বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্রথম খণ্ড

মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৬২ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট ও অলংকরণ
শ্রীগণেশ বসু
প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
ব্লক
মডার্ণ প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯
গ্রন্থণ
সাপ্লাই এজেন্সী কর্পোরেশন
১৬ পাটোয়ার বাগান লেন
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীভূমি মুদ্রণিকা
৭৭ লেনিন সরণী
কলকাতা-১৩

ভারত সরকার কর্তৃক
প্রদত্ত সুলভ মূল্যের
কাগজে এই গ্রন্থ মুদ্রিত

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

স্বামী অভয়ানন্দকে

ভরত-মহারাজ নামে সুপরিচিত পরম শ্রদ্ধেয় এই প্রবীণ সন্ন্যাসীর অজস্র উৎসাহবাক্য ও আশীর্বাদ আমি বহু বৎসর ধরে পেয়ে আসছি— তার একমাত্র কারণ আমি স্বামী বিবেকানন্দের উপরে কাজ করছি।

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

নিবেদিতা লোকমাতা
আমাদের নিবেদিতা (শিশুদের জন্য)
বিশ্ববিবেক (অন্যতম সম্পাদক)
সহাস্য বিবেকানন্দ
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং

কবি ভারতচন্দ্র
মধ্যযুগের কবি ও কাব্য
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি
বিবেকানন্দ ইন ইণ্ডিয়ান নিউজপেপারস্ (অন্যতম সম্পাদক)
লেটারস্ অব সিস্টার নিবেদিতা (যন্ত্রস্থ)

ইডেনে শীতের দুপুর
রমণীয় ক্রিকেট
বল পড়ে ব্যাট নড়ে
ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট
নট আউট
লাল বল লারউড

প্রস্তাবনা

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কয়েক খণ্ডের এই বৃহৎ গ্রন্থ কেন রচনা করলাম, যার জন্য এক যুগেরও বেশি সময় পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার পশ্চাৎপট পাঠকদের কাছে উপস্থিত করা প্রয়োজন, বিশেষতঃ বইটি যখন তার নানাপ্রকার 'আবিষ্কার' ও 'উন্মোচনের' জন্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলেই মনে হয়। স্বামীজী সম্পর্কে প্রীতি ও ভক্তি আমি বাল্য-পরিবেশ থেকেই পেয়েছি। আমি এমন এক জায়গায় বর্ধিত হয়েছি যেখানে বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর নিয়মিত পাঠ ও চর্চা হয়ে থাকে। বিবেকানন্দের আদর্শে সমগ্র জীবন দান করেছেন এমন কয়েকজন মহৎ মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ফলে বিবেকানন্দ-জীবনের নানা কথা ও কাহিনী আমি কার্যতঃ আলো-বাতাসের মতো সহজভাবেই পেয়ে গেছি। বিবেকানন্দ আমার আবাল্য পরিচিত মানুষ।

প্রথম বয়সে আমাকে সবচেয়ে অভিভূত করেছিল স্বামীজীর বিরাট এবং গভীর ব্যক্তিরূপ। এমন প্রবল প্রচণ্ড জ্বলন্ত অস্তিত্বের মানুষ সেদিন আমার ধারণায় কেউ ছিলেন না, আজও আসেন নি। কী প্রকাণ্ড অথচ পরিবর্তনশীল, সমাহিত অথচ গতিশীল! হয়তো তুষারকিরীট হিমালয়ের মতো ধ্যানস্তব্ধ হয়ে আছেন, তার পরেই হিমপ্রপাতের মতো চূর্ণ করে নামতে শুরু করলেন, কিন্তু শেষ করলেন গঙ্গার বিগলিত করুণা হয়ে।' প্রথম বয়সে আমাদের কাছে আরও একটি কথা স্বতঃস্বীকৃত ছিল—স্বামী বিবেকানন্দই নব্যভারতের গঠনকর্তা। সে-সম্বন্ধে বিশিষ্ট ভারতীয়-গণের কিছু-কিছু স্বীকারোক্তির কথাও জেনেছিলুম। কিন্তু পরে, আরও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে, সবিস্ময়ে দেখলুম—ইতিহাসের প্রচলিত বইগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের ভাবাপ্লুত ধারণার অনুরূপ স্বীকৃতি নেই। ব্যাপারটা আমাদের মুগ্ধ হৃদয়ের কাছে যথেষ্ট পীড়াদায়ক ঠেকেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকদের ঔদাসীন্য বা বিরূপতাকে চ্যালেঞ্জ করবার মতো যথেষ্ট উপাদান আমাদের হাতে ছিল না। এমনই সময়ে ১৯৫৮ সালে হাতে এসে পড়ল শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের সুবৃহৎ গ্রন্থ—"স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা : নিউ ডিসকভারিজ্।" অকস্মাৎ যেন পর্দা সরে গেল—এই তো আদর্শ, যাকে অনুসরণ করে কাজ আরম্ভ করতে পারি। শ্রীমতী বার্ক বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমেরিকার নানা জায়গা থেকে স্থানীয় সংবাদপত্র ও অন্য সূত্র সন্ধান করে স্বামীজী সম্বন্ধে অগণিত নূতন বস্তু আবিষ্কার করেছেন এবং সমকালীন আমেরিকার ইতিহাসের উপরে স্থাপন করে বিবেকানন্দের কীর্তির মহিমাকে উন্মোচন করেছেন। বিবেকানন্দ আমেরিকায় কী দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তার কাহিনী লেখবার জন্য তিনি পরবর্তী স্মৃতিকথার উপরে নির্ভর করেন নি, সমকালীন স্বীকৃতিকেই অধিক ব্যবহার করেছেন। আমরা প্রথম বিস্তারিত জানলাম—ধাবমান অগ্নির মতো বিবেকানন্দ আমেরিকার নানা অংশে ছুটে গিয়ে কোন্ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, যা পুড়িয়ে দিয়েছিল বহু মিথ্যার জঞ্জালকে, উদ্ভাসিত করেছিল সত্যের শুভ্র জ্যোতিকে। দেখলুম বিবেকা-নন্দের সংগ্রামী চেহারাকে এবং সন্ন্যাসী চরিত্রকে।

এই গ্রন্থ যেমন আমাদের উল্লসিত করেছিল, তেমনি লজ্জিতও। আমরা স্বামীজীর সন্ধানে এতদিন ভারতবর্ষে কী করেছি! এদেশে স্বামীজী-বিষয়ে যেটুকু গবেষণা হয়েছে তা কি রামকৃষ্ণ-সংঘভুক্ত সন্ন্যাসীরাই করেন নি—এবং আমরা কি তাঁরা আরও

বেশি কেন করেন নি—এই ধিক্কারের অলস আনন্দে কালযাপন করি নি? শ্রীমতী বার্ক এক্ষেত্রে আমাদের লজ্জিত করার সঙ্গে উদ্বুদ্ধও করলেন।

স্বামীজী সম্পর্কে সন্ধানমূলক কিছু কাজ করা উচিত, এ তাগিদ অবশ্য পূর্ব থেকেই অল্পবিস্তর মনে ছিল। সংগ্রহ-কাজ আগেই আরম্ভ করে দিয়েছিলুম। তারই সাহায্যে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর সময়ে 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থ প্রস্তুত করেছিলুম এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শংকরের সহযোগিতায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। গ্রন্থটি বিশেষ সমাদৃত হয়। তার থেকে বুঝেছিলুম—স্বামীজীর বিষয়ে গবেষণা-মূলক কিছু পাবার জন্য পাঠকসমাজ প্রস্তুত হয়ে আছেন। কিন্তু ঠিকভাবে কাজটা শুরু করা যাচ্ছিল না। সংবাদপত্র সন্ধান না করেই ধারণা করে বসেছিলুম—সমকালীন কাগজে বিশেষ কিছুই পাওয়া যাবে না, বিশেষত যখন ইণ্ডিয়ান মিররের ফাইল প্রাপ্তব্য নয়, যাতে নাকি স্বামীজীর সর্বাধিক সংবাদ বেরিয়েছিল। আমার মনোভাব এবং উৎকণ্ঠার কথা আমার পরম বন্ধু শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ (জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত) জানতেন। একদিন তিনি অত্যন্ত আশ্বাসজনক সংবাদ আনলেন—কিছুদিন আগে জাতীয় গ্রন্থাগার ইণ্ডিয়ান মিররের পুরনো ফাইল সংগ্রহ করেছে, কিন্তু—আমার উৎসাহে জলনিষেক করে তিনি জানালেন—যেহেতু ফাইলগুলি একেবারে লোলগাত্র, তাই বাইরের কাউকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না। আমার মানসিক অবস্থা তখন—মুখের গ্রাস বুঝি হাতেই থেকে গেল! উপায়? সুনীল-বিহারীই উপায় জানালেন—একমাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত কেউ ঐ ফাইল ব্যবহারের অনুমতি পেতে পারেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্বশীল কর্মী শ্রীযুক্ত সুনীলবিহারী ঘোষ সেই মুহূর্তে আমার কাছে জ্যোতির্ময় আকার ধারণ করলেন—তিনিই নির্ধারিত পুরুষ তাহলে—মিররের গলিত পৃষ্ঠা থেকে বিবেকানন্দ-উদ্ধারের!! আমার নাছোড় তাগিদে তিনি 'নির্ধারিত পুরুষ' হতে রাজি হলেন—পাওনা ছুটি আদায় করে ঝুঁকে পড়লেন সত্তর বছরের পুরনো জীর্ণ সংবাদপত্রের সুবৃহৎ আকারের পৃষ্ঠার উপরে—এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের অপর এক কর্মী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বেচ্ছাসেবার দায়ে ছুটি নিয়ে একইভাবে ঝুঁকে পড়ে প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি টাইপ করে চললেন। সেই রোমাঞ্চকর উত্তেজনার দিনগুলি কখনো ভুলব না যখন প্রায় প্রতিদিন সুনীলবিহারীর বাজেশিবপুরের বাসায় উপস্থিত হতাম এবং নব নব আবিষ্কৃত সংবাদের উত্তেজনায় ক্রমাগত অধীর হয়ে উঠতাম।

চাকরির বন্ধনে বিশেষ বাঁধা সুনীলবিহারীর পক্ষে এই কাজ আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। আমার চাকরিতে অবকাশের পরিমাণ বেশি এবং—আমার নেশা ধরে গেছে। ফলে থামা গেল না। চৌরঙ্গীর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পুরনো কাগজের উপরে হুমড়ি খেয়ে তারপর কয়েকটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল কে জানে! আরও গোটা পনর সংবাদপত্রের ১৮৯৩-১৯০২ সময়ের পৃষ্ঠা উল্টে সংবাদ সংগ্রহের পরে স্থির করলুম—বিবেকানন্দ যখন প্রথমাবধি সর্বভারতীয় ব্যাপার এবং তাঁর সমাদর যখন বাংলা থেকে বাংলার বাইরে কম নয়, ক্ষেত্রবিশেষে বেশি—তখন বাংলার বাইরে গিয়ে সন্ধান না করলেই নয়। সুতরাং ১৯৬৩-৬৪ সালে কয়েক মাস বোম্বাই ও পুনায় থেকে নানা গ্রন্থাগারে ঘুরে পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টালাম। ফিরে এসে কল-কাতার আরও নানা গ্রন্থাগারে ঘুরলাম। তার ফল : *Vivekananda in Indian Newspapers : 1893-1902* নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ, যা আমার ও সুনীলবিহারী ঘোষের সম্পাদনায়, এবং শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুর উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরে একই উদ্দেশ্যে কাশীতে দুবার গিয়েছি—১৯৬৭ এবং ১৯৭০-৭১ সালে; আলমোড়া, মায়াবতী ও লখনৌ-এ গিয়েছি ১৯৬৯ সালে।

সংবাদপত্র থেকে স্বামীজী-সংবাদ সংগ্রহের কালে আমি অধিকন্তু সমকালীন ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও তার নেতৃস্থানীয় চরিত্রদের সম্বন্ধে প্রভৃত সংবাদ তুলে এনেছিলুম—যাতে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্বামীজীর জীবন ও কার্যাবলীকে স্থাপন করা সম্ভব হয়। এই সমস্ত সংবাদের সাহায্যে বেশ কয়েক বৎসর আগে "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" নামে বৃহৎ একটি গ্রন্থ লিখে ফেলি। সেটি প্রকাশ করার উদ্যোগ যখন করছি, তখন হঠাৎ বাধা এল—এবং সে বাধা শুভকর।

১৯৬৩-এর ডিসেম্বরে যখন আমি পূর্বোক্ত গবেষণাকার্যের জন্য বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনে আছি, তখন স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ পাশ্চাত্ত্যভ্রমণ করে সেখানে এলেন। আমার কাজের কথা শোনার পরে তিনি 'ব্যাপারটা কী' জানতে চাইলেন। আমি 'ব্যাপারটা' তাঁকে বোঝালুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কাজে কিছু অসুবিধা হচ্ছে? আমি জানালুম—অন্য অসুবিধা নেই, কেবল অর্থাভাব। এতদিন পর্যন্ত নিজের টাকায় ও-কাজ করা গেছে কিন্তু আর সম্ভব হচ্ছে না, অথচ মনে হচ্ছে—যদি গোটা ভারতে ঘুরে সন্ধান করা যায়, অনেক-কিছু সংবাদ পাওয়া যাবে। নিত্যস্বরূপানন্দ বললেন—এ-কাজে টাকার অভাব হওয়া উচিত নয়। আমি সন্দিগ্ধ মনে সায় দিলুম।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ কিছুদিন পরে আবার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর ভার নিলেন এবং আমাকে স্বামীজীর উপরে ধারাবাহিক বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। স্বামীজীর উপরে ইতিমধ্যে লিখিত পূর্বোক্ত রচনার ভিত্তিতে আমি দীর্ঘ দুই বৎসর সেখানে সাপ্তাহিক বক্তৃতা করলুম। বক্তৃতা-গুলি যদিও তথ্য ও যুক্তিঠাসা অ্যাকাডেমিক কাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবু ইনস্টি-টিউটের সহিষ্ণু বিদগ্ধ শ্রোতারা যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত থেকে বক্তাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

এরই মধ্যে একদিন স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—আমার পূর্ব ইচ্ছা এখনো বজায় আছে কি-না? অসুবিধা অবশ্যই ছিল কিন্তু ইচ্ছা ছিল প্রবলতর—সুতরাং সম্মতি জানালুম। এবং স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দের উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অব কালচার একটি সর্বভারতীয় বিবেকানন্দ-গবেষণা সফরের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি পাওয়ার যে-অসুবিধা ছিল, তাও নিত্য-স্বরূপানন্দ দূর করলেন উপাচার্য ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ফলে ভারতের অভ্যন্তরে গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্টাডি-লীভ (সর্ব-প্রথম?) লাভ করে সদলবলে ১৯৭১-৭২ সালে প্রায় আট মাস দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও অন্য সূত্র থেকে তথ্যসংগ্রহ করলুম, যার পরিমাণ "বিবেকানন্দ ইন ইন্ডিয়ান নিউজপেপারস্" গ্রন্থে প্রদত্ত সংবাদের চেয়ে অল্প নয়।

এই নূতন সংগৃহীত তথ্য একটি ক্ষেত্রে আমাকে অসুবিধায় ফেলল। "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ"-এর যে-পাণ্ডুলিপি পূর্বে প্রস্তুত করেছিলুম, দেখলুম, তাকে আর পূর্ব আকারে ছাপা সম্ভব নয়—তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অন্ততঃ নূতন জিনিসগুলি প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়ই। তার মানে—গোটা পাণ্ডুলিপি ঢেলে সাজা। এবং তা করতে হলই।

সর্বভারতীয় সন্ধানের ফলে একটি গুরুতর বিষয়ে প্রচুর সমর্থক প্রমাণ পেয়ে

গেলুম, যার কিছু সংবাদ অবশ্য আগেই জোগাড় করেছিলুম। প্রথম সর্বভারতীয় জাগরণ যে বিবেকানন্দের দ্বারাই প্রধানতঃ সম্ভবপর হয়েছে, তা অখণ্ডনীয়ভাবে প্রমাণের উপযোগী প্রচুর সংবাদ সমকালীন সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়ে গেল, যা ভারতবর্ষের নানা স্থানে না ঘুরলে পাওয়া যেত না। এর দ্বারা, আমার বিশ্বাস, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ভারতের নবজাগরণে বিবেকানন্দের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে পারবেন। বর্তমান গ্রন্থের অনেকগুলি খণ্ডে ঐসব প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে আরও কী আছে, পাঠক পৃষ্ঠা ওল্টালেই দেখতে পাবেন—দেখতে পাবেন, বিবেকানন্দ জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজন কিভাবে বুঝেছিলেন এবং ধর্ম ছাড়াও রাজনীতি সমাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান ইতিহাস বিষয়ে কি পরিমাণে উজ্জ্বল উদ্দীপ্ত অগ্রসর চিন্তাসম্পদ রেখে গেছেন।

স্বামীজী সম্পর্কে সমকালীন সংবাদ সংগ্রহের জন্য যে-বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং যে-জন্য ভারতের নানা স্থানে ঘুরতে হয়েছে—সে-ব্যাপারে বহু লোকের সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে, ফলে ঋণের পরিমাণও বৃহৎ। স্বীকৃতির স্ফীত আকার দেখলেও তাই বিদগ্ধ পাঠক যেন নিজগুণে ক্ষমা করেন। এক্ষেত্রে একটি আনন্দের কথা গোড়াতেই নিবেদন করি—যেখানেই গিয়েছি, বিবেকানন্দের নাম শুনে প্রায় সর্বত্রই দ্বার খুলে গেছে। আমি সবিনয়ে স্বীকার করছি, যত মানুষের সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের সকলের কাছে ঋণস্বীকার করা সম্ভব নয়—এবং সকলের নাম মনেও নেই। এক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটলে তাকে অনিচ্ছাকৃত মনে করলে কৃতজ্ঞ হব।

প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের স্নেহপূর্ণ আনুকূল্যের কথা স্মরণ করছি। আমি যখন কাজ আরম্ভ করেছিলুম, তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সম্পাদক। তাঁর ইচ্ছায় মঠ-গ্রন্থাগার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পেরেছি। পরে তাঁর দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে প্রায় সারা ভারত ঘুরেছি এবং সকলের কাছে আমার বিশ্বস্ততার পক্ষে তাই ছিল শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান।

মঠ-গ্রন্থাগার ব্যবহারের একই সুযোগ আমি সংঘের বর্তমান সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দের ইচ্ছায় পেয়েছি। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের বিষয়ে প্রখ্যাত লেখক ইনি. সেই সঙ্গে স্বামীজীর জীবনীকার—এঁর ঔৎসুক্য, উৎসাহ এবং উপদেশ আমাকে প্রেরণা দিয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্তর্ভুক্ত আরও যাঁরা এই গবেষণার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়ে আসছেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অব্জজানন্দ, বুধানন্দ, বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, বলরামানন্দ, এবং রামকৃষ্ণ মহারাজ। স্বামী স্মরণানন্দের ধারাবাহিক আনুকূল্যের কথা আমি স্মরণ করছি এবং স্বামী চেতনানন্দের সক্রিয় সাহায্যের কথাও, যিনি বর্তমানে বেদান্তপ্রচারের জন্য দূর ক্যালিফোর্নিয়াতে গিয়েও আমার কাজের প্রতি আগ্রহে যখনি সম্ভব সেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছেন। স্বামী যোগেশানন্দ আমাকে বৃটিশ মিউজিয়ম থেকে ইণ্ডিয়ান মিরারের শ্রীরামকৃষ্ণ-সংবাদ ফটোকপি করে পাঠিয়েছেন। স্মরণ করছি স্বামী নিখিলানন্দের কথা, যিনি কুড়ি বছরেরও বেশি আগে আমাকে "গস্পেল অব রামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত পাঠিয়েছিলেন।

আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কাছে। এঁর আনুকূল্যে বেদান্তমঠে রক্ষিত পুরাতন সংবাদপত্রের ফটোচিত্র সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই সুপণ্ডিত মনস্বী গ্রন্থকারের শুভেচ্ছা সর্বদাই পেয়েছি।

বিষাদের সঙ্গে এক মহান সন্ন্যাসীর কথা স্মরণ করছি, যিনি এই গ্রন্থ প্রকাশিত দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন কিন্তু দেখে যেতে পারলেন না—তিনি লোকান্তরিত স্বামী ওঁকারানন্দ। দিনের পর দিন তিনি প্রশ্ন করে এই গ্রন্থের সন্ধান নিয়েছেন এবং সাহসের সঙ্গে সত্য কথা যাতে গ্রন্থে লিখতে পারি সে-বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। স্বামীজীর সম্বন্ধে উপযুক্ত গ্রন্থরচনাই যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হবে, একথা ইনি আমার মনে গেঁথে দিয়েছেন।

আমার বিবেকানন্দ-গবেষণার সূচনাপর্বে শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষের ভূমিকার কথা বলেছি। পরেও তিনি যখনি প্রয়োজন উদারভাবে সাহায্য করেছেন। এই কাজে শ্রীবিমল ঘোষের কাছে ঋণের অবধি নেই। বহু বৎসর ধরে এই গবেষণায় তিনি আমাকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। গ্রন্থের নির্ঘণ্ট তিনিই করেছেন। দক্ষিণ ভারতে সফরকালে তিনি দু'মাস সঙ্গে থেকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন। ঐ সফরে অনুরূপ পরিশ্রম করেছেন শ্রীবিশ্বনাথ বসু, যিনিও দুই মাস আমার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীলক্ষ্মী-কান্ত বড়াল একই কাজে মাসাধিক নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের সঙ্গে থেকে বহু ধূলি সরিয়ে ইতিহাস উদ্ধার করার কঠিন অথচ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা আমি পেয়েছি। এই সময়ে শ্রীমতী মায়া বসু আমার সঙ্গে মাদ্রাজে থিয়জফিক্যাল সোসাইটিতে অনেকদিন কাজ করেছেন।

বিভিন্ন সফরকালে যাঁদের কাছে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে পুনা রামকৃষ্ণ আশ্রমের পি এম বোডাসের কথা স্মরণ করছি। পুনায় রামকৃষ্ণ-আন্দোলন ইনিই গড়ে তুলেছেন। ১৯৬৩ সালে এঁরই আতিথ্যে থেকে আমি যথেষ্ট কাজ করতে পেরেছি। পুনা রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যাপক ধারানে এবং শ্রীযুক্ত ধেরে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ঐকালে দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দামলে, তিলকের সহকর্মী এন সি কেলকারের পুত্র কাশীনাথ কেলকার, অধ্যাপক জি পি প্রধান প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপকৃত হয়েছি এবং কাজ করেছি কেশরী ট্রাস্ট গ্রন্থাগার, ফার্গুসন কলেজ গ্রন্থাগারে।

১৯৬৩ সালে বোম্বাইয়ে কাজের সময়ে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী অজয়ানন্দ। শ্রীযুক্ত এম রায়, শ্রী পি কে রায় (ঐকালে টাইমস অব ইণ্ডিয়ান জেনারেল ম্যানেজার), গুজরাটি প্রিণ্টিং প্রেসের শ্রীযুক্ত দেশাই, শ্রীমান্ দে প্রভৃতির কাছে আমি ঋণী। তখন বেশি সময় কাজ করেছিলুম এশিয়াটিক সোসাইটি এবং টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকা লাইব্রেরিতে।

১৯৬৭ ও ১৯৭০-৭১ সালে কাশীতে কাজ করার সময়ে সাহায্য পেয়েছি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দ, রঘুবরানন্দ, এবং শৈলেন মহারাজের কাছ থেকে। সুবৃদ্ধ শৈলেন মহারাজ অসুস্থতা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তথ্যসংগ্রহের জন্য নানা স্থানে ঘুরেছেন, পরেও সংবাদ লিখে পাঠিয়েছেন। স্বামী রঘুবরানন্দ সেবাশ্রম সংক্রান্ত বহু মূল্যবান স্মৃতি এবং সংবাদ আমাকে দিয়েছেন। কাজ করেছি থিয়জফিক্যাল সোসাইটি, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গ্রন্থাগার, কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, (গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য), বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম গ্রন্থাগার (গ্রন্থাগারিক শ্রীগতিনাথ সান্ন্যাল), কারমাইকেল লাইব্রেরি, নাগরী প্রচারিণী সমিতি, হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে।

১৯৬৮ সালে আলমোড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের গ্রন্থাগারে এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম গ্রন্থাগারে কাজ করেছি। আলমোড়ায় "বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরীর" প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ বশীশ্বর সেন অনেক মূল্যবান সংবাদ দিয়েছেন।

১৯৭৩ সালের আগে আরও যেসব গ্রন্থাগারে কাজ করেছি তাদের কয়েকটির নাম ঃ উদ্বোধন গ্রন্থাগার, সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার, হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম গ্রন্থাগার, কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান গ্রন্থাগার, এনটালি শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল গ্রন্থাগার, অদ্বৈত আশ্রম (কলিকাতা) গ্রন্থাগার।

১৯৭১-৭২ সালের সফরে মাদ্রাজে অবস্থানকালে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বপ্রকার সহযোগিতা পেয়েছি। অধ্যক্ষ স্বামী তপস্যানন্দ সর্বদাই খোঁজখবর নিয়েছেন। আর গবেষণাকার্যে সর্বাধিক সাহায্য করেছেন বেদান্তকেশরী পত্রিকার সম্পাদক স্বামী বোধস্বরূপানন্দ। স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ, নির্জরানন্দ, তথাগতানন্দ এবং ব্রহ্মচারী দয়ালের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

এই সূত্রে মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শ্রীযুক্ত এস কে শিবরামনের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনিই 'হিন্দু' ও 'মেল' পত্রিকায় আমাকে নিয়ে গিয়ে ফাইল দেখার অনুমতি সংগ্রহ করে দিয়েছেন, টাইপের ব্যবস্থাও করেছেন এবং তাঁর পরিবারে ও রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে পরিজ্ঞাত স্বামীজীর মাদ্রাজবাসের নানা স্মৃতিকথা শুনিয়ে আমাদের উদ্দীপ্ত করেছেন। শ্রীযুক্ত অর্চন-কুমার বসু এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী আভা বসুর কাছেও আমাদের বিশেষ ঋণ—যাঁরা ঐকালে আমাদের ব্যক্তিগত সুখসুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। কার্যতঃ তাঁরাই ছিলেন মাদ্রাজে আমাদের স্থানীয় অভিভাবক। তাঁদেরই ব্যবস্থাপনায় আমরা শ্রীরবি বর্মা ও শ্রীমতী পদ্মিনী বর্মার বাড়িতে কিছুদিন বাস করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

মাদ্রাজে 'মেল' পত্রিকার গ্রন্থাগারে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন পত্রিকা-সম্পাদক শ্রী ভি পি ভি রাজন। হিন্দু পত্রিকায় কাজের অনুমতি দেন ম্যানেজিং এডিটর সি কে এস রেড্ডি। হিন্দুর লাইব্রেরিয়ান এম পি গোবিন্দরাজ এবং তাঁর সহকারী কে আর ভেঙ্কটেশন যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। অ্যাডেয়ারে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি গ্রন্থাগারেও অনেকদিন কাজ করেছি ও প্রচুর মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করেছি। এই গ্রন্থাগারের অনবদ্য পরিবেশ এবং সুষ্ঠু কার্যব্যবস্থা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

মাদ্রাজের অন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞতা ঃ তামিলনাডু আর্কাইভস্ (ডিরেক্টর শ্রীথিরু এস শৃঙ্গরাজন), মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, স্বদেশ মিত্রম পত্রিকা, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম, মাদ্রাজ ক্রীশ্চান লিটারেচর সোসাইটির ডেভিড প্যাকিমুথু, মরাই মল্লাই আডিগাল গ্রন্থাগার (গ্রন্থাগারিক আর মুথু কুমারস্বামী), এম আর সম্পতকুমার (অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের পুত্র), কুমারী মালা পত্রিকার সম্পাদক এ কে চেট্টিয়ার এবং প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা।

ত্রিবেন্দ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এখানেই স্বামী মৈত্রানন্দের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। এই দীপ্তবুদ্ধি মনস্বী মানুষটির সঙ্গ আমাদের মানসিক-ভাবে বিশেষ উজ্জীবিত করেছিল এবং ইনি বহু মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আরও যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ঃ

স্বামী শ্রীকরানন্দ, শ্রীবোধশরণ, ডাঃ এ জি কৃষ্ণ ভেরিয়ার (বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক), কে প্রভাকরণ (কবি কুমারণ আসানের পুত্র), কে সুকুমারণ (কেরালা কৌমুদী পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেকটর), শ্রীপাণিক্কর (ঐ

পত্রিকার), অধ্যাপক বালকৃষ্ণ আয়ার, বারকেলা শ্রীনারায়ণগুরু ধর্মসংঘ, এন ভি কৃষ্ণ ভেরিয়ার, জি বল্লভকৃষ্ণ নায়ার, পি কে পরমেশ্বরণ নায়ার, অধ্যাপক এলমকুলম পি এন কাঞ্চন পিল্লাই, ডাঃ শ্রীধর মেনন (রেজিস্ট্রার, কেরালা ইউনিভার্সিটি), শ্রীচিত্র তিরুমল লাইব্রেরি, কে পি পদ্মনাভন তাম্পি, অধ্যাপক গুপ্তন নায়ার, অধ্যাপক ভি এস শর্মা, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, ডাঃ ভাস্করণ নায়ার, নট্টয়াম রামকৃষ্ণ আশ্রম।

মাদুরায় প্রধান সহায়করূপে পেয়েছিলাম শ্রীযুক্ত কে অর্থনারী এবং 'রামকৃষ্ণ সমাজে'র জি এ রামমূর্তি ও তাঁর পুত্র জি আর রাধাকৃষ্ণণকে। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ আমাদের নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে সুফলপ্রসূ হয়েছে শ্রী পি এস নারায়ণম্-এর কাছে উপস্থিত হওয়া—যেখানে আমরা মাদুরা মেলের কয়েক বৎসরের পুরনো ফাইল পেয়েছি! অন্য যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি তাঁদের মধ্যে আছেন : স্থানীয় ইন্ডিয়ান একস্‌প্রেসের সম্পাদক শ্রী এন কীর্তিবাসন, দিনমণির স্থানীয় নিউজ এডিটর শ্রী ভি শান্তনম, সৌরাষ্ট্র মিত্রম্-এর সম্পাদক বিপ্রবন্ধু কে ভি পদ্মনাভ আয়ার, এবং শ্রী কে চন্দ্রশেখর।

স্বামীজীর সঙ্গে রামনাদের রাজার সম্পর্কের কথা মনে রেখে আমরা রামনাদে উপস্থিত হই। রামনাদের তরুণ রাজা এস রামনাথন সেতুপতি এবং তাঁর কাকা কাশীনাথ ডুরাই আমাদের সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত ডুরাইয়ের কাছে তাঁদের পারিবারিক স্মৃতিতে রক্ষিত স্বামীজীর নানা প্রসঙ্গ শুনেছিলাম—তিনি স্বামীজীর স্মৃতিসংশ্লিষ্ট নানা জায়গায় আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। দেওয়ান এম ভি রাঘবেন্দ্র রাও-ও বিশেষ সদ্‌ব্যবহার করেছিলেন।

রামনাদের রাজার সুপারিশেই রামেশ্বরে স্বামীজীর স্মৃতিসংশ্লিষ্ট নানা জিনিস ভালভাবে দেখার সুযোগ ঘটে। এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রয়োজনীয় সংবাদ সাগ্রহে সরবরাহ করেছেন।

বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ, সমগ্র কর্ণাটক রাজ্যে প্রথম শ্রেণীর ধর্ম-তাত্ত্বিকরূপে স্বীকৃত, স্বামী আদিদেবানন্দ আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। চিত্রবৎ সুন্দর বাঙ্গালোরের রামকৃষ্ণ আশ্রম—স্থানীয় মানুষদের ভক্তি ও ভালবাসায় একেবারে পূর্ণ—এখানে উপস্থিত হয়ে স্বামীজীর জীবন্ত প্রভাব অনুভব করেছিলাম। এখানকার সংগ্রহশালা থেকে বেশ-কিছু মূল্যবান বস্তু লাভ করেছি এবং ব্রহ্মচারী জগদীশ সম্ভবপর সকল সাহায্য করেছেন।

কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক প্রতিভূ হিসাবে বহুমানিত ডাঃ ডি ভি গুণ্ডাপ্পার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি। নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধের মুখে বাঙ্গালোরে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সূচনাপর্বের ইতিহাস শুনেছি। স্বামীজীর প্রতি ভক্তিতে মাতোয়ারা এই জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষটি অতীতের সেই দিনগুলির কথা আমাদের বলেছিলেন, যখন স্বামীজীর নাম ছিল এই অঞ্চলে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো।

মহীশূরে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক, বিবেকানন্দের শিষ্য এবং তাঁর ভাবে উন্মত্ত ডাঃ পি ভেঙ্কটরঙ্গমের কন্যা, সারদা মাতৃমন্দিরের ভগিনী সুনন্দার সঙ্গে দেখা করে স্মৃতিকথা শুনেছি। শ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসিনী ইনি। এঁর ভাই শ্রী পি ভি রামকৃষ্ণ মূল্যবান ছবি ও চিঠিপত্রের ফটোকপি দিয়েছেন।

বাঙ্গালোরে সর্বাধিক উপাদান পেয়েছি ইউনাইটেড থিয়লজিক্যাল কলেজ লাইব্রেরি থেকে। এর গ্রন্থাগারিক, বয়স্কা জার্মান মহিলা মিসেস অডি আপ্পার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। ক্যানটনমেণ্টের থিয়জফিক্যাল

সোসাইটি লাইব্রেরি এবং গোখলে ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্স লাইব্রেরি থেকেও কিছু প্রয়োজনীয় পত্রিকা পেয়েছি। এ ছাড়া নিম্নের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যও পেয়েছি :

ডাঃ কে গুরুরাজ রাও, ডাঃ এইচ এন মূর্তি, ডি আর ভেংকটরমন, এস আর রামস্বামী, টি টি শর্মা, এস ভেংকটচলপতি, এস রামচন্দ্রন, রেভাঃ সার্জেণ্ট, স্বামী ঋতাত্মানন্দ, ডাঃ শিবরুদ্রাপ্পা (বিশ্ববিদ্যালয়ের কানাড়ি ভাষার অধ্যাপক), পি সদাশিবমূর্তি, কব্বনপার্ক পাবলিক লাইব্রেরি, বাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, মীথিক সোসাইটি, কানাড়া সাহিত্য পরিষদ, চার্চ অব সাউথ ইণ্ডিয়া।

মহীশূরে প্রধান সহায়ক ছিলেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্ভবানন্দ। মহীশূরে শিক্ষাজগতে এই অসাধারণ কর্মীপুরুষের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত, বিরাট বেদান্ত কলেজ এ'রই কীর্তি—আমরা যখন মহীশূরে যাই তখন এই অশীতিপর সন্ন্যাসী বস্তুতঃ তাঁর শেষ রোগশয্যায় শায়িত। কিন্তু তিনি অতীব আত্মনির্ভরশীল, বলা চলে ভয়ানক জেদী, ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও আমাদের নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরলেন (কিভাবে, কোন্ মনের জোরে, ভগবানই জানেন) এবং আমাদের কাজের সম্বন্ধে অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা জানালেন।

মহীশূরে অন্যান্য যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ :

ডাঃ প্রভুশঙ্কর (মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়), স্বামী সোমনাথানন্দ, এম জি শ্রীনিবাসন (আলাসিঙ্গা পেরুমলের দৌহিত্র), ডাঃ নডিগ কৃষ্ণমূর্তি, আগারাম রঙ্গিয়া (সাধ্বী পত্রিকার সম্পাদক), শ্রীনিবাস রাও, এন এন শাস্ত্রী, ডাঃ পুটাপ্পা (ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলার; বিবেকানন্দের জীবনীকার, আকাদামী পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক), এইচ এইচ নায়েক (ডিরেক্টর, কানাড়া স্টাডিজ্), মহারাজা কলেজ লাইব্রেরি, ওয়েসলি মিশন প্রেস, মহীশূর পাবলিক লাইব্রেরি, ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরি।

এই সফরেও বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় নিয়েছিলুম। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ এবং পরে স্বামী অকামানন্দের সাহায্য ও সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞভাবে স্মরণ করছি। আশ্রমের কর্মী ইন্দ্রনীল মাধব ভোলে এবং মধুসূদন বলবন্ত কালে বহু মরাঠি পত্রিকা সন্ধান করে তথ্যসংগ্রহ করে দিয়েছেন। আরও যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞ :

এশিয়াটিক সোসাইটি, জি কে বৈতি, রেভাঃ ক্যানন অসকার ব্রাউন, কান্তিলাল পারেখ, স্বামী শিবব্রতানন্দ, মারুতি গ্রন্থ সংগ্রহালয়, মুম্বাই মরাঠি গ্রন্থ সংগ্রহালয় (গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী কান্তা এ রতবোলে), সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, ফাদার সোলা-গ্রাম, ফাদার ডি কস্টার, উইলসন কলেজ, আমেরিকান মরাঠি মিশন, বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ, এলফিনস্টোন কলেজ, গভর্নমেণ্ট রেকর্ড অফিস, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, কে আর কামা ওরিয়েনটাল ইনস্টিটিউট, শ্রীফরবেস গুজরাটি সভা, সারভেণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া (বোম্বাই শাখা), জামসেদজি এন পেটিট ইনস্টিটিউট, ইউনাইটেড লজ অব থিয়জফিস্টস্, ওয়াই-এম-সি-এ সেনট্রাল লাইব্রেরি, মহারাষ্ট্র স্টেট আর্কাইভস্, সি এম এস হাউস গিরগাঁও, রেভাঃ ক্যানন দাশগুপ্ত, সর্বজনিক বচনালয়।

এই সফরেও পুনায় পি এম বোডাসের তত্ত্বাবধানে রামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলাম। সেখানকার আরও যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী :

কেশরী ট্রাস্টের কিউরেটর বি ডি করকরে, বি ডি খের (কেশরী পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক), এম আর পুরোহিত, পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়াকর গ্রন্থাগার এবং তার গ্রন্থাগারিক কে এস হিংওয়ে, ডেকান কলেজ, ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনস্টিটি-

উট (গ্রন্থাগারিক ভি এল মঞ্জিল), ডি নোবিলি কলেজের অ্যাথীনিয়াম গ্রন্থাগার, মহারাষ্ট্র রিজিওনাল লাইব্রেরি, পুনা মরাঠি গ্রন্থাগার, স্পায়ার্স মেমোরিয়াল কলেজ, ডাঃ লেডারলে, রেভাঃ টিলারি, রেভাঃ ফাদার পি স্যাবিনো (প্যাপাল সেমিনারি), গোখলে ইনস্টিটিউট, শ্রীপাদ যোশী, নগর বচন মন্দির, ফার্গুসন কলেজ লাইব্রেরি, আর্যভূষণ প্রেস, ইতিহাস সংশোধক মণ্ডলী।

দিল্লীতে গবেষণাকালে আতিথ্য নিয়েছিলুম স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে এবং অধ্যক্ষ স্বামী বন্দনানন্দ ও সহকারী সম্পাদক এস এম সেনগুপ্তের বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি নেহরু মিউজিয়ামের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। সেখানে খুবই সাহায্য করেছেন ভি সি যোশী এবং যতীন্দ্রকুমার জৈন। ইনস্টিটিউট অব রিলিজিয়াস স্টাডিজেও ('দিব্যজ্যোতি') যথেষ্ট কাজ করেছি। ফাদার জি জিসপার্ট সাউচ এস-জে, ফাদার রাকারিয়াস, ফাদার জুল ভলকার্ট, ন্যাশন্যাল আর্কাইভস্, মেথোডিস্ট চার্চ, কেম্ব্রিজ ব্রাদারহুড, ফাদার ওয়েদারল, মিঃ স্টুয়ার্ট, সেণ্ট স্টিফেনস্ কলেজ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাছেও আমি ঋণী।

হরিদ্বারে আর্যসমাজের গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কনখলের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গ্রন্থাগারেও সন্ধান করেছি।

বরোদায় আমার আশ্রয়দাতা ও সহায়ক ছিলেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের সংগঠক গোবর্ধনভাই প্যাটেল। ইনি আমাকে হরিদাস বিহারীদাসের প্রপৌত্র সুবোধচন্দ্র দেশাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁর কাছ থেকে হরিদাসকে লেখা স্বামীজীর অনেক চিঠির ফটোকপি পেয়েছি। নিঃসন্দেহে মূল্যবান সংগ্রহ। এইখানে অবস্থানের সময়ে রাজকোট আশ্রমের ব্রহ্মচারী দীনেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যিনি পশ্চিমভারতে স্বামীজীর অবস্থানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসূত্র দিয়েছেন। বরোদার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, রেকর্ড অফিস, জ্ঞানসাধনা আশ্রমের স্বামী স্বয়ং-জ্যোতি তীর্থ, রণছোড়লাল মজুমদার (সাধারণ সম্পাদক, ক্রনলজি অব গুজরাট স্টেট ডিপার্টমেণ্ট অব আর্কলজি) প্রভৃতির কাছে আমি ঋণী।

এই গ্রন্থ প্রস্তুতকালে বহুজনের পরামর্শ নিয়েছি। তাঁদের মধ্যে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাহিত্যিক বন্ধু শংকরের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ-গবেষক অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং কিছু দরকারী সংবাদ জোগাড় করে দিয়েছেন। বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব সমিতির সংগঠক শ্রীধীরাজ বসু সর্বদাই বইটির ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন, এবং নানা ব্যাপারে সাহায্য করেছেন শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীনিত্যানন্দ ভকত, শ্রীশিশির ঘোষ, শ্রীঅসিত ঘোষ, শ্রীঅরুণ ঘোষ। অধ্যাপক স্বপন বসু যথেষ্ট পরিশ্রম করে মূল্যবান কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন পত্রপত্রিকা থেকে। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার আশীর্বাদ সর্বদাই পেয়েছি। স্মরণ করছি লোকান্তরিত অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তকে, যিনি এই গবেষণায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। লোকান্তরিত স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ এবং স্বামী চিদাত্মানন্দের কাছেও অনেক সাহায্য নিয়েছি।

এই বিপুলায়তন গ্রন্থটি যে দ্রুত প্রকাশিত হতে পারলে, তার মূলে প্রকাশক শ্রীসুনীল মণ্ডলের বেপরোয়া সাহস। এই অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে এই আকারের বই উপযুক্ত সজ্জাসহ তিনি কেন প্রকাশ করলেন, তার কারণ তিনি তীক্ষ্ণভাবে জানিয়েছেন (না, আমার প্রতি প্রীতিতে এ-কাজ করেন নি যে-সন্দেহ করতে আমি প্রলুব্ধ হয়েছিলুম)—করেছেন স্বামীজীর প্রতি ভক্তিতে। গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ-

সৌন্দর্যের জন্য শিল্পী-বন্ধু শ্রীগণেশ বসুকে ধন্যবাদ জানাই। এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীহিতেন্দু ভট্টাচার্যকে, যাঁর সতর্ক দৃষ্টি আছে বলেই নানা তথ্য-পরিকীর্ণ এই বই সুষ্ঠুভাবে মুদ্রিত হতে পেরেছে। এবং ধন্যবাদ জানাই দুই সাহিত্যিক অগ্রজ শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসুকে—যাঁরা প্রীতি ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে প্রায়ই গ্রন্থের বিষয়বস্তু পড়েছেন এবং প্রয়োজনীয় মন্তব্য করেছেন।

তথ্য সংগ্রহের জন্য ভারতভ্রমণের কালে একটি পরম আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছে। দেখেছি—চিন্তাশীল মানুষদের মনের গভীরে স্বামীজী অতি গভীরভাবে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আলোচনাকালে বলেছেন, জীবন যখন সহজ সাধারণ তখন বিবেকানন্দকে না নিলেও চলে যায়, কিন্তু যখন গভীর সংকট ঘনায়, আবর্তে পাক খাই, কালো ছায়া ঘিরে ধরে—তখন পরম আলোক ও পরম শক্তির মতো বিবেকানন্দকে পাই।

বিবেকানন্দ যে এখনো সর্বভারতীয় আন্দোলন সৃষ্টি করছেন, তাও দেখেছি। কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল—তিনি কি প্রচণ্ডভাবে জাগ্রত—নচেৎ তাঁর নামে এই নতুন তীর্থ আবির্ভূত হল কি করে—যা সরকারের রাজনৈতিক ভক্তির দাক্ষিণ্যে নয়, রচিত হয়েছে জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছার শক্তিতে।

পাঠকদের আরও একটি বিষয়ে অবহিত করাতে চাই। এই প্রস্তাবনায় তাঁরা দেখেছেন—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে আমি কি বিপুল পরিমাণ সাহায্য নিয়েছি। কিন্তু ঐ সাহায্য তাঁরা নিঃশর্তে দিয়েছেন। গ্রন্থে প্রকাশিত মতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই। সমস্ত মত আমার, তার দায়িত্বও আমার। এমনকি আমার ধারণা, আমার অনেক মত তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তথাপি তাঁরা যে অকুণ্ঠ সাহায্য করে গেছেন, সেই উদারতাকে আমি বন্দনাযোগ্য মনে করি।

এই গ্রন্থে দেখা যাবে—স্বামীজীর জীবন মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না—অবিরাম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তৎকালীন ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায় ও স্বার্থগোষ্ঠী তাঁর বিরোধিতা করেছে। অনেকের বিরোধিতা তাঁর মতাদর্শের বিরুদ্ধে এবং সেটা স্বাভাবিক, কারণ নূতন আবির্ভাব পুরাতনকে বিচলিত করেই, তার প্রতিক্রিয়াও ঘটে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে দেখা গেছে—মতের বিরোধিতায় সন্তুষ্ট না থেকে কোনো-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে নেমে পড়েছিলেন। পটভূমিকাসুদ্ধ সে সমস্ত সংবাদ আমি তুলে ধরেছি। এমন করার হেতু—ওঁদের কীর্তির উন্মোচন নয়--বিবেকানন্দের উন্মোচন—কোন্ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এই মহানায়ক অগ্রসর হয়েছিলেন, তা দেখিয়ে দেওয়া। তাঁর অযথা কুৎসায় ব্যথিত এক শিষ্য স্বামীজীর কাছে আক্ষেপ করলে স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন—পারসিকিউশন্ ছাড়া কোনো ভাব ছড়ায় না। স্বীকার করতে হবে, ঐ পারসিকিউশনের প্রধান অংশ তিনি একাকী ভোগ করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, ঐসব আক্রমণ উৎপীড়নের ইতিহাস না জানলে বিবেকানন্দের পূর্ণ মহিমা বোঝা যাবে না। সেইজন্যই তাঁর শত্রুদের চেহারা খুলে ধরেছি। এতে যদি কারও সম্মান ক্ষুণ্ন হয় আমি নাচার, কারণ আমার কাছে বিবেকানন্দ এবং ভারতবর্ষের মর্যাদার সর্বোচ্চ স্থান।

জন্মাষ্টমী ১২ ভাদ্র, ১৩৮২
২৯ অগস্ট, ১৯৭৫

শংকরীপ্রসাদ বসু

প্রথম অধ্যায়

কাহিনীর সূচনা

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ অগস্টের অপরাহ্ণকাল। কলকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরের বাগানবাটীতে লোকান্তরিত একটি মানুষের (অনেকের কাছে তখনই তিনি দেবমানব বা ততোধিক) দেহ শায়িত। সেই দিনটির শোকপবিত্র রূপের বর্ণনা করেছেন এক বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ঃ

"কলকাতায় এসেছিলাম স্বল্পকালের জন্য। এক অপরাহ্ণে শুনলাম, পরমহংস রামকৃষ্ণ মহাসমাধি লাভ করেছেন। তৎক্ষণাৎ গাড়ি করে কাশীপুর বাগানবাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। কলকাতার উত্তরাংশে কাশীপুরের বাগানবাটীতেই পরমহংসদেব তাঁর মর্ত্যজীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলাম, বাড়ির গাড়িবারান্দার সামনে ধবধবে সাদা এক শয্যায় তিনি শায়িত, এবং বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ অশ্রুরুদ্ধ চোখে খাটটিকে ঘিরে মাটিতে বসে আছেন। পরমহংসদেব ডান পাশ ফিরে শুয়ে, তাঁর সারা দেহে নির্বাণের অনন্ত নীরবতা ও শান্তি। শান্তি চারিদিকে, শান্তি মৌন বৃক্ষে, বিদায়ী অপরাহ্ণে, উপরের নীল আকাশে এবং তার উপরে নীরবে সঞ্চরমান খণ্ড মেঘে। মহামরণের সামনে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হয়ে যখন আমরা বসে রয়েছি, ঠিক তখনি কয়েকটি বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ল। ঠিক যেন পুষ্পবৃষ্টি, আর্যসাহিত্যে যে-কথা আমরা পড়েছি, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করেন যখন তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত কেউ পৃথিবী ত্যাগ করে অমরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন—এই বারিবিন্দু সেই বিগলিত পুষ্পপর্ণ। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জীবিতকালে দর্শন করা জীবনের পরম সৌভাগ্য; একই সৌভাগ্য মৃত্যুর অঙ্কে তাঁর শান্ত মুখচ্ছবির দর্শনলাভ।" ১ [অ]

শ্রীরামকৃষ্ণের গতপ্রাণ দেহকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে-থাকা ভক্তবৃন্দের যে-ফটোটি পাওয়া যায় তাতে দেখা যাবে, ছবির ঠিক মাঝখানে যে-দুজন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের একজন যুবক, অপরজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, দু'জনেরই মুখের আদল একপ্রকার, মহাশোক তাঁদের শ্রীরাম-কৃষ্ণের দেহপার্শ্বে একত্র করেছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় তাঁরা দুই ভিন্ন জগতের মানুষ —একজনের নাম রামচন্দ্র দত্ত, অন্যজন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই দুইজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনে এঁদের বিশেষ দান আছে, কিন্তু দু'জনের মধ্যে মতের ঐক্য ছিল না।

ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত গৃহী মানুষ, প্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচারে উৎসাহী, শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি বৈষ্ণবভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বা ততোধিক মনে করতেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব অপেক্ষা সর্বমানবের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত তাঁর অপূর্ব ধর্মবাণী প্রচারেই তিনি আগ্রহী, এবং ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের পথ অনুসরণ করা যাবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস। তদুপরি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 'বেদান্ত'কে লোকজীবনে কার্যকর করার জন্য সন্ন্যাসের সঙ্গে সেবাকে যুক্ত করেছিলেন।

---

১ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিকথা। 'রেমিনিসেনসেস্ অব বিবেকানন্দ' গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থ অতঃপর সংক্ষেপে 'রেমিনিসেনসেস্' বলে উল্লিখিত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শেষশয্যায় কাশীপুরে দিনযাপন করছেন তখন একদিন একান্তে নরেন্দ্রনাথকে ডেকেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কী বিনিময় হয়েছিল সে রহস্য, নরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন, তাঁর মধ্যেই চিরদিন সমাহিত থেকে যাবে।

কিন্তু ঐ অনালোকিত রহস্যের বহির্মণ্ডলে ছিল একটি প্রকাশ্য ঘোষণাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ লিখে দিয়েছিলেন—"নরেন শিক্ষে দেবে।" আর বলেছিলেন—"এদের দেখিস্।"

'এদের' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সমাগত তরুণদের দেখার দায়িত্ব সুতরাং নরেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁচিশের বেশি নয়।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের অর্থসাহায্যে বরাহনগরে মঠবাড়ি স্থাপিত হল। বরাহনগরের সেই মঠ শুধু রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ইতিহাসে নয়, ভারতবর্ষের ধর্মেতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্তের বর্ণনায় সেই মঠবাড়ির চেহারা ছিল নিম্নপ্রকার ঃ

"আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে, ১৮৮৬ সালে, বরাহনগর মঠে সকলে আসিয়া একত্র হইলেন। মঠের বাড়িটা অতি প্রাচীন, ভগ্ন, নীচেকার ঘরগুলি মাটিতে ডুবিয়া বসিয়া গিয়াছে; শৃগাল ও সর্পের আবাসস্থান। উপরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলি খানিকটা আছে, অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতলের দালানের মেঝের খোয়া দুই হাত আছে তো দুই হাত উঠিয়া গিয়াছে। দরজা জানালার তক্তাগুলির খানিকটা আছে খানিকটা নাই। ছাতের বরগা পড়িয়া গিয়াছে, বাঁশ চিরিয়া ইঁটগুলি [ধরিয়া] রাখা হইয়াছে। চতুর্দিকে জঙ্গল। 'ভূতের বাড়ি' তো সত্যই ভূতের বাড়ি। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উত্তরদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ হাতে যাইতে প্রথমে একটি নাতিবৃহৎ ঘর—যেটিকে কালী-বেদান্তীর বা কালী-তপস্বীর ঘর বলা হইত। তাহার পর দুই ধাপ উঠিয়া একটি ছোট দরজা এবং ভিতরে যাইবার পথ। আর একটু ঢুকিলে বাঁদিকে ঠাকুরঘর এবং সম্মুখে একটি লম্বা দালান ও দালানের পশ্চিমে একটি বড় ঘর। বড় ঘরের ভিতর দিয়া যাইলে উত্তর-পশ্চিম দিকে ছোট একটি ঘর, সেখানে জল থাকিত ও সকলে বসিয়া যাইত। তাহার পর উত্তর-পশ্চিম দিকে পায়খানা। আর ভোজনগৃহের পূর্বদিকে একটি ঘরে রান্না হইত। এই হইল বরাহনগরের মঠ। কাশীপুরের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে-শয্যা, বালিশ ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ছিল, তাহা [এখানে] সংরক্ষিত ছিল। মেঝের উপর শয্যা স্থাপন করা হইয়াছিল, পালংক তখন একটাও ছিল না। দানাদের ঘরে (কালী-তপস্বীর ঘর ব্যতীত অপর যে-একটি বড় ঘর, তাহার নাম 'দানাদের ঘর') বালন্দা পট্‌পটির খান দুই-তিন মাদুর সংযুক্ত করিয়া মেঝেতে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।...মাথার বালিশ হইল বালন্দার চ্যাটাইয়ের নীচে নরম নরম ইঁট। শীত করিলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া শয়ন, বা তাহাতে শীত না ভাঙিলে রাত্রিতে উঠিয়া একবার কুস্তী করিয়া লওয়া।"

বরাহনগর-মঠের চেহারার অনুরূপ ছিল মঠবাসীদের আহারাদির ব্যবস্থা ঃ

"আহারের [বিশেষ] কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এবং কাহারও প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়া সকলেই মুষ্টিভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষার যে-চাউল আসিত তাহা সিদ্ধ করা হইত। তৎপরে এক বস্ত্রখণ্ডের উপর তৎসমুদয় ঢালিয়া তাহার চতুর্দিকে সকলে মিলিয়া বসিতেন এবং লবণ ও লঙ্কার ঝোল করিয়া তাহাই দিয়া ভোজন সমাপ্ত করিতেন। একটি বাটিতে নুন-লঙ্কার ঝোল থাকিত। সকলেই এক গ্রাস করিয়া ভাত একবার মুখে লইতেন ও একবার ঝোল হাতে করিয়া মুখে দিতেন।... জলপানের জন্য একটিমাত্র ঘটি ছিল।"

ঐ পরিবেশে এবং ঐ আহারে আশ্রিত দেহগুলির মধ্যে বৈরাগ্য ও সাধনার আগুন জ্বলছিল সহস্রশিখায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের ঐ অসাধারণ যৌথ সাধনার বিস্তৃত ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজন নেই—শ্রীরামকৃষ্ণের অতি সংকট পীড়ার সময়েও যে-শিষ্যগণ সারারাত

উদ্দাম কীর্তনে মত্ত থেকেছেন, এবং মুমূর্ষু শ্রীরামকৃষ্ণ দূর থেকে সেই কীর্তন শুনে কোথায় সুরের ভুল হয়েছে যাঁদের বলে পাঠিয়েছেন—তেমন শিষ্যগণ গুরু-প্রদর্শিত সাধন-জীবনকে বরণ ক'রে সুকঠোর তপস্যা করবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই—এখানে আমরা বিশেষভাবে নরেন্দ্রনাথের মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কয়েকটি দৃষ্টান্ত চয়ন করতে চাইছি। মহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত বিবরণের আরও কিছু অংশ ঃ

"এই সময়টা [১৮৮৭-র মাঝামাঝি] নরেন্দ্রনাথের মানসিক ও শারীরিক কষ্ট দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। গুরুভাইদের লইয়া, উচ্চ উদ্দেশ্য করিয়া এক মঠ স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে মহাকষ্ট, অনাহার, অনিদ্রা, সকলেই বিবস্ত্র, বিকট, মলিন, পাংশুগুণ্ঠিত এবং রাত্রে শয়ন ধরণীতলে। বাড়িতে স্বজনেরা অন্নাভাবে কাতর ও নিরাশ্রয়। জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা, অনেক অর্থের প্রয়োজন। আহার—এর-ওর বাড়িতে ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ। চারিদিকে লোকে বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেছে ঃ 'নরেন পাগলা হয়ে গেছে। কি বলে, কি কয়, কথার মাথামুণ্ডু নেই। শঙ্কর, উপনিষদ, পঞ্চদশী—ওসব আবার কী জিনিস! ঠাকুর-দেবতার কথা নয়, যতসব বাজে কথা।' ওরূপ বলিবার কারণ, ও-সময় বেদান্ত-গ্রন্থাদি পাঠ বিরল ছিল। নরেন্দ্রনাথের পূর্বপরিচিত এক বন্ধু একদিন বলিল, 'তাইত হে, নরেন্দ্র পাগলা হয়ে বেরিয়ে গেল! এমন গানটা মাটি করে গেল! এত বছর গানটা শিখে, গলা সেধে, সব মাঠে মারা গেল!' এইরূপ চারিদিকে বিকট কটুবাক্য নরেন্দ্রনাথের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সমস্ত দিনরাত জপ-ধ্যান, শরীরের প্রতি লক্ষ্য নাই, গায়ে ধূলোকাদা মাখা, বড় বড় নখ, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া উড়িখুড়ি চুল, তাতে ধূলোকাদা ভর্তি, হুঁস নাই, লক্ষ্য নাই, দেহ কৃশ, চোখের কোল বসিয়া গিয়াছে। মনটা শরীর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে, অনেক কষ্টে দেহের ভিতর তাহাকে টানিয়া আনিতে হইতেছে।

"একদিন, ভাদ্রমাস, ১৮৮৭ সাল, বেলা চারটার সময় বর্তমান লেখক বরাহনগরে নরেন্দ্রনাথের কাছে যান। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে যে-লম্বা দালানটা—নরেন্দ্রনাথ তথায় পায়চারি করিতেছেন—চক্ষু স্থির, ঊর্ধ্বদৃষ্টি, কোনো হুঁস নাই, অভ্যাস হিসাবে পা চলিতেছে।...মুখ ভয়ংকর তেজঃপূর্ণ, শান্ত, দুষ্প্রেক্ষ্য। আমি নরেন্দ্রনাথকে সামনে দেখিয়া অনেকবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম। তাঁহার কোনো সংজ্ঞা নাই।...আমার কিছু ভয় হইল। ভিতরের দালানে গিয়া দেখিলাম, রাখাল-মহারাজ, শরৎ-মহারাজ, আরো কয়েকজন দাঁড়াইয়া আছেন—মাঝের দোরটি ভেজাইয়া দিয়াছেন। সকলেই মহা উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত। আমি রাখাল-মহারাজকে বলিলাম, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এক বিশেষ কাজ আছে। রাখাল-মহারাজ ত্রস্ত ও কাতর হইয়া বলিলেন, তা তুমি গিয়েই বলগে যাও না, আমরা কেউ এগুতে পারছি না ; আজ নরেন কেমন হয়ে গেছে ; নরেনের এমন ভাব পূর্বে কখনো দেখি নাই; তুমি চেঁচামেচি করে কোনো রকমে নরেনের মনটাকে নামিয়ে দাওনা ভাই!...

"সেইদিন বেলা আড়াইটা হইতে নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ ভাব হইয়াছিল। কয়েকদিন ধরিয়া অনবরত জপধ্যান চলিতেছিল, এবং সবিকল্প সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি প্রভৃতি বিষয় লইয়া নানাপ্রকার কথাবার্তা হইতেছিল। সেই সকল চিন্তা করিতে করিতে নরেন্দ্র-নাথের মন উচ্চস্থানে উঠিয়া যায়।...

"এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইতে চলিল, আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। রাখাল-মহারাজ প্রভৃতি সকলেই বলিতে লাগিলেন, 'ভাই, তুমি এগিয়ে গিয়ে খুব চেঁচামেচি করগে যাও, আমরা তোমার পেছন-পেছন থাকব, তুমি ভাই এই উপকারটি করো।' ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ঐরূপ উচ্চ অবস্থায় উঠিলে নরেন্দ্রনাথের দেহ থাকিবে না; সেজন্য সকলে অত ভীত ও উদ্বিগ্ন। আমি নরেন্দ্রনাথের কাছে দাঁড়াইয়া খুব চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু তাঁহার সংজ্ঞার লক্ষণ নাই. পা যেমন চংক্রমণ করিতেছিল, সেইরূপ করিতে লাগিল। আমি

আওয়াজ উচ্চ করিলাম, গাল-মন্দ শুরু করিলাম—নরেন্দ্রনাথ পূর্ববৎ। অবশেষে সাত-আট মিনিট চিৎকার করিবার ও গাল দিবার পর নরেন্দ্রনাথের মন যেন পুনরায় অল্পে-অল্পে শরীরের ভিতর আসিতে লাগিল। তখন তাঁহার চক্ষু যেন এই জগৎটাকে নূতন করিয়া দেখিতে লাগিল—কোথায় অসীম অনন্ত ব্রহ্ম, আর কোথায় খণ্ড আলো অন্ধকার, বাড়ি, মাটি! নরেন্দ্রনাথ যেন জগৎটাকে প্রথম দেখিতেছেন, যেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। পরক্ষণে মন আবার উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে। দুই তিন মিনিট এইরকম থাকিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন—'কি অঃ, কি অঃ'—আর চারিদিকে অনিমেষদৃষ্টিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন।...ক্রমে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।"

যাঁর স্মৃতিকথা আমি বারবার ব্যবহার করছি, তাঁর বিষয়ে কিছু বলা দরকার। মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা, বয়সে ৬ বৎসরের ছোট, স্বামীজীর জীবনের এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের বহুলাংশের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, এবং বংশগত প্রখর স্মৃতির অধিকারী। সুতরাং স্বামীজী ও রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিকথা সবিশেষ মূল্যবান।

মহেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্ধৃত রচনাংশে বা তাঁর স্মৃতিকথার অন্যত্র নরেন্দ্রনাথের একালীন আধ্যাত্মিক সাধনা ও ভাবাবেশের অনেক বর্ণনা রয়েছে। মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও সমকালের সমাজ ও ধর্মজীবনের বহু মূল্যবান তথ্য আছে। বর্তমান গবেষণাকালে আমরা তার ভিতর থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়েছি। স্মৃতিকথা বলে সময়ের হিসাবে হয়ত কোথাও কোথাও গরমিল রয়েছে, দৃষ্টবস্তুর যেসব ব্যাখ্যা করেছেন তাতেও ভ্রান্তি থাকতে পারে, কিন্তু সে সকল অল্পই, তার তুলনায় প্রদত্ত তথ্যগুলির গুরুত্ব এত বেশি যে, মহেন্দ্রনাথের কাছে কৃতজ্ঞতাবোধ করতেই হয়। বর্তমান গবেষণা শুরু করার আগে মহেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত বহু ঐতিহাসিক তথ্যকে বিচিত্র বলে আমাদের মনে হয়েছিল, কিন্তু গবেষণাকালে সংবাদপত্রাদিতে ঐসকল ঘটনাবলীর রূপ দেখে চমৎকৃত হয়েছি এবং তার দ্বারা মহেন্দ্রনাথের প্রখর স্মৃতিশক্তির প্রমাণও পেয়েছি। আমাদের এই রচনায় বহুস্থানে মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথার সাহায্য আমরা গ্রহণ করব।

নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর-মঠের স্বাভাবিক নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, সেখানে মোটামুটি দুই বৎসর কাটালেনও, (দু'একবার অল্প সময়ের জন্য বাইরে ঘুরে এসেছেন), কিন্তু সেখানেই আবদ্ধ থাকতে পারলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে যে জীবনযন্ত্রণা দিয়েছিলেন, তা একদিকে ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসিদ্ধির জন্য তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল, অন্যদিকে অধীর ও আর্ত করে তুলল সমষ্টিমুক্তির চিন্তায়। সমষ্টিমুক্তি নিশ্চয় ঐহিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়েই, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ ঐহিক বিষয়ে। ভারতবর্ষের বহু সহস্র বর্ষের সাধনলব্ধ যে-বেদান্তসত্যকে নিজ জীবনে আকর্ষণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাকে সংসারের উপর বর্ষণ করবার যোদ্ধৃত্ব দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথকে। সুতরাং নরেন্দ্রনাথকে বরাহনগর ত্যাগ করে ভারতের পথে-প্রান্তরে বিচরণ করতে হবে, তারও পরে যেতে হবে সমুদ্রপারে—সেই তাঁর ভবিতব্য।

বিবেকানন্দের পরিব্রাজক-জীবনের বিস্তারিত কথা বলবার প্রয়োজন এখানে নেই। তাঁর প্রামাণ্য জীবনীগুলিতে (যার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ') সে সব কাহিনী মিলবে। এখানে শুধু একথা বললেই চলবে, ভারতের বুকে পরিব্রজ্যাকালে এই সন্ন্যাসী দুই শ্রেণীর 'পওহারী-বাবা'কে দেখেছিলেন। স্বামীজীর জীবনী-পাঠকদের জানা আছে, তিনি গাজিপুরের বিখ্যাত যোগী পওহারী-বাবার কাছে হাজির হয়েছিলেন ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ; পওহারী-বাবার অসাধারণ বৈরাগ্য ও সাধনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল; তাঁর মধ্যে তিনি আদর্শ যোগীকে দেখেছিলেন। পওহারী-

বাবা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতীক। তিনি কী খেতেন প্রায় কেউ জানত না। লোকে তাই তাঁর নাম দিয়েছিল পওহারী অর্থাৎ পবন-আহারী। জীবনের পক্ষে দেহটা কত সামান্য, পওহারী-বাবা তাঁর জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তিনি নিজ দেহান্তও ঘটান অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জন করে।

নরেন্দ্রনাথের জীবনের দুর্ভাগ্য এই—আধ্যাত্মিক কারণে পওহারীর দর্শনেই তিনি পরিতৃপ্ত থাকতে পারেন নি, অনাধ্যাত্মিক কারণে যে-কোটি কোটি মানুষ বাধ্য হয়ে পওহারী হয়ে আছে তাদেরও মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়েছিল। ঐ সকল ভারতীয় মনুষ্য যুগে-যুগে শোষিত। সে-শোষণ চরমে পোঁছয় ইংরাজ-আমলে। তখন দুর্ভিক্ষে মরেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ ; বিধাতার পরম দান পবন আহার করেই তাদের পৃথিবীর মায়া কাটাতে হয়েছে—ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়ে বিবেকানন্দ এদের দেখেছিলেন ; দেখেছিলেন (তাঁর নিজের ভাষায়), 'একটি সহিষ্ণু জাতির উপর কঠিনতম নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন' ; বছরের পর বছর সেই দৃশ্য দেখে বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয় জ্বলেছিল কী যন্ত্রণায় তার পরিমাণ নির্ণয় করবে কে? সমস্ত যন্ত্রণা নিয়ে একদিন তিনি ভারতসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—সেই সমুদ্রগর্ভ থেকে অশান্ত দুঃখ যে-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেছিল তার মূল এবং স্থূল কথা—'রুটি চাই।'

কিন্তু রুটি মিলবে কিভাবে, কোথায়? ভারতের ভূখণ্ডের দিকে মুখ ফিরিয়ে কন্যা-কুমারিকার শিলার উপরে বিবেকানন্দ ধ্যানে বসেছিলেন—এবার উঠে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরালেন সমুদ্রের দিকে—সমুদ্রের ওপারে হয়ত সেই রুটি মিলতেও পারে। বিবেকানন্দ স্থির করলেন তিনি বিদেশে যাবেনই—রুটির সন্ধানে। সে রুটি কি ভিক্ষা করে আনা সম্ভব? না, স্বামী বিবেকানন্দ কোনো অবস্থাতেই ভিক্ষুক নন। তিনি দেখেছেন, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি ভিন্ন রুটি জোটার উপায় নেই। লোককে যন্ত্রবিজ্ঞান শেখাতে হবে, যাতে করে সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গ্রাসাচ্ছাদান করতে পারে। পাশ্চাত্ত্যদেশে যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, তাই সেখানে না গেলেই নয়।

পাশ্চাত্ত্য যাত্রার জন্য স্বামীজীর ব্যাকুলতা এইকালে এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, তিনি পায়ে হেঁটে আফগানিস্থানের পথে পর্যন্ত ইউরোপে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। এই মূল্যবান সংবাদটি আমরা শ্রীযুক্ত বেণীশংকর শর্মার আবিষ্কার থেকে পেয়েছি। সে কথা পরে। বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করি স্বামীজীর নিজের উক্তি উদ্ধৃত করে। আমেরিকায় পোঁছে, ধর্মমহাসভায় দাঁড়াবার আগে, যখন আশার কোনো আলো তিনি দেখছেন না, স্বয়ং একেবারে চূর্ণ হওয়ার অবস্থায়, তখনকার এক অসাধারণ রচনায় তিনি নিজেকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। ২০ অগস্ট, ১৮৯৩, আলাসিঙ্গা পেরুমলকে স্বামীজী লেখেন ঃ

"নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও ভগবান গীতায় বলিতেছেন, 'কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।' কোমর বাঁধো বৎস, প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন। সারা জীবন আমার নানা দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়াছে। প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে আমি একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। লোকে আমাকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর বদমাশ বলিয়াছে। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি তাহাদেরই জন্য যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে।...

"গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোনো ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই, তাহারা মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখো। কোনো চালাকির প্রয়োজন নাই। চালাকির দ্বারা কিছুই হয় না। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব করো, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত অনেক

ধনী ও বড়লোকের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে-করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি।...ভগবান অনন্ত শক্তিমান, আমি জানি তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি, কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, তোমাদের নিকট আমি গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য আমার এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষ-গণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া-ছিলেন—যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলিপ্রদান করো, বলি—জীবনবলি—তাহাদের জন্য যাহাদের জন্য তিনি যুগে-যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন—সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করো, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

"এ একদিনের কাজ নয়। পথ ভীষণ কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শত যুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।...

"এ ব্রত গুরুতর; আমরা ক্ষুদ্রশক্তি কিন্তু আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত-শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত-শত লোক উহাতে ব্রতী হইতে প্রস্তুত থাকিবে। আমি এখানে অকৃতকার্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন সেই ভার গ্রহণ করিবে।...বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি; অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু! জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত! জয় প্রভু! অগ্রসর হও। প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপে অগ্রগামী হইব। একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্ত্যগমনের পরিকল্পনা, আয়োজন ও সহায়কগণ

॥ ১ ॥

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিক থেকেই পাশ্চাত্ত্যগমনের জন্য স্বামীজী কি রকম আগ্রহে অধীর, তা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি। এখন প্রশ্ন, পাশ্চাত্ত্যে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর মনে কখন থেকে জেগেছিল। বলাবাহুল্য এ-বিষয়ে ঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি আই-সি-এস পড়বার জন্য ইংলণ্ডে যেতে চেয়েছিলেন, এমন তথ্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় পেয়েছি। স্বামীজীর কালে পরাধীন ভারতের কিশোর যুবকেরা বিলাতের স্বপ্ন দেখতই, নরেন্দ্রনাথও দেখে থাকতে পারেন, শুধু আই-সি-এস বা ব্যারিস্টার হয়ে আসবার জন্যই নয়, যে-ব্রাহ্ম পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি তখন ঘোরাফেরা করতেন সেখানে, এবং শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও, প্রবল ছিল ইংলণ্ডের সভ্যতার জয়গান। নরেন্দ্রনাথের জীবনের সে-পর্যায় কেটে যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে। তারপরে, পরিব্রাজক-জীবনে যখন তিনি ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করছেন, আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন যথাসম্ভব, নামগোপন হয়ত করতে পারছেন কিন্তু প্রতিভাগোপন করা অসম্ভব—তখন, সেই প্রতিভার দ্যুতিতে চমকিত হয়ে অনেকেই বলেছিলেন—এ-বস্তুর সমাদর এদেশে হওয়া সম্ভব নয়, কেবল পাশ্চাত্ত্যবাসীরাই এর সত্যকার মূল্য বুঝবে। এঁরা অনেকেই সে সম্বন্ধে স্বামীজীকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে১ পাই—১৮৯০-এর প্রথম দিকে যখন তিনি পওহারী-বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গাজিপুরে আছেন তখন কয়েকজন ইউরোপীয় রাজকর্মচারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ওখানকার জেলা-জজ মিঃ পেনিংটনও ছিলেন! হিন্দুধর্ম ও তার সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন, আপনি ইংলণ্ডে যান, সেখানে আপনার এইসব ভাব প্রচার করুন।২ যে-কোনো কারণেই হোক, ব্যাপারটা স্বামীজীর মাথায় ঘুরতে থাকে।

---

১ ইংরাজি জীবনী মানে অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণ-লিখিত' জীবনী।

২ গাজিপুরের এই জেলা-জজের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের বিষয়ে কিছু তথ্য মহেন্দ্রনাথ দিয়েছেন ঃ

"জনৈক ইংরাজ তখন গাজিপুরে ডিস্ট্রিক্ট জজ ছিলেন এবং শিরীষচন্দ্র বসুর বাটীর নিকট বাগানবাড়িতে বাস করিতেন। শিরীষচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। ইংরাজটির বেশ বয়স হইয়াছিল এবং বেশ সৎলোক ছিলেন। একটি যুবক সন্ন্যাসীকে মুন্‌সেফের বাড়িতে যাতায়াত করিতে দেখিয়া ইংরাজটি শিরীষচন্দ্র বসুর নিকট সন্ন্যাসীর বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেন এবং শিরীষচন্দ্রও সন্ন্যাসীটির অদ্ভুত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য ইংরাজটিকে বুঝাইয়া দিলেন। ফলে তিনি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। একদিন শিরীষচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া ইংরাজের বাড়িতে গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তেজস্বী যুবক এবং তর্কযুক্তিতে বিশেষ পারদর্শী: ইংরাজটি বৃদ্ধ ও ধীর; দুজনায় নানা প্রসঙ্গ ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা হইল। নরেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য, অসাধারণ তর্কযুক্তি ও ত্যাগবৈরাগ্য দেখিয়া ইংরাজ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথও মাঝে-মাঝে তাঁহার বাড়ি যাইতেন এবং কখনো-বা খ্রীস্টধর্মের উপর, কখনো-বা বেদান্তশাস্ত্রের উপর, কখনো-বা ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের উপর, কখনো-বা ইতিহাসের উপর আলোচনা করিতেন। ধীরে-ধীরে ইংরাজ ও তাঁহার পত্নী নরেন্দ্রনাথের অনুরক্ত হইলেন। একদিন ইংরাজ নরেন্দ্রনাথকে

১৮৯১-এর শেষে বা ১৮৯২-এর গোড়ায় জুনাগড়ে থাকাকালে সেখানকার দেওয়ান-অফিসের ম্যানেজার সি এইচ পান্ড্যর কাছে তিনি পাশ্চাত্ত্যযাত্রার ইচ্ছার আভাস দিয়েছিলেন। তারও পরে যখন পোরবন্দরের দেওয়ান পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙের সঙ্গে কয়েক মাস কাটিয়ে বেদ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, ও পাণিনির ব্যাকরণের চর্চা করেছেন, তখন তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিত পাণ্ডুরঙ বলেছিলেন, "স্বামীজী, বড়ই দুঃখের বিষয় এদেশে থেকে আপনি বিশেষ-কিছু করে উঠতে পারবেন না। এখানে আপনার সমাদর করবার মতো লোক খুবই কম। আপনার উচিত পাশ্চাত্ত্যে যাওয়া। সেখানে আপনার কথা লোকে বুঝবে, আপনার প্রতিভার যোগ্য সমাদর হবে। নিশ্চয় বলছি, সনাতনধর্ম প্রচার করে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উপরে আপনি বিপুল আলোকবর্ষণ করতে পারবেন।"

এই অবধি, আমরা বুঝতে পারছি, প্রতিভাবান ঐ সন্ন্যাসীর পাশ্চাত্ত্য যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ-কেউ অনুভব করেছিলেন এবং সন্ন্যাসীও নিজ অন্তরে একটা অস্পষ্ট সমর্থন বোধ করেছিলেন। স্বামীজী যদি এখন সত্যই পাশ্চাত্ত্যে যাওয়ার ইচ্ছা বোধ করে থাকেন তাহলে তার সম্ভাব্য হেতু হবে : প্রথমতঃ, পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁর ভিতরে যে-প্রচণ্ড শক্তির স্ফুরণ হয়, এবং তিনি বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে নিজ প্রতিভা সম্বন্ধে প্রশস্তি শুনে যে-প্রবল আত্মবিশ্বাস বোধ করেন—সেই শক্তি 'একটা কিছু করতে হবে' এই যন্ত্রণায় তাঁকে অস্থির করে তোলে—সেই 'একটা কিছু'র মধ্যে পাশ্চাত্ত্যযাত্রা পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি অনুভব করতে পারেন—ভারতীয় ধর্মের যথার্থ রূপ বাইরে প্রচার করা দরকার। খ্রীস্টান মিশনারিদের বিকৃত ব্যাখ্যা, তাতে ভারতীয় সংস্কারকগণের সলজ্জ সমর্থন, তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। এবং এ-ব্যাপারে, আরও বড় কথা, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে যা পেয়েছিলেন, তাকে উন্মোচন করবার উৎকণ্ঠা বোধ করছিলেনই। সকল রামকৃষ্ণ-ভক্ত অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্ববাণীকে তিনিই পূর্ণাঙ্গিকভাবে অনুভব করেছিলেন ; বুঝে-ছিলেন যে, কেবল ভারতীয় ধর্মজাগরণে ব্যবহার করাই নয়, ঐ মেসেজ বৃহত্তর বিশ্বে প্রচারের প্রয়োজন আছে—সেজন্য পাশ্চাত্ত্যে যাওয়া দরকার। তাছাড়া, ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে প্রত্যক্ষ করার পরে তাঁর পক্ষে চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব ছিল। ঐ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতেই হবে, মুখে নয় কাজে। তাঁর বাস্তববোধ তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিল—নিছক কৃষির

বলিলেন, 'দেখুন স্বামী, আপনি ইংলণ্ডে যান, তথায় আরও ভাল করে পাঠচর্চা করুন। আপনার ভিতরে যে-শক্তি আছে, তার উপর যদি উচ্চ বিদ্যাশিক্ষা হয় তাহা হইলে জগতের কল্যাণের বিশেষ কার্য হইবে। তাহার জন্য যাহা খরচ লাগিবে আমি তাহা আনন্দের সঙ্গে বহন করিতে রাজি।' নরেন্দ্রনাথের তখন মহা বৈরাগ্যভাব, ঐ সকল কথায় কোনো মনোযোগ দিলেন না। নরেন্দ্রনাথের নিকট বৈরাগ্য ও ভগবানলাভের কথা শুনিয়া ইংরাজটির মন ক্রমশঃ সংসার হইতে ধর্মমার্গের দিকে চলিল। তিনি মাঝে-মাঝে বলিতে আরম্ভ করিলেন, সংসার আর ভালো লাগে না ইত্যাদি।... তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব দেখিয়া পত্নী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন।...ইংরাজ ও তাঁহার পত্নী নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তাঁহারা যীশুর বৈরাগ্য ও বাইবেল নরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে নূতন ভাবে বুঝিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ ইউরোপীয়দের কাছে নরেন্দ্রনাথের বেদান্তপ্রচার এই প্রথম।"
('ঘটনাবলী', ১ম)

স্বামীজীর অন্যান্য জীবনীতে কিন্তু পেনিংটন-সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার ব্যাপারে শ্রীশ বসুর উল্লেখ নেই। স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন, রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়, আফিম-ডিপার্টমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী রস্-সাহেবের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন—স্বামীজীর বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়ে রস্-সাহেবই পেনিংটনের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটান। মহেন্দ্রনাথ, অপর পক্ষে, গাজিপুরের রায়বাহাদুর গগনচন্দ্রের এবং ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের কথা বলেও পেনিংটনের সঙ্গে আলাপ ঘটানোর ব্যাপারে শ্রীশ (বা শিরীষ) বসুর কথাই বলেছেন, যাঁর গাজিপুরের বাড়িতে পরবর্তীকালে তিনি অতিথি হয়েছিলেন এবং স্বামীজীর নানা গল্প শুনেছিলেন।

উপর নির্ভর করলে দারিদ্র্য ঘুচবে না, যন্ত্রবিজ্ঞানের সুযোগ নিতে হবে, এবং সেজন্য অবশ্যই শিল্পোন্নত পাশ্চাত্যে যাওয়া দরকার। শেষোক্ত কারণ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল তাঁর মনে।

স্বামীজীর মনে এইসকল কথা হয়ত জেগেছিল, বিচ্ছিন্নভাবে বা একত্রে, অন্ততঃ তিনি যে আত্মবিস্তারের তাগিদ বোধ করছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক এই সময়ে একটি সংবাদ প্রচারিত হল ভারতবর্ষে, যার ফলে স্বামীজীর অস্পষ্ট ভাবনা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ক্রমে একটি স্থির প্রতিজ্ঞার রূপ নিল। সে সংবাদ ঃ চিকাগোয় কলম্বিয়া এগজিবিশন উপলক্ষে ধর্মমহাসভা হবে, সেই সভায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবা নিজ ধর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন করবেন। বিবেকানন্দ স্থির করলেন, তিনি আমেরিকা যাবেন।

চিকাগো-ধর্মমহাসভাই স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রাভিলাষের সাক্ষাৎ কারণ একথা সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই উপলক্ষে অন্যান্য পাশ্চাত্ত্যদেশ অপেক্ষা আমেরিকায় যেতে পেরে তিনি অধিকতর খুশি হয়েছিলেন। ইংলন্ডের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর তখন যে-ধারণা তাতে সেখান থেকে সাহায্য তিনি প্রত্যাশা করেননি। তিনি জানতেন, বৈশ্য ইংরাজ নিজ জাতির স্বার্থে ভারতকে শোষণ করছে, তার সেই স্বার্থই ভারতে শিল্পবিজ্ঞান প্রসারের প্রতিবন্ধক, অথচ স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য থেকে শিল্পবিজ্ঞান শিখে আসতে চান। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল, আমেরিকা এ-ব্যাপারে উৎসাহী হতে পারে। আমেরিকা যদি ভারতের শিল্পোন্নয়ন করে নাও দেয়, তবু সে অর্থসাহায্য করতে পারে ; তার অর্থপ্রাচুর্য এবং উদারতার কথা ভারতে তখনই সুপ্রচারিত। তাছাড়া আমেরিকা নবীন দেশ, সেখানে নূতন প্রাণের স্পন্দন আছে, রজোগুণের প্রচন্ড উদ্দীপনা; প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে ঐ নবীন আমেরিকার উৎসাহের সম্মিলন যদি ঘটানো যায় তাহলে শুভফল অবধারিত—এমন কথাও স্বামীজীর চিন্তায় আসতে পারে। অধিকন্তু, আমেরিকাই কোটি-কোটি টাকা খরচ করে অন্যের তুলনায় অধিকসংখ্যক মিশনারি পাঠিয়েছে ভারতে, অতএব, উল্টোপক্ষে আমেরিকায় ভারতীয় ধর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটনও প্রয়োজন।

এই সমস্ত কারণে, অথবা অপরাপর কারণে আমেরিকা যাওয়ার কথা স্বামীজী ভেবে থাকতে পারেন, এবং এও সত্য, প্রকৃত হিন্দুরূপে তাঁর আহত মর্যাদাবোধ তাঁকে আমেরিকায় আকর্ষণ করেছিলই। তিনি দেখেছিলেন, তাঁর দেশ ও ধর্মের পক্ষে দাঁড়াবার মানুষ নেই; চিকাগো-ধর্মমহাসভায় ভারত থেকে প্রতিনিধি যাচ্ছে কিন্তু তাঁরা জৈন, ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান, মুসলমান বা থিয়জফিস্ট, মূল হিন্দুসম্প্রদায়ের কেউ নন; তাঁরা না-হিন্দু, প্রায়-হিন্দু. আলোকিত-হিন্দু কিন্তু হিন্দু নন। তখনো পর্যন্ত হিন্দু-ভারতের মধ্যে যেটুকু স্বধর্মপ্রীতি ছিল, তা ভিতরে-ভিতরে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হয়ে উঠেছিল, এবং সেই অপমানবোধ তীব্রতর হয়েছিল দক্ষিণভারতে। দাক্ষিণীরাই এই তরুণ সন্ন্যাসীর মধ্যে হিন্দুধর্মের যোগ্য প্রতিনিধিকে দর্শন করতে পেরেছিল; মাদ্রাজী-তরুণদের হাত দিয়ে 'নবীন' ভারত সেদিন তার নবীন নায়ককে অর্ঘ্যদান করেছিল।

তবু আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করতে স্বামীজীর সময় লেগেছিল; মনস্থির করার পরেও যাত্রার ব্যাপারে বহু অসুবিধা ঘটেছিল; এবং যাত্রা করে, ও আমেরিকায় পৌঁছে তাঁকে বুঝতে হয়েছিল যে, 'কতকগুলি অর্বাচীন ছোকরার কথায় নেচে কতখানি অবিবেচনার পরিচয়' তিনি দিয়েছেন। অথচ কি বিচিত্র, তিনি একই সঙ্গে অনুভব করেছেন, কোনো একটি অদৃশ্য হস্ত সর্বদা তাঁকে চালিত করছে!

আমেরিকাযাত্রার বিষয়ে মনস্থির করতে দেরি হওয়ার কারণ বোধগম্য। হিন্দুসন্ন্যাসী হয়ে কালাপানির পারে যাওয়া সম্বন্ধে মানসিক বাধার কথা বাদ দিচ্ছি, স্বামীজীর মধ্যে ও-সংস্কার কদাপি ছিল না, কিন্তু অকিঞ্চন সন্ন্যাসী, অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক যিনি ত্যাগ

করেছেন (এইকালে কথাটা প্রায় আক্ষরিক সত্য, সে সম্বন্ধে অনেক সাক্ষ্য আছে), পরিব্রাজক জীবনে বাধাবন্ধহীন সাধনার মুক্ত বৈরাগ্যে যাঁর দেহমন প্রসারিত, তিনি বিদেশে সামাজিক জীবনের বদ্ধতার মধ্যে প্রবেশ করবেন কিভাবে—এ ভাবনা নিশ্চয় তাঁকে পীড়িত করেছিল। বিবেকানন্দ অ্যাডভেঞ্চারকে ভয় করতেন না, কিন্তু কিভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে তাঁর মিশন (যা আর্থিক ও আধ্যাত্মিক দুই-ই) সফল হবে, সে-বিষয়ে নিশ্চয় চিন্তিত হয়ে থাকতে পারেন, এবং—তাঁর জীবনের মিশন কি বিদেশে সত্যই সফল হবার সম্ভাবনা আছে!! শেষোক্ত প্রশ্নের সমাধান হয়েছিল। আধ্যাত্মিক মানুষ হিসাবে যে-দৈবনির্দেশের প্রয়োজন তাঁর ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সমুদ্রপারে গমনের ভিশন্ ও শ্রীমা সারদাদেবীর সমর্থন-পত্রের মধ্যে তিনি তা পেয়েছিলেন।

॥ ২ ॥

আমেরিকা যাবেন এই মনস্থির করার পরে যাত্রা-ব্যাপারে বেশ-কিছু অসুবিধা দেখা দিল। সে প্রসঙ্গে আসার আগে আমেরিকাগমনে তাঁর ক্রমবর্ধমান ইচ্ছার ইতিহাস আর একবার পর্যালোচনা করে নেওয়া যায়। গাজিপুরের জেলা-জজের কাছ থেকে পাশ্চাত্ত্য-গমনের জন্য উৎসাহ পেয়েছিলেন, সেকথা আগে বলেছি। সে ১৮৯০ সালের কোনো এক সময়ের ঘটনা। এই সময় পর্যন্ত ব্যাপারটা বিদেশযাত্রা, বিশেষভাবে আমেরিকাযাত্রা নয়। তারপর সেটা আমেরিকাযাত্রার অভিপ্রায় হয়ে দাঁড়ায়—চিকাগো-ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এই সংবাদ ভারতে প্রচারিত হওয়ার পরে। চিকাগোয় যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর মনে নিজস্ব-ভাবে জেগেছিল, বা অন্য কেউ তা জাগিয়েছিল, তাও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনী-অনুযায়ী তারিখের দিক থেকে চিকাগো যাবার ইচ্ছা তিনি প্রথম প্রকাশ করেন খাণ্ডোয়ায় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, স্বামীজী খাণ্ডোয়ায় গিয়েছিলেন ১৮৯২, অগস্টের শেষে বা সেপ্টেম্বরে। হরিদাস চট্টো-পাধ্যায়কে স্বামীজী বলেন; 'কেউ যদি আমার যাতায়াতের খরচ দেয় তো...আমি যেতে প্রস্তুত।' তাঁর ইচ্ছার বিষয়ে পরবর্তী সংবাদ পাই হরিপদ মিত্রের স্মৃতিকথা থেকে। বেলগাঁওয়ের ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্রের বাড়িতে স্বামীজী হাজির হয়েছিলেন ১৮৯২, ১৮ অক্টোবর। সেখানে কয়েকদিন ছিলেন। হরিপদ মিত্র লিখেছেন ঃ "কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী বলিলেন...'চিকাগোয় ধর্মসভা হইবে ; যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় তো তথায় যাইব।' আমি চাঁদার লিস্ট করিয়া টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভাবিয়া স্বীকার করিলেন না।"

হরিপদ মিত্রের বাড়িতে যাওয়ার এক মাস আগে ১৮৯২, ২০ সেপ্টেম্বর বোম্বাই থেকে খেতড়ির পণ্ডিত সুন্দরলালকে লেখা এক পত্রে স্বামীজী হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা সমর্থন করে-ছিলেন ঃ "পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। সমুদ্রযাত্রা বা দূরভ্রমণ করিবার লোক ছিল বটে, তবে তাহারা প্রায় সবাই ছিল বণিক। একদিকে পৌরোহিত্যের অত্যাচার, অন্যদিকে মুনাফার লালসা তাহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে রুদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের পর্যবেক্ষণের ফলে মনুষ্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বর্ধিত না হইয়া উহার অবনতিই হইয়াছিল। কারণ, তাহাদের পর্যবেক্ষণ দোষযুক্ত ছিল, এবং তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ এতই অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক হইত যে, বাস্তবের সঙ্গে তাহার মোটেই মিল থাকিত না। সুতরাং বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য

দেশে সমাজযন্ত্র কিরূপ পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয় তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংশ্রব রাখিতে হইবে।"

এই সময়ে যে, বিদেশগমনের ইচ্ছার কথা স্বামীজী নানাস্থানে প্রকাশ করছিলেন, তা দেখতে পাই ১৮৯৩, মে মাসে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা এক চিঠিতে ঃ "আপনার হয়তো মনে আছে, আগে থেকেই আমার চিকাগো যাওয়ার অভিলাষ ছিল।" স্বামীজী জুনাগড়ের দেওয়ানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে।

বেলগাঁও থেকে স্বামীজী যান বাঙ্গালোরে, সেখানে মহীশূরের মহারাজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। মহারাজকেও তিনি আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানান এবং গুণমুগ্ধ মহারাজা তৎক্ষণাৎ যাত্রার ব্যয়ভার বহনের প্রস্তাব করেন। স্বামীজী কিন্তু রামেশ্বর দর্শনের আগে সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন। তারপর স্বামীজী ১৮৯২, ডিসেম্বর মাসে ত্রিবাঙ্কুরে যান। অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের স্মৃতিকথায় পাই, মহীশূরের মহারাজা স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে চিকাগোয় যেতে অনুরোধ করেছেন, একথা স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর থেকে স্বামীজী রামেশ্বরের পথে মাদুরায় যান। সেখানে রামনাদের রাজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনিও মহীশূরের মহারাজার মতই তাঁকে চিকাগোয় যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। রামেশ্বর গমনেচ্ছু স্বামীজী সত্বর তাঁকে সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে প্রস্থান করেন। স্বামীজী রামেশ্বর দর্শন করেন, তারপরে কন্যাকুমারিকায় যান—এই কন্যাকুমারিকায় সমুদ্রশিলার উপরে যখন ধ্যানলীন বিবেকানন্দের মধ্যে দেশপ্রেমিক ও ঋষি একযোগে আবির্ভূত হলেন, তখনই তিনি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করলেন—তিনি পাশ্চাত্ত্যে যাবেন। ১৮৯২-এর একেবারে শেষ তখন।৩

১৮৯৩-এর শুরুতে মাদ্রাজে পৌঁছে স্বামীজী তাঁর প্রতিভায় অবিলম্বে মাদ্রাজের বহু শিক্ষিত যুবককে আকৃষ্ট করলেন। তাঁদের কাছে চিকাগো যাওয়ার অভিপ্রায় জানালে তাঁরা অতীব উৎসাহে ৫০০্ টাকা সংগ্রহ করে ফেললেন। টাকা দেখে কিন্তু স্বামীজী বিচলিত হলেন। মনে আবার দ্বিধা এল—তিনি আমেরিকা যাবেন—সত্যই কি বিশ্বজননীর তাই ইচ্ছা? মনস্থির করতে অসমর্থ স্বামীজীর নির্দেশে সংগৃহীত ৫০০্ টাকা দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হল।৪ স্বামীজী তারপরে হায়দারাবাদে গেলেন। সেখানে ১৮৯৩, ১১ ফেব্রুয়ারি নিজামের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও ভগিনীপতি নবাব বাহাদুর, স্যার খুরশীদ

৩ বাঙ্গালোর থেকে স্বামীজীর রামেশ্বর ও কন্যাকুমারিকা দর্শনের স্থানক্রম আমি 'প্রচলিত জীবনী' অনুযায়ী দিয়েছি। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে ঐ ক্রমকে স্বীকার করেননি। তিনি যথেষ্ট যুক্তির সাহায্যে দেখাতে চেয়েছেন, স্বামীজী ত্রিবেন্দ্রাম থেকেই কন্যাকুমারিকা যান, সেখান থেকে রামনাদ, পরে রামেশ্বর, তারপরে পণ্ডিচেরী হয়ে মাদ্রাজ ও হায়দারাবাদ। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর পক্ষে যেসব যুক্তি দিয়েছেন তার সারবত্তা স্বীকার্য, যদিও অধিকতর সন্ধান না করে শেষ সিদ্ধান্ত করতে চাইছি না। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জন্য ঐ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন নেই।

৪ স্বামীজীর এই ৫০০্ টাকা বিলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি কিছু বিচিত্র। বেশ কয়েক মাস ধরে যিনি আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছার কথা নানাজনকে বলছেন, প্রকারান্তরে অর্থসাহায্য চাইছেন, তিনি সেই অর্থ কিছু পরিমাণে সংগৃহীত হলে বিলিয়ে দিতে বলবেন? স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে ব্যাপারটার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ঃ

"But the Swami, when he saw the money, grew nervous. He said to himself, 'Am I following my own will? Am I being carried away by enthusiasm? Or is there a deep meaning in all that I have thought and planned? He prayed, 'O Mother, show me Thy will! It is Thou who art the Doer. Let me be only Thy instrument,'..And he said to the astonished disciples, 'My boys, I am

জা, কে-সি-এস-আই-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ আলোচনা হল। স্বামীজীর কথায় ও ব্যক্তিত্বে স্যার খুরশীদ স্বতঃই মুগ্ধ হন, এবং চিকাগোয় যাত্রার অভিলাষের কথা শুনে এক হাজার টাকা দানের প্রস্তাব করেন। স্বামীজী সে-টাকা তখন নেন নি, বলেন, প্রয়োজন হলে চেয়ে নেবেন। হায়দারাবাদের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চ রাজকর্মচারী ও অভিজাত ব্যক্তিগণও তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং সেখানকার মেহবুব কলেজে ১৩ ফেব্রুয়ারী সহস্রাধিক লোকের সামনে "আমার পাশ্চাত্ত্যগমনের উদ্দেশ্য" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্বামীজীর এই প্রথম বড় সভায় বক্তৃতা। তারপর তিনি মাদ্রাজে ফেরেন। সেখানকার ভক্ত ও শিষ্যগণ মার্চ ও এপ্রিল মাস ধরে চিকাগো-যাত্রার টাকা সংগ্রহ করতে থাকেন। ঐ উদ্দেশ্যে তাঁরা মহীশূর, হায়দারাবাদ ও রামনাদে যান। এই দলের নেতা ছিলেন তরুণ শিক্ষক আলাসিঙ্গা পেরুমল, "যিনি আক্ষরিকভাবে দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করেছিলেন।" স্বামীজী মনে করতেন, তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি, সুতরাং তাঁর যাত্রার টাকা যেন প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে (যেহেতু 'জনসাধারণ' কিছুই দেবার অবস্থায় ছিল না) সংগ্রহ করা হয়। আলাসিঙ্গার নেতৃত্বে কিছু টাকা সংগৃহীত হয়।

আমেরিকা যাওয়ার ব্যবস্থাদি যখন হয়ে গিয়েছে তখন হঠাৎ খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্‌শি জগমোহনলাল এসে উপস্থিত হন মাদ্রাজে। খেতড়ির মহারাজ বহু-আকাঙ্ক্ষিত পুত্রলাভ করেছেন, তার জন্য রাজ্যে উৎসব চলেছে, স্বামীজীর উপস্থিতি

determined to force the Mother's will. She must prove that it is Her intention that I should go, for it is a step in the dark. If it be Her will, then money will come again of itself. Therefore, take this money and distribute it amongst the poor." His disciples obeyed him without a word, and the Swami felt as though a great burden had been taken off his shoulders."

৫০০৲ টাকা বিলিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে ইংরাজি জীবনীর এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পূর্ণ স্বীকার করেননি। আধ্যাত্মিক দিকটি বজায় রেখেও তিনি সম্পূর্ণ লৌকিক একটি ব্যাখ্যা যোগ করেছেন—সংগৃহীত অর্থ পরিমাণে সামান্য হওয়ার জন্যই স্বামীজী হতাশ হয়ে টাকা বিলিয়ে দিতে বলেন এবং জগজ্জননীর ইচ্ছার উপরে নির্ভর করেন। তিনি লিখেছেন—"এদিকে উৎসাহী ভক্তবৃন্দ প্রায় পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। কিন্তু স্বামীজী সে অর্থ দেখিয়া যেন হঠাৎ দ্বিধায় পড়িলেন—এ অর্থ তো বিদেশযাত্রার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর; তাঁহার বিদেশ-গমন যদি বিধাতার অভিপ্রেতই হয়, তবে আয়োজন এমন তুচ্ছ কেন, ভক্তদের প্রযত্ন এরূপ অসাফল্যগ্রস্ত কেন?" স্বামী গম্ভীরানন্দের ব্যাখ্যা যুক্তিসংগত সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর এই ব্যাখ্যাও সকল প্রশ্নের সমাধান করছে না। প্রথম কথা, ৫০০৲ টাকা কি সত্যই সামান্য? শেষ পর্যন্ত আলাসিঙ্গারা যেখানে সর্বমোট প্রায় চার হাজার টাকা জোগাড় করতে পেরেছিলেন, সেখানে প্রথম পর্যায়ে সংগৃহীত ৫০০৲ টাকাকে কম বলি কি করে? তাছাড়া আরও কয়েকটি কথা মনে ওঠে। স্বামীজীর জীবনী থেকে পাই, তিনি প্রধানতঃ মধ্যবিত্তদের চাঁদার উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন, আর মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে চাঁদা অল্পে-অল্পেই ওঠে। সর্বদিক বিবেচনা করে আমরা কিন্তু ইংরাজি জীবনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকেই স্বীকার করি, যখন তাছাড়া ব্যাপারটার সর্বথাগ্রাহ্য কোনো মীমাংসা হচ্ছে না। স্বামীজীর চরিত্রের প্রেরণাময় খামখেয়ালির কথাও এখানে মনে রাখছি। টাকা কিছুটা সংগৃহীত হবার পরে তাঁর মনে দ্বিধা আসে, সত্যই কি তাঁর যাওয়া উচিত? তিনি তখন আধ্যাত্মিক মানুষ হিসাবে সব-কিছু সরিয়ে দিয়ে (অর্থাৎ ৫০০৲ টাকার সংগ্রহ নষ্ট করে) দৈবনির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। আরও একটি জিনিসের মীমাংসা এখানে করে নিচ্ছি, স্বামীজী যেখানে বারংবার দক্ষিণী রাজাদের সাহায্য চেয়েছেন যাত্রার খরচের জন্য, সেখানে মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের নির্দেশ কিছুটা সঙ্গতিহীন মনে হয়। আমাদের ধারণা, স্বামীজী রাজন্যবর্গ ও অভিজাতদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে সহজে বিশ্বাস করে পরবর্তীকালে হতাশ হওয়ার পরে মনে করেছিলেন, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য যখন তিনি যাচ্ছেন, তখন দৈব-নির্দেশ হয়ত এই যে, তাঁর যাত্রার ব্যয়ভার বহুলাংশে সাধারণ মানুষ বহন করবে।

সেখানে একান্ত প্রার্থনীয়। স্বামীজী জগমোহনের অনুরোধ শুনে বলেন (ইংরাজি জীবনীতে পাই), "জগমোহনজী, ৩১ মে আমেরিকা যাবার ব্যবস্থাদি করছি। মাত্র একমাস বাকি আছে। এখন কিভাবে আমি যাব বলুন?" নাছোড় জগমোহনের তাগিদে কিন্তু স্বামীজীকে খেতড়িতে যেতে হয়। যাবার পথে তিনি বোম্বাই ঘুরে যান। তারপর খেতড়ির উৎসবশেষে স্বামীজী আমেরিকাযাত্রার জন্য বোম্বাইয়ে আসেন, তাঁর সঙ্গে জগমোহনও এসেছিলেন। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে পাই, খেতড়ির মহারাজ স্বামীজীর যাত্রার সর্বপ্রকার খরচ দিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

"He [Jagmohan Lal] had been instructed to pay the expenses of the Swami's journey and to provide him with everything necessary for his voyage to America."

"The Maharaja of Khetri had instructed Jagmohan Lal to make every possible arrangement for the Swami's comfort. The Swami was therefore outfitted properly, presented with a handsome purse, and a first class ticket on the Peninsular and Orient Company's steamer, 'Peninsular.' "

॥ ৩ ॥

স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীর উপরে নির্ভর করে তাঁর যাত্রাপরিকল্পনা ও তার পরিণতির কথা উপরে লিখেছি। তাঁর যাত্রাসহায়কদের উল্লেখও তদনুযায়ী করেছি। ঐ বিবরণের সঙ্গে কিন্তু স্বামীজীর চিঠিপত্র, কথাবার্তা, বক্তৃতা প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত সংবাদের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই। ফলে কতকগুলি প্রশ্ন ওঠে। প্রথম প্রশ্ন, ইংরেজি জীবনী অনুযায়ী, খেতড়ির মহারাজ ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে দিয়েছিলেন, উত্তম পোষাক, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং মোটারকমের টাকা দিয়ে যাত্রার 'সর্বপ্রকার ব্যবস্থা' করে দিয়েছিলেন—স্বামীজীর চিঠিপত্রে ঐসব সাহায্যের কোনো উল্লেখ নেই কেন? আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামীজী দক্ষিণভারতের বক্তৃতাদিতে মহীশূর ও রামনাদের রাজা এবং মাদ্রাজের বন্ধুগণের সাহায্যের উল্লেখই করেছেন।৫

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইংরেজি জীবনীতে পাচ্ছি, ১৮৯৩, ১১ ফেব্রুয়ারি স্বামীজীর সঙ্গে হায়দারাবাদের নিজামের প্রাইভেট সেক্রেটারির সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি এক হাজার টাকা দানের প্রস্তাব করেন। স্বামীজী বলেন, প্রয়োজন হলে তিনি টাকা চেয়ে নেবেন। এই হায়দারাবাদেই স্বামীজী 'পাশ্চাত্যগমনের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি সেখানকার ব্যবসায়ীরা বলেন, তাঁরা জাহাজভাড়া দেবেন। স্বামীজী যে, টাকার ব্যাপারে

---

৫ সে রকম কয়েকটি উল্লেখ ঃ

"বোধহয় আপনাদের অধিকাংশই জানেন, রামনাদের রাজাই চিকাগো যাওয়ার ভার প্রথম আমাকে দেন, এবং তিনিই সর্বসময়ে তাঁর সমস্ত হৃদয়ের আবেগ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা একে সমর্থন জানিয়েছেন।" (মাদুরা-অভিনন্দনের উত্তর। একই কথা স্বামীজী রামনাদ-অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন)।

"মহীশূরের রাজা ও অন্য কয়েকজন বন্ধু আমাকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন।" ('ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে উক্ত। অগস্ট ২৬, ১৮৯৬)।

"তিনি [স্বামীজী] আমাকে বলেন, মহীশূরের মহরাজা তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে বলেছিলেন।" (সুন্দররাম আয়ারের স্মৃতিকথা)।

এ জাতীয় উল্লেখ আরও পাওয়া যায়।

হতাশ হয়েছিলেন তার উল্লেখ নেই ইংরেজি জীবনীতে; অথচ ২১ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী হায়দারাবাদের খার্তাবাদ থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে যে-চিঠি লিখলেন, তার মধ্যে টাকার ব্যাপারে তাঁর চরম নৈরাশ্য প্রকাশ পেয়েছেঃ "আমার সব মতলব তাহলে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এইজন্যই আমি আগেই মাদ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে আমাকে আমেরিকা পাঠাতে উত্তরভারতের কোনো রাজাকে ধরবার জন্য বেশ কয়েকমাস সময় পেতাম। কিন্তু হায়, এখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে! প্রথমতঃ এই গরমে আমি ঘুরে বেড়াতে পারব না—তা করতে গেলে মারা পড়ব। দ্বিতীয়তঃ আমার রাজপুতনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ একবার আমাকে কাছে পেলেই ধরে রাখবেন, ইউরোপে যেতে দেবেন না। তাই আমার মতলব ছিল, আমার ঐসব বন্ধুদের অজ্ঞাতে নতুবা কোনো লোককে ধরা। কিন্তু মাদ্রাজে বিলম্ব হওয়ার জন্য আমার সব আশা চূর্ণ হয়ে গেল। এখন অতি দুঃখের সঙ্গে আশা ছেড়ে দিলাম। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

স্বামীজীর হতাশা এমন তীব্র যে, তিনি মহীশূরের মহারাজের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা হারিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতেই লিখেছিলেন—"যাইহোক, তুমি একরকম নিশ্চিন্ত জেনো যে, কয়েকদিনের মধ্যেই দু'একদিনের জন্য মাদ্রাজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে বাঙ্গালোরে যাব, আর সেখান থেকে উতকামণ্ডে গিয়ে দেখব যদি মহীশূরের মহারাজা আমাকে পাঠান। 'যদি' বলছি এইজন্য যে, আমি কোনো দাক্ষিণী রাজার প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিত ভরসা রাখতে পারি না। তারা রাজপুত নয়—রাজপুত বরং প্রাণ দেবে কিন্তু কখনো কথার খেলাপ করবে না।"

স্বামীজীর চিঠি থেকে স্পষ্টই মনে হয়, তিনি হায়দারাবাদে বড়-কিছু সাহায্যের আশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়! হয়তো তিনি নিজামের সেক্রেটারির প্রতিশ্রুত হাজার টাকা সামান্য মনে হওয়ায় গ্রহণ করেননি, কিংবা ঐ টাকা চেয়েও পাননি। হায়দারাবাদে ব্যর্থতার জন্য স্বামীজী ক্ষোভের বশে দাক্ষিণী রাজাদের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁর তিক্ত মন্তব্যে কিছু অবিচারই করেছিলেন,[৬] যেহেতু অল্পদিন পরে [মে মাসে?] জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসকে লেখেন, "আপনার হয়তো স্মরণ আছে যে, আগে থেকেই আমার চিকাগো যাওয়ার অভিলাষ ছিল; এমন সময়ে মাদ্রাজের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, মহীশূর ও রামনাদের মহারাজের সাহায্যে আমাকে পাঠাবার সবরকম ব্যবস্থা করে ফেলল। আপনার আরও স্মরণ থাকতে পারে যে, খেতড়ির রাজা ও আমার মধ্যে ঘনিষ্ঠতম প্রেম-সম্পর্ক বর্তমান। তাই স্বতঃই যথারীতি তাঁকে লিখেছিলাম যে, আমি আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। এখন, খেতড়ির রাজা প্রেমবশে মনে করলেন যে, যাবার পূর্বে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, বিশেষতঃ ভগবান তাঁকে যখন সিংহাসনের একটি উত্তরাধিকারী দিয়েছেন এবং সেজন্য রাজ্যে খুব আনন্দোৎসব চলেছে। তদুপরি, আমার আসা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে অতদূর মাদ্রাজে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে পাকড়াতে।"

মহীশূর ও রামনাদের মহারাজা স্বামীজীকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন, এই তথ্য ছাড়া আর একটি সংবাদ পাচ্ছি উদ্ধৃত পত্রাংশে—খেতড়ির মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর বিশেষ ভালবাসা থাকায় তাঁকে স্বামীজী আমেরিকা যাত্রার আগে কথাচ্ছলে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। কিন্তু, স্বামীজী তাঁর অতিপ্রিয় খেতড়ির রাজাকে আরও আগে জানাননি কেন? স্বামীজীর ২১ ফেব্রুয়ারির চিঠি থেকে একটা কারণ জেনেছি—তাঁর আশঙ্কা ছিল

৬ ঠিক অবিচার করেছিলেন বলা যাবে কি না সন্দেহ। খেতড়ির মহারাজার ১৯ এপ্রিলের চিঠিতে (বেণীশঙ্কর শর্মার গ্রন্থে উদ্ধৃত) দেখি, রামনাদের রাজা টাকা দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি ক'রেছিলেন।

রাজপুতনার বন্ধুরা তাঁকে কাছে পেলে ছাড়বেন না। তাই স্বামীজী যাত্রার সব বন্দোবস্ত করার পরেই খেতড়ির মহারাজকে সংবাদ দেন, যাতে তিনি বা অন্যান্যরা বাধা দিতে না পারেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই কারণটি যথেষ্ট জোরালো বলে গৃহীত হবে না। খেতড়ির মহারাজা স্বামীজীর এতই অনুগত যে, তিনি সত্যই কার্যকরী বাধা দেবেন না, স্বামীজী জানতেন, এবং ২৭ এপ্রিলের চিঠিতে তা ডাঃ নান্‌জুণ্ডা রাওকে লিখেছেনঃ "খেতড়ির রাজা অথবা আমার গুরুভাইগণ আমার সংকল্পে বাধা দিবেন তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। রাজাজীর তো আমার প্রতি অগাধ ভালবাসা।" ঐ পত্রে আর একটি বিষয় পাই, যা বিবেচনাযোগ্য। স্বামীজী লিখেছেনঃ "মাদ্রাজ হইতে জাহাজের উঠিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উহা এক্ষণে আর হইবার জো নাই, কারণ আমি পূর্বেই বোম্বাই হইতে উঠিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" স্বামীজী মাদ্রাজে থাকাকালে যদি যাত্রাব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছিল, তাহলে মাদ্রাজ থেকে জাহাজে উঠলেন না কেন? বোম্বাই থেকে জাহাজে ওঠা সুবিধাজনক বলে? তাই যদি হয়, সে-ব্যাপারটা ডাঃ নান্‌জুণ্ডা রাও পূর্বাহ্ণে জানলেন না, যিনি আমরা যতদূর জানি, অন্যতম বিশিষ্ট মাদ্রাজী ভক্ত!

এইখানে থেমে আরও কতকগুলি তথ্যের বিচার করতে হবে। স্বামীজীর জীবনের খেতড়ি-পর্ব সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন শ্রীযুক্ত বেণীশঙ্কর শর্মা। গ্রন্থের নাম, "স্বামী বিবেকানন্দঃ এ ফরগট্‌ন চ্যাপটার অব হিজ্ লাইফ।" এই গ্রন্থে নূতন তথ্য ও অপ্রকাশিত পত্রাবলীর সাহায্যে তিনি স্বামীজী ও খেতড়ির মহারাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাঁর একটি সিদ্ধান্ত—স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রায় 'সর্বাধিক' সাহায্য করেন—মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের রাজা বা মাদ্রাজী ভক্তগণ নন—খেতড়ির মহারাজা। এবং আমরাও একথা স্বীকার করতে বাধ্য, নূতন তথ্যের সাহায্য না নিয়েও, স্বামীজীর ইংরেজি জীবনী অনুযায়ী ঐকথা সত্য। ইংরেজি জীবনীতে এ-ব্যাপারে খেতড়ির মহারাজের সাহায্যের বিষয়ে যা লেখা আছে, তা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। শ্রীযুক্ত বেণীশঙ্কর শর্মা তদুপরি আরও অনেক নূতন তথ্য দিয়েছেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩, স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত খেতড়ির রাজাকে যে-চিঠি লেখেন, (পত্রটি শ্রীযুক্ত শর্মার আবিষ্কার), তার মধ্যে দেখি, মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই খেতড়ির রাজা অজিত সিং স্বামীজীর মাদ্রাজে অবস্থিতির কথা জানতে পারেন। মহেন্দ্রনাথ লেখেনঃ "দিন পনর আগে আমার দাদার কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছি ; তিনি এখন মাদ্রাজে আছেন।" পরে ২২ মার্চ মহেন্দ্রনাথ আবার মহারাজকে জানানঃ "দাদার খবর আবার পেয়েছি ; তিনি মাদ্রাজে সেখানকার অ্যাসিট্যাণ্ট কমপ্‌ট্রোলার বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের কাছে আছেন।" পুনশ্চ ১১ এপ্রিল মহেন্দ্রনাথ একই জনকে লিখলেনঃ "দাদার কোনো নতুন সংবাদ পাইনি, শুধু ভাসাভাসা শুনেছি যে, তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে আছেন, বোধহয় হায়দারাবাদে।"

মহেন্দ্রনাথের ১১ এপ্রিলের চিঠি থেকে মনে হতে পারে, মাদ্রাজে অবস্থিত স্বামীজীর সঙ্গে রাজা অজিত সিংয়ের বোধহয় তখনো কোনো সংযোগ স্থাপিত হয়নি। তা কিন্তু সত্য নয়, কারণ ঐ ১১ এপ্রিল তারিখেই অজিত সিং মাদ্রাজস্থ মুন্‌শি জগমোহনলালকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছেন স্বামীজীর ব্যাপারে। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই জগমোহন মাদ্রাজে গিয়েছিলেন। রাজার ১১ এপ্রিলের চিঠির ভাষা দেখে মনে হয়, জগমোহন তখন বেশ কয়েকদিন মাদ্রাজে আছেন। জগমোহন কবে মাদ্রাজ যাত্রা করেছিলেন এবং কেন?

কবে যাত্রা করেছিলেন ঠিকভাবে বলা শক্ত, কিন্তু কেন যাত্রা করেছিলেন তার পরিজ্ঞাত কারণ হল, রাজার পুত্রজন্মের উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য রাজগুরু স্বামীজীকে আমন্ত্রণ

জানানো। এর সঙ্গে আর একটি কারণ অনুমান করে যোগ করা যায়ঃ আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়ে স্বামীজী রাজাকে চিঠি দিয়েছিলেন (যে-চিঠির কথা হরিদাস বিহারীদাসকে স্বামীজী জানিয়েছিলেন, আগেই দেখেছি), দক্ষিণী রাজাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হওয়ার পরে ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চের গোড়ায় যা লিখতে পারেন, যাতে যাত্রাব্যাপারে সাহায্যের প্রয়োজন আছে এমন ইঙ্গিতও থাকতে পারে—হয়ত সেইজন্যও সাক্ষাতে সংবাদ জানতে জগমোহন বিশেষভাবে এসেছিলেন।

এ-ব্যাপারে তথ্যনির্ণয়ে অজিত সিংয়ের ১১ এপ্রিলের চিঠির গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি জগমোহনলালকে লিখেছিলেনঃ

"তোমার সুদীর্ঘ চিঠি আজ সকালে এখানে এসে পেঁছেছে। তার থেকে মোটকথা আমি এই বুঝছিঃ এক, খুব-কিছু ভাল লোক নন এমন কোনো ব্যক্তির প্রতিশ্রুতির উপরে স্বামীজী নির্ভর করেছিলেন। দুই, রামনাদের রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে দ্বিধা করছেন। তিন, আমরা অন্ততঃপক্ষে তিন হাজার টাকা দিতে রাজি হতে পারব কি-না সে-সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ। আমাদের রাজ্যের লোকজনের কথা ভেবে, পুণ্যাত্মা স্বামীজী সম্বন্ধে তাদের মনোভাব কী দাঁড়াবে সে-বিষয়ে চিন্তা করে ঐ সন্দেহ তুমি করেছ।[৭] চার, স্বামীজীর ভক্তেরা তাঁর যাত্রার জন্য অর্থসংগ্রহ করছেন। পাঁচ, চাঁদার মারফত ঐ অর্থসংগ্রহ-চেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে তোমার পুরোপুরি ভরসা নেই, কারণ তুমি লিখেছ যে, স্বামীজী আফ-গানিস্থানের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটেই যাত্রা করতে পারেন। ছয়, স্বামীজী যথার্থই ইউরোপ যেতে ইচ্ছুক। সাত, এখানকার গরম হাওয়া লু'তে স্বামীজীর অবস্থা কী হবে সে-সম্বন্ধে তুমি আশঙ্কিত। আট, তুমি খুব সংকট অবস্থায় রয়েছ মনে করছ।"

আলোচ্য পত্রে আরও পাই, স্বামীজীর জন্য প্রয়োজনীয় তিন হাজার টাকা খরচ করতে রাজা সানন্দে প্রস্তুত। রাজ্যের সাধারণ তহবিল থেকে খরচ করলে যদি কথা ওঠে, তিনি 'হুকুম খরচ' অর্থাৎ ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ঐ টাকা দেবেন, এবং প্রজারাও কিছু বলতে পারবে না। (বললেও অজিত সিং তাতে ভ্রূক্ষেপ করতেন কিনা সন্দেহ)। উদ্দীপ্ত অনু-রাগের সঙ্গে মহান কথাগুলি তিনি লিখেছিলেনঃ

"ইউরোপ যাত্রা সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি মনেপ্রাণে সমর্থন করি, যখন দেখছি, ইউরোপে ঐরকম বিরাট-কিছু তিনি করতে চান। এক্ষেত্রে আমি কখনই স্বার্থপর হতে পারি না বরং আমি সন্তুষ্ট ও সুখী হব যদি দেখতে পাই, যাঁকে গুরু বলে বরণ করার গৌরব ও সৌভাগ্য আমার ঘটেছে, তাঁর কাছ থেকে বিশ্বজগৎ শ্রেয়বস্তু সংগ্রহ করে নিতে পারছে।"

বিস্ময়কর কথা, এই ১১ এপ্রিলের চিঠির কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে, মে মাসের গোড়ার দিকে লেখা [আনুমানিক সময়; কারণ মূল চিঠিতে তারিখ নেই] চিঠিতে স্বামীজী হরিদাস বিহারীদাসকে লিখেছেন, মাদ্রাজের লোকেরা এবং মহীশূর ও রামনাদের রাজা তাঁকে আমেরিকা পাঠাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। এখানে আরও প্রশ্ন, যা আগেও করেছি, দক্ষিণীরাই যদি স্বামীজীর যাত্রাব্যবস্থা করেন তাহলে মাদ্রাজ থেকে জাহাজে না-উঠে বোম্বাই থেকে ওঠার ব্যবস্থা হল কেন?

শ্রীযুক্ত বেণীশঙ্কর শর্মা এখানে খোলাখুলি দাবি করেছেন, স্বামীজী মাদ্রাজ থেকে সামান্যই সাহায্য পেয়েছিলেন, খেতড়ির মহারাজের সাহায্যেই তাঁকে আমেরিকা যেতে হয়,

---

৭ স্বামীজী সম্পর্কে ভবিষ্যতে খেতড়ির প্রজাদের মনোভাব অনুকূল না থাকতে পারে, জগমোহনের এই সন্দেহের মূলে, আমাদের মনে হয়, সমুদ্রলঙ্ঘন সম্বন্ধে দেশীয় মনের বিরূপ ধারণা। সন্ন্যাসী হয়ে কালাপানির পারে যাওয়া!—মহাপাতক!—এমন ধারণা এদেশে গড়ে উঠেছিল।

বোম্বাই হয়ে। অথচ সে দাবি সত্য হলে হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা স্বামীজীর কথা মিথ্যা হয়, শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে রামনাদ ও মহীশূরের সাহায্য সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তিগুলিও অসত্য হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী গম্ভীরানন্দ বেণীশঙ্করের দাবিকে অতিরঞ্জিত মনে করেন। স্বামীজীর পত্রে বা বক্তৃতায় খেতড়ির রাজার এ-ব্যাপারে সাহায্যের উল্লেখ নেই—তিনি এর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, খেতড়ির রাজা টিকেটের ব্যাপারে কিছু সাহায্যের (নিম্নতর শ্রেণীর টিকেটকে উচ্চতর শ্রেণীর করে দেওয়া) বেশি কিছু করেননি।

সবদিক বিবেচনা করে আমাদের ধারণা হয়েছে, বেণীশঙ্কর যতখানি দাবি করেছেন তা পুরোপুরি না হলেও বহুলাংশে ঠিক। এমন ধারণার মূলে কেবল শর্মাজীর আবিষ্কৃত তথ্যই নেই, স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীর সাক্ষ্যও রয়েছে। স্বামীজীর ইংরেজি জীবনী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শিষ্যদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছিল ; সুতরাং তার সাক্ষ্যকে নিশ্চয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না।

এইসঙ্গে আরও যোগ করে দিতে পারি, স্বামীজী সরাসরি না বললেও সমসাময়িক নানা সূত্র থেকে খেতড়ির সাহায্যের উল্লেখ পাই। স্বামীজীর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত এবং বোম্বাই অঞ্চলে স্বামীজীর ভাবপ্রচারে সর্বাধিক উৎসাহী এস এস সেটলুরের (তিলকের সহায়ক বন্ধু ও আইনজীবী) একটি চিঠি 'মাদ্রাজ মেলে' ১৪ জুলাই, ১৯০২, প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে তিনি ধর্মমহাসভায় যোগদানের ব্যাপারে রামনাদের রাজা, খেতড়ির মহারাজা, বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং অন্যান্য মাদ্রাজী অনুরাগীদের সাহায্যের কথা বলেছেন।৮ মিরারে ১৯ মার্চ ১৮৯৭, সংবাদ আছে, খেতড়ির মহারাজা স্বামীজীকে আমেরিকা পাঠাতে বিশেষ সাহায্য করেছেন।৯ এই সংবাদ স্বামীজীর জীবিতকালেই প্রকাশিত, যখন তিনি এদেশে আছেন। খেতড়ির রাজা ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসবে যোগদানের পরে ভারতে ফিরলে বোম্বাইয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়, সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সুবিখ্যাত মাধবগোবিন্দ রানাডে—সেখানে মহারাজাকে প্রদত্ত মানপত্রে বলা হয়, তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ গুণাবলীকে আবিষ্কার করে ইউরোপ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে তাঁকে যেতে প্রণোদিত করেছিলেন, সেজন্য সমগ্র ভারত তাঁর কাছে ঋণী। 'বম্বে গেজেটে' এই সংবাদ ২৫ অক্টোবর, ১৮৯৭, বেরিয়েছিল।১০ 'ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর' কাগজে ৩১ অক্টোবর, ১৮৯৭, একই বিষয়ে মন্তব্য ছিল।১১

৮ "The Parliament of Religions came, and with the help of the Rajah of Ramnad and the Maharajah of Khetri and Mr. Justice Subramanya Iyer and other Madras admirers he [Swamiji] went to America.
[S.S. Setlur's letter in *Madras Mail;* July 14, 1902]

৯ "His Highness [the Maharaja of Khetri] helped much in sending the Swami to America." [*Mirror;* March 19, 1897]

১০ "The whole of India lies under a deep debt of obligation to Your Highness, for Your Highness was the first to discover the marvellous abilities of Swami Vivekananda and harp him to carry the mission of Vedanta to Europe and America which has extorted from the civilized world that respect and admiration for our religion to which it is entitled."
[*Bombay Gazette;* Oct. 25, 1897]

১১ "The Prince is, further, disciple of Swami Vivekananda and is said to have furnished that learned exponent..with the means with which to preach his philosophy in England and America." [*Indian Spectator;* Oct., 31, 1897]

আমেরিকা থেকে ফেরার পরে স্বামীজী ১৮৯৭, ডিসেম্বরে খেতড়ি যান। সেখানে যেসব বক্তৃতাদি করেন, খেতড়ির মহারাজের কাছে তাঁর ঋণের কথা যেভাবে স্বীকার করেন, দুঃখের বিষয়, তার পূর্ণাঙ্গ কোনো বিবরণ নেই। ১ জানুয়ারি, ১৮৯৮, ব্রহ্মবাদিনে স্বামী সদানন্দ-প্রেরিত চিঠিতে পাই (১২ ডিসেম্বর, ১৮৯৭-তে লেখা), স্বামীজী বলেছেন, ভারতের উন্নতির জন্য তিনি যেটুকু করেছেন, খেতড়ির মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে তা করা সম্ভব হত না।১২ একই সংখ্যায় 'এ ফ্রেন্ড' খেতড়িতে স্বামীজীর উপস্থিতি ও তাঁর সঙ্গে খেতড়ির মহারাজের সম্পর্কের বিষয়ে লেখেন, 'এই দুই আত্মা যেন পরস্পরকে সাহায্য করতেই দেহধারণ করেছেন।' ইনিও খেতড়ির মহারাজের সাহায্য সম্বন্ধে স্বামীজীর সদ্যোক্ত স্বীকৃতির উল্লেখ করেছিলেন।

এই সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে আছে। এগুলি থেকে আমরা এইরকম মীমাংসা করতে চাইঃ

এপ্রিলের গোড়ার দিকে মাদ্রাজের প্রতিশ্রুত সাহায্য সম্পূর্ণ না পাওয়া গেলেও কিছু-দিনের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল—মহীশূর এবং রামনাদের রাজা টাকা দিয়েছিলেন। সাধারণ চাঁদার দ্বারাও টাকা কিছু সংগৃহীত হয়েছিল। তবে প্রয়োজনীয় অর্থ ১১ এপ্রিলের কয়েক-দিন পরেও পাওয়া যায়নি। অল্প যা-কিছু পাওয়া গিয়েছিল তার উপরে আরও অন্ততঃ তিন হাজার টাকার প্রয়োজন ছিল। জগমোহন সেকথা খেতড়ির মহারাজকে জানান। ১১ এপ্রিল তারিখে লিখিত মহারাজের প্রতিশ্রুতিযুক্ত চিঠি কয়েকদিনের মধ্যে মাদ্রাজ পৌঁছায়। অপূর্ব মহাপ্রাণতা দেখিয়ে মহারাজ জগমোহনকে লিখেছিলেন, স্বামীজীর যদি গরমে আসতে কষ্ট হয় তাহলে তাঁকে চাপ দেবার প্রয়োজন নেই ; আর তিনি যেন টাকার জন্য চিন্তিত না হন। সেই চিঠি পাওয়া মাত্র জগমোহন স্বামীজীকে নিয়ে খেতড়ি যাত্রা করেন। তাঁরা বোম্বাই ঘুরে যান টিকেট কিনবার বা রিজার্ভ করবার জন্য। ২১ এপ্রিল স্বামীজী খেতড়ি পৌঁছান। পৌঁছবার পরেই আলাসিঙ্গা প্রভৃতির কাছ থেকে জানতে পারেন, মাদ্রাজেও টাকার জোগাড় হয়েছে। সুতরাং তিনি ২৭ এপ্রিল হরিদাস বিহারীদাসকে লিখতে পেরেছিলেন, মাদ্রাজের লোকেরা এবং মহীশূর ও রামনাদের রাজা তাঁর যাত্রার টাকা দিয়েছেন।

গ্রীষ্মকালে রাজপুতনার গরম স্বামীজীর পক্ষে অসহ্য হলেও তিনি খেতড়িতে গিয়ে-ছিলেন মহারাজের সঙ্গে তাঁর প্রাণের সম্পর্ক ছিল বলে—এবং মহারাজের উক্ত মহাপ্রাণতার জন্যও। আরও একটি কৃতজ্ঞতায় তিনি গিয়েছিলেন—সেটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। খেতড়ির রাজা তাঁকে একটি দারুণ দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হলেও নিজেই স্বীকার করেছেন, হৃদয়কে নষ্ট করতে পারেননি। নিজের অসহায় মা ও ভাইদের কথা ভোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর সন্ন্যাস ও মা, ভাইদের অনশন—এর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন খেতড়ির রাজা। রাজার নিয়মিত সাহায্যে স্বামীজীর মা ও ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদন হয়েছে। ভাইদের পড়াশোনা হয়েছে খেতড়ির রাজারই টাকায়। বিবেকানন্দকে মানবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। তার ফলে উপকৃত হয়েছে নিখিল মানব, কিন্তু তাতে কলিকাতাবাসী কয়েকটি মানবের ক্ষতির সীমা ছিল না। সেই ক্ষতিপূরণে এগিয়ে এসেছিলেন খেতড়ির রাজা। তার জন্য তাঁকে আশীর্বাদ জানাতেও স্বামীজী

---

১২ "Swamiji..delivered a brief speech [at Khetri on Dec. 17]..in which he thanked the Rajah highly, saying that what little he had done for the improvement of India would not have been done if he did not meet him." [Swami Sadanandas' letter. *Brahmavadin ;* January, 1898]

খেতড়ি গিয়েছিলেন, এবং যে-অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন, তার আগে অন্ততঃ জেনে নিতে চাইছিলেন—তাঁর মা ও ভাইয়েরা অনশনের মুখে দাঁড়াচ্ছেন না।

এ-ব্যাপারে সর্বশেষ একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সত্যই কি খেতড়ি শেষ পর্যন্ত পুরো তিন হাজার টাকা খরচ করেছিলেন? তার মীমাংসার জন্য 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯৬৪, মে সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী শিবানন্দের একটি চিঠির উল্লেখ করব। ১৮৯৪, ১৩ ফেব্রুয়ারি শিবানন্দ মাদুরা থেকে ঐ পত্রে লেখেনঃ "নরেন্দ্র-বাবাজির কাছ থেকে কোনো সংবাদ পাইনি। তবে মাদ্রাজে তার বন্ধুদের কাছে লেখা তার কিছু চিঠি পড়েছি। ঐসব বন্ধুরা কলেজের অধ্যাপক, বা অ্যাডভোকেট বা ডাক্তার ইত্যাদি।......এ'রাই প্রায় চার হাজার টাকা চাঁদা তুলে তাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন।"

স্বামী শিবানন্দের এই চিঠি সুস্পষ্টভাবে মাদ্রাজে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। শিবানন্দ-স্বামী স্বামীজীর বন্ধু ও শিষ্যদের কাছ থেকে সাক্ষাৎ সংবাদ নিয়ে চিঠি লিখেছিলেন।

২০ অগস্ট, ১৮৯৩, আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে স্বামীজী লিখেছিলেনঃ "তোমার স্মরণ আছে তুমি আমায় ১৭০ পাউন্ড নোট, ও নগদ ৯ পাউন্ড দিয়েছিলে।" স্বামী গম্ভীরানন্দের হিসাবমত, ওতে ২৮০০ টাকার কিছু বেশী হয়। বাকি থাকে হাজার খানেকের মত। স্বামীজী অর্থকষ্টে পড়লে আলাসিঙ্গা আরও ৮০০ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তা দেখতে পাই, ১৮৯৩, ২ নভেম্বরে লেখা স্বামীজীর চিঠিতে। আলাসিঙ্গা যদি পরবর্তীকালে নতুন চাঁদা না তোলেন তাহলে আমরা প্রায় চার হাজার টাকার হিসেব পেয়ে যাচ্ছি—স্বামীজীর যাত্রার আয়োজনের জন্য অল্প-কিছু খরচ আলাসিঙ্গারা করে-ছিলেন, তাও ধরে নিচ্ছি। আলাসিঙ্গারা যদি নতুন চাঁদা তুলেও থাকেন, তার হিসেবও নিশ্চয় শিবানন্দ-স্বামীর প্রদত্ত টাকার অঙ্কের মধ্যে ছিল, কারণ ঐ চিঠি আলাসিঙ্গা কর্তৃক সর্বশেষ ৮০০ টাকা পাঠাবার কয়েক মাস পরে লেখা হয়।

উপরের হিসাবের মধ্যে কিন্তু জাহাজভাড়ার এবং যাত্রার আনুষঙ্গিক খরচের হিসেব নেই।

এখন খেতড়ির রাজার খরচের কথায় আসা যাক। রাজার টাকায় ফার্স্ট ক্লাস টিকেট কেনা হয়েছিল। তদুপরি তিনি পোষাক ও জিনিসপত্র কিনে দেন এবং 'মোটারকম হাত-খরচ'ও দেন। সব জড়িয়ে তিন হাজারের মত টাকা হওয়া আশ্চর্য নয়। ঐসব খরচ খেতড়ির রাজা করেছিলেন বলেই আলাসিঙ্গার পক্ষে স্বামীজীর ব্যক্তিগত খরচের জন্য পূর্বোক্ত টাকা দেওয়া এবং পরবর্তী প্রয়োজন অনুমান করে কিছু টাকা হাতে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

খেতড়ি যদি কম-বেশি তিন হাজার টাকা খরচ করে থাকেন তাহলে তা পরিমাণে মাদ্রাজ থেকে সংগৃহীত টাকার অর্ধেকেরও বেশী। সেক্ষেত্রে আমেরিকা যাত্রার ব্যাপারে খেতড়ির সাহায্যের উল্লেখ স্বামীজী করেননি কেন? ঠিক কারণ আমরা বলতে পারব না। এ বিষয়ে খেতড়ির রাজার নিষেধ থাকতে পারে। কিংবা আমেরিকা যাত্রার প্রেরণা দক্ষিণ থেকে পেয়েছিলেন বলেই সেখানকার ঋণের কথা স্বামীজী বলেছেন। কিংবা খেতড়ির রাজার সঙ্গে স্বামীজীর এমনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, কোনো একটি বিশেষ ব্যাপারে তাঁর সাহায্যের উল্লেখ বাহুল্য বিবেচনা করেছিলেন—খেতড়ির রাজাকে নিজের 'প্রধান কর্মী ও সহায়ক' রূপে ঘোষণা করার মধ্যেই স্বামীজী সবকিছু জানিয়ে গেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি-সংবাদ

উনিশ শতকের শেষে আমেরিকার চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মমহাসভা পরাধীন ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল—এই সংবাদ বিস্ময়কর মনে হলেও সত্য। কিভাবে তা সত্য, এই রচনায় ক্রমেই তা উন্মোচিত হবে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি-সংবাদ কিভাবে ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল, তা সন্ধান করে কিছুটা উপস্থিত করছি, ইতিহাসের প্রয়োজনে।

ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি-সংবাদ এদেশে প্রথম কবে বেরিয়েছিল, তার ঠিক উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ তা বেরিয়েছিল ১৮৯২-এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে। কিংবা তারও পূর্বে। এদেশে যেসব ব্যক্তি মহাসভার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত বা পরিচালিত পত্রিকাদিতে এই সংবাদ আগে বেরিয়েছিল, সন্দেহ নেই। মাদ্রাজের সুবিখ্যাত শিক্ষাবিৎ রেভারেন্ড ডাঃ হেনরি মিলার, 'হিন্দু' কাগজের সংস্কারপন্থী প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার (যিনি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম), কলকাতার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ধর্মমহাসভার 'অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলে'র সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। মহাবোধি সোসাইটির কর্তা বৌদ্ধনেতা অনাগারিক ধর্মপালের সঙ্গে মহাসভা-কর্তৃপক্ষের বিশেষ যোগাযোগ ছিল।

যতদূর সন্ধান করে পেয়েছি, তদনুযায়ী ডাঃ মিলার মাদ্রাজের 'হিন্দু' কাগজেই মহাসভার বিষয়ে চিঠি লিখে রক্ষণশীল হিন্দুদের উক্ত সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। তবে রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা কালাপানি পার হয়ে ম্লেচ্ছদেশে যে, যাবেন না, সে-বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলেন বলে তিনি একই সঙ্গে জানিয়েছিলেন, বিশেষ-বিশেষ ধর্ম-শাখার দ্বারা প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃত পণ্ডিতেরা যদি ধর্মবিষয়ক রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে পাঠান, তাহলে তা মহাসভায় পঠিত হবে। সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধি হিসাবে কাউকে পাঠাতে চাইলে তাঁর যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ মহাসভা-কর্তৃপক্ষ বহনে ইচ্ছুক, তাও ডাঃ মিলার উক্ত পত্রে জানিয়েছিলেন।

ডাঃ মিলারের চিঠি 'হিন্দুতে' প্রকাশ হওয়া মাত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। 'হারভেস্ট ফিল্ড' নামক মিশনারি পত্রিকার জুন ১৮৯২ সংখ্যায় উক্ত সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে আরও সংবাদসহ যে-সকল মন্তব্য করা হয়, তার মধ্যে সেকালের হিন্দুর সামাজিক মনের অনেকখানি চেহারা ফুটে উঠেছে দেখতে পাই—বিশেষতঃ রক্ষণশীল হিন্দুদেরঃ

"হিন্দুধর্মের তিন প্রধান শাখার প্রত্যেকটি থেকে [illegible] রক্ষণশীল পণ্ডিত পাশ্চাত্যের সুদূর এক অংশের এক নূতন শহরে গিয়ে [illegible] কাছে ইংরেজিতে দ্বৈত, অদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনের পার্থক্য [illegible]চেছেন—দেখবার 'সুন্দর' দৃশ্য বটে! রক্ষণশীল শাস্ত্রীর কাছে সমুদ্রই তো এক দুর্লঙ্ঘ্য [illegible]!... [ডাঃ মিলারের [illegible]টি দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষরকম ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। এই চিঠির সূত্রে 'হিন্দুর' সম্পাদক লিখেছেন, 'আধুনিক সমাজজীবনের বাস্তব সমস্যাসমূহের উপরে
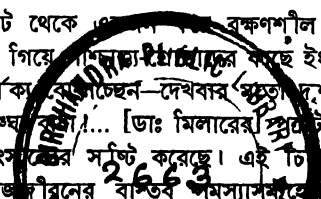
ব্রহ্মণ্যধর্ম যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে না।'১ এই মন্তব্য ত্রিবান্দ্রামের মিঃ রঙ্গাচার্যের ক্রোধ-বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি মনে করেন, ভগবদ্‌গীতায় আদর্শ হিন্দুধর্মের উপস্থাপনা আছে এবং 'সেই আদর্শ, আধুনিক সমাজজীবনকে বিচলিত করছে এমন অনেক বাস্তব সমস্যার অতি চমৎকার সমাধান করে দেয়।' কয়েকজন যোগ্য লেখক বিষয়টিতে মনোযোগী হয়েছেন। তাঁরা বলেন, ধর্ম কেবল আদর্শময় হলেই চলবে না, তাকে বাস্তবও হতে হবে। একজন প্রশ্ন করেছেন, 'ব্রহ্মণ্যধর্মে কার্ডিনাল ম্যানিং কোথায়—যাঁকে সামাজিক আন্দোলনের অগ্রে দেখা যাবে, যিনি পার্থক্য দূর করবেন, শুভকর্মে আশীর্বাদ জানাবেন, প্রেরণা দেবেন দুর্বলকে সবল হতে, দুর্বৃত্তকে ন্যায়পর হতে?' এইসব লেখকরা বলেছেন, 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।' তার জীবন নিঃশেষিত, গতি স্তব্ধ, 'তার শেষ বক্তব্য বহু পূর্বে বলা হয়ে গেছে।' পত্রলেখকেরা বলেছেনঃ হিন্দুসমাজ যে-সকল দোষে দুষ্ট, তার উৎপত্তি হিন্দুধর্ম থেকেই। হিন্দুগৃহের শান্তি ও সুখ সম্বন্ধে যত ডম্‌ফাই করা হোক না কেন, তা অলীক কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। 'আমাদের বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে কী বলা যাবে? আমাদের বাধ্যতামূলক বৈধব্য সম্বন্ধে? বহুবিবাহ সম্বন্ধে? এই সমস্ত নিয়ে হিন্দুসমাজ যথার্থই একটি শ্বেতশুভ্র সমাধিভূমি, যার তলায় চাপা আছে মানবের পক্ষে সম্ভবপর সকল প্রকার পাপের পুঞ্জ।' " [অ]

১ মাদ্রাজের সুপরিচিত অধ্যাপক-লেখক কে সুন্দররাম আয়ার তাঁর বিবেকানন্দ-স্মৃতির মধ্যে 'হিন্দু'র সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার সম্বন্ধে লিখেছেন : "তিনি একদা অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন; বৈদিক কর্মকাণ্ড ও সদাচারাদি কঠোরভাবে পালন করতেন। তাঁর অল্পবয়সী কন্যা যখন দাম্পত্যজীবন আরম্ভ করার আগেই বিধবা হয়, তখন তিনি নিষ্ঠুর আঘাত পান এবং অনুভব করেন, হিন্দু-রক্ষণশীলতার সঙ্গে কোন্ দণ্ড ও যন্ত্রণাবহন আবশ্যিকভাবে জড়িত।...তিনি তখন ঠিক বিপরীত দিকে সরে যান—রক্ষণশীল থেকে হয়ে দাঁড়ান সমাজবিপ্লবী।" ('রেমিনিসেনসেস্ অব বিবেকানন্দ')।

'সমাজবিপ্লবী' বলতে সমাজসংস্কারপন্থী বুঝতে হবে। জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের পরিচালনায় 'হিন্দু'তে সমাজসংস্কারের পক্ষে যেসব উগ্র রচনাদি প্রকাশিত হয়েছে, তা অনেকের কাছেই আপত্তিকর মনে হয়েছিল, বিশেষ 'হিন্দু' নামক কাগজে যখন সেগুলি বেরিয়েছিল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত, সতীশ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকা জুন, ১৮৯৩, সংখ্যায় লেখে :

"By a strange irony of fate the editor of the *Hindu* has been recognised as the representative of the Madras Presidency by the Chicago Exhibition! Probably the name of the journal has thrown dust into the eyes of the promoters. A leading Hindu gentleman of Madras has written the following letter to us: "The *Hindu* of Madras is not edited by people whom the masses of the orthodox believe to be Hindus by religion nor does the paper represent the views of the latter. They have divorced Shastras and have adopted their individual reason in its place."

হিন্দু-সম্পাদকের ব্যক্তিগত মতামত পরেও একই প্রকার ছিল, তা দেখা যায় বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত 'কর্ণাটক প্রকাশিকা'র ৩ অগস্ট ১৮৯৩ সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে। হিন্দু-সম্পাদক প্রকাশ্য সভায় বলেন, তাঁর স্বদেশবাসীর একাংশের এমন অবস্থা যে, খ্রীস্টান হয়ে গেলে সেটা তাদের পক্ষে অধিকতর মন্দ ব্যাপার হবে না। কর্ণাটক পত্রিকা রূঢ়ভাবে লেখে, এই যাঁর মত, তাঁর উচিত 'ন্যায়ের খাতিরে' হয় পত্রিকার নাম বদলে দেওয়া, নচেৎ পদত্যাগ করা। তা যদি তিনি না করেন, তাহলে বুঝতে হবে, ধাপ্পাবাজি করতেই তিনি চান।

কে সুন্দররাম আয়ার তাঁর বিবেকানন্দ-স্মৃতিতে বলেছেন, স্বামীজী যখন ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজ-বক্তৃতায় জাতীয় জীবনের পক্ষে শক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, তখন হিন্দু-সম্পাদক আনন্দে একেবারে আত্মহারা; তারপর স্বামীজী যখন বললেন, জাতিভেদ কোনো না কোনো আকারে পৃথিবীর সর্বত্র বর্তমান, তখন তিনি বিব্রত হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন।

মিশনারি-কাগজ 'হার্ভেস্ট ফিল্ড' হিন্দু সংস্কারবাদীদের এইসব মসীময় স্বধর্মকুৎসা সানন্দে ছেপেছিল, এবং ঈষৎ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে বলেছিল, হয়ত ঐসব রচনায় কিছু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, কিন্তু ভগবদ্‌গীতায় আধুনিক সমস্যার সমাধান রয়েছে, এই উদ্ভট দাবির তুলনায় পূর্বোক্ত কথাগুলিতে অনেক বেশি সত্য আছে। 'হার্ভেস্ট ফিল্ড' আরো লিখেছিলঃ এই আলোচনা যদি শিক্ষিত হিন্দুদের ধর্ম-প্রশ্নকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে এবং তার ফলে যে-সব সিদ্ধান্ত এগিয়ে আসবে তাদের সম্মুখীন হতে সাহস ও শক্তি দেয়—সেটা আশীর্বাদের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

পাঠকগণকে অগ্রিম একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—১৮৯২, জুন মাসে মাদ্রাজের শিক্ষিত হিন্দুগণের বিবেচনায় যেখানে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান 'অসম্ভব কাণ্ড'—দেড় বছরের মধ্যে সেই অসম্ভবের বন্দনাতে মাদ্রাজের পত্রপত্রিকা পূর্ণ হয়ে যাবে, আর তা ঘটাবেন প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দ। এবং, যে-রঙ্গাচার্য শিক্ষিত হিন্দুদের হীনমন্যতা ও স্বধর্মদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর তুলেছিলেন, তাঁরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আলাসিঙ্গা পেরুমল স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্মমহাসভায় পাঠানোর ব্যাপারে নেতৃত্ব করবেন।

১৮৯২, জুলাই মাসেই ধর্মমহাসভার কার্যকরী সমিতির সভাপতি ডাঃ জন হেনরি বারোজ-প্রেরিত প্রাথমিক কার্যবিবরণ প্রকাশিত হয়ে যায়। ডাঃ বারোজ জানান, গ্ল্যাডস্টোন-প্রমুখ বহু বিখ্যাত ব্যক্তি মহাসভার ব্যাপারে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। ঐসব ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের কার্ডিনাল, আর্চবিশপ ও বিশপগণও আছেন। ডাঃ বারোজ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে এমন স্তোত্রগীতি পাঠাবার অনুরোধ করেছিলেন, এবং এই বিশেষ আশা প্রকাশ করেছিলেন—ভারতবর্ষ থেকে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি মহাসভায় যোগদান করবেন। ('হার্ভেস্ট ফিল্ড' জুলাই, ১৮৯২)।

ডাঃ মিলারের উৎসাহে দক্ষিণভারতের মিশনারিরা প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছিলেন, এবং জানা গিয়েছিল, মিঃ জাস্টিস আমির আলি ইসলামধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবেন (ইনি মহাসভার 'অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলে'র সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন; যার সদস্যসংখ্যা আড়াই হাজার পর্যন্ত বাড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, যাতে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব তাতে ঘটতে পারে), কিন্তু 'হার্ভেস্ট ফিল্ড' নামক মিশনারি পত্রিকাটি এই অপূর্ব দৃশ্য দেখার কল্পনায় আমোদিত না হয়ে পারেনি—'একই মঞ্চে আসীন একজন রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিত, একজন মুসলমান মৌলবী, এবং একজন খ্রীস্টান মিশনারি—এবং তাঁরা সকলেই ঈশ্বরের জয়গান করছেন!' পত্রিকাটি জানত, উক্ত আমোদজনক কল্পনা অচরিতার্থই থেকে যাবে, কেননা কোনো গোঁড়া হিন্দু সমুদ্রপার হবেই না, এবং 'খ্রীস্টানধর্ম ছাড়া আর কোনো ঐতিহাসিক ধর্ম আলোকপ্রাপ্ত শ্রোতাদের কাছে নিজ ধর্মমত উপস্থিত করার যোগ্য লোক যথেষ্ট সংখ্যায় পাবেই না'; এবং, খ্রীস্টানেতর ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা নিজ ধর্মবিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত রয়েছে, এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ হাজির করতেই পারবেন না। তবে প্রাচ্য প্রতিনিধিদের কথাবার্তা থেকে যদি পাশ্চাত্যের লোক বুঝতে পারে প্রাচ্যদেশে মিশনারিদের কি ধরনের বিচিত্র ধর্মাদর্শের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে সেটাই হবে ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি—'হার্ভেস্ট ফিল্ড' লিখেছিল।

'মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিন' ঐকালে মিশনারি-পত্রিকা হিসাবে বিখ্যাত। ঐ পত্রিকার পরিচালনায় ডাঃ মিলারের বিশেষ হাত ছিল। এর ১৮৯২, অগস্ট সংখ্যায় 'মিশনারি রিভিউ অব দি ওয়ার্লড্' পত্রিকা থেকে ডাঃ বারোজের রচনাংশ সংকলিত হয়, যার মধ্যে ধর্মমহাসভায় সংগঠন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক-কিছু বলা হয়েছিল। সেগুলির সারসংক্ষেপ করার পরে এই পত্রিকা যে-মন্তব্য করে, তার মধ্যে পুনশ্চ তৎকালীন আত্মসংকুচিত হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে খ্রীস্টানী কৃপাদৃষ্টি ফুটে উঠেছে ঃ

"যে-সকল ধর্মসম্প্রদায়কে নিজ মত-বিশ্বাস উপস্থাপিত করবার জন্য চিকাগোয় আহ্বান করা হয়েছে তাঁরা হলেনঃ ব্রহ্মণ্য, বৌদ্ধ, কনফ্যুসীয়, ইসলামিক, পারসিক, ইহুদী এবং খ্রীস্টীয়। কোনো রক্ষণশীল পণ্ডিত সমুদ্র এবং স্বজাতীয় মানুষের বিরূপতা লঙ্ঘন করে, ধর্মমহাসভায় যোগদান করে, হিন্দুধর্মতত্ত্ব ব্যক্ত করেন কি না, তা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয়, এবং যদি কেউ তা না করেন, তার কারণে তাঁরা কি স্বীকার করে নেবেন না—বৃহত্তর পৃথিবীর কাছে হিন্দুধর্মের কোনো বার্তা নেই?" [অ]

আরও দুটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য পত্রিকাটি করেছিল। এক, প্রস্তাবিত ধর্মমহাসভা সারা পৃথিবীতে যে-ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, তা সত্যই মানবজীবনে ধর্মের গুরুত্বের চমকপ্রদ স্বীকৃতি; দুই, খ্রীস্টান ধর্মসম্প্রদায়গুলি এখন অন্য ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে ছুৎমার্গের মনোভাব ত্যাগ করেছে; তারা এই কথা অনুভব করতে শুরু করেছে, হীদেনদের মধ্যেও একই খ্রীস্টের আলোক!

এই ধরনের দম্ভ ও মুরুব্বিয়ানা স্বতঃই আত্মমর্যাদাশীল ভারতবাসীকে আঘাত করেছিল। কিন্তু সে বেদনা নিরুপায়ের। কোথায় সেই প্রতিভাবান স্বধর্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞানী হিন্দু, যিনি প্রচলিত সংস্কার অগ্রাহ্য করে, পাশ্চাত্যে গিয়ে হিন্দুধর্মের সত্য উন্মোচনের দ্বারা আলোকিত উত্তর দান করবেন? কে তিনি, কোথায় তিনি? মাদ্রাজ টাইমস্ পত্রিকার ২৭ জানুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায় সি পি শ্রীহরি নাইডুর পত্রে সেই জ্বালাময় বেদনাই ফুটে-ছিল। ১৮৯২-এর মাঝামাঝি ডাঃ মিলারই যে প্রথম মাদ্রাজ-অঞ্চলে ধর্মমহাসভার কথা সকলের গোচর করেন, এই কথা বলার পরে তিনি লেখেন ঃ

"বাংলার ব্রাহ্মরা একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচন করেছেন মিঃ পি সি মজুমদারকে; ইসলামের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন পঞ্জাবের এক মুসলমান; কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত শুনিনি, আমাদের এই তমসাচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে কেউ এগিয়ে এসেছেন এই অঞ্চলের পণ্ডিত ও শাস্ত্রীদের দ্বারা আচরিত হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে!" [অ]

চিকাগো যেতে হলে মধ্যবর্তী স্থানে কালাপানি নামক কৃষ্ণবর্ণ ব্যাপারটি থাকবেই; যদি কোনোক্রমে তার লঙ্ঘনদোষ কাটিয়ে ওঠা যায়, তাহলে অপরাপর হিন্দু আচার পুরো বজায় থাকবে, এমন ব্যবস্থাদিসহ একটি বিশেষ জাহাজ ছাড়বার আয়োজন করেছে একটি পার্শি কোম্পানি, এক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে বাধা কি?— এমন-সব কথা বলার পরে, শ্রীহরি নাইডু শেষকালে যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর এবং অনেকের পীড়িত অভিমান, ক্ষোভ ও দুঃখ ফুটে উঠেছিল, অধিকন্তু একটি অসচেতন ভবিষ্যৎবাণী!—

"যেখানে পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রতিনিধিরা যাচ্ছেন, সেখানে যদি ভারতের এই অঞ্চলের কেউ গিয়ে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব না করেন, তা হবে গভীর লজ্জার বিষয়। এই প্রেসিডেন্সিতে কয়েকজন ধর্মসংস্কারক আছেন, যাঁরা অন্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের অপূর্ব মহান গুণাবলী কালাকাল বিবেচনা না করে সর্বদা কীর্তন করে থাকেন। তাঁদের পক্ষে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এমন সুবর্ণসুযোগ আর কখনো মিলবে না—চিকাগোর ধর্মমহাসভা এই যে-সুযোগ করে দিয়েছে—যেখানে শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সমবেত হবেন। **যদি এমন একটি মহান বিশ্বজনসমাবেশে অন্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের মত ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা যায়, যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কঠিন বিচারে সেই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়, তাহলে এই ধর্ম বহু আমেরিকান ও ইংরাজকে আলোকদান করবে, যাঁরা এখন হিন্দুধর্মের সেই শক্তিকে অস্বীকার করেন।**" [অ] [স্থূলাক্ষর লেখক-নির্দেশে।]

হিন্দুধর্মের মর্যাদার জন্য আকূতি তখন ভারতের অন্য স্থান অপেক্ষা দক্ষিণ অঞ্চলেই অধিক। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না, মাদ্রাজী তরুণেরা কেন বিবেকানন্দের মধ্যে বার্তাবহকে

দর্শন করা মাত্র তাঁকে চিকাগোয় পাঠানোর জন্য দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করেছিলেন। এবং হয়ত তাঁদের বেদনা সত্যই এত গভীর ছিল যে, তাঁদের প্রেরিত 'প্রতিনিধি' উপরের স্থূলাক্ষর-চিহ্নিত কথাগুলিকে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য প্রমাণ করতে পেরেছিলেন!

॥ ২ ॥

কেবল ধর্মমহাসভা নয়, ধর্মমহাসভা যার অংশ সেই কলম্বিয়া প্রদর্শনী সমকালীন ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের বহু পৃষ্ঠা অধিকার করেছিল। 'কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চতুঃশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য' আমেরিকাবাসীরা এই বিরাট বিশ্বমেলার আয়োজন করেছিল—তার পরিকল্পনার বৃহৎ বিবরণগুলি ভারতবাসীর কল্পনার চোখ একেবারে ঝলসে দিয়েছিল। যেমন, কলকাতার 'ইউনিটি অ্যান্ড দি মিনিস্টার' কাগজের (এই কাগজটি অতঃপর সংক্ষেপে 'মিনিস্টার' বলে উল্লিখিত হবে) ২৯ জানুয়ারি, ১৮৯৩-এর স্তম্ভিত বিবরণ :

"১ মে, ১৮৯৩, চিকাগোয় যে-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে, তার জন্য আমেরিকায় বিপুল আয়োজন চলেছে, যাতে সেটিকে পৃথিবীতে এ-যাবৎ অনুষ্ঠিত সকল প্রদর্শনীর মধ্যে সর্বাধিক জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলা যায়। চিকাগো আয়তনে কলকাতার পনর গুণ, লোক-সংখ্যা দ্বিগুণ।...প্রদর্শনী বসবে ১০৩৭ একর বা ৩০০০ বিঘারও বেশি জমি জুড়ে। কতকগুলি বাড়ির উচ্চতা ও পরিসর মনে হর্ষ-বিস্ময় জাগাবে। ছয় বিঘা জমি জুড়ে বাড়ি বা বিশতলা বাড়ির কথাও শোনা যাচ্ছে। প্যারিসের ইফেল টাওয়ারের চেয়ে দেড়শো ফুট বেশি উঁচু টাওয়ার এবং রাস্তার নিচে সুড়ঙ্গপথের কথাও শুনেছি।" [অ]

একই প্রকার অভিভূত বিবরণ বেরিয়েছিল পুনার 'মরাঠা' কাগজে (বালগঙ্গাধর তিলক-পরিচালিত ইংরাজি সাপ্তাহিক) ১৪, ২১ ও ২৮ মে, ১৮৯৩ সংখ্যাগুলিতে। সেই দীর্ঘ রচনায় যেসব সংবাদ ছিল, আড়ম্বরের যে-বিপুল আয়োজন-কাহিনী, বহুল ব্যয়ের যে-স্তূপাকার হিসাব, তা সে-যুগের হৃতসর্বস্ব ভারতের কাছে রূপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে শিক্ষিত ভারতবাসী ঐকালে আমেরিকার রত্নমহাদেশে কল্পনার রথে পর্যটন করেছিল নিশ্চয়। সেইজন্য ঐ বিশ্বমেলা-সংশ্লিষ্ট ধর্মমহাসভার সংবাদও প্রচুর আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হয়েছিল।২

২ কেবল ইংরাজি পত্রপত্রিকা নয়, দেশীয় ভাষার পত্রিকাগুলিও যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে চিকাগো-প্রদর্শনীর উপরে সংবাদ-প্রবন্ধ ছেপেছিল। যেমন, 'সখা' পত্রিকার জুন ১৮৯৩ সংখ্যায় 'চিকাগো মহামেলা' নামক বিবরণবহুল রচনার শেষাংশে ছিল—'শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া চিকাগো মহামেলায় প্রদর্শনার্থ কতকগুলি জিনিস নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। তিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে।' মাদুরার উল্লেখযোগ্য ইংরাজি পত্রিকা 'মাদুরা মেল' ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩-তে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা থেকে সংবাদ উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, মিসেস কাদম্বিনী গাঙ্গুলী চিকাগোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন; বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আগামী মার্চে যাবেন; এবং মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত যাবেন আগামী জুলাইয়ে। 'মাদুরা মেল' প্রশ্ন করেছিল—"আমরা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে কোন্ হিন্দু ভদ্রলোক চিকাগো যাচ্ছেন?—হিন্দুমহিলার সমুদ্রযাত্রার কথা অবশ্য এই অঞ্চলে ওঠেই না।"

চিকাগো-প্রদর্শনীতে 'ভারতীয় শিবির' স্থাপিত হয়েছিল। সে সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক সংবাদ 'মরাঠা'র মে মাসের সংখ্যাগুলিতে বেরিয়েছিল। 'মাদুরা মেলে'র ২৫ মার্চ সংখ্যায় ছিল, রবি বর্মা প্রদর্শনীতে ছবি পাঠিয়েছেন। 'মাদ্রাজ টাইমস' পত্রিকায় ২৫ মার্চে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য কিভাবে উক্ত প্রদর্শনীতে যাচ্ছে, তার কিছু খবর ছিল। এই ধরনের সংবাদ-তালিকা বাড়িয়ে যাওয়া যায়, প্রয়োজন নেই। উৎসুক পাঠকেরা এসব সম্পর্কে আরও বেশি সংবাদ পাবেন বর্তমান লেখকের 'ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি-সংবাদ' নামক উদ্বোধনে প্রকাশিত প্রবন্ধে—১০৭৭-এর আশ্বিন, কার্তিক, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যাগুলিতে।

চিকাগো বিশ্বমেলা সম্পর্কে ভারতীয় আগ্রহ ও উত্তেজনার একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ—হিন্দু জাহাজ ছাড়ার প্রস্তাব, যার উল্লেখ আগেই পেয়েছি। ও-সম্পর্কে আরও কিছু কথা শোনানো যায়। 'মিনিস্টারে' ২৯ জানুয়ারি ১৮৯৩-তে পাই, বোম্বাই-এর মেসার্স কারসেটজি সোরাবজি অ্যান্ড কোম্পানি উক্ত জাহাজ ছাড়ার প্রস্তাব করেন, যার ভিতরে স্নান আহার এবং নিদ্রা, সর্বব্যাপারে পুরো হিন্দুয়ানী বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; হিন্দু ব্রাহ্মণ রাঁধুনী, হিন্দু মোদক, হিন্দু পরিচারক, হিন্দু তত্ত্বাবধায়ক, এমনকি রোগে পড়লে হিন্দু কবিরাজ—সর্বময় হিন্দুত্ব সংরক্ষণী ব্যবস্থা। জাহাজে পশুবধ নয়, মৎস্যশিকার নয়; অপরদিকে স্পেশাল হিন্দু জল, হিন্দু আহার্যের পুরো স্টক। তুলনায় খরচ অতি সামান্য—যাতায়াত ও থাকা নিয়ে চার মাস সময়ের জন্য প্রথম শ্রেণীর ভাড়া তিন হাজার, দ্বিতীয় শ্রেণীর আড়াই হাজার, পরিচারকদের দেড় হাজার টাকা। বহু বিখ্যাত উদারনৈতিক হিন্দু পরিকল্পনার সমর্থন করেছিলেন।৩ একে উৎসাহের সঙ্গে সংবর্ধনা জানিয়ে 'মিনিস্টার' কাগজ সেই উজ্জ্বল দিনের কল্পনা করেছিল, যখন 'এক হাজার সম্ভ্রান্ত হিন্দু কালাপানি পাড়ি দিয়ে এমন এক দেশে মাসখানেকের জন্য থাকবেন, যেখানে কোনো গোঁড়া হিন্দু এ-পর্যন্ত পদার্পণ করেননি।' সেদিন যদি আসে তাহলে কি হবে? 'আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তা হবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে তার দ্বারা কতখানি শুভ ফললাভ হবে, তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে ভারত একাই লাভবান হবে তা নয়,...উচ্চবংশজাত সম্ভ্রান্ত হিন্দুর জীবনে পরিস্ফুট আর্য-সভ্যতাকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে ইউরোপ ও আমেরিকাও উপকৃত হবে প্রভূত পরিমাণে।'

এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছিল। এক হাজার নয়, মাত্র একজন সম্ভ্রান্ত আর্য হিন্দু দারুণ আলোড়ন এনেছিলেন আমেরিকায়। আমরা চমৎকৃত হয়ে লক্ষ্য করব, সেদিন 'মিনিস্টার' পত্রিকা কার্যতঃ নিজেকে অভিশাপ দেবে বোহিসেবী ভবিষ্যৎবাণী করবার অহেতুক উদারতার জন্য। অদৃষ্টের পরিহাসের সে এক অপরূপ দৃষ্টান্ত; ক্রমে তার রূপ আমরা দেখব।

॥ ৩ ॥

১৮৯৩, মে মাসে চিকাগো-বিশ্বমেলার উদ্বোধন হয়। সে পর্যন্ত ভারতীয় পত্রপত্রিকায় বিশ্বমেলার প্রস্তুতি-সংবাদই প্রাধান্য পেয়েছিল। তারপর থেকে, সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় ধর্মমহাসভা-সংবাদ গুরুত্ব পেতে থাকে। ক্রমেই অধিক পরিমাণে মহাসভার সংগঠন-সংবাদ ভারতীয় পাঠকদের গোচরে আনা হয়। স্বামীজী ৩১ মে ভারত ত্যাগ করে যাবার পরে মহাসভার বিস্তারিত পরিকল্পনা এদেশে প্রচারিত হয়েছিল বলে সে-সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অবহিত থাকতে পারেননি; তাই তিনি মহাসভা শেষ হবার পরে এক চিঠিতে বিস্ময়ের সঙ্গে লিখেছিলেন, দেখছি এখানকার সব সংবাদ ভারতে পৌঁছে গেছে, ইত্যাদি।

মে'র আগেই, এপ্রিল মাসেই অবশ্য মহাসভার বিস্তারিত কার্যসূচী ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। ৯ এপ্রিল 'মিনিস্টার' যে-কার্যসূচী প্রকাশ করে, তাকে আরও বিস্তারিতভাবে

৩ এই পরিকল্পনার সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি আই ই; মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব-বাহাদুর; মাননীয় পি চেন্টসালরাও পান্টুলু, সি আই ই; দেওয়ান কে শেষাদ্রি আয়ার, সি এস আই; দেওয়ান রাম দাস, সি এস আই; মাননীয় রণছোড়লাল ছোটলাল, সি আই ই; কপুরথালার দেওয়ান মথুরাদাস বাহাদুর; রাজা তেজনারায়ণ সিং বাহাদুর; রায়বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র মুখার্জি ইত্যাদি।

উপস্থিত করা হয় অগস্ট মাসের 'দি জার্নাল অব দি মহাবোধি সোসাইটি' পত্রিকায় (অতঃপর পত্রিকাটিকে সংক্ষেপে 'মহাবোধি' বলে উল্লেখ করব)। 'মহাবোধি' ঐ সংখ্যাতেই 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকার আমেরিকান সংস্করণে এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ডাঃ বারোজের বিবৃতির অংশ উদ্ধৃত করে। ডাঃ বারোজ অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখেছিলেন ঃ

"এটুকু নিশ্চিত বলা যায়, এহেন সুযোগ পূর্বে কোনো যুগে কখনো আসেনি।... অপর ধর্মমত বা ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ ধারণা অর্জন করে নিজ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের [পক্ষপাতদুষ্ট] বক্তব্য থেকেই। সুতরাং আমরা যখন সত্যভাবে, অর্থাৎ সরাসরিভাবে, সেই-সেই ধর্মমতের প্রতিনিধিদের মারফত সেই সকল ধর্মমত সম্বন্ধে জানতে পারব, তখন আমরা কিয়দংশে অন্ততঃ তাদের বিষয়ে আমাদের ধারণাকে সংশোধন করতে সমর্থ হব—এবং আমাদের আধ্যাত্মিক মনোভাবও তাদের বিষয়ে বদলে যাবে। এইভাবে সত্যজ্ঞান ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়িয়ে তুলবে।" [অ]

ডাঃ বারোজ সত্যই কর্মবীর। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি পৃথিবীর নানা স্থানের ধর্মনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। প্রেসবিটেরিয়ান যাজক হয়েও এইকালে তিনি ধর্মবিষয়ে যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছিলেন, তা তাঁর চিঠিপত্র ও রচনাদি থেকে দেখা যায়। সার্কুলার-পত্রে তিনি লিখেছিলেন, ৩০ এপ্রিলের 'মিনিস্টারে' পাই ঃ

"মহান ঐতিহাসিক ধর্মসমূহের প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে মানবসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিরাট বিষয় সম্বন্ধে বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করবেন একটি ধর্মমহাসভায়—এই পরিকল্পনা এখন আর স্বপ্নের জিনিস নয়। এই যথার্থই সর্বজনিক সভায় ধর্মমহীরুহের প্রধান শাখাসমূহের প্রতিনিধিরা আসবেন। জাপান, ভারত এবং সম্ভবতঃ শ্যামদেশ থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা আসবেন। শিন্টোধর্মের উচ্চ পুরোহিতদেরও একজন আসবেন আশা করা যায়। ভারতের দুজন খ্যাতনামা মুসলমান পণ্ডিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। প্রগতিশীল হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বলবেন বাগ্মী মজুমদার। রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছ থেকে রচনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কনফুসীয় মত উপস্থিত করবার জন্য চীন সরকার একজন পণ্ডিত নিয়োগ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে, বোম্বাইয়ের পার্শিরা তাঁদের প্রাচীন মতের বিষয়ে বলবেন। আমেরিকা ও ইউরোপের ইহুদি রাব্বিরা এই আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন।... নানা দেশের প্রধান-প্রধান খ্রীস্টান মিশনারি ও দেশীয় খ্রীস্টান উপস্থিত থাকবেন—তাঁদের মধ্যে ভারতের অগ্রগণ্য কিছু ব্যক্তিও আছেন। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জার্মানির বিশিষ্ট অনেক পণ্ডিত ধর্মমহাসভায় ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন। এমন আশায় আমরা উৎসাহিত যে, রুশ, আর্মেনীয় ও বুলগেরীয় চার্চ ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধি পাঠাবেন।" [অ]

ধর্মমহাসভার মৌল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল (মিনিস্টারে ১৭ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত) ঃ

"ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ঃ তুলনামূলক ধর্মালোচনার একটি মহান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা; বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আদানপ্রদান ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করা; বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধকে ঘনীভূত করা; প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার করা; মানুষ কেন ঈশ্বরে এবং উত্তরজীবনে বিশ্বাস করে, তা দেখানো; খ্রীস্টান ও অন্য জাতিগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ ধর্মভিত্তিক জাতিগুলির মধ্যে যে-বিরাট ব্যবধানের গহ্বর রয়েছে, তার উপর সেতুনির্মাণ করা; মানুষকে তার সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার ব্রত গ্রহণের জন্য সৎ মানুষকে প্রণোদিত করা; এবং আন্তর্জাতিক শান্তির পথ প্রশস্ত করা।" [অ]

শ্বেত খ্রীস্টান ডাঃ বারোজ তাঁর ঐ কথাগুলি মুখের কথা নয়, প্রাণের কথা, প্রমাণ করলেন ধর্মপালকে লেখা চিঠিতে ('মহাবোধিতে' মে ১৮৯৩-তে প্রকাশিত) ঃ

"ভারতীয় প্রতিনিধিরা যদি একই স্টিমারে একসঙ্গে লিভারপুল থেকে নিউইয়র্কে আসতে পারেন, তাহলে খুব সুন্দর হয়। সেক্ষেত্রে আমি আনন্দের সঙ্গে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁদের স্বাগত জানাব। সেইসঙ্গে নিউইয়র্ক শহরে তাঁদের জন্য সাদর অভ্যর্থনার ব্যবস্থাও করব।" [অ]

॥ ৪ ॥

ডাঃ বারোজ প্রমুখ ধর্মমহাসভার সংগঠকদের এই ধরনের কথাবার্তা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মমহলে স্বভাবতঃই উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, বিশেষতঃ ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য প্রস্তুত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে উৎসাহ খুবই প্রত্যাশিত। প্রথমতঃ নববিধানের কর্ণধারদের অন্যতম প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ধর্মমহাসভার উপদেষ্টা-সমিতির সদস্য হয়েছেন। দশ বৎসর পূর্বে আমেরিকা ভ্রমণ করে, এবং 'ওরিয়েন্টাল ক্রাইস্ট' গ্রন্থ লিখে, তিনি সেখানে যশোলাভ করেছেন। খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অতিরিক্ত পক্ষপাত খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগকে সহজতর করে তুলেছিল, এবং খ্রীস্টধর্মের আশ্রয়ে সর্বধর্মের সম্মিলন-প্রস্তাবে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, কেশবচন্দ্র সেন-প্রবর্তিত নববিধানের আদর্শ ধর্মমহাসভায় পূর্তিলাভ করবে। নববিধান সম্প্রদায় অধিকন্তু ধর্মমহাসভা-উদ্ভূত উদ্দীপনাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের এবং কেশবচন্দ্রের প্রভাব তখন বাঙালীসমাজে ক্ষীয়মাণ। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে হিন্দু-সমাজে নূতন জীবনোন্মেষের সূচনা দেখা দিয়েছে—তার তরঙ্গ আঘাত করছে ব্রাহ্ম-সমাজকে, বিশেষতঃ কেশবপন্থী নববিধানকে। সুতরাং লুপ্ত আশার উদ্ধারের পক্ষে ধর্ম-মহাসভার অনুষ্ঠানকে তাঁরা বিশেষ সহায়ক মনে করেছিলেন, যেহেতু সেখানে প্রতাপচন্দ্রকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, এবং নববিধানের আদর্শের সঙ্গে ধর্মমহাসভার ঘোষিত উদ্দেশ্যের ঐক্য আছে।

বৌদ্ধ ধর্মপাল ও তাঁর দলভুক্ত ব্যক্তিগণের উৎসাহের কারণও বোধগম্য। ভারতে উদ্ভূত অথচ এখান থেকে উৎখাত বৌদ্ধধর্ম এই সময়ে এদেশে স্থানগ্রহণে সচেষ্ট হয়, ধর্মপাল সেই চেষ্টার নায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি ছিল ধর্মপালের কার্যবাহন। ধর্মপাল ও তাঁর সমর্থকেরা মনে করেছিলেন, ধর্মমহাসভায় তাঁর উপস্থিতি ভারতে বৌদ্ধ পুনরুজ্জীবন-আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক হবে। তাছাড়া প্রায়ই দেখা যায়, নূতন আন্দোলনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সর্ববিষয়ে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন, প্রচারের কোনো সুযোগেই অবহেলা দেখান না, আর—প্রচারের সুবিধার পক্ষে ধর্মমহাসভা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মঞ্চ অন্য কী হতে পারে!!

বৌদ্ধ, এই পরিচয় ছাড়া ধর্মপালের আর একটি পরিচয় ছিল—তিনি একইসঙ্গে থিয়জ-ফিস্ট। ভারতে থিয়জফিস্ট-আন্দোলন তখন কাগজপত্রে বিশেষ প্রবল—শিক্ষিতমহলে তার কিছু প্রভাবও ছড়িয়েছে। থিয়জফিস্ট-দলে হিন্দু, বৌদ্ধ অনেক সম্প্রদায়ই ছিল। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কর্নেল অলকট ছিলেন বৌদ্ধ। স্বতঃই বৌদ্ধ ধর্মপালের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি ছিল (যা পরে অবশ্য ভেঙে যায়)। থিয়জফি-মত আবার গুপ্ত বৌদ্ধমতের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত, যে-বৌদ্ধমতের গোপন কেন্দ্রভূমি রহস্যময় তিব্বতের 'মহাত্মা'দের হাত ধরে থিয়জফি দাঁড়িয়েছিল। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মপালের পক্ষে থিয়জফিস্ট হওয়া আশ্চর্য নয়। থিয়জফিস্ট সম্প্রদায়ও ধর্মমহাসভায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। নববিধান যেমন দাবি করেছিল, তাদের আদর্শেই ধর্মমহাসভা আহূত, ঠিক একই দাবি ছিল থিয়জফিস্টদের, যাঁরা বলতেন, থিয়জফির মধ্যে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। থিয়জফিস্টরা ধর্মমহাসভায় যোগ

দেওয়া ছাড়া ঐ সময়ে চিকাগোয় নিজস্ব পৃথক সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। অ্যানী বেশান্ত ও জি এন চক্রবর্তী ধর্মমহাসভায় থিয়জফিস্টদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ধর্মপালের সঙ্গে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সম্পর্কের কিছু সংবাদ এখন দেওয়া যায়, পরেও এ-প্রসঙ্গ আসবে। থিয়জফিক্যাল সোসাইটির কর্তা কর্নেল অলকট আবার মহাবোধি সোসাইটিরও কর্তা ছিলেন। ঐ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট তখন এইচ সুমঙ্গল; জেনারেল সেক্রেটারী—এইচ ধর্মপাল এবং ডিরেক্টর জেনারেল—কর্নেল অলকট।৪ বৌদ্ধধর্মপ্রচারে নিজ উৎসাহের কথা অলকট জানিয়েছিলেন থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলনেঃ

"বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে আমার কাজের যে-সম্ভাবনা দেখছি, তাতে গত ডিসেম্বর মাসের চেয়েও বেশি উৎসাহ পাচ্ছি। শ্রীসুমঙ্গল, মহানায়ক এবং এইচ ধর্মপালের সঙ্গে আমি বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ও প্রচারের জন্য একটি বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছি। থিয়জফিক্যাল সোসাইটি কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এর জন্য দায়ী নয়; বৌদ্ধধর্মের জন্য যা করছি, তা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার।" [অ]

ধর্মমহাসভার ব্যাপারে মহাবোধি সোসাইটির বিশেষ উৎসাহ থাকলেও তার দ্বারা ভারতবর্ষে কোনো তরঙ্গের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছিল নববিধান সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অংশগ্রহণে। পরাধীন জাতির একজন মানুষ ধর্মমহাসভার মত বৃহৎ ব্যাপারের উপদেষ্টা পরিষদে মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন, এতে অবশ্যই কিছু পরিমাণে সাধারণ আনন্দের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে, নববিধানীদের খ্রীস্টধর্মপ্রীতি অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তো তাঁদের এই খ্রীস্টধর্মাসক্তির ঘোরতর বিরোধী ছিল, এবং খ্রীস্টানদের বহু প্রশস্তির মূল্যে মজুমদারের ঐ সম্মানপ্রাপ্তি—এমন সন্দেহ থাকাও আশ্চর্য নয়। সে যাই-হোক, ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাগুলি একত্র হয়ে মজুমদারকে অভিনন্দিত করেছিল। এমনকি 'হিন্দু পুনরুত্থানের' অন্যতম নায়ক বিখ্যাত বাঙালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এ-বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

এখানে আমরা 'মিনিস্টারে' ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্যের গুণগান করে, তার সঙ্গে নব-বিধানের আদর্শের ঐক্য দেখিয়ে, যে-সব সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল, তার কিছু-কিছু উপস্থিত করব। প্রতাপচন্দ্রের আমেরিকাগমনের উপরে অনেক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখা হয়। ৯ এপ্রিল ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন জানাবার পরে লেখা হয় ঃ

"এ-ব্যাপারে আমরা বিশ্ববিধাতা ঈশ্বরের অদ্ভুত কর্মের দ্রষ্টা মাত্র। আধুনিক যুগে নববিধান স্থাপনে ব্যস্ত তিনি। এ-ধরনের একটা ধর্মমহাসভা কেউ ডাকতে পারবে, পঁচিশ বছর আগে তা চিন্তারও অতীত ছিল। এ থেকেই এ-মহাসত্যটি উপলব্ধ হয়—'মানুষের কাছে যা অসাধ্য, ঈশ্বর তা সম্ভব করেন।' আমরা যে-বিধানের অন্তর্ভুক্ত, ধর্মমহাসভার কল্পনা সেই বিধানের পরিপূর্তিরই সূচনা করছে।" [অ]

ধর্মমহাসভা যে, নববিধানের নবতম বিধান, তা 'মিনিস্টারে' এইকালে বহুবার লেখা হবে, এবং পত্রিকাটির পৃষ্ঠাগুলি পূর্ণ থাকবে ধর্মোৎসাহে। ৩০ এপ্রিল এতে *The Chicago Exhibition and the New Dispensation*-শীর্ষক যে সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

"পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে নবযুগের সূচনা হবে এই ধর্মমহাসভায়। যে-সর্বজনীন ধর্মে সকল ধর্মই সম্মিলিত, মনুষ্যজাতি কর্তৃক তার প্রথম স্বীকৃতি এখানেই ঘটবে। বাস্তবে

৪ মহাবোধি সোসাইটির পক্ষে কর্নেল অলকটের কাজ করার অধিকারপত্র মহাবোধির ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তির তলায় এইচ ধর্মপাল ও এইচ সুমঙ্গলের স্বাক্ষর ছিল।

সত্য হবে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার-প্রমুখ দ্রষ্টাগণের ভবিষ্যৎবাণী, যাঁরা 'ধর্মের বিজ্ঞান' বলে কথিত জিনিসের জন্য সফল পরিশ্রম করেছেন।...আমাদের ধর্মাচার্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁর পার্থিব কর্মজীবন সমাপনের পূর্বে সর্বসাধারণের জন্য যে-শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন, তার নাম 'ইউরোপের উদ্দেশ্যে এশিয়ার বাণী।'...তিনি পাশ্চাত্যের কাছে সকরুণ আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, এশিয়ার যা-কিছু সত্য, সুন্দর, মঙ্গলকর, এবং পবিত্র, তাকে গ্রহণ করুন নিজেদের উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য।" [অ]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আলোচ্য সম্পাদকীয়তে কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে, যাকে স্থূলাক্ষরে চিহ্নিত করেছি—তা পরবর্তী কালে অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গিয়েছিল, (অনুরূপ দৃষ্টান্ত আগেও দিয়েছি) তবে এই পত্রিকার অভিপ্রেতভাবে নয়। ভারতের এবং বিশ্বের ধর্মেতিহাসে নূতন যুগের সূত্রপাত চিকাগোর ধর্মমহাসভা থেকেই হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-সূচনা নববিধানের আলোকে হয়নি, হয়েছিল বেদান্ত-সত্যের উন্মোচনে। যাঁর দ্বারা সে-বস্তু ঘটেছিল তিনি কেশবচন্দ্রের নন, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন, যিনি বলেছিলেন, 'রামকৃষ্ণের একক জীবনই একটি ধর্মমহাসভা।' সে যাই-হোক, 'মিনিস্টারে'র সম্পাদক ধর্মমহাসভার পিছনে ম্যাক্সমূলারপ্রমুখ তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রালোচনার পথিকৃৎ-দের, বিশেষতঃ নববিধান-প্রবর্তক কেশবচন্দ্রের প্রভাব দেখবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহনের নামোল্লেখ করবেন না, অথচ ম্যাক্সমূলার নিজে রামমোহনকে তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান-অনুশীলনের প্রবর্তক বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এখানে জানানো উচিত, এ-ব্যাপারে রামমোহনের নাম না-করার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে বিশেষ আপত্তি করা হবে; তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলবেন, কেশবচন্দ্র নন, রামমোহনই ধর্মমহাসভার প্রথম পরিকল্পনাকারী।

'মিনিস্টারে'র উপরে-উল্লিখিত সম্পাদকীয়তে অতঃপর প্রতাপচন্দ্রের বিশেষ সম্মান সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষায় লেখা হয়েছিল :

"কতকগুলি কারণে নববিধানের মতাবলম্বী আমরা বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারি। আমরা পূর্বেই পত্রিকার এই কলমে ঘোষণা করেছি যে, আমাদের ধর্মযাজক ভাই প্রতাপচন্দ্র প্রদর্শনীতে আমন্ত্রিত হয়েছেন ও ধর্মমহাসভার উপদেষ্টা-সমিতির অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হয়েছেন। আমাদের ভাইকে এই বিশেষ মর্যাদার আসন দেওয়া হয়েছে দেখে আমরা উল্লসিত।...[ধর্মমহাসভায় পাঠের জন্য প্রাচ্যশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি-চয়নের ভার প্রতাপচন্দ্রকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে জেনে আনন্দপ্রকাশ করার পর] আমাদের ভাইকে যে-সম্মানে ভূষিত করার কথা হয়েছে তাতে সমগ্র এশিয়ারই গৌরব। ভারতের আনন্দের কথা, তারই একজন সন্তানকে এই মহাসম্মান দেওয়া হবে। আমরা, নববিধান-মতাবলম্বীরা এবং তাঁর সহ-আচার্যেরা এতে বিশেষভাবে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। [এরপর বলা হয়েছে : এ-ঘটনার তাৎপর্য গভীরতর—নববিধান-শাস্ত্রই পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে চলেছে। যে-কেশবচন্দ্র সেন বিশবছরেরও আগে 'ইউরোপের প্রতি এশিয়ার বাণী' ঘোষণা করেছিলেন, তিনি আজ স্থূল-দেহে নেই ; আজ সুদূর পাশ্চাত্যে তাঁর সে-বাণী বহন করার যোগ্যতম ব্যক্তি কে? সর্ব-সম্মতিক্রমে নববিধানের প্রতাপচন্দ্রই সেই সুযোগ্য ব্যক্তি।]"

৩০ এপ্রিলের সম্পাদকীয়ের শেষাংশে প্রতাপচন্দ্রের মিশন সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল, তা আরও বিস্তারিতভাবে লিখিত হল ২৫ জুনের সম্পাদকীয়তে। প্রতাপচন্দ্রের আমেরিকা-যাত্রার প্রাক্কালে এটি লেখা হয়। লেখাটির মধ্যে যথার্থই প্রাণের উত্তাপ এবং বলিষ্ঠ আশা ফুটে উঠেছিল, এবং ধর্মসমন্বয়ের প্রেরণার দ্বারা তা স্পন্দিত ছিল। গোড়ায়, প্রতাপচন্দ্র কী গুরুদায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন, এশিয়াবাসী হিসাবে ধর্মদানের কী বিরাট ভূমিকা তাঁকে নিতে হবে, তা বলা হয়। ভারতের প্রাণ ধর্মে, সেই ধর্মই ভারত দেবে জগৎকে, প্রতাপচন্দ্র

তারই বাহক, তাঁর পাণ্ডিত্য বেশী না থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মাচার্যদের শক্তি তাঁর উপরে ভর করেছে—এসব কথা উত্তপ্ত ভাষায় লেখা হয়। শেষে বলা হয় :

"অপর ধর্মের সত্য সম্বন্ধে বলার সময় তিনি নববিধানের সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত ধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিতেই তা বলবেন।

"যীশুখ্রীষ্টের কথা তাঁকে বলতে হবে, এবং দেখাতে হবে যে, যীশুর মধ্যে সবই একীভূত হয়েছে। [যীশুর অন্যতম প্রধান শিষ্য] প্রচারক পল এই একত্বের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভবিষ্যতে সে-ভিত্তির ওপর ধর্মসমন্বয়ের মহাসৌধ-নির্মাণের কাজ পূর্বনির্ধারিত ছিল নববিধানের এই প্রচারকের জন্য।" [অ]৫

ধর্মমহাসভায় সর্বধর্মের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে শান্তি ও মিলনের বাণী প্রচার করবেন—নববিধানীদের এই মহান স্বপ্ন কিছুটা ভেঙেছিল একটি সংবাদে—ইংলন্ডের প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় এই মহাসভায় যোগদান করছে না। কেবল এঁরা নন, ভারতের অনেকেই বিচলিত হয়েছিলেন উক্ত অস্বস্তিকর সংবাদে, কারণ পরাধীন ভারতবর্ষের নানা ধর্মভক্ত ব্যক্তিরা অনেকেই তখন নিজেদের ধর্মকে ইংলন্ডের রাজধর্মের সামন্ত ধর্মরূপে ভাবতে ইচ্ছুক হয়ে পড়েছিলেন।

ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ পরিষ্কার জানালেন, তিনি কদাপি ধর্মমহাসভায় যোগদান করতে পারেন না, কারণ তাহলে স্বীকার করে নেওয়া হবে, অন্য ধর্মের সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম সমস্তরের। তা তাঁরা করবেন কি করে যখন জানেন যে, খাঁটি অর্থে খ্রীস্টধর্মই একমাত্র ধর্ম। তাছাড়া, ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ আরও বলেছিলেন, অনেক খ্রীস্টান ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গেও একাসনে বসতে তাঁদের আপত্তি আছে।৬

'মাদ্রাজ মেলে'র মতো কাগজের কাছে যদিও ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপের উক্ত মনোভাব ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনে হয়েছিল, এবং 'ইন্ডিয়ান মিরারে'র (ভবিষ্যতে আমরা সংক্ষেপে 'মিরার'

---

৫ "He [Mozoomdar] will have to speak of Christ and show that all things have been made one in Him. The apostle Paul has laid the foundation of this unity and it was reserved to the Apostle of the Now Dispensation to follow his footsteps and complete the great edifice of religious unity." [*Unity and the Minister;* April 30, 1893]

৬ 'মাদ্রাজ মেল'-এর ১০ জুন, ১৮৯৩-এর সংবাদ :
"The Archbishop of Canterbury is against the whole idea [of Parliament of Religions]. He is reported to have stated that 'it did not appear to him to be their business to put Christianity on a platform in competition with all the other religions in the world. They could not make Christianity a member of the Parliament of Religions without acknowledging that those religions have equal claims and had come to mankind under a parity of conditions. That he could not by any means admit'."

মাদ্রাজ টাইমস-এর ১৭ অগস্ট ১৮৯৩-এর সংবাদের অংশ :
"The Archbishop of Canterbury..wrote : 'The difficulties which I feel myself are not questions of distance and convenience, but rest on the fact that the Christian religion is the one religion. I do not understand how that religion can be regarded as a member of a Parliament of Religions without assuming the equality of the other intended members, and the parity of their position and claims."

বলব) মনোভাবও ছিল একই প্রকার,৭ 'মিনিস্টার' কিন্তু অপরপক্ষে সে-রকম বিদ্রোহী চিন্তার কথা ভাবতে পারেনি। তাকে যথেষ্ট সংকুচিত ও সতর্ক হতে হয়েছিল। সর্ব ধর্মের হাত ধরাধরি কোলাকুলির ধর্মীয় গণতান্ত্রিকতা কিছুটা সামলে তাকে বলতে হয়েছিল, হাঁ, ঠিক, ঠিকই যে, নিখাদ খ্রীস্টীয় যাজকেরা সকল ধর্মের প্রতিনিধির সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন না, যাদের কোনো কোনোটিকে, যেমন হিন্দুধর্মের কোনো কোনো শাখাকে, ধর্ম বলা ধর্মদ্রোহিতা। ভারতের নববিধান-প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধু খ্রীস্টানরা একাসনে বসতে পারেন বলে অন্যান্যদের সঙ্গেও একাসনে বসতে রাজি হবেন, এমন আশা করা নিশ্চয় সঙ্গত হবে না; তা হলেও, যেখানে রক্ষণশীল রোমান ক্যাথলিকেরা যোগদান করছেন, সেখানে ইংলন্ডের প্রোটেস্টান্টদের পক্ষে ক্ষমাঘেন্না করে রাজি হয়ে যাওয়া কি উচিত ছিল না?—যথেষ্ট কাতরতার সঙ্গে এই পত্রিকা জিজ্ঞাসা করেছিল।৮

ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ কেন ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন নি, তার আসল কারণটি 'মিনিস্টার'-সম্পাদক জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে বিস্মৃত হয়েছিলেন। ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক কারণে পরাধীন দেশের মানুষের সঙ্গে একাসনে বসতে রাজি ছিলেন না উক্ত আর্চবিশপ। ইংলন্ডের রাজাই ইংলন্ডের চার্চের প্রভু—এটা সর্বজ্ঞাত রাজনৈতিক সত্য। আমেরিকা ভারতের প্রভু নয়, এবং তখনো 'নতুন দেশ', সুতরাং সে ভারতবাসীকে ডাক দিতে পারে। রোমান ক্যাথলিকরাও ভারতের রাজনৈতিক প্রভু নয়। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট ইংলন্ডকে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ধর্মের ব্যাপারেও প্রভুর পার্থক্য বজায় রাখতে হয়।

মিনিস্টার-সম্পাদক অবশ্য এইসব কূট রাজনীতিচিন্তা থেকে দূরে ছিলেন, কারণ তাঁদের সম্প্রদায় ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ঈশ্বরবিধান এবং রাজানুগত্যকে ধর্মনীতি বলে স্বীকার করে রাজনৈতিক অসন্তোষের মূলোচ্ছেদ করে রেখেছিলেন,৯ এবং ধর্মমহাসভার

---

৭ "Although the Anglican Church, in its haughty and imperious exclusiveness, and with its characteristic narrowness and bigotry, did not approve of the aims and objects of the Parliament of Religions, that great assembly did not thereby lose a whit of its representative character, as it nevertheless attracted to it representatives of almost every form of religion and faith, now prevailing in the world." (*Mirror*, March 21, 1894)

৮ "We understand that the Archbishop of Canterbury has withdrawn his sympathy from the new movement. The influence of His Grace's change of opinion will no doubt injure, to some extent, the interests of the Conference, though it is rather strange to find that while the heads of the more orthodox Roman Catholic and Greek Churches do not find any objection to lend their supports to it...

"He [the Archbishop] said..they have no objection to stand on the same platform with our ministers; but..invitations have been issued to some such depraved bodies of religious men that it would be blasphemy to apply the sacred name of religion to their opinions, practices and modes of living. Is it not highly absurd and greatly outrageous to ask the Archbishop of Canterbury or such other dignitaries to sit on the same platform with, for instance, the Mormon highpriest or the representatives of such Hindu sects as are justly looked upon with hatred and indignation?" [*Minister*, July 2, 1893]

৯ "Loyalty is one of the creeds of the New Dispensation." [*Minister*, May 18, 1902]

মজুমদার তাঁর 'ইনটারপ্রেটার' কাগজে এই বিষয়ে খোলাখুলি কেশবচন্দ্রের ও নিজের ধারণার কথা লিখেছিলেন :

বিরুদ্ধে উত্থাপিত কতকগুলি অভিযোগকে যথার্থ বলে স্বীকার না করেও তাঁদের উপায় ছিল না, যেমন—যে-কোনো লোকই মহাসভামঞ্চে দাঁড়িয়ে 'নীতিহীন, উদ্ভট বা শয়তানী বক্তব্য বলতে পারে', 'ধর্মমহাসভা উত্তম মধ্যম ও অধম ধর্মের সাজানো বাজারবিশেষ হয়ে দাঁড়াতে পারে'—তাহলেও 'ধর্মমহাসভার প্রতি সহানুভূতি প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত নয়,' কারণ ঃ

"আমরা যতদূর বুঝছি, ধর্মমহাসভা জুরির মতো কাজ করবে; যে যা বলবে তা শুনবে কিন্তু সবকিছু স্বীকার করে নেবে না। জুরিদের মতোই, ভুল জবানবন্দী, ঠিক জবানবন্দী শুনবার পরে সে রায় দেবার অধিকার রাখবে নিজের হাতে।...মিথ্যা থেকে সত্যকে, অপবিত্র থেকে পবিত্রতাকে, অন্ধকার থেকে আলোককে পৃথক করবে সে। আমাদের ধারণা, তার কাজ হবে, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর থেকে সর্ববিধ পবিত্রতা, সত্য ও আলোক আহরণ করে সেগুলিকে একাঙ্গ সামগ্রিকতায় মিলিত করা; তথাকথিত খ্রীস্টান সম্প্রদায়গুলি এবং হীদেন সম্প্রদায়গুলি থেকে খ্রীস্টধর্মবিরোধী ভাবগুলি বর্জন করে অবশিষ্ট বিশুদ্ধ খ্রীস্টান ভাবগুলিকে একত্রবদ্ধ করা; যা হবে, সেণ্ট পলের সুন্দর ভাষায়, 'যীশুখ্রীস্টে সব কিছুর সমন্বয়।" [অ]

॥ ৫ ॥

ভারতের 'স্বীকৃত' প্রতিনিধিদের আমেরিকাযাত্রা এবং সেখানে পৌঁছবার পরে তাঁদের অভ্যর্থনার সংবাদ পত্রপত্রিকায় কিছু-কিছু বেরিয়েছিল। ১৭ সেপ্টেম্বরের 'মরাঠা' পত্রিকার 'লণ্ডন লেটারে' (২৫ অগস্ট লিখিত) ভারতীয় প্রতিনিধিদের লণ্ডন থেকে আমেরিকা-যাত্রার কথা আছে ঃ

"বিশ্বমেলার অন্তর্ভুক্ত ধর্মমহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হবে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে। কলকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বোম্বাইয়ের মিঃ বি বি নাগরকর, কলম্বোর মিঃ ধর্মপাল আগামীকাল চিকাগোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। প্রথম ব্যক্তি যাবেন লিভারপুল থেকে 'আম্ব্রিয়া' জাহাজে, বাকি দুজন সাদাম্পটন থেকে 'প্যারিস' জাহাজে।"

আমেরিকা পৌঁছানোর পরে ভারতীয় প্রতিনিধিদের প্রাথমিক সংবর্ধনার বেশ-কিছু সংবাদ আমেরিকান পত্রিকা থেকে সংকলন করে 'মহাবোধি' প্রকাশ করে। তারই অংশ ঃ

"আরিয়ান থিয়জফিক্যাল সোসাইটির ১৪৪ নং ম্যাডিসন অ্যাভিনিউয়ের কক্ষগুলি গত রাত্রে সোসাইটির সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের রাজধানী এলাহাবাদ থেকে এদেশে আগত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং থিয়জফিক্যাল সোসাইটির বৌদ্ধ সদস্য হেওয়াবিতরণ ধর্মপালকে সংবর্ধনা জানান। উভয়েই বিশ্বমেলার অন্তর্গত ধর্মমহাসভায় যোগদান করতে চিকাগো যাচ্ছেন।"

"রেভারেণ্ড জন হেনরি বারোজের প্রাইভেট সেক্রেটারি কয়েকজন যাজকসহ জাহাজ-

---

"Man conquers man, and nation conquers nation, by the force of character. My honored friend Keshub Chunder Sen used to say repeatedly, that the British keep the Indian Empire in subjection not by the 60 thousand bayonets of which so much is made, but by the superior morals, the superior knowledge of their civilization, above all the superior forces of their Christianity. In his words, 'Christ conquered India and rules it for them.'" [*Interpreter*, June, 1896]

ঘাটায় উপস্থিত হয়ে আগন্তুক যাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে করে ফিফথ্ অ্যাভিনিউয়ের ব্রুনস্‌উইক, ওয়ালডর্ফ ও অন্যান্য হোটেলে পৌঁছে দেন।

"বিশিষ্ট আগন্তুকদের মধ্যে আছেন : কলকাতার এইচ ধর্মপাল,...যাঁর পৃষ্ঠপোষক তিব্বতের মহান লামা লোজাং-থাব-ডান-গ্যাটকো; প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, যিনি হিন্দু একেশ্বরবাদের প্রবক্তা এবং ভারতের সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অন্যতম; বোম্বাইয়ের বি বি নাগরকর, যিনি ৬৩ বছর আগে রাজা রামমোহন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য; লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক মিনাস জের্জা;...বীরচাঁদ এ গান্ধী, ভারতের জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যিনি; এলাহাবাদের জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অ্যানী বেশান্ত, মিস মুলার ও অন্যান্য থিয়জফিস্টগণ; ইংলণ্ডের রেভারেণ্ড জি এফ পেণ্টিকস্ট; এবং উচ্চার্য বা দুরুচ্চার্য নামযুক্ত আরও কিছু ব্যক্তি।...

"বীরচাঁদ এ গান্ধী বলেন, তাঁর ধারণা, জৈনসম্প্রদায় থেকে তিনিই প্রথম মানুষ যাঁকে গত দু'হাজার বছরের মধ্যে ভারতের বাইরে ভ্রমণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। 'আমাদের সম্প্রদায়ের নীতি হল, আমাদের মধ্যে যদি কেউ ইংরাজের সঙ্গে আহার করে, তাকে ধর্মচ্যুত করা হবে। আমাদের সম্প্রদায়ের একটি সভায় প্রধান আচার্য ও সদস্যগণ আমাকে ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনীত করেছেন, যদিও অন্য নানা সভায় এখানে আসার জন্য আমার নিন্দা করা হয়েছে।...ফিরে যাবার পরে হয়ত এজন্য আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে।'

"যে-কোনো প্রকার মাংসের স্পর্শ গান্ধীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, মাংসের স্বাদ কি, তিনি তা জানেন না। গান্ধী প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, এবং নিজ সম্প্রদায়ে তাঁর স্থান অতি উচ্চে।

"দলটির মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন ও বুদ্ধিমানদের একজন মিঃ মজুমদার নিউইয়র্কের যেটুকু দেখেছেন, তার বিষয়েই অবাধ প্রশংসা করেন।

"মিঃ নাগরকর সঙ্গে এনেছেন ডক্টর আনন্দলাল যোশীর ভস্মাবশেষ। ডক্টর যোশী বোম্বাইয়ের প্রথম মহিলা যিনি আমেরিকায় মেডিসিন পড়েছিলেন। ৬ বছর আগে তিনি ভারতে মারা যান। ব্রুকলিনের জনৈকা মিসেস কার্পেণ্টার তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধবী—তাঁর অনুরোধ, ডক্টর যোশীর ভস্মাবশেষের কিয়দংশ এখানে এনে যেন হিন্দুপ্রথায় সমাহিত করা হয়।...

"ডঃ ধর্মপাল আজ ব্রুকলিনের প্লিমাউথ চার্চে ভাষণ দেবেন। রেভারেণ্ড লীম্যান অ্যাবটের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যিনি জাহাজে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন।"

ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত এই সমস্ত রচনায় স্বামী বিবেকানন্দের নাম নেই। ৩১ মে, ১৮৯৩, যখন বোম্বাই থেকে তিনি জাহাজে ওঠেন, তখন তাঁকে বিদায় দিতে জাহাজঘাটায় সামান্য কয়েকজন মাত্র উপস্থিত ছিলেন।১০ এখনো জানিনা, তাঁর যাত্রাসংবাদ খবরের

---

১০ মহেন্দ্রনাথ আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছ থেকে শুনে স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রাকালীন দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে তা এইরকম :

"মুন্শি জগমোহনলাল, আলাসিঙ্গা এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তি স্বামীজীকে জাহাজে তুলিয়া দিতে সঙ্গে যাইলেন। স্বামীজীর আর গৈরিক বসন, নগ্ন পদ নাই। জুতা ও বুট পরিয়াছেন, ট্রাউজার পরিয়াছেন, এবং একটি লম্বা কোট। তিনি উন্মনা হইয়া জাহাজের ডেকে পায়চারি করিতেছেন—একবার যেন ভারতবর্ষ ও একবার আমেরিকা তাঁহার চোখের সামনে আসিতেছে। পায়চারি করিতে-করিতে কখনো স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন, মাঝে মাঝে চুরুট টানিতেছেন, কিন্তু কোনো কথা কহিতেছেন না। মুন্শি জগমোহনলাল পূর্বে স্বামীজীকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়া-

কাগজে উঠেছিল কি না! অপরদিকে এইটুকু জানতে পেরেছি—ভিক্ষার টাকায় তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন এবং সেখানে পেঁছে আর্থিক ও অন্যান্য বিপাকে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। ধর্মমহাসভায় যোগদানের আগে আমেরিকায় তাঁর গতিবিধি, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়, 'অখ্যাত' মানুষটির ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্বন্ধে স্থানীয় স্বীকৃতির ইতিহাস অসামান্য পরিশ্রমে উদ্ধার করেছেন মেরী লুই বার্ক। 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকাঃ নিউ ডিসকভারিজ্' নামে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থটি (গ্রন্থটি অতঃপর সংক্ষেপে 'ডিসকভারিজ্' নামে অভিহিত হবে) এখন সুপরিচিত। কিন্তু বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় যোগদানের পূর্বে ভারত-ইতিহাসের কোনো পরিজ্ঞাত ব্যক্তি নন; যে-পর্যন্ত না তাঁর সাফল্য সংবাদ ভারতে প্রচারিত হচ্ছে, সে অবধি তিনি কার্যতঃ অজ্ঞাতপরিচয়। অপর প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে সেকথা বলা চলবে না। তাঁদের অনেকেই সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত ; অনেকের পিছনে রয়েছে সংবাদপত্রের সমর্থন। সুতরাং তাঁরা কবে কখন যাত্রা করলেন ও পেঁছিলেন, কিভাবে বিদেশে গৃহীত হলেন, সেসব কথা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছিল। সে সকল সংবাদের মধ্যে বিবেকানন্দের নাম নেই' কারণ থাকার কথা নয়—ইতিহাসের মঞ্চে নায়কের নাটকীয় প্রবেশের ভাগ্য নিয়ে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু এই বিচিত্র নাটক যেহেতু বিধাতার রচনা, তাই এর নায়ক পূর্বে থেকে জানতে পারেননি—প্রবেশ নির্গমনের কালাকাল! ডাঃ বারোজ চেয়েছিলেন—ভারতীয় প্রতিনিধিরা একত্রে আমেরিকায় আসুন—তাঁদের অভ্যর্থনাসহ গ্রহণ করা হবে। তাঁরা তাই এসেছিলেন। তাঁরা পরিচয়পত্রসহ প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা কেউ অনাহূত অবাঞ্ছিত নন। তাঁদের কাউকে নির্বোধ বলা যায় না। আমেরিকার জনারণ্যে উদ্‌ভ্রান্ত বিবেকানন্দ আত্মধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন—'আমিই নির্বোধ, আমি প্রস্তুত হয়ে আসিনি।' মাত্র একমাস। তারপরেই 'অপ্রস্তুত' ও 'নির্বোধে'র জয়রব ভারতের প্রান্তে-প্রান্তে ধ্বনিত হবে। সেই জয়রবই হবে নবভারতের উদ্বোধনমন্ত্র। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিবেকানন্দ কোনো অস্তিত্বই নন—এইটাই ইতিহাসের সুমহান রসিকতা!

ছিলেন এখন অন্য বেশে দেখিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, রাজতরফে তিনি অনেক ইংরাজের সহিত মিশিয়াছেন বলিয়া ইংরাজের পোষাক পরা তাঁহার বেশ জানা আছে। সেজন্য সতর্ক করিয়া স্বামীজীকে ট্রাউজার পরিবার পদ্ধতি শিখাইয়া দিতে লাগিলেন। স্বামীজী আপন মনে পায়চারি করিতেছিলেন তাই জগমোহনলালের কথা কানে যায় নাই। কিন্তু বারংবার একই কথা বলাতে তাঁহার যেন হুঁস হইল, নিজের ট্রাউজারের দিকে তাকাইয়া, জগমোহনের দিকে তীক্ষ্ণ নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, 'বাল্যাবস্থা হইতেই আমি এইরূপ পোষাকে অভ্যস্ত; এ বিষয়ে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবার আবশ্যক নাই।' তাঁহার তীক্ষ্ণস্বরে জগমোহন চমকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া একেবারে চুপ করিয়া গেলেন।" ('ঘটনাবলী', ২য়)

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতে ধর্মমহাসভা-অনুষ্ঠানের প্রাথমিক সংবাদ

॥ ১ ॥

বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ধর্মমহাসভার অধিবেশন চিকাগো শহরে শুরু হয়ে গেল ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩; সতের দিন পরে সমাপ্ত হল ২৭ সেপ্টেম্বর। ধর্মমহাসভার মহিমা সম্বন্ধে আমি দুইজনের উক্তি এই অধ্যায়ের সূচনায় উদ্ধৃত করব। প্রথমজন এক তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ; যিনি এই মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন বলে এই সমাবেশ দিব্যপুরুষের স্পর্শলাভ করেছিল, এই কথা পরবর্তীকালে লেখা হবে। দ্বিতীয়জন সুপ্রবীণ জার্মানদেশীয় পণ্ডিত, ফ্রেডরিক ম্যাক্সমুলার, যিনি সমগ্র পৃথিবীতে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী মনীষী-কর্মী বলে স্বীকৃত।

'পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের পক্ষে' দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন:

"অশোকের ধর্মসভা কেবল বৌদ্ধধর্মেরই সভা। আকবরের ধর্মসভা [সর্বজনীন ধর্ম-স্থাপন-] উদ্দেশ্যের অধিকতর নিকটবর্তী হইলেও তাহা ছিল বৈঠকী আলোচনাসভা মাত্র। সকল ধর্মের মধ্যে সেই প্রভুই বর্তমান—সমগ্র জগতে ইহা ঘোষণা করিবার দায়ভার আমেরিকার জন্যই সংরক্ষিত ছিল।"

"পৃথিবীতে এতাবৎ অনুষ্ঠিত মহত্তম বৃহত্তম সমাবেশের অন্যতম এই ধর্মমহাসভা গীতাপ্রচারিত সেই অপূর্ব শ্রেষ্ঠ মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে : যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'॥—যে যে-ভাব আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়া থাকে।

"সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং তাহার ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মান্ধতা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারেবারে নররক্তে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়াছে, এবং দেশের পর দেশকে নৈরাশ্যের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে। এইসকল ভয়ানক পিশাচেরা যদি না থাকিত, মানবসমাজ বর্তমানে আরও বহুগুণে উন্নত হইত। কিন্তু ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত। আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্মমহাসভার সম্মানে আজ প্রভাতে যে-ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহা সর্ববিধ ধর্মান্ধতা, অসি অথবা মসীর সর্ববিধ অত্যাচার, একই লক্ষ্যে অগ্রসর ব্যক্তিগণের হৃদয়স্থিত পারস্পরিক অনুদারতার মৃত্যুঘণ্টা-স্বরূপ হইবে।"

ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পরে, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল অভিযোগের বিষয়ে অবহিত থেকে, ম্যাক্সমুলার ১৮৯৩, ডিসেম্বর মাসে 'এরিনা' পত্রিকায় লিখেছিলেন:

"ধর্মমহাসভা হইতে বাস্তবে কি পাওয়া গিয়াছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। পৃথিবীর সর্বস্থানের সহস্র-সহস্র মানুষ এই প্রথম একত্রে প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছে—'হে আমার স্বর্গস্থ পিতা!' এবং প্রফেট মালাচির এই কথার সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছে : 'আমাদের সকলেরই কি সেই **একই** পিতা নহেন? সেই একই ঈশ্বর কি আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেন নাই?' [ধর্মমহাসভায়] তাহারা এই কথাই ঘোষণা করিয়াছে, 'যে-কোনো জাতির মধ্যে যে-

কেহ ঈশ্বর-ভীরু এবং ন্যায়রক্ষায় তৎপর, সেই ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য।' [ধর্মমহাসভায়] সমবেত তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, যাহারা ঈশ্বর-সন্ধানী তাহাদের নিকট হইতে ঈশ্বর দূরবর্তী নহেন। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া চলুন, কিন্তু ধর্ম অতি সহজ ব্যাপার। এবং ঐ অতি সহজ অথচ আমাদের পক্ষে পরম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি, ধর্ম-শস্যের সজীব শাঁসটুকু, আমার বিশ্বাস, প্রায় সকল ধর্মমতের মধ্যেই পাওয়া যায়, বাইরের খোসা-অংশে যতই তাহাদের পার্থক্য থাক না কেন। তাহার অর্থ কি ভাবিয়া দেখুন! অর্থ হইল—ধর্ম-সমূহের ঊর্ধ্ব অধঃ অন্তর ব্যাপ্ত করিয়া একটি ধর্ম রহিয়াছে, যাহা শাশ্বত ও সর্বজনীন ধর্ম, তাহারই মধ্যে বর্তমান আছে বা থাকিবে—কৃষ্ণ শ্বেত পীত অথবা লোহিত, যে-কোনো বর্ণের মানুষ।"

॥ ২ ॥

ধর্মমহাসভার 'প্রস্তুতি-সংবাদ' যেখানে পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলির বহু সহস্র স্তম্ভ অধিকার করেছিল, সেখানে তার বাস্তব অনুষ্ঠানসংবাদ যে আরও বহু সহস্র স্তম্ভ অধিকার করবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে? ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও যথাসম্ভব ঐ সকল সংবাদ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু প্রধান ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে ঐসকল সংবাদ **অবিলম্বে** যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয়নি। ভারতীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সম্বন্ধে বলা যায়, ধর্ম-মহাসভাকে বৃহৎ ব্যাপার ধরে নিয়েও পরাধীন ভারতের পক্ষে বহিঃপৃথিবীর তাত্ত্বিক বা ভাবগত আন্দোলনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার মতো মানসিক বা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তার ছিল না। রয়টারের কাছ থেকে টাটকা খবর কেনার মতো যথেষ্ট টাকা ভারতীয়-চালিত সংবাদপত্র-গুলির ছিল না। অপরদিকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি ১ সাম্রাজ্যস্বার্থ ও বাণিজ্যিক স্বার্থের বাইরের বিষয়ে অধিক মনোযোগী হবার কারণ খুঁজে পায়নি।

আলোচ্যকালে সংবাদপত্রের ব্যাপারে কলকাতার সর্বাধিক গুরুত্ব। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী, সাম্রাজ্যের প্রধান নগরী, এদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র। তখন কলকাতায় ভারতীয়-পরিচালিত তিনটি ইংরাজি দৈনিক—'ইণ্ডিয়ান মিরার,' 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট।' 'বেঙ্গলী' 'সঞ্জীবনী', 'ইণ্ডিয়ান নেশন', 'রইস অ্যাণ্ড রায়ত' ইত্যাদি কয়েকটি প্রভাবশালী ইংরাজি সাপ্তাহিকও আছে। বহুল প্রচারিত বাংলা সাপ্তাহিকও আছে (যাদের ফাইল এখন পাওয়া যায় না)। তদুপরি আছে ইংরাজ-চালিত তিনটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক—'স্টেটসম্যান', 'ইংলিশম্যান' ও 'ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ।' ভারতের অন্যত্র আরও কতকগুলি জবরদস্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক রয়েছে—এলাহাবাদে 'পায়োনীয়ার', বোম্বাইয়ে 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' এবং 'বোম্বে গেজেট,' মাদ্রাজে 'মাদ্রাজ মেল' এবং 'মাদ্রাজ টাইমস,' লাহোরে 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট,' পুনায় 'পুনা অবজারভার' ইত্যাদি। দেশীয়দের ইংরাজি পত্রিকার ব্যাপারে মাদ্রাজের স্থান কলকাতার পরেই—সেখানে আছে 'হিন্দু' ও 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড।' বোম্বাই অঞ্চলে কিন্তু দেশীয়দের কোনো ইংরাজি দৈনিক ছিল না; অবশ্য পুনায় ছিল শক্তিশালী ইংরাজি সাপ্তাহিক—তিলকের 'মরাঠা।' তাঁর অধিকতর শক্তিশালী মরাঠি সাপ্তাহিক 'কেশরী'ও ছিল। লখনৌ-এর 'অ্যাডভোকেট' এবং লাহোরের 'ট্রিবিউন'—দেশীয়দের এই আর দুই গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি পত্রিকা। তালিকা দীর্ঘ করা যায়, প্রয়োজন নেই। তবে উল্লেখ্য এই, দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের কথা এখানে বিশেষভাবে বলিনি, কারণ প্রথমতঃ সেগুলির অধিকাংশের ফাইল এখন বিলুপ্ত,

১ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র বলতে বোঝায় ইংরাজ-পরিচালিত ভারতের ইংরাজি সংবাদপত্র।

দ্বিতীয়তঃ যেগুলি পাওয়া যায়, তার সব কটির মধ্যে প্রবেশ করাও সম্ভব হয়নি ভাষাগত অসুবিধার জন্য। সংবাদপত্রের সঙ্গে আমরা সাময়িকপত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছি এই রচনায়, যাদের অনেকগুলি গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ আবার অনেকগুলি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর পত্রিকা। কোনো-কোনো সংবাদপত্র সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্যে পরে করব।

প্রথমে ধর্মমহাসভা-অনুষ্ঠানের যে-সকল সংবাদ এদেশের পত্রিকায় বেরিয়েছিল, তার থেকে দুটিকে নির্বাচন করে উপস্থিত করছি। প্রথমটি বৌদ্ধ-মুখপত্র 'মহাবোধি' থেকে সংকলিত। এটি ধর্মমহাসভা শেষ হয়ে যাবার অনেকদিন পরে, এপ্রিল ১৮৯৪-এর 'মহাবোধিতে' বেরিয়েছিল, যদিচ আকর-সংবাদটি বেরোয় আমেরিকায় 'সেণ্ট লুই অবজারভার' কাগজে ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখে।—

"দুই বৎসরের বেশি সময়ের শ্রমসাধ্য প্রস্তুতির পরে, উদ্বেগ, উচ্চ আশা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মমহাসভার যে-উদ্বোধন দিন-ক্ষণটির প্রতীক্ষা করা হয়েছিল—তা সমাগত।...

"নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব থেকে [ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান-] ভবনটি ঝাঁকে-ঝাঁকে প্রতিনিধি ও দর্শকের দ্বারা একেবারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল—আর কলম্বাস হল আকীর্ণ ছিল এদেশ ও বিদেশের চার হাজার উৎসুক মানুষের দ্বারা। সকাল দশটার সময়ে হলের মধ্যবর্তী পথে বহু দেশের পতাকার নীচে দিয়ে হাতে হাত দিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চললেন পৃথিবীর ডজনখানেক ধর্মমতের প্রতিনিধিরা—বিরাট দর্শকমণ্ডলীর সোৎসাহ হর্ষধ্বনি তখন উচ্ছ্বাসে-উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ছিল। তারই মধ্যে দেখা যাচ্ছিল মঞ্চটি—অপূর্ব চিত্রবৎ—সুন্দর, মনোহারী। মঞ্চের একেবারে কেন্দ্রে রাজকীয় চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন উজ্জ্বল রক্তবর্ণ পোষাক-পরিহিত যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মাচার্য—কার্ডিনাল গিবনস্। তাঁর দুই পার্শ্বে প্রাচ্য প্রতিনিধিরা, যাঁদের বহু বর্ণের পরিচ্ছদ নিজ ঔজ্জ্বল্যে ঝলসিত। ব্রহ্ম, বুদ্ধ এবং মহম্মদের ঐসকল অনুগামীদের মধ্যে নয়নহরণকারী ছিলেন রক্তিম বর্ণৈশ্বর্যময় পোষাকে আবৃত বোম্বাইয়ের বাগ্মী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—পীতবর্ণের বৃহৎ পাগড়ি-জড়ানো তাঁর মুখমন্ডল যেন ব্রোঞ্জনির্মিত। তাঁর পাশে উপবিষ্ট কমলা ও শ্বেতবস্ত্রে সজ্জিত ব্রাহ্মসমাজের বি বি নাগরকর এবং সিংহলের বৌদ্ধপন্ডিত ধর্মপাল। শেষোক্ত জন সাড়ে সাতচল্লিশ কোটি বৌদ্ধের অভিনন্দন বহন করে এনেছেন। তাঁর নমনীয় লঘু শরীর বিশুদ্ধ শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং কুঞ্চিত কেশ স্কন্ধোপরি লম্বিত।

"প্রায় পাদরী-জনোচিত কৃষ্ণ-ধূসর পোষাক পরে প্রাচ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ব্রাহ্মসমাজের এই নেতা কয়েক বৎসর হল এই দেশ পরিভ্রমণ করে গেছেন। সেই সময়ে তিনি তাঁর বাগ্মিতা ও ইংরাজি ভাষায় নিখুঁত দখলের দ্বারা বিপুল দর্শকদের আনন্দিত করেছিলেন।

"প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ডাঃ বারোজ বলেন ঃ 'আমি যথাসাধ্য এই কথাই আপনাদের জানাতে পারি, যাঁরা এই বিরাট কার্যে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কত না ব্যাপক এবং বহুমুখী! যাই হোক, আমি আমার অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ভক্তিমতী রমণীগণের উদ্দেশ্যে যাঁরা ধর্মমহাসভার পরিকল্পনার পোষকতা করে তার বাস্তব রূপায়ণের জন্য কাজ করে গেছেন। ধন্যবাদ জানাই, কলম্বিয়া এক্সপোজিশনের সভাপতি ও তাঁর সহকর্মীগণের উদ্দেশ্যে; ওয়ার্লডস্ কংগ্রেস অক্সিলিয়ারীর সভাপতির উদ্দেশ্যে, যাঁর ধৈর্যশীল বিপুলাকার পরিশ্রমের পূর্ণমূল্য একদিন স্বীকৃত হবে; এদেশের খ্রীস্টান ও সেকুলার সংবাদপত্রগুলির উদ্দেশ্যে, যাঁরা প্রথমাবধি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সাহায্য করে গেছেন; অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের নানা দেশভুক্ত তিন হাজারের অধিক নর-নারীর উদ্দেশ্যে; বহুসংখ্যক মিশনারিদের উদ্দেশ্যে, যাঁরা এই মহাসভার চরম মূল্য অনুভব

করবার মতো দূরদর্শিতা ও মুক্তদৃষ্টি দেখিয়েছিলেন; মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মিলারের উদ্দেশ্যে, যিনি তাঁর কণ্ঠ ও লেখনী আমাদের পক্ষে নিয়োজিত করেছিলেন; জাপানের বৌদ্ধ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে, যাঁরা এই ধর্মসম্মেলনের পক্ষে বলেছেন ও লিখেছেন; সিংহলের মিঃ ধর্মপালের উদ্দেশ্যে, দক্ষিণ ভারতে নিজ সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ রেখে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, আমেরিকার এই কেন্দ্রদেশে যিনি এসে হাজির হয়েছেন; মজুমদার ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে, যাঁরা এসেছেন ইংলণ্ডের মহান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনাকীর্ণ অংশ থেকে, যাকে সংগতভাবেই বলা হয় 'পৃথিবীর ধর্মসমূহের স্থায়ী বৃহত্তম মহাসভা'; চীনের ইম্পিরিয়াল গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্যে, যা তাঁর দেশের অন্যতম ধর্ম কনফুসীয় মতের পক্ষে বলবার জন্য জনৈক পণ্ডিত এবং যোগ্য প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছেন; অ্যাংলিকান, মেথডিস্ট, ইউনাইটেড ব্রিদরেন, আফ্রিকান মেথডিস্ট এবং অন্যান্য চার্চের বহুসংখ্যক বিশপের উদ্দেশ্যে; আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে, যাঁরা প্রয়োজনের সময়ে উদারভাবে সাহায্য করেছেন; এদেশের মহান ক্যাথলিক চার্চের উচ্চ পদাধিকারীদের উদ্দেশ্যে, যাঁরা ওয়াশিংটনের ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির উদারমনা সুপণ্ডিত রেকটরের মারফত সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন, যার জন্য আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উঠতে পারব না।

"এঁদের সকলকে আজ আমি অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। যাঁরা উপস্থিত নেই তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করছি প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা; এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ নমস্কার জানাচ্ছি আরো বিপুলসংখ্যক মানুষের উদ্দেশ্যে যাঁদের নাম আমি করিনি। অর্থডক্স গ্রীক চার্চ, রাশিয়ান চার্চ, আমেরিকান চার্চ, বুলগেরিয়ান চার্চ, ও অন্যান্য চার্চের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে আমি অতীব আন্তরিক অভ্যর্থনা ও নমস্কার জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, আপনারা সকলেই আমাদের সাহচর্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন, আর বিশ্বাস করি, আপনাদের আগমনে আমরা জ্ঞানলাভ করব।...

"স্বাগত জানাই সকলকে! স্বাগত, সুস্বাগত পৃথিবীর প্রথম ধর্মমহাসভা! স্বাগত, পৃথিবীর জাতি ও ধর্মসমূহের মধ্যে স্থায়ী অলৌকিক কাণ্ডের তুল্য ইহুদীধর্ম ও তার নরনারীগণ! স্বাগত, কুমার সিদ্ধার্থের অনুগামীগণ, যাঁরা কোটি-কোটি সংখ্যায় প্রভু বুদ্ধকে 'এশিয়ার আলোক' বলে বিশ্বাস করেন! জাপানের জাতীয় ধর্মের সর্বোচ্চ পুরোহিতকে স্বাগত জানাই। সূর্যোদয়ের দেশের আলোকপ্রাপ্ত শাসকের প্রতি এই শহরের কৃতজ্ঞতাবোধ করবার প্রভূত কারণ রয়েছে। স্বাগত জানাই ভারতের ধর্মসমূহ ও মানবগণকে। খ্রীস্টের সকল শিষ্যকে স্বাগত জানাই। এই সম্মেলনের উপরে ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হোক—তা বর্ষিত হোক ১২০ কোটি মনুষ্যের উপরে যাদের ধর্মমতসমূহের প্রতিনিধিদের এখন আমি সম্বোধন করছি।"

এবার পুনার 'মরাঠা' পত্রিকায় ২৯ অক্টোবর ১৮৯৩-তে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ 'নিউজ লেটার' থেকে অংশ উদ্ধৃত করছি। এটি ধর্মমহাসভা চলাকালে ১৮ সেপ্টেম্বর এবং ২১ সেপ্টেম্বর লিখিত হয়েছিল। উপরে উদ্ধৃত বর্ণনার সঙ্গে মোটামুটি ঐক্য থাকলেও এই বর্ণনাটির নিজস্ব স্বাদ আছে, এবং এটি সম্ভবতঃ কোনো ভারতীয়ের লেখা।—

"চিকাগো বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীর আকর্ষণকেন্দ্র। বিশ্বমেলা এ-যুগের বিরাট ঘটনা, আর সেই বিশ্বমেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পৃথিবীর ধর্মসমূহের মহাসম্মেলন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য অনুষ্ঠান এটি। এর পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ভূমণ্ডলের সকল স্থানে উদ্‌গ্রীব কৌতূহলের সঙ্গে এর বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, এই ধর্মসমূহের পার্লামেণ্টের শুভ উদ্বোধন হয়। ঐদিন সকাল আটটা থেকেই মহাসভার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত অপূর্ব কলম্বাস-হলে অসাধারণ ব্যস্ততা, কলরব ও চাঞ্চল্য দেখা যায়। কলম্বাস-হল বিরাটাকার; বিস্তৃত আয়তাকার স্থানের তিন দিকে গ্যালারি; গ্যালারি ও হলে চার হাজারের বেশি লোক বসতে পারে। উদ্বোধনের নির্ধারিত

সময় সকাল দশটা. কিন্তু ন'টার অনেক আগে থেকেই হল ভর্তি। দশটার সময়ে দেখা গেল, বসা তো দূরের কথা, দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। হল ও গ্যালারিতে ঠাসাঠাসি। ঠিক সাড়ে দশটায় কমিটির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ জে এইচ বারোজ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করলেন। প্রতিনিধিরা যখন দুই সারি হয়ে বিশাল মঞ্চে উঠে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন তখন বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলী দাঁড়িয়ে উঠে সমুচ্চ হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়লেন—যতক্ষণ না সকল প্রতিনিধি আসন গ্রহণ করলেন, ততক্ষণ সেই সংবর্ধনা-শব্দ থামেনি। সুমহান দৃশ্য। বিস্তৃত সভাগৃহ ধ্বজ-পতাকায় অপূর্ব সজ্জিত—প্রশস্ত মঞ্চের উপরে ভূমণ্ডলের অতি দূর প্রান্তেরও ধর্মমতের প্রতিনিধিরা, মহিলা ও পুরুষেরা আসীন। ইউরোপের প্রায় সকল দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত; মিশর, এশিয়া মাইনর, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আফ্রিকা, এবং আমাদের নিজ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরাও আছেন। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে মঞ্চে ছিলেন : কলকাতার ব্রাহ্ম মিঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বোম্বাইয়ের ব্রাহ্ম মিঃ বলবন্ত ভাউ নাগরকর, বোম্বাইয়ের জৈন মিঃ বীরচাঁদ গান্ধী, এলাহাবাদের ব্রাহ্মণ থিয়জফিস্ট বাবু জি এন চক্রবর্তী, বাংলার প্রগতিশীল ব্রাহ্মণ স্বামী বিবেকানন্দ, সিংহলের অন্তর্গত কলম্বোর বৌদ্ধ মিঃ এইচ ধর্মপাল, এবং আরও কয়েকজন যাঁদের নাম আমি বার করতে পারিনি। খুব আনন্দের বিষয়, অতীব যোগ্যতার সঙ্গে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। স্থানীয় সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে আপনারা দেখবেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে ভারতের স্থান উঁচুতে নির্ধারিত। খ্রীস্টান, মুসলমান, ইহুদী, জেণ্টাইল, হিন্দু, পার্শী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট, অতীব রক্ষণশীল কিংবা অতি উদার—সকলেই এক মঞ্চে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে উপবিষ্ট। এই প্রথম পৃথিবীর ইতিহাসে একটি শান্তিপূর্ণ সম্মেলন হল যার উদ্দেশ্য, পৃথিবীর ধর্মমতসমূহের মূলে কোন্ অপরিবর্তনীয় চিরন্তন নীতি নিহিত আছে তার সম্বন্ধে সাধুতা বিশ্বস্ততা ও বিবেকবোধের সঙ্গে ঘোষণা করা। সেখানে উপবিষ্ট সকলের মুখেই ঐকান্তিকতার ছাপ, প্রত্যেকেই জাতীয় পোষাকে আচ্ছাদিত, মনে হয়েছিল পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বহুপ্রত্যাশিত শান্তি ও শুভেচ্ছার দিন বুঝি এসে গেছে। নিঃসন্দেহে এখন থেকে ধর্মের ইতিহাসে নূতন যুগের সূত্রপাত হল, এবং এই সম্মেলন ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন জাতির সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে।

"সকলে আসন নেবার পরে বিরাট ঘণ্টায় ধীরে, নির্দিষ্টভাবে, শতবার আঘাত করা হল—প্রত্যেক ধর্মের সম্মানে একটি ধ্বনি। প্রতিটি ধ্বনিই এত গম্ভীর ও দীর্ঘায়ত যে, মনে হল, সভাগৃহে একেবারে অকম্পিত স্তব্ধভাবে উপবিষ্ট পাঁচ সহস্র মানুষের আত্মায় তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মনে হল, এতদিন পর্যন্ত মানবসমাজে ধর্মের নামে যে-সকল গোঁড়ামি, উৎপীড়ন, অত্যাচার সংঘটিত হয়ে ভেদবৈষম্যের বীজ বপন করেছে, এই ঘণ্টাধ্বনি তাদের সমাধির ঘণ্টাধ্বনি। সভাগৃহে উপস্থিত প্রতিটি প্রাণ তার চরম তাৎপর্য অনুভব করল—অনুষ্ঠান-পরম্পরার গাম্ভীর্যে প্রভাবিত ও অভিভূত হল গভীরভাবে। ঘণ্টাধ্বনির তরঙ্গ যখন মিলিয়ে গেল, বিশাল সমাবেশ তখন উঠে দাঁড়িয়ে আন্দোলিত সুরে সুমহান বন্দনাগীতি গেয়ে উঠল সমস্বরে :

"হে জাতিসমূহ, দাও জয় ঈশ্বরের!
হে দেশসমূহ, তোলো উচ্চে কণ্ঠস্বর!
আকাশ পৃথিবী জুড়ে মহা ঐকতান—
জয় প্রভু জয় তব, জয় রাত্রি দিন।...
"বলো ধন্য, যে-তুমি জেনেছ তাঁর প্রেম!
বলো ধন্য, গুহাহিত গভীরের স্বরে!

বলো ধন্য, ঊর্ধ্বলোকে অসীম আকাশে!
ধন্যধ্বনি দাও প্রতি নিঃশ্বাসে স্রষ্টার!

"সঙ্গীতের পরে সর্বজনীন প্রার্থনা ঃ 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা!' ইত্যাদি। প্রার্থনার শেষে প্রতিনিধি ও শ্রোতৃমণ্ডলী আসন গ্রহণ করলে উঠে দাঁড়ালেন সৌম্য, কম্র-আকার প্রেসিডেন্ট সি সি বনি। সহৃদয় অনুরাগপূর্ণ ভাষণে তিনি প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি অল্প বলেছিলেন—বেশি বলতে পারতেন না তা নয়, কিন্তু ভাবাবেগে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, বেশি বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তারপর বলেছিলেন ডাঃ জে এইচ বারোজ। অতি উদ্দীপনাময় সাবলীল ভাষণে প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ও কার্যধারার রূপ বিবৃত করেন। ডাঃ বারোজ উদার মতের ও প্রশস্ত হৃদয়ের বিশিষ্ট প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মযাজক। তিনি ধর্মমহাসভার অক্সিলিয়ারি কমিটির প্রেসিডেন্ট। এই মহাসভা প্রধানতঃ তাঁর পরিকল্পনায় সংগঠিত হয়েছে।...এঁর অভ্যর্থনা-ভাষণের পরে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও অভ্যর্থনা জানান।...কয়েকজন প্রতিনিধি সংক্ষেপে সংবর্ধনার উত্তর দেন।" [অ]

'মরাঠা'র এই দীর্ঘ 'নিউজ লেটারে' আরও অনেক সংবাদ ছিল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দর্শকেরা অব্যাহত আগ্রহে প্রতিনিধিদের, বিশেষতঃ ভারতীয় প্রতিনিধিদের, ঘিরে ছিল, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছিল, যা অশালীন কৌতূহল নয়, যথার্থ জিজ্ঞাসা। 'তাঁরা কদাপি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে, নিন্দা-কুৎসা করতে, বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে আসেন নি, যথার্থ শিক্ষার্থীর মন নিয়ে এসেছেন।' ধর্মমহাসভার উদ্বোধনের এক সপ্তাহ পরেও দর্শকদের আগ্রহ এতটুকু কমেনি, এবং মূল কলম্বাস-হল উপচে শ্রোতারা পার্শ্ববর্তী নানা হলে হাজির হয়, সেখানে 'এথিক্যাল', 'সেক্যুলার', 'থিয়জফিক্যাল', 'ফ্রি রিলিজিয়ানস্', 'এভল্যুশন' প্রভৃতি নানা সোসাইটি বা অ্যাসোসিয়েশনের সভা হয়েছে। এর ফলে 'আর্ট ইনস্টিটিউট অবিরাম মানসিক ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের কেন্দ্রভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে।' 'পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে দর্শকেরা সমবেত; নানা পরিবেশে তাঁরা লালিত-পালিত', তাঁদের রুচির আচরণের ভিন্নতা সবিশেষ, কিন্তু এখন, এই সভাগৃহে তাঁরা চার হাজার প্রাণের বিশাল সমুদ্র।

॥ ৪ ॥

ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে সত্বর সংবাদ বেশি বেরিয়েছিল নববিধান সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'মিনিস্টার' কাগজে। তার কারণ সম্ভবতঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সেগুলি সরাসরি এই পত্রিকায় সরবরাহ করেছিলেন। গোড়ার দিকে মিনিস্টারে প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ প্রায় নেই—কেন নেই তা দেখাবার জন্যও সংবাদগুলির সারাংশ উপস্থিত করার প্রয়োজন আছে।

ধর্মমহাসভা শুরু হবার কয়েকদিনের মধ্যে এই পত্রিকার ১৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ডাঃ বারোজ-প্রেরিত সংবাদ সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বিবেকানন্দের নামোল্লেখ পাচ্ছি ভুল বানানে—*Vurkananda*—এবং আমাদের সন্ধানমতো, এইটেই ভারতীয় পত্রিকায় প্রথম 'বিবেকানন্দ' নামের উল্লেখ। সংবাদটি প্রকাশকালে মিনিস্টার-সম্পাদক অন্যান্য ধর্মের আচার্যদের বাদ দিয়ে ভগবান্ যীশুর প্রতি একান্ত ভক্তি প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত মন্তব্যের কিছু অংশ ঃ

"The Chicago Parliament of Religions was opened on Monday last. The following private telegram has been received from Dr. Barrows

of Chicago, Chairman of the Committee of Parliament of Religions through Reuters agency on Tuesday morning :

" 'Religious Parliament opens with great success. Noble speeches by Mozumdar, Dharmapala, Nagarkar, Chakraborti, Vurkananda, Gandhi, Sorabji.'

"The 11th of September last is no doubt a memorable day in the history of religion. It is the commencement of a new era in the religious world. About nineteen hundred years ago when Christ was born and taught the people, a new start was given to the religious life of the world. His spirit was in the world to mould the minds of men to his full stature...Let the sectarians, in their misguided zeal to glorify Christ, say what they like against the noble movement, the fact cannot be gainsaid that the Parliament of Religions aims only at the glorification of the Prince of peace."

পরের সপ্তাহে, অধিবেশন তখনো চলছে, ২৭ সেপ্টেম্বর এই পত্রিকা আবেগভরে লিখল : 'আমরা যখন এই কথাগুলি লিখছি, তখন মহান ধর্মমহাসভায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে সদস্যগণের চিত্তোন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করে চলেছেন। তাঁদের কাছ থেকে বিশাল সমুদ্রের দ্বারা যদিও আমরা বিচ্ছিন্ন, তবু অনুভব করছি আমাদের আত্মা সেখানে উপস্থিত রয়েছে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ অভিবাদন জানাচ্ছে সমবেত প্রতিনিধিদের।'

একই রচনার মধ্যে ধর্মমহাসভা-বিরোধীদের সমালোচনা একদিকে, অন্যদিকে সকল ধর্মকে একাসনে বসানোর নিন্দাও। পরিশেষে আতঙ্কিত খ্রীস্টান মিশনারিদের প্রবোধদান --ভয় নেই, ভয় নেই, ধর্মমহাসভায় খ্রীস্টীয়তার জয় হবে, হবে জয়।—

"The Parliament of Religions opens up the gate of a golden era —an era which shall purge of all un-Christian elements form the different systems of faith—both Christian and non-Christian, and unite them all in Christ".

এই পত্রিকার ২২ অক্টোবরের সম্পাদকীয়তে ধর্মমহাসভার সূচনার বর্ণনা ছিল, সেইসঙ্গে ডাঃ বারোজের উদ্বোধনী ভাষণের উচ্ছ্বসিত স্তুতি, এবং মজুমদার ও নাগরকরের ভাষণের যথোচিত প্রশংসা। ডাঃ বারোজ তাঁর ভাষণে যে-মনোভাব দেখিয়েছেন, আশ্চর্য সে তো আমাদেরই মনোভাব, নববিধানের শিষ্য না হয়েও ঐ মনোভাব তিনি অর্জন করলেন কিভাবে?— এই উল্লসিত বিস্ময় পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিল। 'ওরিয়েণ্টাল ক্রাইস্ট' গ্রন্থের লেখকরূপে পরিচায়িত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কিভাবে তাঁর ভাষণে কেশবচন্দ্র সেন-প্রবর্তিত নববিধান আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছিলেন, সে কথা পত্রিকাটি বিশেষভাবে লিখেছিল। মানব-সমাজ একদিন নববিধানের আদর্শ গ্রহণ করবেই— মজুমদার যখন নিশ্চিত বিশ্বাসে এই কথা বলেছিলেন, তখন মুহুর্মুহু উল্লাসধ্বনি ও রুমাল নাড়ানোর দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তাও আমরা উক্ত রচনা থেকে জেনেছি।

এই পত্রিকার ২৯ অক্টোবর সংখ্যায় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে মজুমদারের ভাষণের যে-অংশ উদ্ধৃত হয়েছে তা মজুমদার এবং এই পত্রিকার নববিধানী উদারতার সকল গাহনা সত্ত্বেও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেখিয়ে দেয়, হিন্দুধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা অন্য ধর্মশাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে এঁদের আকর্ষণ কত বেশি। মজুমদারের ভাষণে পাই, তিনি সগৌরবে জানিয়েছিলেন, কিভাবে তাঁরা

হিন্দুশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বিষয়ক ধারণাকে ছেড়েছিলেন, এবং কিভাবে বাইবেলকে পেয়েছিলেন। ২

একই তারিখের 'মিনিস্টারে' আমেরিকার 'আউটলুক' পত্রিকা থেকে ধর্মমহাসভার বিবরণ সংকলন করা হয়, যার মধ্যে সূচনা দিবসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের অনেক নাম পাচ্ছি—সেখানে কিন্তু বিবেকানন্দের নাম নেই। নাম না থাকার কারণ এই নয় যে, 'আউটলুক'-এর মতো গোঁড়া খ্রীস্টান কাগজ বিবেকানন্দকে অব্যাহতি দিয়েছিল, আসল কারণ, তাঁকে অব্যাহতি দিতে চেয়েছিল 'মিনিস্টার' পত্রিকা! ৩

---

২ মজুমদার ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ যেহেতু হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল, সে কারণে পৃথক হওয়া ব্যাপারটিকে সমর্থন করার তাগিদ তিনি বোধ করেছিলেন। ফল দাঁড়িয়েছিল--উক্ত বক্তৃতায় তিনি যেন হিন্দুশাস্ত্রকে মূল্যহীন প্রমাণ করতেই সচেষ্ট। তবু তাঁর মূল বক্তৃতায় যেটুকু ভারসাম্য ছিল, 'মিনিস্টার' কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। ঐ রিপোর্ট পড়ে মনে হয়, হিন্দুশাস্ত্র অভ্রান্ত নয়, এইকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলের নির্বিচার জয়ঘোষণা করাই মজুমদারের উদ্দেশ্য। আমি 'মিনিস্টারে'র রিপোর্টের সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে বর্জিত অংশ যোগ করে দিচ্ছি *Lectures in America and Other Papers; P.C. Mozoomdar* (1955) বই থেকে ঃ

"Our brother [Mozoomdar] said : "So, twenty-one years after the foundation of the Brahmo Somaj, the doctrine of the infallibility of the Hindoo scriptures was given up. Then a further question came. The Hindoo scriptures are only not infallible ! Are there not other scriptures also ? [Did I not tell you the other day that on the imperial throne of India Christianity now sat with the Gospel of Peace in one hand and the sceptre of civilization in the other ? The Bible had penetrated into India ; its pages were unfolded, its truths were read and taught]. The Bible is the book which mankind shall not ignore (applause). [Recognising, therefore, on the one hand the great inspiration of the Hindu scriptures, we could not but on the other hand recognise the inspiration and authority of the Bible]. In 1861 [1867] we published a book in which extracts from all scriptures were given as the book which was to be read in the course of our devotions [doctrines]. [Our monotheism, therefore, stands upon all scriptures. That is our theological principle, and that principle did not emanate from the depths of our own consciousness ; it came as the natural result of the indewelling of God's Spirit within our fellow-believers. No,] it was not the Christian missionaries that drew our attention to the Bible ; it was not the Mahommedan priests who showed us the excellent passages in the Koran ; it is no Zoroastrian who preached to us the greatness of his Zend-Avesta ; but there was in our hearts the God of infinite reality, the Source of inspiration of all the book, of the Bible, of the Koran, of the Zend-Avesta, who drew our attention to his excellencies as revealed in the record of holy experience everywhere."

মজুমদারের প্রতি অবিচার করবার ইচ্ছা আমাদের নেই, যা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে করেছিলেন 'মিনিস্টার'-সম্পাদক, মজুমদারকে অভ্রান্ত বাইবেলের অন্ধ পূজকরূপে হাজির করে। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করতে হয়, মজুমদার বাইবেল, কোরান, জেন্দ-আবেস্তার নাম করে উঠতে পারলেন, কিন্তু কোনো হিন্দুশাস্ত্রের নাম করবার চেষ্টামাত্র করলেন না! করা সম্ভবও ছিল না, কারণ বেদ অভ্রান্ত নয়, এবং গীতা বলেছেন কেলেংকারী-কারী কৃষ্ণ, যাঁর নাম মিশনারি-সমাজে উচ্চার্য নয়!!

৩ 'আউটলুক'-এর মত কাগজ সত্যই বিবেকানন্দকে রেয়াত দিতে পারে না, যখন তিনি মিশনারিদের আক্রমণ করার মতো স্পর্ধা দেখিয়েছেন। লুই বার্ক ৭ অক্টোবর ১৮৯৩-এর 'আউটলুক'

'মিনিস্টার' এই সংখ্যায় এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে মজুমদারের ভাষণগুলি এবং তাঁর 'ওরিয়েণ্টাল ক্রাইস্ট' গ্রন্থ সম্বন্ধে আমেরিকান পত্রপত্রিকার প্রশংসা ছেপে যায়। প্রশংসাগুলি সবই সাম্প্রদায়িক খ্রীস্টান পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত। তারা মজুমদারের খ্রীস্টপ্রীতির প্রতি সদয় সমর্থন জানিয়েছিল। যীশু প্রাচ্যের মানুষ, প্রাচ্যের লোকে স্বতঃই তাঁকে পূজা করে—মজুমদারের এই নিবেদন বিশেষ রকম পিঠচাপড়ানি পেয়েছিল ঐসব পত্রিকা থেকে।৪

'মিনিস্টারে' ৫ নভেম্বরের সম্পাদকীয় রচনায় ধর্মমহাসভার নিন্দাকারীদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়। ধর্মমহাসভাকে 'religious managerie' বলা হয়েছিল। তার উত্তরে সরোষ দুঃখে এই পত্রিকা লেখে ঃ

"It is to say the least, simple blasphamy to stigmatise such a sacred assembly as a religious managerie."

অপরপক্ষে মিশনারি-প্রীতিতে আচ্ছন্ন এই পত্রিকার কষ্টের সীমা ছিল না এই দেখে যে, কোনো কোনো প্রাচ্য-প্রতিনিধি খ্রীস্টানদের বিদ্রূপ করবার দুর্মতি দেখিয়েছে! লজ্জিত ও অনুতপ্ত সুরে সম্পাদক লিখেছিলেন ঃ

"We admit that there were speakers who unfortunately proved unfaithful to the object for which they assembled. The ill-humoured remarks of the representatives of certain Asiatic religions were extremely unfortunate. They were uncalled for and unjustifiable taunts to the Christians who formed the bulk of the assembly and as such marred very much the spirit of harmony which was the life and soul of the great movement."

খ্রীস্টানদের সম্বন্ধে কিছু-কিছু প্রাচ্য-প্রতিনিধির অম্ল কথাবার্তা 'মিনিস্টার'-সম্পাদককে বিচলিত করতেই পারে, কারণ তিনি ও তাঁর দলভুক্তেরা আগে থেকেই খ্রীস্টানদের সহজ শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে রেখেছেন। তাঁদের ধারণা, খ্রীস্টানদের কাছে অবনমিত হওয়ার নামই তাদের সঙ্গে 'হার্মনাইজড্' হওয়া, এবং যদি এ'রা খ্রীস্টানপক্ষে কিছু দর্প বা মুরুব্বিয়ানা দেখেন, তাকে না দেখতেই এ'রা অভ্যস্ত। প্রাচ্য-প্রতিনিধিদের 'ইল্ হিউমার্ড' ভাষণের নমুনা, ধরা যাক, মহাসভার নবম দিনে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি, যার রিপোর্ট ৭ ডিসেম্বরের 'মিরারে' এইভাবে বেরিয়েছিল (আমেরিকান সংবাদপত্রের সাক্ষাৎ বিবরণ অবশ্যই 'মিনিস্টার'-দপ্তরে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল) ঃ

থেকে অংশ উপস্থিত করছেন ঃ

"..The subject of Christian work in India calls Vivekananda, in his brilliant priestly orange, to his feet. He criticises the work of Christian missions. It is evident that he has not tried to understand Christianity, but neither, as he claims, have the priests made any effort to understand *his* religion, with its ingrained faiths and race-prejudices of thousand of years' standing. They have simply come, in his view, to throw scorn on his most sacred beliefs, and to undermine the morals and spirituality of the people he has been set to teach."

['ডিসকভারিজ্']

৪ 'মিনিস্টার' ২৯ অক্টোবর সংখ্যায় খ্রীস্টান পত্রিকাগুলি থেকে মজুমদারের প্রশংসা উদ্ধৃত করে। 'দি ক্রীশ্চান রেজিস্ট্রার', 'দি কনগ্রিগেশন্যালিস্ট' ও 'দি ক্রিটিক' পত্রিকা থেকে মজুমদার ও তাঁর গ্রন্থের প্রশংসা হাজির করা হয়েছে। ৫ নভেম্বর সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে 'দি ক্রীশ্চান রেজিস্ট্রার' ও 'দি আউটলুক' পত্রিকার অনুকূল মন্তব্য।

চিকাগোয় ধর্মমহাসভা

হিন্দু কর্তৃক খ্রীস্টানধর্মের সমালোচনা

মিঃ বিবেকানন্দ বলেন, বেদের ধর্ম প্রেমের ধর্ম

বিবেকানন্দ বলেন, খ্রীস্টধর্ম অসহিষ্ণু

ডঃ নোবল অপরাহ্নের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কলম্বাস-হল ছিল ঠাসাঠাসি-ভর্তি।...ডাঃ নোবল তারপর হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করেন। যখন তিনি অগ্রসর হয়ে মঞ্চের মধ্যভাগে উপস্থিত হন, তখন তাঁকে উচ্চ করতালি-ধ্বনিতে অভিনন্দিত করা হয়। তিনি পীতবর্ণের আলখাল্লা পরেছিলেন, যা উজ্জ্বল লাল রঙের কোমরবন্ধনীতে আবদ্ধ। মাথায় ফিকে হলুদ রঙের পাগড়ি। তাঁর পরম সুন্দর মুখে ভদ্রতার হাসি, এবং সজীব উজ্জ্বল চক্ষু। তিনি বললেন ঃ

"আমরা যারা প্রাচ্যদেশ থেকে আগত, দিনের পর দিন মঞ্চে বসে এই মুরুব্বিয়ানার বচন আমাদের শুনতে হয়েছে—আমাদের উচিত খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করা, কারণ খ্রীস্টান দেশগুলি সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী! আমরা চারিদিকে তাকিয়ে দেখি—দেখি যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পন্ন খ্রীস্টান দেশ ইংলণ্ড, দাঁড়িয়ে রয়েছে ২৫০,০০০,০০০ এশিয়াবাসীর গলার উপরে পা দিয়ে। আমরা ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরে তাকাই, দেখি যে, খ্রীস্টান ইউরোপের সমৃদ্ধির সূচনা স্পেন থেকে। সেই স্পেনের সমৃদ্ধির শুরু মেক্সিকো অভিযান থেকে। খ্রীস্টান জাতির সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে তাদেরই মতো মানুষের গলা কেটে। এই মূল্যে হিন্দুর সমৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।"৫

৫ নভেম্বরের 'মিনিস্টারে'র এই সম্পাদকীয়তে ডাঃ বারোজের সমাপ্তি-ভাষণের উন্মত্ত প্রশংসা করে বলা হয় ঃ

'It represents the highest religious genius of the present age.'

প্রশংসার হেতু, অবশ্যই, নববিধানের আদর্শের সঙ্গে ডাঃ বারোজের দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য। অন্ততঃ পত্রিকাটি তাই বলেছিল।

এই তারিখের সংখ্যাতেই মজুমদারের ভাষণ প্রকাশ করে বলা হয়, কেন তাঁর ভাষণ উচ্চাঙ্গের। মজুমদার তাঁর ভাষণে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন-প্রদত্ত *Asia's Message*

৫ গর্বিত খ্রীস্টানী সভ্যতাকে বিবেকানন্দের প্রচণ্ড আক্রমণের রিপোর্ট এরও আগে, ২৮ নভেম্বর 'মিরারে' বেরিয়ে গেছে। 'বিবেকানন্দ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ' অধ্যায়ে এইসব বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

মিশনারিদের আচরণে উত্ত্যক্ত আরও অনেক প্রাচ্য প্রতিনিধি অভিযোগ করেছিলেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪-এর মাদ্রাজ টাইমস-এ পাই, কনফুসীয় প্রতিনিধি মাননীয় পং কোয়াং য়ু ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে খুব দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, খ্রীস্টান মিশনারিরা নিজ পতাকার অন্তরালে দুর্বৃত্তদের আশ্রয় দিচ্ছেন। মিশনারিদের নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তি এবং পড়াশোনার অভাবের কথাও তিনি বলেন। উচ্চ চরিত্রের চীনাদের ধর্মান্তরিত করতে সমর্থ না হয়ে দূষিত চরিত্রের মানুষকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে, এবং সেটাই হল চীনে মিশনারিদের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণ ঃ

"The cause of all the periodical outbreaks on the part of the Chinese people against the missionaries may," he [the Hon. Pang Kwang Yu] says, "be traced to the haste on the part of the missionaries themselves to secure proselytes without instituting a searching enquiry into their moral character."

to Europe থেকে অংশ উদ্ধৃত করেন, যার মধ্যে দেখতে পাই, কেশবচন্দ্র যে-ধর্মসভার কল্পনা করেছিলেন, তা খ্রীস্টানধর্মের ছত্রছায়ায় সংগঠিত হবে। মজুমদার কেশবের উক্তি উদ্ধৃত করার পরে বলেছেন, কেশবের সেই সুমহান কল্পনা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। ৬

পরের সপ্তাহে, ১২ নভেম্বর সংখ্যায় বিভিন্ন আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের বিষয়ে মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছিল, কিন্তু বিবেকানন্দের নাম তার মধ্যে দেওয়া হয়নি।

এই সংখ্যাতেই এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মজুমদারকে তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দিত করা হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমেরিকার কাগজপত্র পড়ে এই পত্রিকার সম্পাদক দেখেছেন (তাই তিনি জানিয়েছেন), মজুমদারের প্রয়াস বিশেষভাবে সাফল্য-মণ্ডিত। ৭ মজুমদারের সাফল্যে সন্দেহ করার কারণ নেই, কিন্তু যদি বলা যায়, মজুমদারের মিশনই 'পারটিকুলারলি সাকসেস্‌ফুল', তাহলে ধরে নিতে হবে, এই পত্রিকার অফিসে গোঁড়া খ্রীস্টান পত্রিকা ছাড়া আর কিছু আসত না কিংবা সম্পাদক সত্যগোপন করেছেন। মজুমদার প্রাচ্য-প্রতিনিধিদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তপ্ত অভ্যর্থনা লাভ করেছেন, এই কথা জানাতে সম্পাদক যে-পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তার নাম—'দি ক্রীশ্চান রেজিস্ট্রার!!' ৮

এই রচনাতেই দেখি, পত্রিকা-সম্পাদক বলছেন, মজুমদারই কেশবচন্দ্রের যোগ্য বাণীবাহক ও ব্যাখ্যাতা, যদিও একই পত্রিকার পৃষ্ঠায় অল্পদিনের মধ্যে কার্যতঃ বিপরীত কথাই লেখা হবে। এইসঙ্গে দুটি খ্রীস্টান পত্রিকা থেকে মজুমদার-বিষয়ক প্রশংসা উদ্ধৃত হয়। 'ক্রীশ্চান রেজিস্ট্রার' পত্রিকা পরিষ্কার বলেছিল, মজুমদার ভারতে যা করেছেন, তা কোনো ক্রীশ্চান মিশন করতে সমর্থ হয়নি।৯ আর ইউনিটারিয়ান খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'ইউনিটারিয়ান'

---

৬ মজুমদার কেশবের নিম্নের কথাগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন :

"Here will meet the world's representatives, the foremost spirits, the most loving hearts, the leading thinkers and devotees of each church, and offer unified homage to the King of Kings and the Lord of Lords. This central union church is no utopian fancy, but a veritable reality, whose begining we see already among the nations of the earth...

"Believe me, the time is coming when the more liberal of the Catholic and Protestant branches of Christ's church will advance and meet upon a common platform and form a broad Christian community, in which all shall be identified, in spite of diversities and differences in non-essential matters of faith...

"Come then, my friends, Ye broad-hearted of all churches, advance and shake hands with each other and promote that spiritual fellowship, that kingdom of heaven which Christ predicted."

কেশবের এই কথাগুলি উপস্থিত করার পরে মজুমদার বলেন :

"These words were said in 1883, and in 1893 every letter of the prophecy has been fulfilled."

৭ "From the reports of newspapers and magazines that come to us week after week, we understand that Bhai Protap Chunder's mission to America has been particularly successful." (*Minister,* Nov. 12, 1893)

৮ "None of our foreign guests have met with a warmer reception than he [Mozoomdar]." ('ক্রীশ্চান রেজিস্ট্রার' পত্রিকার মন্তব্য, ১২ নভেম্বরের 'মিনিস্টারে' উদ্ধৃত)

৯ ১২ নভেম্বর ১৮৯৩ 'মিনিস্টারে' উদ্ধৃত 'ক্রীশ্চান রেজিস্ট্রার পত্রিকায় মন্তব্যের অংশ :

"When Mr. Mozoomdar was here [in U.S.A] ten years ago, he met with

বলেছিল, 'নিরপেক্ষ বিদেশী প্রতিনিধির মতে মজুমদারই ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ বক্তা', যদিও মজুমদারের দীর্ঘদিনের বন্ধু এই পত্রিকাটি জানাতে ভুলে গিয়েছিল, উক্ত নিরপেক্ষ বিদেশী প্রতিনিধি কে?

॥ ৫ ॥

সুতরাং ১২ নভেম্বর পর্যন্ত দেখা গেল, নববিধানের মুখপত্র 'মিনিস্টার' পত্রিকায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ধর্মমহাসভার সুদীর্ঘ বিবরণ, মজুমদার প্রভৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে একবার মাত্র ভুল বানানে বিবেকানন্দের নামোল্লেখ ছাড়া আর কোনো উল্লেখ নেই। এটা কি জাতীয় সাংবাদিকতা বা ধার্মিকতা (পত্রিকাটি ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপত্র ভুললে চলবে না) আমরা জানি না। সম্পাদক মহাশয় 'সপ্তাহের পর সপ্তাহ' ধরে যে-সমস্ত আমেরিকান পত্রপত্রিকা পেয়েছেন, তাদের মধ্যে কি ভারতীয় হিন্দু বিবেকানন্দের কোনো উল্লেখ ছিল না? বিবেকানন্দের প্রশংসায় তাঁরা আনন্দবোধ করবেন, তাতে গুরুত্ব দেবেন, এতখানি আত্মঘাতী উদারতা যদি আশা না করি, ভদ্রতা রক্ষা করে কি বিবেকানন্দের নাম তাঁরা দু'একবার করতে পারতেন না, যেখানে তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের বহির্বর্তী ধর্মপালের উল্লেখ করেছেন! বিবেকানন্দ নামটা তাঁদের কাছে অত শীঘ্র ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল কি করে, তা কি বিশেষ কোনো প্রাপ্ত নির্দেশের জন্য, যা বলে দিয়েছে—পত্রপত্রিকায় বিবেকানন্দের নাম দেখলেও কদাপি তার উল্লেখ যেন না করা হয়। এ ছাড়া ঐ সম্পূর্ণ নীরবতার কোন্ অর্থ করতে পারি? এ'রা যে বিবেকানন্দের বিষয়ে রীতিমত অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ—এ'রা এইকালে নাম না করে কোনো-কোনো প্রাচ্য-প্রতিনিধির খ্রীস্টান-বিরোধী সমালোচনার নিন্দা করেছেন। এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বা এ'দের নির্দেশদাতারা হয়ত ভেবেছিলেন, বিবেকানন্দ আমেরিকায় যে-উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন তা সাময়িক, তাঁর বিষয়ে নীরবতা পালন করলেই তিনি নিঃশব্দে গত হবেন, ভারতে তাঁর কথা কেউ জানবে না, বিশেষতঃ ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে প্রধান সংবাদ-উৎস যখন তাঁরাই। কিংবা এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ভাবতে পারেন—বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের প্রতি প্রীতি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে শিক্ষিতসমাজে যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে রামকৃষ্ণের জনৈক শিষ্যের প্রশস্তি প্রকাশ করে ইন্ধন জোগানোর কাজ না করাই মঙ্গল।

॥ ৬ ॥

বিবেকানন্দ-সংবাদের উপর হস্তক্ষেপ কেবল এখানেই নয়, অন্য পত্রিকাতেও করা হয়েছিল, তার কৌতূহলজনক দৃষ্টান্ত পুনার 'মরাঠা' পত্রিকা থেকে পাই। 'মরাঠা'র ২৯ অক্টোবর ১৮৯৩-এর দীর্ঘ 'নিউজ লেটার' থেকে ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান-বিবরণ ইতিপূর্বে আমরা উপস্থিত করেছি। এই বর্ণনার মধ্যে একবার মাত্র বিবেকানন্দের উল্লেখ আছে

---

a warm welcome from Unitarians and liberal Christians of all denominations. He baptized not with water, but with fire. His appeal to-day has lost nothing of its urgency or spirituality. *The Brahmo Somaj, which he represents has done a work in India which no Christian mission could do.* Yet it is nearer the essense of pure Christianity than are the dogma which Christian missionaries often proclaim under the Christian name." [বক্রলিপি লেখক-নির্দেশে]

('Swami Vivekananda, advanced Brahman, Bengal') কিন্তু বিস্ময়ের কথা, তারপরে.আর কোনো উল্লেখ বা বিবরণ পাই না। এমন কি, প্রথম দিনে বক্তৃতাদানকারী ভারতীয়দের নামের যে-তালিকা এতে পাই, তাতে পর্যন্ত বিবেকানন্দের উল্লেখ নেই, অথচ সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র বিবেকানন্দের প্রারম্ভিক বক্তৃতার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। নিউজ লেটারটির লেখক মজুমদারের বক্তৃতার সর্বাধিক প্রশংসা করেছেন, নাগরকারও বঞ্চিত হননি এবং ইনি আমেরিকার সংবাদপত্রগুলির হাতে-গরম সংবাদলালসার নিন্দাও করেছেন, উক্ত লালসায় আক্রান্ত সংবাদপত্রগুলি 'সাবধান এবং যথাযথ' হবার চেষ্টা করে না, অথচ এই লেখক 'সাবধান এবং যথাযথ' হবার যথেষ্ট সময় সুযোগ পেয়েও কিভাবে প্রথম দিনের ভারতীয় বক্তাদের নামের তালিকা থেকে বিবেকানন্দের নাম বাদ দিলেন বুঝতে পারছি না।

বিবেকানন্দের নাম বাদ দিলেও এই সংবাদদাতা বিবেকানন্দ-বিষয়ে যে যথেষ্টই অবহিত ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর রচনাতেই আছে। ধর্মমহাসভার ঘণ্টাধ্বনিকে ইনি যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি, উৎপীড়ন প্রভৃতির মৃত্যুঘণ্টাধ্বনিরূপে চিহ্নিত করেছিলেন, তখন তিনি মহাসভার সূচনাদিবসে বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তির প্রতিধ্বনিই করেছিলেন।

স্বামীজী বলেছিলেন ঃ

"Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth..But their time has come; and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honour of this convention may be the death-knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the some goal.

নিউজ লেটারে ছিল ঃ

"It appeared as if this tolling of the bell was the death-knell of all the bigotry, persecution and tyranny that is in the name of religion has so long sown the seeds of discord and disunion among mankind."

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নিউজ লেটারটির লেখক বিবেকানন্দের নাম অপেক্ষা বাণীতে বেশি মুগ্ধ ছিলেন।

ধরে নিতে পারি, বিশেষ কারণে এই সংবাদদাতা বিবেকানন্দের নাম বাদ দিয়েছেন, যে একই বিশেষ কারণে তিনি মজুমদার ও নাগরকারের প্রশংসাকারী এবং সেই কারণেই ইনি যে-বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় সর্বাধিক আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে আমেরিকান দর্শকদের প্রচণ্ড আগ্রহকে অপর ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন; এ সকল ব্যাপারে আমরা বিস্মিত নই, বিস্মিত কেবল এইজন্য যে, এহেন ব্যাপার ঘটেছিল তিলকের পত্রিকায়! হিন্দুধর্মের প্রতি তিলকের যথেষ্টই প্রীতি ছিল, তাঁর এই 'মরাঠা' পত্রিকা ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে বিবেকানন্দ-সংবাদ পরিবেশন করবে, স্বামীজীর দার্শনিক সিদ্ধান্তের সমর্থনও সে করবে, জাতীয় জাগরণে বিবেকানন্দের দান সর্বাধিক—একথা বলতে সে কখনো কুণ্ঠিত হবে না, স্বামীজীর যে-সকল প্রশংসা সে করবে, সেগুলি অবাধিত এবং শর্তহীন, হিন্দুধর্মের মুখ্য আচার্য বলে বিবেকানন্দকে সে স্বীকার করে নেবে—সেই পত্রিকায় বিবেকানন্দের ইচ্ছাকৃত অনুল্লেখ? পটভূমিকা জানলে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা কঠিন হবে না। ১৮৯৩, অক্টোবর মাসে আমেরিকা থেকে যখন ধর্মমহাসভার সংবাদ 'মরাঠা'য় পৌঁছেছিল, তখন সংবাদের সত্যতা যাচাই করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং তা যাচাই করার কোনো কারণও ঘটেনি। বিবেকানন্দ যে, অসামান্যভাবে হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থন করছেন, এই তথ্য তখন সাধারণ জ্ঞানে পর্যবসিত হয়নি। ফলে বিবেকানন্দের প্রতি বিশেষ

কারণে প্রীতিহীন কোনো সংবাদদাতার পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ সহজেই 'মরাঠা'য় বেরিয়েছিল। 'মরাঠা' এবং তিলকের অপর কাগজ 'কেশরী'তে পরবর্তীকালে কি জাতীয় বিবেকানন্দ-সংবাদ বেরোয়, তা লক্ষ্য করব 'বিবেকানন্দ ও তিলক', 'সেবা-আন্দোলন' প্রভৃতি অধ্যায়ে।

॥ ৭ ॥

ধর্মমহাসভার সংবাদ কাছাকাছি সময়ে আরও অনেক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। ২৮ অক্টোবরের 'ট্রিবিউন', যা তৎকালে ব্রাহ্ম-প্রভাবিত সংবাদপত্র, মজুমদারের কিছু সংবাদ ছেপেছিল। নভেম্বরের 'মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিন' ডাঃ বারোজের উদ্বোধনী ভাষণের উপর ধীর-স্থির বিবেচনাপূর্ণ আলোচনা করেছিল। উদারনৈতিক খ্রীস্টান ডাঃ হেনরি মিলার-প্রভাবিত এই পত্রিকাটি বলেছিল, সত্য এমন একটা জিনিস নয়, যার বিষয়ে সকল মানুষ ঐকমত হবে; এখানে প্রয়োজন হল, মতভেদের বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া অপেক্ষা ঐক্যের বিষয়গুলির সন্ধান করা। ধর্মমহাসভা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজ করবার উপযুক্ত ভূমিকা নিতে সমর্থ। কোনো একটি সত্যের দিকে দৃষ্টি দিলে অপরাপর সত্যগুলি দৃষ্টির বহির্ভূত থেকে যেতে পারে, এই বিপজ্জনক সম্ভাবনার দিকে পত্রিকাটি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

'বোম্বে গার্ডিয়ান' অনেক বেশি গোঁড়া মিশনারি কাগজ। ধর্মমহাসভার গণতান্ত্রিকতা এই একধর্মবাদী পত্রিকার পছন্দ হওয়ার কথা নয়। সুতরাং প্রথমাবধি নানা খোঁচাখুঁচি দিয়ে গেছে। ধর্মমহাসভা শেষ হবার পর ১১ নভেম্বর সংখ্যায় এই পত্রিকা কিছু বিরক্তির সঙ্গে লিখেছিল, ধর্মসভাটি বিভিন্ন ধর্মের গুণাগুণ যাচাই না করে সকল ধর্মকে সুযোগ দিয়েছিল নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠ দিকগুলি উপস্থিত করতে। ফলে অনেক আসল ব্যাপারই জানা যায় নি। এই মহাসভাকে কোনো-কোনো পত্রিকা যে 'প্যানথীয়ন্ অব আনবিলিফ্' বলেছে, যার মধ্যে কিছু-কিছু খ্রীস্টীয়তা ছড়িয়ে দিয়ে গ্রাহ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে—সেই কথাগুলি এই পত্রিকার কাছে স্বাদু ঠেকেছিল, এবং উক্ত সভার কোনো-কোনো উত্তেজনার আতিশয্যকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থিত করার সুখ সে অস্বীকার করতে পারে নি। যেমন, 'চিকাগো অ্যাডভান্স' পত্রিকা থেকে সে সংকলন করেছিল ঃ জাপানের শিণ্টো ধর্মের মুখ্য পুরোহিত রউচি সিবাতার অভিভাষণ যখন ডাঃ বারোজ পড়ছিলেন তখন সভাস্থলে উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল, এবং উক্ত জাপানী পুরোহিত-প্রধান মাঝে-মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে সেই অভিনন্দনকে গ্রহণ করেছিলেন; অভিভাষণ পাঠান্তে আবেগের উত্তেজনায় অধীর হয়ে যখন কেউ-কেউ মঞ্চের কাছে চলে এসেছিল করমর্দন করতে, তখন পুরোহিত-প্রবর সমাগত দুই-তিনজন নারীর গণ্ডদেশে 'ধর্মভ্রাতৃত্বের স্মারক চুম্বনরেখা' অঙ্কন করে দিয়েছিলেন।১০ এই 'মূঢ়তার মহাঝড়ে'র বিষয়ে যথাযথ ঘৃণা প্রকাশ করার পরে অবশ্য

১০ ধর্মমহাসভায় কিছু চিত্তাকর্ষক ধর্মও উপস্থিত ছিল। যেমন একটি 'না'-ধর্ম। 'মাদ্রাজ টাইমসে'র ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সংখ্যায় পাইঃ

"Dr. Adolph Brodbeck thus clears the ground for his proposed *New Religion* ;—

"We are not heathens, nor Jews, nor Mohammedans, nor Buddhists, nor Christians, and more specially neither Catholics, nor Protestants, nor Methodists, nor holders of any other forms of Christianity. We also do not revive any old religion that may have existed or still exists. The new religion is also not a mixture or synopsis of previous religions. The new religion is also not a philoso-

এই পত্রিকা 'সেণ্ট লুই ক্রীশ্চান অ্যাডভোকেট' থেকে এই সুখসংবাদটি সংগ্রহ করতে পেরেছিল ঃ

"আমরা শুনেছি, এই ধর্মমহাসভা থেকে একটি বাস্তব শুভফল পাওয়া গেছে, তা হল, অপর কোনো ধর্মমতে বা পথে যা-কিছু উত্তম বস্তু আছে, তা সবই বাইবেলে প্রাপ্তব্য। অধিকন্তু, অপরাপর ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রাদিতে যা রয়েছে, বাইবেল তার থেকে বহুগুণ বৃহৎ বিষয়কে আলিঙ্গন করে বর্তমান।"

॥ ৭ ॥

বিবেকানন্দ-সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে গোড়ার দিকে নববিধান-মুখপত্র যে-নীরবতার ষড়যন্ত্র করেছিল, তা করে উঠতে পারেনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মেসেনজার', বা বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের মুখপত্র 'সুবোধ পত্রিকা।'

'ইণ্ডিয়ান মেসেনজারকে (পত্রিকাটিকে অতঃপর সংক্ষেপে 'মেসেনজার' বলব) আমরা কদাপি বিবেকানন্দ-ভক্ত বলতে পারি না, এখন বা পরে কখনো নয়, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বাহ্যতঃ উৎসাহহীনতা এবং ভিতরে বিরক্তি এই পত্রিকা সর্বদা রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিল, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, বিবেকানন্দ-মূর্তি ঢাকতে গোড়ার দিকে এই পত্রিকা নববিধান-মুখপত্রের মতো 'পুরো নিষ্প্রদীপে'র মহড়া নেয়নি। ২২ অক্টোবরের 'মেসেনজারে' 'দি ওয়ার্লডস্ পার্লামেণ্ট অব রিলিজনস্' নামক সংবাদের মধ্যে বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ এইটুকু ঃ

"Swami Vivekananda, of Bombay, India, said that he represented a religion in whose sacred language, the Sanskrit, the word seclusion is untranslatable, was proud to belong to a nation which had sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. He gave as a text suitable to the Parliament, this passage: 'Whosoever comes to me through whatsoever form, I reach him. All such are struggling through paths that in the end always, lead to me.' He believed the time had come when sectarianism, bigotry and fanaticism were to be put away for ever."

'সুবোধ পত্রিকা'র ৫ নভেম্বর সংখ্যায় ধর্মমহাসভার যে-দীর্ঘ কাহিনী বেরিয়েছিল, তার মধ্যে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে হুবহু উপরের সংবাদটি ছিল।

'মেসেনজারে' ২৯ অক্টোবর সংখ্যায় ধর্মমহাসভার পঞ্চম দিনের অধিবেশন-সংবাদের মধ্যে পুনশ্চ কিছু বিবেকানন্দ-কথা ঃ

"Another session, held on Friday morning, was devoted to Orthodox Hindnism. Swami Vivekananda, a Brahmin Sannyasi or monk,

---

phical system of any kind. It is not atheism, not pantheism, not theism, not deism, not materialism, not spiritualism, not naturalism, not mysticism, not freemasonary; nor is it any form of so-called philosophical idealism. It is not rationalism, and not supernationalism, also not scepticism or agnosticism. It is not opticism, and not pessimism; also not stoicism and not epicurism, nor is it not positivism, and not Darwinism or evolutionism. It is also not moralism, and is also not synonimous with plilanthropism or humanitarianism. In short, the new religion is something new."

spoke on the teachings of his religion and answered questions put by the andience. Hundreds of questions were asked by men and women of various creeds, Catholic or Protestant clergymen, Theosophists, rationalists etc...The hall was crowded and immense enthusiasm prevailed; and yet between this hetrogeneous and this pagan teacher, there was no disagreeable friction whatever."

এই পত্রিকার ৫ নভেম্বর সংখ্যায় বিবেকানন্দের সামান্য উল্লেখ ছিল ('Swami Vivekananda, advanced Brahman, Bengal') এবং মজুমদার ও নাগরকরের বক্তৃতার সামারি দেওয়া হয়েছিল।

৫ নভেম্বর পর্যন্ত, স্বীকার করতে হবে, স্বামীজী সম্বন্ধে বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত তথ্য পরিবেশনের কৃতিত্ব 'মেসেনজারে'র। 'মিনিস্টার' যেখানে এই সময়ের মধ্যে 'বুকানন্দ' শব্দটি মাত্র ছেপে বিবেকানন্দের সাফল্যসংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব সাঙ্গ করেছিল. সেখানে 'মেসেনজার' কিছু বেশি উদারতা দেখিয়েছিল, সন্দেহ নেই। অবশ্য 'মেসেনজার' স্বাভাবিক কারণে মজুমদার-সংবাদের উপরে বেশি জোর দিয়েছে, এবং ধর্মমহাসভার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে (তা পালিতও হচ্ছিল; ৫ নভেম্বরের 'দি পার্লামেণ্ট অব রিলিজন' সংবাদের শেষে 'টু বি কন্টিনিউড্' লেখা ছিল) রহস্যময় কারণে তা রক্ষা করেনি (আমাদের অনুমান, বিবেকানন্দ লোকটি কে, এই সময়ে 'মেসেনজার'-কর্তৃপক্ষ জেনে ফেলেন, এবং তাঁরা দেখেন যে, ধর্মমহাসভা-সংবাদের অনেকখানি অংশ জুড়ে উক্ত বিবেকানন্দ বর্তমান), তবু মানতে হবে, 'মেসেনজার' যে-কোনো কারণেই হোক 'মিনিস্টারে'র মতো বিবেকানন্দ-নাম সম্বন্ধে ছুৎমার্গের মনোভাব দেখায়নি।

তা হলেও, আমেরিকায় বিবেকানন্দের বিপুল সমাদরের তুলনায় 'মেসেনজারে'র সংবাদ কতটুকু! এই পত্রিকায় ছাপা হল—বিবেকানন্দ 'বাংলার প্রগতিশীল ব্রাহ্মণ'—কিন্তু লোকটি কে? 'মেসেনজার' এখনো পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে সে বিষয়ে কৌতূহলী নয়। হয়ত বিবেকানন্দ বেশ কিছুদিন ঐ পরিচয়েই আবদ্ধ থাকতেন যদি-না একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি রুখে দাঁড়াতেন—তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ সেন, কেশবচন্দ্র সেনের জ্ঞাতিভাই তিনি, সাংবাদিক-চূড়ামণি, 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজের সম্পাদক।

পঞ্চম অধ্যায়

আবির্ভাব : প্রথম শিহরণ

॥ ১ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রজ্যায় বেরিয়ে পড়ে একদিন বলেছিলেন—যখন ফিরব, সমাজের উপর বোমার মতো ফেটে পড়ব। ঘটনা তাই হয়েছিল। না, একটু পার্থক্য আছে—ভারতীয় সমাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই তাঁর সংবাদ বোমার মতো ফেটে পড়েছিল এবং তার আগুনকে ছড়িয়ে দেবার নিমিত্ত হয়েছিল একটি কাগজ—'ইণ্ডিয়ান মিরার।' 'ইণ্ডিয়ান মিরার'—ভারত-দর্পণ—সার্থকনামা হয়েছিল এইকালে বিবেকানন্দকে প্রতিফলিত করে। 'স্বয়ং ভারতবর্ষ'—বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এই অভিধা পরবর্তীকালে বারেবারে ব্যবহৃত হবে, আমরা দেখব।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর আবির্ভাবকালে তাঁর সংবাদপ্রচারের ব্যাপারে 'মিরারে'র গুরুত্বকে যথেষ্ট চেষ্টা করলেও প্রকাশ করা যাবে না। যে-শক্তি বিবেকানন্দকে ভর করেছিল, তারই অংশ বোধহয় কিছু সময়ের জন্য এই কাগজটিকেও চালিত করেছিল। ভারতীয় শিক্ষিতসমাজে এই পত্রিকার তখন সবিশেষ মর্যাদা এবং এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাবত্তা ও চারিত্রগুণে সমাজের অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি। কেশবচন্দ্র সেনের সম্পর্কের ভাই হয়েও, এবং দীর্ঘদিন কেশবের ভাববাহন 'মিরারের' সম্পাদনা করেও, ইনি উদারমনা হিন্দু ছিলেন, এবং ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানের কল্পনায় উদ্দীপ্ত থাকতেন। তাই দূর আটলাণ্টিকের পারে অপরিচিত এক হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অভ্যুদয় যখন ঘটল, তার বার্তাকে এই ভারতবর্ষে বহন করে আনবার মতো উদার্য ও উদ্দীপনা ইনি দেখাতে পেরেছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের ইতিহাসে এক পর্যায়ে নরেন্দ্রনাথ সেনের ভূমিকা অতুলনীয়।

॥ ২ ॥

নরেন্দ্রনাথ সেন ও 'মিরারে'র কথা এই রচনায় বহুবার বহুভাবে আসবে। তাই ঐকালে এদেশে উভয়ের মর্যাদা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলে নেওয়া যায়।

নরেন্দ্রনাথ সেন (১৮৪৩-১৯১১) কলুটোলার হরিমোহন সেনের পুত্র, রামকমল সেনের পৌত্র। 'বাল্যকাল হইতেই ইঁহার সংবাদপত্রে লিখিবার অনুরাগ দৃষ্ট হয়।' ১৯ বছর বয়সে অ্যাটর্নি-অফিসে কাজ শিখবার সময়েই কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে' প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৮৬১, অগস্ট মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে পাক্ষিক পত্র হিসাবে ইণ্ডিয়ান মিরার প্রতিষ্ঠিত হলে তার সম্পাদক হন মনোমোহন ঘোষ, এবং তাতে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকেন নরেন্দ্রনাথ। ১৮৬৩ থেকে পত্রিকাটির সম্পাদনা নরেন্দ্রনাথই করতে থাকেন। ১৮৬৬-এর পরে কিছুদিন পত্রিকাটির সঙ্গে তাঁর যোগ থাকে না। তার মধ্যে মিরার সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তারপরে বিশেষ ঘটনাচক্রে যখন মিরার

কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়১ তখন নরেন্দ্রনাথ আবার তাতে যোগ দেন। 'প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অল্পদিনব্যাপী সম্পাদকতার পর নরেন্দ্রনাথ মিরারের সম্পাদনাভার গ্রহণ করিলেন' (১৮৭২-এর অল্পদিন পর থেকে), এবং ১৮৮৯ থেকে তিনি কেবল সম্পাদনাই করেন না, পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারীও হন। ২

স্বামী বিবেকানন্দ মিরার সম্বন্ধে (২২.২.৯৪ পত্রে) বলেছেন, 'ভারতের সর্বাধিক প্রভাবশালী পত্রিকা,' সেকথা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সত্য, তা নানা সূত্রে দেখা যায়, যদিও স্বামীজী রাজনৈতিকভাবে অমৃতবাজারকে সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী মনে করতেন।৩ মিরার ভারতীয়-পরিচালিত 'প্রাচীনতম দৈনিক ইংরাজি সংবাদপত্র', ১৮৯৪ সালেও 'বহুভাবে পঠিত' এবং 'যথেষ্ট সাহিত্যিক নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচালিত' ৪ এবং

১ মিরার কিভাবে দৈনিক পত্রে রূপান্তরিত হয় সে-বিষয়ে ২২ জুলাই ১৯০২-এর মিরাবে 'গোবিনচাঁদ ধর' একটি চিঠি লেখেন, তাতে পাই, এইকালের ৩০ বছর আগে একটি মহরমের শোভাযাত্রা যখন হেয়ার স্কুলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন কিছু ছেলে নাকি ইঁট ছুঁড়ছে এই অভিযোগ করে কয়েকজন পাহারাওয়ালা স্কুলে ঢুকে ছেলেদের পেটায় এবং শিক্ষকদের অপমান করে। পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করেও কিছু হয় না।—

"The late Babu Keshub Chunder Sen, Mr. Monomohan Ghose, and you, Editor, took an active part in the matter on behalf of the boys. A report of the case was sent to the Anglo-Indian daily papers with a request to publish it in their columns, but the request was not complied with. On this it was proposed to convert the weekly Mirror into a daily. The late Babu Keshub Chunder Sen agreed to this proposal and appointed you to be the editor. You took up the paper with all its assets and liabilities, the latter being somewhat heavy."

২ এই সংবাদগুলি বিহারীলাল সরকার-প্রণীত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত 'জীবন-কথা'র অন্তর্ভুক্ত 'নরেন্দ্রনাথ সেন' রচনা, এবং 'ন্যাশন্যাল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় এপ্রিল ১৮৯৬ সংখ্যায় 'অ্যান ওল্ড জার্নালিস্ট'-লিখিত 'হিস্টরি অব দি নেটিভ অ্যান্ড অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান জার্নালিজম্ ইন বেঙ্গল' রচনা থেকে সংকলিত।

৩ মিরার এবং অমৃতবাজার দুই দৃষ্টিভঙ্গির কাগজ—পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অগ্রসর। এই বিষয়ে 'অ্যান্ড ইন্ডিয়ান স্পেকটেটর' মিরারে ১৮৯৭, ২ অক্টোবর যে-পত্র লেখেন, তার মধ্যে পাই:

"It was about 1867 that the Sens and the Ghoses—that the *Mirror* and the *Patrika*—parted ways, never to meet! 'A pure home and a pure religion first, pure politics afterwards'—was the guiding principle of the *Mirror* of 1868. 'Pure politics first, pure homes and pure religion afterwards'—was the guiding principle of the *Patrika* of that time...Thirty years have passed since then; the Sens own and edit the *Mirror*, and the Ghoses own and edit the *Patrika* still...The *Patrika* should remember that the *Mirror* heartily supported the primary education policy of Sir George Campbell, whom the *Patrika* hated. The *Mirror* supported the Consent Age Bill, which the *Patrika* declared would destroy the Hindus."

মিরার এবং অমৃতবাজার নানা প্রশ্নে বহু বৎসর একাদিক্রমে ঝগড়া করে গেছে, এবং বাংলার বাইরের সবাদপত্রগুলি দীর্ঘদিন সানন্দে এই কোঁদল উপভোগ করেছে। এ বিষয়ে যদি কেউ মাত্র ১৯০০ সালের অমৃতবাজারের ৩০ এপ্রিল, ১৮ জুলাই, ৩১ জুলাই, ৯ অগস্ট সংখ্যাগুলি দেখেন যথেষ্ট সংবাদ পাবেন।

৪ ১৮৯৪, ৩১ অক্টোবর 'মাদ্রাজ মেলে' বাংলার প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিশনার এইচ সি উইলিয়ামসের রিপোর্টে পাই:

"Of the English newspapers, conducted by natives, the *Indian Mirror, Amrita Bazar Patrika, Reis and Rayyat, Hindoo Patriot, Indian Nation, Hope*

ইংলিশম্যান কাগজ নরেন্দ্রনাথ সেনের ধর্মব্যাপারে উৎসাহ সম্বন্ধে কটাক্ষ করলে ইণ্ডিয়ান নেশনের সুপণ্ডিত সম্পাদক এন এন ঘোষ উক্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাটির 'বিদ্বিষ্ট ও অজ্ঞতাপূর্ণ' মনোভাবের সমালোচনা করতে গিয়ে ১৮৯৬, মার্চ সংখ্যায় জানিয়েছিলেন:

"বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন অগ্রণী থিয়জফিস্ট; বঙ্গীয় থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি। ...ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কথা সর্বজনবিদিত। তিনি একইসঙ্গে রিভাইভালিস্ট ও রিফর্মার।...ব্যক্তিজীবনে পুরো হিন্দু। প্রচুর জরুরী কাজের চাপ সত্ত্বেও তিনি ফলাও করে পূজা-যজ্ঞাদি করবার সময় করে নিতে পারেন। সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্তেরা... তাঁকে সর্বদা সহায়ক পান, তাঁর বাড়িতে আশ্রয়ও পান। এবং ইণ্ডিয়ান মিরার অন্যান্য রাজনৈতিক সংবাদপত্রাদির তুলনায় নিজ স্তম্ভে অনেক বেশি জায়গা নিয়ে নৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করে থাকে।" [অ]

মিরারের প্রভাব আরও কয়েক বছর বজায় থাকে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫) আরম্ভ হলে দেশ যখন দ্রুত রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যায়, তখন মধ্যপন্থী রাজভক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেন না, এবং সেজন্য নিন্দিতও হন। তা হলেও, তাঁর ব্যক্তিগত সাধুতা ছিল প্রশ্নাতীত। ১৯১০ সালে মিরারের সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউ মিরারের বিষয়ে লেখে, "অর্ধশতাব্দী আগে, যখন ইউরোপীয় প্রয়াসের কথা বাদ দিলে সাংবাদিকতা ছিল ভারতে অজ্ঞাত, তখন মিরারের আবির্ভাব," এবং "দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার অগ্রগতি।" নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাধুতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে৫ এই পত্রিকা 'বাংলার কয়েকজন অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তি' তাঁকে যে-মানপত্র দিয়েছিলেন, তার অংশ উদ্ধৃত করেছিল। ব্রহ্মবাদিন পত্রিকা নরেন্দ্রনাথ সেনের দেহত্যাগের পরে ১৯১১, নভেম্বর সংখ্যায় তাঁর 'চরিত্রমাধুর্য, ঐকান্তিকতা, উদার সহানুভূতি'র কথা জানিয়ে বলেছিল, 'বাংলার সকল প্রগতিশীল আন্দোলন তাঁর সমর্থন ও আশীর্বাদ পেয়েছে,' যে-কথা বিহারীলাল সরকার নরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই লিখেছিলেন:

"শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজনীতি ও ধর্মসংস্কার-সম্বন্ধীয় যত সভা কলিকাতায় আছে, নরেন্দ্রনাথ প্রায় সকলগুলির সহিত বিশিষ্টভাবে জড়িত আছেন।...ইনি এতপ্রকার কার্যের সহিত সম্বন্ধ রাখেন যে, লোকে আশ্চর্যান্বিত হয়, কেমন করিয়া ইনি এত-সকল কার্য সম্পন্ন করেন।"

and *Bengalee* largely read and are generally conducted with considerable literary skill."

৫ ইণ্ডিয়ান রিভিউ ১৯১১ জানুয়ারি সংখ্যায় অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখে:

"[*The Mirror*] has steadily grown into public esteem by the sobriety, independence and 'sweet reasonableness' of its views....Even when its readers differed most from its views, they felt that the presonal integrity and honesty of the occupant of the editorial chair was unimpeachable. It is no doubt a rare thing that any newspaper should be able to celebrate its Golden Jubilee, but much more so it is under the conditions in which the *Indian Mirror* has had to make its way. Journalism, rightly understood, is a serious and inspiring vocation and its traditions have been safe in the keeping of so worthy a representative of them as Rai Bahadur Narendra Nath Sen."

ব্রহ্মবাদিনের ভাষায় 'প্রফেট-জাতির অন্তর্ভুক্ত' নরেন্দ্রনাথ সেনের বিষয়ে যেসব কথা উপস্থিত করলাম, বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে তার যৌক্তিকতা আমরা ক্রমেই উদ্‌ঘাটিত দেখব। বিবেকানন্দের প্রথম বড় সংবাদ কিন্তু মিরারে বেরোয়নি—বেরিয়েছিল বোম্বাইয়ের টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ৪ নভেম্বর, ১৮৯৩। পশ্চিমভারতে এই সংবাদ যথোচিত নাড়া দিয়েছিল কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশে যখন ঐ একই সংবাদ স্টেটসম্যানে ৯ নভেম্বরে প্রকাশিত হল। ঐ সংবাদই মাদ্রাজের 'হিন্দু' প্রকাশ করে ১৭ নভেম্বর। অন্যত্রও এটি প্রকাশিত হয়েছে, যেমন 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায়।

উল্লিখিত সংবাদটি সংকলিত হয়েছিল 'বস্টন ইভনিং ট্রানসক্রিপ্ট' পত্রিকা থেকে। ওতে ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ডাউটি ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ভারতীয়গণের যে-বিবরণ দেন, তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ নামক জনৈক হিন্দুসন্ন্যাসীর এক উজ্জ্বল বিবরণ ছিল—তা পাঠ করেই বাঙালী ও ভারতীয় পাঠক প্রথম জানতে পারে—ধর্মমহাসভায় সর্বাধিক জনপ্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর চেহারা অপূর্ব, ব্যক্তিত্ব অসামান্য, ততোধিক মহান তাঁর বাণী। স্টেটসম্যানের এই বিবরণটি দুদিন পরে, ১১ নভেম্বর, মিরারে পুনশ্চ প্রকাশিত হয়, এবং চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়।

বাংলাদেশের প্রধান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক স্টেটসম্যান অবশ্যই ধর্মমহাসভার বিষয়ে অতিরিক্ত উৎসাহী ছিল না, বিশেষতঃ ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ কর্তৃক মহাসভা বর্জনের পরে। সুতরাং স্টেটসম্যানে পরে এসব সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ পাই না। তবে, সাম্রাজ্যিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট না হলে এই পত্রিকা দেশীয়দের সম্বন্ধে কিছুটা নিরপেক্ষতা যেহেতু বজায় রাখার চেষ্টা করত, তাই আমেরিকান সংবাদপত্রে জনৈক ভারতীয় হিন্দুসন্ন্যাসীর রিপোর্টকে চেপে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি, ছেপে দিতে পেরেছিল পাত্রবিচার না করেই, এবং সেই হল শুভসূচনা।

স্টেটসম্যান যে-সংবাদ একবার প্রকাশ করে দায়িত্ব শেষ করল, সেই সংবাদ, সেই জাতীয় আরও অনেক সংবাদ, শিক্ষিত ভারতবাসীর উপরে অজস্রভাবে বর্ষণ করতে লাগল মিরার। এইসকল সংবাদের শুভবর্ষণ ভারতবর্ষের চিত্তকে সরস ও উর্বর করে তুলল, আনন্দিত অঙ্গনে মঙ্গলশঙ্খ বাজল, ধুলি ও ঝঞ্ঝা উড়ল না তা নয়, কিন্তু সকল কোলাহল ও অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি নিশ্চিত সত্য তখন জেগে উঠেছে, যার নাম বিবেকানন্দ, একটি আলোকরেখা এসে পড়েছে তমসা ভেদ করে এদেশবাসীর নিমীলিত নয়নের উপরে, সেই আলোকসম্পাতে শিহরিত হয়ে তারা ভেবেছে—সূর্যোদয় তাহলে দূরবর্তী নয়।

বস্টন ইভনিং ট্রানসক্রিপ্টের যে-সংবাদটি এতকিছু ঘটিয়েছিল, তার কিছু অংশ উপস্থিত করা যাক ঃ

"আর্ট-প্যালেসে প্রবেশপথের বাঁ-দিকে একটি ঘরের উপরে লেখা আছে—'এক নম্বর ঘর—প্রবেশ নিষেধ।' এই ঘরের মধ্যে ধর্মমহাসভার বক্তাগণ নিজেদের মধ্যে বা প্রেসিডেণ্ট বনির সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য শীঘ্র বা দেরিতে, যখনই হোক, আসবেনই। মিঃ বনির ব্যক্তিগত অফিস এই ঘরেরই এক কোণে। সাধারণ দর্শকেরা যাতে ঢুকতে না পারে, তার জন্য ভাঁজ করা দরজার সামনে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা। দরজা থেকে এত দূরে তাদের আটকানো হয় যে, উঁকি মারাও সম্ভব নয়। কেবল প্রতিনিধিরাই এই সুপবিত্র (!) সীমা ভেদ করার অধিকারী, যদিও অন্যের পক্ষে 'চিচিং-ফাঁক' আবিষ্কার করা হয়ত একেবারে অসম্ভব নয়। যদি কেউ তা করতে পারে তাহলে কলম্বাস-হলের প্ল্যাটফর্ম থেকে বিশিষ্ট অতিথিদের যে-ধরনের পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, তার থেকে এখানে অনেক নিকট-দর্শন সে পেয়ে যাবে, অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য।

"এই অন্দর-কক্ষের সবচেয়ে চমক-লাগানো চেহারা ব্রাহ্মণ-সাধু বিবেকানন্দের। তাঁর

বৃহৎ সুগঠিত আকার, অসাধারণ সুন্দর দেহভঙ্গি, চৌকশ ধরনের পরিষ্কার কামানো মুখের সুঠাম সৌন্দর্য, শুভ্র দন্তপংক্তি, সুবিন্যস্ত অধরোষ্ঠ, কথোপকথনকালে যা প্রায়শঃ সদয় হাসিতে বিভক্ত হয়; স্কন্ধোত্থিত মনোহর মস্তক কমলা বা রক্তবর্ণের পাগড়িতে সজ্জিত; নিম্নজানু-পর্যন্ত লম্বিত উজ্জ্বল কমলা বা রক্তবর্ণের আলখাল্লা কোমরবন্ধনীতে আবদ্ধ; কথা বলেন চমৎকার ইংরাজিতে; প্রশ্ন আন্তরিক হলে উত্তর দেন সাগ্রহে।

"তাঁর ব্যবহার অতি সরল; তারি মধ্যে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে একটু ব্যক্তিগত সমীহভাব থাকে—তাঁর স্বয়ংবৃত সন্ন্যাসজীবনের রীতিই তার মূলে। তাঁর সম্প্রদায়ের আচারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি স্বাধীন, আমার আচরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কখনো থাকি হিমালয়ের উপরে, কখনো শহরের পথে। পরের দিনের আহার কোথায় জুটবে জানি না। আমি টাকা সঙ্গে রাখি না। চাঁদা তুলে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।' তারপর, ঘটনাক্রমে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন এমন কয়েকজন স্বদেশবাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ'রাই আমার ভার নেবেন।' তার দ্বারা ইঙ্গিতে বোঝালেন, চিকাগোয় তাঁর আহারাদির ব্যবস্থা অন্যেরা করছেন। তাঁর পোষাক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল—এটাই তাঁর সাধারণ সন্ন্যাসীবেশ কি না? তিনি উত্তর দিলেন, 'এ পোষাকটা বেশ ভাল। তবে দেশে থাকলে আমার খালি পা, ছেঁড়া কাপড়।—আমি জাতিভেদে বিশ্বাস করি কি না? জাতিভেদ একটা সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। সকল জাতির মধ্যে আমার স্থান আছে।'

"তাঁর চেহারা ও ব্যবহার থেকে অবশ্য স্বতঃই প্রমাণিত হয়, তিনি উচ্চবর্ণের সন্তান; দীর্ঘদিনের স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য ও গৃহহীন পরিব্রাজক-জীবন তাঁর জন্মগত ভদ্রসংস্কৃতিকে দূর করতে পারেনি। তাঁর পারিবারিক নামও অনুচ্চারিত। ধর্মজীবন বরণ করে তিনি 'বিবেকানন্দ' নাম নিয়েছেন; 'স্বামী'—সন্ন্যাসীদের প্রতি প্রযুক্ত শ্রদ্ধাসূচক শব্দ। বয়স তিরিশের কোঠার গোড়ার দিকে। তাঁকে দেখে মনে হয়, এই জীবন ও তার সম্ভোগ, কিংবা অপর জীবন ও তার ধ্যানসাধনা—এর যে-কোনো একটির জন্য তিনি নির্মিত। তাঁর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে চিন্তা জাগে—এক জীবন থেকে অন্য জীবনে গেলেন কিসের টানে?

"'আমি বিয়ে করব কেন?'—তাঁর ঝলসানো উত্তর—'প্রত্যেক নারীতে যখন আমি জগজ্জননীকে দেখি?—আমি এইসব কৃচ্ছ্রসাধনা করি কেন? পার্থিব বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য—যাতে আমার পুনর্জন্ম না হয়, যাতে মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে পরমের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি, একাঙ্গ হতে পারি ঈশ্বরের সঙ্গে। আমি বুদ্ধ হতে চাই।'

"এর দ্বারা বিবেকানন্দ কিন্তু নিজেকে বৌদ্ধ বললেন না। কোনো বিশেষ নাম বা সম্প্রদায়ের ছাপ তাঁতে নেই; তিনি উচ্চতর ব্রহ্মণ্যধর্মের সৃষ্টি; বিশাল, স্বপ্নাচ্ছন্ন আত্মাহূতিময় হিন্দুসত্তার মূর্তবিকাশ তিনি—পবিত্রাত্মা সন্ন্যাসী।

"তিনি তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক জনৈক ঈশ্বরভক্তের সম্বন্ধে কিছু পুস্তিকা বিতরণ করছিলেন। এই সাধু, তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের এমনই প্রভাবিত করেছিলেন যে, অনেকেই তাঁর মৃত্যুর পরে গৃহত্যাগ করেছেন। এই সাধুকে মজুমদারও [প্রতাপচন্দ্র মজুমদার] গুরুর মত দেখেন, কিন্তু খ্রীস্টের শিক্ষামত মজুমদার সংসারজীবনে আধ্যাত্মিকতার জন্য সচেষ্ট।

"ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের ভাষণ ঊর্ধ্বাকাশের মতই উদার, সর্বজনীন ধর্মের পরম বিকাশরূপে তা সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠাংশকে আলিঙ্গন করেছে, সমগ্র মানবের জন্য করুণায় তা স্পন্দিত, তাতে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের প্রেরণায় শুভকর্মের আহ্বান—শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে নয়। ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ অতিশয় প্রিয়—তাঁর চিন্তার ঐশ্বর্যের জন্য, অবয়বের মহিমার জন্যও বটে। মঞ্চে পদার্পণমাত্রে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়, আর সহস্র

সহস্র মানুষের এই উচ্চারিত সমাদরকে তিনি শিশুর আনন্দে গ্রহণ করেন, তাতে অহংকারের লেশমাত্র থাকে না। এই তরুণ, সুবিনীত ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীর পক্ষে দারিদ্র্য ও আত্মবিলয়ের জগৎ থেকে খ্যাতি ও প্রাচুর্যের শিখরে সহসা উত্থান নিশ্চয়ই এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।" [অ]

॥ ৪ ॥

১১ নভেম্বর উপরের সংবাদটি প্রকাশ করার পরে মিরার ১৫ নভেম্বর যে-সম্পাদকীয় মন্তব্য করে, বর্তমানে সেটি কৌতুকজনক মনে হতে পারে, কিন্তু তা এই অদ্ভুত তথ্যকে প্রকাশ করেছে—বিবেকানন্দ কলকাতার বৃহত্তর সমাজে একেবারেই পরিচিত ছিলেন না। বিবেকানন্দ যে বাঙালী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, পরলোকগত জনৈক অ্যাটর্নির পুত্র, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্য—এইসব তথ্য কয়েকবার 'আমাদের যতদূর বিশ্বাস' বলে ঢোক গিলে জানাতে হয়েছে। এর থেকে অন্ততঃ এটুকু মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এ যে, স্বামী বিবেকানন্দ নাম নিয়ে আমেরিকার ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়েছেন, কলকাতায় তা জানা ছিল না।

মিরারের উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য এই ছিল :

"Vivekanund Swami, the young Hindu Yogi, who, from all accounts appears to have created a profound sensation by the grandeur of his appearance and address at the World's Parliament of Religions at Chicago, is *believed to be* a Bengali Graduate of the Calcutta University. Norendro Nath Dutt by name, who became a disciple of the late venerable Paramhansa Ram Krishna of Dakhineswar, and left home some years back. Norendro Nath Dutt, *we believe,* is the son of a late Attorney of the Calcutta High Court. (বক্রলিপি লেখক-নির্দেশে)

কেবল মিরার নয়, বেঙ্গলীও ২৫ নভেম্বর, ১৮৯৩, যখন ধর্মমহাসভার উপরে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করে, তখন স্বামী বিবেকানন্দ নামক ব্যক্তি সহসা উদিত হয়ে কী ধরনের চাঞ্চল্যসৃষ্টি করেছেন, তার উল্লেখ করার পরে, তাঁর ব্যক্তিপরিচয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সংবাদ-জ্ঞাপনে অসামর্থ্য প্রকাশ করে। অবশ্য বিবেকানন্দ যে, রামকৃষ্ণ-শিষ্য, একথা শোনা গেছে বলে পত্রিকাটি জানিয়েছিল। বেঙ্গলীর এই রচনায় সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছিল, রক্তাক্ত ধর্মসংঘাতের যুগ কিভাবে ধর্মসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে। তা হয়েছে বলেই চিকাগোয় ধর্মমহাসভা বসতে পেরেছে, যে-'অসাধারণ' ঘটনা একশো বছর আগে কল্পনাও করা যেত না। বিবেকানন্দের কথা বলতে গিয়ে বেঙ্গলী ঐ রচনায় লিখেছিল :

"The Swami Vivekananda suddenly springs into fame and prominence. Indian anchorites are indeed most successful in the art of self-effacement. When they become anchorites, they change their names and their outward garb ; they forsake their caste, in their wider fellowship with the human family. Such being the case we are not in a position to identify the Swami, or to satisfy the natural curiosity which his unique personality has awakened in America. But we learnt that he is a Bengalee, and that he was a disciple of the well-known Paramhansa

Ramakrishna of Dakhineswar. He is in the prime of life, and does not profess to belong to any particular religion."

আগেই দেখেছি স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম পরিচয়জ্ঞাপক রচনা মিরারে প্রকাশিত হয় ১৫ নভেম্বর, বেঙ্গলীতে হয় তার দশদিন পরে ২৫ নভেম্বরে। এই দশদিনের মধ্যে মিরারে কিন্তু এ-বিষয়ে নূতন কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। বিস্ময়ের কথা, মিরারের উক্ত ১৫ নভেম্বরের সংবাদের আগের দিন ১৪ নভেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় 'হিন্দু রিলিজন ইন আমেরিকান কংগ্রেস' নামে যে-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে বিবেকানন্দ যে রামকৃষ্ণ-শিষ্য, একথা বিনা দ্বিধায় জানানো হয়। অমৃতবাজারের সম্পাদকীয়টি বহু বক্র মন্তব্যে পূর্ণ, কেন, সে প্রসঙ্গ এখানে নয়, পরে বিশদভাবে আলোচিত হবে, আমরা এখানে কেবল বিবেকানন্দের পরিচয়জ্ঞাপক লাইনগুলি উপস্থিত করছি ঃ

"The Americans wanted to see a Hindu 'in his native jungles'—a genuine Hindu, not Christianized, humanized or Europeanized. They fancied that they had found one such in Vivekananda. His figure, deportment and tenets attracted the greatest attention.

"Vivekananda is a Bengalee, and a disciple of Ram Krishna Paramhansa, who lived at Baranagar in seclusion."

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ৯ নভেম্বর স্টেটসম্যানে বা ১১ নভেম্বর মিরারে বিবেকানন্দ-সংবাদ বেরোনার পরেই তাঁর সম্বন্ধে বাংলাদেশে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সংবাদপত্রের দপ্তরে সংবাদ পৌঁছে যায় উক্ত 'ব্রাহ্মণসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। এই সংবাদ অমৃতবাজার পরিষ্কার মেনে নেয়, মিরার সাবধানে মানে, এবং, বেশ কয়েকদিন পরেও বেঙ্গলী ঐ সংবাদ পরিবেশনের কালে যথেষ্ট নিশ্চয়তার সঙ্গে কথা বলেনি।

এখন প্রশ্ন—সংবাদপত্রের দপ্তরে বিবেকানন্দের পরিচয় কে বা কারা দিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা বিবেকানন্দের পরিচয় কতখানি জানতেন?

কারা দিয়ে এসেছিলেন, তার সহজ উত্তর—বিবেকানন্দের সতীর্থ রামকৃষ্ণ-ভক্তরা। এই সহজ উত্তরের বিরুদ্ধে রয়েছে স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীর একটি মন্তব্য। মন্তব্যটি এই প্রকার ঃ

"রামকৃষ্ণ সংঘের বরাহনগর [আলমবাজার]-মঠের সন্ন্যাসীরাও স্বামীজীর সাফল্যের বিবরণ পড়েছিলেন। তাঁরা যদিও 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামের অন্তরালবর্তী তাঁদের নরেনকে চিনতে পারেন নি, তথাপি কী যেন তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে বলে দিয়েছিল—এ সে ছাড়া আর কেউ নয়। কয়েক বছর এঁরা তাঁর সংবাদ পাননি। ধর্মমহাসভা সাঙ্গ হবার ৬ মাস পরে স্বামীজীর একটি চিঠি গোটা ব্যাপারটির চূড়ান্ত সমাধান করে দেয়।" [অ]

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবনকথা'য় ইংরাজি জীবনীর বক্তব্যই সমর্থন করেছেন।৬

৬ 'আলমবাজারে [মঠে] নরেন্দ্রনাথের কোনো সংবাদ না পাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান ও ভক্তগণের অন্তরে বেশ একটু দুঃখ ও ব্যাকুলতা ছিল। এই সময়ে একদিনের এক ঘটনার কথা বলি। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাস। ইংরেজি একটি দৈনিক কাগজে (কাগজটির নাম এখন স্মরণ নাই) মারউইন মেরী স্নেল নামে জনৈক আমেরিকান 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ সংবাদপত্রে লেখেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরমহংসদেবের নামও সম্পর্কিত ছিল। মিঃ মেরী স্নেল আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের কিছু-কিছু কার্যাবলীর কথা লিখিয়াছিলেন। আমরা সকলেই কাগজে পড়িলাম বটে কিন্তু **'স্বামী বিবেকানন্দ' নামের সহিত মোটেই পরিচিত**

সমসাময়িক সংবাদপত্রের যেসব সংবাদ ইতিমধ্যে আমরা উদ্ধৃত করেছি, তার পাশে ইংরাজি জীবনীর উপরের মন্তব্য যথেষ্ট বিস্ময়কর মনে হবে। বিবেকানন্দ-সংবাদ কলকাতার প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে যেখানে তাঁর পরিচয় সংবাদপত্রের দপ্তরে পোঁছে গেছে, সেখানে রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ তা জানলেন না? শুধু আন্দাজের উপরে তাঁরা 'বিবেকানন্দকে' নরেন্দ্র বলে বুঝে আনন্দ করেছিলেন? না- তা সম্ভব নয়—ইংরাজি জীবনীতে ঐ মন্তব্য অনবধানতাবশে করা হয়েছে। সুতরাং এখানে সন্ধান করে দেখা যেতে পারে, আমেরিকায় 'আবির্ভাবে'র পূর্ব পর্যন্ত 'স্বামী বিবেকানন্দ' এই নাম এবং তাঁর আমেরিকাযাত্রার সংবাদ কি পরিমাণে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যত্র জানা ছিল?

॥ ৫ ॥

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই, থাকতে পারে না—স্বামীজীর আমেরিকাগমনের ইতিহাস মাদ্রাজী শিক্ষিতজনেরা সবচেয়ে বেশি জানতেন, কারণ তাঁরাই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর জন্য যেসব মহল থেকে অর্থসংগ্রহ করা হয়, সেখানেও ব্যাপারটা জানা ছিল। হায়দারাবাদের অনেকে জানতেন; জানতেন—মহীশূর ও রামনাদের রাজারা ও তাঁদের দরবারের অনেক লোক, হরিদাস বিহারীদাস-প্রমুখ পশ্চিম ভারতের অনেক ব্যক্তি, স্বামীজীর শিষ্য হরিপদ মিত্র ও তাঁর স্ত্রী, এবং অবশ্যই খেতড়ির রাজা ও তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা। এই তালিকা সন্ধান করে বাড়ানো যায়।

যেখানে জানাটা অল্প ছিল, তাঁর সেই জন্মস্থান ও তাঁর গুরুদেবের আত্মপ্রকাশস্থান কলকাতা সম্বন্ধেই এখানে আমাদের কৌতূহল। প্রথম দিকে, পরেও, স্বামীজীর পরিচয় দিতে গিয়ে কলকাতার সভাস্থলে বা সংবাদপত্রে বলা হয়েছে—'Better known in Bombay and Madras' —সেই তাঁর নিজ প্রদেশে ক'জন মানুষ জানতেন, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা গেছেন, ঠিকভাবে বলতে গেলে, কজন মানুষ তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামটা জানতেন, এমন কি ঘনিষ্ঠ মহলেও?

'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম নিয়ে এখানে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যায়। ইংরাজি জীবনীর মতে, "খেতড়ির দরবারেই মহারাজের অনুরোধে স্বামীজী 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেন। তার আগে তিনি সচ্চিদানন্দ, বিবিদিষানন্দ ইত্যাদি নানা নাম নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।" [অ]

একথা অবশ্যই সত্য, স্বামীজী সচ্চিদানন্দ, বিবিদিষানন্দ নানা নাম নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, (যদিও এখনো পর্যন্ত বিবিদিষানন্দ নামের প্রয়োগ কোথাও পাইনি) কিন্তু ইংরাজি জীবনী থেকে যা মনে হয়—ঐ নামগুলির মধ্যে 'বিবেকানন্দ' ছিল না—তা কিন্তু

ছিলাম না। আমি যখন বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন জানিয়াছিলাম যে, নরেন্দ্রনাথ 'স্বামী সচ্চিদানন্দ' নাম লইয়া ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। **কাজেই আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের কার্যাবলীর কথা পড়িয়া আমরা মোটামুটি নির্ধারণ করিতে পারিলাম যে, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের নরেন্দ্রনাথ।** বিবেকানন্দ শব্দের পিছনে স্বামী যুক্ত থাকায় আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ কোনো একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক হইবেন। কিন্তু দুই-একদিন পরে জানিতে পারিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ আর কেহ নহেন, আমাদের প্রিয় গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ। ভারতের ধর্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য নরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কাহারও কোনোরূপ সাহায্য পাইয়া আমেরিকায় গিয়াছে। তখন আমাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।...ইহার কিছুদিন পরে আমেরিকা হইতে নরেন্দ্রনাথের পত্র আসিল।" [স্থূলাক্ষর লেখক-নির্দেশে] [স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 'আমার জীবনকথা' (১৯৬৪)]

মোটে সত্য নয়। মাদ্রাজে থিয়জফিস্ট পত্রিকার মার্চ ১৮৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে যিনি 'সচ্চিদানন্দ', তিনি প্রায় এক বৎসর আগে হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা ২৬ এপ্রিল ১৮৯২-এর চিঠিতে (মূল চিঠির প্রতিলিপি আমি দেখেছি) 'বিবেকানন্দ।' সুতরাং খেতড়ির মহারাজা 'বিবেকানন্দ' নামটি দেননি বলেই মনে হয়, যদিও সম্ভবতঃ তাঁরই অনুরোধে উক্ত নাম 'পাকাপাকিভাবে' স্বামীজী গ্রহণ করেছিলেন।৭

খেতড়ির মহারাজ 'বিবেকানন্দ' নামের উদ্ভাবক নন তার পরোক্ষ প্রমাণ, যদিও ১৮৯১-এর এপ্রিল মাসের কাছাকাছি সময়ে স্বামীজীর সঙ্গে খেতড়ির মহারাজের প্রথম পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু ঐসময়ের এক বছর পরে স্বামীজী ২৬ এপ্রিল ১৮৯২, হরিদাস বিহারী-দাসকে লেখা চিঠিতে *Bivekananda* এই বানানে নাম লিখেছেন; তার কিছুদিন পরে, ১৫ জুন, লিখছেন *Vivekananda* ; তারপর ২২ অগস্ট আবার লিখছেন *Bivekananda*। এরকম বানানের ওলটাপালট থেকে অনুমান করতে ইচ্ছা হয়, এই সময়েই স্বামীজী ঐ নামটি প্রথম ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

॥ ৬ ॥

পরবর্তী প্রসংগ—স্বামীজীর আমেরিকাগমনের সংবাদ রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে কি পরিমাণে জানা ছিল? কিছু আগে উদ্ধৃত ইংরাজি জীবনী অনুযায়ী—ঐ মণ্ডলীর কেউই তা জানতেন না। তা যে ঠিক নয়, এবং কেবল স্বামীজীর আমেরিকাগমনের নয়, বিবেকানন্দ নাম নিয়ে গমনের কথাও কলকাতার কেউ-কেউ জানতেন, তার প্রমাণ আছে। এ-বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা উদ্ধৃতিযোগ্য :

"মাদ্রাজ হইতে [১৮৯৩ সালে] একখানি পত্র আসিল যে, স্বামীজী চিকাগো-মহাসভায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যাওয়া কতদূর সম্ভব হইবে, এবং যাইয়া কৃতকার্য হইতে পারিবেন

৭ রোমা রোলাঁ স্বামীজীর নামের বিষয়ে উৎসুক ছিলেন। স্বামী অশোকানন্দ সন্ধান নিয়ে তাঁকে যে-সংবাদ দিয়েছিলেন, তা ইংরেজি জীবনীর সংবাদের অনুরূপ। সুতরাং তিনিও বলেছেন, খেতড়ির মহারাজই উক্ত নাম তাঁকে দেন। "স্বামীজীর 'বিচারশক্তির' কথা ভাবিয়াই এই নামটি নির্বাচিত হইয়াছিল। নরেন সম্ভবতঃ সাময়িকভাবেই এই নামটি লইয়াছিলেন।" সাময়িকভাবে গৃহীত নামটি স্বামীজীর পক্ষে ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি, কারণ ঐ নামেই তিনি 'অল্পদিনের মধ্যে ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।' রোলাঁ সুগভীরভাবে বলেছেন, আমেরিকা যাত্রাকালে গৃহীত এই নাম স্বামীজী 'পৃথিবীর উপর ন্যস্ত করিতে যাইতেছিলেন।

কোন্ পরিস্থিতিতে খেতড়ির মহারাজা 'বিবিদিষানন্দ' নামের বদলে স্বামীজীকে নাম গ্রহণে অনুরোধ করেছিলেন, তা যথেষ্ট নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন পণ্ডিত ঝাবরমল। তিনি কিন্তু তাঁর সংবাদেব উৎস জানাননি। অদ্বৈত আশ্রমেব স্বামী বলরামানন্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন একটি বিষয়ে—পণ্ডিত বেণীশংকরেব গ্রন্থে উদ্ধৃত ওকায়ত রেজিস্ট্রাবে প্রথম থেকেই 'বিবেকানন্দ' নাম আছে। বেণীশংকরজী খেতড়ির মহারাজা কর্তৃক 'বিবেকানন্দ' নাম-দান থিয়োরীর সমর্থক। সুতরাং তিনি বলতে চেয়েছেন, গোড়াতেই উক্ত রেজিস্ট্রারে পাকা লেখা হয় না; প্রথমে খসড়া করা হয়, কিছুদিন পরে সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে লেখা হয়। ওকায়ত রেজিস্ট্রারে খসড়া-রচনায় সন্ন্যাসীর নাম ছিল না; ভালভাবে খাতা লেখার আগেই উক্ত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নামে বিখ্যাত হয়ে যান; সুতরাং সেই নাম খাতায় ওঠে। কিন্তু বেণীশংকরজীর এই ব্যাখ্যা গৃহীত হবে কি?

একটি প্রশ্ন, বরাহনগর-মঠে বিরজাহোমের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যরা যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, এবং স্বামীজী অন্য সকলের চরিত্র অনুযায়ী তাঁদের সন্ন্যাস-নাম স্থির করে দিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজের জন্য কোন্ নাম নিয়েছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ 'আমার জীবন কথা'য় জানিয়েছেন, সে নাম 'বিবিদিষানন্দ', যদিও তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল নাকি 'রামকৃষ্ণানন্দ' নাম নেওয়া। সে ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করেন উক্ত নামের উপরে শশী-মহারাজের অধিক দাবি স্বীকার করে।

কি না, সে-বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল; সেইজন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ চাহিয়াছিলেন। স্বামীজী কথাটি অতি গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া এইসকল কথা শরৎ-মহারাজ, যোগেন-মহারাজ, সান্ন্যাল-মহাশয় [বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল] ও বর্তমান লেখক ব্যতীত আর কেহই জানিত না।" (ঘটনাবলী, ২য়)।

অন্যত্র ঃ "স্বামীজী আমেরিকা গিয়াছেন, যদিও এ-খবরটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, সান্ন্যাল-মহাশয়, শরৎ-মহারাজ ও বর্তমান লেখক ভিন্ন আর কেহ জানিত না, কিন্তু পরে অল্পবিস্তর সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। আমেরিকা যাইয়া কৃতকার্য হইতে পারিবেন কি না, এ-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া স্বামীজী সান্ন্যাল-মহাশয় ও শরৎ-মহারাজকে লিখিয়াছিলেন যে, একথা যেন প্রকাশ না পায়। কারণ ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইবে, এবং কি যে হইবে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করা তাঁহার মোটেই অভ্যাস ছিল না, এবং মাদ্রাজ ব্যতীত প্রায় কোথাও তিনি ইংরাজিতে কথাবার্তা কহিতেন না [?]। কথাটি যখন প্রকাশ পাইল [অর্থাৎ আমেরিকাযাত্রার কথা] তখন কেহ-কেহ প্রশ্ন তুলিলেন যে, সেখানে ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতে হয়, স্বামীজী তো এসব কিছু জানেন না, তবে যাইয়া কি করিবেন? কেহ-কেহ আপত্তি তুলিলেন যে, সেখানে অপরের সাথে আহার করিতে হইবে, সাধু বা হিন্দুর পক্ষে তাহা কি করিয়া সম্ভব? কেহ-কেহ বলিল, হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা তো নিষেধ, তবে স্বামীজী কি করিয়া যাইতে পারেন? একজনের এক ভীষণ আপত্তি উঠিল; তিনি তাহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—আমেরিকা ঠাণ্ডা দেশ, সাহেবদের দেশ, সেখানে ইজের পরিতে হয়, স্বামীজী গেরুয়া পরেন, তিনি কি করিয়া গেরুয়া ত্যাগ করিয়া ইজের এবং অন্য রঙের কাপড় পরিবেন।"

স্বামীজীর প্রথম সাফল্য-সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে কিভাবে পেৌঁছেছিল সেই বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে কার্ত্তিক মাসে ইংরাজি কাগজে মারউইন মেরী স্নেল নামক জনৈক আমেরিকান পণ্ডিত একখানি পত্র 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম দিয়া লিখিলেন। অনেকের ধারণা হইল যে, লোকটি মাদ্রাজী হইতে পারে কারণ তখন বহুবাজারে অনেক মাদ্রাজী অর্শের ডাক্তার থাকিত এবং তাহাদের নামে 'স্বামী' শব্দ থাকিত। এমনকি আলমবাজার মঠে অনেকে জানিতেন না যে, স্বামীজীর সন্ন্যাস-নাম বিবেকানন্দ। কারণ কথিত আছে, স্বামীজীকে এক মাস বিবিদিকিৎসানন্দ [বিবিদিষানন্দ?], বা সচ্চিদানন্দ বা অপর একটি নাম গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।...কার্ত্তিক মাসে একদিন প্রাতে মাস্টার-মহাশয় একখানি স্টেটসম্যান হাতে লইয়া রামতনু বসুর গলির বাড়িতে যাইয়া আহ্লাদ করিয়া সেই পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন, এবং স্বামী বিবেকানন্দ লোকটি কে, তাহা বিশেষ-ভাবে স্থির করিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাকে সমস্ত কথা বলা হইল তখন তিনি বিশেষ আহ্লাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।" (ঘটনাবলী, তৃতীয়)

কলকাতার রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে কিভাবে স্বামীজীর সংবাদ এসেছিল তার কিছু তথ্য পেলাম। এখন তথ্যগুলিকে একটু নাড়াচাড়া করা দরকার। এক্ষেত্রে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বেণীশংকর কর্তৃক আবিষ্কৃত চিঠিগুলিকে ব্যবহার করব। প্রথম কথা, ইংরাজি জীবনীতে এ-ব্যাপারে যা লেখা হয়েছে, তা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেখানে পাই, বরাহনগর-মঠের [আলমবাজার] সন্ন্যাসীরা স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্য-সংবাদ পড়ে ধরতে পারেননি তাঁদের নরেনই বিবেকানন্দ হয়েছেন যদিও তাঁদের মন বলছিল, ওইটাই হবে। মোটেই না; আলমবাজার মঠের রামকৃষ্ণানন্দ-স্বামী হৃদয়ের গোপন বার্তায় নয়, পূর্বাহ্নে লব্ধ সংবাদের দ্বারা 'বিবেকানন্দ' নামের কথা জানতেন, কারণ খেতড়ির মহারাজকে ১৩ জুন, ১৮৯৩-তে লিখিত চিঠিতে তিনি 'বিবেকানন্দ' নাম ব্যবহার করেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যদিও জগমোহনকে ১১ জুলাইয়ের পত্রের মধ্যে শুধু *Swamiji* লিখেছিলেন, তাহলেও খেতড়ির সঙ্গে তাঁর

পত্রালাপ থাকার দরুন 'বিবেকানন্দ' নাম শোনেননি, এমন হওয়া শক্ত। আমরা দেখতে পাই, ২০ জুলাই স্বামী শিবানন্দ খেতড়ির রাজাকে লেখা চিঠিতে পরিষ্কার 'বিবেকানন্দ' লিখেছেন। যদি তিনি ঐ নাম লিখে থাকেন, তাহলে অবশ্যই জানতেন, খেতড়ি স্বামীজীকে 'বিবেকানন্দ' বলে থাকেন। ঐ চিঠিতে দেখেছি, শিবানন্দ লিখেছেন, তিনি আলমবাজার-মঠে প্রেরিত খেতড়ির রাজার চিঠিপত্র দেখেছেন। রাজা যে ঐ সকল পত্রে 'বিবেকানন্দ' নাম উল্লেখ করেছেন, আমরা অনুমান করতে পারি।

মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় স্বামীজীর আমেরিকাগমনের কথা কারা জানতেন, তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া আছে। কিন্তু তার মধ্যে রামকৃষ্ণানন্দের নাম নেই, যিনি গোড়া থেকেই ব্যাপারটা জানতেন। মহেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, গোড়ায় না হলেও কিছুদিনের মধ্যে প্রায় সকলে ও-ব্যাপারটা জেনে গিয়েছিলেন। তা যে সত্য, তার প্রমাণ—১৮৯৩-এর কার্ত্তিক মাসে স্টেটসম্যান পত্রিকা নিয়ে মাস্টার-মহাশয়ের রামতনু বসুর গলিতে ছুটে আসা। মাস্টার-মহাশয় স্পষ্টভাবে 'বিবেকানন্দ' নাম না জানতে পারেন, কিন্তু স্বামীজীর আমেরিকাগমনের কথা অবশ্যই জানতেন, নচেৎ তিনি হঠাৎ স্টেটসম্যান হাতে নরেন্দ্রনাথের মাতুল-বাড়িতে হাজির হলেন কেন? নিশ্চয় তিনি যাচাই করতে গিয়েছিলেন, এই বিস্ময়কর কৃতিত্ব যে-বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, তিনিই নরেন্দ্রনাথ কি না! নরেন্দ্রনাথ এ-রকম একটা-কিছু করতে পারেন, এ ধারণা নিশ্চয় রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া স্টেটসম্যানের সংবাদে বিবেকানন্দ যে রামকৃষ্ণ-শিষ্য একথাও লেখা ছিল।

মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথাতেও তথ্যের গরমিল আছে। ১৮৯৩, কার্ত্তিক মাসে (৯ নভেম্বর) স্টেটসম্যানে স্বামীজীর সংবাদ প্রথম বেরিয়েছিল, তাঁর এই কথা ঠিক; সেই কাগজ নিয়ে মাস্টার-মশাইয়ের রামতনু বসু লেনে নরেন্দ্রনাথের মাতুলালয়ে ছুটে যেতেও বাধ্য নেই, কিন্তু স্টেটসম্যানে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মারউইন স্নেলের চিঠি ছিল না—সে চিঠি বেরিয়েছিল পায়োনীয়ারে, ৮ মার্চ, ১৮৯৪। ঐ তারিখের অনেক আগেই মিরার ফলাও করে স্বামীজীর অনেক খবর ছেপে কলকাতায় চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে মারউইন মেরী স্নেলের পত্রযুক্ত কাগজ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে মাস্টার-মহাশয়ের ছুটে আসার অর্থ হয় না। মহেন্দ্রনাথের মনে মিঃ স্নেলের চিঠির কথা ওঠার কারণ, আমাদের ধারণা—বস্টন ইভনিং ট্রানসক্রিপ্টের সংবাদের কয়েকমাস পরে বেরুলেও অধ্যাপক স্নেলের লেখাটি সকলকে গভীরভাবে অভিভূত করেছিল। অধ্যাপক স্নেল একেবারে শিষ্যের মত বিবেকানন্দের বন্দনা করেছিলেন, এবং তিনি ধর্মমহা-সভার বিজ্ঞানশাখার সভাপতির মত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এইজন্য প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী মহেন্দ্রনাথের মনেও বস্টন ইভনিং ট্রানসক্রিপ্টকে ঠেলে মারউইন মেরী স্নেলের চিঠি জায়গা করে নিয়েছে।

এখানে আর একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য। স্টেটসম্যানের আগেই মেসেনজারে কিছু বিবেকানন্দ-সংবাদ বেরুলেও রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিনা মহেন্দ্রনাথ জানাননি।

মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে খেতড়ির রাজার পত্রব্যবহার চলত, এবং মহেন্দ্রনাথই তাঁকে স্বামীজীর মাদ্রাজে অবস্থানের সংবাদ দিয়েছিলেন, তথাপি স্বামীজী আমেরিকা পাড়ি দেবার আগে মহেন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে ঠিক সংবাদ জানতেন না। স্বামীজী ১৮৯৩, ৩১ মে বোম্বাই থেকে জাহাজে ওঠেন; ২ জুন মহেন্দ্রনাথ খেতড়ির রাজাকে লেখেন ঃ

"My mother and grandmother both expressed their consent about my brother's tour round the world."

এই চিঠি থেকে মনে হয়, স্বামীজী বোধহয় খেতড়ির রাজাকে বলেছিলেন, তিনি যেন পাশ্চাত্ত্যযাত্রার কথা তাঁর মাকে লিখে পাঠান। তবে স্বামীজী নিশ্চয় এ-ব্যাপারে মায়ের

সম্মতি চাননি; নচেৎ সেই সম্মতি আসার আগেই যাত্রা করতেন না। এখানে আমরা স্বামীজীর মহীয়সী জননীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করব, যিনি ভারতীয় মাতা হয়েও তাঁর সন্তানের বিদেশযাত্রা অনুমোদন করেছিলেন। তাঁর মনের ঔদার্যের এবং শক্তির অপূর্ব এই নিদর্শন। স্বামীজীও নিজ জননী সম্বন্ধে কিছুদিন পরেই লিখবেন :

"She could bear to give me up for the service of God and man,.. the most beloved of her children—her hope."

দেখা যাচ্ছে, স্বামীজীর বিদেশযাত্রা তাঁর বাড়ির প্রায় সকলে—মা, দিদিমা ও মেজভাই মহেন্দ্রনাথ জানতেন। তবে স্বামীজী ঠিক কোথায় গেছেন, তা বোধহয় তখনি তাঁরা জানেন নি। কারণ ১৩ জুন মহেন্দ্রনাথ খেতড়ির রাজাকে লিখেছেন :

"I have heard from Swamy R. [Ramakrishnananda] and Swamy Sarat Chandra [Swami Saradananda] that my Dada has gone to Burmah. He shall then go to China or some such place."

এর পরে ৫ জুলাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিদেশযাত্রায় পরে স্বামীজীর সংবাদ না পেয়ে খেতড়ির রাজাকে লিখেছেন :

"Since his start from India we have received no news of our much esteemed Bivekanaanda. If your Highness has got any of his tidings, kindly bless us with the same."

বিদেশ মানে যে স্বামীজী চিকাগোয় যাচ্ছেন, সে-সংবাদ প্রথম স্পষ্টভাবে স্বামীজীর পরিবারে আসে যাত্রার এক মাসেরও পরে। ৬ জুলাই মুন্শি জগমোহন মহেন্দ্রনাথকে লেখেন :

"Swami Vivekananda is having a prosperous voyage to Chicago after his leaving Bombay. His Highness has received two letters from him, one from Colombo, and the other from Penang, both written while on board the steamer 'Peninsula.'"

রামকৃষ্ণানন্দ বা সারদানন্দের মতো ব্রহ্মানন্দ বা তুরীয়ানন্দও স্বামীজীর আমেরিকাযাত্রার কথা জেনেছিলেন, কারণ স্বামীজীর খেতড়ির যাবার পথে (স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে) তাঁরা বোম্বাইয়ে কালীপদ ঘোষের বাড়িতে মিলিত হয়েছিলেন, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে। স্বামীজীর সঙ্গবিচ্ছিন্ন হবার আগে তাঁরা জেনে গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রিয় গুরুভাই আমেরিকা চলেছেন।৮ জয়পুর থেকে অতঃপর ব্রহ্মানন্দ, মুন্শি জগমোহনলালকে যে-চিঠি লেখেন, তাতে পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে। ৬ জুলাইয়ের ঐ চিঠি থেকে আরও

৮ **স্বামী তুরীয়ানন্দ**: খেতড়ি থেকে স্বামীজীর ফেরার পথে তাঁর সঙ্গী হয়ে বোম্বাই যান, বিদায় দিতে। উদ্বোধনের ১৩১২, ১ ভাদ্র সংখ্যায় 'খেতড়িরাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে প্রিয়নাথ সিংহ লিখেছেন: "[খেতড়ি হইতে বোম্বাইয়ের পথে] আবু স্টেশনে আসিয়া স্বামীজী তাঁহার এক ভক্ত রেল-কর্মচারীর আবাসে সেই রাত্রি রহিলেন। ইতিপূর্বে স্বামীজীর দুইজন গুরুভাই পীড়িত হওয়ায় স্বামীজী তাঁহাদের এইস্থান হইতে দশ মাইল দূরে আবুপর্বতে খেতড়ির গ্রীষ্মাবাসে রাখিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সংবাদ পাঠান। তাঁহাদের একজন যথাসময়ে আসিলেন। তিনি, জগমোহন, ও ভক্ত রেলওয়ে-কর্মচারী একসঙ্গে পুনরায় বোম্বাই যাইবার গাড়িতে উঠিলেন।"

স্বামীজীর সঙ্গে যে-গুরুভাই বোম্বাই গিয়েছিলেন, তিনি যে স্বামী তুরীয়ানন্দ, তা তাঁর নিজ কথাতেই দেখা যায়। 'স্পিরিচুয়াল টকস্' (অদ্বৈত আশ্রম; দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৯৪৪) গ্রন্থে পাই, তুরীয়ানন্দ বলেছেন: "স্বামীজী যখন প্রথমবারের জন্য আমেরিকা যান, আমি মাউণ্ট আবু থেকে বোম্বাই পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী ছিলাম: চলন্ত ট্রেনের মধ্যে স্বামীজী অতি গভীরস্বরে

দেখি, অখণ্ডানন্দও ব্যাপারটা জেনেছিলেন : "প্রায় এক সপ্তাহ হল, আমরা আবু রোড থেকে এখানে নিরাপদে এসে পৌঁছেছি। সঙ্গে আমাদের আর এক গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দজী ছিলেন। তিনি বোম্বাই থেকে এসেছিলেন খেতড়িতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।...অনুগ্রহ করে জানান, স্বামীজীর কাছ থেকে আর কোনো খবর পেয়েছেন কি না! তাঁর ঠিকানাও আমাদের দিন, যাতে আমরা মাঝে-মাঝে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।" [অ]

এর পরে ৩১ জুলাই জগমোহনকে লেখা মহেন্দ্রনাথের একটি চিঠি পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে বহু মূল্যবান সংবাদ আছে :

"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছ থেকে জেনে আনন্দিত হলাম যে, আপনি আপনাদের জায়গা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত আমার ভ্রাতার যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন এবং একসঙ্গে আবার বোম্বাইয়ে ফিরেছেন ও তাঁকে স্টিমারে পৌঁছে দিয়েছেন। কলকাতায় তাঁর সম্বন্ধে কোনো খবর জানা নেই। কেউ বলছেন, তিনি মাদ্রাজীদের প্রতিনিধিরূপে গিয়েছেন এবং চিকাগোর মিঃ বারো তাঁকে সমুদ্রযাত্রার খরচ পাঠিয়েছেন। এ-বিষয়ে যদি আপনি অনুগ্রহ করে কোনো সংবাদ পাঠান আমি খুবই সুখী হব, কারই তিনি প্রায় তিন মাস তাঁর বাংলার কোনো বন্ধুর কাছেই কোনো চিঠি পাঠান নি। সেদিন একটা গুজব ছড়িয়েছে যে, তিনি চিকাগো পৌঁছেছেন, এবং মাদ্রাজের অ্যাসিট্যাণ্ট কম্‌ট্রোলার বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। কিন্তু তার সম্ভাব্যতা বিচার করে ও সময়ের হিসাব করে ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমি খুবই সন্দেহ বোধ করি; বস্তুতঃপক্ষে ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেই অগ্রাহ্য

বলেন, '[আমেরিকায়] যে আয়োজন চলেছে, তা [নিজের দিকে ইঙ্গিত করে] এর জন্যই। আমার মন তাই বলছে। বেশিদিন পরে নয়, শীঘ্রই দেখবে একথা সত্য।" [অ]

আধ্যাত্মিক মানুষেরা খুবই দুজ্ঞেয় ব্যাপার। এই পর্বে স্বামীজী সুনিশ্চিত ঐশ্বরিক নির্দেশ যেমন পাচ্ছেন, তেমনি উক্ত ঈশ্বর তাঁকে নিয়ে কিছু নিষ্ঠুর খেলাও খেলছেন, অনিশ্চয়ের ছায়া-পথে ঘুরিয়ে। নচেৎ যে-ব্যক্তির কণ্ঠে সরস্বতী দীর্ঘকাল বীণা বাজাচ্ছেন, তিনি ধর্মমহাসভায় ভাষণ দেবার জন্য পুনঃপুনঃ আহূত হয়েও সভয়ে পিছিয়ে থাকবেন কেন? তারপর যখন দাঁড়িয়ে উঠে বলবেন—কী বলেছেন নিজে জানবেন না কিন্তু ইতিহাস জানবে—এ সেই কণ্ঠস্বর, যা কখনো শোনা গেছে কুরুক্ষেত্রে, কখনো 'শৈলোপরি।'

পদানত লাঞ্ছিত ভারতের প্রতিনিধিরূপে পাশ্চাত্যযাত্রার আগে স্বামীজী কিন্তু বাহ্যতঃ উগ্র আত্মমর্যাদার বাদ্য করছিলেন। এই আবু স্টেশনেই স্বামীজী এক অসভ্য ইংরেজ রেলকর্মচারীকে রীতিমত ধাতানি দেন। দাবড়ি খেয়ে কেঁউ-কেঁউ করতে-করতে লোকটি পালিয়ে যাবার পর স্বামীজী জগমোহনকে বলেছিলেন, "হিন্দুরা কত শত-সহস্র গুণে অন্য জাতি অপেক্ষা উচ্চ অন্তঃকরণবিশিষ্ট। কেবল ধর্মশিক্ষার অপচারেই আপনাকে সকল-অপেক্ষা হীন ভাবে। তাই জন্য জুতার ঠোক্কর খেয়ে ঝেড়ে ফেলে।"

জাহাজে ওঠার পরে এক শ্বেতাঙ্গ ভৃত্য, প্রথমশ্রেণীর যাত্রী বিবেকানন্দের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করে। ঐকালে সাহেবী পরিচর্যায় ভারতীয়দের অন্তঃকরণে ভক্তির ব্যাকুল 'না-না' ধ্বনি উঠত। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে স্বামীজীর ভক্তিবোধ কম ছিল। জগমোহনকে তিনি বলেন: "আমরা যে-যেমন লোক, তার সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করিনি, তাই ওরা পেয়ে বসে। এই যে গৌরাঙ্গটি দেখছ, এ আমার হুকুম শুনবে বলে হাজির। এখন সব গৌরাঙ্গই এক রকম ডোলের। কেহবা এসে এর সঙ্গে যেন মনিবের [কাছে ভৃত্যের] মতো 'আপনি হুজুর' করবে। তা নয়, ও গোলাম। গোলামের মতো ওকে খাটিয়ে নিয়ে, দাবে রাখতে হবে, রাশভারি হতে হবে। তোমরা রাশ হালকা করে ফেলো, সেই হয় দোষ। তুমি দেখবে, আমি কেমন রাশভারি হয়ে ওকে দাবিয়ে নেবো, বাছাধন কেঁচো হয়ে থাকবে।'

তারপর স্বামীজী যখন জাহাজে সকলের মধ্যে আহারে বসেছেন, সুন্দর গেরুয়া পরা, পাগড়ি মাথায়, উন্নত আকার, জগমোহন দেখলেন—'স্বামীজী যেন রাজশোভা ধারণ করিয়া বসিয়াছেন।'
(প্রিয়নাথ সিংহের রচনা থেকে সংকলিত)

করেছি। হয়তো তাঁর কোনো অবস্থিতিস্থান থেকে আপনার কাছে কোনো চিঠি এসেছে।... আমরা তাঁর সম্বন্ধে খুবই উদ্বিগ্ন।" [অ]

এই চিঠি থেকে পাই, স্বামীজীর গতিবিধি সম্বন্ধে কলকাতার কিছু লোকের স্পষ্ট ধারণা না থাক, 'গুজবপ্রাপ্ত ধারণা' ছিল; তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে—মাদ্রাজীরা তাঁকে ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে। স্বামীজীর গতিবিধি সম্বন্ধে কৌতূহলী গুজব যে, ছড়াচ্ছিল তার অন্য প্রমাণ রয়েছে এর আগে ২০ জুলাই খেতড়ির রাজাকে লেখা স্বামী শিবানন্দের চিঠিতে ঃ "আপনি কি অনুগ্রহ করে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সংবাদ পাঠাবেন, কারণ গুজব ছড়িয়েছে যে, তিনি ইংলণ্ডযাত্রা করেছেন।" [অ]

এই পত্র শিবানন্দ আলমোড়া থেকে লেখেন। এর থেকে আরও জানা যায়, ই টি স্টার্ডির সঙ্গে আলমোড়ায় তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল, স্টার্ডি থিয়জফিক্যাল সোসাইটির কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পণ্ডিত বেণীশংকরের আবিষ্কৃত পত্রের আর একটির উল্লেখ এখানে করা যায়। ১৪ অগস্টের চিঠিতে বেলগাঁওয়ের হরিপদ মিত্র জগমোহনের কাছে চিকাগো-প্রস্থিত স্বামীজীর ঠিকানা চেয়েছিলেন। স্বামীজী চিকাগো গেছেন তা হরিপদ মিত্র জানতেন, কারণ তাঁর পত্নী ইন্দুমতী মিত্রকে ২৪ মে'র চিঠিতে স্বামীজীই আমেরিকাযাত্রার নির্ধারিত পরিকল্পনা জানিয়েছিলেন।

উপরে যেসব তথ্য উপস্থিত করলাম, তাদের দ্বারা বোঝা গেল, স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার সংবাদ কলকাতায় তাঁর ঘনিষ্ঠ-মহলে অজ্ঞাত ছিল না। এমনকি তিনি যে ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিরূপে গেছেন, তেমন একটা কানাঘুষার সংবাদও ছিল। এই গুজবের ব্যাপ্তি কতখানি বলা সম্ভব নয়।

বেণীশংকরের আবিষ্কৃত আর একটি চিঠি থেকে আমরা দেখি, সাধারণের মধ্যে স্বামীজীর সাফল্যকাহিনী যদিও স্টেটসম্যান ও মিরারের সংবাদ দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল কিন্তু ঘনিষ্ঠ-মহলের কারো কারো কাছে তারো পূর্বে প্রকাশিত মেসেনজারের বিবেকানন্দ-সংবাদ অলক্ষিত থাকেনি। ৪ নভেম্বর, অক্ষয়কুমার ঘোষ খেতড়ির রাজাকে লেখেন ঃ

"I appear before your Highness to-day with a very happy tidings. It is that of Swamiji. Swamiji has been honoured with a sit on the platform in the Parliament of Religions at Chicago...He represented the orthodox Hinduism of India and spoke on it and answered to many questions that were put to him by the representatives, male and female of the various communities present there. In the *Messenger* it is published as follows."

এর পরে পত্রলেখক মেসেনজারে প্রকাশিত সংবাদ উদ্ধৃত করেন, যা আমরা আগেই উপস্থিত করেছি।

ON THE BRAIN —No. 45
SWAMI VIVEKANANDA,
the representative of orthodox Hinduism in the World's Parliament of Religions at Chicago

ভারতীয় পত্রিকায় স্বামীজীর একমাত্র কার্টুন—যা আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি। বেরিয়েছিল বোম্বাইয়ের হিন্দী পাঞ্চ পত্রিকায়, ১৮৯৪ মার্চে। ঐ সময়ের মধ্যে কিন্তু কোনো ভারতীয় পত্রিকায় স্বামীজীর মুদ্রিত চিত্র দেখিনি।
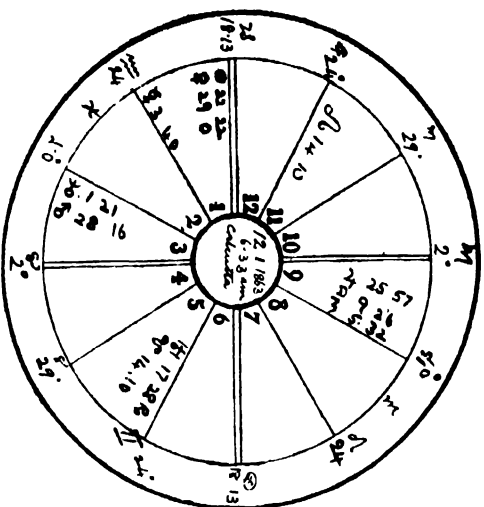
সানফ্রানসিসকো এগজামিনার পত্রিকায় স্বামীজীর সংগে সাক্ষাৎকার-বিবরণের সংগে এই কার্টুনটি বেরিয়েছিল। কলকাতা বেদান্ত-মঠের সংগ্রহশালায় এটি পেয়েছি।

THE STATESMA[N]

HINDOOS at the WORLDS FAIR.

F[r]a[nc]is A[lb]ert Do[u]ghty writing to the B[oston] ... [illegible]

[illegible]

The most striking figure one meets in this ... Swami Vivekanand ... [illegible]

৯ নভেম্বব ১৮৯৩—স্টেটসম্যানেব সেই সংবাদটি—যা অপবিচিত বিবেকানন্দকে কলকাতায প্রকাশ কবে চাঞ্চল্যসৃষ্টি কবেছিল।

THE Bengalee.

SATURDAY, 18 MAY, 1895.

SWAMI VIVEKANANDA ON THE SEA-VOYAGE MOVEMENT

THERE is not a Hindoo who is not proud of Vivekananda Swami—who would not honor him and his teachings. He has done honour to himself, to his race and his religion. If we are right in this view it follows that the opinions of Vivekananda are entitled to the highest consideration. This is what he says with regard to the sea voyage movement :—" Expansion is life, contraction is death. Love is life, hatred is death. We began to die the day, we began to contract—to hate other races—and nothing can prevent our death until we come back to life, to expansion. We must mix, therefore, with all the races of the earth—and every Hindu that goes out to travel in foreign parts, does more benefit to his country than hundreds of those bundles of superstition and self[illegible] whose one aim in life [illegible] be [illegible] the manger. Those wonderful [illegible] of national life which the Western nations have raised are supported by pillars of character—and until we

বিবেকানন্দেব প্রচন্ড প্রভাব যে অবিলম্বে সামাজিক ধাবণাবদল কবেছিল—বেঙ্গলীব সম্পাদকীযতে তাব আভাস।

SUPPLEMENT TO

The Indian Mirror.

CALCUTTA, THURSDAY, FEBRUARY 18, 1897.

Provincial.

SERAMPORE

Our Contemporaries.

SWAMI VIVEKANANDA'S FIRST LECTURE

প্রথম পর্যায়ে বিবেকানন্দ-প্রচারে ইণ্ডিয়ান মিরারের অবিস্মরণীয় ভূমিকা। এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন সমকালে সাংবাদিক-চূড়ামণি এবং সাংস্কৃতিক জগতে অবিসংবাদিত নেতা-রূপে স্বীকৃত।

THE MADURA MAIL, SATURDAY, JANUARY 28, 1893.

SUPPLEMENT TO
THE THEOSOPHIST.

MARCH 1893

HEAD-QUARTERS.

During the absence of the President-Founder and Mr Edge, the monotony of routine work has been agreeably broken by several gatherings of Theosophists and friends upon various occasions The arrival of Saunyasi Sachchidánanda Swami in Madras, and his subsequent visits to the Head-quarters of the T S has been the cause of much local interest The Sannyasi is possessed of great versatility. a thorough knowledge of Páli, Sanskrit, English, French and Hebrew being among his many accomplishments He is also an M A of the Calcutta University To these Nature has added a fine stalwart physique and dignified presence He has travelled a great deal and, among other places, has visited Lhassa and other cities in Thibet In his teaching he follows Sri Sankaráchárya But what sets him off from all others of his Holy Order, is the fact that he travels far and wide, mixing freely with the people, holding public meetings and discussions upon religious philosophy The Sannyasi has had audiences from among the highest intellects in Madras, and has shown himself to be equally facile with arguments from Western philosophy and well versed in modern science

Sachchidánanda expressed himself pleased with some experiments in "localization" and 'impression-reading' conducted at Head-quarters Several seances have been given during the month, many persons, including members of the T S, enquirers and sceptics, being present on each occasion. The experiments have always given satisfaction and elicited much enquiry; and the fact that avowed sceptics have not unfrequently produced the best results, has sent many away with visible wonderment in their faces Occasionally a boat-load of people will come down the river and stop to examine the Library, make enquiries about our teachings, and so forth Thus, between our spells of work we manage to keep touch with our neighbours and friends, and to engage the attention of one and another among strangers to our movement

W R OLD

পরিব্রাজক-জীবনে সংবাদপত্রে স্বামীজীর সংবাদ বেরোয়নি বলেই এতদিন ধারণা ছিল। কিন্তু আমরা ঐকালে প্রকাশিত দুটি সংবাদ আবিষ্কার করতে পেরেছি। একটি বেরিয়েছিল থিয়জফিস্ট পত্রিকায়, অন্যটি মাদ্রা মেলে।

A BENGALI SADHU ON HINDU RELIGION AND SOCIOLOGY.

A young Bengalee *Sanyasi* of about thirty-two years of age, and a Master of Arts of the Calcutta University was last week interviewed at the Triplicane Literary Society by about a hundred educated Indians, among whom was Dewan Bahadhur Ragunatha Rao. A summary of what was stated by the *Sadhu* is published by the *Indian Social Reformer*, from which we make the following extracts:—

THE VEDIC RELIGION.

The perfect religion is the Vedic religion. The Vedas have two parts—mandatory and optional. The mandatory injunctions are eternally binding on us. They constitute the Hindu religion. The optional ones are not so. These have been changing and been changed by Rishis to suit the times. The Brahmins at one time ate beef and married Sudras. Calf was killed to please a guest. Sudras cooked for Brahmins. The food cooked by a male Brahmin was regarded as polluted food. But we have changed our habits to suit the present *yug*. Although our caste rules have so far changed from the time of Manu, still if he should come to us now, he would still call us Hindus. Caste is a social organisation and not a religious one. It was the outcome of the natural evolution of our

SWAMI VIVEKANANDA
Disciple of
SRI RAMKRISHNA PARAMHANSA DEVA.

NC.

SWAMI VIVEKANANDA

DISCIPLE OF THE LORD

RAMKRISHNA PARAMHANSA DEB

AT THE PARLIAMENT OF RELIGIONS,

CHICAGO.

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE

OF

BABU GURU PRASANNA GHOSE

Of Jorabagan, Calcutta.

5,000 Copies Distributed on the occasion of the
BIRTHDAY ANNIVERSARY OF THE
LORD RAMKRISHNA PARAMHANSA DEB.

Calcutta:
NABABIBAAKAR PRESS,
63/3, Machua Bazar Road.
March 1894.

এই পুস্তিকাটি স্বামীজীকে বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য করেছিল, সেইসঙ্গে বিরক্তও। 'কিছু অসুখী ব্যক্তি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

'অপরিচিত সন্ন্যাসী' কি সত্যই অপরিচিত?

॥ ১ ॥

স্বামীজীর অভ্যুদয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি যেন কোন্ অজ্ঞাত রাজ্য থেকে অত্যুজ্জ্বল উল্কার মতো খসে পড়েছিলেন। অনুরাগীদের এই কথাই বিদ্বেষের ভাষায় রূপান্তরিত করে বিরোধীরা বলেছেন, ঠিক কথা, আমেরিকা যাওয়ার আগে বিবেকানন্দ ছিলেন পরিচয়হীন ভবঘুরে এক ছোকরা মাত্র। অনুরাগ ও অসূয়া, দুইই এক ভাষা গ্রহণ করেছে—বিস্ময়কর বটে! কিন্তু বিবেকানন্দ কি সুপরিচিত হবার আগে সত্যই অপরিচিত? এখানে এ-বিষয়ে তথ্যসন্ধানের প্রয়োজন আছে। অল্পবিস্তর সে-কাজ আমরা করেছি। এবং কিছু নূতন সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি, যা এতাবৎ বিবেকানন্দ-জীবনীতে ব্যবহৃত হয়নি।

সেই সন্ধান-ফল গোচর করার আগে বলে নেওয়া দরকার, বিবেকানন্দ এই পর্বে নিজের পরিচয় আবৃত করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। আত্মপ্রচারকে ধর্ম করেননি বলে যেসব যন্ত্রের সাহায্যে নামবাদ্য হয়, সেগুলি মোটেই ব্যবহার করেননি। উল্টোপক্ষে দেখব, যেখানে সংবাদ-পত্রে বা গ্রন্থে তাঁর নাম উঠবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে দৃঢ় নিষেধ করেছেন। অপূর্ব হল, এই মানুষটি প্রচারের আরাধ্য দেবতা যিনি সেই নিজ নামকে সবচেয়ে কম মূল্য দিয়েছেন। তা না-হলে, পরিব্রাজক অবস্থায় বারেবারে নিজের নাম বদলাতেন না। আমরা জানি, মানুষের খ্যাতি-চেষ্টা মানে নিজ নামকে জনমনে স্থায়ী করার চেষ্টা।

কিন্তু বিবেকানন্দের পক্ষে আত্মগোপন করা সত্যই সম্ভবপর নয়—তিনি এমনই প্রদীপ্ত পুরুষ। মানুষ তাঁকে চিনে নিতই, কোনো বিশেষ নামে না হলেও—জ্যোতির্ময় উপস্থিতি-রূপে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যাঁরা স্মৃতিকথা লিখেছেন, তাঁরা উক্ত 'অজানা সন্ন্যাসী'র তখনই প্রতিভাত প্রতিভাদ্যুতি সম্বন্ধে সোচ্ছ্বাসে মন্তব্য করেছেন। এঁদের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলকের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিও আছেন। এই অধ্যায়ে আমরা বিবেকানন্দের আমেরিকাপূর্ব ভারতীয় জীবনের 'খ্যাতি' সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করতে চেষ্টা করব।

॥ ২ ॥

.বিবেকানন্দ যেখানে সবচেয়ে কম পরিচিত বলে কথিত সেই কলকাতার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। বহু প্রতিভার উদয়ক্ষেত্র, মনীষার বিচরণভূমি, আন্দোলনের রণক্ষেত্র, ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় একজন যুবকের পক্ষে যতখানি লোকজ্ঞাত হওয়া সম্ভব, নরেন্দ্রনাথ তা ছিলেনই, বরং বেশি। কলেজে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ে পারদর্শিতার জন্য যত না নাম, অনেক বেশি খ্যাতি মুক্ত প্রখর বুদ্ধি, স্বাধীনচিত্ততা, এবং সঙ্গীতকুশলতার জন্য। প্রিন্সিপাল উইলিয়ম হেস্টি কলকাতায় তখন শিক্ষাবিৎ এবং গোঁড়া যুযুধান খ্রীস্টান হিসাবে সুপরিচিত—তাঁর কাছে 'নরেন্দ্রনাথ সত্যই প্রতিভা! তার মতো দর্শনের ছাত্র জার্মান বিদ্যালয়-সমূহেও বিরল'—ইংরাজি জীবনীতে তাই পাই। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন,

এবং পরিচিত হয়েছিলেন সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে স্নেহ করতেন, কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তিনি এক মঞ্চে অভিনয় করেছেন (অবশ্যই ধর্মীয় নাটকে), শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর সন্ধানে তাঁর বাড়িতে প্রায়ই আসতেন, এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁকে জানতেন। অন্যান্য বিখ্যাত ব্রাহ্মরাও তাঁকে চিনতেন ধরে নেওয়া যায়, বিশেষতঃ তিনি যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদি সদস্যদের একজন এবং সুপরিচিত গায়ক। বিখ্যাত দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, নরেন্দ্রনাথ ছাত্রবয়সে নিয়মিত তাঁর বক্তৃতা শুনতেন।১ শোনা যায়, এবং সেকথা সত্য বলেই মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে রাজনীতিতে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন।২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে চিনতেন, বিদ্যাসাগরের স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। পৈতৃক মামলার সূত্রে ডবলিউ সি ব্যানার্জির সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীতে প্রবেশের পর তিনি নিজ গুণে এবং তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের সীমাহারা বেহিসেবি স্নেহের জন্য, অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।৩ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তা ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে। এইভাবে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অসুখের সময়ে তিনি বিখ্যাত ডাক্তার ও বিজ্ঞানসেবী মহেন্দ্রলাল সরকারকে কাছ থেকে জানবার সুযোগ পান। মহেন্দ্রলাল বহু তর্ক ও কথালাপের মধ্যে এই প্রদীপ্ত যুবকটিকে ভালই চিনেছিলেন। তৎকালীন বাংলার প্রধান নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আরও যেসব বিখ্যাত ব্যক্তি যাতায়াত করতেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর কমবেশি জানাশোনা হয়েছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। এইসকল তথ্য থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত করা চলে, সমুজ্জ্বল চেহারার বুদ্ধিদীপ্ত যুবকরূপে তিনি তৎকালীন বিশিষ্ট বাঙালীদের অনেকের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে যে লিখেছিলেন, "এই কলিকাতার বহু ধনী মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন," সেকথা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়, যদিও স্বামীজী তারপরেই যোগ করে দিয়েছিলেন, "তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তির কারণ বোধ হয়।"

---

১ "I soon helped to make student life instinct with a new spirit in Calcutta. I delivered lectures. ..upon such subjects as Indian Unity, the Study of History, the Life of Mazzini, the Life of Chaitanya, High English Education, etc.... Amongst those who regularly attended the meetings in those days were Mr. B. Chakravarty, Swami Vivekananda, Mr. Nanda Kishore Bose, Mr. S. K. Agasti and others." [Surendra Nath Banerjee : *A Ndtion in Making*].

২ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের নিজ দলে পেতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথায়' পাই: ১৮৯৬ সালে অখণ্ডানন্দ বৈদিক শিক্ষার অনুকূলে বেঙ্গলী পত্রিকা মারফত আন্দোলন চালাবার অনুরোধ জানতে যখন সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়েছিলেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে বলেন, 'আপনারাও কংগ্রেসের প্রচারকাজে যোগদান করুন।' তাতে অখণ্ডানন্দ তাঁকে তৎকালীন কংগ্রেসের চেহারা সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিলেন, তা শুনে সুরেন্দ্রনাথ বলাবাহুল্য খুশি হতে পারেন নি। অখণ্ডানন্দ তাঁকে বলেন :

"আপনাদের কংগ্রেস একটা মনস্ট্রাস হুজুগ বলেই আমার মনে হয়। বছরে তিনদিন মাত্র খুব হৈ-চৈ, ভারি সমারোহ, তারপর-সব ঠাণ্ডা। দেশের সর্বত্র কত নিরন্ন, বিপন্ন অসহায় লোক পড়ে রয়েছে, কই আপনারা তাদের কোনো তো খোঁজ নেন না, আপনাদের কোনো প্রচারককে কোনো চাষীর কুঁড়েঘরে দেখতে পাই না?"

৩ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎবাণী সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যা সেই সময়ে অত্যুক্তি ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্যই এই ধরনের কথা বলতেন, ওগুলো যে শ্রীম'র রচনা নয়, তার প্রমাণ এখানে মেলে :

এই পর্বে সঙ্গীতকুশলতা এবং ক্ষুরধার দার্শনিক বুদ্ধি—প্রধানতঃ এই দুই গুণেই নরেন্দ্রনাথ সকলকে আকৃষ্ট করেছিলেন। সম্পন্ন বাড়ির সন্তান নরেন্দ্রনাথ কেবল সঙ্গীতজ্ঞ-রূপে নন, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞরূপেও সুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এ' তাঁর বন্ধু বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে 'সঙ্গীতকল্পতরু' (১৮৮৭) নামে যে-একটি সঙ্গীত-সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার সুদীর্ঘ ভূমিকা তিনিই লেখেন, যেখানে বিস্ময়কর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গীতের কলাকৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে বইটির কয়েকটি সংস্করণ হয়। তার ফলে নরেন্দ্রনাথ নিশ্চয় প্রচারগৌরব লাভ করেছিলেন। অনুমান করি, এর কাছাকাছি সময়ে তিনি হারবার্ট স্পেনসারের 'এডুকেশন' গ্রন্থের অনুবাদ করেন 'শিক্ষা' নাম দিয়ে। (গ্রন্থটির ঠিক প্রকাশকাল এখনো নির্ধারণ করতে পারিনি)।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য নরেন্দ্রনাথ যে, পরিচিত মহলে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, তার পক্ষে একটি তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। অমৃতলাল রায় ঐকালে প্রখ্যাত ব্যক্তি। তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন এবং উগ্র আধুনিক মতের জন্য গোড়ার দিকে সুবিদিত ছিলেন। পরে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে উঠেন।৪ অমৃতলাল 'হিন্দু ম্যাগাজিন' ও 'হোপ'—এই দুটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। হিন্দু ম্যাগাজিনের ১৮৯১, সেপ্টেম্বর সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তিনি নরেন্দ্রনাথের বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলেন, রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের মধ্যে একজন আছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যাঁর আশ্চর্য পাণ্ডিত্য। ১৮৯১ সালে অমৃতলাল রায়ের মতো সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী ঐকথা বলেছেন।—

"He [Ramakrishna] was a man of highly developed consciousness whose conversation bristled with truths that would go home to the hearts of his hearers, among whom used to be some of the most intellectual men of his day, such as Babu Keshub Chunder Sen, and Protap Chunder Mozoomdar and others. Among the disciples of this mad man,

"N Gupta, says in the *Bengalee* :—While Narendra Nath Dutta was yet an obscure young student Ramakrishna Paramahansa used to point him out to other people sitting around him saying, 'Mark him well! He is a hundred-petalled lotus—*Satadal Padma*—perfect in his incarnation and charged with a message to deliver.' Later on the Paramahansa used to say that Vivekananda had work to do, and he would be most heard of in the West. People listened and wondered, but never was prophecy truer or more unerring."

(*The Indian Review* : May, 1914)

৪ ১৮৯৮, ৩০ সেপ্টেম্বরের অমৃতবাজারের সম্পাদকীয় অনুযায়ী, 'অমৃতলাল আমেরিকায় প্রথম বাঙালী।' ১৮৯৩, ১৪ নভেম্বর অমৃতবাজার এ'র বিষয়ে লিখেছিল:

"When Babu Amrita Lal Roy, with that enterprise which has made the Bengalees an object of jealousy to their masters, not only in entering America without a pice in pocket, but in making a living there...."

আধুনিকতা থেকে রক্ষণশীলতায় অমৃতলালের রূপান্তর ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মারের ১৮৯৫, ১ জুন সংখ্যায় আক্রান্ত হয়েছিল:

"Babu Amrita Lal Roy was once a great radical. He went to America and astonished the world by his one sided attack of the British Government. But he returned home and joined his reactionary countrymen and his bitterness against those that plead for wholesome innovations in the social system is intense and we need not say, unjust."

who have given up every desire and hope of this world on the strength of his teachings are some graduates and other educated men, *one of whom is known to the writer, is a person of remarkable learning in the philosophies of both the East and the West*" ৫

(বক্রলিপি লেখক-নির্দেশে)

নরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন সম্পর্কে যে-সকল স্মৃতিকথা পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রিয়নাথ সিংহ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের রচনা সুপরিচিত। প্রিয়নাথ সিংহ শিল্পী হিসাবে কিছুটা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, আর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তো দর্শনের অগ্রণী পণ্ডিত। প্রিয়নাথ সিংহ উদার আনন্দময় বন্ধুবৎসল একটি যুবককে দেখিয়েছেন, যিনি একই সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করেন জ্ঞানসাগরে। ব্রজেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন একটি প্রচণ্ড গতিশীল তরুণকে—দর্শন যাঁকে তৃপ্ত করতে পারছে না, জ্বালাময় আকাঙ্ক্ষায় যিনি জীবনপ্রশ্নের সমাধান চাইছেন, ঊর্ধ্বশ্বাস ধাবিত সন্ধানে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন পদে-পদে, যাঁর আপসহীন প্রতিজ্ঞা—সত্যকে জানব তত্ত্বে নয় প্রত্যক্ষে, এই দেহে, অনস্বীকার্য আগ্নেয় অস্তিত্বে। প্রিয়নাথ সিংহ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতিকথা স্বামীজীর জীবনীতে সহজেই প্রাপ্তব্য বলে এখানে উপস্থিত করব না, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র জেলা-জজ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের টুকরো স্মৃতি অবশ্যই উপহার দেওয়া যায় ঃ

"সতীশবাবু আমাদের ন' কাকা। নরেনবাবু তাঁর সহপাঠী। দুজনে গলাগলি-ভাব। বাবা ও কাকাবাবুদের দুটো বৈঠকখানাকে বলা হত অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ। বাবার [শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; শ্রীম'র সতীর্থ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন] অসামান্য মেধা প্রতিভার জন্য কলকাতার বাছাবাছা এলেমদার ছাত্রদের জমায়েত এই জোড়া-ঘরে। আমরা তখন স্কুলের পড়ুয়া। নরেনবাবু এইসব গুণীদের মজলিশে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান আলোচনায় উল্লেখ-যোগ্য মহড়া নিতেন। তিনি জ্ঞানগুণসাগর। তখন থেকেই সব ছোকরারা ওঁকে, সমবয়সী হলেও, চিহ্নিত সর্দারের মত সমীহ ও শ্রদ্ধা করত। সেটা তাঁর অপূর্ব তীক্ষ্ন ধীশক্তি আর বাগ্‌বিভূতির দরুন। গলার গম্ভীর ভারি আওয়াজ। সে সময়ে দেখতে একহারা। চোখ দুটো চমৎকার। মুখ যেন মনস্বিতা দিয়ে মাজা। আরও বৈশিষ্ট্য, তাঁর মুখে হাসি দেখলে সবাই আমোদ-আহ্লাদ করবার অধিকার পেতেন, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য-মেঘ দেখলে কার বাবার সাধ্য কাছে এগোয়!"৬

সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমবয়সী নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিনের আলাপের ছবি এইভাবে ফুটিয়েছেন ঃ

৫ উদ্ধৃতিটি মূল পত্রিকা থেকে সংগৃহীত নয়। হরমোহন মিত্রের একটি পুস্তিকায় এটি পেয়েছি।

অমৃতলাল রায়ের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পরিচয়-বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু সংবাদ দিয়েছেন ঃ "১৮৮৭...অমৃতলাল...আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায় (পরে প্রেমানন্দ-ভারতী) উভয়ে মিলিয়া অপরাহ্নে অমৃতলাল রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেদিন তাঁহার সহিত আমেরিকার জীবনের বিষয় অনেক কথাবার্তা হইয়াছিল। কষ্টে পড়িয়া মানুষ কি করিয়া উন্নতিলাভ করিতে পারে, তাহাই সেইদিন তথায় প্রধান বক্তব্য হইয়াছিল, এবং তাঁহার 'রেমিনিসেনসেস্‌ ঃ ইংলিশ অ্যান্ড আমেরিকান' নামক পুস্তকখানি তিনি নরেন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত অমৃতলাল আসিয়া রামতনু বসুর গলির বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিয়াছিলেন।...অমৃতলাল তারকেশ্বরের রেললাইন করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বন্ধু-হিসাবে অনেক বিষয়ে নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।" ['ঘটনাবলী', ১ম]

৬ স্বামী নির্লেপানন্দ সংকলিত 'স্বামীজীর স্মৃতি-সঞ্চয়ন।'

"বহুদিনের কথা। বোধহয় সেটা ছিল ইংরাজি ১৮৮১ কি ১৮৮২।...দক্ষিণেশ্বরে আমাদের বাড়ি—ভাগীরথীর সন্নিকট।...সেদিন ছিল ছুটির দিন।.. বাচস্পতি-পাড়ার হরিদাস চট্টো, তিনি তখন বি-এ পড়েন, এসে বললেন, 'তোমাকে আমার বড় দরকার, আমাদের বাড়ি একবার যেতে হবে। কলকাতা হতে আমার এক সহপাঠী বন্ধু এসেছেন—তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। তাঁকে মুড়ি-গুড় খেতে দিয়ে বসিয়ে এসেছি। উঠে পড়, বিলম্ব করো না।'

"উঠতে হল। পথে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি একটু বলো। আমাকে ডাকবার একটা কোনো কারণ তো আছে, শুনে রাখি।

"হরিদাস হাসতে-হাসতে বললেন, 'বিশেষ কিছুই নয়। এই তুমি যেমন আমাদের দলের প্রধান বক্তা ও রহস্যপটু আনন্দদাতা, তিনিও কলেজে আমাদের গল্পে ও কথায় রসমুগ্ধ করে রাখেন। তাঁর সঙ্গ সকলেই খোঁজেন। তাঁর মতো রসমধুর বক্তা বিরল,' ইত্যাদি।

"শুনে আমি যেন চিন্তা-চঞ্চল হয়ে পড়লুম। এ যেন পরীক্ষা দিতে যাওয়া। ভাববার সময় নেই—[তাঁর] সামনা-সামনি এসে পড়েছি—বেশ এক মুঠো মুড়ি মুখে ফেলে—'Welcome my mighty mate' বলে, মুড়ির থালাখানি আমার দিকে একটু ঠেলে দিয়ে বললেন—'লেগে যান!'

"বললুম—মাজতে নাকি? সে কাজটা আর এখানে কেন? হরিদাস বড় সৌখিন লোক।

"'সে কি! [মুড়ি] ফুরিয়ে গেল নাকি? Haridas a damn thrift।' হাসি পড়ে গেল। আমাদের কথাও আরম্ভ হয়ে গেল।

"হরিদাস আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন—'ইনি কলিকাতার সিমলা-নিবাসী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমাদের সহপাঠী হলেও দুনিয়ার কি বা কোন্ বিষয় যে জানেন না, সেইটি জানি না।'

"নরেন্দ্রনাথ বললেন—'কেন, ম্যাথামেটিক্স? বিদ্যাসাগর মশাই এখনো বেঁচে আছেন—সদা সত্য কথা কহিবে।' "

[আরও কিছু তীক্ষ্ন সরস কথা নরেন্দ্রনাথ বললেন। কেদারনাথ তারপর লিখেছেন ঃ]

"আমি তাঁর কথাবার্তার দু'একটা পরিচয় দিয়ে রাখলুম মাত্র। তিনি যেমন সুপুরুষ, তেমনি সুবক্তা। তাঁকে দেখলে ও তাঁর কথা শুনলে মুগ্ধ না-হয়ে কেউ পারতেন না। পাছে কেউ ভুল বোঝেন, তাই বলে রাখছি, তাঁর রহস্যমাখা ভাষা ছিল শোনবার জিনিস, কিন্তু বস্তু থাকত 'ভাবে।' এমন কথা কইতেন না, যাতে পাবার কিছু থাকত না। সবই সদর্থপূর্ণ ও দরকারি। শ্রোতা যদি নিবিষ্ট সমঝদার হন, শুনে অবাক হয়ে ভাবতেন, বয়সের অনুপাতে এতটা জ্ঞান হয় কি করে? এ যে শাস্ত্রজ্ঞ বড়-বড় পণ্ডিতদেরও চমকপ্রদ! তাঁর কাছে সে-সব কিন্তু হাসি-রহস্যচ্ছলেই প্রকাশ পেত। এমন অদ্ভুত যুবা দেখিনি। আমাপেক্ষা মাত্র মাস-দেড়েকের বড় ছিলেন।...

"নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

"বৈকালে তাঁরই ইচ্ছামতো রাণী রাসমণির ভাগীরথী-তীরস্থ কালীবাড়ি দেখতে যাওয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'না হয় ঠকাই যাবে। শুনেছি [পরমহংস] নিরক্ষর ব্রাহ্মণ, যিনি ইতিপূর্বে মা-কালীর পূজারী ছিলেন, এখন সহসা সিদ্ধপুরুষ; আমাদের দেশে যা সহজেই হওয়া যায়! তাঁকে দেখা হবে। আমাদের দেশে লোক পয়সা দিয়েও ভেলকি দেখে। শুনেছি এখানে পয়সাও লাগে না। নিরক্ষরের কাছে আমার শোনবার কিছু নেই—দেখবার থাকে তো দেখা যাবে হে! আমি একদিন ঘুরে-ফিরে চলে গেছি।'...

"শুনে আমি চমকে উঠি। তিনি সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, 'ব্যানার্জির দেখা আছে বুঝি? ব্যানার্জিরা কি এমন মওকা ছাড়েন! ওসব যে ওঁদের জন্যই!'

"বললুম—কেশববাবু কোনো সময়ে তাঁর সানডে মিরারে দক্ষিণেশ্বর-যোগী বলে যাঁর কথা লিখেছিলেন, ইনিই কি সেই—

"'হাঁ হাঁ, আর বলতে হবে না—ইনিই সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাহলে জানা-শোনা আছে?'

"না। সেই না-থাকাটার অপরাধটা স্মরণ হওয়াতেই চমকে উঠেছিলুম। আমার অগ্রজ মীরাটে থাকেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, ও আমাকে সাধুর সঙ্গে দেখা করে কিছু লিখতেও বলেছিলেন। কোনো কারণে তা হয়ে ওঠেনি। পরে ভুলেও গিয়েছিলুম। ভারি অপরাধ হয়ে গেছে।

" 'ও—তাই! চলো অপরাধ মিটিয়ে আসবে। ব্যানার্জি প্লাস ব্যানার্জি—তোমাদের শোনাই যথেষ্ট। তাঁকে না দেখেও দাদাকে লিখতে পারো—সিদ্ধ মহাপুরুষ। তোমরা যম-বিশ্বাসী। চলো—' "

[অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ। নরেন্দ্রনাথকে গান গাইতে তাঁর অনুরোধ। সেই গান শোনামাত্র তাঁর সমাধি। 'নরেন্দ্র নির্বাক হয়ে দেখতে লাগলেন।' কেদারনাথও জীবনে প্রথম সমাধি দেখলেন। তারপর—]

"ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'মাঝে-মাঝে এসো।' শুনে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি পড়ছি, আমার কলেজ আছে।' তিনি বললেন, 'এও থাক না। ভাল কথা শুনতে ক্ষতি কি?' তাতে নরেন্দ্র বললেন, 'আপনি তো নিরক্ষর লোক। আপনি যা বলবেন, সে-সব আমার জানা আছে।

"নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে আমি শিউরে উঠেছিলুম, পালাই-পালাই করছিলুম। ঠাকুর হাসতে-হাসতেই বললেন, 'এ তো খুব আনন্দের কথা। আমায় বেশি বকতে হবে না। এক-একবার এলে তোমার বিশেষ ক্ষতি হবে কি? ধরো আমিই তোমাকে চাই। [তোমার] ও কলেজ-ফলেজ থাকবে বলে যে মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, আজ যেতে পারো। আবার ইচ্ছা হলে এসো। কেমন, তাতে আপত্তি নেই তো!' নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'না, বেড়াতে আসতে আর আপত্তি কি?'

"উঠে যেন বাঁচলুম। ভাল লাগছিল না। বাইরে বেরিয়ে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমার কথাগুলো বড় বিশ্রী লাগছিল, না বাঁড়ুয্যে?' বললুম, সেটা নিজেই বুঝতে পারছেন। 'না, আমি ভাল বুঝতে পারিনি, তাই দ্বিতীয়বারের জন্য একটু কড়া ভূমিকা ছেড়ে চললুম। এরপর সাক্ষাতে খোলসা হতে পারে। সেবার আর হরিদাসের মুড়ি নষ্ট করব না, সোজা একাই চলে আসব।' আর দাঁড়ালেন না।

"ঠাকুরের কথা মনে রইল না, নরেন্দ্রনাথের কথাই ভাবতে-ভাবতে ফিরলুম। সমবয়সী হলেও এরূপ ছেলে পূর্বে দেখিনি—যেমন নির্ভীক, কথাবার্তাতেও তেমনি বহুদর্শী জ্ঞানীর মতো। এ ছেলে কারো মুখ চেয়ে কথা কবার নয়, লিডার হবার জন্যই জন্মেছে—কোনো মহাপুরুষের ধার ধারে না, ধারবে না। এ ধারণা সেই প্রথমদিনেই কে যেন আমাকে দিয়েছিল। দেখলুম, ঠাকুরও এঁকে চান। এ ছেলে কম্যান্ডার-ইন-চিফ্ হবার ছেলে—সোলজার নয়।"

কাছাকাছি সময়ের আর এক ব্যক্তি, সাংবাদিক-সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথের বন্ধনহীন মনীষার উল্লাসকে ফুটিয়েছিলেন বঙ্গবাসী সংবাদপত্রে। রক্ষণশীল বঙ্গবাসী তখন আমেরিকা-প্রত্যাবৃত্ত বিবেকানন্দকে নিয়মিত আক্রমণ করছে। পাঁচকড়ি বঙ্গবাসীর সম্পাদক, যিনি নরেন্দ্রনাথের 'ইংরেজি বিদ্যার বহর' জানেন। গোঁড়ামির বেতনভুক লেখক হিসাবে তিনি বিবেকানন্দের ধর্মোদ্ধারক ভূমিকাকে স্বীকার করতে অপারগ, তবে—

"বস্তুতঃ আমরা বিবেকানন্দকে দীর্ঘদিন ধরে ভালবাসি। যখন তিনি বিবেকানন্দ নাম ধরেন নি, তারও আগে থেকে তাঁর বিষয়ে আমাদের একপ্রকার শ্রদ্ধা। বি-এ পাস করার পরে তিনি যখন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কবতেন, তখনো তাঁকে ভালবাসতাম। মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউশনে যখন তিনি শিক্ষক হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন, এবং নানাবিধ তর্কযুক্তির

দ্বারা হিন্দুধর্মের অসারত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করতেন, তখনো তাঁকে ভালবাসতাম, যদিও তাঁর মতামত আমাদের বিশেষ আঘাত করত। তারপর যখন তিনি হিন্দুশাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যাদি গ্রহণ করতেন এবং অপরকে সেই কাজে প্রণোদিত করতে চাইতেন, তখনো তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা যায়নি। তারপর তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য হয়েছিলেন।

"আমরা তাঁকে ভালবাসতাম কারণ, প্রখর ছিল তাঁর চিৎশক্তি, প্রবল জীবনীশক্তি এবং নৈতিক সাহস। কারণ, সূক্ষ্ম দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনার গোলমেলে জট খুলে গোটা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য তাঁর ছিল। কারণ, পৃথিবীর বহুবিধ ধর্মবিষয়ে তাঁর সর্বাত্মক জ্ঞান ছিল। কারণ, তাঁর ছিল সম্মোহনকারী আকার আর সর্বজয়ী কণ্ঠস্বর।"৭ [অ]

নরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডন-সোসাইটি সূত্রে যিনি বিখ্যাত, তাঁর 'লাইট অব দি ইস্ট' কাগজে ১৮৯৪, জানুয়ারি সংখ্যায় ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ লেখাটি বেরোয়, যেটির লেখক 'জীরো', যিনি সম্পাদক ছাড়া কেউ নন বলেই মনে হয়—সেই রচনাতেও প্রায় বঙ্গবাসীর দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বামীজীর সমালোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে পূর্ব পরিচয়সূত্রে লেখক বিবেকানন্দের প্রতি নমস্কার না জানিয়েও পারেন নি :

"বিবেকানন্দ-স্বামীকে আমি নিজস্বভাবে জানি। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, পবিত্রতা এবং প্রতিভা সম্বন্ধে আমার সমুচ্চ শ্রদ্ধা। বহুদিক দিয়ে তিনি সুমহান রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ্য শিষ্য।...

"আমি তাঁকে ভালবাসি কারণ তিনি সকল মানুষের ভালবাসা পাবার যোগ্য। চমৎকার দীর্ঘ প্রশস্ত পুরুষ; অপূর্ব সুন্দর মুখ যা মনস্বিতায় পূর্ণ; বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু—প্রসন্ন-স্থির প্রেমে ও স্নেহে তোমার প্রতি আনত; বুদ্ধির প্রভায় ঝলমলে অবয়ব—সত্যই ভালবাসার যোগ্য মানুষ—এই বিবেকানন্দ! আধুনিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার তিনি নির্ধারিত পুরুষ। তাঁর বৃহৎ উদার কোমল হৃদয়, তাঁর দৃঢ়তা, তাঁর আত্মত্যাগ, সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা, সর্বোপরি, তাঁর পবিত্রতা এবং অতি উচ্চ মার্গের বুদ্ধিশক্তি—এই সকলের দ্বারা বহু সহস্রের যে-কোনো সমাবেশে তিনি অনন্য পুরুষ। তোমার প্রতি নিবদ্ধ তাঁর প্রদীপ্ত নয়নের দিকে যদি তুমি তাকাও, দেখবে, তার মধ্যে আছে সংকল্পশক্তির আগ্নেয়গিরি, যা ঠিক পথ গ্রহণ করলে মাতৃভূমিতে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবে।...এবং যে-আমি আজ তাঁর বিচার করতে বসেছি, সেই আমি হয়ত একদিন তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলতে পেলেও ধন্য বোধ করব!" [অ]

এই সমস্ত তথ্য নিঃসংশয়ে দেখিয়ে দেয়, নরেন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ যৌবনেই সমবয়সীদের তুলনায় কলকাতার শিক্ষিতসমাজে অধিক পরিচিত ছিলেন—বিখ্যাত হয়ে পড়বার জন্য আর একটুমাত্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা তাঁকে সাময়িক খ্যাতিজীবন থেকে অনন্ত জীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিল। নরেন্দ্রনাথের আকস্মিক পিতৃবিয়োগও সম্পন্ন পারিবারিক পরিচিতি থেকে তাঁকে 'অব্যাহতি' দিল। ফলে খ্যাতির সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে কোনো এক অজ্ঞাত রহস্যময় অরণ্যে হারিয়ে গেলেন। লোকপূর্ণ কলকাতা শহরে থেকেও বরাহনগরের হানাবাড়ির বাসিন্দা! তারপরে ববাহনগর থেকে ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে প্রস্থান। একজন উঠতি প্রতিভাবান যুবককে ভুলতে একটা বড় শহরের কতক্ষণ লাগে যখন সেই যুবকটি লোকখ্যাতির কোনো অবলম্বনকে ধরতে রাজি

৭ মূল বঙ্গবাসীর ফাইল আমরা দেখবার সুযোগ পাইনি। 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকা ১৮৯৭ ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবাসী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে উদ্ধৃত অংশটি প্রকাশ করে। আমরা তার থেকে পুনশ্চ অনুবাদ করেছি।

নন, অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের বা স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে নিজের ঠাঁই পাকা করতে চান না! এমনকি ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচার করে রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় গঠন করতে চাইছেন, তখন তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন দৃঢ়ভাবে—রামদত্তের কোনো বইয়ে বা পত্রপত্রিকায় তাঁর নাম যেন ছাপা না হয়।

॥ ৩ ॥

বৃহত্তর ভারতের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ একই নাম-হারানো রীতি নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হননি। নরেন্দ্রনাথ কলকাতার ছেলে, এখানে যত প্রতিভার পরিচয়ই তিনি দিন, 'ছোকরা বেশ ট্যালেন্‌টেড'—এই পিঠচাপড়ানির বেশি সেই বয়সে পাওয়া সম্ভব ছিল না; কিন্তু বৃহত্তর ভারতে এই অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতিভা ভিন্ন আর কোনো পরিচয় ছিল না। সুতরাং তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই এই 'ইংরেজি-জানা অসামান্য পণ্ডিত,' 'জ্বলন্ত সুন্দর তরুণ সন্ন্যাসী'র খ্যাতি বিকীর্ণ হতে দেরী হত না। সন্ন্যাসী কিছুদিন সেখানে থাকতেন, কথা বলে, গান গেয়ে, আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সকলকে মুগ্ধ করতেন, তারপরে যখন বেশিদিন থাকার তাগিদ আসত, তখন এক সময়ে সকলের অজ্ঞাতে প্রস্থান করতেন, পিছনে থাকত এক অপরিসীম বিস্ময়ের স্মৃতি, নামটুকু পর্যন্ত না, যেখানে নামটুকু আছে সেখানে হয়ত সেই অঞ্চলের জন্য গৃহীত একটি নাম। এখানে একটা কথা যোগ করা উচিত, পরিব্রাজকজীবনে সন্ন্যাসীর অভিজ্ঞতা ও সাধনার গভীরতা যতই বেড়েছে, যতই লোকব্যবহার করেছেন, ততই বেড়েছে তাঁর আত্মবিশ্বাস, এবং তাঁকে কোন্ মিশন সফল করতে হবে সে-বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন। তার ফলে আত্মগোপনের ইচ্ছা সত্ত্বেও জনসম্পর্ক ক্রমেই বেড়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বহুস্থলে স্বামীজী, যে-নামেই হোক, আমেরিকাযাত্রার পূর্বে অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলে সুপরিচিত ছিলেন। এখানে আমি পরিব্রাজক-অবস্থায় স্বামীজীর সঙ্গে কাদের পরিচয় হয়েছিল, তার বিস্তৃত তালিকার মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না; কিন্তু যদি একবার চিন্তা করে দেখি যে, ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে একজন মানুষ ভারতের বেশ কয়েকজন দেশীয় রাজার গুরু হয়েছেন বা তাঁদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধালাভ করেছেন, তাঁদের প্রধান কর্মচারীদের মুগ্ধ করে আস্থা অর্জন করেছেন, যে-শহরেই গেছেন সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলীতে প্রাচীন বিদ্যায় ব্যুৎপত্তির জন্য চাঞ্চল্য এনেছেন, সেই সঙ্গে নব্যশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, সচেতন চেষ্টা ছাড়াই এমন একটি তরুণ ভক্তগোষ্ঠী জুটিয়েছেন যাঁরা তাঁর জন্য সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত—সে সন্ন্যাসী পাশ্চাত্ত্যযাত্রার আগে ভারতে অপরিচিত ছিলেন, একথা মোটেই সত্য নয়। আসল কথা, তিনি পরিচিত ছিলেন, কিন্তু পুরনো পান্থশালা থেকে নতুন পথে নামবার সময়ে অর্জিত পরিচয়গুলি পিছনে ছড়িয়ে যেতেন সানন্দ বৈরাগ্যে।

॥ ৪ ॥

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজীর প্রতিভা কিভাবে নানাস্থানে স্বীকৃত হয়েছিল, তার অনেক দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনীতে আছে। আমরা এখানে অল্পজ্ঞাত বা অপরিচিত দু'একটি যোগ করে দিতে চাই। এদের অনেকগুলি বিবেকানন্দ-গবেষণাকালে ভারতের নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত।

খেতড়ির মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের বিষয়টি তাঁর জীবনীতে বহুভাবে

লিখিত আছে। এ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মা হিন্দীতে লিখেছেন 'খেতড়ি-নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' এবং পণ্ডিত বেণীশঙ্কর শর্মা—'স্বামী বিবেকানন্দ ঃ এ ফরগটন্ চ্যাপটার অব হিজ লাইফ' (১৯৬৩)। ঝাবরমলজী তাঁর 'আদর্শ নরেশ' গ্রন্থেও স্বামীজী ও খেতড়ির রাজার কথা বিস্তারিত লিখেছেন। আমরা ইতিমধ্যে খেতড়ির মহারাজের বিষয়ে বেশ-কিছু কথা জানিয়ে এসেছি—স্বামীজীকে পাশ্চাত্ত্যে পাঠানোর ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা প্রসঙ্গে। এখানে এই সংবাদটির উপরে জোর দিতে চাই, খেতড়ি যদিও জয়পুরের অধীনে একটি সামন্তরাজ্য, বিশাল ঐশ্বর্যশালী দেশ নয়, তবু ঐকালে আয়তন ও অর্থসম্পদের তুলনায় খেতড়ির মর্যাদা ছিল বেশি। প্রজাকল্যাণে এবং রাজকীয় গুণে স্বামীজী তাঁর দেখা রাজাদের মধ্যে বরোদা ও খেতড়ি—এই দুইজনের নাম করেছিলেন অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের কাছে।

ক্ষুদ্র রাজ্য খেতড়ির অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মর্যাদার কথা বোম্বাইয়ের গোঁড়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ বোম্বে গেজেটও স্বীকার করে নিয়েছিল। "[খেতড়ির রাজা] আলোকপ্রাপ্ত শাসক হিসাবে বর্ণিত। গদীতে বসার পর পরে নিজ রাজ্যে তিনি বহুবিধ উন্নতিমূলক কাজ করেছেন।" জয়পুর ভিন্ন অপর সকল দেশীয় রাজার সঙ্গে খেতড়ির মহারাজা সমব্যবহার করেন; বিভিন্ন রাজা মহারাজা এবং লেফট্ন্যাণ্ট গভর্নর তাঁর রাজ্যে আতিথ্য নেন; তিনি ফিরতি-ভ্রমণও করেন; দিল্লী সাম্রাজ্যের সঙ্গে খেতড়ির সরাসরি সম্পর্ক আছে; সেখান থেকেই খেতড়ির 'রাজা-উপাধি' এবং সনদলাভ; মরাঠাদের সঙ্গে ছিল খেতড়ির পূর্ব-যোগাযোগ; বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত থেকে গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ-স্থাপনের মর্যাদা—এইসব সংবাদ উক্ত পত্রিকার ১৮৯৬, ১১ জুন সংখ্যা থেকে পাই। খেতড়ির উদারতা ও প্রজাবাৎসল্যের স্বীকৃতি পাই মহারাষ্ট্রের প্রধান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক টাইমস অব ইণ্ডিয়ার ১৮৯৩, ১০ নভেম্বরের সংবাদে। পুত্রজন্মের আনন্দোৎসব উপলক্ষে মহারাজা এক লক্ষ দশ হাজার টাকার বকেয়া খাজনা ছেড়ে দিয়েছিলেন, অনাথ-আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং ভারত-সরকারের কাছে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য জিয়লজিস্ট পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ইত্যাদি।

এখানে ইতি নয়। ভিক্টোরিয়ার রাজ্যকালের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে যোগ দিতে খেতড়ির মহারাজা ইংলণ্ড ভ্রমণ করেন ১৮৯৭ সালে। এই ভ্রমণ 'রাজা-রাজড়ার প্রমোদভ্রমণ নয়' এবং এই ভ্রমণের সামাজিক বিপদও কম ছিল না। রীতিমত ঝুঁকি নিয়েই খেতড়িকে ইংলণ্ড যেতে হয়েছিল। তার মূলে ছিল স্বামীজীর প্রেরণা—খেতড়ি স্বীকারও করেছিলেন। খেতড়ি ইংলণ্ড থেকে ফিরলে সমাজসংস্কারকদের নেতা মাধব গোবিন্দ রানাডের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ের নাগরিকরা তাঁকে যে-মানপত্র দেন, তার মধ্যে 'ভারতের চিরকালের গৌরবের কারণ এক প্রাচীন ক্ষত্রিয় পরিবারের এই প্রসিদ্ধ প্রতিনিধি' 'ইংলণ্ডে সমুদ্রযাত্রা করে বিরল নৈতিক সাহস দেখিয়েছেন'—এই কথা সগৌরবে বলা হয়েছিল। 'মহামান্য মহারাজা এই কাজ করতে পেরেছেন এইজন্য যে, তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছেন—ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক নেতা রাজন্যবর্গের কর্তব্য হল, নিজেদের দৃষ্টান্তের দ্বারা [যথা কালাপানি পার হওয়া] দেশের একান্ত প্রয়োজনীয় নবজাগরণ সম্ভব করা।'[৮]

খেতড়ির মহারাজা সমুদ্রযাত্রা করে নিজের উপরে কী বিপদ ডেকে এনেছিলেন, তা খুলে লিখেছিলেন বিখ্যাত সংস্কারক মালাবারি, তাঁর পত্রিকা ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটরে। সেখানে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে, খেতড়ির মহারাজা দেশে ফিরলে তাঁর বরাতে অবর্ণনীয় দুর্গতি ঘটতে পারে।[৯]

৮ বোম্বে গেজেট; ১৮৯৭, অক্টোবর ২৫।

৯নং পাদটীকা পরপৃষ্ঠায়।

খেতড়ির মহারাজের জীবনে এই 'অবর্ণনীয় দুর্গতির' মূলে স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ তাঁকে ক্ষুদ্র সুখ থেকে মহান যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করেছিলেন; চোখের সামনে জেবলে দিয়েছিলেন পৃথিবীর আলো, আর দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কোন্ অন্ধকার আর বঞ্চনার মধ্যে রয়েছে ভারতের প্রজাপুঞ্জ। খেতড়ি বদলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর নবজন্মের পিতার প্রতি নমস্কারও জানিয়েছিলেন প্রকাশ্যে ঃ

"মহারাজা স্বীকার করেছেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কাছে মহাঋণী। অধ্যাত্ম পথপ্রদর্শনের ঋণই কেবল নয়, পাশ্চাত্ত্যের বাস্তব জ্ঞানলাভের জন্য প্রেরণা তিনিই দিয়েছেন। সেই সঙ্গে দিয়েছেন বিদেশভ্রমণের প্রেরণা, যার দ্বারা আত্মসংস্কার করা যাবে এবং নিজ দেশ ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নবজাগরণ আনা যাবে।"১০

মালাবারি বলেছিলেন, 'দেখা যাচ্ছে, মহারাজা অলস ভ্রমণকারী নন, ভিন্নতর মানুষ।' বিবেকানন্দের কাছে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপারে খেতড়ির ঋণের স্বীকৃতি তাঁর প্রতি, ততোধিক তাঁর গুরুর প্রতি, সম্ভ্রমে উচ্চকিত করে তুলেছিল ভারতের নানা জায়গার শিক্ষিত প্রগতিশীল মানুষদের। মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকায় এ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়; লাহোরের ট্রিবিউনও তাই করে। শেষোক্ত পত্রিকায় সমর্থনের সঙ্গে 'হিন্দু'র বোম্বাই-সংবাদদাতার মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয় ১৮৯৭, ৬ নভেম্বরে ঃ

"স্বামী বিবেকানন্দ বাস্তবিকই অসাধারণ পুরুষ। একজন রাজপুত রাজার মধ্যে ফিজিক্স ও অ্যাসট্রনমির সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করা কম কৃতিত্বের বিষয় নয়,১১ যখন একথা জ্ঞাত যে, বিবেকানন্দ বিজ্ঞানের উক্ত শাখাদ্বয়ের মহা পণ্ডিত নন। তিনি অবশ্য ও-দুটি বিষয় ভালই জানেন। কিন্তু তাঁর আসল অধিকারের বিষয় ধর্ম ও তত্ত্ববিদ্যা। ফলে এর দ্বারা বিবেকানন্দের এই অসাধারণ গুণ দেখা যাচ্ছে—তিনি অপরের অন্তর্নিহিত প্রবণতা ধরতে পারেন এবং সেইসকল শক্তির বিকাশে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। আমেরিকান ও ইংরাজদের উপরে তিনি কিভাবে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন, তার রহস্যও এখানে কিছুটা উন্মোচিত হচ্ছে। অপরের অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করে, তাকে যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে, সেই মানসিক প্রবণতাকে এমন খাতে প্রবাহিত করানো, যাতে তার শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্ভব হয়—এ জিনিস [যা বিবেকানন্দের আছে] বিশেষ ধরনের দুর্লভ ক্ষমতার প্রমাণ।" [অ]

---

৯ "Here was a Raja of unsullied Ksatriya lineage who had dared to cross the Kalapani and who has already been given notice of untold trouble to come to him on that account in the whole of Rajputana. Yet it is Princess and Chiefs who, as the President of the day—the Hon. Mr. Justice Ranade remarked, are the natural leaders of society, and whose lead, therefore, can carry the reform movement forward with a strength and prestige which it would be hopeless for ordinary mortals to command, unless they were gifted prophets of their age born to extort respect and ensure a following. We trust, the demonstration in Bombay will smooth the difficulties threatning the Maharaja of Khetri on his arrival at his native place." (*Indian Spectator;* 1897, Oct., 31)

রানাডে বলেছেন, সমাজকে সংস্কারের পথ দেখাতে পারেন সমাজের স্বাভাবিক নেতা ক্ষত্রিয় রাজারা। আর পারেন মহাগুণান্বিত প্রফেটরা, যাঁদের পিছনে জনসমর্থন থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রানাডে বোধহয় স্বামীজীর ইঙ্গিত করেছিলেন, কারণ এই পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে অতঃপর খেতড়ির রাজার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে স্বামীজীর প্রেরণার কথা বলা হয়েছে।

১০ ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর, ১৮৯৭, ৩১ অক্টোবর।

১১ খেতড়ির মহারাজাকে স্বামীজী কিভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে তাঁর সঙ্গে টেলিস্কোপ নিয়ে রাত্রি জেগে নৈশ আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছেন, তার দৈনন্দিন বিবরণ উদ্ধার করেছেন বেণীশঙ্কর তাঁর গ্রন্থে।

সুতরাং বিবেকানন্দ তাঁর পরিব্রাজক জীবনে রাজপুতনার মতো রক্ষণশীল স্থানের কিছু অংশে কেবল 'পরিচিত' নন, বৈপ্লবিক অস্তিত্বে বর্তমান ছিলেন।

॥ ৫ ॥

আবুপাহাড়ে, আজমীরে স্বামীজীর অবস্থান সম্বন্ধে যেসব সংবাদ তাঁর জীবনীতে রয়েছে, তার সঙ্গে সত্যই মূল্যবান কিছু যোগ করে দেবার মতো উপাদান আমরা পেয়েছি—হরবিলাস সর্দা'র (১৮৬৭-১৯৫৫) স্মৃতিকথা থেকে। হরবিলাস সর্দা উত্তরজীবনে সর্ব-ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন 'সর্দা-আইনের' প্রবর্তকরূপে। এই আইনের দ্বারা (আইন পাস হয় ১৯২৯ সেপ্টেম্বরে, কার্যকরী হয় ১৯৩০, ১ এপ্রিল) বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হয়, এবং এর জন্য হরবিলাস দেশে তুমুল আলোড়নের কারণ হন। ইনি ১৯২৯-এ 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সোস্যাল কনফারেন্সে'র সভাপতিত্ব করেছেন এবং বহু গ্রন্থ রচনার দ্বারা নিজের গভীর পাণ্ডিত্য ও দেশপ্রেমের প্রমাণ রেখেছেন। 'হিন্দু সুপিরিয়রিটি' (১৯০৬), এঁর বিখ্যাত বই, যার মধ্যে ইনি মানবজ্ঞানের নানা শাখায় প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন সমকালের অন্য দেশের মানুষদের তুলনায়। জীবনী, শিক্ষা, ইতিহাস ও দর্শনের নানা গ্রন্থের ইনি লেখক। চাকরি-জীবন শুরু করেছিলেন শিক্ষক হিসাবে। নানা চাকরির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ঐ জীবন শেষ করেন আজমীর-মাড়োয়ারে অস্থায়ী জেলা ও সেসন-জজ হয়ে। তারপরে 'সেণ্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে' একাধিকবার সদস্য নির্বাচিত হন।১২

হরবিলাস বাল্যে দয়ানন্দ সরস্বতীকে দর্শন করেন এবং তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর বৃহৎ জীবনীও ইনি লিখেছেন। আজমীরের আর্যসমাজের সভাপতিও ইনি ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে যখন এঁর সাক্ষাৎ হয় তখন ইনি স্থানীয় আর্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত এবং সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করছেন (ইনি ইংরেজি অনার্সসহ বি-এ পাস করে-ছিলেন ১৮৮৮-তে)।

স্বামীজী সম্বন্ধে ইনি লিখেছেন ঃ

"স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমি চারবার মিলিত হয়েছি। প্রথম সাক্ষাৎ মাউণ্ট আবুতে। ১৮৮৯ কিংবা ১৮৯০ সালের মে কি জুন মাসে, ঠিক মনে নেই কোন্ মাসে, আমি আমার বন্ধু, আলিগড় জেলার চাহ্‌লাসারের টি মুকুন্দ সিংহের সঙ্গে গ্রীষ্ম কাটাতে মাউণ্ট আবুতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, টি মুকুন্দ সিংহের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ রয়েছেন। টি মুকুন্দ সিংহ আর্যসমাজী, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর অনুগামী। আমার বন্ধুর সঙ্গে প্রায় দশদিন ছিলাম, এবং স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বহু কথাবার্তা বলেছি। আমার বয়স তখন ২১। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। অতি চমৎকার কথাবার্তা বলেন, সব বিষয়ে সংবাদ রাখেন। প্রথমদিন নৈশ আহারের পরে, স্বামী বিবেকা-নন্দ ঠাকুরসাহেবের অনুরোধে একটি গান গাইলেন। এমন অপূর্ব মধুর সুরে গানটি গেয়েছিলেন যে, মনপ্রাণ ভরে গিয়েছিল আনন্দে। তাঁর সঙ্গীতে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিদিন তাঁকে একটি-দুটি গান গাইতে অনুরোধ করতাম। তাঁর সঙ্গীত-ময় কণ্ঠস্বর এবং আচার-আচরণ আমার উপর স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। আমরা কখনো-কখনো বেদান্ত-বিষয়ে কথাবার্তা বলতাম, যে-বিষয়ে আমার কিছু জানাশোনা ছিল।...

১২ হরবিলাস সর্দা সম্বন্ধে সংবাদগুলি সংগ্রহ করেছি এস পি সেন-সম্পাদিত 'ডিক্সনারি অব ন্যাশন্যাল বায়োগ্রাফি' থেকে।

বেদান্ত-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথাবার্তা আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত আমার কাছে পরম বরণীয় বস্তু ছিল কারণ সেগুলি গভীর দেশপ্রেমে পূর্ণ। মাতৃভূমি এবং হিন্দুসংস্কৃতির প্রতি প্রেমে তিনি পূর্ণ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে-সময় আমি কাটিয়েছি, তা আমার জীবনের সর্বাধিক আনন্দপূর্ণ সময়ের মধ্যে পড়ে। আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর স্বাধীনচিত্ততা।

"পরবর্তী সাক্ষাৎ আজমীরে। সম্ভবতঃ তা পরের বছরে। যতদূর মনে পড়ে, তিনি দু'তিন দিন, কি চারদিন আমার অতিথি ছিলেন। মনে পড়ছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সন্ন্যাসী হবার আগে তাঁর নাম কি ছিল? সে নাম তিনি বলেছিলেন।...আমার কাছ থেকে তিনি বিওয়ারে চলে যান। ঐকালে আজমীরে বাস করতেন শ্রীযুক্ত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা। আমার দেখা পণ্ডিতাগ্রণীদের তিনি একজন। স্বামীজী যখন আমার সঙ্গে ছিলেন তখন তিনি বোম্বাই গিয়েছিলেন। তিনি ফিরলে তাঁর কাছে আমি স্বামীজীর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা এবং দেশপ্রেমের কথা বলেছিলাম। স্বামীজী যে মাত্র দু'তিন দিন আগে চলে গেছেন ও বিওয়ারে আছেন, সে কথাও। পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার পরদিন বিওয়ারে যাবার কথা। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন—স্বামীজীকে নিয়ে আজমীরে ফিরবেন। পরদিন তিনি স্বামীজীকে নিয়ে এলেন। স্বামীজী প্রায় ১৪-১৫ দিন তাঁর অতিথি ছিলেন—শ্রীযুক্ত শ্যামজীর বাংলোয় আমি প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। আমরা তিনজনে সান্ধ্যভ্রমণে বার হতাম। এই দুই পণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে আমার জীবনের চরম সুখের কিছুকাল কেটেছে।...আমার পরিষ্কার মনে আছে, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা হয়েছিল। তাঁর বাগ্মিতা, দেশপ্রেমিকতা, আচরণের মাধুর্য আমাকে আনন্দিত করেছিল—গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল আমার উপর। শ্রীযুক্ত শ্যামজী এবং স্বামী বিবেকানন্দ যখন সংস্কৃতসাহিত্য ও দর্শনের কোনো বিষয় আলোচনা করতেন, তখন আমার ভূমিকা ছিল অধিকাংশক্ষেত্রে কেবল শ্রোতার।......

"আবার তাঁর সঙ্গে এক কি দু'দিনের জন্য সাক্ষাৎ হল যখন তিনি পুনশ্চ আজমীরে এলেন। চিকাগো-ধর্মমহাসভায় তিনি যেতে উৎসুক, এবং খেতড়ির রাজার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রত্যাশা করছেন। কয়েকদিন পরে শুনলাম, তিনি আমেরিকা চলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আর আমার কখনো দেখা হয়নি, কিন্তু খুব গর্ব অনুভব করেছিলাম যখন 'পায়োনীয়ারে' পড়লাম—চিকাগোয় সকল প্রতিনিধিদের [এবং শ্রোতাদের] উপর তিনি অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছেন। আজমীরে তিনি যখন আমার অতিথি তখন একথা প্রায় মনেই হয়নি—তিনি শীঘ্রই বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন।...ঐ সকল দিন-গুলিতে তাঁকে অসাধারণ লোক বলে মনে হলেও নানা বিষয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে সাবলীলভাবে যেসব কথা বলে গিয়েছিলেন, সে সকলের বিবরণ লিখে রাখা হয়নি। তাঁর যে তিনটি জিনিস আমাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিল, তারা হল, বাক্‌পটুত্বের দ্বারা অপরের মধ্যে ভাবপ্রবেশ করাবার ক্ষমতা, সংগীতময় কণ্ঠস্বর এবং স্বাধীন নির্ভীক চরিত্র।" [অ]

হরবিলাস সর্দা-প্রদত্ত এই বিবরণ আমি সংগ্রহ করেছি প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার ১৯৪৬, ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে। সেখানে হরবিলাসের উদ্ধৃত রচনার উৎসনির্দেশ করা নেই। প্রবুদ্ধ ভারতের ১৯৫৫ জুলাই সংখ্যায় হরবিলাসের 'রেকালেকশন্ অ্যান্ড রেমিনিসেন-সেস্' গ্রন্থের আলোচনায় বলা হয়েছে, উক্ত গ্রন্থে বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ আছে। হয়ত এই গ্রন্থ থেকে উপরের অংশটি চয়িত। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থটি হাতে পাইনি। যদি ঐ বই থেকে উপরের অংশ গৃহীত হয়, তাহলে বলতে হবে, সেখানে বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ আরও বেশি কিছু আছে, কারণ গ্রন্থ-সমালোচনার মধ্যে অধিকন্তু পাই, হরবিলাস স্বামীজীর ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক অনর্গল আলোচনা ও 'সম্মোহনকারী সঙ্গীতের' সঙ্গে অধিকন্তু

'জ্যোতির্ময় বিশাল নয়নের' কথাও বলেছেন। উক্ত গ্রন্থে হরবিলাসের ১৮৯১ নভেম্বর-ডিসেম্বর ডায়েরী থেকে যে-অংশ উদ্ধৃত আছে, তার মধ্যে স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার বিষয়াদি লেখা ছিল, এমন কথা গ্রন্থসমালোচক বলেছেন, যার একটি তিনি উদ্ধৃতও করেছেন ঃ

"তাঁর আলোচনা আমার কাছে অতীব চিত্তাকর্ষক। সেগুলিকে অত্যন্ত পছন্দ করেছি। অত্যন্ত আনন্দদায়ক সঙ্গী তিনি। যদি খুব ভুল না করি তাহলে—তিনি এই পৃথিবীতে একটা-কিছু হয়ে দাঁড়াবেন।" [অ]

সদ্য-লিখিত ডায়েরী এবং পরবর্তী স্মৃতিকথার মধ্যে একটি বিষয়ে উপভোগ্য বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯১ সালের শেষে যে-বিবেকানন্দ হরবিলাসের ডায়েরীতে 'এই পৃথিবীতে একটা-কিছু হবেন', ১৮৯৩-এর মাঝামাঝি যিনি 'অসাধারণ' ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত, তিনি ১৮৯৩-এর শেষে পৃথিবীতে সত্যই 'একটা-কিছু' হয়ে হরবিলাসের মনে চমক সৃষ্টি করেছেন!! আসল কথা, বিরাট মানুষকে যখন কাছ থেকে দেখা যায়, তখন তাঁর শক্তির কথা অনুভব করেও মানুষ, খুব বুদ্ধিমান মানুষও, উক্ত বিরাটত্বের সম্পূর্ণ পরিমাপ করতে সমর্থ হয় না।

স্বামীজীর সঙ্গে হরবিলাসের দেখাসাক্ষাতের বিষয়ে সংবাদ অন্য সূত্রেও পাই। খেতড়ির 'ওকায়ত রেজিস্ট্রার' থেকে বেণীশঙ্কর শর্মা যেসব অংশ উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে আছে, আবুপাহাড়ে খেতড়ির রাজার বাড়িতে অবস্থিত স্বামীজীর সঙ্গে হরবিলাস দেখা করতে এসেছেন, মুকুন্দ সিংহের সঙ্গী হয়ে ঃ

"২৪ জুন, ১৮৯১...[বিকাল] পাঁচটার সময় জলেশ্বরের ঠাকুর মুকুন্দ সিংজী পূর্ব-নির্ধারিত ব্যবস্থামত এলেন—সঙ্গে আজমীর আর্যসমাজের সভাপতি হরবিলাস, বি-এ। মহারাজ চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই ভদ্রলোকেরা এসে মহারাজকে অভিবাদন করলেন, নজরানা দিলেন, তা মহারাজ স্পর্শ করে দিলে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হল। মহারাজ চেয়ারে বসলেন, এবং তাঁদের আসন গ্রহণ করতে বললেন। স্বামীজীও একটি চেয়ারে বসলেন। তাঁরা সকলে আধ ঘণ্টাটাক কথাবার্তা বললেন, যার পরে ঠাকুর মুকুন্দ সিংজী হারমোনিয়াম বাজালেন।" [অ]

হরবিলাস তাঁর স্মৃতিকথায় স্বামীজীর অপূর্ব সঙ্গীতের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। খেতড়িতে স্বামীজীর অবস্থানকালে আমরা দেখতে পাই, একদিকে যেমন ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব ইত্যাদির আলোচনা চলছে, সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চাও হচ্ছে, সেইসঙ্গে সঙ্গীতের ইন্দ্রলোকও রচিত হয়ে যাচ্ছে। খেতড়ির মহারাজা সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, নিজে বীণা বাজাতে পারতেন, স্বামীজীর গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজাতেন (মহারাজ হয়েও!) এবং তিনি নিজের রাজসভায় সত্যকার গুণী শিল্পীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। 'তাঁর সভাগায়ক ছিলেন সুবিখ্যাত মুসরফ্ খাঁ, যাঁকে পরবর্তীকালে প্যারিসে বিশ্বসঙ্গীত সম্মেলনে পাঠানো হয়েছিল পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর কথামত'—বেণীশঙ্করজী লিখেছেন।

হরবিলাসের বন্ধু ঠাকুর মুকুন্দ সিংহ স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, স্বামীজীর সাক্ষাতে অনেকবার যন্ত্রবাদ্য করেছেন—এঁর বিষয়ে পণ্ডিত ঝাবরমল 'খেতড়ি-নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আলিগড়ের এই বিশিষ্ট আর্যসমাজীর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় প্রগাঢ় হয়েছিল ; আর্যসমাজে মূর্তিপূজা অগ্রাহ্য ; স্বামীজীর প্রভাবে ইনি পূর্বমত ত্যাগ করেন ; এঁর উপরে স্বামীজীর বিদ্যাবত্তার গভীর প্রভাব পড়েছিল ; এবং তাঁর গভীর অনুরাগী ইনি হয়ে উঠেছিলেন। শেষকালে ইনি বড় ভক্ত হয়ে ওঠেন।

হরবিলাসের স্মৃতিকথায় স্বামীজীর দেশপ্রেমিকরূপের কথা প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সামাজিক কুপ্রথার বিষয়ে স্বামীজীর কঠোর মনোভাবের উল্লেখ তিনি করেন

নি। হয়ত 'দেশপ্রেমিক' শব্দের মধ্যে সবকিছু দিয়েছেন। এরই কাছাকাছি সময়ে স্বামীজীর বিষয়ে যে-সব স্মৃতিকথা পাই, তাদের মধ্যে দেখি, স্বামীজী অন্যান্য সামাজিক অবিচারের সঙ্গে বাল্যবিবাহ-প্রথার নিন্দা করেছেন অতি কঠিন ভাষায়। এই প্রথার সমর্থকদের সম্বন্ধে ঘৃণায় ও ধিক্কারে তাঁর মন পূর্ণ ছিল। সহবাস-সম্মতি বিল নিয়ে তখন দেশে হৈ-চৈ চলেছে, সেইসূত্রে স্বামীজী তাঁর মনোভাবকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। আমরা জানি, হরবিলাস সর্দা এই বিষয়ে পরবর্তী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। নিশ্চয় ধরে নিতে পারি, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের কালে তাঁর মনোভাব এ-বিষয়ে কিছুটা প্রস্তুত ছিল। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর আলোচনাকালে কি প্রসঙ্গটি ওঠেনি? এবং যদি তা উঠে থাকে, হরবিলাস কি এক্ষেত্রে স্বামীজীর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হননি?

হরবিলাস-স্মৃতিকথায় এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে স্বামীজীর প্রায় পক্ষকাল অবস্থানের কথা পাই, যাঁর নাম পরবর্তীকালে ভারতের চরমপন্থী রাজনীতি প্রসঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হবে—তিনি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা (১৮৫৭-১৯৩০)। স্বামীজীর কোনো জীবনীতে এই বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে স্বামীজীর সংযোগের কথা পাইনি, যদিও শুনেছি, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নাকি তাঁর আত্মকথায় স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও পত্রব্যবহারের কথা লিখেছেন, যদিও সে লেখা এখনো আমরা দেখবার সুযোগ পাইনি। ১৮৯৭ সালে চিরতরে ভারতত্যাগ করে প্রথমে ইংলণ্ডে, পরে প্যারিসে বসবাস করে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে যে-রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়েছিলেন (যার মধ্যে পড়ে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি', 'ইণ্ডিয়া হাউস' স্থাপন ; চরমপন্থী পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' প্রকাশ; সাভারকর-প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রভাবিত করা ইত্যাদি), তারই জন্য যদিও বর্তমানে তাঁর খ্যাতি, তবু স্বামীজীর সঙ্গে অবস্থানকালে তিনি মোটেই অখ্যাত ব্যক্তি নন। কচ্ছ-মাণ্ডবীতে এঁর জন্ম ; সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হন প্রথম শিক্ষাজীবনেই ; স্বামী দয়ানন্দকে দেখে আর্যসমাজ-আন্দোলনে যোগ দেন ; দয়ানন্দের দ্বারা ১৮৮৪-তে আর্যসমাজের অন্যতম ট্রাস্টি মনোনীত হন; তার আগে ইংলণ্ডে গিয়ে অক্সফোর্ড থেকে বি-এ ডিগ্রি নেন ১৮৭৯-এ ; সেখানে সংস্কৃতজ্ঞ মনিয়ের উইলিয়মসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘটে ; বার্লিনে ওরিয়েনটালিস্ট কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ১৮৮৩-তে ; ১৮৮৫-তে ভারতে ফিরে প্রথমে বোম্বাই হাইকোর্টে আইনব্যবসা, পরে রতলম-এ দেওয়ানের পদগ্রহণ ; দু'বছর পরে পদত্যাগ করে পুনশ্চ আইনজীবী—এই সময়েই স্বামীজীর সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ। এর খুব অল্পদিনের মধ্যে উদয়পুর রাজ্যে পরামর্শদাতার পদ ; তারপর জুনাগড়ের দেওয়ানী-লাভ ; ইংরেজ-অফিসারের চক্রান্তে সেই চাকরি থেকে বঞ্চিত হওয়া। ইংরেজ-শাসনের প্রকৃতি ইনি চিনে নিয়েছিলেন, বিশেষতঃ তিলক ও নাটু-ভ্রাতাদের সম্বন্ধে সরকারের বর্বর আচরণ দেখে। নিজের বিপদের আশঙ্কা দেখে অতঃপর ইনি দেশত্যাগ করে যান।[১৩]

খুবই দুঃখের বিষয়, এইরকম একজন বিরাট পণ্ডিত এবং গতিশীল চরিত্রের মানুষের সঙ্গে স্বামীজীর দীর্ঘ আলোচনা হল পক্ষকাল ধরে, অথচ তার কোনো বিবরণ রইল না, কেবল উল্লেখটুকু ছাড়া! এবং সে উল্লেখও আমরা পেতাম না—হরবিলাস সর্দা না লিখে গেলে!!

---

১৩ শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সম্বন্ধে সাধারণ সংবাদগুলি ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 'মিলিট্যাণ্ট ন্যাশন্যালিজম্ ইন ইণ্ডিয়া' (১৯৬৬) এবং এস পি সেন-সম্পাদিত 'ডিক্সনারি অব ন্যাশন্যাল বায়োগ্রাফি' থেকে সংকলিত।

॥ ৬ ॥

১৮৯২-এর গোড়ার দিকে কোনো সময়ে স্বামীজী জুনাগড়ে পৌঁছে সেখানকার দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসের বাড়িতে আতিথ্য নেন। "স্বামীজীর আলাপ-ব্যবহারে দেওয়ানজী এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রত্যহ অপরাহ্ণে রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত স্বামীজীর সঙ্গে বসিয়া দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। স্বামীজীও ইঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে এইপ্রকারে যে-বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জীবনব্যাপী অব্যাহত ছিল।" ১৪

হরিদাস বিহারীদাসের সঙ্গে স্বামীজীর বন্ধুত্বের বিশেষ মূল্য আছে। প্রথমতঃ স্বামীজী এঁকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন বলে নিজ জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধে এঁর কাছে এমন কতকগুলি চিঠি লিখেছেন, যা 'টেস্টামেণ্ট'-এর গৌরব পাবে। দ্বিতীয়তঃ স্বমাজী তাঁর জীবনের এক অতি সংকটক্ষণে তাঁর সম্বন্ধে দেওয়ানজীর লেখা প্রশংসাযুক্ত একটি পত্র উপায়ান্তর হয়ে ব্যবহার করেছিলেন, এবং বলেছিলেন, এঁকে 'ভারতের গ্লাডস্টোন' বলা হয়। মিশনারি ও ব্রাহ্ম-কুৎসার বিষয়ে যখন আমরা 'কিছু অসুখী ব্যক্তি' অধ্যায়ে আলোচনা করব, তখন দেখাবার চেষ্টা করব—হরিদাস বিহারীদাস সম্পর্কে স্বামীজী-কথিত উক্তি সমকালে কি রকম স্বীকৃত ছিল। এখানে কেবল বর্তমান অধ্যায়ের প্রয়োজনে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে 'অপরিচিত' নবীন সন্ন্যাসীর গভীর শ্রদ্ধাসম্পর্ক ছিল।

হরিদাস বিহারীদাস যে বিবেকানন্দের দ্বারা এইকালে অভিভূত হতে পারেন, তা স্বামী গম্ভীরানন্দ বিচারসহ জানিয়েছেন ঃ

"বস্তুতঃ জুনাগড়ে তখন স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের এমন এক অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল, যাহা মনে হয়, আদর্শের দিক হইতে প্রায় পূর্ণাঙ্গ।...জুনাগড়ে যেন তাঁহার অসামান্য প্রতিভা কার্যকরী পূর্ণ বিকাশের পথে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিল। বরাহনগরে তাঁহাকে পাইয়াছিলাম অধ্যয়নাদিনিরত এবং তপস্যাপরায়ণ নেতারূপে। হিমালয়ে তাঁহাকে দেখিয়াছি আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ সত্যদ্রষ্টা ঋষিরূপে। আলোয়াড়ে তাঁহার গুরুভাব সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। খেতড়িতে তিনি ধর্মজীবনের সহিত পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞানের সমন্বয়সাধনে তৎপর। জুনাগড়ে এইসমস্ত তো আছেই, তদুপরি তাঁহাকে আমরা পাই ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের অগ্রদূতরূপে।"

মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর সঙ্গে হরিদাসের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু সংবাদ দিয়েছেন। হরিদাস জুনাগড়ের দেওয়ান নির্বাচিত হয়েছিলেন বোম্বাই সরকারের দ্বারা। স্বামীজী প্রথমে যখন হরিদাসের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন রম্‌তা সাধু হিসাবে, তাঁর গুণপনার বিশেষ পরিচয় হরিদাস পাননি, এমন সময়ে একদিন স্বামীজী দেখলেন, হরিদাস খুবই বিষণ্ণ হয়ে আছেন। স্বামীজী কারণ জিজ্ঞাসা করলে হরিদাস বলেন, যাঁরা রাজকাজে থাকেন, তাঁদের চিন্তিত থাকতেই হয়। তাছাড়া এসব ব্যাপারে সাধুদের অভিজ্ঞতাই বা কি? স্বামীজী তবু প্রশ্ন করে ব্যাপারটা জেনে নিয়েছিলেন ঃ বোম্বাই সরকারের সঙ্গে জুনাগড়ের স্বার্থসংঘাত। হরিদাস আছেন দোটানায়। স্বামীজী তখন একখানা কাগজ তুলে নিয়ে আপনমনে কি যেন লিখেছিলেন, তারপর সেটি এগিয়ে দিয়েছিলেন দেওয়ানজীর দিকে। তিনি পড়ে অবাক। অনবদ্য রাজনৈতিক রচনা—যার থেকে ভাল-কিছু লেখা সম্ভব নয়। হরিদাস সেটাই লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বোম্বাই সরকারের কাছে, তাতে কর্যোদ্ধার

১৪ 'যুগনায়ক'; ১ম; পৃ ৩৩৪।

হয়েছিল, আর তিনি বুঝেছিলেন, ইনি সন্ন্যাসী তবে রাজসন্ন্যাসী। স্বামীজীর প্রতি দেওয়ানজীর গভীর সম্ভ্রম জেগেছিল বলাই বাহুল্য।

স্বামীজী-বিষয়ে হরিদাস বিহারীদাসের কোনো মন্তব্য বা রচনা আমরা এখনো পাইনি, তবে লুই বার্কের গ্রন্থে আছে, স্বামীজী তাঁর বিষয়ে লেখা হরিদাসের একটি চিঠি অধ্যাপক রাইটের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য সে চিঠি ছিল প্রশংসাসূচক। সে চিঠি অবশ্য মুদ্রিত হয়নি, কারণ নিশ্চয় সেটির সন্ধান অধ্যাপক রাইটের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়নি।

১৮৯৪-এ আফিম-কমিশনের সদস্যরূপে কলকাতায় এসে হরিদাস আলমবাজার মঠে যান, এবং সেখানে ভাণ্ডারা দেন। সেইসময়ে তিনি স্বামীজীর বিষয়ে অনেক কথা বলে-ছিলেন, কিন্তু সেগুলি বিশেষ মনে রাখার উৎসাহ মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতির হয়নি, কারণ তখন আমেরিকা থেকে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আশ্চর্যজনক সংবাদ আসছে, তাই মন কেড়ে রেখেছে সকলের।

॥ ৭ ॥

স্বামীজীর গোয়াগমনের বিষয়ে কিছু নতুন সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। স্বামীজী গোয়া গিয়েছিলেন, এই সংবাদটুকু ইংরেজি জীবনীতে আছে। অতিরিক্ত সংবাদ দিয়ে গোয়াবাসী ডি পি এন দালাল ১৯৫৮ সালে কোনো মরাঠি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার সাহায্য নিয়ে ভি এস সুখতংকর ১৯ জানুয়ারি, ১৯৬৪, মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকায় যা লেখেন, তার প্রয়োজনীয় অংশ এই ঃ

"স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পরিব্রজ্যাকালে বেলগাঁওয়ে এসেছিলেন। এখানে তিনি শহরের বিশিষ্ট নাগরিক ডাঃ ভি ভি শিরগাঁওকরের কাছে গোয়াগমনের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। এটি সাধারণ ভ্রমণেচ্ছা নয়, কারণ তার মনে বিশেষ উদ্দেশ্য জাগরূক ছিল। ডাঃ শিরগাঁওকর তাঁর পণ্ডিত-বন্ধু মাড়গাঁওয়ের সুব্রাই নায়ককে লেখেন, তিনি যেন স্বামীজীকে সাহায্য করেন।

"স্বামীজী মাড়গাঁও রেলস্টেশনে অবতরণ করলে শত-শত লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। স্বামীজীকে ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে শোভাযাত্রা করে নিমন্ত্রক সুব্রাই নায়কের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

"সুব্রাই নায়ক সংস্কৃতজ্ঞ এবং হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সুতরাং স্বভাবতঃই তিনি স্বামীজীর অসাধারণ মনীষা ও ধর্মজ্ঞানের গভীরতায় চমৎকৃত হন। তিনি যখন শুনলেন, তাঁর এই বিশিষ্ট অতিথির গোয়া আগমনের মূল উদ্দেশ্য প্রাচীন ল্যাটিন গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি থেকে খ্রীস্টান তত্ত্ববিদ্যা অধিগত করা, যেসব গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি গোয়া ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রাপ্তব্য নয়—তখন তিনি জে পি অ্যালভারস্ নামক তাঁর জনৈক বিদ্বান খ্রীস্টান বন্ধুর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। অ্যালভারসের সঙ্গে স্বামীজীর এই বিষয়ে ল্যাটিন ভাষায় আলোচনা হল। স্বামীজীর পাণ্ডিত্যে বিশেষ প্রভাবিত হয়ে তিনি অবিলম্বে মাড়গাঁও থেকে চার মাইল দূরবর্তী রঙেকাল সেমিনারিতে তাঁর থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করে দিলেন। এটি গোয়ায় খ্রীস্টীয় তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষার সর্ব-প্রাচীন কনভেণ্ট কলেজ ; এখানে খ্রীস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি এবং ল্যাটিনে ছাপা গ্রন্থ রক্ষিত ছিল।

"স্বামীজী এই সেমিনারিতে তিনদিন থেকে একাগ্র অধ্যবসায়ের সঙ্গে এখানে রক্ষিত খ্রীস্টীয় তত্ত্ববিদ্যার সকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁর বিরাট মনীষা এবং খ্রীস্টধর্ম

সম্বন্ধে সুদৃঢ় জ্ঞানভিত্তিতে স্থাপিত মৌলিক বক্তব্য ঐ সেমিনারির ফাদার-সুপিরিয়র, অন্যান্য পাদরি এবং ছাত্রগণের কাছে আশ্চর্যজনক ব্যাপার বলে মনে হয়।

"স্বামীজী মাদ্রাজে [ফিরতে চাইলে, তার আগে] তাঁর কাছে নিকট বা দূর থেকে পাদরিদের নিয়মিত আগমন ঘটতে থাকে; পাদরিরা এমন কি এই হিন্দুসন্ন্যাসীকে বিদায়দানের জন্য শহরে যে-সংবর্ধনানুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন।" [অ] ১৫

॥ ৮ ॥

মহারাষ্ট্রের কয়েকটি জায়গায় স্বামীজীর ভ্রমণ এবং চমকসৃষ্টি বিষয়ে কিছু মূল্যবান নূতন সংবাদ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীতে পাই, তিনি ১৮৯২, জুলাই মাসের শেষে খান্ডোয়া থেকে বোম্বাই আসেন। সেখানে বিখ্যাত ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসের বাড়িতে ওঠেন। কয়েক সপ্তাহ কাটানোর পরে পুনা যান এবং তিলকের বাড়িতে দশ-বার দিন থাকেন। তারপরে মহাবালেশ্বরে যান লিমড়ীর ঠাকুর-সাহেবের (অর্থাৎ রাজার) সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। এঁর কাছে স্বামীজী বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন কারণ ইনি কতকগুলি কদাচারী তান্ত্রিকের কুমতলব থেকে স্বামীজীকে বাঁচান। ঠাকুরসাহেব পরে স্বামীজীর শিষ্যত্ব নেন। মহাবালেশ্বর থেকে স্বামীজী কোলাপুর ও বেলগাঁওয়ে যান। সেখান থেকে যান মাড়গাঁও, যার বিবরণ কিছু আগে দিয়েছি। তারপর আরও দক্ষিণে প্রস্থান করেন।

'রেমিনিসেনসেস্' গ্রন্থে বালগঙ্গাধর তিলকের একটি স্মৃতিকথা মুদ্রিত আছে। সেটি কিন্তু তিলক নিজে লেখেন নি, বেদান্তকেশরীর প্রতিনিধি তাঁর কাছ থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তার মধ্যে দেখি, ঘরোয়া সভায় স্বামীজীর দার্শনিক বক্তৃতা শুনে অন্যান্যদের সঙ্গে তিলক মুগ্ধ হয়েছিলেন; 'কপর্দকশূন্য' এই তরুণ সন্ন্যাসীর 'সমুচ্চ গুণপনা' সম্বন্ধে চমৎকৃত চিন্তা করেছিলেন। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তিলক এইসময়ের মধ্যেই ভারতীয় তত্ত্বদর্শনের বড় পণ্ডিত। 'রেমিনিসেনসেস্' গ্রন্থে ধৃত এই স্মৃতিকথা এখানে উপস্থিত করব না। আর একটি স্মৃতিকথা অনুরূপভাবে সংগ্রহ করেন প্রহ্লাদ নারায়ণ দেশপাণ্ডে ১৬—সেটিরই প্রথমাংশ আমরা এখানে ব্যবহার করব; শেষাংশ যাবে 'বিবেকানন্দ

১৫ ইংরাজি জীবনীতে স্বামীজীর গোয়াগমনের ভালো বিবরণ না পাওয়া গেলেও স্বামীজীর পত্রাবলীতে গোয়ার মাড়গাঁও থেকে লেখা একটি চিঠি রয়েছে, যার তারিখ দেওয়া আছে ১৮৯৩। তারিখটি সম্ভবতঃ আনুমানিক। মাড়গাঁওয়ে স্বামীজী যাঁর আতিথ্য নিয়েছিলেন, তাঁর বংশধরেরা জানাচ্ছেন, তিনি ১৮৯২ খৃীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গোয়ায় গিয়েছিলেন। মাড়গাঁও থেকে স্বামীজী হরিপদ মিত্রকে লিখেছিলেন: "আমি এস্থানে নিবাপদে পেঁৗছি, ও তদনন্তর পঞ্জেম প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ও দেবালয় দর্শন করিতে যাই।...ডাক্তার যুগড়েকরের মিত্র আমায় অতিশয় যত্ন করিয়াছেন।... পঞ্জেম শহর বড় পরিষ্কার। এখানকার খৃীস্টিয়ানেরা অনেকেই কিছু-কিছু লেখাপড়া জানে। হিন্দুরা প্রায় সকলেই মূর্খ।" স্বামীজী পত্রে 'সচ্চিদানন্দ' বলে স্বাক্ষর করেছিলেন। যাই হোক, এখানে দেখতে পাচ্ছি, স্বামীজী মাড়গাঁওয়ে তাঁকে আশ্রয়দানকারীর বিষয়ে বলছেন—তিনি ডাঃ যুগড়েকরের বন্ধু। উপরে উদ্ধৃত রচনায় তিনি ডাঃ ভি ভি শিরগাঁওকরের বন্ধু। উভয়ে কি একই ব্যক্তি?

১৬ তিলকের স্মৃতিকথা সংগ্রহের কারণ জানাতে গিয়ে দেশপাণ্ডে বলেছেন, তিনি 'লোকমান্য তিলকের ছাত্র', স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে তিলকের সঙ্গে স্বামীজীর একত্র অবস্থানের উল্লেখ দেখে কৌতূহলী হয়ে তিনি আরও সংবাদ জানবার জন্য মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বানন্দের কাছে উপস্থিত হন ১৯১৪ বড়দিনের সময়ে। সর্বানন্দজী অপরপক্ষে তাঁকে তিলকের কাছ থেকে অধিক সংবাদ ও চিঠিপত্র সংগ্রহ করবার অনুরোধ জানান। তদনুযায়ী ১৯১৫ সালে তিলকের কাছ থেকে উপরি-উদ্ধৃত স্মৃতিকথা দেশপাণ্ডে সংগ্রহ করেন।

ও তিলক' অধ্যায়ে। বেদান্তকেশরীর বিবরণের সঙ্গে অবশ্য দেশপাণ্ডের বিবরণ প্রধানাংশে এক।

তিলক বলেছিলেন :

"১৮৯২-তে আমি বোম্বাই থেকে ফিরছিলাম। সেকেণ্ড ক্লাসে বসেছিলাম। একজন সন্ন্যাসী এসে আমার কামরাতেই উঠে বসলেন। কয়েকজন গুজরাটি ভদ্রলোক সঙ্গে এসেছিলেন তাঁকে বিদায় দিতে। তাঁরাই সন্ন্যাসীর টিকেট কেটে দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীর পুনায় চেনা-জানা কেউ ছিল না বলে গুজরাটি ভদ্রলোকেরা আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন, এবং আমার বাড়িতে তাঁকে আশ্রয় দিতে বলেন। পুনায় এসে সন্ন্যাসীকে আমি বসতবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা একটি ঘরে থাকতে দিলাম। সেখানে তিনি প্রায় দশদিন ছিলেন। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটি মৃগচর্মের আসন, দণ্ড, কমণ্ডলু, দুটি কাপড় ও কয়েকটি বই। তিনি কিছুটা চাপা স্বভাবের, অপরের সঙ্গে কথাবার্তায় বিশেষ রাজি নন। আমি অবশ্য মাঝে-মাঝে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতাম।

"সে সময়ে হীরাবাগে আমাদের 'হীরাবাগ ক্লাবে'র সাপ্তাহিক অধিবেশন হত। রীতি ছিল—কোনো সদস্য কোনো একটা বিষয়ে বক্তৃতা করবেন, তারপরে অন্য সদস্যেরা তার উপরে আলোচনা করবেন। বক্তৃতা হত ইংরেজিতে। একদিন সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে হীরাবাগে গেলেন। পরলোকগত কাশীনাথ গোবিন্দ নাটু কোনো এক দার্শনিক বিষয়ে প্রথমে বক্তৃতা করলেন। নিয়ম অনুযায়ী অপর সদস্যদের সেই বিষয়ে আলোচনা করার কথা। কিন্তু বক্তৃতার বিষয় ছিল তাঁদের জানার বাইরে, সুতরাং কেউই কিছু বলতে এগোলেন না। তখন আমি সন্ন্যাসীকে কিছু বলতে অনুরোধ করলাম। আমার কথায় তিনি উঠে ঐ বিষয়ের প্রতিপক্ষে বলতে শুরু করলেন। এক ঘণ্টা অনর্গল প্রাঞ্জলভাবে বলে গেলেন। বিষয়টির উপর এমনভাবে আলোচনা করলেন যে, সকলেই পরম বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল।

"এই ঘটনার পর থেকে শহরের লোকজন তাঁর দর্শনে প্রায়ই আসতে আরম্ভ করল। সন্ন্যাসী তাঁদের কাছে ভগবদ্গীতা, উপনিষদ প্রভৃতির বিষয়ে বলতেন। সন্ন্যাসী কিন্তু নিজের নাম বলেননি।

"ভগবদ্গীতা আমার প্রিয় বিষয়। ঐ বিষয়ে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি দুই-তিনবার আলোচনা করেছিলাম। তার দ্বারা মনে হয়েছিল, আমাদের উভয়েরই ধারণা, গীতার মূল কথা নিষ্কাম কর্মযোগ। লোকজনের আসা-যাওয়া যখন বিশেষ বেড়ে গেল, তখন সন্ন্যাসী

মনে নাড়া খেলে তিলক নিজেই স্বামীজীর প্রসঙ্গ করতেন, তার একটি নিদর্শন পেয়েছি কবিযোগী মহর্ষি শ্রীশুদ্ধানন্দ ভারতীর (ইনি রামকৃষ্ণ সংঘভুক্ত নন) স্বামীজী-বিষয়ক একটি রচনায় ('স্বামী বিবেকানন্দ বার্থ সেণ্টিনারি স্যুভেনির; পেরাম্বুর ডিভিশন; ১৯৬৪' গ্রন্থে), যার মধ্যে তিনি লিখেছেন :

"মহান জাতীয় নেতা বালগঙ্গাধর তিলকেব সঙ্গে মাদুরায় ১৯১৭ সালে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁকে 'গীতা মিশনে'র কথা বলেছিলুম—এই ব্যাপারে একদল প্রচারক সৃষ্টির প্রয়োজনের কথা, যাঁরা ভারতীয়দের আত্মচেতনা দেবেন। তিলক সহসা বিবেকানন্দের কথা বলতে আরম্ভ করলেন, যাঁকে তিনি ১৮৯২ সালে পুনায় দেখেছিলেন। বিবেকানন্দ তিলকের সঙ্গে আট দিন ছিলেন। স্বামীজী প্রকাশ্য সভায় কোনো বক্তৃতা করেন নি, লোক এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু তিলক তাঁকে প্রথম ডেকান ক্লাবে বক্তৃতা করান। তিলক বললেন : "জীবন্ত গীতা হতে হবে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রবাহিত হোক উপনিষদ। ত্যাগ মানে নয় ঊষর জীবন কিংবা পরলোকের প্রতি আসক্তি। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে সাহসের সঙ্গে, বীরের মতো, কার্যকরভাবে। আমাদের ঐক্য নেই। স্বামীজী বলতেন, ঐক্য এবং কর্ম—এই হল বিজয়ী দেশের দুই শক্তি।" তিলক চেয়েছিলেন, ভারতের তরুণেরা 'রাজনৈতিক বিবেকানন্দ' হয়ে উঠুক, আত্মায় সাহসী, স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মত্যাগী বীর।

লেখক শ্রীশুদ্ধানন্দ ভারতী তাঁর শৈশবে স্বামীজীর স্পর্শ ও আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। এঁর ধারণা—সেই স্পর্শই এঁকে সন্ন্যাসী করেছে।

একদিন আমাকে বললেন, পরদিন তিনি চলে যাবেন। সত্যই চলে গেলেন, কেউ শয্যাত্যাগ করার আগেই।" [অ]

বেদান্তকেশরীর বিবরণের সঙ্গে দেশপাণ্ডে-বিবরণের যে-অল্প পার্থক্য বা নতুন যোজনা আছে তা হল, দেশপাণ্ডে অতিরিক্ত জানিয়েছেন ঃ (১) স্বামীজী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠেছিলেন, এবং তাঁকে বিদায় দিতে আগত গুজরাটি ভদ্রলোকেরা তাঁর টিকেট কেটে দিয়েছিলেন; (২) পুনায় স্বামীজী তিলকের বাড়িতে যে-ঘরে থাকতেন সেটি বসতবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন; (৩) স্বামীজী গোড়ায় অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা এড়িয়ে চলতেন, তবে তিলকের সঙ্গে আলাপ করতেন; (৪) বেদান্তকেশরীর বিবরণে আছে, স্বামীজী নাকি মেনে নিয়েছিলেন, গীতা ত্যাগ-বৈরাগ্য সমর্থন করে না (যে-কথার প্রতিবাদ রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে করা হয়েছে), এখানে সেরকম কোনো কথা নেই; (৫) হীরাবাগের ডেকান ক্লাবে বক্তৃতার পর থেকে স্বামীজীর কাছে ভিড় জমতে শুরু করে, সুতরাং স্বামীজী সকলের অজ্ঞাতে অদৃশ্য হয়ে যান।

স্বামীজীর বোম্বাইয়ের বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সেটলুর। ইনি তিলকেরও ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। বোম্বাই অঞ্চলে স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারে এঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগের অল্প পরে, ১৯০২, ২৪ অগস্ট ইনি কোলাপুরের নেটিভ জেনারেল লাইব্রেরীতে স্বামীজীর জীবন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সেটি বিজাপুরকর-সম্পাদিত বিখ্যাত মরাঠি পত্রিকা 'গ্রন্থমালায়' দুই সংখ্যায় বেরিয়েছিল। আমরা ১৯০২, অগস্ট সংখ্যা দেখতে পেয়েছি। তার মধ্যে যে নতুন সংবাদ পাচ্ছি তা এই ঃ

(১) স্বামীজীকে বিবাহিত করার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়েছিল; স্বামীজীর মা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তাঁর কথায় পরমহংস নরেন্দ্রনাথকে বলেন, মায়ের কথা শুনলে ক্ষতি কি? 'ভগবানের সম্মতি' নিয়ে নরেন্দ্রনাথকে তিনি বাড়ি ফিরতে বলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন দেবমূর্তির সামনে প্রার্থনায় বসেন। প্রতিমার দিকে তাকিয়ে তিনি সমাধিস্থ হয়ে যান। তাঁর মা কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারেননি। পরমহংস তখন তাঁর মাকে বলেন, একে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কী লাভ? এ সেখানে গেলে তো একই ভাবে থাকবে। মা হতাশ হয়ে ফেরেন।

(২) স্বামীজী যখন আমেরিকাযাত্রার জন্য জাহাজে ওঠেন তখন তাঁর মাদ্রাজী-শিষ্যদের মধ্যে একজন বলেন, স্বামী-মহারাজ, আপনি বিচিত্র এক দেশে যাচ্ছেন হিন্দুধর্মের উপরে বক্তৃতা করার জন্য, কিন্তু কি ব্যাপার, আপনি কোনো বই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন না? যদি অন্য কোনো বই না নিয়ে যান, অন্ততঃ এই বইটি সঙ্গে নিন। এই বলে তিনি মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ বইটি এগিয়ে দেন। তাঁর কথা শুনে স্বামীজী ঐ বই থেকে ক্রমান্বয়ে নানা অংশ মুখস্থ বলে যেতে থাকেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মনীষা এবং প্রচুর স্মৃতিশক্তি ছিল। তিনবার পড়েই যে-কোনো জিনিসকে তিনি মুখস্থ রাখতে পারতেন। শিষ্যটি যখন 'সর্বদর্শন' থেকে মুখস্থ বলতে শুনলেন তখন তিনি আর বই নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন না।

(৩) বোম্বাইয়ের ছবিলদাস স্বামীজীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, স্বামীজী যদি মঠ করতে চান তাহলে তিনি তাঁর কান্হারি গুহা দিয়ে দেবেন। ১৭

---

১৭ সেটলুর শ্রুতি ও স্মৃতি মিশিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে মাদ্রাজ মেল পত্রিকায় ১৯০২, ১৪ জুলাই। তার মধ্যে পাই!

"স্বামী বিবেকানন্দ সারা ভারতে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত করেন—অন্যতম উদ্দেশ্য ভারতের ছোট বড় প্রত্যেক ধর্ম মত ও পথের সেরা প্রবক্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবেন।...

শেষোক্ত প্রসঙ্গে জানানো যায়, ব্যারিস্টার ছবিলদাস স্বামীজীর সঙ্গে একই জাহাজে *পাশ্চাত্যযাত্রা করেছিলেন, এবং তিনি স্বামীজীর গুণমুগ্ধ* ছিলেন। স্বামীজীও তাঁকে *পছন্দ করতেন।* ছবিলদাস মঠ-তৈরীর জন্য যে-কান্হারি গুহা দিতে চেয়েছিলেন, তা বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে এখন বোম্বাইয়ের অন্যতম প্রধান দর্শনীয় স্থান।

উপরে উল্লিখিত 'গ্রন্থমালা'র সম্পাদক বিখ্যাত মরাঠি সাহিত্যিক বিজাপুরকর গ্রন্থমালার জুলাই, ১৯০২ সংখ্যায় যে-শোকপ্রবন্ধ লেখেন তাতে কিছু মূল্যবান স্মৃতিকথা আছে। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিজাপুরকর লিখেছিলেন ঃ

"ঋষিরা পৃথিবীর কাজ শেষ হয়ে গেলে এক মুহূর্তও এখানে থাকেন না। আরব্ধ কাজ শেষ হয়েছে কিনা তা তাঁরাই বলতে পারেন।...শ্রীবিবেকানন্দ জীবন শেষ করে দিলেন চল্লিশের ঠিক আগে। তাঁর সবকিছু তিনি আমাদেরই হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। যদি কেউ তাঁকে নিয়ে 'শঙ্কর দিগ্বিজয়ের' অনুরূপ 'বিবেক-দিগ্বিজয়' রচনা করতে পারেন তাহলে তা মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ দুইই হবে। আমাদের বিবেচনায়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিবেকানন্দের দেহাধারে বিশেষ শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন পাশ্চাত্য জাতিসমূহের উদ্বোধনের জন্য। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, যে-ভারতবর্ষকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়, সে পৃথিবীতে বিরাট কাজ করতে সমর্থ।... বিচারপতি রানাডের প্রভাব নানা দেশে যায়নি; তিনি ভারতের জন্যই প্রয়োজনীয় ছিলেন। বিবেকানন্দের সুবিশাল প্রতিভা আমাদের কাজে লাগা উচিত ছিল। প্রথমে নিজের মঙ্গলে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, তারপরে পৃথিবীর মঙ্গলের চেষ্টা। কিন্তু উপরে জানিয়েছি, আমরা সামান্য জীবমাত্র, ঋষিদের কাজের বিচার আমরা করতে সমর্থ নই, মহাকালই তা নির্ণয় করতে পারবে। এসবই বিশ্বনিয়ন্তার হাতে।"

অতঃপর বিজাপুরকরের স্মৃতিকথা ঃ

"১৮৯২ সালে তিনি [স্বামীজী] আমাদের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করছিলেন। তখন ভেবেছিলাম, তিনি বিখ্যাত বাগ্মী হয়ে দাঁড়াবেন। নিজের বিষয়বস্তুতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন—তাকে তিনি শ্রোতাদের সামনে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতেন যে, সেগুলি তাদের মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যেত। আমরা তাঁকে আমাদের রাজারামীয় পরিষদে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। আলোচনার সময়টির কথা কখনো ভুলব না। তাঁর সঙ্গে যদি দেড় ঘণ্টা সময় কাটাবার অপূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকত তাহলে কিভাবে তিনি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ

রামেশ্বর ও মালাবার যাবার পথে তিনি বাঙ্গালোর ও মহীশূরে যান; অবশেষে পণ্ডিচেরী হয়ে মাদ্রাজে পৌঁছান। মাদ্রাজে তিনি বাবু [মন্মথ] ভট্টাচার্যের সঙ্গে বাস করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর চতুর্দিকে একদল তরুণ জুটে গেল, যারা এতদিন ডাঃ ডানকানের সাহায্যে কেবল মিল, বেন, স্পেনসার সেবন করেছে। যখন তারা দেখল, এই সাধু এমন ইংরাজি বলছেন, যে-রকম বলতে পারা তাদের অধিকাংশের সাধ্যাতীত, এবং পাশ্চাত্যের দর্শনসমূহের মধ্যে প্রবেশের এমন পরিচয় দিচ্ছেন, যা পুথিপড়া বিদ্যে দিয়ে তারা কদাপি করতে সমর্থ নয়—তখন মাদ্রাজের সমগ্র তরুণসমাজ তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত হল। মাদ্রাজে তাঁকে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করতে বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়। সে অনুরোধ তিনি যে কেবল অগ্রাহ্য করেন তাই নয়, **তাঁর অনুরাগীদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দেন, তারা যেন তিনি যা শিক্ষা দিচ্ছেন, তা প্রকাশ না করে।** তারপর এল ধর্মমহাসভা। রামনাদের রাজা, খেতড়ির মহারাজা, শ্রীযুক্ত বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং অপর মাদ্রাজী অনুরাগীদের সহায়তায় তিনি আমেরিকা যান—না, 'হিন্দু-বৌদ্ধদের প্রতিনিধি হিসাবে' নয়, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবেই।" [অ] [স্থূলিলিপি লেখক-নির্দেশে]

এইকালে স্বামীজীর বিষয়ে সংবাদপত্রে সংবাদের অভাবের কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটলুরের চিঠি থেকে। স্বামীজী যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, যাতে তাঁর সংবাদ কাগজে না বেরোয়। যেটুকু সংবাদ 'থিয়জফিস্ট' বা 'রিফর্মারে' বেরিয়েছিল [কী বেরিয়েছিল পরে দেখব], তা তাঁর অনিচ্ছায়, ধরে নিতে হবে। মনে হয়, কাল পূর্ণ না হলে তিনি অবতীর্ণ হতে চাননি।

করে রাখেন তা কোনমতে বুঝতেই পারতাম না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বক্তৃতার সময়ে তাঁর কোনো সাহায্যের দরকার আছে কি না? কিন্তু তিনি বক্তৃতার জন্য কোনো কিছুই টুকে রাখলেন না। আমরা সাধারণভাবে অনেক কিছুই জানতাম, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে সেগুলি নির্গত হয়ে অদ্ভুত আকর্ষণীয় দাঁড়াল। রাওসাহেব গোলওয়ালকর কোলাপুরের রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। স্বামীজীকে খাসবাগে রাখবার ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছিলেন। আমরা শুনেছিলাম, একজন বিরাট সন্ন্যাসী এসেছেন যিনি ইংরাজিতে কথাবার্তা বলেন। সান্ধ্যভ্রমণ থেকে ফিরবার পথে তাঁকে দেখতে গেলাম। কিছু দূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, এবং তাতেই বুঝলাম, স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব অপূর্ব। তাঁর সন্নিধানে গিয়ে রীতি অনুযায়ী নমস্কার করলাম। তিনি 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করলেন না, বা আশীর্বাদ-সূচক কিছু বললেন না। তিনি অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন। কেউ প্রশ্ন করা মাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিচ্ছিলেন। পরদিন আমরা তাঁকে আমাদের রাজরামীয় পরিষদে আমন্ত্রণ জানালাম। সেখানেও সেই একই অভিজ্ঞতা।...স্বামীজী অব্যাহতভাবে বলে যেতে লাগলেন—তাঁর বক্তৃতার মধ্য থেকে একটি-দুটি বাক্য স্মরণ করতে পারি : 'আমার ধর্ম এমন, বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রীস্টধর্ম সামান্য অনুকরণ।' 'ইয়োরোপের লোক ধর্ম বুঝবে কি করে যখন তারা ঐশ্বর্যের পিছনে ধাবিত?' এই কথার একজন অর্থ করে বললেন, 'মাংসাশীরা কি করে ধর্ম বুঝবে?' তাতে স্বামীজী ঝলসে উঠে বললেন, 'না, তা ঠিক নয়; তোমাদের, প্রাচীন ঋষিরা মাংসাহারী ছিলেন, উত্তররামচরিতে পড়নি?' তারপর তিনি উত্তররামচরিত থেকে অংশ উদ্ধৃত করে শোনালেন, যাতে পরিষ্কার মাংসাহারের কথা রয়েছে। এই উল্লেখ শুনে সকলে নির্বাক হয়ে রইল। কয়েকজনের মনে তখন সন্দেহ হল, স্বামীজীর জাতি কী? কিন্তু কে সাহস করে সে প্রশ্ন করবে?" [অ]

এরপরে স্বামীজীর মহাবালেশ্বরে অবস্থান সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাই তিলকের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, পুনার 'মরাঠা' পত্রিকার সম্পাদক এন সি কেলকারের একটি বক্তৃতা থেকে। পুনা ফার্গুসন কলেজে ১৯৩৫, ১৯ জুলাই তিনি ঐ বক্তৃতা দেন। এন সি কেলকারের কাছে অন্য সকলের তুলনায় বিবেকানন্দের স্থান ছিল উচ্চে। ঐ বক্তৃতায় রাজা রামমোহন রায় বা কেশবচন্দ্র সেনের উপরেই কেবল তিনি স্বামীজীকে স্থাপন করেননি, সেইসঙ্গে প্রচলিত একটি ধারণার পোষকতা করে বলেছিলেন—বিবেকানন্দের জন্যই তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রচারিত হতে পেরেছিলেন। "যদি রামকৃষ্ণকে আমি অপূর্ব এক আলোক বা টর্চের সঙ্গে তুলনা করি, বিবেকানন্দকে বলব, ঐ অগ্নিশিখার দ্বারা প্রজ্বলিত দাবানল"—কেলকার বলেছিলেন। এইকথা বলবার সময়ে তিনি অবশ্যই ভুলে গিয়েছিলেন, মূল গৌরব কেন্দ্রীয় অগ্নির; রামকৃষ্ণ তাই। ঐ সভার সভাপতি, দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দামলে সেই কথাই বলেছিলেন। যাই হোক স্বামীজীর প্রতি শ্রীযুক্ত কেলকারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রদ্ধাই ওখানে প্রকাশ পেয়েছিল।১৮

১৮ কেলকার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"In Bengal itself many persons like Ram Mohon Roy and Keshub Chunder Sen had appeared. There were also experts in making religious propaganda. But Vivekananda's trend of mind proved to be more enviable and more successful. Ram Mohon Roy was a great scholar and was given to the comparative study of religions. But most of his works rather proved to be destructive. He bluntly exposed defects in the social system of the Hindus. He generally advised that the Indian should accept western civilization. Keshub

স্বামীজী মহাবালেশ্বরে কি রকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, কেলকারের বক্তৃতায় সংক্ষেপে তা পাই ঃ

"১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি আমাদের বোম্বাই ও পুনা অঞ্চলে এসেছিলেন। তখন তিনি কিন্তু বিখ্যাত হননি। আমি তখন এল-এল-বি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি। গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকজন উকিল মহাবালেশ্বরে গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা বললেন, এক প্রদীপ্ত-প্রতিভা বাঙালী সন্ন্যাসীর দেখা তাঁরা পেয়েছেন। চমৎকার তাঁর ইংরাজি ভাষার বাগ্মিতা, একেবারে বেঁধে রাখে, এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তা প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুমহান। তাঁরা আরও বললেন, সাতারায় সন্ন্যাসীকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী কিন্তু সেখানে আসেন নি এবং আমিও তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ পাইনি।" [অ]

বেলগাঁওয়ে স্বামীজীর অবস্থানের দুটি উত্তম স্মৃতিকথা আছে; দুটিই 'রেমিনিসেনসেস' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। প্রথমটির লেখক জি এস ভাট, যিনি ঐকালে ছাত্র ছিলেন। স্বামীজীর আকৃতি, পোষাকের বৈশিষ্ট্য, হিন্দীজ্ঞান, পানসুপারি ও তামাকপ্রীতি, খাদ্য বিষয়ে মনোভাব ইত্যাদির কথা ইনি বলেছেন। সেইসঙ্গে স্বামীজীর সংস্কৃতজ্ঞানের কথাও। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী স্বামীজীর কণ্ঠস্থ—তাঁর কাছে সংস্কৃত-শিক্ষার্থী এই ছাত্রটি কি রকম ফ্যাসাদে পড়েছিলেন, সেকথাও। লেখকের পিতা অল্পদিনেই আবিষ্কার করেছিলেন, উক্ত তরুণ সন্ন্যাসী 'কেবল সাধারণের ঊর্ধ্বে অবস্থিত নন, তিনি একেবারে অসাধারণ ব্যক্তি।' অবিলম্বে স্বামীজীর চতুর্দিকে লোক জুটেছিল। আলোচনার সময়ে একদিকে পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে যুক্তিতর্কের অসামান্য ক্ষমতা স্বামীজী কিভাবে দেখাতেন, তার বিবরণও লেখক দিয়েছেন।

হরিপদ মিত্রের স্মৃতিকথা ('স্বামীজীর সহিত দুই-চারি দিন' ঃ 'স্বামীজীর কথা' গ্রন্থভুক্ত; অনূদিত হয়ে 'রেমিনিসেনসেস' গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে) অতি মূল্যবান, এবং রচনাগুণে অতি উপাদেয়। পরিচ্ছন্ন, প্রগাঢ়, অর্থবহ বাংলায় তিনি এই স্মৃতিকথা লিখেছেন। রচনা পড়লেই বোঝা যায়, ইনি ছাত্র-হিসাবে উত্তম ছিলেন। ঐকালে ইনি ফরেস্ট অফিসারের বড় চাকরি করতেন। কলেজে পড়বার সময়ে নানা শাখার বিজ্ঞান পড়েছিলেন; হাক্সলি, ডারউইন, মিল, টিন্ডাল, স্পেনসারের রচনাদির সঙ্গে পরিচয়ও ছিল; ফলে গর্বিত নাস্তিক হতে দেরি হয়নি; কিন্তু জিজ্ঞাসাটা থামেনি; ধর্মজিজ্ঞাসাও ছিল; ফলে চার্চ, ব্রাহ্মমন্দির ও হিন্দু দেবালয়ে যাতায়াত করতে লাগলেন, এবং কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করতে না পেরে অজ্ঞেয়বাদ ও 'প্রচুর বেতনের চাকরি'র আশ্রয়ে আপাতসুখে অথচ কোনো একটা 'অভাবের ছায়া' নিয়ে কাল কাটাতে লাগলেন। এমনি এক সময়ে তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ—১৮৯২, ১৮ অক্টোবর মঙ্গলবার। "প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা-সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।...দেখিলাম, প্রশান্ত মূর্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, গোঁপ-দাড়ি কামানো, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি—সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ হইলে এখনো যেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি।" যে-সুখের সন্ধানী

Chunder Sen was a follower of Bhakti Marga. He helped to start Prarthana Samaj [of Maharashtra]. But the people of Maharashtra know the reasons why this religious institution could not achieve success.

"I may dare say that Vivekananda was more successful than his Guru Ramkrishna Paramhansa. If there could not have been Vivekananda, fame of Ramakrishna would not have spread as it is now."

ছিলেন হরিপদ মিত্র, তাকে মূর্ত দেখলেন স্বামীজীতে : "মনে হইল, এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদাসন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখনো দেখি নাই। মনে করিতাম, যাহার পয়সা নাই তাহার মরণ ভালো। বাস্তবিক নিস্পৃহ সন্ন্যাসী জগতে অসম্ভব—কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া এতদিনে তাহাকে শিথিল করিল।"

হরিপদ মিত্র যা শুনেছিলেন, তাকে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন। সব-কথায় আমাদের প্রয়োজন নেই, কেবল কতকগুলি সংবাদ সংকলন করতে পারি। আমরা জেনেছি, এই সময়ে স্বামীজী টাকাকড়ি স্পর্শ না করার ব্রত নিয়েছিলেন (এ-বিষয়ে তিলক প্রভৃতি অনেকে সাক্ষ্য দিয়েছেন), কোলাপুরের রাণী (যিনি শিষ্যা হয়েছিলেন) অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে দুইখানি গেরুয়াবস্ত্রের বেশি-কিছু দিতে পারেন নি; জেনেছি, 'রাজোয়ারা ও খেতড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা-রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন'; জেনেছি, তাঁর 'স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল', 'আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওলজি, অ্যাস্ট্রনমি, মিকস্‌ড্‌ ম্যাথামেটিকস্‌ প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল,' এবং সেইসঙ্গে জুল ভার্নের বৈজ্ঞানিক উপন্যাস ও কার্লাইলের সার্তর রেসার্টাস পড়তে উৎসাহ বোধ করতেন। যে-হরিপদ মিত্র কোনোদিন কাউকে ভক্তিভরে প্রণাম করেননি, তিনি স্বামীজীকে বিদায় দেবার সময়ে 'আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম' করেছিলেন, কারণ ইতিমধ্যে তাঁর মনে এই মনোরম সন্দেহ জেগেছে—'ইনি কি মনুষ্য না দেবতা?'

॥ ৯ ॥

স্বামীজীর জীবনীতে এবং পত্রাবলীতে মহীশূর-মহারাজের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। ঐকালে ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদের মধ্যে অর্থে-সম্পদে এবং সম্মানে মহীশূরের মহারাজের স্থান একেবারে প্রথম সারিতে। স্বামীজীর সঙ্গে মহারাজের সম্পর্ক-বিষয়ে যেসব সংবাদ স্বামীজীর জীবনীতে পাই, সেগুলি যে, মহীশূরের রাজপরিবার এবং রাজসভাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে, তা আমরা সন্ধান করে বার করতে সমর্থ হয়েছি। ১৯১৪, জানুয়ারিতে বাঙ্গালোরে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব সভায় মহীশূরের যুবরাজ একটি ভাষণ দেন, যার মধ্যে স্বামীজীর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাবলীর চমৎকার উপস্থাপনা ছিল। ইনি পূর্বোক্ত মহীশূরের মহারাজা শ্রীচামরাজেন্দ্র ওয়াড়িয়ারের পুত্র। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ইনি বলেছিলেন, 'বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সানুরাগ পক্ষপাত এবং ভক্তিশ্রদ্ধা আমি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। আমার স্বর্গতঃ স্মরণীয় পিতা স্বামীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন এবং সর্বদাই তাঁর বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন।' এই সভাতেই, যুবরাজের উপস্থিতিতে, মহীশূরের দেওয়ান-বাহাদুর কে পি পুত্তনা চেট্টিয়ার যা বলেন, তা বাঙ্গালোরের 'কর্ণাটক' পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৯১৪, ৩১ জানুয়ারিতে। আমি প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি :

"আপনাদের অনেকে স্বামীজীর জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড পড়েছেন। তার মধ্যে তাঁর মহীশূরবাসের বিবরণ আছে। পুণ্যস্মৃতি মহামান্য মহারাজ শ্রীচামরাজেন্দ্র ওয়াড়িয়ারের সঙ্গে স্বামীজীর কথাবার্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেখানে আছে। স্বামীজী তিন কি চার সপ্তাহের জন্য দেওয়ান স্যার কে শেষাদ্রি আয়ারের অতিথি হয়েছিলেন। তাঁর অবস্থানকালে তাঁর দর্শন পাবার জন্য তাঁর স্বধর্মভুক্ত সর্বশ্রেণীর মানুষই কেবল উদ্‌গ্রীব হতেন না, অন্য ধর্মমত ও পথের মানুষেরাও একই আগ্রহ বোধ করতেন। রাজ্য-কাউন্সিলের সদস্য পরলোক-

গত মিঃ আবদুল রহমান সাহেব কোরানের কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ মিটিয়ে *নেবার জন্য স্বামীজীর কাছে গিয়েছিলেন।*

"পরলোকগত মহামান্য মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটিয়ে দেবার পরে তিনি মহীশূর-প্রাসাদে সম্মানিত অতিথি-হিসাবে বাস করেন। মহারাজার সঙ্গে স্বামীজীর গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্বামীজীর একটি মন্তব্য এখানে পুনরুদ্ধৃত করার যোগ্য। মহারাজ একদিন তাঁর সভাসদগণের সমক্ষে স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন, 'স্বামীজী! আমার সভাসদদের বিষয়ে আপনার কি ধারণা?' স্বামীজীর সাহসী উত্তর, 'মহারাজের অন্তঃকরণ মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি সভাসদগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকেন, আর সভাসদরা যে-রকম হয়ে থাকে তাই।'[১৯] স্বামীজী অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা ছিলেন, কাউকে খাতির করে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন না। স্বামীজী সম্পর্কে গভীরভাবে প্রীত হয়ে স্যার কে শেষাদ্রি আয়ার একদিন তাঁকে কোনো-কিছু উপহার গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করেন। বাজারের সবচেয়ে দামী দোকানে স্বামীজীকে নিয়ে যাবার জন্য একজন সেক্রেটারির উপর আদেশ দেন, যাতে তিনি পছন্দ করে যা-ইচ্ছে জিনিস কিনে নিতে পারেন। গৃহস্বামীর সন্তোষের জন্য স্বামীজী উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। সেক্রেটারি পকেটে চেকবই নিয়ে চললেন—হাজার টাকা পর্যন্ত চেক কাটতে তিনি তৈরী। দোকানে ঢুকে স্বামীজী একেবারে শিশুর মতো; এটা দেখেন, ওটা নাড়েন, সবেতেই খুশি। শেষে অধীর হয়ে বললেন, 'আমি ইচ্ছামতো কিছু কিনলে যদি দেওয়ানজী আনন্দিত হন, তাহলে এখানকার সবচেয়ে ভালো চুরুট কিনে দিন।'

"একদিন মহারাজা স্বামীজীকে নিজ কক্ষে আহ্বান করেন। দেওয়ান তাঁর সঙ্গে যান। মহারাজা জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজী আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?' তখন স্বামীজী সরাসরি উত্তর না দিয়ে তাঁর মিশন সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অনর্গল বলে যান। ভারতের ভাণ্ডারে দর্শন ও ধর্মরত্ন সংগৃহীত আছে; ভারতের এখন প্রয়োজন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবধারা, সেইসঙ্গে আমূল সংস্কার। সঞ্চিত অধ্যাত্ম ও দার্শনিক রত্নরাজি পাশ্চাত্ত্যজগতে দান করা ভারতের দায়িত্ব; পাশ্চাত্ত্যের জাতিসমূহের কাছে বেদান্তপ্রচারের জন্য তিনি আমেরিকায় যেতে চান ইত্যাদি। তিনি যোগ করে দেন, 'আমি চাই, পাশ্চাত্ত্যদেশ আমাদের ঐহিক উন্নতির জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করুক, অন্যান্য কারিগরি জ্ঞানদানের ব্যবস্থাও করুক।' মহারাজা তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুতি দেন, স্বামীজীর আমেরিকাগমনের ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। স্বামীজী কিন্তু তখন এই উদার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। সেইদিন থেকে মহারাজা এবং দেওয়ানজী ধারণা করেন—ভারতের পরিত্রাণের জন্য নির্ধারিত পুরুষ ইনিই; ইনি সেই মানুষ, যাঁর মধ্যে সমগ্র দেশচেতনা মূর্তিপরিগ্রহ করেছে। স্বামীজী যতই মহারাজার সঙ্গে কাটাতে লাগলেন ততই স্বামীজীর প্রতি মহারাজের আকর্ষণ নিবিড়তর হতে লাগল। স্বামীজী বিদায় নেবেন শুনে মহারাজ বলেন,

১৯ অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার তাঁর স্মৃতিকথায় স্বামীজীর কাছ থেকে মহীশূরের মহারাজের বিষয়ে যা শুনেছিলেন, তার কিছু লিখেছেন। তার মধ্যে সভাসদ-ব্যাপারটি ছিল। স্বামীজীর স্পষ্টকথা কি রকম বিপজ্জনক হতে পারে তার ইঙ্গিতও সেখানে আছে। "স্বামীজী, মহারাজকে তাঁর কাছের কোনো মানুষকে সরিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। উক্ত ব্যক্তি মহারাজার প্রীতিভাজন বলে কথিত, তাঁর কিছু খ্যাতিও ছিল; কিন্তু তাঁর বিষয়ে সত্য করে হোক, মিথ্যা করে হোক, মিথ্যা করেই সম্ভবতঃ জনমানসে মন্দ ধারণা ছিল। স্বামীজীর অনুরোধ শুনে মহারাজ এই বিচিত্র উত্তর দেনঃ স্বামীজী, আপনি আমার দেখা শ্রেষ্ঠতম মানুষদের একজন; আপনি এই দেশের জন্য অতি মহৎ কর্ম সম্পাদন করার নির্ধারিত পুরুষ; সুতরাং আমার প্রীতিভাজনদের কারো প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করে বা তাকে বরখাস্ত করাবার চেষ্টা করে আপনি রাজপ্রাসাদে নিজের জীবন বিপন্ন করবেন না। ও-বিপদ সত্যই আছে।"

'স্বামীজী, আপনার ব্যক্তিত্বের স্মারক-হিসাবে একটা-কিছু আমি রেখে দিতে চাই। সুতরাং আপনার কণ্ঠস্বরের ফনোগ্রাফিক রেকর্ড করে নিতে দিন। এই যন্ত্রে প্রেরণাপূর্ণ কিছু বলুন, যাতে তা সর্বদা আমার সঙ্গে থাকতে পারে।' স্বামীজী রাজি হন। এখনো পর্যন্ত সেই রেকর্ডটি প্রাসাদে রক্ষিত আছে। স্বামীজীর প্রতি মহারাজের শ্রদ্ধাভক্তি এমনই বেড়ে যায় যে, তিনি তাঁর **পদপূজা** করতে চান, কিন্তু স্বামীজী সে কাজ করতে দেননি। বিদায় নেবার সময় হয়ে গেছে, স্বামীজীর মুখে একথা শুনে মহারাজা তাঁকে দামী উপহার দিতে চান। স্বামীজী তা অস্বীকার করে বলেন, 'মহামান্য মহারাজ, আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী। দামী উপহার নিয়ে কি করব? নিজের জন্য সম্পদ-হিসাবে কিছু না নেবার ব্রত আমি গ্রহণ করেছি। আমি অর্থ স্পর্শও করছি না। সুতরাং মহামান্য মহারাজ, যদি আপনার কাছ থেকে কিছু না-নিলে নয়, তাহলে ধাতুর্জড়িত নয়, এমন একটা হুঁকা আমাকে দিন।' মহারাজা তখন তাঁকে সুন্দর খোদাইকরা রোজ্-কাঠের একটি হুঁকা উপহার দেন। [যেটি স্বামীজী অল্প-দিনের মধ্যে মাদ্রাজে মন্মথ ভট্টাচার্যের পাচককে উপহার দিয়ে ফেলেন।]

"মহীশূরের রাজসভা থেকে স্বামীজী যখন বিদায় নেন, তখন দেওয়ানজী তাঁর পকেটে একতাড়া কারেন্সি-নোট গুঁজে দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। স্বামীজী একেবারেই রাজি হন না, কেবল কোচিন যাবার একটি টিকেট নিয়ে নেন।" [অ]

স্বামীজীর মহীশূরে থাকাকালে আরও দু'একটি ঘটনার কথা বিবৃত করেছিলেন এ নরসিংহয়াঙ্গ, বাঙ্গালোরে ১৯০৬ জানুয়ারিতে, বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব সভায়। ১৯০৬ ফেব্রুয়ারির ব্রহ্মবাদিনে পাই, উক্ত ব্যক্তি বলেছিলেন ঃ

"স্বামীজীর মহীশূরে অবস্থানকালের একটি-দুটি ঘটনা আমি বলব, যাদের থেকে দেখা যাবে, কি অসাধারণ শক্তি তাঁর ছিল। স্বামীজী যখন মহীশূরের মহারাজার অতিথি হয়ে আছেন তখন মহীশূরে ঘটনাচক্রে এসে হাজির হন পৃথিবীবিখ্যাত এক অস্ট্রিয়ান সঙ্গীতজ্ঞ। ইনি প্রাসাদে এসেছিলেন। সঙ্গীতের বিষয়ে কথাবার্তার সময়ে দেখা গেল, ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বামীজীর অসাধারণ জ্ঞান। সবাই অবাক হয়ে ভাবল, ভারতীয় সঙ্গীতে উচ্চ অধিকারের সঙ্গে স্বামীজী কিভাবে ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিষয়েও এমন অসাধারণ জ্ঞানার্জন করলেন! পুনশ্চ আর একদিন তাঁর সঙ্গে একজন বিদ্যুৎ-বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ হল এবং উভয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ-বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। তখনও দেখা গেল—এই ব্যক্তি, যিনি বিদ্যুৎ বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন, হাতে-কলমে তা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, মহীশূর-প্রাসাদকে বিদ্যুতালোকিত করবার কাজ নিয়ে এসেছেন—বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাঁর থেকে স্বামীজীর জ্ঞান অনেক বেশি। আর একবার স্যার শেষাদ্রি আয়ারের সভাপতিত্বে এক পণ্ডিত-সম্মেলন হয়। আলোচনার বিষয় বেদান্ত। সমবেত পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরাও স্বামীজীর কাছে দাঁড়াতে পারলেন না।" [অ]

স্বামীজীর সঙ্গীতপ্রতিভা মানুষকে কি রকম অভিভূত করত, তার বর্ণনা পাওয়া যায় এস কে নায়ারের 'সভ্যতা' বিষয়ক একটি বক্তৃতার মধ্যে। মহীশূর শহরে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেনঃ "পৃথিবীর সর্বাধিক বিখ্যাত ব্যক্তিগণের অনেকে সঙ্গীতজ্ঞ। আমি নিজে অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়, প্রথমশ্রেণীর অনেক সঙ্গীতজ্ঞকে জানি; তথাপি আমার ধারণা, কেউই এক্ষেত্রে স্বামীজীকে অতিক্রম করতে পারেন নি। সঙ্গীতশিল্পে স্বামী বিবেকানন্দের অত্যুচ্চ অধিকার। সঙ্গীতকালে স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের মধুরতা, তাঁর গহন সত্তার উন্মোচিত ধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে শ্রোতাদের এমন প্রবলভাবে আচ্ছন্ন অভিভূত করে ফেলে যে, তারা যেন অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য কোনো ঊর্ধ্বতর জগতে উন্নীত হয়।" [অ] [প্রবুদ্ধ ভারত, ১৯০৬, নভেম্বর]

মহীশূরের মহারাজা আর বেশিদিন বাঁচেননি। স্বামীজীর ফেরার আগেই ১৮৯৪

ডিসেম্বরে তাঁর দেহান্ত হয়। তিনি যথার্থই কৃতী পুরুষ ছিলেন, 'যৌবনে তাঁর মহৎ আচরণ ও অকলঙ্ক চরিত্রের জন্যই' যে, তাঁকে মহীশূরের গদী ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা তাঁর পিতার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন ইংরাজ সরকার—একথা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র 'মাদ্রাজ মেল' ১৮৯৪, ২৮ ডিসেম্বরের সম্পাদকীয়তে লিখেছিল। উপযুক্তভাবে ইংরাজি-শিক্ষিত এই মহারাজা নিজ রাজ্যকে এমনভাবে শাসন করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, লণ্ডন টাইমসের 'ভারত-বিষয়ে'র লেখক মন্তব্য করেন ঃ মহীশূরের মত সুবৃহৎ রাজ্যের বিপুল প্রজাপুঞ্জের শুভাশুভের ভার দেশীয় ব্যক্তির শাসনাধীনে অর্পণ করার ফল মারাত্মক হতে পারে, এই আশংকা অনেকে পোষণ করলেও, মহীশূরের মহারাজা তাঁর মন্ত্রী স্যার শেষাদ্রি আয়ারের সহযোগিতায় এমনভাবে রাজ্য চালিয়েছেন যে, তা আদর্শ দেশীয়রাজ্য হয়ে উঠেছে। মাদ্রাজ মেল মহারাজার ব্যক্তিগত চরিত্রের বিষয়ে প্রভূত প্রশংসা করে লিখেছিল ঃ 'শ্রেষ্ঠ এবং ব্যাপক অর্থে খাঁটি ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়, তিনি তাই ছিলেন। ইংরাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর প্রীতি নানাদিক দিয়ে খুবই স্পষ্ট ছিল। তথাপি কদাপি বিস্মৃত হননি তিনি হিন্দু। তাঁর জাতি এবং ধর্ম তাঁর উপরে যে-দায় অর্পণ করেছিল, তাকে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পালন করেছেন।'

মহীশূর রাজ্যকে 'বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহের সমতুল, কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে শ্রেষ্ঠতর করে তোলার' কৃতিত্ব মহীশূরের মহারাজার চেয়ে তাঁর দেওয়ান স্যার শেষাদ্রির কম নয়। ১৯০১, ১৩ সেপ্টেম্বর তাঁর দেহান্তের পরে ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লেখে, স্যার শেষাদ্রি তাঁর ১৮ বছরের কার্যকালে মহীশূরকে ঋণগ্রস্ত অবস্থা থেকে উত্তোলন করে 'ঈর্ষাযোগ্য সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে' এগিয়ে নিয়ে গেছেন। 'দেশীয় প্রতিভা এবং রাজনীতিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপের' পরিচয় ইনি দিয়েছেন, এবং এ'র দেহান্ত 'আধুনিক ভারতীয় রাজনৈতিক জগৎ থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের অপসারণ করেছে।'

স্বামীজীকে স্যার শেষাদ্রি ব্যক্তিগত অতিথি-হিসাবে পেয়েছিলেন। স্বামীজী-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অন্য অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করব। এখানে প্রসঙ্গ-শেষে মহীশূরের মহারাজের দেহান্তে মিরার দুঃখপ্রকাশ করে যা লিখেছিল, তার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্যযাত্রায় মহারাজের দানের কথা স্মরণ করে মিরার লেখে, 'স্বামীজীর হৃদয়ে ধর্মাগ্নি জ্বলছিল, মহারাজা তার চকিত রূপদর্শন করেছিলেন। আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে পাশ্চাত্ত্যে বিবেকানন্দের মিশনের গৌরবময় সাফল্য দেখে কত না আনন্দ-বোধ করতেন! পরলোকগত মহারাজা চাম রাজেন্দ্র ওয়াড়িয়ার বহু মহৎ কাজের দ্বারা নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন। এদের মধ্যে কম শ্রেষ্ঠ কাজ নয়—পাশ্চাত্ত্যে হিন্দুধর্ম প্রচারের নির্ধারিত মানুষটিকে চিনে নিয়ে তাঁকে সেখানে প্রেরণের সহায়ক হওয়া।২০

॥ ১০ ॥

কেরালায় স্বামী বিবেকানন্দের আগমন এবং সেখানকার শোচনীয় সমাজব্যবস্থা দেখে তাঁর জ্বালাময় অনুভূতির কথা তাঁর জীবনী-পাঠকদের জানা আছে। পথে চলতে শূদ্রের ছায়া লাগলে যেখানে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, অথচ শূদ্রনারীকে ভোগ করলেও ব্রাহ্মণের জাত পুরো বজায় থাকে, সেই জায়গা স্বামীজীর কাছে 'একেবারে পাগলাগারদ।' এই কেরালায় সামাজিক উন্নয়নের জন্য নারায়ণ-গুরুকে কেন্দ্র করে যে-শক্তিশালী আন্দোলন

২০ 'মিরারে'র মন্তব্য লাহোর 'ট্রিবিউন' উদ্ধৃত করেছিল ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬।

হয়েছে, তার পিছনে স্বামীজীর প্রেরণা কতখানি আছে, তা গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। এখানে প্রসিদ্ধ নারায়ণ-গুরুর গুরুরূপে কথিত চট্টম্পি-স্বামীর সঙ্গে স্বামীজীর মিলন সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আমরা পেয়েছি, তাই পরিবেশন করছি।

চট্টম্পি-স্বামীর শিষ্য নীলকণ্ঠ তীর্থপাদের উপরে মালয়ালম ভাষায় পি নানু পিল্লাই এবং এস এন্ কৃষ্ণ পিল্লাই-লিখিত 'জীবচরিত্রসমুচ্চয়' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে কেরালায় বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ এবং চট্টম্পি-স্বামীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা আছে। মূল গ্রন্থ হাতে পাইনি বলে সেখানে কী এবং কতখানি লেখা আছে বলতে পারব না, তবে পি শেষাদ্রি 'ত্রিচুর বিবেকানন্দ সেণ্টিনারি সুভ্যেনিরে (১৯৬৩)' 'স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড কেরালা' প্রবন্ধে' আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"কথিত আছে স্বামীজী এর্নাকুলামে মহান চট্টম্পি-স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। দুজনেই দুজনকে দেখে মুগ্ধ হন। স্বামীজী চট্টম্পি-স্বামীকে একান্তে আলোচনা করার ইচ্ছার কথা বলেন। চট্টম্পি-স্বামী অনুরোধ রক্ষা করেন এবং এক গোটা রাত্রি কথাবার্তায় অতিবাহিত করেন। কথিত আছে, আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে 'চিন্মুদ্রা' ছিল। এমনও বলা হয়েছে, স্বামীজী তাঁর ডায়েরীতে চট্টম্পি-স্বামীর নাম ও ঠিকানা লিখে নেন। তিনি চট্টম্পি-স্বামীকে বলেন, 'আমি ডায়েরীতে লিখছি—মালাবারে একজন যথার্থ মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম।' চট্টম্পি-স্বামী প্রায়ই স্বামীজী-সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে কথা বলতেন, এবং স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'সন্দেহ হয়, বিবেকানন্দ-স্বামীর সঙ্গে আমার পার্থক্য গরুড় ও মশার পার্থক্যের মতো কি না!'"

বিবেকানন্দ-গবেষণার জন্য ১৯৭১ অক্টোবরে ত্রিবাঙ্কুরে অবস্থানকালে চট্টম্পি-স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত শ্রীবোধশরণের সঙ্গে দেখা করতে যাই। এই সম্মানিত ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ সমাজসেবী সাক্ষাৎকালে আলোচ্য প্রসঙ্গে বেশ-কিছু সংবাদ আমাকে দিয়েছিলেন। শ্রীবোধশরণ ধর্মের সন্ধানে শৈশব থেকেই বহির্গত; ১২ বছর বয়স থেকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত; সেই সময়ে এক বিখ্যাত মালয়ালী লেখকের দ্বারা অনূদিত স্বামীজীর 'ভক্তিযোগ' পাঠ করে আত্মবোধ লাভ করেন; স্বামী নির্মলানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকেন; পরে যদিও তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে (বা তাঁর ইচ্ছায় সরে গিয়ে) নারায়ণ-গুরুর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন তথাপি নির্মলানন্দের প্রতি এঁর অব্যাহত শ্রদ্ধা। গান্ধীজীর বহু আগে কেরালায় স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ দূর করার ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে নির্মলানন্দ যে-গৌরবময় কাজ করেছেন, তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ইনি বলেছিলেন, কেরালার জনজীবনে বহির্গত যে-কোনো প্রভাবের চেয়ে বিবেকানন্দ-প্রভাব বেশি। স্বামীজীর জীবনীতে চট্টম্পি-স্বামীর উল্লেখ না থাকার জন্য তাঁর ভক্তদের অভিযোগের কথা জানিয়ে শ্রীবোধশরণ আমাদের বলেন :

"চট্টম্পি-স্বামীর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ পরিচিত। স্বামীজীর সঙ্গে চট্টম্পি-স্বামীর সাক্ষাতের কথা তাঁর মুখেই বারবার শুনেছি।

"স্বামীজীর কন্যাকুমারিকায় যাবার আগের বা পরের ঘটনা। এর্নাকুলামে লাল (একজন ভদ্রলোক) ও একজন ব্রাহ্মণ—একত্রে প্রাতঃভ্রমণে ও সান্ধ্যভ্রমণে বেরুতেন। একদিন এর্নাকুলামে সমুদ্রখাড়ির ধারে বেড়াবার সময়ে একটি নৌকা এসে ভিড়ল, তার থেকে অবতরণ করলেন কাষায় বসন-পরা এক সন্ন্যাসী, হাতে লাঠি নিয়ে। 'এঁকে দেখে যথার্থ সন্ন্যাসী মনে হচ্ছে, যথার্থ বড় মানুষ। সুতরাং এঁকে হারানো যায় না'—এঁরা সিদ্ধান্ত করলেন। এগিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে হাজির হলেন। সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী বলছিলেন। তাঁকে নিয়ে একজন নিজের বাড়িতে তুললেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ইংরাজি জানেন?' 'কুছ্ কুছ্ জানি'—উত্তর হল। কিছু পরে দেখা গেল 'কুছ্ কুছ্' নয়—ইংরাজিতে দারুণ পণ্ডিত। সংবাদ রটে

গেল দ্রুত। এর্নাকুলামের সবাই যেন এসে জুটল। চট্টম্পি-স্বামী তখন ওখানেই আছেন। এইরকম এক সমাবেশে তিনি পিছনের দিক থেকে উঁকি দিয়ে স্বামীজীকে দেখে গিয়েছিলেন। স্থানীয় লোকে স্বামীজীর কাছে চট্টম্পির বিষয়ে নানাকথা, বলেছিলেন। তাঁদের কেউ-কেউ বলেন, তাঁরা চট্টম্পি-স্বামীকে নিয়ে আসবেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য। তাতে স্বামীজী বলেন, 'তোমরা যে-রকম বলছ, তিনি যদি সেইরকম বিরাট মানুষ হন, তাহলে তিনি কেন আমার কাছে আসবেন, আমিই যাব তাঁর কাছে।' তখন শঙ্কর মেননের বাড়িতে চট্টম্পি-স্বামী ছিলেন। সেখানে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ গেলেন। তাঁরা সংস্কৃতে কথাবার্তা বললেন, কারণ চট্টম্পি-স্বামী হিন্দী জানতেন না। চট্টম্পি, স্বামীজীর সঙ্গে একান্তে কথা বলার জন্য তাঁকে একটি গাছতলায় নিয়ে গেলেন। গাছের উপরে বাঁধা ছিল একটি বাঁদর—গৃহস্বামীর পোষা। কথাবার্তার সময়ে সে ব্যস্ত হয়ে ছটফট করতে লাগল, গাছ নাড়াতে লাগল। স্বামীজী উপরদিকে তাকালেন। তারপর বললেন, বানরের চঞ্চলতার দিকে ইঙ্গিত করে, 'ঠিক আমার মনের মতো [বানরটির অবস্থা]।' চট্টম্পি-স্বামী তৎক্ষণাৎ বললেন, 'হাঁ, ওকথা আপনার মতো [মহান] ব্যক্তি বলতে পারেন; আমার মতো লোক, যে ওর [বানরের] মতো, ওকথা বলতে সমর্থ নয়।' তারপর উভয়ের মধ্যে 'চিন্‌মুদ্রা' নিয়ে আলোচনা হয়। 'চিন্‌মুদ্রা এইরকম কেন?'—স্বামীজী প্রশ্ন করেন। চট্টম্পি তামিল-পণ্ডিত, ব্যাপারটা জানতেন, সুতরাং যথাযোগ্য উত্তর দেন। স্বামীজী তাতে খুব সন্তুষ্ট হন। তিনি তৎক্ষণাৎ চট্টম্পির দুই হাত হাতে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বলেন, 'বহুত আচ্ছা।' কেউ-কেউ বলবেন, চট্টম্পির হাত স্বামীজী নিজের মাথায় নিয়েছিলেন। তা ঠিক নয়। চট্টম্পি-স্বামী নিজে আমাকে বলেছেন, ওটা ছিল পারস্পরিক ভদ্রতা-বিনিময়।

"চট্টম্পি-স্বামী আমাকে দেখতে পেলেই বিবেকানন্দের কথা বলতেন। স্বামীজীর কণ্ঠস্বরে তিনি মুগ্ধ। তার ধ্বনি যেন 'তাঙ্ক কুডাম', Golden pot-এর অনুরণিত ধ্বনির তুল্য। 'তিনি গান করতেন! আ-হা! তাঙ্ক কুডাম! কি মধুবর্ষী স্বর! আমি সেই স্বরতরঙ্গে একেবারে বিগলিত হয়ে যেতাম!' স্বামীজীর চোখেরও বহু প্রশংসা তিনি করতেন।

"চট্টম্পি ও স্বামীজী যখন সংস্কৃতে কথাবার্তা বলছিলেন, তখন একজন সংস্কৃত পণ্ডিত সেখানে এসে হাজির হন। তিনি স্বামীজীর ভাষায় কিছু ব্যাকরণভুলের কথা বলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামীজী বলেন, 'ব্যাকরণের কাছে আমার যাবার প্রয়োজন নেই—ব্যাকরণই আমার পায়ের কাছে এসে স্থির হয়ে বসুক।'

চট্টম্পি-স্বামী ও নারায়ণ-গুরু স্বামীজীর আমিষভোজন সমর্থন করতেন না। 'ওটুকু বাদ দিলে, তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ'—তাঁরা বলতেন।"

ত্রিবেন্দ্রামে বিবেকানন্দের অবস্থান-স্মৃতি লিখেছেন ঐকালে মাদ্রাজের প্রধান পণ্ডিত-অধ্যাপকদের অন্যতম কে সুন্দররাম আয়ার,২১ 'রেমিনিসেনসেস' গ্রন্থে গৃহীত সেই রচনাটি

২১ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'মিলিটাণ্ট ন্যাশন্যালিজম্ ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের সূচনায় সুন্দররাম আয়ারের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ডঃ মজুমদারের মতে অধ্যাপক আয়ারই ভারতীয় শিক্ষাজগতের প্রথম ব্যক্তি যিনি 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখেছেন, (*Four Political Essays*; Madras; Natesan; 1903), যার মধ্যে তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসকে 'ন্যাশন্যাল' বলতে রাজি হননি, কারণ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয় 'স্বাধীন সরকার।' কংগ্রেস নিজেকে 'রাজানুগত্য-সম্পন্ন' ঘোষণা করেছে; তার আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক; তার অনেক নেতা উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারী। 'এইসব ব্যক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্য বরবাদ করতে চাইবেন, এমন কথা গর্দভেই ভাবতে পারে।' অধ্যাপক আয়ার যাঁকে 'আধুনিককালে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক' মনে করতেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে তাঁর গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন।

উচ্চাঙ্গের। আমি কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংকলন করছি সেখান থেকে। যথাপূর্ব, ত্রিবেন্দ্রামেও বিজয়ী বিবেকানন্দকে দেখা গিয়েছিল। তবে এখানে স্বামীজী যথার্থ পণ্ডিত কয়েকজনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মহাপণ্ডিতরূপে স্বীকৃত অধ্যাপক রঙ্গাচার্য (যাঁর বিষয়ে আগে কিছু বলেছি, পরেও কিছু বলতে হবে 'স্বামীজীর পত্রিকা' অধ্যায়ে), অধ্যাপক সুন্দরম পিল্লাই, দেওয়ান শঙ্কর সুব্বিয়ার, এস রমা রাও (ডিরেক্টর, ভার্নাকুলার ইনস্ট্রাকসন) প্রভৃতি। ত্রিবেন্দ্রামের সকল প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তি যেখানে সমবেত হতেন সেই 'ত্রিবেন্দ্রাম ক্লাবে' আলোচনাকালে স্বামীজী তাঁর ব্যক্তিত্বের গাঢ় ছাপ সকলের মনে এঁকে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বামীজী খুব খুশি হয়েছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের পণ্ডিত হিসাবে বিদিতযশ বঞ্চীশ্বর শাস্ত্রীর সঙ্গে অল্পকালস্থায়ী আলাপের কথা অধ্যাপক আয়ার বলেছেন, যার মধ্যে ব্যাকরণের অত্যন্ত জটিল কয়েকটি প্রসঙ্গ উঠেছিল, এবং পণ্ডিতজী স্বীকার করেছিলেন, 'স্বামীজী দেখিয়েছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণে তাঁর নিখুঁত জ্ঞান এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁর সমূহ দখল।' অধ্যাপক আয়ার স্বামীজীকে যেমন ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার এবং দেশাচারকে প্রচণ্ড আক্রমণ করতে দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন বিজ্ঞানের কুসংস্কারকেও অনাবৃত করতে। তিনি বলেছিলেন, ধর্মের যদি কুসংস্কার থাকে, বিজ্ঞানের কুসংস্কারও কম নয়। 'বিবর্তনবাদ' ইত্যাদিকে পরীক্ষা করে যেখানে অনেক সময়ে অসন্তোষজনক মনে হয়, সেখানে বিজ্ঞানের নাম ধরে এসেছে বলে কিছুসংখ্যক মানুষ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। 'পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের এবং দুর্জ্ঞেয় মানবপ্রকৃতির রহস্য সমাধানে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান যেখানে অর্ধপথে থেমে গেছে, সেখানে এগিয়ে এসেছে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান—তা ব্যাখ্যা করেছে, দৃষ্টান্ত দিয়েছে, শিখিয়েছে—কি করে ঊর্ধ্বতর অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার ব্যাপারটিকে বাস্তব নিয়মাধীন করা যায়।'

ত্রিবেন্দ্রামে এই পর্বে স্বামীজী নয় দিন কাটিয়েছিলেন! 'নয় দিনের বিস্ময়!' কী অসাধারণ তাঁর কণ্ঠস্বর, 'মোহন সঙ্গীতের মতো শ্রোতার হৃদয়কে একেবারে গলিয়ে দেয়।' কী বর্ণনাক্ষমতা! লীলাশুকের কাহিনী একদিন বলছিলেন, মনে হয়েছিল, 'কুম্ভকোনমের অলৌকিক সঙ্গীতজ্ঞ শরভ শাস্ত্রীয়ারের অমর বীণাধ্বনি।' তিনি যখন উপস্থিত ছিলেন, 'ক্রীতদাস করে রেখেছিলেন প্রতিটি হৃদয়কে।' আর তিনি যখন চলে গেলেন, মনে হল—'ঘরের আলো যেন নিভে গেল।'

॥ ১১ ॥

১৮৯৩ সালের প্রথম দিকে একদিন স্বামীজী দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে মাদ্রাজ শহরে এসে দাঁড়ালেন। মাদ্রাজ তাঁকে চিনে নিল উত্থিত ভারতের প্রতিভূরূপে। তারপর মাদ্রাজীরা কি করলেন, সে-ইতিহাস আমরা নানাভাবে জেনেছি। স্বামীজীর জীবনীতে তাঁর মাদ্রাজবাসের কাহিনী নানাসূত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। আমরা এখানে আরও কিছু যোগ করব। এমন কিছু স্মৃতি-কথা উপস্থিত করব, যা ব্যবহৃত হয়নি, বা খণ্ডাংশে মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব স্মৃতিকথা এবং অন্যান্য তথ্য আমাদের প্রতিপাদ্যকে প্রমাণিত করতে সাহায্য কববে—তিনি সত্যই অপরিচিত সন্ন্যাসী নন।

অন্য ব্যক্তিদের কথা ছেড়ে দিলেও তৎকালীন মাদ্রাজের দুই প্রধান ব্যক্তি স্বামীজীকে বিশেষরকম জেনেছিলেন এবং তাঁর আমেরিকাযাত্রায় সাগ্রহ সমর্থন জানিয়েছিলেন—তাঁদের একজন এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার, অন্যজন দেওয়ানবাহাদুর রঘুনাথ রাও।

স্বামীজীর আমেরিকাগমনের পিছনে এস সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সাহায্য ছিল—একথা

স্বামীজীই স্বয়ং বলেছেন। এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার (১৮৪২—১৯২৪) দীর্ঘজীবী পুরুষ; বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে কয়েক দশক মাদ্রাজের 'গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান' রূপে খ্যাত; মাদ্রাজ-হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন; রাজভক্ত মডারেট মানুষ-হিসাবে 'স্যার' উপাধিসহ বহু রাজসম্মান পেয়েছেন; কিন্তু জীবনের শেষভাগে হোমরুল-আন্দোলনে যোগ দিয়ে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর চেহারা চিনতে পেরে, নাইটহুড ত্যাগও করেছিলেন (১৯১৮)—ইনি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দেও মাদ্রাজে গণ্য ব্যক্তি। তারই মধ্যে তিনি মাদুরার সফল আইনব্যবসা ত্যাগ করে মাদ্রাজে চলে এসেছেন (মাদুরায় তিনি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান পর্যন্ত হয়েছিলেন; তখনকার দিনে সাহেব ছাড়া কেউ চেয়ারম্যান হতে পারতেন না); মাদ্রাজেও সাফল্য এসেছে অবিলম্বে; ফলে গভর্নমেণ্ট-প্লিডার (১৮৮৮); লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য (১৮৮৪)। কংগ্রেসের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৮৮৫ বোম্বাই কংগ্রেসে মাদ্রাজের অন্যতম প্রতিনিধি। মাদ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটর, অল্প সময়ের জন্য ভাইসচ্যান্সেলার; মাদ্রাজের প্রথম ভারতীয় তিনি ঐ পদে। ১৮৯৩ থেকে তাঁর দ্রুত উত্থান—১৮৯৫-তে হাইকোর্টের বিচারপতি, (১৮৯৯, ১৯০৩, ১৯০৬-এ অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি), ১৯০০-তে 'স্যার' উপাধিলাভ ইত্যাদি।

এই সময়ের মধ্যেই দেশের সাংস্কৃতিক জীবন ও ধর্মান্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন। ১৮৮৪-তে পত্নীর মৃত্যু (পুনর্বিবাহ করেন নি) তাঁকে ধর্ম ও দর্শনের দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে এবং কর্নেল অলকটের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে থিয়জফি-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। অ্যানী বেশান্তের একান্ত গুণমুগ্ধ ইনি—থিয়জফিক্যাল সোসাইটির দীর্ঘদিনের স্তম্ভ। এই ধর্মপ্রীতির জন্যই ইনি তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন—আবার তাঁর থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্নও হয়ে যান যখন স্বামীজী থিয়জফিক্যাল সোসাইটি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রকাশ্যে খুলে বলেন। সে ইতিহাস পরে আসবে। এখানে এইটুকু সংবাদই আমাদের প্রয়োজন—এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী।

স্যার আহ্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার যৌবনে স্বামীজীকে দেখেছিলেন—এই প্রথম মাদ্রাজে আগমনকালেই—(মহীশূরের খ্যাতিজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমাজনেতা শ্রীযুক্ত গুণডাপ্পা ১৯৭১ সালে বাঙ্গালোরে আমাদের বলেছিলেন, স্যার আহ্লাদীর মতো বুদ্ধিজীবীও, যিনি ভাবাবেগের ধার ধারতেন না, অল্প কথায় মন্তব্যের জন্য সুপরিচিত ছিলেন, তাঁর চোখও আর্দ্র হয়ে উঠত বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে)—স্মৃতিচারণাকালে স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ারের ভূমিকার কথা জানিয়েছেন ঃ

"স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাবার আগে যখন মাদ্রাজে আসেন, তিনি অপরিচিত সন্ন্যাসী—অল্পসময় এখানে থেকে তরুণদের সঙ্গে এমন উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেন যে, তারা শহরের সব জায়গা থেকে তাঁর কাছে জুটেছিল। বিরাট মৌলিকতার অধিকারী বলে তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করে নেন স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও অন্যান্যরা, এবং সেইজন্য তাঁকে চিকাগো-ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।" [অ] [মাদ্রাজ মেল; ১৯০২ ২৬ জুলাই]

মাদ্রাজের আর এক বিখ্যাত ব্যক্তি মাননীয় পি আনন্দ চার্লু বিবেকানন্দের একান্ত অনুরক্ত। স্বামীজীকে কয়েকবারই তিনি দেখেছেন এবং সেসব অভিজ্ঞতার কথা বলেছেনও। ১৮৯৩ সালে তিনি নিতান্ত তরুণ, যখন প্রথম স্বামীজীকে দেখেন। তাঁর সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতার কথা এই ঃ

"প্রথম যখন তিনি মাদ্রাজে আসেন তখনই তাঁকে দেখি। তিনি আমাকে জানতেন না। আমি এতই ক্ষুদ্র যে, আমাকে জানা সম্ভব ছিল না। এক সন্ধ্যায় তাঁর সম্মানে একটি পার্টির

আয়োজন হল। মাদ্রাজের চিন্তাজগতের সকল জ্যোতিষ্কই হাজির সেখানে—তাঁদের ঠিক উল্টোপ্রান্তের অধিবাসী আমি—আমিও হাজির। তাঁদের অনেকেই স্বামীজীর বুদ্ধির বিদ্যুৎঝলক দর্শন করেছেন। এক কোণে পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র চক্রান্তের আয়োজন হয়ে গেল—স্বামীজী যা বলেছেন, তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে হবে। স্বামীজী প্রবল সাহসে, প্রায় চ্যালেঞ্জের স্বরে, নিজেকে অদ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করলেন। ঘোঁটের মধ্য থেকে প্রশ্ন হল : 'আপনি বলছেন, আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক। তাহলে তো আপনার দায়িত্ব বলে কিছু রইল না। যখন আপনি কোনো পাপ করবেন, কি ন্যায়পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন, তখন আপনাকে বাধা দেবার উপায় তো রইল না?' তৎক্ষণাৎ সে দিকে ফিরে স্বামীজী বিধ্বংসী উত্তরটি দিলেন, 'যদি সত্যই বিশ্বাস করি, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তাহলে পাপের পথে যাবো কি করে? এক্ষেত্রে বাধার প্রশ্নই ওঠে না।' সবাই চুপ। তখনি তাঁকে আমি চিনলুম।" [অ]

॥ ১২ ॥

ধর্মমহাসভাপূর্ব বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেসব কথা ও কাহিনী আমরা উপস্থিত করেছি, সেগুলি সবই ধর্মমহাসভার পরে রচিত। কেবল অমৃতলাল রায়ের অল্প মন্তব্য এর ব্যতিক্রম। এইবার আমরা সত্যই কিছু 'আবিষ্কার' উপস্থিত করব—বিবেকানন্দের পরিব্রাজক-জীবনে তাঁর বিষয়ে মুদ্রিত সংবাদ। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে মাদ্রাজে গবেষণাকালে আমরা থিয়জফিস্ট পত্রিকার ১৮৯৩ মার্চ সংখ্যায় স্বামীজী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ বর্ণোজ্জ্বল বর্ণনা পাই, যেটি এখনো পর্যন্ত স্বামীজীর জীবনীতে ব্যবহৃত হয়নি, যদিও হরমোহনের একটি পুস্তিকায় তার উদ্ধৃতি আগে দেখেছিলাম। সংবাদটি এই :

> "প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি [কর্নেল অলকট] এবং মিঃ এজ্-এর অনুপস্থিতিতে নিয়মমাফিক কাজের যে একঘেয়েমি চলছিল, তা তৃপ্তিকরভাবে ভঙ্গ হয় বিভিন্ন কারণে আগত থিয়জফিস্টগণ ও বন্ধুগণের কয়েকটি সমাবেশে। সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দের মাদ্রাজে উপস্থিতি এবং থিয়জফিক্যাল সোসাইটির হেডকোয়ার্টারে কয়েকবার আগমন যথেষ্ট পরিমাণে স্থানীয় আকর্ষণের হেতু হয়েছিল। সন্ন্যাসীর বিরাট বহুমুখী প্রতিভা। তাঁর অর্জিত বহুবিধ গুণের কয়েকটি—পালি, সংস্কৃত, ইংরাজি, ফরাসি এবং হিব্রু ভাষায় পুরো জ্ঞান। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ-ও। এর সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা যোগ করে দিয়েছেন উন্নত সুঠাম অবয়ব এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি বহু ভ্রাম্যমান—তাঁর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে আছে লাসা এবং তিব্বতের অন্যান্য শহর। দার্শনিকভাবে তিনি শঙ্করপন্থী। কিন্তু তাঁর পুণ্য ধর্মসম্প্রদায়ের অন্য সকলের সঙ্গে তাঁর এই পার্থক্য প্রতীয়মান—নিকট ও দূর, সর্বত্র তিনি ভ্রমণ করে বেড়ান, লোকজনের সঙ্গে খোলাখুলি মেশেন, এবং ধর্ম-দর্শনের জনসভায় বা আলোচনাসভায় যোগ দেন। এই সন্ন্যাসীর শ্রোতাদের মধ্যে মাদ্রাজের সর্বশ্রেষ্ঠ মনস্বী ব্যক্তিরা আছেন। তিনি যে পাশ্চাত্ত্যদর্শন ও প্রাচ্যদর্শনের তর্কযুক্তিতে সমর্থ এবং আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তা দেখিয়ে দিয়েছেন।
>
> সচ্চিদানন্দ [আমাদের] হেডকোয়ার্টারে লোকালাইজেশন এবং ইমপ্রেশন-রিডিং-এর এক্সপেরিমেন্ট দেখে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন।...—ডবলিউ আর ওল্ড।" [অ]

স্বামীজী ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত চিত্তাকর্ষক সংবাদের মধ্যে কিছু তথ্যগত ভুল আছে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ নন, বি-এ, এবং তিনি তিব্বত

যাননি, গিয়েছিলেন তাঁর দুই গুরুভাই অখণ্ডানন্দ ও ত্রিগুণাতীতানন্দ। ফরাসি, পালি ও হিব্রু ভাষাতে ঐ সময়ে তাঁর 'পুরো জ্ঞান' ছিল কি না সন্দেহ—কাজ চলা গোছের জানতেন, এই পর্যন্ত। থিয়জফিক্যাল একস্‌পেরিমেণ্ট তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিল, একথাও সন্দেহজনক। এবং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত কর্নেল অলকটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি—যখন হবে, তার ফল মোটে ভাল হবে না। সে ইতিহাস পরে বিস্তারিত আমাদের দেখতে হবে, কিন্তু উক্ত সংবাদ থেকে এই প্রয়োজনীয় কথাটি পেয়ে যাচ্ছি—মাদ্রাজ শহরের শ্রেষ্ঠ মনস্বী ব্যক্তিরা তাঁর কথা শুনতে হাজির হয়েছেন।

॥ ১৩ ॥

এই পর্বে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'আবিষ্কার' স্বামীজীর একটি বক্তৃতার মুদ্রিত বিবরণ। সে গুরুত্ব কোথায় তা বোঝাবার জন্য কিছু ভূমিকা করা প্রয়োজন।

স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর (দশ খণ্ডে 'বাণী ও রচনা') মধ্যে তাঁর বক্তৃতাদির যেসব রিপোর্ট আছে, মেরী লুই বার্কের আবিষ্কারসুদ্ধ—সে সকলই ১৮৯৩, ৩১ মে'র পরবর্তীকালের। সাধারণ সভামঞ্চে তাঁর আবির্ভাব ঐ বৎসর ১১ সেপ্টেম্বরে, ধর্মমহাসভায়। শ্রীমতী বার্ক দেখিয়েছেন, তার আগেই তিনি আমেরিকার নানা ঘরোয়া সভায় বক্তৃতা করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, এবং স্থানীয় সংবাদপত্রে সেগুলি গুরুত্বের সঙ্গে ছাপাও হয়েছিল। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে ঐ কালের আগেকার দুটি বক্তৃতার উল্লেখ অন্ততঃ পাই—একটি তাঁর বিদ্যালয়-জীবনের, যখন কোনো শিক্ষকের বিদায়-সংবর্ধনা সভায় বালক নরেন্দ্রনাথ আধঘণ্টা ধরে এমন চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন যে, উক্ত সভার সভাপতি, ভারতের বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রভূত প্রশংসা করেন। স্কুল-বালকের বক্তৃতা সংবাদপত্রের মনোযোগের বস্তু হবে না, ধরেই নেওয়া যায়, কিন্তু ১৮৯৩, ১৩ ফেব্রুয়ারি হায়দারাবাদের মেহবুব কলেজ-প্রাঙ্গণে 'সহস্রাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে' স্বামীজী-প্রদত্ত বক্তৃতা (বিষয় ঃ 'আমার পাশ্চাত্ত্যগমনের উদ্দেশ্য') সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু না হওয়াই আশ্চর্য। ঐ বক্তৃতার বিবরণ কাগজে বেরোয়নি, এমন কথা বলছি না, কিন্তু যদি বেরিয়ে থাকে, তার সন্ধান পাইনি। ইংরাজি জীবনীতে আছে ঃ 'ইংরাজি ভাষায় স্বামীজীর দখল, তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রকাশসামর্থ্য এবং বাগ্মিতা এই বক্তৃতায় যেভাবে দেখা গিয়েছিল, তা সকলের কাছে অত্যাশ্চর্য উন্মোচনের মতো প্রতীয়মান হয়।'

এর আগে পুনায় ঘরোয়া সভায় স্বামীজী কি ধরনের পাণ্ডিত্য ও বাচনক্ষমতা দেখিয়েছিলেন, তার বিবরণ বালগঙ্গাধর তিলকের স্মৃতিকথা থেকে দেখে এসেছি। বিজাপুরকর কোলাপুরের রাজারামীয় পরিষদে অনুরূপ বক্তৃতার কথা বলেছেন, সুন্দররাম আয়ার বলেছেন ত্রিবেন্দ্রাম ক্লাবে বক্তৃতার কথা।

স্বামীজী কিন্তু ১৮৯২-এর শেষের দিকের এইসব ঘরোয়া ভাষণকে 'পাবলিক স্পীচ' বলতে রাজি হননি। ত্রিবেন্দ্রামে অবস্থানকালে অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার যখন তাঁকে 'পাবলিক লেকচার' দিতে অনুরোধ করেন, তখন স্বামীজী বলেন, 'তিনি কখনো আগে জনসভায় বক্তৃতা করেন নি, সুতরাং সে কাজ করতে গেলে নিশ্চয় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠবেন।' অধ্যাপক তা শুনে জিজ্ঞাসা করেন, 'তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি কি করে ধর্মমহাসভার সম্মুখীন হবেন?' মহীশূরের মহারাজা যে স্বামীজীকে উক্ত মহাসভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেছেন, তা স্বামীজীর মুখেই অধ্যাপক শুনেছিলেন। অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন, 'ঈশ্বর যদি আমাকে তাঁর মুখপাত্র করতে ইচ্ছা

করেন,...তাহলে তার জন্য যে-গুণের ও শক্তির প্রয়োজন, তিনিই তা জুটিয়ে দেবেন।' স্বামীজীর উত্তর তখন অধ্যাপকের কাছে 'সুস্পষ্টভাবে কথা-এড়ানো' বলে মনে হয়েছিল। এমন মনে হবার কারণ, তিনি স্বীকার করেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানুষের কথার মধ্যে কোন্ সত্য অন্তর্নিহিত থাকে তা উপলব্ধি করবার মতো যথেষ্ট সত্যবোধ তখন আমার ছিল না।'

আমরা ধরে নিতে পারি, বিশ্বমঞ্চে ধর্ম-প্রবক্তারূপে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বরিক নির্দেশ এইকালে স্বামীজীর কাছে ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। ত্রিবেন্দ্রামের পরে তিনি মাদ্রাজ যান। তার আগে কন্যাকুমারিকা দর্শন করে এসেছেন। মাদ্রাজেই তাঁর 'আত্মপ্রকাশ' —হায়দারাবাদের জনসভায় বক্তৃতা মাদ্রাজে আত্মপ্রকাশের পরেই।

মাদ্রাজেই যে, স্বামীজীর 'আত্মপ্রকাশ', তার অনেক প্রমাণের দুটি বিশেষ প্রমাণ—এক, থিয়জফিস্ট পত্রিকার বিবরণ, যা আগেই উপস্থিত করেছি। দুই, আরো অনেক বেশি মূল্যবান একটি প্রকাশিত সংবাদ, হাতে না পেলেও যার অস্তিত্বের বিষয়ে কিন্তু পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলাম। মাদ্রাজের 'ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মারে ১৯০২, ১৩ জুলাই-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল : 'দশ বছর আগে, দক্ষিণ ভারতে অজানিত অপরিচিত পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটিতে যে ক্ষুদ্র সমাবেশ হয়েছিল, আমরা তার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার ঘটনাবলী রিফর্মারের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে দেখা যাবে।'

সকলেই বুঝবেন, রিফর্মারের উক্ত মুদ্রিত বিবরণটির গুরুত্ব কতখানি। যদি তার মধ্যে স্বামীজীর বক্তব্য উদ্ধৃত থাকে, তাহলে সেটাই হবে সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তব্যের **একমাত্র** বিবরণ, কারণ এখনো পর্যন্ত পরিব্রাজক-জীবনে বা তার পূর্বে প্রদত্ত কোনো বক্তৃতার, বা তাঁর কথোপকথনের রিপোর্ট সংবাদপত্র থেকে আবিষ্কৃত হয়নি।

রিফর্মারের ঐ সময়ের ফাইল কিন্তু আমরা পাইনি—১৮৯৪-১৯০২ সময়ের ফাইলই আমরা সন্ধান করতে পেরেছি। অবস্থাটা খুবই দুঃখজনক থেকে যেত, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ১৮৭১ সালে মাদুরায় সন্ধানকালে অপ্রত্যাশিতভাবে উক্ত সংবাদকে বহুলাংশে 'মাদুরা মেল' কাগজের ২৮ জানুয়ারি সংখ্যায় সংকলিত দেখতে পেয়েছি। নিম্নে সেটি উদ্ধৃত করছি। এইটি অদ্যাবধি-প্রাপ্ত স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনের ভাষণের একমাত্র মুদ্রিত বিবরণ।—

হিন্দুধর্ম এবং সমাজতত্ত্ব বিষয়ে জনৈক বাঙালী সাধুর বক্তব্য

> একজন তরুণ বাঙালী সন্ন্যাসী, বত্রিশের মতো বয়স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ— ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটিতে তিনি গত সপ্তাহে প্রায় একশত শিক্ষিত ভারতীয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। উপস্থিতদের মধ্যে দেওয়ানবাহাদুর রঘুনাথ রাও ছিলেন। সাধু যা বলেছেন, তার সারাংশ ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার প্রকাশ করেছে। তার থেকে আমরা নিম্নের অংশ বেছে উপস্থিত করছি :

বৈদিক ধর্ম

> বৈদিক ধর্মই নিখুঁত ধর্ম। বেদের দুই অংশ—আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক। আবশ্যিকের দ্বারা আমরা চিরন্তনভাবে আবদ্ধ। তাদের নিয়েই হিন্দুধর্ম। ঐচ্ছিক বিষয়গুলি তা নয়। তারা পরিবর্তমান। আগেও তারা পরিবর্তিত হয়েছে কালপ্রয়োজনে, ঋষিদের

দ্বারা। ব্রাহ্মণেরা একদা গোমাংস খেতেন এবং শূদ্রনারী বিবাহ করতেন। অতিথিকে তুষ্ট করার জন্য গোবৎস মারা হত। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের পাচক ছিলেন। পুরুষ-ব্রাহ্মণ যদি কিছু রান্না করতেন, তা দূষিত বলে গণ্য হত। কিন্তু আমরা বর্তমান যুগের উপযোগী করে রীতিনীতি বদলে ফেলেছি। এতৎ সত্ত্বেও, আমরা মনুর কালের পরে নানা সময়ে যদিও জাতিবর্ণের রীতিনীতি বদলেছি, তথাপি স্বয়ং মনুও যদি এখন আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হন, আমাদের হিন্দুই বলবেন। জাতিপ্রথা সামাজিক ব্যাপার—ধর্মব্যাপার নয়। আমাদের সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তন থেকে ঐ প্রথার সৃষ্টি। একদা তার প্রয়োজন ছিল, তখন তা ছিল সুবিধাজনক। তার উদ্দেশ্যসিদ্ধি সে করেছে। ঐ প্রথা না থাকলে আমরা অনেক আগে মুসলমান হয়ে যেতাম। আজ কিন্তু ওটি প্রয়োজনহীন। এখন ওকে বর্জন করা যায়। হিন্দুধর্মের পক্ষে এখন আর জাতিপ্রথার দরকার নেই। একজন ব্রাহ্মণ যে-কারো সঙ্গে আহার করতে পারেন—এমন কি পারিয়ার সঙ্গেও। তার দ্বারা ব্রাহ্মণ তাঁর আধ্যাত্মিকতা খোয়াবেন না। পারিয়ার স্পর্শে যে-আধ্যাত্মিকতার ক্ষয় হয়, সে বড় মন্দমানের আধ্যাত্মিকতা। বস্তুতঃ তা শূন্যে অদৃশ্য। ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ যেন কূল ছাপিয়ে যায়, যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, যাতে করে কেবল একজন পারিয়া নয়, হাজার-হাজার পারিয়া, যেই তাঁকে স্পর্শ করেছে, অধ্যাত্মজীবনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। খাদ্যের ব্যাপারে প্রাচীন ঋষিরা বিধিনিষেধ রাখেন নি, পার্থক্য করতেন না। যে-ব্যক্তি মনে করে তার আধ্যাত্মিকতা এমনই ঠুনকো যে, নিম্নশ্রেণীর কোনো মানুষের দর্শনমাত্রে তার লয় হয়ে যাবে, সে ব্যক্তির পারিয়ার কাছে যাবার প্রয়োজন নেই, তিনি নিজের যক্ষের ধন আগলে বসে থাকুন!

হিন্দু জীবনাদর্শ

নিবৃত্তিই হিন্দুর জীবনাদর্শ। নিবৃত্তি মানে মন্দবৃত্তির—কাম ক্রোধ ঘৃণা প্রভৃতি তামস বৃত্তির—দমন ও বিজয়। নিবৃত্তি মানে নয় সকল বাসনার পরাভব। তার অর্থ, স্থূল বাসনাগুলির বিনাশ। প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই তার মনুষ্যভ্রাতার প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। তিনিই হলেন সন্ন্যাসী যিনি সকল স্বার্থপর কামনা দূর করেছেন এবং পরার্থে নিজ জীবন উৎসর্গ করার ব্রত নিয়েছেন। তিনি সকলের প্রতি প্রেমপরায়ণ। 'প্রবৃত্তি' মানে ভগবানের প্রতি এবং তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের প্রতি ভালবাসা। সন্ন্যাসীকে আহার্য দান করা উচিত। সন্ন্যাসীরা খ্রীস্টান বিশপ বা আর্চবিশপের মতো নন, যাঁদের কাজের জন্য প্রতি বছর হাজার-হাজার পাউন্ড মাহিনা দিতে হয়, যে-টাকা তাঁদের এবং তাঁদের স্ত্রী-পুত্রের বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয়। সন্ন্যাসী কেবল এক মুষ্টি খাদ্য চান; বিনিময়ে তিনি জনগণের সেবায় নিয়োগ করেন তাঁর সকল জ্ঞান ও কর্ম। সন্ন্যাসী ভ্রাম্যমান প্রচারক। ব্যক্তিকে এবং সমাজকে নিজস্বভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা পশু থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকে দেবতায় উন্নীত হয়। এমন-কি সর্বনিম্ন যে-হিন্দু, অর্থাৎ পারিয়া, তার মধ্যে অনুরূপ সামাজিক অবস্থায় পতিত কোনো ব্রিটনের চেয়ে পশুত্বের অংশ কম। প্রাচীন উৎকৃষ্ট এক ধর্মীয় সভ্যতার জন্যই এই-ফললাভ। নিয়ম এবং শিক্ষার মধ্য দিয়ে গেলেই কেবল এইপ্রকার উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিবর্তন ঘটতে পারে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যেসব প্রথা শিক্ষার প্রতিবন্ধক, সেগুলির মুণ্ড অবিলম্বে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এমনকি 'শ্রাদ্ধ'কেও বর্জন করা যায়, যদি তার অনুষ্ঠান করতে সময় নষ্ট হয়, যে-সময়কে আত্মশিক্ষার জন্য শ্রেয়তরভাবে কাজে লাগানো যেত। তাই বলে 'শ্রাদ্ধ' ত্যাগ করা ঠিক হবে না কারণ তার মন্ত্রের অর্থ সত্যই চিত্তোন্নতিকারক। আমাদের পিতামাতারা আমাদের জন্য কী যত্ন করেছেন, কোন্ দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করেছেন, মন্ত্রগুলিতে তা বর্ণিত আছে। এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অর্থ—আমাদের পিতৃপুরুষগণের সমষ্টি-সত্তার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন। ঐ পিতৃপুরুষদের গুণাবলীর উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি। তাই বলে শ্রাদ্ধের সঙ্গে কারো মুক্তির সম্পর্ক নেই। তা হলেও, নিজ ধর্মকে, দেশকে এবং মহান পূর্ব-পুরুষদের ভালবাসেন, এমন কোনো হিন্দু 'শ্রাদ্ধ' পরিত্যাগ করবেন না। [তবে শ্রাদ্ধে] বাহ্য আনুষ্ঠানিকতা, ব্রাহ্মণভোজনাদি আবশ্যক অংশ নয়। শ্রাদ্ধের সময়ে ভোজন করানো যায়, এমন ব্রাহ্মণ এখন নেই। যাঁদের ভোজন করানো হবে, তাঁরা যেন পেশাদার ভোজনকারী না হন—তাঁরা হবেন সেই ব্রাহ্মণ যাঁরা শিষ্যকে নিজ গৃহে বিনা অর্থে রেখে যথার্থ বেদশিক্ষা দেন। এখনকার দিনে মনে-মনেই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা যায়।

স্ত্রীশিক্ষা

নারীদের বিষয়ে আমাদের অত্যুৎসাহী অভিভাবকত্ব দেখিয়ে দেয়, আমরা হিন্দুরা, আমাদের জাতীয় গুণাবলী হারিয়ে ফেলেছি—নিজেদের নিয়ে গিয়েছি 'বর্বর অবস্থায়।' প্রত্যেক পুরুষ অবশ্যই যেন নিজ মনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাতে সে প্রত্যেক নারীকে নিজ ভগিনী ও মাতারূপে দেখতে পারে। নারীদের পড়াশোনার স্বাধীনতা দিতেই হবে, পুরুষের মতোই শিক্ষালাভের অধিকার। অজ্ঞতা এবং দাসত্বের মধ্যে ব্যক্তির বিকাশ কখনই সম্ভব নয়।

হিন্দুর মুক্তি

সহস্র বৎসরের দাসত্বের জন্য বর্তমানে হিন্দুরা অধঃপতিত। তারা আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। প্রত্যেক ইংরেজ বালককে নিজ গুরুত্ব অনুভব করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সে শেখে—পৃথিবীকে পদানত করেছে, এমন একটি বিরাট জাতির মানুষ সে। আর হিন্দু বাল্যকাল থেকে ঠিক উল্টোটাই শেখে—দাস হতেই তার জন্ম! আমরা কখনই মহান জাতিতে পরিণত হতে পারব না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের ধর্মকে ভালবাসতে, নিজ সমাজ ও দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করতে পারব। এখনকার হিন্দুরা অধিকাংশই ভণ্ড। তাদের অবশ্যই উত্থিত হতে হবে, খাঁটি বৈদিক ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ইউরোপীয়গণের রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যজ্ঞানকে। জাতিভেদের পাপ বাংলাদেশ অপেক্ষা দক্ষিণভারতে অধিক প্রকট। বাংলায় ব্রাহ্মণেরা শূদ্রস্পৃষ্ট জল পান করেন, কিন্তু এখানে [দক্ষিণ ভারতে] ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের বহুদূরে সরিয়ে রাখেন। কলিযুগে খাঁটি ব্রাহ্মণ বলতে কিছু নেই। পারিয়ারা আমাদেরই মতো মানুষ—তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে উচ্চতর শ্রেণীর মানুষদের। পারিয়াদের অবশ্যই হিন্দুধর্মের [মহান] সত্যসমূহ দিতে হবে, এবং

[তা দিতে হবে] ব্রাহ্মণদেরই। ব্রাহ্মণদের প্রথম কর্তব্য সকলকে ভালবাসা। [পার্থক্য ভুলে] প্রথমে সর্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে মিলতে হবে; তারপর [ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই] দ্বিজজাতিগুলিকে; তারপরে [উক্ত তিন] দ্বিজজাতি এবং শূদ্রদের। [অ]

সন্দেহ নেই, চমকপ্রদ কথাগুলি, হিন্দু-সন্ন্যাসীর মুখে, মাদ্রাজের মতো রক্ষণশীলতার পীঠস্থানে। বিবেকানন্দকে এখানে আমরা সমাজবিপ্লবীর চেহারায় দেখতে পাচ্ছি—এবং যদি কেউ স্বামীজীর চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে চান, তাহলে তাঁকে এই বক্তৃতার সাহায্য বিশেষভাবে নিতে হবে। প্রকাশিত বিবরণে দেখি, বক্তব্যে অনেক ফাঁক আছে, উপযুক্তভাবে স্বামীজীর কথাগুলি তোলা হয়নি। রিফর্মারে প্রকাশিত বিবরণের কতখানি বাদ দিয়েছিল মাদুরা মেল, তাও বলা সম্ভব নয়। তবু যেটুকু পাচ্ছি, তাই নিঃসন্দেহে দেখিয়ে দেয়, চিন্তাক্ষেত্রে বৈপ্লবিকতা অর্জন করার জন্য স্বামীজীর পাশ্চাত্তে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না (যা এখন কেউ-কেউ বলতে চান), এবং পরবর্তীকালে কথিত স্বামীজীর সামাজিক চিন্তার মূল কথাগুলি এখানে আছে।

বক্তৃতাটি আরও একটি জিনিস দেখিয়ে দেয়। স্বামীজীর মাদ্রাজ-পূর্ব পরিব্রাজকজীবন সম্বন্ধে যেসব স্মৃতিকথা পাই, তাদের মধ্যে তথ্যভ্রান্তি বিশেষ ঘটেনি। বিখ্যাত ব্যক্তির সম্বন্ধে পরবর্তীকালে লেখা স্মৃতিকথা সম্বন্ধে এমন সন্দেহ প্রায়ই করা হয় যে, উক্ত নামী ব্যক্তির উত্তরকালের গৌরব পূর্বকালে অযথা আরোপিত হয়েছে। স্বামীজীর ক্ষেত্রে তা যে ঘটেনি মুদ্রিত বক্তৃতাটি থেকে আমরা দেখতে পাই। তারই সাক্ষ্যে, মাদ্রাজ-পূর্ব কালে বেলগাঁওয়ে স্বামীজীর অবস্থানকালে জি এস ভাটে তাঁকে যেভাবে ইচ্ছামত প্রচলিত দেশাচার ভাঙতে দেখেছেন (মুসলমানদের সঙ্গে একত্র আহারের স্বীকৃতিসুদ্ধ), হরিপদ মিত্র দেখেছেন—বাল্যবিবাহের প্রচণ্ড বিরোধীরূপে, ত্রিবেন্দ্রামে অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার দেখেছেন—সমুদ্রযাত্রার পক্ষসমর্থনে, প্রাচীন ব্রাহ্মণদের মাংসাহারের দৃষ্টান্ত প্রদানে, ব্রাহ্মণরাও মিশ্রজাতি এই 'আপত্তিকর' বক্তব্য উপস্থাপনে, দেশাচারকে কঠোর আক্রমণে এবং নারী ও শূদ্রকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারদানের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল, এই প্রচণ্ড ঘোষণায়—তখন সে সকলই সত্যরূপে স্বীকার্য প্রতীয়মান হয়।২২

স্বামীজীর এই বক্তৃতা যে প্রগতিশীল মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, তা নানাসূত্রে দেখতে পাই। যে ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটিতে স্বামীজী ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটি তৎকালীন মাদ্রাজের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান। এর

২২ অধ্যাপক কে সুন্দররাম আয়ারের স্মৃতিকথা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উপস্থিত করেছি :

"মাঝে-মাঝে তিনি প্রচলিত দেশচারের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তেন।"

"নারীদের মর্যাদা এবং বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে স্বামীজী কঠোরভাবে মতপ্রকাশ করেন। নারী, সেইসঙ্গে নিম্নজাতিকে, অতি অবশ্যই সংস্কৃতশিক্ষা নিতে হবে; প্রাচীন অধ্যাত্মসংস্কৃতিকে গ্রহণ করে তারা বাস্তবে রূপান্তরিত করবে ঋষিদের অধ্যাত্ম আদর্শকে। তারপর তারা নিজেদের মর্যাদা ও প্রয়োজন-সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের সমাধান করবে নিজেরাই, ধর্মের সত্যজ্ঞানের আলোকে।"

"স্বামীজী উত্তরে বললেন, ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা মাংসাহারে এমনকি গোমাংসাহারে অভ্যস্ত ছিলেন। যজ্ঞের সময়ে বা অতিথিকে মধুপর্কদানের কালে গাভী বা অন্য পশু মারতে বলা হত।"

"আমার কাছে অন্ততঃ স্বামীজী বলেছিলেন, হিন্দুদের অবশ্যই মাংসাহার করতে হবে যদি ভারতকে পৃথিবীতে এখন যে শক্তির ও প্রাধান্যবিস্তারের প্রতিযোগিতা চলেছে, তাতে অংশ নিতে হয়।"

"স্বামীজী আমার মতের প্রতিবাদ করে বললেন, পৃথিবীর অন্য জাতিগুলির মতোই ব্রাহ্মণেরাও মিশ্রজাতি, এবং নিজেদের বিশুদ্ধ রক্ত সম্বন্ধে তাদের ধারণা বহুলাংশে কল্পকাহিনী ছাড়া কিছু নয়।"

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'হিন্দু'-সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের কথা আগেই বলেছি। কর্তাদের মধ্যে ছিলেন বিলিগিরি আয়েঙ্গার, তৎকালীন মাদ্রাজের মুখ্য নাগরিকদের একজন, যাঁর 'ক্যাসল কার্নেনে' স্বামীজী ১৮৯৭ সালে দেশে ফিরে বাস করবেন।২৩ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও, যিনি তৎকালে কেবল মাদ্রাজে নন, সর্বভারতে আইনবিদ্ ও সংস্কার-আন্দোলনের অন্যতম নেতারূপে পরিচিত। 'ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড', 'হিন্দু ল অ্যান্ড কাস্টম', 'ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেম' ইত্যাদি বহুগ্রন্থের এই লেখক সমকালের অনেক প্রগতিশীল আন্দোলনের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। সহবাস সম্মতি বিলের (১৮৮৯-৯০) দৃঢ় সমর্থন তিনি করেন, তার পক্ষে আন্দোলনও করেন, যখন অনেক সমাজসংস্কারকও ইতস্তত করেছেন। বহু বৎসর ইনি 'হিন্দু ন্যাশন্যাল সোস্যাল কনফারেন্সে'র সম্পাদক ছিলেন।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কামাক্ষী নটরাজন, ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার পত্রিকার সম্পাদক, সংস্কার-আন্দোলনের পক্ষে দীর্ঘদিনের প্রধান শক্তিশালী লেখক। "ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার পত্রিকাটি ১৮৯০ সালে আরম্ভ করেন 'হিন্দু'র সম্পাদকীয় বিভাগের কয়েকজন তরুণ কর্মী, সমাজসংস্কারের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি 'হিন্দু'-কর্তৃপক্ষের ব্যবসায়স্বার্থকে আঘাত করছিল।" [অ]

ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটিতে এই বক্তৃতা দিয়েই যে স্বামীজী মাদ্রাজের বিদ্বৎ-মহলে আবির্ভূত হন, তা দেখা যায়, ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে এই সোসাইটির পক্ষে স্বামীজীকে প্রদত্ত মানপত্রে :

"ইউরোপ ও আমেরিকাগমনের আগে স্বামীজী এই সোসাইটির হলেই মাদ্রাজের জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আহূত হয়েছিলেন, যেখানে মাদ্রাজের শিক্ষিতজনেরা তাঁর যোগ্যতা ও মহিমা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ২৪ [অ] ('মাদ্রাজ টাইমস'; ১৮৯৭, ১১ ফেব্রুয়ারি)

মাদ্রাজের সমাজসংস্কারকদের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক কি দাঁড়িয়েছিল, তা আমরা পরে আলোচনা করব, কিন্তু তাঁদের আসল নেতা কামাক্ষী নটরাজন যে, এই সভার বিবেকানন্দকে কখনো ভুলতে পারেন নি, তা পরবর্তীকালে তিনি অনেকবার বলেছেন বা লিখেছেন। আমরা যে-দু'একটি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তুলে দিচ্ছি।

বোম্বাইয়ের হীরাবাগে ১৯১৪, ২৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব সভায় কে নটরাজনের বক্তৃতার অংশ :

"[কে নটরাজন] বলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মধারা সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর জানেন তাই নয়, স্বামীজীকে কিছু ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

২৩ মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় পাই, বিলিগিরি আয়েঙ্গার আলমবাজার মঠে এসেছিলেন এবং পাঁচ-ছয় দিন ছিলেন। তিনি 'স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন।' ('ঘটনাবলী'; তৃতীয়)

বিলিগিরি আয়েঙ্গার মহীশূরের লোক। মাদ্রাজে সলিসিটারের কাজ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু এই অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষটি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে যা সঞ্চয় করেন প্রায় সকলই শিক্ষার জন্য দান করেন। 'মহীশূর আয়েঙ্গারস্ চ্যারিটি ট্রাস্ট বোর্ডে' তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। 'মাদ্রাজ আরবিট্রেশন কোর্টস'-এর তিনি স্থাপয়িতা। তিনি কংগ্রেসের সমর্থকও ছিলেন। স্বয়ং রামানুজী হলেও ধর্মসম্বন্ধে এমন উদারতা ছিল যে, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর আনুকূল্য পেতেন। এঁর ক্যাসল কার্নেনেই বেশ কয়েক বৎসর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যালয় ছিল, সেখান থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কাজ চালাতেন। [সংবাদগুলি মাদ্রাজ টাইমস; ওভারল্যান্ড সংস্করণ; ১৮৯৬ ১৯ অগাস্ট সংখ্যা এবং ব্রহ্মবাদিনের ১৯০২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে নেওয়া।]

২৪ স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীতে এইকালে স্বামীজীর কয়েকবার উক্ত সোসাইটিতে যাওয়ার কথা আছে।

...মাদ্রাজে প্রথম যখন স্বামীজী হাজির হন, তখন প্রথম তাঁর সম্মুখীন যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁদের একজন হলেন দীপ্ত পাণ্ডিত্যসম্পন্ন বিচারপতি সুন্দর আয়ার। সেখানে আরও এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি কার্যতঃ তখন নাস্তিক, কিন্তু স্বামীজীর শিষ্য হয়ে দাঁড়ান—স্বামীজী তাঁর উপরে এমন প্রভাববিস্তার করেছিলেন।" [অ] [প্রবুদ্ধ ভারত; ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯১৪]

১৯২০ সালে বোম্বাইয়ে প্রদত্ত আর একটি বক্তৃতার অংশ ঃ

"তারপর তিনি [নটরাজন] বলেন, স্বামীজী দরিদ্র ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীরূপে যখন প্রথম মাদ্রাজে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে প্রথমেই মিলিত হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। একথা তিনি গর্বের সঙ্গে বলবেন, মাদ্রাজই বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করে।...তারপর তিনি সেই অপরিচিত ২৮ বৎসর বয়সের সন্ন্যাসী, দেওয়ানবাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় যে-প্রচণ্ড জোরালো আলোচনা করেছিলেন, তার উল্লেখ করেন। স্বামীজী সেখানে প্রাচ্য সংস্কৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। **এইখানেই স্থির হয়, স্বামীজীকে চিকাগো-কংগ্রেসে পাঠানো উচিত,** কারণ স্বামীজী মহান অধ্যাত্মনীতিকে আধুনিক সভ্যতার ভাষায় ব্যাখ্যা করার বিষয়ে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন।" [অ] [স্থূল-লিপি লেখক নির্দেশে] [প্রবুদ্ধ ভারত, ১৯২০, মে]

পুনশ্চ ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মারে ১৯৪৬, ২ ফেব্রুয়ারিতে ঃ

"মনে হয়, পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে স্বামীজীকে দেখেছেন, এমন যে সামান্য কয়েকজন বেঁচে আছেন, আমি তাঁদের অন্যতম।...তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের নিশ্চয় অল্পদিন পরে [না, প্রায় সাত বৎসর পরে] আমার পুরাতন অধ্যাপক সুন্দররাম তাঁকে ত্রিবেন্দ্রামের পথে ক্লান্তপদে হাঁটতে দেখেছিলেন। কাষায় বস্ত্র ভারতের সর্বত্র শ্রদ্ধা জাগায়, আতিথ্যদানের আগ্রহ জাগায়। বালক-সন্ন্যাসীর চালচলন ও চেহারা দেখে অধ্যাপক চমকিত। সন্ন্যাসী ইংরাজি বলছেন অনর্গল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য ও দর্শনে গভীর ব্যুৎপন্ন। অধ্যাপক তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর মাদ্রাজ-বন্ধুদের কাছে। এক সকালে ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটিতে তাঁকে দেখলাম। দর্শনশাস্ত্রে আগ্রহী বন্ধুদের সেখানে সমাবেশ হয়েছে। দেওয়ানবাহাদুর রঘুনাথ রাও সভাপতি। তিনি তখনকার দিনে সমাজসংস্কারের পক্ষে অক্লান্ত প্রচারক, বিশেষতঃ বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে। তরুণ বিবেকানন্দ তখন পাশ্চাত্ত্যগন্ধী সকল কিছুর বিরুদ্ধে উদ্যত সংগ্রামী। [মোটেই সত্য নয়; বক্তৃতার মুদ্রিত বিবরণ দেখলেই বোঝা যাবে।]...ভারতীয় সমস্যাকে স্বামীজী দুটি শব্দে ধরে দিয়েছেন—'নারী ও জনগণ।' ভারতের পতনের একেবারে মূল কারণ—নারী ও জনসাধারণের মঙ্গলে অবহেলা। এবং উভয় সমস্যা সমাধানের চাবিকাটি—শিক্ষা। বৈদিক সাহিত্যে শিক্ষা এবং বৃত্তির ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষে পার্থক্য করা হয়নি।...চিত্তাকর্ষক কথা হল, স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন, নারীরা আত্মরক্ষার কৌশল শিখুক। তিনি ঝাঁসীর রাণীকে ভারতীয় নারীর অনুসরণীয় আদর্শ মনে করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, হিন্দুশাস্ত্রে নারীর সন্ন্যাসে অধিকার নিষিদ্ধ নয়। ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা সমগ্র ভারতে জ্ঞানালোক বিস্তারের বিরাট পরিকল্পনা তাঁর ছিল।" [অ] [প্রবুদ্ধ ভারত; ১৯৪৬, এপ্রিল]

॥ ১৪ ॥

স্বামীজীর মাদ্রাজ-অবস্থানকালের বিষয়ে দু'একটি স্মৃতিকথা উপস্থিত করে প্রসঙ্গে শেষ করব। তার আগে বলে নিতে চাই, এইবার হয়ত আমরা বলবার মতো অবস্থায় এসেছি—ধর্মমহাসভায় যোগ দেবার আগে বিবেকানন্দকে ভারতবর্ষে যতখানি 'অপরিচিত' বলা হয়, তিনি সত্যই তা ছিলেন না। বিচিত্র কথা এই, প্রায় সকল স্মৃতিকথকই বলেছেন,

স্বামীজীকে এই পর্বে যখন তিনি দেখেছেন তখন তিনি বিখ্যাত হননি। আবার তাঁরা বলেছেন, স্বামীজী তাঁদের অঞ্চলে অবস্থানকালে ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও দীপ্ত বাণীর দ্বারা চাঞ্চল্যসৃষ্টি করেছিলেন। নিশ্চয় স্বামীজীর চাঞ্চল্যসৃষ্টির ক্ষমতা ঐ একটি জায়গায় ব্যবহৃত হবার অপেক্ষায় বসে ছিল না। সুতরাং আগেও তা তিনি করেছেন, করবেন পরেও। আমরা নানা জায়গার মানুষের স্মৃতিখণ্ডগুলিকে যদি একত্র করি দেখতে পাবো, ভারতের এক বৃহৎ অংশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেছেন, কিন্তু যেহেতু সেই পরিচয়খণ্ডগুলিকে চেষ্টাসূত্রের দ্বারা গেঁথে নিজের গলায় পরবার মতো স্বখ্যাতিমালাকর হতে রাজি হননি, তাই মনে হয়, তিনি অপরিচিত!

১৮৯৩ সালে মাদ্রাজে বিবেকানন্দ-বিষয়ে প্রথমে জি জি নরসিমাচার্যের কথা শোনা যাক:

"স্বামীজীর দৈহিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ও আমেরিকান পত্র-পত্রিকায় অনেক-কিছু লেখা হয়েছে। সে-বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু একটা জিনিস যোগ করে দিতে পারি। তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকালে প্রথম যে-জিনিসটি আকর্ষণ করে তা হল তাঁর চোখ-দুটি, বিশাল এবং চমকপ্রদ; যখনই কোনো বিষয়ে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন তারা যেন ঘুরতে থাকে আর অপূর্ব বিচিত্র জ্যোতিবিচ্ছুরণ করে। তিনি নিজের বিষয়ে কিছু বলতে অনিচ্ছুক। তাঁর পূর্বজীবন সম্বন্ধে আমি যেসব কথা বলতে যাচ্ছি, তা সংগৃহীত হয়েছে বাল্যাবধি তাঁর সঙ্গে পরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে। [অতঃপর স্বামীজীর প্রথম জীবনের বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া হয়, যেগুলি মোটামুটি পরিচিত। অজানিত একটি হল—পথ দিয়ে যদি স্যালভেশন আর্মি কীর্তন করতে-করতে যেত, নরেন্দ্রনাথ সেই ঈশ্বরের নামগানে তৎক্ষণাৎ যোগ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে পরিব্রাজক জীবনে তিনি বহুবার হিমালয়ভ্রমণ করেছেন। মনের শান্তি তিনি হিমালয়ে খুঁজে পান।] সারাভারত তিনি ধাতুমুদ্রা স্পর্শ না করে ঘুরে বেড়াবেন, এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এমনই এক ভ্রমণের সময়ে আমরা অনেকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের পরম সৌভাগ্য, ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই সময়ে যখন মাদ্রাজের অনেক যুবক তৎকালীন প্রচলিত চিন্তায় পাক খাচ্ছে, নিজেদের সত্তা সম্বন্ধে কোনো চেতনা নেই, জানে না জীবনোদ্দেশ্য কি? অনেকের কাছেই তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। তাঁর বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ চরিত্রের সামান্য সংস্রবই তাদের জীবন-গ্রন্থের পৃষ্ঠাপরিবর্তন করে দিয়েছিল। তাঁর মধ্যে তারা দেখল, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা এবং সামাজিক প্রগতিশীলতার অপূর্ব সমন্বয়, পাশ্চাত্ত্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রাচ্য ধর্মপ্রজ্ঞার স্বচ্ছন্দ মিলন।...যে-কোনো বিষয়ে তাঁর আলোচনা চিত্তাকর্ষক—ধর্মপ্রসঙ্গে তো অতুলনীয়। শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ঈশ্বরচেতনা এবং প্রেম পূর্ণ ব্যক্ত। যে-কেউ তাঁর কাছে এসেছে, সে কখনো তাঁর হৃদয়ের যাদুপ্রভাব এড়াতে সমর্থ হয়নি। তাঁর সাহচর্যে যে-সুখলাভ হয়, তা নিছক বুদ্ধির পরিতৃপ্তি নয়, হৃদয়ানুভূতির ঊর্ধ্বতর আস্বাদনের জন্যই। তাঁর জ্ঞানের বিষয়ে মন্তব্য করার যোগ্যতা আমার নেই, কেবল এইটুকু বলতে পারি, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যখন আলোচনা করছিলেন তখন অনেক মানুষই মূর্তিবৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ধর্মের অপূর্ব সমন্বয়তত্ত্ব প্রচার করেছেন। তিনি শিখিয়েছেন, বিবর্তনের ধারাপথে বেদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে; তার মধ্যে আছে ধর্মসমূহের অগ্রগতির সামগ্রিক ইতিহাস; শেষে ধর্ম তার চূড়ান্তে পৌঁছেছে—ঐক্যে, অদ্বৈতে। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্মতত্ত্ব প্রচারিত হয়নি, যা বেদে নেই।...বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের জন্য তিনি বলতে পেরেছিলেন, খ্রীস্টধর্ম হিন্দুধর্মের প্রশাখা এবং বৌদ্ধধর্ম বিদ্রোহী সন্তান। বেদের অন্তর্গত আপাতবিরোধী বক্তব্য সকলই সত্য, কারণ তারা এক চরম সত্যের নানা

অংশের রূপ—একথা তিনি বলতেন। হিন্দুধর্ম যেহেতু বলে, মানুষ সত্য থেকে সত্যের দিকে অগ্রসর হয়, মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে নয়, তাই হিন্দুধর্ম ধর্মের ধর্ম—তিনি বলতেন।... তাঁর উত্তর আসত দ্রুত; সর্বদাই তার মধ্যে অব্যর্থতা এবং অভিনবত্ব থাকত, কারণ প্রায়শঃ সেগুলি উপমা-রূপকের ভাষায় দেওয়া হত। প্রশ্ন করা হয়েছিল—কৃষ্ণ নীলবর্ণ কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'প্রকৃতির ধর্ম এই, বিশাল মহান-কিছু সর্বদাই নীলবর্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অঞ্জলিতে সমুদ্রজল তুলে নাও, দেখবে বর্ণহীন, কিন্তু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখো—নীল নীল! সামনের দিকে তাকাও—শূন্যের কোনো বর্ণ নেই, কিন্তু অসীম আকাশ নীল।' প্রশ্ন করা হল, 'জীবনে এত দুঃখ কেন?' উত্তর হল, 'হাঁ, জীবন ও দুঃখ সমার্থক। নবজাত শিশু যে জীবিত, কি করে নির্ধারণ করো—তার কান্না শুনে নয় কি?' প্রশ্ন : 'ধর্মসংস্কারকেরা পরস্পর এত বিবাদ করেন কেন?' উত্তর : 'বলদের মতো তাদের চোখ বেঁধে ঘানিতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ উদ্দেশ্যে।'" [অ] [মিরার; ১৮৯৪; ৫ সেপ্টেম্বর]

মাদ্রাজের শিক্ষাজগতে 'রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস্ হোম'-এর অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি বেরিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠানটি দেখে ভারত ও পৃথিবীর বহু নামী ব্যক্তি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ গঠন করেন সি রামস্বামী আয়েঙ্গার। তাঁর সম্পর্কের ভাই সি রামানুজাচারিয়ার সারাজীবন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে গেছেন। 'রামু' ও 'রামানুজু' নামে পরিচিত এই দুই ভাই স্বামীজীকে দেখেছিলেন। এবং সেই প্রেরণায় একদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, স্বামীজীর কোন্ কাজ করব বলুন? রামকৃষ্ণানন্দ তাঁদের দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থা করতে বলেছিলেন—এবং তাঁরা তাই করেছিলেন সারা জীবন ধরে। এখানে সি রামানুজাচারিয়ারের বিবেকানন্দ-স্মৃতি উপস্থিত করছি :

"স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৯৩ ফেব্রুয়ারিতে, যখন তিনি পরিব্রাজকবেশে মাদ্রাজে আসেন। তখন তিনি মাদ্রাজের অ্যাকাউনটাণ্ট জেনারেল জনৈক মিঃ ভট্টাচার্যের বাংলোয় অতিথি। বাংলোটির নাম 'রমত বাগ', সান থোমের বিচ্ রোডে। আমরা তখন ছাত্র; শুনেছিলাম, উত্তর ভারত থেকে সচ্চিদানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, অদ্ভুত বুদ্ধিমান, যাঁর চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব। আমরা শুনেছিলাম, মাদ্রাজের অনেক তরুণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন এম সি আলাসিঙ্গা পেরুমল (পচ্চাইপ্পা কলেজের), জি ভেঙ্কটরঙ্গরাও, ডি আর বালাজী রাও (পরে ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের), জি জি নরসিমাচারি ইত্যাদি। সেইসঙ্গে ট্রিপ্লিকেন লিটারারি সোসাইটি নামক একটি তাজা প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন তরুণও দেখা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এসে বক্তৃতা করাতে খুব উৎসাহী। মিঃ ভট্টাচার্যই নিশ্চয় তাদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমে স্বামীজী ট্রিপ্লিকেন লিটারারি সোসাইটির এক ক্ষুদ্র সম্মেলনে ভাষণ দেন। কিন্তু তাতেই দারুণ একজন বক্তারূপে তিনি এমন দাগ কাটেন যে, নবীন দল তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। প্রবীণেরাও অবিলম্বে বুঝে গেলেন—এই অসাধারণ ব্যক্তির অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে প্রকান্ড মনীষা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ঐকান্তিক দেশপ্রেমের অগ্নি, উজ্জ্বল সহাস্য বাক্‌বৈদগ্ধ্য এবং সর্বোপরি অপরাজেয় ত্যাগশক্তি। মাদ্রাজ শীঘ্রই জানতে পারল—তাদের উত্তোলিত করবার শক্তি নিয়ে এসেছেন একজন মানুষ—আর এ ওকে ডিঙিয়ে ছুটতে লাগল—তাঁর দর্শন পাবার জন্য। এক প্রভাতে, যখন তিনি পনর-বিশটি তরুণকে পিছনে নিয়ে, ময়লাপুরের লুজ চার্চ রোড ধরে পশ্চিম দিকে রাজকীয়ভাবে হেঁটে চলছিলেন দণ্ড হাতে, স্যার এস সুব্রহ্মণ্য আয়ারের বাড়ির দিকে—তাঁর সঙ্গে দেখা করে, আমেরিকার ধর্ম-

মহাসভায় প্রেরণের প্রস্তাব উপস্থাপন করতে—তখনি আমি তাঁকে প্রথম দেখেছিলুম, এবং সেবারকার মতো শেষ দেখা। রাস্তার শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করেছিলুম। কিন্তু পথিমধ্যে ক্রমে বিরাট জনতা সঙ্গে জুটে গেল, মূল দলের সঙ্গে যাদের (আমিও তার মধ্যে ছিলাম) স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ারের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সেবার স্বামীজীর আর-কিছু দেখার সুযোগ হল না। তবে শুনলাম, তিনি বিরাট সাধু, আমেরিকার ধর্মমহাসভায় যাচ্ছেন।

"এই সময়কার একটি ঘটনা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল—মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজের অধ্যাপক সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়রের সম্পূর্ণ রূপান্তর। তিনি শাস্ত্রে অবিশ্বাসী, অজ্ঞেয়বাদী, মুক্তচিন্তা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মাথায় টুপি পরে ঘুরতেন; পাশ্চাত্ত্য জীবন-যাত্রা অবলম্বন করেছিলেন; তার দ্বারা সামাজিক আলোড়নের কারণ হচ্ছিলেন। স্বামীজী যখন মিঃ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ছিলেন তখন ইনি স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজীর স্পর্শমাত্রে সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র একেবারে বদলে যান। তিনি চাকরি ছাড়েন, ঘরসংসার ছাড়েন—স্বামীজীর সংশ্রবে আসার মুহূর্ত থেকে আত্মসমর্পিত অধ্যাত্মসাধক হয়ে দাঁড়ান। ক্রমে তিনি মার্কামারা সাধু হয়ে যান, ডাঃ নানজুণ্ডা রাওয়ের ময়লাপুরের বাড়ির উল্টোদিকে একটি কুটীরে একলা থাকতেন, দুপুরে আর রাত্রে ডাক্তারের বাড়ি থেকে খাবার আসত, তাই খেতেন। ইনিই হলেন বিখ্যাত 'কিডি'। ঐ নামটি স্বামীজী দিয়েছিলেন। সমস্ত মাদ্রাজে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জনসাধারণ কিছুটা বুঝতে পেরেছিল—বিবেকানন্দ নামক বারুদখানা ব্যাপারটা কি!" [অ] [বেদান্তকেশরী; ১৯৫২ মে]

এবার 'জনৈক শিষ্য'-লিখিত একটি অনবদ্য স্মৃতিকথার অংশ উপস্থিত করছি। এটি ব্রহ্মবাদিনে ১৯০৬ নভেম্বর, ডিসেম্বর দুই সংখ্যায় বেরিয়েছিল। লেখাটির মধ্যে মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও রচনাসৌন্দর্যের সুন্দর সমন্বয় হয়েছিল। এখানে কেবল 'নেতা' বিবেকানন্দকে নয় 'পিতা' বিবেকানন্দকেও দেখা যাবে, মহাবীরের সঙ্গে করুণার অবতারকে, প্রতিভার শিখরকে, যা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মেঘপুঞ্জ নিয়ে বর্তমান। এই 'শিষ্য' ১৮৯৭ সালের বিবেকানন্দের কথাও বলেছেন। আমি এখানে কেবল ১৮৯৩ সাল সংক্রান্ত অংশই তুলছি ঃ

"[এইসব বিরাট আধ্যাত্মিক পুরুষগণের] একটি শব্দ, একটি স্পর্শ, একটি নেত্রপাত, ভাবনার ক্ষণিক সংক্রমণও হীনতম মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে পারে। তাঁদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব, যাঁরা এহেন কোনো মানুষের প্রভাবে আসতে পেরেছেন, তাঁর গগনস্পর্শী মনীষার কাছে নত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, সেই সান্নিধ্যের ফলে অপরিচিত উল্লাসে অধীর হতে পেরেছেন, নিমজ্জিত হতে পেরেছেন তরুণ আলোকোজ্জ্বল ভালবাসার সমুদ্রে। এমনই একজন বিরাট আধ্যাত্মিক পুরুষ হলেন আমাদের প্রিয় নেতা [স্বামী বিবেকানন্দ]। স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যরা যথার্থ কথাই বলেছেন—তিনি হলেন সেই আধ্যাত্মিক রত্নসম্পদ, যা পাঁচ হাজার বছর ভূমিতলে প্রোথিত ছিল, এখন আবার ভূমি ভেদ করে উঠেছে—মানবজাতির ঊর্ধ্বায়নের জন্য।

"স্মরণাতীত কালের বৈদিক ধর্মের মূর্ত বিগ্রহরূপে যিনি একালে, ভিন্নতর পরিবেশে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন—এই মহাজ্ঞানী ঋষি, নবযুগের প্রফেট, কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞান ও শিল্পের যে-কোনো শাখায় সংগ্রামী বীর—এ'র বিষয়ে আমি যে বলতে যাচ্ছি, তার মানে এই নয় যে, আমি এ'কে বুঝে ফেলেছি! তিনি কে, আর আমি কে? প্রবাহিত তরঙ্গের বুদ্‌বুদ্‌মাত্র আমি, প্রকাশ করতে চাইছি তাঁকে, যিনি সকলের কাছে মহারহস্য! তবু চাইছি, তার সহজ কারণ এই—তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার মহাসৌভাগ্য আমার হয়েছিল, যিনি প্রতিভায় সকলকে অতিক্রম করেও ছিলেন শিশুর মতো সরল, বালকের মতো ক্রীড়াশীল, বিচক্ষণ পিতার মতো শাসনকারী এবং কোমলপ্রাণা মাতার মতো স্নেহবর্ষী।

উচ্চ বা নীচ, সবাই তাঁর কাছে সমান; সকলের সঙ্গে তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, সকলের হৃদয়ানুভূতির মধ্যে প্রবেশ করতেন—তাদের মধ্যে মন্দতমকেও বিশুদ্ধ সুবর্ণে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত ছিলেন। পরম নিঃস্বার্থ তিনি, চরম স্বার্থপর হতে পারতেন যদি তাঁর নিজস্ব কোনো মানুষের প্রয়োজনের ব্যাপার হত। তাঁর যে-বিবরণই আমি দিই না কেন, তা আমার ত্রুটি ও দুর্বলতায় কলঙ্কিত হবে। তথাপি যে-পাত্রের পানীয় আমার তৃষ্ণানিবারণ করেছে, তাকে অপরের ওষ্ঠের সামনে তুলে ধরার কর্তব্য আমার আছে। সুতরাং আমি অপরের কাছ থেকে জেনে নিয়ে নয়, তাঁর কথোপকথন বা বক্তৃতার বিবরণ থেকেও নয়—আমি বলব আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, আমার এই মহান আচার্য ও পরম বন্ধুর বিষয়ে—যাঁকে কিছুকাল খুব নিকট থেকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল।

"তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ১৮৯৩-এর গোড়ার দিকে, যখন তিনি মাদ্রাজের তৎকালীন ডেপুটি অ্যাকাউনট্যাণ্ট জেনারেল বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে মাদ্রাজে এসে হাজির হয়েছিলেন। রামেশ্বরের পথে যাত্রী, ভিক্ষাজীবী এই সন্ন্যাসী, দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে হাঁটছিলেন—ভট্টাচার্য-মহাশয় তাঁকে সেই অবস্থায় পাকড়াও করেন। মহীশূরের এক সহৃদয় বন্ধুর কাছে আগেই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলুম—শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে একজন ইংরাজি-জানা চমকপ্রদ সন্ন্যাসী ঘুরছেন। সুতরাং সন্ন্যাসীর আগমনের দিনেই আমাদের অর্ধ ডজন বাছা-বাছা বন্ধু ভট্টাচার্য-বাবুর বাংলোয় হাজির। আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে বলা যাবে, তাঁরা সকলেই আধুনিক পাশ্চাত্যসংস্কৃতির কোনো না কোনো শাখার বিষয়ে মোটামুটি ভালরকম জ্ঞানসম্পন্ন; আর এই অধীনের সম্বল—নতুন ধরনের আধুনিক এক সন্ন্যাসীকে দেখার কৌতূহল!...ভট্টাচার্য-বাবুর দ্বারা অভ্যর্থিত হবার পরে আমরা গিয়ে পড়লাম সেই সন্ন্যাসীর সামনে, যাঁর উজ্জ্বল সহাস্য মুখ, অপূর্ব জ্যোতি-বিচ্ছুরিত সঞ্চরমান নয়ন। জিজ্ঞাসিত হয়ে বন্ধুরা আত্মপরিচয় দিলেন। অল্প-কিছু প্রাথমিক শিষ্টাচারের পরে, সাধুকে একেবারে গেঁথে ফেলা হল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন —সর্ববিষয়ের প্রশ্ন। দলের মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ আমি—চুপটি করে বসে এইসব কথাবার্তার ফলভক্ষণ করছিলাম। স্বামীজীর ভাবগর্ভ এবং সুস্বর উত্তরগুলি কেবলই ঝলসে-ঝলসে উঠে প্রশ্নকারীকে চুপ করিয়ে দিতে লাগল। স্বচ্ছন্দে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যেতে লাগলেন সর্বপ্রকার ক্লাসিক্যাল লেখকদের রচনা থেকে, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধে। ভ্রমণক্লান্ত সন্ন্যাসীকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে আমার বন্ধুরা যখন সন্ধ্যাশেষে বাড়ির পথ ধরলেন, তখন তাঁরা সন্ন্যাসীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার অনুমান করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। একজন বললেন, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের এম-এ; অন্য একজন বললেন, না, উনি প্রকাণ্ড দার্শনিক; তৃতীয়জন বললেন, উনি ঐতিহাসিক, কারণ ঐ বিষয়ে উনি কয়েকজন সুপরিচিত পণ্ডিতের কথা উদ্ধৃত করেছেন। এঁদের মধ্যে অত্যুচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন একজনকে যখন স্বামীজী-বিষয়ে প্রশ্ন করা হল, তিনি বললেন, 'ওঁর মনের বিশাল দিগন্তের আকার আমাকে বিমূঢ় ও অভিভূত করে ফেলেছে। ঋগ্‌বেদ থেকে রঘুবংশ, বেদান্তদর্শনের তাত্ত্বিক ঊর্ধ্বগত রূপ থেকে আধুনিককালের কাণ্ট ও হেগেল; প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত এবং নীতিশাস্ত্রের সমগ্র পরিধি; প্রাচীন যোগের সুমহান প্রকৃতি থেকে আধুনিক ল্যাবরেটরির জটিলতা—সবই যেন এঁর দৃষ্টির সামনে পরিষ্কার। এই ব্যাপারটিই আমাকে হতভম্ব করে ওঁর দাস করে ফেলেছে।' এঁদের মধ্যে আমার বলার কিছু ছিল না। আমি তাঁর দর্শনেই বশীভূত এবং আত্মবিক্রীত। তাঁর অসাধারণ মনীষা এবং বলবার ক্ষমতার রূপ স্তব্ধ বিস্ময়ে কেবল দেখে গেছি। সেইদিন থেকে শুরু করে আমেরিকার জন্য স্বামীজীর মাদ্রাজত্যাগ অবধি প্রত্যেকটি দিন, শহরের নবীন প্রবীণ সকলের কাছে মন্মথবাবুর বাড়িতে প্রাত্যহিক তীর্থযাত্রার দিন।

"স্বামীজীর লুক্কায়িত শক্তি প্রত্যেক দিনই উন্মোচিত হত নূতন আলোকে। আজ হয়ত 'ভক্তি' সম্বন্ধে তাঁর কথাবার্তা চোখে জল এনে দিল এমন-সব ব্যক্তির যাঁরা জীবনে কখনো ধর্মীয় আবেগ বোধ করেন নি; কাল হয়ত সংস্কৃত নাট্যকারদের উপরে তাঁর আলোচনা শিল্পের নতুন দিগন্ত খুলে দিল। সমান স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি শেক্সপীয়ার এবং বায়রন, কালিদাস এবং ভবভূতির বিষয়ে কথা বলতেন। এখনি হয়ত কৃষ্ণ এবং রামের মহিমার বিষয়ে বলছেন, তারপরেই খ্রীস্ট ও মহম্মদের বিরাটত্বের উপরে। এক সময়ে তিনি রাজস্থানের গল্প বলে, চাঁদ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে, আমাদের আনন্দিত করছেন, অন্য সময়ে শিহরিত করে তুলছেন গ্রীস ও রোমের, ফ্রান্স ও স্পেনের বীর ও বীরাঙ্গনাদের কাহিনী শুনিয়ে। ধার্মিক বা ধর্ম-সম্পর্ক-হীন, সকল প্রকার মানুষের কাছেই তিনি গভীর আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সান্নিধ্যে সবাই যেন ভুলে যেত, তিনি একজন বিরাট আধ্যাত্মিক পুরুষ। তিনি বড় প্রিয় মানুষ, একান্ত বিশ্বাসের, আমাদের খেলার সাথী, জীবনের একঘেয়ে প্রহরগুলির ক্লান্তি লীলাছলনায় ভুলিয়ে দিতে এসেছেন। তাঁকে স্পর্শ করা যায়, হাত ধরে টানা যায়, গান গাওয়ানো যায়—আত্মার গভীর যাতে কেঁপে ওঠে, তাঁকে নাচতে বলা যায় যাতে আমরা আমোদ পেতে পারি, কিংবা অন্য যে-কোনো সেবার কাজ তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়। যে-কেউ তাঁর কাছে গিয়েছে, সেই মানসিকভাবে বা নৈতিকভাবে ঐশ্বর্যবান হয়ে ফিরে এসেছে। তাঁকে দেখা মানেই চিরদিনের জন্য তাঁকে ভালবাসা ও মনে ধরে রাখা।

"তাঁর সংস্পর্শে যারা আসত তাদের প্রকাশিত করতেন বিচিত্র উপায়ে। পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের প্রায়ই এই উপদেশ তিনি দিতেন—কদাপি ভাববে না, অপরের নেতৃত্ব করছ, সর্বদা নিজেকে অপরের সেবক মনে করবে। সেইখানেই কর্মসাফল্যের রহস্য। তাঁর নিঃস্বার্থ সহৃদয়তা সর্বদাই অপরকে স্বতঃপ্রবৃত্ত সেবায় উদ্বুদ্ধ করত। তাঁর কাছে যারা হাজির হত, সবসময়ে তাদের যে তাঁকে বুঝবার মতো বুদ্ধিবৃত্তি থাকত তা নয়; সেজন্য তাঁকে প্রায়ই প্রশ্নকর্তার মানসিক স্তরে অবতরণ করে, অত্যুচ্চে অবস্থিত চিন্তারাজিকে তাদের উপযোগী ভাষায় উপস্থিত করতে হত। এক নজরে বুঝে নিতেন প্রশ্নকর্তার ক্ষমতা, তারপর তার বিশ্বাস জাগানোর মতো অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যেতেন। এমনই দ্রুত অন্তর্ভেদী তাঁর মন যে, তিনি অনেকগুলি প্রশ্ন অগ্রিম অনুমান করে নিতেন এবং এমন প্রস্তুত উত্তর দিতেন যে, প্রশ্নকর্তা চুপ করে যেত। কিভাবে শ্রোতাদের মনের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেন, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি সহাস্যে উত্তর দিতেন—'সন্ন্যাসীরা যেহেতু মানবমনের চিকিৎসক', তাই রোগের বিধান দেবার আগে তাঁদের নিদান জানতে হয়। অনেক সময়েই তাঁর উত্তরগুলি বজ্রবৎ আঘাত করে প্রশ্নকর্তার মনের সীমাবদ্ধতাকে চূর্ণ করে তাকে তুলে দিত বিশুদ্ধ চিন্তারাজ্যে। একদা তিনি গভীর ভাবাবেশে আছেন, যে-কোনো কথাকেই উত্তোলন করে অসীমের সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছেন; এই সময়ে তাঁর একজন শিষ্য কুণ্ঠিতভাবে অর্ধব্যক্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা স্বামীজী, এত উচ্চ বৈদান্তিক চিন্তার অধিকারী হয়েও হিন্দুরা কেন মূর্তিপূজক?' স্বামীজীর নয়নে বিদ্যুৎ ঝলসালো, প্রশ্নকর্তার দিকে ঘুরে তিনি বললেন, 'কারণ আমাদের হিমালয় আছে!' সম্ভবতঃ তিনি বলতে চেয়েছিলেন, প্রকৃতির এমন রূপৈশ্বর্যপূর্ণ সুমহান সৌন্দর্যের দ্বারা পরিবৃত আমরা, যা আমাদের সম্মোহিত করে রাখে, আলোড়িত করে আত্মাকে—এমন দেশের মানুষ লুটিয়ে প্রণাম না করে পারে না। মানুষ সর্বদাই প্রতিমা-পূজক, সুন্দর ও সুমহানের সে উপাসক, নিসর্গপ্রকৃতির বা মানবপ্রকৃতির, যারই হোক। অন্য এক ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন, 'যদি তুমি কলাশিল্পের সমাদর করতে না পারো, প্রকৃতির মহান সুন্দর সমন্বয়ের রূপকে উপভোগ করতে না পারো, তাহলে তুমি কি করে ঈশ্বরকে ভালবাসবে, যিনি সকল সৌন্দর্য ও ছন্দের চরম সমন্বয়?'

"যারা তাঁর করুণা পেয়েছে, তাদের প্রতি তাঁর ত ব্যবহার একেবারে ভিন্ন। কখনই

তাদের তিনি 'সংশোধন' করতে চাইতেন না। অপরপক্ষে চাইতেন, তারা নিজেরা ভেবে ঠিক করুক, কোনটা ঠিক। তিনি কেবল দু'একটি এমন ইঙ্গিত দিয়ে দিতেন যার দ্বারা তারা উচ্চতর দিক থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারে এবং তারপরে নিজস্ব-ভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত করতে পারে। কারণ, 'ভুল' ব্যাপারটা কোথাও নেই, মানুষের কেবল বুঝবার দোষ; সেটা ঠিক করে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ এক অসাধারণ শিক্ষক, একেবারে নিঃস্বার্থ, সর্বদিকে নিখুঁত, প্রত্যেক ধর্মমতের রহস্যের মধ্যে স্বতঃশক্তিতে প্রবিষ্ট। না, সেই শেষ কথা নয়, তাঁর নিকটবর্তী প্রতিটি মানুষের অন্তর্গহনরহস্যে তিনি সঞ্চরমান। সবকিছুর রহস্যের মধ্যে তাঁর এই প্রবেশ করার ক্ষমতা তাঁকে মহাসমন্বয়ের আদর্শ শিক্ষক করেছিল—সেই সমন্বয় কেবল ভিন্ন ধর্মমতের মধ্যেই নয়, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিন্ন রূপের ক্ষেত্রেও বটে।...

"সুকোমল ক্ষমাপূর্ণ অন্তর তাঁর, তথাপি তাঁর সঙ্গ যেন ভয়ংকর বিস্ফোরকের সান্নিধ্যের মতো—কোনো মন্দ চিন্তা তোমার মনে উঠেছে কি তৎক্ষণাৎ সেটি চমকে উঠেছে তাঁর মনেও —আর তা ধরা পড়বে তাঁর চোখ-মুখের বিচিত্র হাসি থেকে, কথাবার্তার মধ্যে যেন এমনিতে এসে গেছে এমন কোনো-কোনো শব্দ থেকে। এর থেকে অপূর্ব ব্যাপার হল—ক্ষেত্রবিশেষে তিনি একসঙ্গে বহু মানুষের চিন্তাকে অনুধাবন করতে পারতেন। একটি আঘাতেই অজস্র প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যেত। তখন সবাই চুপ। যে-কেউ তাঁকে একবারও দেখেছে, সেই আমার কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তিনি কিন্তু কারো উদ্দেশ্যে কর্কশ কথা বলতেন না। এমনকি অপরে যখন দোষ করেছে, তিনি নিজের ঘাড়ে সেটা টেনে নিতে চাইতেন। যখন একজন পণ্ডিত চড়া ভাষায় তাঁকে অপমান করেন তখন তিনি ক্ষমা চেয়ে বলেন, আমি মূর্খ। যে-কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাক, কিছু খেতে বলবেনই। তাঁর কাছাকাছি যদি কেউ হতাশ মুখ করে বসে থাকে, তার মনে স্ফূর্তি আনার জন্য তিনি সবকিছু করবেন, কারণ তিনি নৈরাশ্য বা ব্যর্থতাকে ঘৃণা করতেন। তাঁর প্রিয়পাত্র কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করেছে, এমন অভিযোগ করলে তিনি একটি রাজপুত-প্রবাদ উচ্চারণ করে উত্তর দিতেন—'হাতির দাঁত বেরুলে সে আর তাকে ঢুকিয়ে নিতে পারে না'; সেইরকম যার উপরে একবার ভালবাসা অর্পিত হয়েছে, যোগ্য হোক অযোগ্য হোক, ভালবাসা সেখান থেকে ফিরবে না। অ্যাডেয়ার সমুদ্রতীরের কাছে একবার যখন জেলেদের কয়েকটি নগ্ন শিশুকে তাদের মায়েদের পিছনে হাঁটু-কাদাজলে ঘুরতে দেখেছিলেন [তাদের মায়েরা কাজ করছিল], তখন তাঁর দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। কী যন্ত্রণায় ঐ অশ্রুপাত আমরা বুঝতেই পারতুম না যদি-না তাঁর গলা চিরে এই কাতরোক্তি বেরিয়ে আসত—'হা ভগবান! কেন তুমি এদের সৃষ্টি করলে! এ দৃশ্য যে আমি আর দেখতে পারছি না!' হিমালয়ে যখন পরিব্রাজক তিনি, ধ্যানাসনে উপবিষ্ট এক সাধুকে শীতে কাঁপতে দেখে নিজের সম্বল একটিমাত্র কম্বল তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারপর সাধুর আপত্তিতে কর্ণপাত না করে চলে গিয়েছিলেন, শীতে কাঁপতে-কাঁপতে। অপরের দুঃখ-জ্বালা—তাঁরই দুঃখ-জ্বালা—সে যন্ত্রণাকে নিজের উপর তুলে নিতে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। এই বিরাট মানুষটির মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের এই রূপ। না, 'বিরাট' কথাটি তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট নয়, কারণ মানবসমাজের শক্তিসীমার অনেক ঊর্ধ্বে তিনি অবস্থিত।

"তাঁর কোমল হৃদয়, সমুদ্রের মতো অসীম। তাঁর প্রস্তরকঠিন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি সুগভীর দেশপ্রেমে মূর্ত। অর্ধাহারী, ক্ষুধাক্লিষ্ট, ছিন্নবসন কোটি-কোটি মানুষের উদ্ধারের জন্য তাঁর কী বিপুল আকূতি!...ভারতের ঋষিদের প্রতি তাঁর এমনই শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁদের সমর্থনে মনপ্রাণ নিয়োগ করতেন।...একবার কথাবার্তার সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ-সংস্কারক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সময়ের বড় অভাব, এক্ষেত্রে সন্ধ্যাবন্দনাদি ত্যাগ করলে কোনো ক্ষতি আছে কি? স্বামীজী বলেন, 'অতীতের সেই বিরাট পুরুষেরা [অর্থাৎ ঋষিরা] লাফিয়ে-ডিঙিয়ে ছাড়া

হেঁটে পথ চলতেন না, তাঁদের মতো করে যদি এক মুহূর্ত চিন্তা করতে চেষ্টা করো তাহলে কুঁকড়ে কেঁচো হয়ে যাবে—তাঁরা সময় করতে পারতেন আর তুমি পারো না?' একই সভায় আর একজন প্রশ্নকর্তা বৈদিক ঋষিদের শিক্ষাকে অর্থহীন বলে, সে সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যপ্রকাশ করেন। স্বামীজী বলেন, 'প্রাচীন ঋষিদের প্রদত্ত শিক্ষার নিন্দা তুমি কোন্ অধিকারে করছ, যখন সেগুলি পরীক্ষা করোনি?' জোরের সঙ্গে বলেন, 'প্রাচীন ঋষিদের এই চ্যালেঞ্জ—প্রতিবাদ করতে চাও তো যাচাই করবার পরে তা করো।'...

"তাঁর ভালবাসায় আশ্রয় পেত ভাল-মন্দ সকলেই। মানুষের দুর্বলতার বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থেকেও তিনি তাকে যৎপরোনাস্তি সাহায্য করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। কারো অগোচরে তার গুণের কথাই তিনি বলতেন। 'দোষ কার নেই বলো?'—তিনি জিজ্ঞাসা করতেন। কারো মধ্যে একটা গুণ দেখলেও বুঝতে হবে, তা পূর্বজন্মের অনেক সুকৃতির ফল। ভালর থেকে মন্দের জন্যই তো বেশি ভালবাসার দরকার। যাদের দুর্বলতাকে পর্যন্ত অগোচরে সমর্থন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, সেই ব্যক্তিদের সামনে আবার তাদের দোষের বিষয়ে সরাসরি বলবার সাহস রাখতেন। একবার একজন মহারাজা স্বামীজীর স্পষ্টকথা তাঁর নিরাপত্তার পক্ষে কি রকম বিপজ্জনক হতে পারে, সে বিষয়ে তাঁকে একান্তে সতর্ক করে দেন। স্বামীজীর উত্তর : 'মহারাজের পুত্রও যদি আমাকে আগামীকাল জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি রকম মানুষ, আপনি কি মনে করেন আমি তাঁকে বলব না যে, মহারাজের হৃদয় যদিও মহৎ কিন্তু তিনি নির্বোধের মত সভাসদদের দ্বারা ভ্রান্তপথে চালিত হন? সন্ন্যাসী মরার ভয়ে সত্য বলবে না!!' অথচ এই মহারাজার বিষয়ে প্রায়ই তিনি কত না শ্রদ্ধা-প্রীতির সঙ্গে কথা বলতেন।...

"সত্য-সন্ধানে সর্বস্বত্যাগ করে ভারতের যেসব সন্ন্যাসী পথে বেরিয়েছেন—তাঁদের তিনি এই পৃথিবীতে দেহধারী ভগবান মনে করতেন। অশিক্ষিত অজ্ঞান সাধু-বৈরাগীদের ধর্মীয় আচার-আচরণকেও তিনি সানুরাগে সমর্থন করতেন। একবার মন্তব্য করেছিলেন—'ওঁরা হলেন ভারতীয় সমাজের সেফটি-ভালভ্। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ যে, তাঁকেও গরিব মানুষদের কাছ থেকে এক মুঠি অন্ন ভিক্ষা করবার সময়ে ধর্মের কথা বলতে হয়। কী উৎসাহের সঙ্গে না তিনি রাজপুতনার কম্বলী-স্বামীর কথা বলতেন, এই পৃথিবীতে যাঁর একমাত্র সম্পদ একটি ছেঁড়া কম্বল, আহার্য মুঠিখানেক ভাত, গোটা ছয়েক পরিবার দুপুরের খাওয়া শেষ করে একদিন-একদিন করে যা তাঁকে দেয়। বিনিময়ে কি করেছেন? রাজপুতনার প্রায় প্রতিটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ভবন, দূর দূর প্রান্তে অবস্থিত, বহুমূল্যে নির্মিত—এই নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী সেগুলি করেছেন; ইনিই নির্মাণ করিয়েছেন হিমালয়ে নদী গিরিখাতের উপরে লোহার সেতু।" [অ]

শেষ করছি মাদ্রাজের বিখ্যাত ডাক্তার এবং চিন্তাশীল লেখক ডাঃ নানজুণ্ডা রাওয়ের স্মৃতিকথা দিয়ে। স্বামীজীর প্রতি এঁর অপরিসীম ভক্তি। পি এ শ্রীনিবাসাচারী তাঁর স্মৃতিকথায় (বেদান্তকেশরী, ১৯৫৬, ফেব্রুয়ারি) বলেছেন, ডাঃ নানজুণ্ডা রাও স্বামীজীকে আমেরিকা পাঠাবার দলের এক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি বালক তখন। আমার পরম সৌভাগ্য ডাঃ নানজুণ্ডা রাওয়ের ময়লাপুরের বাড়িতে স্বামীজীকে প্রণাম করতে পেরেছিলাম। স্বামীজী আমাকে নিজে আশীর্বাদ করেছিলেন।'

ডাঃ নানজুণ্ডা রাও বেদান্তকেশরীর ১৯১৪-১৬-এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যায় স্বামীজীর স্মৃতি ও চিন্তার অনুধ্যান করেছিলেন। বেশি অংশ জুড়ে ছিল শিবাজী-বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য, যার ফাঁকে-ফাঁকে ডাঃ রাও ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত তথ্যাদি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

'বিবেকানন্দ ও তিলক' অধ্যায়ে আমরা শিবাজী প্রসঙ্গে আসব। এখানে ১৮৯৩-এর বিবেকানন্দ কথা। ডাঃ নানজুণ্ডা রাওয়ের স্মৃতিকথার শুরু এইভাবে :

"ধন্য সেই কতিপয় ব্যক্তি যাঁরা দুর্লভ ভাগ্যে অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্যও সুমহান স্বামীজীর পায়ের তলায় বসে আমাদের ধর্ম, ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা (যে-ব্যবস্থা পাশ্চাত্ত্যের থেকে পৃথক) ইত্যাদি সম্বন্ধে হৃদয় মন্থনকারী শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছেন। বস্তুতঃপক্ষে সেইসব শান্ত অথচ অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ সম্মিলনগুলি ভোলা সম্ভব নয়, যখন মাদ্রাজ-সমুদ্রতটে সান থোমের নিকটে একটি বাংলোয় (এখন নাম রমত বাগ) স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হত অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধু এবং কলেজের ছাত্ররা।... বাংলোর সামনে নীলজলের বিরাট বিস্তার, উপরে নীলতর আকাশ। ১৮৯৩, মার্চ কি এপ্রিলের কোনো এক সময়ে, মুক্ত আকাশতলে যখন সকলে সমবেত, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'স্বামীজী, কৃষ্ণকে নীলবর্ণ করা হয়েছে কেন?' স্বামীজী তখন স্থির-গভীর দৃষ্টিতে বিশাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সহসা ফিরে বললেন, 'কারণ, নীল হল অনন্তের বর্ণ।' [এর পরে এই প্রসঙ্গে স্বামীজী যা বলেন, তার সঙ্গে নরসিমাচার্যের পূর্বে উদ্ধৃত স্মৃতিকথার মোটামুটি মিল আছে।]...

"তারপর প্রসঙ্গ ঘুরে গেল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের আলোচনায়। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই স্পেনসারের দর্শনের বিষয়ে উচ্চ মন্তব্য করলেন। স্বামীজী স্পেনসারের প্রতি আরোপিত প্রশংসাকে উদারভাবে স্বীকার করে এমনকি যোগ করে দিলেন, 'স্পেনসারের "আননোয়েবল্" কী?— ও-তো আমাদের মায়া।' কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তীক্ষ্নভাবে প্রত্যুত্তরও দিলেন : এইসব পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা 'অজ্ঞেয়'-কে নিয়ে ভীত। অপরদিকে আমাদের দার্শনিকেরা অজ্ঞাতের মধ্যে বিরাট লাফ দিয়ে পড়েছেন, এবং তাকে জয় করেছেন। এই হল, দর্শন সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যের লম্বা বচনের সঙ্গে প্রাচ্যের উপলব্ধি-জীবনের পার্থক্য। তোমাদের পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা শকুনের মতো, আকাশে অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু সর্বসময়ে তাদের চক্ষু নিবদ্ধ থাকে নীচেকার পচা মড়ার দিকে। অজ্ঞেয়কে তারা অতিক্রম করতে পারে না, তাই তারা পিছিয়ে আসে এবং কদাপি সর্বশক্তিমান ডলারের উপাসনা ত্যাগ করতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যদেশে যথার্থ ত্যাগের ধর্ম নেই। একথা সত্য, অনেকে ত্যাগ করে, দারুণ আত্মত্যাগ, কিন্তু সে-কাজ করবার সময়ে সর্বদাই প্রশংসা ও পূজাপ্রাপ্তির দিকে মন পড়ে থাকে, যাতে করে অধিকতর মার্জিত, বৃহত্তর শক্তিলাভ করতে পারে। যথার্থ আত্ম-ত্যাগ যাকে বলে, একেবারে আত্মবিলয়, সে-বস্তু কেবল দেখা যাবে আমাদের কিছু শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিদের জীবনে। একথা ঠিক অনেকে পার্থিব বস্তু ত্যাগ করে, কিন্তু তা করে তথা-কথিত অতিপ্রাকৃত সূক্ষ্ম শক্তি, সিদ্ধাই ইত্যাদি পাবার জন্য।'

"'তাহলে হিন্দুধর্মের মূল কথা কি?' কলেজের এক অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'হিন্দুধর্মের মূল বস্তু হল, ঈশ্বরে বিশ্বাস, নিত্যসত্য-রূপে বেদে বিশ্বাস, এবং কর্ম ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস।'

"'হিন্দুধর্ম ও অপর ধর্মসমূহের মধ্যে এক পার্থক্য এই—হিন্দুধর্ম বলে, মানুষ সত্য থেকে সত্যে অগ্রসর হয়, নিম্নতর সত্য থেকে ঊর্ধ্বতর সত্যে—মিথ্যা থেকে সত্যে নয়। কেউ যদি খুঁটিয়ে বেদ পড়েন দেখবেন যে, সেখানে কেবল সমন্বয়ের ধর্মই আছে। বিবর্তন-তত্ত্বের আলোকেই বেদ পড়া উচিত। বেদের মধ্যে ধর্মীয় বিবর্তনের সমগ্র ইতিহাস রয়েছে—যার চরম পরিণতি অদ্বৈতবাদ। হিন্দুধর্মে নেই এমন কোনো নূতন ধর্মীয় ভাবনা সম্ভব নয়।'

"এই বিষয়টির দৃষ্টান্ত দিতে স্বামীজী পুনশ্চ বললেন, 'রসায়ন যেমন অগ্রসর হতে পারে না যখন সে একটি মূলদ্রব্যে পৌঁছে যায় যার থেকে অপর মূলদ্রব্যগুলি বিভক্ত করা সম্ভবপর, পদার্থবিদ্যা অগ্রসর হতে পারে না যখন মূল শক্তিতে সে পৌঁছে গেছে, অপর

সমস্তই যার বিকাশ ভিন্ন আর কিছু নয়, তেমনি অদ্বৈতে পেঁছবার পরে আর ধর্ম অগ্রসর হতে পারে না, এবং হিন্দুধর্ম সেই ধর্ম।'

"'আপনার ধর্ম কী?'—এই প্রশ্ন যখন তাঁকে করা হল তখন এই মহিমান্বিত উত্তর এসেছিল, 'আমার ধর্ম হল তাই খ্রীস্টানধর্ম যার প্রশাখা এবং বৌদ্ধধর্ম বিদ্রোহী সন্তান।' সেকথা বলার পরে স্বামীজী হিন্দু ও পৃথিবীর অপরাপর জাতির পার্থক্যের প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন : 'পৃথিবীতে প্রগতির দুই ধারা দেখতে পাওয়া যায়; এক, রাজনৈতিক, দুই, ধর্মীয়। প্রথম ক্ষেত্রে গ্রীকরাই সবকিছুই করে গেছে; আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠন ও ধারণাসমূহ গ্রীক চিন্তারই বিকাশ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সবকিছু করেছে হিন্দুরা। হিন্দুদের মধ্যে খুবই প্রাচীন যুগে ধর্মের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রগতি হয়েছিল। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অতি সূক্ষ্মকে উপলব্ধি করবার যে তীক্ষ্ম অনুভূতি তাদের মধ্যে জেগেছিল, তার জন্য তারা জীবনের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতর যে দ্বিতীয় দিকটি আছে তাকেই সর্বদা গ্রহণ করেছিল, ফলে হিন্দুদের এই অবস্থা। এখন সময় এসেছে—হিন্দুদের উচিত পাশ্চাত্ত্যজগৎ থেকে কিছু বর্বরতা শিখে নিয়ে বিনিময়ে তাদের কিছু মানবতার শিক্ষা দেওয়া।'

"'বর্তমান হিন্দুধর্ম কেবল ছুৎমার্গ। এবং এদেশে পাশ্চাত্ত্য সম্বন্ধে হয় উদাসীনতা, নয় নকল-প্রবণতা, সামাজিক ব্যাপারে কেবল নয়, ধর্মব্যাপারেও। পাশ্চাত্ত্যের লোক হিন্দু-ধর্মের ছিটেফোঁটা নিয়ে তাকে বিকৃত করে যেভাবে হাজির করেছে [অর্থাৎ থিয়জফি]—তাকে অনুসরণ করার ইচ্ছা দেখলেই শেষোক্ত ব্যাপারটি বোঝা যায়।'

"স্বামীজী আলোচনা শেষ করলেন এই সতর্কবাণী করে, 'যদি প্রয়োজন হয়, সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতি করো, বিধবাদের বিয়ে দাও, জাতিপ্রথার মাথায় বাড়ি মারো, কিন্তু ধর্মকে ত্যাগ করো না। সামাজিক ব্যাপারে প্রগতিশীল হও কিন্তু ধর্মব্যাপারে রক্ষণশীলতা রেখো।'" [অ]

ধর্মসমন্বয়ের বিষয়ে এবং পৃথিবীর মহান ধর্মাচার্যদের বিষয়ে স্বামীজী কী বলেছিলেন, ডাঃ রাও তাও কিছু উপস্থিত করেছেন। স্বামীজী যখন খ্রীস্টধর্মকে হিন্দুধর্মের প্রশাখা এবং বৌদ্ধধর্মকে বিদ্রোহী সন্তান বলেছিলেন, তখন এই ধর্মগুলির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে : "তিনটি বই আমি অত্যন্ত ভালবাসি এবং প্রায়ই তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরি—'গীতা', এডউইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' এবং টমাস আ কেম্পিসের 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট।' স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে আরও বলেছিলেন :

"'এই পৃথিবীতে তিন দেহধারী দেবতা—শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং খ্রীস্ট। এঁরা সকলেই খাঁটি কারণ প্রত্যেকেই একটি বিরাট ভাব প্রচার করতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম শ্রীকৃষ্ণ। অমর গীতায় ব্যক্ত তাঁর শিক্ষা মহত্তম, বৃহত্তম, সর্ব-ভাব অঙ্গীকারকারী। গীতার কেন্দ্রীয় ভাব হল, পার্থিব বিষয়ে নির্লিপ্তি। যদি এই পৃথিবীর কোনো-কিছুকে ভালবাসা যায়, পিতামাতা স্ত্রী-পুত্র, স্বামী-পুত্র, ধনসম্পদ, নাম-যশ—সে ভালবাসায় আসক্তি থাকলে কেবলই দুঃখ আসবে। তাই ঈশ্বরই হোন একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু, আর কিছু নয়, এবং সর্বকর্মফল অর্পিত হোক তাঁর উপরে। সর্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। ঈশ্বরের প্রতি এই সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কাজ করা উচিত। কাজ, কাজ, কাজ, দিবারাত্র কাজ করো—গীতা বলেছেন। কাজ ছেড়ে পালানো শান্তির পথ নয়।'...স্বামীজী আরও বললেন, 'কাজের চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামিও না। মনকে কেবল জিজ্ঞাসা করো, তুমি নিঃস্বার্থ কি না? তা যদি হও কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করো না, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে যে-কর্তব্য আছে তা যদি পালন করে যাও, তাহলেই তুমি গীতার সত্য উপলব্ধি করবে।'...স্বামীজী আরও বললেন, 'প্রত্যেক কাজই পবিত্র। পৃথিবীর কোনো কাজকে নীচ কাজ বলার অধিকার তোমার নেই। ঝাড়ুদারের কাজের

সঙ্গে সিংহাসনে বসে সম্রাটের রাজ্যচালানোর কাজের মধ্যে ভালো-মন্দ কোনো পার্থক্য নেই।' ”

সর্বপ্রকার কাজের পবিত্রতার কথা বলবার সময়ে স্বামীজী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের আচরণের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন, যা 'তাঁর মনের উপরে অনপনেয় ছাপ রেখে গেছে।' ঘটনাটি স্বামীজী এইভাবে বর্ণনা করেন ঃ

"একদিন ডাঃ সরকার ও তাঁর এক বন্ধু কলকাতার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে মলভর্তি টব মাথায় নিয়ে এক মেথর সামনের দিক থেকে এসে তাঁদের কাটিয়ে উল্টোদিকে চলে গেল। এমনই বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়াল যে, ডাঃ সরকারের বন্ধু নাকে কাপড় চাপা দিলেন কিন্তু ডাঃ সরকার কোনো প্রকার বিকার না দেখিয়ে পথ চলতে লাগলেন। বন্ধুটি অবাক হয়ে গেলেন, কারণ ডাঃ সরকারের খুঁত-খুঁতে শুচিবাই স্বভাবের কথা তিনি জানতেন যিনি, তাঁর স্ত্রী প্রতিটি গম বেছে পরীক্ষা করে ভাঙতে দিলে তবে রুটি খেতেন। বন্ধুটি তাই প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার, তোমার ঘ্রাণশক্তি কি নষ্ট হয়ে গেছে? ডাঃ সরকার উত্তর দিলেন, 'মশায়, আমরাই লোকটিকে ঐ অবস্থায় নিয়ে গেছি। সে যখন আমারি পরিত্যক্ত জিনিস মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমি নাকে চাপা দিয়ে সরে দাঁড়াবো?' ”

একই প্রসঙ্গ ধরে স্বামীজী কিভাবে জগতের মহান ধর্মাচার্যদের সাম্যাদর্শ বিবৃত করেছিলেন, তা ডাঃ রাও উপস্থিত করেছেন, সেইসঙ্গে যোগ করে দিতে ভোলেন নি, এ-যুগে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই সাম্যের মহান আচার্য, যাঁকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে এ-জাতীয় সকল আন্দোলন হয়েছে।

" 'স্বামীজী বলেছিলেন, ভগবান বুদ্ধের বাণীও একইপ্রকার, যদিও নিজ কালের উপযোগী করে ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত। তাঁর শিক্ষা ছিল, স্বার্থপরতা ত্যাগ করো; যা-কিছু তোমাকে স্বার্থপর করে তাকে ত্যাগ করো; প্রেমের চতুরাঙ্গিক পথে অগ্রসর হও।' স্বামীজী বললেন, 'যখনি তুমি স্বার্থের পথ ধরলে, অমনি তোমার মধ্যেকার খাঁটি লোকটি সরে গেল—তুমি দাস হয়ে পড়লে।' 'সময় বয়ে যাচ্ছে। এ পৃথিবী সান্ত এবং দুঃখময়। শিশু এই পৃথিবীতে প্রথম প্রবেশের কালে কোন্ উচ্চারণ করে স্মরণ করো—সে কাঁদে। হাঁ, শিশু প্রথমেই কাঁদে। তাই সত্য। এ পৃথিবী কাঁদিবারই জন্য। যখন এই মহাসত্য জানব, তখন আর স্বার্থপর হতে পারব না।'

"স্বামীজী বললেন, 'অপর একজন মহান বার্তাবহ হলেন নাজারেথের যীশু। তাঁর বাণীও একইপ্রকার ঃ দেখো, নিকটেই ঈশ্বরের রাজ্য; অনুতপ্ত হও; আমাকে অনুসরণ করো। যে নিজ পিতা-মাতাকে আমার অপেক্ষা ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়। যে নিজ পুত্র-কন্যাকে আমার অপেক্ষা ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়। এবং যে তাঁর ক্রুশকাষ্ঠ গ্রহণ করে আমার অনুগমন না করে, সে আমার যোগ্য নয়। খ্রীস্ট আরও বলেছিলেন, সিজারের পাওনা মিটিয়ে দাও সিজারকে, ঈশ্বরের পাওনা দাও ঈশ্বরকে। সাংসারিক নাগরিক দায়দায়িত্ব পালন করো, কিন্তু হৃদয় রেখো ঈশ্বরে।

"প্রশ্ন করা হল—'আর কি কোনো শিক্ষক নেই?' 'নিশ্চয় আছে', স্বামীজী বললেন, 'কেন, মহম্মদ—সাম্যের মহান আচার্য যিনি। নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ততঃ বাস্তবে এই সাম্যাদর্শ তিনি কার্যকরী করেছিলেন। নিজ জীবনের দৃষ্টান্তে মহম্মদ দেখিয়ে গেছেন, মুসলমানদের মধ্যে পুরো সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ থাকবে, জাতি সম্প্রদায় বর্ণ, কোনো কিছুর পার্থক্য থাকবে না। কোনো হিন্দুকে কিংবা আফ্রিকার নিগ্রোকে মুসলমানেরা কাফের বলে ঘৃণা করে, কিন্তু যে-মুহূর্তে সে মুসলমান হয়ে গেল, তখনি যতবড় সম্ভ্রান্ত মুসলমানই হোক তার থালা থেকে আহার্য তুলে সে খেতে পারে। আর আমরা, হিন্দুরা, কি করি?'—স্বামীজী আর্তনাদ করে বললেন, 'আমাদের ছোট সম্প্রদায়টির বাইরে যদি কেউ আমাদের

খাদ্য স্পর্শ করে, তখনি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমাদের দর্শনে মহান তত্ত্ব আছে, কিন্তু আমাদের দুর্বলতা হল তাকে বাস্তব জীবনে আমরা প্রয়োগ করি না। মহম্মদের মহিমা এইখানে, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে [নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে] তিনি পুরো সাম্য বলবৎ করেছিলেন। যদি কেউ তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে বর্ণপার্থক্যের জন্য তাকে ভাই বলতে তাঁর বাধা হয়নি।'

"প্রশ্ন করা হল, 'পৃথিবীতে কি আরো মহান আচার্য আসবেন না?' 'নিশ্চয় আসবেন', স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'আরও অনেক আচার্য ইতিমধ্যে হয়েছেন, আরও অনেক হবেন। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি বরং চাই, তোমাদের প্রত্যেকেই আচার্য হয়ে ওঠো, কারণ তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই সম্ভাবনা আছে। পূর্বের বিরাট আচার্যেরা সকলেই মহান ছিলেন। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন। তাঁরা আমাদের কাছে ঈশ্বর। আমরা তাঁদের নমস্কার করি। আমরা তাঁদের দাস। এইসকল আচার্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে। কিন্তু তাঁদের শিক্ষার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে নিজেদের উপলব্ধি—স্বয়ং তোমাকে প্রফেট হতে হবে। এ-কাজ অসম্ভব কিছু নয়, কারণ এইসকল মহান আচার্যরা যদি ঈশ্বরের পুত্র হন, আমরাও তো তাই। তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন, আর আমরা এখন সেইপথে চলেছি। যীশু-বাক্য স্মরণ করো—ঈশ্বরের রাজ্য নিকটেই! এসো এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেকে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করি ঃ আমরা প্রফেট হব; আমরা আলোকের দূত হব; আমরা ঈশ্বরতনয় হব; আমরা ঈশ্বর হব।"

এর পরেই ডাঃ নানজুণ্ডা রাও মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজের বিজ্ঞানের নাস্তিক অধ্যাপক সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়রের 'ঈশ্বর হবার' দারুণ সিদ্ধান্তের অমর ঘটনাটি অপূর্বভাবে বর্ণনা করেছিলেন, যে-ঘটনার উল্লেখ ইতিমধ্যে আমরা রামানুজাচারির স্মৃতিকথায় পেয়েছি। রামানুজাচারি ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন—কিন্তু ডাঃ রাও স্বচক্ষে তা দেখেছেন। সে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার আগে, এই ঘটনাপ্রসঙ্গে স্বামীজী কয়েকদিন পরে যা বলেছিলেন, তার সারসংক্ষেপ করব। স্বামীজী বলেছিলেন, কিডির (সিঙ্গারাভেলুর) ঐ রূপান্তর 'ঈশ্বর কৃপায়' হয়েছে। কিন্তু স্বামীজীর স্পর্শেই তো উক্ত ঈশ্বরকৃপা সঞ্চারিত হয়েছিল! স্বামীজী অস্বীকার করেন নি। বার বছর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করে কেউ যদি ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকে, তাহলে সে ঈশ্বরের করুণাপ্রবাহের যন্ত্র হতে পারে। 'ঈশ্বরের কৃপা তখন তাকে তার অজান্তে অধিকার করে ফেলে; তাকে একেবারে বদলে দেয়; নানা রকম সিদ্ধাই-শক্তি দেয়; নিজের সমাধিলাভের, অপরের সমাধি ঘটাবার ক্ষমতা দেয়; নিজের পূর্বজন্মের কাহিনী সে জানতে পারে, স্পর্শের দ্বারা অপরকে রোগমুক্ত করতে পারে ইত্যাদি।' স্বামীজী এক্ষেত্রে দু'ধরনের শক্তির কথা বলেছিলেন, এক আধ্যাত্মিক শক্তি, দুই সিদ্ধাই-শক্তি। উঁচুদরের আধ্যাত্মিক মানুষ নন, এমন মানুষও মনঃসংযোগের দ্বারা (অর্থাৎ বিশেষ ধরনের যোগের দ্বারা) সিদ্ধাই-শক্তি আয়ত্ত করতে পারেন। তাঁরা আপাত অলৌকিক কাজ করতে সমর্থ। তেমন একজন ব্যক্তিকে স্বামীজী স্বচক্ষে দেখেছিলেন। কিন্তু মানুষকে চরিত্র বদলে দেওয়ার ক্ষমতা অধিকারী আধ্যাত্মিক পুরুষদেরই থাকে, যেমন, পওহারী-বাবা একজন চোরকে বদলে সাধু করে দিয়েছিলেন।[২৫] স্বামীজী, প্রসঙ্গশেষ করেছিলেন এই বলে ঃ

২৫ পওহারী-বাবা যে-চোরকে বদলে সাধু করে দিয়েছিলেন, তাঁর সাক্ষাৎ স্বামীজী হিমালয় ভ্রমণকালে পেয়েছিলেন। মহৎ চরিত্রের এক সাধুর কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে স্বামীজী উক্ত সাধুর কাছ থেকে তাঁর পূর্বকাহিনী শোনেন। তিনি পূর্বে চোর ছিলেন, পওহারী-বাবার আশ্রমে চুরি করতে গিয়েছিলেন, পোঁটলা বেঁধে জিনিস নিয়ে যখন চলে আসছেন, তখন পওহারী-বাবা শব্দ করে ফেলেন, তাতে চমকে উঠে পোঁটলা ফেলে তিনি ভয়ে পালাতে থাকেন, পওহারী-বাবাও তাঁর পিছনে পোঁটলা নিয়ে ছোটেন, অনেক কষ্টে তাঁর নাগাল পান; তারপর তাঁর পায়ের

"সেণ্ট পল বলেছেন : দু'রকম শক্তি রয়েছে ঈশ্বরের—*Graces of the Spirit* এবং *Powers of the Spirit*। উচ্চ আধ্যাত্মিকতা নেই, এমন মানুষও মনঃসংযোগের জোরে *Powers of the Spirit* অর্জন করতে পারেন, কিন্তু ধর্মানুভূতি, পরিত্রাণ বা মুক্তি *Graces of the Spirit* ভিন্ন পাওয়া সম্ভব নয়। সেই ঈশ্বরকরুণায় অভিষিক্ত যাঁরা, তাঁরা স্বয়ং জ্যোতির্ময় পুরুষ; তাঁদের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয় প্রেম আলোক আনন্দ অমৃত।"

এইবার সিংগারাভেলু মুদালিয়রের নবজন্মকথা :

"শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সমুদ্রতীরের বাড়ি। অপরূপ চন্দ্রালোকিত রাত্রি। স্বামীজী সর্বোত্তম ভাবাবেশে আছেন। তাঁর মুখ সত্যই প্রদীপ্ত; সুস্মিত সৌম্য দেহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর চারপাশে যেন জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করেছে। একটু আগেই গান গাইছিলেন, যা প্রাণের ভিতরকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে।...মহামায়ার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সুমহান সংগীত। ভাববিহ্বল কণ্ঠে গানটি একটু-একটু করে অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় সেখানে সমবেত সকলে নিঃশ্বাস রোধ করে সেই গান

কাছে পোঁটলাটি রেখে পওহারী-বাবা সেটি গ্রহণ করার জন্য অনুনয় করতে থাকেন, এবং গভীর বেদনার সংগে বলেন, প্রভুর কাজে বাধা দেওয়ার জন্য তাঁর দুঃখ ও লজ্জার শেষ নেই। সত্যই পওহারী-বাবার কাছে সবই 'প্রিয়তম' বা 'প্রিয়তমের দূত।' বলাবাহুল্য এর পরে চোরের পক্ষে সাধু না হয়ে উপায় ছিল না। এই সত্য কাহিনীর সংগে লা মিজারেবলের কল্পিত কাহিনীর অদ্ভূত সাদৃশ্য সকলেরই চোখে পড়বে।

স্বামীজীর স্পর্শে বা সংস্পর্শে বহু মানুষের রূপান্তরের কথা আমরা জানি। এখানে একটি বিচিত্র কাহিনী যোগ করছি। স্বামী-শিষ্য-সংবাদে পাই, স্বামীজী স্বয়ং বলেছেন, পরিব্রাজক-জীবনে মাদ্রাজে থাকাকালে একদিন যখন নিজ জননীর মৃত্যু ঘটেছে এমন কাল্পনিক দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে পড়েন, তখন আলাসিংগা তাঁকে মাদ্রাজে শহর থেকে কিছুদূরে রেলপথে একজায়গায় এক পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যান, সে ব্যক্তি স্বামীজীর 'নাম গোত্র, চৌদ্দপুরুষের খবর' বলে দেন, আরও বলেন, ঠাকুর সর্বদা স্বামীজীর সংগে ফিরছেন, এবং তাঁর মা কুশলেই আছেন। স্বামীজী দেখেছিলেন, লোকটি খানিকক্ষণ আঁক কষেছিলেন, পরে একাগ্র মনঃসংযোগ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকালে আলাসিংগা দোভাষীর কাজ করেন।

মহেন্দ্রনাথ দত্তও এই পিশাচসিদ্ধের কাছে স্বামীজীর যাওয়ার কথা লিখেছেন। সেখানে অনেক নূতন সংবাদ আছে। লোকটি মদ্যপ, তাঁর জন্য আলাসিংগা এক বোতল মদ নিয়ে গিয়েছিলেন, স্বামীজী তাঁর কুটীরের কাছাকাছি যেতেই তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে চীৎকার করতে থাকেন, তামিল ভাষায়, তার মর্মার্থ—'ও লোকটিকে চলে যেতে বলো, ওর গা থেকে বড় তেজ বেরুচ্ছে, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। আমি সহ্য করতে পারছি না।' স্বামীজী খানিক দূরে গিয়ে একটা ফুলগাছ থেকে একটা ফুল তুলে শুঁকতে থাকেন ও গুন্ গুন্ করে বাংলায় গান গাইতে থাকেন। তারপর আলাসিংগার সামনে সেই ব্যক্তি "কতকগুলি কাগজ লইয়া নিজের ভাষায় অনবরত লিখিতে লাগিল। এক তাড়া কাগজ লেখা হইলে সেই কাগজগুলি আলাসিংগার হাতে দিয়া বলিল যে, প্রত্যেক কাগজে প্রত্যেক পাতায় উহার [স্বামীজীর] নাম সহি করিতে বলো। স্বামীজী তদ্রূপ করিয়াছিলেন। আলাসিংগা সেই কাগজগুলি পড়িয়া স্বামীজীকে ইংরাজিতে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।" সত্যই ঐ কাগজগুলিতে স্বামীজীর ভূত ভবিষ্যতের অনেক সত্য কথা লেখা ছিল। লোকটি আরও লিখেছিলেন, "এই কাগজটিতে লিখিত কথা যে সত্য, ইহার প্রমাণ—স্বামীজী অমুক ফুল তুলিয়া লইয়া শুঁকিবেন এবং গুন্ গুন্ করিয়া নিজের ভাষায় একটি গান গাহিবেন।"

মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণের সত্যতার পক্ষে বলতে পারি, সমকালের সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে কুম্ভকোনমের গোবিন্দ চেট্টি নামক এক ব্যক্তির কথা যথেষ্ট বেরিয়েছিল, যিনি এই ধরনের কাজ করতেন— এবং মহেন্দ্রনাথ যেভাবে বলেছেন—সেই ছিল তাঁর পদ্ধতি। মাদ্রাজের থিয়জফিস্ট কাগজে এঁর অনেক বিবরণ বেরিয়েছে, তার একটির লেখক ফ্রেডরিক উইলিয়ম থার্সটন, এম-এ। ১৮৯২, নভেম্বর সংখ্যার থিয়জফিস্টে *The 'Cunning Man' Once Again* নামক রচনায় গোবিন্দ চেট্টির দীর্ঘ বর্ণনা তিনি দেন। তার মধ্যে আছে—'**Seated on a mat, without a word of previous**

শুনছিল। গান শেষ হলে অসীম স্তব্ধতা, যা সকলকে সন্ত্রস্ত সম্ভ্রমে অভিভূত করে দিয়েছিল। স্বামীজী আবার যখন কথা আরম্ভ করলেন, তখনই নীরবতা ভাঙল। তিনি বললেন, কখনো-কখনো কিভাবে তাঁর উপরে শক্তি ভর করে, তখন তিনি একেবারে বদলে যান; সেই সময়ে যারা তাঁর সংস্পর্শে আসে কিভাবে তিনি তাদের বদলে দেন। তিনি বলে চললেন, ঐসব সময়ে তাঁর মনে হয়, একটা বিরাট শক্তি তাঁর দেহের অনুপরমাণুর মধ্যে শিহরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে—প্রভাবিত করে সমস্ত কিছুকে। যদি তখন কেউ তাঁকে স্পর্শ করে, তার সমাধির অনুভূতিলাভ হয়, চিররহস্যের দ্বার তার কাছে খুলে যায়, পার্থিব আকর্ষণ ছিন্ন হয়ে যায়, সহস্র বর্ষের সাধনার ফল সে একমুহূর্তে লাভ করে। স্বামীজী যেই এই কথা শেষ করেছেন, সহসা শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন উঠে পড়ে, স্বামীজীর কাছে এগিয়ে এসে, তাঁর দুই পা আঁকড়ে ধরলেন। ইনি পরলোকগত পি সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র; তখন মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক; স্বামীজী এঁকে আদর করে কিডি বলে ডাকতেন; সেই নামেই ইনি বেশি পরিচিত; মহাপ্রাণ মানুষ; ঐকান্তিকতার প্রতিমূর্তি; নিজ বিশ্বাসকে কর্মে পরিণত করতেন নির্ভয় সাহসে। সিঙ্গারাভেলু স্বামীজীর পদধারণ করলে স্বামীজী দুই হাতে তাঁকে স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু বললেন, 'এ তুমি

Conversation, he commenced writing rapidly in Tamil....chewing some betel, humming and screwing up his face, now into a smile, now into puzzled frown. His eyes seemed to be rather inverted, and he now and then glanced at the paper he was writing on.... When he had finished writing he asked me to sign or initial the bottom—so as to prove that he did not change or add to it."

শ্রীযুক্ত থার্স্টন লিখেছেন, গোবিন্দ চেট্টির কাছে যাবার আগে তিনি যে-সকল প্রশ্ন লিখে খামে করে পকেটে রেখে দিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটির ঠিক উত্তর গোবিন্দ চেট্টি তামিল ভাষায় তাঁর সামনে লিখে দেন—পকেটে রাখা প্রশ্নগুলি কী, তা না-জেনেই। পরে কথাবার্তার সময়ে আরো অনেক আশ্চর্যজনক ভূত-ভবিষ্যৎ এবং অপরের অজ্ঞাত বর্তমানের কথা বলেন।

লেফট্‌ন্যাণ্ট সি এল পীকক ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজে এ'রই বিষয়ে লেখেন, সেটি সংকলন করে বার করে কর্নাটক প্রকাশিকা ১৮৯২, ৮ ফেব্রুয়ারি। গোবিন্দ চেট্টির চেহারা ও আচরণ এ'র বর্ণনায়—"A tall, well-made man, though his features show signs of considerable debauch, for he is addicted to heavy drinking. His manner is bluff and excessively uncourteous I am told." "In about ten minutes he handed me a sheet of paper and asked me to sign my name at the end of what he had written on it."

এখানেও একই অভিজ্ঞতা। শ্রীযুক্ত পীকক যে-যে প্রশ্ন করবার মনস্থ করে এসেছিলেন, তার সব-কয়টির উত্তর গোবিন্দ চেট্টির লেখা কাগজে ছিল--যদিও তা লিখে দিয়েছিলেন কোনোপ্রকার জিজ্ঞাসাবাদ না করেই। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। উক্ত কাগজ পড়বার আগে চেট্টি, সাহেবকে যে-কোনো একটি কবিতার লাইন বলতে বলেন। সাহেব যেটি বলেন, পরে দেখা গেল, চেট্টি সেটি আগেই কাগজে লিখে রেখেছেন—এই লাইনটি সাহেব পরে বলবেন, এই কথা-সহ!

মহেন্দ্রনাথের বিবরণ এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত বিবরণগুলি মিলিয়ে দেখলে কোনোই সন্দেহ থাকে না, স্বামীজী কুম্ভকোনমের গোবিন্দ চেট্টির কাছে গিয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথের বিবরণ থেকে আরও পাই, স্বামীজী গোবিন্দ চেট্টির কাছে গিয়ে পরে কথাবার্তা বলেছিলেন। সে-ব্যক্তি কারণ পান করে উৎফুল্ল হয়ে নিজের পূর্বকথা বলেছিলেন : "সে পূর্বে নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং বালক অবস্থায় একদল সাধুর সঙ্গে মিশিয়াছিল। এক সাধু তাহার সেবায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে জপ-ধ্যানের কতকগুলি প্রক্রিয়া শিখাইয়া দেন। কিছুকাল সেইভাবে জপ করার পরে তাহার ভিতর একটা শক্তি জাগিয়া ওঠে কিন্তু পূর্বের নিষ্ঠা চলিয়া যায়। কেউ কিছু প্রশ্ন করিলে কারণসহ ও বামাচারী পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব অভ্যাসমতো ধ্যান করিলে সম্মুখে একটি মূর্তি দেখিতে পায়। সেই মূর্তিটি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বলিয়া যায়, আর সে সেইগুলি কাগজে লিখিয়া লয়। কখনো-কখনো দুষ্ট মূর্তিটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না, তখন সে একটি স্লেটে অঙ্কের তেরিজ কষিতে আরম্ভ করে। তখন তাহাতেই তাহার মন নিবিষ্ট হইয়া যায়, এবং মূর্তিটি তখন স্পষ্ট

কী করলে? এতখানি ঝ‌ুঁকি নিলে কেন? সে যাই হোক, এর পরিণাম থেকে তোমার অব্যাহতি নেই।' ঠিক তখনি আমরা সকলে দেখল‌ুম, সিঙ্গারাভেল‌ুর ম‌ুখে চরম তৃপ্তির আলো। সেই ম‌ুহ‌ূর্তে তিনি কী অন‌ুভব করেছিলেন কেউ জানে না, কারণ বহ‌ু অন‌ুরোধেও এ-বিষয়ে কিছ‌ু বলেন নি, কিন্তু এটি অন্ততঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—সেদিন থেকে তিনি সম্প‌ূর্ণ ভিন্ন মান‌ুষ। তিনি সংসারত্যাগ করেছিলেন—স্ত্রী-প‌ুত্রাদি সব-কিছ‌ু—অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলেন—অতঃপর শ‌ুধ‌ু স্বামীজীর কাজই করে গেছেন। তাঁকে যাঁরা জানতেন তাঁদের সকলেরই মনে আছে, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে গেছেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিমজ্জিত থেকেছেন সাধনায় ও ধ্যানে।"২৬

হইয়া প্রতীয়মান হয় ও সমস্ত কথা বলিয়া দেয়। ইহা ছাড়া সে বিশেষ-কিছ‌ু জানে না।"

যে-দ‌ুই ইংরাজের বিবরণ উপরে তুলেছি, তাঁরা তাঁদের বর্ণনার মধ্যে গোবিন্দ চেট্টি কর্তৃক আঁকা-জোকার কথা বলেছেন।

গোবিন্দ চেট্টির সিদ্ধাইশক্তির পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করা বর্তমানে আমাদের ম‌ূল উদ্দেশ্য নয়। এ'র শেষ পরিণতির কাহিনী আমি যা শ‌ুনেছি, তা উপস্থিত করছি—যার সঙ্গে স্বামীজীর বিশেষ যোগ ছিল। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ-মঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রীয‌ুক্ত এস কে শিবরামন ঘটনাটি আমাদের জানিয়েছেন। তা তিনি শ‌ুনেছেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে, যিনি কুম্ভকোনমের মেয়ে (শ্রীয‌ুক্ত শিবরামনের পিতা বাল্যে স্বামীজীকে দেখেছিলেন; তাঁর সঙ্গে ১৯৭১ সালে আমি দেখা করেছিলাম)।

ঘটনা এই। আমেরিকা থেকে ফেরার পরে বিখ্যাত বিবেকানন্দ আবার কুম্ভকোনমে উপস্থিত। তাঁকে দেখতে হাজার-হাজার মান‌ুষ জ‌ুটেছে। ভিড়ের মধ্যে উক্ত ভবিষ্যৎবক্তাও আছেন। স্বামীজী দ‌ূর থেকে দেখেই তাঁকে চিনেছেন। তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে পরে দেখা করতে বলেন। তিনি হাজির হলে স্বামীজী তাঁকে বলেন, আমি জানি তোমার অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে। ঐ সিদ্ধাই তোমাকে টাকাকড়ি সম্মান ইত্যাদি দিয়েছে। কিন্তু সাধনার গোড়ায় মনের দিক থেকে যেখানে ছিলে, সেখানে এখন আছো কি? তোমার মন কি ঈশ্বরের দিকে এগিয়েছে? সে-ব্যক্তি সংকোচের সঙ্গে বলেন, না, তা হয়নি। তখন স্বামীজী বলেন, তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে ঐ শক্তি নিয়ে লাভ কি? স্বামীজী আরও বলেন, একবার যদি ঈশ্বরের স্পর্শ পাও, দেখবে, তার কাছে এসব জিনিস কত তুচ্ছ। এই বলে স্বামীজী তাঁকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীজীর ঐ আলিঙ্গনের পর থেকে উক্ত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ বলবার সকল ক্ষমতা চলে যায়। তার জায়গায় আসে অদ্ভুত ব্যাকুলতা। ক্রমে ঈশ্বরলাভের আক‌ুতি তাঁকে এমন অধিকার করে যে গ‌ৃহত্যাগ করে চলে যান।

২৬ স্বামীজীকে দিব্য ভাবান‌ুভ‌ূতির ক্ষণে স্পর্শ করার 'ভয়ঙ্কর' অর্থ স্বামীজী জানতেন। তিনি সভয়ে ভেবেছিলেন—কোন্ প্রেরণার বিষদংশন কিডি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। স্বামীজীর সানন্দ ভীতি ফ‌ুটে উঠেছে কিডিকে লেখা ১৮৯৪, ২১ সেপ্টেম্বরের পত্রে ঃ

'তোমার এত শীঘ্র সংসারত্যাগের সংকল্প শ‌ুনে দ‌ুঃখিত হলাম। ফল প‌াকলে আপনি গাছ থেকে পড়ে যায়। অতএব সময়ের অপেক্ষা করো। তাড়াতাড়ি করো না। বিশেষতঃ কোনো আহাম্মকি করে অপরকে কষ্ট দেবার অধিকার কারো নেই। সব‌ুর করো। ধৈর্য ধরো, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

স্বামীজীর সদ‌ুপদেশ শ‌ুনে কিডি কি বলেছিলেন জানি না। কিডির ভিতরকার চোরকে চ‌ুরি করতে বলে, কিডির বাইরের গ‌ৃহস্থকে সাবধান হতে বলার রসিকতা তিনি কতদ‌ূর উপভোগ করেছিলেন তাও জানি না। কিংবা জানি না, কিডি দ্বিতীয়ভাগের ভ‌ুবনের মতো ম‌ৃত্যুর আগে (এখানে অমর মরণ সগৌরবে) বলেছিলেন কিনা—পিতঃ, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ!!

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের নবজাগরণ ঃ বিবেকানন্দের ভূমিকা

॥ ১ ॥

ভারতের ইতিহাসে পূর্ণ প্রভায় আবির্ভূত হবার আগেই স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর ইতিহাসে আবির্ভূত হলেন। কোন্ রূপে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল, সে-বিষয়ে অ্যানী বেশান্ত লিখেছেন ঃ

"চিকাগোর ঘন আবহাওয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য, সিংহতুল্য গ্রীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত ওষ্ঠ, চকিত দ্রুতগতি, কমলা ও হলুদ রঙের পোষাকে পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব—স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়ার রূপ।...সন্ন্যাসী—তাঁর পরিচয়? নিশ্চয়ই। কিন্তু সৈনিক সন্ন্যাসী তিনি, প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চেয়ে সৈনিকই বেশি মনে হয়—মঞ্চ থেকে এখন নেমে এসেছেন, দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায়-রেখায়—পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি, পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন কৌতূহলী অর্বাচীনদের দ্বারা, যারা কোনোমতেই নিজেদের দাবি ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, যারা যেন বলতে চায়, তিনি যে-সুপ্রাচীন ধর্মের প্রতীক-পুরুষ সেই ধর্ম আশেপাশে সমবেত ধর্মসমূহের মহিমার চেয়ে হীনতর। কিন্তু না, তা হবার নয়। ধাবমান ও উদ্ধত পাশ্চাত্ত্যদেশের কাছে ভারত, যতক্ষণ তার এই বাণীবহ সন্তান বর্তমান আছে ততক্ষণ লজ্জিত থাকবে না। ভারতের বাণীকে তিনি বহন করে এনেছেন—ভারতের নামে তিনি দাঁড়িয়েছেন। সকল দেশের রাণীর মতো যে-দেশ থেকে তিনি এসেছেন, তার মর্যাদার কথা স্মরণ রেখেছিলেন এই চারণ সন্ন্যাসী। প্রাণবন্ত, শক্তিধর, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্থির স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষের মধ্যে পুরুষ—নিজেকে উত্তোলন করার মতো সামর্থ্যসম্পন্ন পুরুষ।

"মঞ্চের উপর অপর পক্ষও আত্মপ্রকাশ করেছিল; মর্যাদা, যোগ্যতা ও শক্তির দ্যোতনা সেখানেও ছিল; কিন্তু সবকিছুই আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিবেকানন্দের দ্বারা আনীত অধ্যাত্ম-বাণীর অপরূপ সৌন্দর্যের কাছে; নম্র হয়ে গেল সমস্তই যখন তাঁর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল ভারতের জীবনস্বরূপ পরমাশ্চর্য আত্মতত্ত্ব; জ্বলে উঠল প্রাচ্যের দিব্যবাণীর অতুলনীয় মহিমা। মোহিত ও অভিভূত সেই বিরাট জনমণ্ডলী উৎকর্ণ হয়ে রইল প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের জন্য, অপেক্ষা করে রইল রুদ্ধশ্বাসে—যে-ধ্বনিতরঙ্গ ঐ আছড়ে পড়ছে, ওর কিছুই যেন হারিয়ে না যায়! 'ঐ লোকটিকে আমরা পৌত্তলিক বলেছি!'—বিশাল সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে একজন বলে উঠলেন—'আর ওঁর দেশে মিশনারি পাঠাচ্ছি! এদেশে ওঁদেরই মিশনারি পাঠানো উচিত!'" [অ] [ব্রহ্মবাদিন; ১৯১৪, মার্চ-এপ্রিল]

তৎকালীন আমেরিকার বিশিষ্ট কবি হ্যারিয়েট মনরো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দকে দেখে যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে এই কথাগুলিও ছিল ঃ

"কমলারঙের পোষাক-পরিহিত সুদর্শন সন্ন্যাসীই নিখুঁত ইংরাজিতে আমাদের সর্বোত্তম বস্তু দিলেন। তাঁর প্রচণ্ড ও বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্ব, ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনির মতো ঐশ্বর্যময় কণ্ঠস্বর, তাঁর সংযত আবেগের অন্তর্লীন প্রবলতা, প্রতীচ্যজগতের সামনে প্রথম উচ্চারিত ও আবির্ভূত তাঁর বাণীর সৌন্দর্য—এই সমস্ত-কিছু মিশ্রিত হয়ে চরম অনুভূতির এক নিখুঁত বিরল মুহূর্ত আমাদের দান করল। মানব-ভাষণের এই হল সর্বোচ্চ শিখর।" [অ] ['ডিস্কভারিজ্']

লেখিকা লুসি মনরোর বর্ণনার কিছু অংশ ঃ

"কেউই হিন্দুসন্ন্যাসীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতরভাবে ধর্মমহাসভার প্রাণধর্ম, তার সীমাবদ্ধতা এবং তার সুন্দর প্রভাবের বিষয়টিকে প্রকাশ করতে সমর্থ হননি। আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁর ভাষণ উদ্ধৃত করছি, কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের উপরে তাঁর ভাষণের প্রভাবের সামান্য আভাসের বেশি-কিছু দিতে পারব না, কারণ তিনি দিব্যাধিকারপ্রাপ্ত বাগ্মী। তদুপরি, পীত ও কমলারঙের চিত্রবৎ পোষাকের পটভূমিকায় স্থাপিত তাঁর সুদৃঢ় বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, ঐ মুখোচ্চারিত ঐশ্বর্যময় ও সংগীতময় বাণীর অপেক্ষা কম আকর্ষক ছিল না।" [অ] ['ডিস্‌কভারিজ্‌']

বিবেকানন্দ তারপর ভারতবর্ষে এলেন, সশরীরে নয়, সংবাদের রথে চড়ে—এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কাঁপতে লাগল সেই বার্তা-শিহরণে। ঐ সংবাদগুলি পরাধীন পতিত ভারতবর্ষকে তার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিল—আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষে তখন দেশনেতা বা সমাজসংস্কারকের অভাব ছিল না; ভারতীয় সমাজের দোষের চেহারাটা দেশী-বিদেশী সকলের কল্যাণে বে-আব্রু হয়ে পড়েছিল পুরোপুরি, রোগের নিদান কাগজপত্রে লিখিত হয়ে, বক্তৃতামঞ্চে কথিত হয়ে, ভারতভূমিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল—আত্মাবমাননার সেই বিপুল আয়োজনের মধ্যে নির্বাসিত মর্যাদাকে নিজের মধ্যে আহ্বান করে বিবেকানন্দ যেন ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'—জাতিপ্রাণ সহর্ষে তখনি সাড়া দিয়েছিল, বন্দনা গেয়েছিল সেই মানুষটির যিনি লজ্জিত করতে আসেন নি, উদ্বুদ্ধ করতে এসেছেন, ক্ষুণ্ণ করতে আসেন নি, এসেছেন পূর্ণ করতে।

বিবেকানন্দের মহিমার ভিত্তি বিদেশীর প্রশংসায় নয়, তা আমরা এখন যথেষ্টই জানি, কিন্তু আজ বোধহয় কল্পনা করাও সম্ভব নয়, বিবেকানন্দের বৈদেশিক প্রশংসা লাঞ্ছিত ভারতবাসীকে কতখানি দিয়েছিল! বিবেকানন্দই প্রথম ভারতবাসী যিনি এতটুকু মাথা না নামিয়ে, কোনোভাবে আপস না করে, নিজ তেজে অর্জন করে এনেছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষে তখন অজ্ঞাতপূর্ব সেই অভিজ্ঞতা। বিবেকানন্দের আগে যে-সকল বিখ্যাত ভারতবাসী বিদেশীর প্রশংসা পেয়েছিলেন, তা লাভের জন্য তাঁদের কতখানি দিতে হয়েছিল, তার কাহিনী শিক্ষিত ভারতবাসী জানত। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে দেখা গেল, রচিত হয়েছে অভিনব কাহিনী —তার রোমাঞ্চ তাই মুকুলিত করেছিল জাতির মর্মমূল।

আরও একটি অভাবিত ব্যাপার ঘটেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে, অন্ততঃ ভারতের ইতিহাসে, এমন কখনো হয়নি যে, কোনো একটি মানুষের বহির্দেশে সাফল্যের সংবাদেই সমগ্র জাতি জেগে উঠেছে। ১ সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার, একেবারে তা অবিশ্বাস্য মনে হতে

---

১ ভারতীয় ইতিহাস থেকে তুলনাযোগ্য দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। প্রথম—গান্ধীজীর। গান্ধীজীর আদি রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানে বর্ণপার্থক্যের বিরুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা ভারতীয় সংবাদপত্রে যথেষ্ট বেরিয়েছিল, উৎসুক্যের ও প্রশংসার উদ্রেকও করেছিল, কিন্তু তার দ্বারা কোনো জাতীয় জাগরণ হয়নি, একথা সমসাময়িক সংবাদপত্রের সাক্ষ্যেই বলতে পারি। ১৯০২-এর মধ্যে, পরবর্তীকালেও সংবাদপত্রে গান্ধী-সংবাদ ও তার প্রতি-ক্রিয়ার রূপ আমি দেখেছি। নেতাজীর বহির্ভারতীয় কার্যকলাপের সংবাদ অবশ্য অগ্নিস্রোতের মতো ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে সত্যই পাগল করে দিয়েছিল দেশবাসীকে। সেকথা সত্য, কিন্তু আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ সংগঠনে নেতাজীর মুখ্য ভূমিকা হলেও একমাত্র ভূমিকা নয়। তাছাড়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যাপক উন্মাদনা তার আগে কয়েকবার দেখা গেছে—নেতাজীর ক্ষেত্রে তীব্রতা হয়ত বেশি দেখা গিয়েছিল। পুনশ্চ, নেতাজী আজাদ হিন্দ-পূর্ব যুগেও ভারতবিখ্যাত ব্যক্তি, পৃথিবীর নানা স্থানে তাঁর নাম তখনই অল্পবিস্তর ছড়িয়েছে—বিবেকানন্দের মতো সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ হিসাবে বিশ্বমঞ্চে উঠে দাঁড়াননি।

পারত, যদি-না আমাদের কাছে সমসাময়িক সংবাদগুলি থাকত। সে-সকল সংবাদের কিছু-কিছু আমরা ক্রমে উপস্থিত করব।

॥ ২ ॥

কী ধরনের সংবাদ শিহরণ এনেছিল, তার একটি নমুনা আমরা 'আবির্ভাব' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি—বস্টন ইভনিং ট্রানসক্রিপ্টে ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ডাউটি যা লিখেছিলেন। এখানে শুরুতে আর একটি তুলে ধরছি—ধর্মমহাসভার বিজ্ঞানশাখার সভাপতি (তার কম নন) মারউইন মেরী স্নেলের একটি পত্র-প্রবন্ধ, যা দুঁদে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা পায়োনীয়ারে বেরিয়েছিল ১৮৯৪, ৮ মার্চ—এবং পায়োনীয়ারে বেরিয়েছিল বলে চারদিকে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। লেখাটি অনেক কাগজে উদ্ধৃত হয়।২ ১৮৯৩, ৩০ জানুয়ারিতে লিখিত উক্ত পত্রে অধ্যাপক স্নেল বলেছিলেন ঃ

"ভারত থেকে আগত ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে আমেরিকার সংবাদপত্র ও জনগণের মধ্যে যে-প্রশংসার ঐকতান উঠেছে, তাতে কখনো-কখনো কিছু বেসুরো আওয়াজ শোনা গেছে, বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে। এই পরিস্থিতিতে যথাযথ অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের দেশবাসীকে অবহিত করবার জন্য, এবং আমাদের জনগণের মার্জিত ও উদার-বুদ্ধি অংশের সর্বান্তঃকরণের সমবেত কৃতজ্ঞতা ও সমাদর জানাবার জন্য অন্তরের মধ্যে আমি তাগিদ বোধ করেছি। ধর্মমহাসভার বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিরূপে, এবং বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকল অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে, আমি আমার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য এখানে উপস্থিত করছি। স্বামী বিবেকানন্দ কী শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে এখানে গৃহীত হয়েছেন, কী প্রভাব তিনি বিস্তার করেছেন, কী মঙ্গলকার্য তিনি সম্পাদন করছেন, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরূপে কথা বলার আমি অধিকারী।

"গত সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো শহরে পৃথিবীর ধর্মসমূহের যে-মহাসম্মেলন হয়ে গেছে, তাকে নানা কারণে ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ-চিহ্নিত ঘটনা বলা চলে। মুখ্য লাভের একটি হচ্ছে, খ্রীস্টান-জগৎ বিশেষতঃ আমেরিকার লোকে এই মহৎ শিক্ষা পেয়েছে—পৃথিবীতে এমন-সব ধর্মও আছে, যেগুলি খ্রীস্টধর্মের অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধেয়; দার্শনিক গভীরতায়, আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায়, চিন্তার মুক্ত বীর্যপূর্ণ প্রকাশে, মানবতার প্রতি সহানুভূতির ব্যাপক নিষ্ঠায় সেইসকল ধর্ম খ্রীস্টধর্মকে অতিক্রম করেছে, অথচ সেইসঙ্গে নীতির সৌন্দর্য এবং কার্যকারিতাকে এক চুলের জন্যও তারা হারায় নি। আলোচনার সময়ে আটটি মহান অখ্রীস্টান ধর্ম উপস্থাপিত হয়েছিল ঃ হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদী, কনফুসীয়, শিন্টো, মুসলমান এবং জেন্দ্-আবেস্তার ধর্ম।...

"বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে জৈনধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বোম্বাইয়ের মিঃ বীরচাঁদ এন গান্ধী। তিনি খুব অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, এখনো এদেশের নানাস্থানে বক্তৃতা করে তাই করছেন। সিংহল এবং জাপান থেকে আগত বহুসংখ্যক বৌদ্ধ প্রতিনিধি ধর্মমহাসভায় খুবই বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন; তাঁরা অনেক রচনা পড়েছেন, বৌদ্ধ-দর্শনের অনেক ক্লাস নিয়েছেন, তাতে শত-শত লোক প্রতিদিন আকৃষ্ট হয়ে যোগদান করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলতে হবে, হিন্দুধর্মের মতো আর কোনো ধর্মই ধর্মমহাসভায় এবং

২ মারউইন মেরী স্নেলের রচনাটি, আমরা দেখেছি, পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল হিন্দুতে (৬ মার্চ), মিরারে (৯ মার্চ), ট্রিবিউনে (২১ মার্চ), অমৃতবাজারে (১০ মার্চ), থিয়জফিক থিংকারে (৭ এপ্রিল)।

আমেরিকার জনগণের উপর অনুরূপ বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত যেসব প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেনঃ এলাহাবাদের অধ্যাপক চক্রবর্তী, মাদ্রাজের মিঃ নরসিমাচারী, লাহোরের লক্ষ্মীনারায়ণ। মণিলাল এন দ্বিবেদী ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকলেও কতকগুলি রচনা পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি গঠিত ও আলোচিত হয়েছিল, যেমন হয়েছিল মাদ্রাজের এস পার্থসারথি আয়েঙ্গার-প্রেরিত টেঙ্গলাই শ্রীবৈষ্ণব দর্শনের উপর রচনা। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মিঃ মজুমদার এবং মিঃ নাগরকর; আমেরিকার ইউনিটারিয়ানরা এঁদের বিশেষ খাতির করেছিলেন কারণ মতাদর্শে উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ ঐক্য ছিল।

"কিন্তু যে-কোনো হিসাবে, হিন্দুধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং 'নিজস্ব' প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি কোনো সন্দেহ না রেখেই ধর্মমহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রায়ই বক্তৃতা করেছেন—ধর্মমহাসভার মঞ্চে এবং বিজ্ঞানশাখার অধিবেশনগুলিতে; শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে সভাপতিত্ব করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি খ্রীস্টান বা 'প্যাগান'—যে-কোনো প্রতিনিধি অপেক্ষা অধিকতর উদ্দীপনার সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন। তিনি যেখানেই যেতেন, লোকে দলবেঁধে ধাওয়া করত, এবং তাঁর মুখোচ্চারিত প্রতিটি শব্দের জন্য হাঁ করে অপেক্ষা করত। ধর্মমহাসভা শেষ হবার পরে তিনি এখন আমেরিকার প্রধান শহরগুলিতে বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বক্তৃতা করছেন এবং যেখানেই গেছেন সোৎসাহ সংবর্ধনা পেয়েছেন। খ্রীস্টীয় ধর্মমঞ্চে বক্তৃতা করবার জন্য তাঁকে প্রায়ই আহ্বান করা হয়েছে। যদি কেউ একবারও তাঁর বক্তৃতা শুনে থাকেন, কিংবা তদুপরি যদি কেউ তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে থাকেন, তাহলে তিনি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে সর্বদা তাঁর বিষয়ে উল্লেখ করবেনই। সবচেয়ে গোঁড়া, অনড় অচল খ্রীস্টানও না-বলে পারেন না যে, 'তিনি সত্যই নরকুলে নরেন্দ্র', যদিও সুপ্রচলিত সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার জন্য তাঁরা যোগ করে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন, 'কিন্তু তিনি অবশ্যই ব্যতিক্রম, তাঁর মতো আর কোনো হিন্দুই নন।'

"মিশনারিগণের দ্বারা প্রচারিত গালগল্প ও অর্ধসত্যের কল্যাণে আমেরিকার জনগণ সাধারণভাবে হিন্দুদের অধঃপতিত অজ্ঞান হীদেন বলে ধারণা করতে অভ্যস্ত ছিল—সেক্ষেত্রে পরমহংস বিবেকানন্দের উপস্থিতি, আকারমহিমা, ভাষার সৌন্দর্য—সুতীব্র সবিস্ময় সমাদর ও শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পেরেছে, সেকথা সত্য, সেইসঙ্গে আরও বলতে হবে, আমেরিকায় অতঃপর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে-ধারাবাহিক আগ্রহ দেখা গেছে তার মূলে নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিক সত্যের জন্য তার যথার্থ ক্ষুধা। ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে ঐ সত্য আমেরিকার জনগণের সামনে উপস্থিত করেছে।

"ঐহিক বিষয়ে ব্যাপৃত আমেরিকা আধ্যাত্মিক আহার্যের জন্য ক্ষুধিত। উচ্চ শ্রেণীগুলির অজ্ঞান ও প্রাদেশিকতা, নিম্নশ্রেণীগুলির বর্বরতা সত্ত্বেও বলা যায়, আমেরিকার বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে সর্বত্রই বিক্ষিপ্ত রয়েছে উচ্চতর বস্তুর জন্য বহু তৃষিত আত্মা। ইয়োরোপ সর্বসময়ে আধ্যাত্মিক প্রেরণার জন্য ভারতের নিকট ঋণী। খ্রীস্টধর্মের উচ্চ ভাবসমূহের মধ্যে এমন খুব অল্প অংশই পাওয়া যাবে যেগুলিকে ক্রমান্বয়ে উত্থিত হিন্দু-ভাবতরঙ্গের কোনো একটির সঙ্গে যুক্ত করা না যাবে; সেগুলি হয় পিথাগোরাস কিংবা প্লেটোর হিন্দুভাবান্বিত হেলেনিজম্, কিংবা নস্টিকদের হিন্দুভাবান্বিত ম্যাজডিজম্, কিংবা ক্যাবালিস্টদের হিন্দুভাবান্বিত ইহুদীমত, কিংবা মুর দার্শনিকদের হিন্দুভাবিত মুসলমান-ধর্ম, থিয়জফিস্টদের হিন্দুভাবাপন্ন রহস্যবাদ, নিউ ইংলণ্ড ট্রানসেনডেন্ট্যালিস্টদের হিন্দু-ভাবাপন্ন সোসিয়ালিজম। আরও যেসব নানাপ্রকার প্রাচ্য-প্রভাবের নবধারা সমকালীন খ্রীস্টানজগৎকে উর্বর করেছে তাদের কথা না বললেও চলে।

"সুতরাং ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্বাধিক আলোকপ্রাপ্ত নরনারীরা যখন তাঁদের ভাবজীবন ও আলোকের ঐতিহাসিক উৎস এই হিন্দুধর্মের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে পড়েন, তখন তাঁরা তার প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হন। বিশেষভাবে এখন এখানে কতকগুলি ব্যাপক ও প্রভাবশালী আন্দোলন রয়েছে যেগুলি স্বভাবচরিত্রে সুস্পষ্টভাবে হিন্দু। যেসব বৈজ্ঞানিক ও উদার চিন্তাধারা ভাবগতভাবে অদ্বৈতমার্গীয়, কেবল সেগুলিই নয়, তথাকথিত ক্রীশ্চান সায়েন্স (নিতান্ত ভ্রান্ত একটি নাম) বেদান্তদর্শনের উপর নির্ভরশীল বলে সর্বথা স্বীকৃত। বেদান্তের তিন ধারার অনুসারীরা আমেরিকায় যথেষ্ট ছড়িয়ে আছেন, যদিও হিন্দুচিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের অভাবে তাঁরা নিজেদের মতকে সংজ্ঞাচিহ্নিত করতে পারেন না। এমনকি খ্রীস্টীয় পৌরাণিক কাহিনীও হিন্দু কাহিনী থেকে খুব পৃথক নয়। হিন্দু পুরাণকথাগুলির অনুবাদ, বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের প্রবন্ধ, থিয়জফিস্ট ও অপর উদার সম্প্রদায়ের রচনা, এবং ব্যক্তিগত পরিশ্রম, এই সকলের দ্বারা ক্রমেই আমেরিকার জনগণের কাছে হিন্দুধর্ম পরিচিত হয়ে উঠছে।

"হিন্দুকরণের যে-সকল শক্তি এতাবৎকাল সক্রিয় ছিল, সবগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াসের ফলে উল্লেখযোগ্য গতিবেগ পেয়েছে। যথার্থ হিন্দুধর্মের, পাশ্চাত্ত্যঘেঁষা তার বীর্যহীন নানা ইদানীন্তন সংস্করণের নয়, এমন প্রতিনিধি ও প্রমাণ-পুরুষ আর কখনো আমেরিকার জিজ্ঞাসুরা পাননি। একথা নিশ্চিতভাবে, কোনো সন্দেহ না রেখে, বলা যায়, যখন তিনি এদেশ থেকে চলে যাবেন তখন আমেরিকান জনগণের বৃহৎ অংশ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর প্রত্যাগমনের অথবা শঙ্করপন্থী তাঁর কোনো সহযোগীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করবে।

"প্রটেস্টান্ট খ্রীস্টান-সম্প্রদায়ের চরম গোঁড়া অংশের খুবই অল্পসংখ্যক কিছু লোক তাঁর সাফল্যে ঈর্ষাতুর হয়ে বিরোধী সমালোচনা করতে প্ররোচিত হয়েছে। সে সমালোচনা এসেছে অপরিণত স্বভাবের ধর্মধ্বজীদের কাছ থেকে। আবার সেই দলগত সংকীর্ণতা ও শত্রুতা সর্বক্ষেত্রেই স্তব্ধ হয়ে গেছে ভারতভূমি থেকে আগত এই কমলাবর্ণ পোষাকাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীর সর্বাঙ্গীণ সহৃদয়তা ও বিস্তারিত শুভেচ্ছায়, তাঁর পাণ্ডিত্য, মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত স্বভাবের আকর্ষণী মধুরতায়।"

সংবাদের পর সংবাদ আছড়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের উপরে। তাদের কয়েকটিকে অংশতঃ মাত্র আমরা এখানে উপস্থিত করতে পারি। এইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত—একই সংবাদ অনেক সময়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, এবং তার দ্বারা প্রভাবিত করেছিল সেইসব জায়গার মানুষদের। অর্থাৎ কেবল আগত সংবাদের সংখ্যা নয়, তার ব্যাপক প্রচারের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। সংবাদ অনেক সময়ে আকারে খুবই বৃহৎ ছিল। তাদের মধ্যে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির বর্ণনার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের সারাংশও দেওয়া হয়েছিল। আমরা সাধারণভাবে বক্তব্যের অংশ বাদ দেব। এবং, ১৮৯৬ পর্যন্ত সময়ে স্বামীজীর বিষয়ে আমেরিকা থেকে যেসব সংবাদ এসেছিল, সেগুলির অল্পবিস্তর উল্লেখই করব, ইংলণ্ড থেকে আগত সংবাদ নয়, যার বিষয়ে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা থাকবে। যদিচ নিম্নের সংবাদটি সম্ভবতঃ লণ্ডন থেকে আগত।

ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত ধর্মযাজক এইচ আর হাউইস্ ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী এঁকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিলেন। স্বামীজীর লণ্ডনে বাসকালে এঁর সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে কিছু সংবাদ পরে দেব। ডেইলি ক্রনিকলে প্রকাশিত এঁর রচনার অংশ এই [মিরার; ১৮৯৩, ২৮ নভেম্বর]—

"সিংহলের বাগ্মী ধর্মপালের ভাষণ এবং বর্ণময় পোষাক-পরিহিত বিবেকানন্দের সুক্ষ্ম

তীক্ষ্ন উক্তিসমূহ শোনার পরে অনেকের কাছে সর্বপ্রথম এই কথা প্রতিভাত হয়েছিল—খ্রীস্টজন্মের পূর্বেও এতবেশি উচ্চ খ্রীস্টীয়তা শেখানো হয়েছে অথচ তার দ্বারা খ্রীস্টধর্ম লঘুত্বপ্রাপ্ত হয়নি। অপরপক্ষে বোঝা গেল, এক পরম দিব্য উৎস থেকে এইসকল এবং অন্যান্য মহান ভক্তিগভীর শিক্ষা উৎসারিত হয়েছে।

"জনপ্রিয় হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, যাঁর মুখাবয়বের সঙ্গে বুদ্ধের ক্লাসিক মুখের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রয়েছে, আমাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি, রক্তাক্ত যুদ্ধ, এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে ধিক্কার দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন—'মৃদুস্বভাব হিন্দুরা' কখনো এই মূল্যে আমাদের দর্পিত সভ্যতাকে লাভ করতে চাইবে না। যখন এই প্রচণ্ড সন্ন্যাসী দোলায়িত হস্তসহ প্রায় ফেনায়িত স্বরে 'মৃদুস্বভাব হিন্দু' কথাটি পুনঃপুনঃ ছন্দোময়ভাবে উচ্চারণ করছিলেন, তখন শ্রোতাদের কাছে তা বিচিত্র বলে মনে হয়েছিল। চিৎকার করে তিনি বলেছিলেন, 'এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে বিজেতার তরবারি নিয়ে তোমরা আমাদের দেশে গিয়েছ। তোমরা—আমাদের তুলনায় তোমাদের গতকালকার ধর্ম—হাজার-হাজার বছর আগে আমাদের ঋষিদের কাছ থেকে আমরা তোমাদের খ্রীস্টের শিক্ষা ও জীবনের মতোই মহান পবিত্র শিক্ষা ও জীবন পেয়েছি—সেই আমাদের তোমরা পায়ের তলায় দলেছ, এবং ধূলির মতো তুচ্ছজ্ঞান করেছ।...তোমরা মাংসাশী পশু। তোমরা মদ খাইয়ে আমাদের অধঃপতিত করেছ, অসম্মানিত করেছ নারীদের, বিদ্রূপ করেছ ধর্মকে—যে-ধর্ম বহুদিক দিয়ে তোমাদের মতোই কিন্তু উচ্চাঙ্গের কারণ অধিকতর মানবিক। এর পরেও তোমরা ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্মের ধীর গতি দেখে বিস্মিত হও! ধীর গতির কারণ তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছি—তোমরা খ্রীস্টের অনুগামী নও, যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। তাঁর মতো করে যদি তোমরা আমাদের দ্বারে আসো, সেই দীনহীনভাবে, প্রেমের বার্তা নিয়ে, অপরের জন্য জীবনগ্রহণ করে, যন্ত্রণা বহন করে—আমরা কি বধির হয়ে থাকব তখন? কদাপি নয়। আমরা তখন আবাহন করব, বার্তা শুনব, যা করেছি আমাদের দিব্য ঋষিদের ক্ষেত্রে।" [অ]

আমেরিকার 'প্রেস' পত্রিকার সংবাদ [মিরার; ১৮৯৩, ৩০ নভেম্বর]—

"এই বৃহৎ সমাবেশের কাছে সবচেয়ে আকর্ষক ব্যক্তিদের অন্যতম হলেন হিন্দু-তাত্ত্বিক এবং বিরাট পণ্ডিত অধ্যাপক স্বামী বিবেকানন্দ। অধ্যাপক বিবেকানন্দের মনোহারী চেহারা, তরুণবয়স্ক, তথাপি প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ—তিনি এমন এক ভাষণ দিলেন যে, ধর্ম-কংগ্রেসকে যেন একেবারে জয় করে নিলেন। সেখানে প্রায় সকল খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের বিশপ ও মিনিস্টাররা উপস্থিত ছিলেন—তাঁদের যেন উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। মানুষটির বাগ্মিতা, তাঁর পীতাভ মুখে মাখা মর্মাস্বিতার দীপ্তি, তাঁর কাল-সম্মানিত ধর্মমতের সৌন্দর্য-উন্মোচনের অনবদ্য ইংরাজি ভাষা—সবকিছু সম্মিলিত হয়ে শ্রোতাদের উপরে গভীর প্রভাব-বিস্তার করল। এই অসাধারণ অধ্যাপক যেদিন তাঁর প্রথম ভাষণ দিলেন (পরে আরও অনেক ভাষণ দিলেন), তারপর থেকে সর্বত্রই তাঁর পিছনে জনতা ছুটতে লাগল। কংগ্রেস-ভবনের ভিতরে বাহিরে যাত্রাকালে প্রতিদিন শত-শত নারী তাঁকে ঘিরে ফেলত, যারা তাঁর সন্নিকট হবার ও করমর্দন করবার জন্য কার্যতঃ পরস্পর যুদ্ধ করত। তাঁর উপাসনাকারিণীদের মধ্যে সর্বস্তরের মহিলা ছিলেন, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। কেউ-কেউ ফ্যাসানের পরম পূজারিণী, যদিও এই সংগ্রামের সময়ে প্রসাধনের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি।...এই সংবর্ধনায় অধ্যাপক খুবই বিস্মিত, সৌজন্যের সঙ্গে তাকে-গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ক্রমে পুনরাবৃত্তির জন্য ব্যাপারটা যখন ক্লান্তিকর হয়ে উঠল, তখন বারান্দায় দালানে কোনো নারী না থাকলেই তবে যাতায়াত করতেন। চিত্রবৎ সুন্দর পোষাকপরা দূরপ্রাচ্যের অন্য প্রতিনিধিদের বিষয়েও আগ্রহ ছিল, কিন্তু অনেক কম পরিমাণে। ধর্মমহাসভার এইসকল ভাষণ যথেষ্ট শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছেও আশ্চর্যজনক। যাঁদের এমন মস্তিষ্ক, এমন তীক্ষ্ন চিন্তাশক্তি, তাঁরাও হীদেন-ধর্মে

বিশ্বাসী—এইকথা ভেবে অবাক হয়েছেন অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি। এ'রা কিন্তু অধ্যাপক বিবেকানন্দকে নিয়ে নাচানাচি করেছেন এমন মহিলাবৃন্দ নন।" [অ]

নিউইয়র্ক ক্রিটিক [মিরার; ১৮৯৩, ২৭ ডিসেম্বর]—

"বিবেকানন্দের সংস্কৃতি, বাগ্মিতা, মোহকর ব্যক্তিত্ব হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের নূতন চেতনা দিয়েছে। তাঁর সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, গভীর সংগীতময় কণ্ঠস্বর অবিলম্বে অপরের হৃদয় অধিকার করে ফেলে—তিনি বিভিন্ন সংস্থা ও গির্জায় প্রচার করে নিজ ধর্মমতকে আমাদের কাছে সুপরিচিত করে তুলেছেন। বক্তৃতার সময়ে কোনো নোট রাখেন না; সর্বোত্তম শিল্পকৌশলের সংগে নিজ বক্তব্যকে উপস্থিত করেন ও সিদ্ধান্তে পেঁছে যান; তার মধ্যে থাকে অপরকে প্রভাবিত করার মতো সুগভীর আন্তরিকতা; এবং এই সকলের সমবায়ে তিনি প্রায়শঃ উন্নীত হন দিব্যপ্রেরণার শিখরে।" [অ]

নিউইয়র্ক হেরাল্ড [মিরার: ১৮৯৩, ২৭ ডিসেম্বর]—

"বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভার সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর কথা শোনার পরে আমরা অনুভব করেছি—তাঁর জ্ঞানী দেশের মানুষদের কাছে মিশনারি পাঠানো কী মূর্খতা!" [অ]

বে সিটি ট্রিবিউন [মিরার; ১৮৯৪, ১৭ অগস্ট]—

"গতকাল বে সিটিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি বহুকথিত হিন্দু স্বামী বিবেকানন্দ, সেনেটার পামারের অতিথি।...বিবেকানন্দের চমকপ্রদ চেহারা; প্রায় ৬ ফুট লম্বা, ওজন নিশ্চয় ১৮০ পাউন্ড, অনবদ্য দেহসৌষ্ঠব। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল অলিভ, সুন্দর কৃষ্ণ কেশ, পরিষ্কার কামানো মুখ। তাঁর কণ্ঠস্বর কোমল এবং সুনিয়মিত; ইংরাজি বলেন অদ্ভুত ভালো। বস্তুতঃপক্ষে অধিকাংশ আমেরিকানের চেয়ে ভালো তাঁর ইংরেজি। সবিশেষ অমায়িক ব্যবহার তাঁর।" [অ] [অতঃপর স্বামীজীর আকর্ষক কথাবার্তা এবং বক্তৃতার সারসংক্ষেপ]

চিকাগো ইন্টারওসান [হিন্দু; ১৮৯৪, ১৪ নভেম্বর]—

"ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের তুল্য সৌজন্যপূর্ণ মনোযোগ আর কেউ আকর্ষণ করতে পারেন নি। তার মূলে তাঁর চিত্তহারী ব্যবহার, তাঁর শক্তিসামর্থ্য, নিজ ধর্মের সকল বিষয় সম্বন্ধে তাঁর নির্ভয় আলোচনা।..এই মর্যাদাময় হিন্দু পাশ্চাত্ত্যজগতের মহিমা এবং ঐহিক বিকাশের বিষয়ে উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ বোধ করেন; তাঁর দেশের জনগণের পক্ষে কল্যাণকর হবে এমন সমস্ত-কিছু শিখতে উদ্গ্রীব; সর্ব ধর্মের সত্য স্বীকারে আন্তরিক-ভাবে ইচ্ছুক; ন্যায় ও পুণ্যের পক্ষে প্রচেষ্টায় সদা প্রস্তুত; কিন্তু একইসংগে এমন সামর্থ্য ও বাগ্মিতার দ্বারা হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থন করেছেন যে, তা কেবল তাঁর ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভ্রম আকর্ষণ করেনি, তাঁর শিক্ষার বিষয়েও বিবেচনার মনোভাব সৃষ্টি করেছে।" [অ]

আর্নেস্ট জি ডে-র পত্র [ইন্ডিয়ান নেশন; ১৮৯৪, ৩১ জানুয়ারি]—

"আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ টেম্পল ইউনিভার্সাল বলে একটি প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ আর্নেস্ট জি ডে, এম-ডি তাঁব এখানকার জনৈক বন্ধুকে লিখেছেন, 'এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন ধর্মমতের সাহায্যে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি। ধর্মগুলি বিভিন্ন পথের মতো, গিয়ে পেঁছেছে একই লক্ষ্যে।' মিঃ ডে আরও লিখেছেন, 'স্বামীজী আমাদের কাছে উচ্চ সম্মানিত মানুষ। যথার্থ সত্যসন্ধানীরা তাঁর চতুর্দিকে সমবেত। পাশ্চাত্ত্যের উপরে তিনি বিরাট আলোকবর্ষণ করবেন; বহু মানুষকে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধ্রুবতর জ্ঞানে অভিষিক্ত করবেন এবং ঈশ্বরের সংগে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ ঘটিয়ে দেবেন।" [অ]

পবিত্র ক্রীসমাস দিবসে (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৫) আমেরিকার অনেক বিশিষ্ট মহিলা স্বামীজীর মাতাকে একটি চিঠি লেখেন। স্বাক্ষরকারিণীদের মধ্যে ছিলেন সারা সি বুল,

সারা জে ফারওয়ার, ফ্লোরেন্স জেমস অ্যাডামস্, মেরী পি ফোলেট, অ্যানী টি শ্যাপ্‌লে, মেরী ডবলিউ উইলসন, এমা সি থার্সবি, রুথ গিবসন্, এলিজাবেথ ডবলিউ বার্টলেট, ইসাবেল এল ব্রিগস্, মেরী এফ স্টডার্ড, মেরী পি রজার্স। এই মহিলাদের কেউ-কেউ কেবল আমেরিকায় নন, তার বাইরেও খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। এঁদের পত্রে ব্যঞ্জনায় যীশু ও বিবেকানন্দ একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। পত্রটি এই ঃ

"এই ক্রীসমাসের পবিত্র প্রহরে, যখন পৃথিবীর জন্য মেরী-পুত্রকে উপহারদানের উৎসব চলেছে, যার আনন্দোল্লাসের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়ে আছি—এই হল স্মরণের মহালগ্ন। আপনার সন্তানকে আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে, আপনাকে নমস্কার।

"আমাদের এখানকার পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য তাঁর সেবাকে সেদিন তিনি আপনারই শ্রীচরণে নিবেদন করেছিলেন 'ভারতীয় মাতৃত্ব' বিষয়ক একটি ভাষণের মধ্যে। তাঁর সে-কথা যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের পক্ষে তাঁর জননীর পূজা হবে পরম পবিত্র প্রেরণার এবং চিত্তোন্নয়নের কারণ।

"হে প্রিয় মহীয়সী নারী, আপনার পুত্রের মধ্যে প্রতিভাত আপনার জীবন ও সাধনার বিষয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি গ্রহণ করুন।

"আমাদের সশ্রদ্ধ হৃদয়ের ক্ষুদ্র স্মরণিকা আপনি গ্রহণ করুন। তার দ্বারা স্বীকৃত হোকঃ এই পৃথিবী, ঈশ্বরের যথার্থ উত্তরাধিকার যে-ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মানবতা, তাকে অঙ্গীকার করার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।" [অ] [মিরার; ১৮৯৫, ২৩ ফেব্রুয়ারি]

ব্রুকলিন স্ট্যান্ডার্ড [হিন্দু; ১৮৯৫, ২৩ ফেব্রুয়ারি]—

"প্রাচীন বৈদিক ঋষির কণ্ঠস্বর যেন শোনা গেল আবার, হিন্দুসন্ন্যাসী পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে, যখন গতকাল সন্ধ্যায় তিনি মধুময় ভাষায় প্রেম ও সহিষ্ণুতার কথা বলছিলেন, আর শত শত শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনছিল। ক্লিনটন অ্যাভিনিউয়ের পাউচ গ্যালারিতে ঐ সভা হয়েছিল, আহ্বান করেছিলেন ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটি। আমন্ত্রিত শ্রোতাদের দ্বারা বিরাট সভাগৃহ কানায়-কানায় ভর্তি হয়ে উপচে পড়েছিল।

"পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ধর্মদর্শন বৌদ্ধমতের প্রতিনিধি ও দূত হিসাবে যে-প্রাচ্যদেশীয় সন্ন্যাসী পাশ্চাত্তে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি এখানে [ব্রুকলিনে] পদার্পণ করার আগেই তাঁর খ্যাতি অগ্রিম পৌঁছে গিয়েছিল। তার ফলে সকল শ্রেণীর ও সকল বৃত্তির মানুষ—ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, বিচারক—মহিলাগণসহ শহরের সকল স্থান থেকে এসেছিলেন 'ভারতের ধর্মসমূহের' অপূর্ব সুন্দর বাণীময় পক্ষসমর্থন শুনতে। চিকাগো-ধর্মমহাসভায় তাঁকে তাঁরা দেখেছেন, কৃষ্ণ, ব্রহ্ম এবং বুদ্ধের উপাসকরূপে কথা বলতে। ঐ ধর্মমহাসভায় তিনিই ছিলেন পৌত্তলিক প্রতিনিধিদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত মানুষ। তাঁর বিষয়ে তাঁরা জেনেছেন ঃ এই দার্শনিক, ধর্মের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ঐহিক ভবিষ্যৎ ত্যাগ করেছেন; বহু বৎসরের একান্ত ধৈর্যশীল পাঠানুশীলনের দ্বারা পাশ্চাত্তের বিজ্ঞানময় সংস্কৃতি অধিগত করেছেন; এবং তাকে প্রোথিত করেছেন হিন্দুদের প্রাচীন ঐতিহ্যের রহস্যময় ভূমিতে। তাঁর বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও সরস বাকপটুতা, পবিত্রতা ঐকান্তিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার কথাও তাঁরা জেনেছিলেন। তাই তাঁরা বড়-কিছু আশা করেছিলেন।

"সে আশা ব্যর্থ হয়নি। 'স্বামী' অর্থাৎ প্রভু কিংবা রাব্বি কিংবা শিক্ষক বিবেকানন্দ তাঁর বিরাট খ্যাতির চেয়েও বিরাট। গতরাত্রে যখন তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন, পরনে উজ্জ্বল লোহিত চিত্রবৎ সুন্দর আলখাল্লা, বহু ভাঁজকরা কমলারঙের পাগড়ির তলায় দু'একটি ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, শ্যামল মুখে দ্যুতিময় চিন্তার অভিব্যক্তি, বিশাল বাঙ্ময় চক্ষু প্রফেটের উন্মাদনায় জ্যোতির্ময়, স্পন্দিত মুখ থেকে উৎসারিত গভীর সঙ্গীতময় স্বরে, প্রায় নিখুঁত ইংরাজিতে শোনালেন প্রেম সহানুভূতি আর সহিষ্ণুতার বাণী—তখন মনে হয়েছিল

তিনি সত্যই হিমালয়ের বিখ্যাত ঋষিগণের এক অপূর্ব নমুনা, সত্যই নবধর্মের প্রফেট, যিনি সম্মিলিত করেছেন খ্রীস্টীয় নৈতিকতার সঙ্গে বৌদ্ধদের দর্শনকে।" [অ]

হার্টফোর্ডস্ ডেইলি টাইমস্ [মিরার; ১৮৯৫, ১৯-২১ এপ্রিল]—

"গতকল্য রাত্রে বিবেকানন্দ অতি চমৎকার সভাগৃহে অভ্যর্থিত হয়েছেন। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই আনন্দিত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন কারণ দেশের এই অংশে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের ভাষণ সাধারণ ঘটনা নয়। ব্রাহ্মণেরা কদাচিৎ তাঁদের বাসভূমি ত্যাগ করেন। সমুদ্র পার হলে তাঁদের জাত যায়। কিন্তু বিবেকানন্দ খ্রীস্টানদেশে আসার জন্য সেই ঝুঁকি নিয়েছেন। তথাকথিত অনেক খ্রীস্টানের তুলনায় তার মতের সঙ্গে স্বয়ং যীশুখ্রীস্টের মতাদর্শের বেশি ঐক্য আছে। তাঁর উদার হৃদয় সকল ধর্ম ও সকল জাতিকে গ্রহণ করে। গতরাত্রে প্রদত্ত তাঁর সরল ভাষণ অত্যন্ত মনোহারী। তাঁর লালরঙের দীর্ঘ আলখাল্লা, হলুদ-রঙের পাগড়ি, প্রাচ্যদেশীয় রূপময় মুখমণ্ডল এক অপূর্ব চিত্রের মতো শ্রোতাদের নয়নকে যেমন মোহিত করে রেখেছিল, তেমনি তাদের শ্রবণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবময় বাক্যরাজিতে।" [অতঃপর বক্তৃতার সারাংশ এবং শ্রোতাদের সঙ্গে চিত্তাকর্ষক সংলাপের রিপোর্ট] [অ]

রাদারফোর্ড আমেরিকান [মিরার; ১৮৯৫, ৫ মে]—

"নিশ্চয় অসাধারণ আকর্ষণ! নচেৎ 'রিসার্চ ক্লাবে'র দুজন সদস্য গত রবিবার সন্ধ্যায় প্রচণ্ড উত্তর-বাতাসের আক্রমণ অগ্রাহ্য করে, জমাট বরফের উপর দিয়ে দীর্ঘ কষ্টের পথ অতিক্রম করে ব্রুকলিনে এসে হাজির হবেন কেন? আকর্ষণের হেতু হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বক্তৃতা শুনতেই আসা। চিকাগো-ধর্মমহাসভায় এই সন্ন্যাসীর উচ্চচিন্তা-পূর্ণ বাগ্মিতা কেবল সেইখানকার শ্রোতাদের উপরেই নয়, সমগ্র ধর্ম-পৃথিবীর উপরে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল।

"৩০ ডিসেম্বরের বক্তৃতা প্রদত্ত হয় ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে।...এটি ব্রুকলিনের সর্বোচ্চ মনীষা ও সামাজিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। বক্তার পরিচয় দেন ডাঃ লুইস জি জেনস। অপূর্ব চিত্রবৎ আকার নিয়ে তিনি বক্তৃতা করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ..তাঁর সুঠাম অঙ্গ, স্ফুরিত ওষ্ঠ; মুখনিঃসৃত বাণীতে সংস্কৃতির প্রবাহ। চক্ষু বৃহৎ এবং ঘনকৃষ্ণ, যখন অব্যস্ত তখন সে-চক্ষে প্রাচ্যের মন্থর মেদুরতা, কিন্তু যখনই উচ্চ ভাবনার সংক্রমণ ঘটে তৎক্ষণাৎ ঐকান্তিক মনঃশক্তির সঞ্চরমান আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বর মৃদু কোমল, তাতে আশ্চর্যজনক সঙ্গীতময় তরঙ্গতরলতা; উচ্চারণে ঈষৎ বিদেশী টান, আকর্ষণ তাতে বেড়েছে বই কমেনি। সব জড়িয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব এমন যে, স্মৃতি-পথে আনাগোনা করবে দীর্ঘকাল।" [অ]

ফ্রেনলজিক্যাল জার্নালে এডগার সি বীল, এম-ডি স্বামীজীর বিষয়ে দীর্ঘ একটি রচনা লেখেন। এই লেখাটি ভারতবর্ষের নানা পত্রপত্রিকায় সাদরে গৃহীত হয় (যথা, লাইট অব দি ইস্ট—সেপ্টেম্বর ১৮৯৫; থিয়জফিক থিংকার—৫ অক্টোবর ১৮৯৫; মিরার—৫ অক্টোবর, ১৮৯৫; অমৃতবাজার—ফেব্রুয়ারি ২০, ১৮৯৭ ইত্যাদি)। এর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নানা অঙ্গের বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছিল, তিনি কিভাবে 'দেহে মনে সুসমন্বিত' এবং 'আর্যজাতির উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি।' নানা টেকনিক্যাল শব্দে পূর্ণ লেখাটি অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন, প্রয়োজনও নেই, কিন্তু স্বামীজীর দৈহিক সৌন্দর্যের এই 'বৈজ্ঞানিক' বন্দনা ভারতবর্ষে যথেষ্ট ঔৎসুক্য ও উল্লাসের কারণ হয়েছিল বোঝা যায় একই প্রবন্ধের বহুল ব্যবহার থেকে।

নিউইয়র্ক হেরাল্ড [মাদ্রাজ মেল; ১৮৯৬, ১২ মার্চ]—

"নিউইয়র্ক সোসাইটির একাংশে, সম্পদে বা মনস্বিতায় অগ্রগণ্য মানুষেরা যার অন্তর্ভুক্ত, 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামটি এখন মোহমন্ত্রস্বরূপ। উক্ত নামের অধিকারী হলেন এক কৃষ্ণবর্ণ

ভারতীয়, যিনি গত ১২ মাস ধরে এই রাজধানী-শহরে প্রাচ্যের এক বিশেষ ধরনের ধর্ম-দর্শন প্রচার ও তার অনুশীলনের দ্বারা নাম-যশ অর্জন করেছেন। গত শীতে ফিফথ্ অ্যাভিনিউয়ের একটি সুপরিচিত হোটেলের রিসেপসন্-কক্ষ ছিল তাঁর প্রচারস্থান। নিজের পক্ষে এবং নিজ শিক্ষার পক্ষে উচ্চ সোসাইটিতে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর ইনি এখন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসতে ইচ্ছুক। সেই কারণে প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে হার্ডম্যান হলে বিনামূল্যে ধারাবাহিক বক্তৃতা করছেন।

"স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টা এমনই সাফল্যলাভ করেছে যে, মানুষটি সম্বন্ধে এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর কাজ সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া উচিত।

"স্বামী বিবেকানন্দ বিশুদ্ধ-রক্ত হিন্দু; বছর-তেত্রিশ আগে বাংলা প্রদেশে জন্ম; শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে তিনি ইংরাজি ভাষা স্বচ্ছন্দে অনর্গল বলতে শিখেছেন। নিজের প্রথমজীবন সম্বন্ধে তিনি কখনই কিছু বলেন না। কেবল সাধারণভাবে তাঁর মহান আচার্যের কথা বলেন, যাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মানুশীলনের পদ্ধতি তিনি এদেশে প্রবর্তন করতে সচেষ্ট। তাঁর পরবর্তী জীবনের মোটমাট কথাটা আমেরিকানদেরই বেশি জানা, কারণ তিনি চিকাগো-ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে আসেন তিন বছর আগে, এবং তারপর থেকে সারা যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন।

"স্বামীজীর ছবি থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। বর্ণ কৃষ্ণ, উচ্চতা সাধারণের চেয়ে বেশি, ভারি গড়ন। ভাবভঙ্গি নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক; এবং প্রচুর তাঁর ব্যক্তিত্বের চৌম্বকশক্তি। তাঁর ক্লাস শুনছেন এমন পুরুষ ও নারীদের গম্ভীর আকর্ষক মুখের দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায় যে, তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তুই কেবল শিষ্যদের আকর্ষণ করে আটকে রাখেনি।

"এদেশে বর্তমানে এই হিন্দু-মানুষটির কাজ হল—বিনা অর্থে বক্তৃতা করা, বিনা অর্থে ক্লাস করা, শিষ্যদের দীক্ষা দেওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে চিঠিতে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

[অতঃপর স্বামীজীর দুই শিষ্যের বিবরণ ঃ যাঁদের একজন, অভয়ানন্দ, আমেরিকায় নাগরিকতাপ্রাপ্ত বয়স্ক ফরাসি মহিলা, 'পঁচিশ বৎসরের উপর মেটিরিয়ালিস্ট সোস্যালিস্ট, কেউ-কেউ বলেন অ্যানার্কিস্ট', সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে মাদাম মারী লুই নামে খ্যাত, 'নির্ভীক, প্রগতিশীল, অগ্রসর মনুষ্য, দম্ভ করে বলেন, আমি সর্বদাই রণাঙ্গনে সম্মুখ-সারিতে থাকি এবং আমি কালের অগ্রবর্তিনী।' দ্বিতীয়জন রাশিয়ান ইহুদি, পূর্বনাম লিয়ন ল্যান্ডসবার্গ, সন্ন্যাসনাম কৃপানন্দ, নিউইয়র্কের একটি প্রধান সংবাদপত্রে চাকুরিয়া, 'মধ্যবয়সী, মাঝারি আকারের, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কোঁচকানো চুল, আর দুই চোখে একেবারে ফ্যানাটিকের জ্বলন্ত আগুন।' তারপর স্বামীজীর মতাদর্শের বিবরণ। তারপর—]

"সম্প্রতি যখন আমি স্বামীজীর একটি ক্লাসে হাজির হই, দেখি যে, সেখানে মননশীল মুখাকৃতিসম্পন্ন সুবেশ শ্রোতারা সমবেত। তাঁদের মধ্যে ডাক্তার, আইনজীবী, অন্যান্য পেশার লোক এবং সোসাইটি-মহিলারা আছেন। স্বামী বিবেকানন্দ গৈরিক পোষাক পরে কেন্দ্রে উপবিষ্ট।...

"বক্তৃতা বা ক্লাসের পরে স্বামীজী সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হলেন। তাঁর শ্রোতারা যেভাবে দ্রুত এগিয়ে এসে তাঁর করমর্দন করতে চাইলেন, কিংবা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন, তার দ্বারা তাঁর ব্যক্তিত্বের চৌম্বকশক্তির রূপ দেখা গেল। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি নিজের বিষয়ে কিছুই বলতে রাজি নন। তাঁর কোনো-কোনো শিষ্য যা বলে থাকেন, তার বিপরীত কথাই বললেন—তিনি এদেশে নিজস্বভাবে এসেছেন, কোনো হিন্দু-সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে নয়। তিনি বললেন, তিনি সন্ন্যাসী, সুতরাং ভ্রমণে তাঁর জাতিনাশ হয় না। তাঁকে যখন বলা হল, হিন্দুধর্ম

ধর্মান্তরিত করে না, তিনি তখন বললেন, পাশ্চাত্ত্যের জন্য তাঁর একটি বাণী আছে, যেমন প্রাচ্যের জন্য বুদ্ধের বাণী ছিল।" [অ]

নিউইয়র্ক হেরাল্ড [মিরার; ১৮৯৬, ৯ এপ্রিল]—

"নিঃসন্দেহে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভাবশালী অনুগামী সংগ্রহ করে ফেলেছেন। বহু খ্রীস্টান যাজক তাঁর বক্তৃতা শোনেন। বস্তুতঃপক্ষে ডাঃ রাইট কর্তৃক তিনি ডিক্সন সোসাইটিতে বক্তৃতা করতে আহূত হয়েছেন। তাঁর ছাত্রগণের কেউ-কেউ এই শহরে সুপরিচিত। স্বামীজীর আবাসে উপস্থিত যেসব ব্যক্তির নাম লিখিত আছে, তাঁদের মধ্যে আছেন ঃ এলা হুইলার উইলকক্স, মিঃ ও মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট, মাদাম আঁতোয়া স্টার্লিং, ডাঃ অ্যালান ডে, মিস এমা থার্সবি, এবং অধ্যাপক ওয়াইম্যান। মিসেস ওলি বুলও তাঁর শিষ্যা। হারভার্ড গ্রাজুয়েট ফিলজফিক্যাল ক্লাবে বক্তৃতা করার জন্য তিনি মিঃ জন পি ফক্সের কাছ থেকে সদ্য নিমন্ত্রণ পেয়েছেন।" [অ]

ডেট্রইট ইভনিং নিউজ [বেঙ্গলী; ১৮৯৬, ২৫ এপ্রিল]—

"স্বামী বিবেকানন্দ এখানে দু'সপ্তাহ থাকবেন।...ক্লাস নেবেন বিনা অর্থে, কারণ ধর্ম-শিক্ষা ডলারে বেচা যায় না। গত তিন মাসে নিউইয়র্কে তাঁর বিরাট সাফল্য ঘটেছে, তাঁর ক্লাসে প্রভূত লোকসমাগম ঘটেছে এবং অনেকে তাঁর মতগ্রহণ করেছেন। এখান থেকে বস্টনে যাবেন এবং হারভার্ডের দর্শনের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা করবেন। তারপর এক সপ্তাহ চিকাগোয় কাটিয়ে যাবেন ইংলন্ডে, যেখানে লেডি ডার্ডাল এবং অনেকে দীর্ঘদিন তাঁর বিষয়ে আগ্রহী। সেখানে গ্রীষ্মকাল কাটাবার পরে ভারতে ফিরবেন এবং ধ্যান ও আত্মচিন্তার জন্য দুই-তিন বৎসরের জন্য গুহাবাস করবেন, যেমন করে থাকেন ধার্মিক সন্ন্যাসীরা।" [অ]

বস্টন ইভনিং ট্রানসক্রিপ্ট [ব্রহ্মবাদিন; ১৮৯৬, ১৫ মে]—

"স্বামী বিবেকানন্দ নিয়মিতভাবে নিউইয়র্কে ক্লাস-বক্তৃতা করে অতীব মূল্যবান এবং সাফল্যময় কাজ করছেন গত দুই শীতের সময়ে। তাঁর অনুরাগী শ্রোতা ক্রমবর্ধমান। বস্টনে তিনি শুভ লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ['সন্ন্যাসী' শব্দের ও সন্ন্যাসজীবনের যে-তাৎপর্য স্বামীজী ব্যাখ্যা করেন, তা উপস্থিত করার পরে—] স্বামীজী স্বয়ং যে-শিক্ষা দিচ্ছেন, তার বিষয়ে বলেন, 'আমার গুরুর (একজন বিখ্যাত হিন্দু-সাধু) কাছ থেকে প্রাপ্ত আলোকের সাহায্যে প্রাচীন গ্রন্থকে আমি ব্যাখ্যা করেছি। কোনো অতিপ্রাকৃত অধিকারের দাবি নেই আমার। আমার প্রদত্ত শিক্ষার যে-অংশ সর্বোচ্চ মনস্বিতার কাছে আবেদন জানিয়ে শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মানুষদের আগ্রহী করে তুলবে, এবং তাকে তাঁরা যে-পরিমাণে গ্রহণ করবেন, আমি সেই অংশে নিজেকে পুরস্কৃত বোধ করব। সকল ধর্মেরই উদ্দেশ্য, ভক্তি কর্ম অথবা জ্ঞানমার্গের শিক্ষা দেওয়া। বেদান্তদর্শন হল বিমূর্ত বিজ্ঞানসত্য, যা এই সকল পদ্ধতিকেই স্বীকার করে, আর আমি সেই জিনিসই শিক্ষা দিই, প্রত্যেকে যাতে তাকে নিজস্ব-ভাবে গৃহীত নির্দিষ্ট পথে প্রয়োগ করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি নিজ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে বলি। যেসব বইয়ের উল্লেখ করি, সেগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব এবং প্রত্যেকে নিজেরাই সেগুলি পড়ে নিতে পারেন।' স্বামীজী কোনো গুপ্ত শিক্ষাদাতার কথা বলেন না, কোনো গুপ্ত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি থেকে শিক্ষালাভের কথা তো নয়ই। [ধর্মের] গুপ্ত সমিতির কাছ থেকে কোনো মঙ্গল আসতে পারে তিনি মনে করেন না। 'সত্য নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে।'" [অ]

বস্টন ট্রানস্‌ক্রিপ্ট [মাদ্রাজ মেল; ১৮৯৬, ২৭ মে]—

"স্বামী বিবেকানন্দ গত কয়েকদিন ধরে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বক্তৃতাদি করছেন।...

"যে-প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ তিন বছর আগে আমেরিকায় এসেছেন...ধর্মমহাসভার তাই ছিল মূলগত নীতি।...তাকে কার্যকর করার নিজস্ব পদ্ধতি তিনি নিয়েছেন। গত

সপ্তাহের একটি বক্তৃতার বিষয়বস্তু, 'সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ।'...স্বামীজী নিছক তত্ত্ব-প্রচারক নন। তাঁর প্রচারিত বেদান্তদর্শনের যদি কোনো দিক ঐ তত্ত্বের মতোই প্রাণোদ্দীপক হয়, তা হল—তার বাস্তব প্রয়োগের দিক। এতদিন শুনে-শুনে আমাদের মনে এই কথা সাতপাকে বাঁধা হয়ে গেছে—ধর্ম সুমহান তত্ত্ববিশেষ, তার বাস্তব প্রয়োগ পরজীবনেই কেবল সম্ভব। স্বামীজী এই ধারণার ভ্রান্তি দেখিয়ে দিয়েছেন। মানবের দেবত্বের কথা প্রচার করার সময়ে তিনি আমাদের মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চারিত করে দেন যে, চরম পরমের সঙ্গে এই জীবনের ব্যবধান-প্রাকার ভেঙে যায়, সাধারণ মানুষের কাছে যা চিরদিনই দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয়। [অতঃপর কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগমার্গ সম্বন্ধে স্বামীজীর উচ্চাঙ্গের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করা হয় এবং হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কথিত স্বামীজীর বক্তব্যও অংশে উদ্ধৃত হয়।] [অ]

আমেরিকার সমাজজীবনে সুপরিচিত কয়েকজন মানুষ আলমবাজার মঠে রামকৃষ্ণানন্দের কাছে একটি পত্র পাঠান, স্বামীজীর কার্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন, ফ্রান্সেস গুডইয়ার, এথেল ই হাউ, মেরী বি স্মিথ, ফ্লাউয়েন্স দা লা ভিনসেন, মড রি লি ভিনসেন, এডিথ সোয়ানডার, রুথ এলিস, এল এল ওয়াইট, মেরী ফিলিপস, এলেন ওয়াল্‌ডো, ওয়ালটার গুডইয়ার, কার্ল লি ভিনসেন, হের্নার ভন হ্যাগান, জে ই সুইটলারলিন, এলিজাবেথ অ্যানী ওয়াইম্যান, ডাঃ জন সি ওয়াইম্যান, অ্যানী এ হাইনস্, এডমন্ড এল ডে, এম-ডি, এবং আরো অনেকে। হিন্দু পত্রিকায় ১৮৯৬, ৬ জুলাই তারিখে প্রকাশিত ঐ চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা হয়েছিল ঃ

"আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের দেশ এবং আমাদের দেশ শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে—তা ঘটিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

"তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত বেদান্তের মহান সত্যসমূহ সর্বশ্রেণীর চিন্তাশীল মানুষকে আকৃষ্ট করেছে এবং তাঁর কথা শুনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁদের অনেকেই অবিলম্বে ব্যগ্র হয়ে উক্ত সত্যকে গ্রহণ করেছেন।...

"[স্বামীজী আসার আগে] আমরা জানতেই পারিনি, বহু দূরে অবস্থিত বহুপ্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে আমাদের মতো তরুণতম জাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল ঐ পরিমাণে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।"

১৮৯৬, ৬ জুনের ব্রহ্মবাদিন আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে যে-সংবাদ সংকলন করে প্রকাশ করে (যেটি মিরারেও বেরিয়েছিল) তার মধ্যে 'মহামহিমান্বিত' বিবেকানন্দের বিস্ময়কর প্রচারসাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আলমবাজার-মঠ থেকে স্বামী সারদানন্দকে পাঠানো হচ্ছে, এই সংবাদ ছিল। 'আমেরিকার অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তি স্বামীজীর বেদ-শিক্ষা গ্রহণ করেছেন' এই কথা জানানোর পরে 'রাজধানীর মহিলাগণের নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক সংস্থার অগ্রণী কর্মী, মিস মেরী ফিলিসপ্ কিভাবে স্বামীজীর ভাবপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন, তার বিবরণ ছিল। মিস ফিলিপস্ বলেছিলেনঃ 'অনেক খ্রীস্টই এ-পর্যন্ত আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই বেদোক্ত ধর্মাদর্শের প্রতিনিধি। কলভিন, লুথার, মহম্মদ, সোয়েডেনবার্গ এবং ধর্মীয় ইতিহাসের স্রষ্টাগণ একই নীতির উপরে তাঁদের মত স্থাপন করেছেন। সুতরাং সেই মূলগত সত্যের অনুশীলনের দ্বারা আমরা নাজারেথের যীশুর ধর্মকে অধিক বুঝতে সমর্থ হব।' এই কথাই বলেছিলেন ডাঃ জেনস, মিঃ গুডইয়ার প্রভৃতিরা বিরোধী সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে ঃ 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্মকে ত্যাগ করছি না, নাজারেথের যীশুকেও নয়। আমরা সকল ধর্মের মূলসন্ধান করছি। যে-কোনো উপায়ে বা আকারে উপাসনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের রয়ে গেছে।"

হেলেন হাণ্টিংটন ব্রুকলিন থেকে যে-পত্র লেখেন, (মিরারে ১৮৯৭, ৭ মে প্রকাশিত),

মাদ্রাজ টাইমসের মতো সাহেবী পত্রিকা সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখেছিল যার উপরে, বলেছিল, ঐ চিঠি থেকে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক চরিত্র আমেরিকায় কি গভীর প্রভাববিস্তার করেছে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে--সেই পত্রের কিছু অংশ ঃ

"খ্রীস্টান সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক এবং গোঁড়া গির্জাসমূহে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে আমরা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম—'ভারতের হতভাগ্য হীদেনদের মধ্যে আমাদের মিশনারি কার্যাবলী' ইত্যাদি, এবং ভারত সম্বন্ধে ধারণা করে নিয়েছিলাম —সে এমন এক দেশ যেখানে ধর্মহীনতার নিবিড়তম অন্ধকার, যা কেবল মাঝে-মাঝে ছিন্ন হয় আমাদের গস্‌পেলের কিরণরেখার দ্বারা। সহস্র-সহস্র মোটামুটি উত্তম শিক্ষিত, সভ্য মানুষ প্রতি রবিবার আতঙ্ক এবং দুঃখপূর্ণ বেদনার সঙ্গে আমাদের গোঁড়া পাদরিদের মুখে শুনেছে—নিপাত গেছে, নিপাত গেছে একেবারে চিরদিনের জন্য ঐ কোটি-কোটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হীদেনগুলো, কারণ ওরা কখনো খ্রীস্টের কথা পাদরির মুখে প্রচারিত হতে শোনেনি।...

"কিন্তু ঈশ্বর করুণাময়। তিনি ঐ ভারত থেকেই একজন অধ্যাত্মপথ-নির্দেশক আচার্যকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন, যাঁর সুমহান দর্শন ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমাদের দেশের নীতিবাদী আবহাওয়াকে ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করছে। ঐ মানুষটির অসাধারণ শক্তি এবং পবিত্রতা। তিনি অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক জগতকে আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন, এনে দিয়েছেন সর্বজনীন অসংকুচিত করুণার ধর্মকে, আত্মত্যাগকে, মানববুদ্ধির পক্ষে সর্বোচ্চসম্ভব শুদ্ধতম অনুভূতিকে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ধর্ম আমাদের কাছে প্রচার করেছেন, যা মত ও পথের বন্ধনকে স্বীকার করে না, যা উন্নীত করে, পবিত্র করে, অনন্ত আশ্বাসে পূর্ণ করে হৃদয়, নিন্দা করে না একেবারে। তাঁর ধর্ম মানব ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের দ্বারা গঠিত এবং পূর্ণ চারিত্রিক শুদ্ধির উপরে নির্ভরশীল। তাঁর শিক্ষাকে গ্রহণ করে আমরা খ্রীস্টধর্মকে খন্ডন করছি না (অনেকে মনে করেন, আমরা তা করতে বাধ্য, এবং সেইকারণে বেদান্তকে তাঁরা অভিশাপ দিতে প্রস্তুত), আমরা কেবল পুরাতন কুসংস্কার এবং মতের বেড়া ভেঙে ফেলতে চাইছি, যেগুলির দ্বারা অজ্ঞ মানুষেরা ঈশ্বরের অনির্বচনীয় সান্নিধ্য থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে।...

"স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামী-গোষ্ঠীর বাইরেও বহু বন্ধু করেছেন। সমাজের সকল স্তরের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের শর্তে মিলিত হয়েছেন। আমাদের শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ মনস্বী ব্যক্তি, সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল চিন্তার মানুষেরা তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, ক্লাসে যোগদান করেছেন; এবং তাঁর প্রভাব ইতিমধ্যেই প্রবল গভীর অন্তঃস্রোতপূর্ণ আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছে। নিন্দা বা প্রশংসা তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, অনুমোদন বা আপত্তি কোনো কিছুই নয়। সম্পদ বা সম্মান তাঁকে প্রভাবিত বা পক্ষপাতী করতে পারেনি। অনুচিত তোষণের সামনে তিনি সন্ন্যাসীসুলভ ঔদাসীন্য রক্ষা করেন, যা নির্বোধ আতিশয্যকে প্রশমিত করে, আর দেখা যায় তাঁর অনিবার্য প্রভাবশালী মর্যাদাকে। অন্যায়কারী বা অসৎ চিন্তাকারী ভিন্ন কাউকে ধিক্কার দেন না, তুলে ধরেন কেবলই পবিত্রতা ও সৎ জীবনের মহিমাকে। সর্বাংশে তিনি সেই মানুষ যাঁকে 'নমস্কার করতে পেরে ধন্য হয় রাজকুল।'"

॥ ৩ ॥

ভারতীয় সংবাদপত্র থেকে এই যে-সব বিবরণ উপস্থিত করলাম, এগুলি যে যৎসামান্য, তা সর্বদাই আমি মনে রেখেছি। বিপুল পরিমাণে সংকলিত সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্র

প্রকাশ করেছিল, তার অল্পমাত্রই এখানে পরিবেশন করা সম্ভব। এবং আমরা নিশ্চয় সকল সংবাদের সন্ধানও পাইনি। তাছাড়া আরও অসন্তোষের কারণ এই—আমরা স্বামীজীর বর্ণনাই প্রধানতঃ তুলেছি, কিন্তু তাঁর অসাধারণ বক্তব্যকে প্রায় তুলিনি, যদিও একথা সত্য, 'তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের তুলনায় বাণীর সৌন্দর্য অল্প ছিল না, বরং বেশি।' পাঠকদের আরও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভারতীয় সংবাদপত্রে আমেরিকায় প্রকাশিত সংবাদের কতটুকুই বা বেরিয়েছিল! লুই বার্কের গবেষণা-ভিন্ন আমরা আমেরিকায় বিবেকানন্দ-সংবাদের পরিমাণের আভাসই পেতাম না। অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখেও বহু পৃষ্ঠা লাগবে। তথাপি একটি-দুটি জানাতেই হয়, যেমন স্বামীজী ধর্মমহাসভায় দাঁড়াবার আগেই তাঁর বিষয়ে মিসেস রাইট লেখেন, "অপূর্ব জমকালো দৃশ্য—তিনি। মাথা খাড়া রাখার অপূর্ব ভঙ্গি প্রাচ্যরীতিতে অসাধারণ সুদর্শন, বয়সে ত্রিশ, সভ্যতায় সুপ্রাচীন।" মিসেস হেল লেখেন, "মহান গরীয়ান সেই আত্মা, ঈশ্বরপ্রেমে কানায়-কানায় পূর্ণ, দিব্য আলোকে উদ্‌ভাসিত আনন। তাঁর বাণীতে যজ্ঞাগ্নি, তাঁর অবস্থিতিতে সৌষম্য ও পবিত্রতার পরিবেশ।"

নানা সংবাদপত্র থেকে আমরা জেনেছি :

"এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তির ১৫ মিনিটের বক্তৃতার জন্য হাজার হাজার মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে।"—[**নর্দাম্পটন ডেইলি হেরাল্ড**; ১১।৪।১৮৯৪]। "অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মানুষ; প্রভূত গভীর দর্শন এবং উৎকৃষ্ট ধর্ম তাঁর; প্যাগান হলেও খ্রীস্টানরা তাঁর অনেক শিক্ষা অনুসরণ করতে পারেন; তাঁর মত আকাশের মতোই বিশাল।"—[**উইসকনসিন স্টেট জার্নাল**; ২১।১১।৯৩]। "স্বামী বিবেকানন্দের প্রদীপ্ত মনস্বিতা ধর্মমহাসভায় তাঁকে অন্যতম প্রধান প্রিয়চরিত্র করেছিল, ডেস মইনস্-এ তাঁর বক্তৃতাগুলি সম্বন্ধে বলা যায় যুগসৃষ্টিকারী।"—[**ডেস মইনস্ নিউজ**; ২৮. ১১. ৯৩]। "দুর্ভাগ্য তার, যে এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর নিজ ভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে চায়।...তাঁর উত্তরগুলো ঝলসে ওঠে বিদ্যুতের মতো। ফলে দুঃসাহসিক প্রশ্নকর্তা নির্ঘাত ভারতীয় মানুষটির উজ্জ্বল ধারালো বুদ্ধির বর্শায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তাঁর মনের ক্রিয়াশক্তি এমনই সূক্ষ্ম ও দীপ্তিমান, এমনই সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত যে, তা কখনো-কখনো শ্রোতাদের ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু সর্বদাই তার অনুধাবনে অত্যন্ত আনন্দলাভ সম্ভব।"—[**আওয়া স্টেট রেজিস্ট্রার**]। "ধর্মমহাসভার মহৎ মূল্য এইখানে—উপস্থিত মানুষেরা একটি মানুষকে জানবার সুযোগ পেয়েছিল। একটি লোকই ওখানে ছিলেন—আধ্যাত্মিকতার প্রতি-মূর্তি। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আমি জানি না। কিন্তু খ্রীস্টানের মতোই তাঁর চিন্তা, কর্ম এবং কথা। তোমরা বলো, তিনি খ্রীস্টান নন। ভালই। তোমরা বলো, তিনি বৌদ্ধ। [স্বামীজীকে অনেকেই বৌদ্ধ মনে করতেন।] আরো ভালো। যদি তোমরা তাঁর থেকে উচ্চতর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে তাঁর থেকে আরো বড় হতে চেষ্টা করো না কেন?" —[রাশিয়ার প্রতিনিধি প্রিন্স উলকনস্কির উক্তি : **সেণ্ট লুইস রিপাবলিক**; ৩১।১০।৯৪] "বিবেকানন্দের চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব। বর্ণ কৃষ্ণ, তথাপি তাঁর মনীষাদীপ্ত ললাট, বৃহৎ সুন্দর চক্ষু, কৃষ্ণ কেশ, স্বচ্ছন্দ কমনীয় আচরণ এবং সুগঠিত অবয়ব ও উন্নত ভঙ্গির জন্য তিনি যথার্থ সুপরুষ।"— [**মেমফিস্ কমার্শিয়াল**; ১৩।১।৯৪]। "তাঁর সংস্কৃতি, বাগ্মিতা, যাদুকারী ব্যক্তিত্ব এই দেশে হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে নূতন ধারণার সূচনা করে দিয়েছে। অত্যন্ত আকর্ষক মানুষ। মনোরম, বুদ্ধি-প্রভাযুক্ত, প্রাণস্পন্দিত তাঁর মুখ হলুদবর্ণের পটভূমিকায় স্থাপিত, এবং তাঁর গভীর সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর অবিলম্বে অপরকে আকর্ষণ করে পক্ষপাতী করে ফেলে।"—[**অ্যাপীল অ্যাভালেঞ্চ**; ১৪।১।৯৪]। "স্বামী বিবেকানন্দ ...এই দেশের মঞ্চে এ-পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছেন, এমন ধর্মবিষয়ক বা অন্য বিষয়ক

শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের অন্যতম। তাঁর অতুলনীয় বাচনভঙ্গি, অধ্যাত্মরহস্যের মধ্যে প্রবেশসামর্থ্য, তর্ককালে বুদ্ধিকৌশল, এবং তাঁর পরম ঐকান্তিকতা ধর্মমহাসভায় উপস্থিত পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষদের নিবিড়তম মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, এবং তা অনুরাগপূর্ণ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে সহস্র-সহস্র মানুষের, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের বহু রাজ্যে বক্তৃতা-সফরের সময়ে তাঁর ভাষণ শুনবার সুযোগ পেয়েছেন। কথোপকথনকালে অতি অমায়িক ভদ্রলোক তিনি। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলি ইংরাজি ভাষায় রত্নতুল্য। এমনই তাঁর অভ্যস্ত আচার-আচরণ যে, পাশ্চাত্তাজগতের সেরা বিদগ্ধ ব্যক্তির আদবকায়দার সমস্তরের তা। সঙ্গী হিসাবে প্রাণ-মনোহারী। পাশ্চাত্ত্যজগতের সেরা শহরের ড্রইংরুমেও এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যিনি বাক্‌পটুতায় তাঁকে অতিক্রম করতে সমর্থ। ইংরেজি কেবল সুস্পষ্টভাবে নয় স্বচ্ছন্দ গতিতে বলে যান। এবং তাঁর ভাবরাজি, যেমন নূতন তেমনি দ্যুতিময়। সে ভাব নির্গত হয়—বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো অলংকৃত বাক্যপ্রবাহে।...ঈশ্বরের সমুচ্চ কল্পনার সৃষ্টি অপূর্ব রহস্যময়ী প্রকৃতির নিবিড় পর্যবেক্ষক তিনি; প্রাচ্যের উচ্চতর বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকরূপে বহু বৎসর কাটিয়ে যে-জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন, তার দ্বারা বর্তমান যুগের একজন সর্বাধিক চিন্তাশীল পণ্ডিত হবার গৌরব অর্জন করেছেন। ধর্মমহাসভায় তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রারম্ভিক ভাষণটি তাঁকে তৎক্ষণাৎ সেই ধর্মজ্ঞানীদের সভায় নেতৃত্ব দান করেছিল। অধিবেশন চলাকালে নিজ ধর্মের সমর্থনে প্রায়শঃ তাঁকে বলতে শোনা গেছে। মানুষ, মানুষের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি কোন্ উচ্চতর কর্তব্যে আবদ্ধ, তা চিত্রিত করবার কালে ইংরাজি ভাষা অলংকৃত হয়েছে এমন কতকগুলি অপরূপ দর্শনমাণিক্য তাঁর মুখাগ্র থেকে স্খলিত হয়েছে। শিল্পী তিনি চিন্তায়, আদর্শবাদী তিনি বিশ্বাসে, এবং নাট্যকার তিনি মঞ্চে।"—[ঐ; ১৫।১।৯৪] "বিখ্যাত এই প্রাচ্যদেশীয় মানুষটিকে উদার করতালিতে অভিনন্দিত করা হয়। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা শোনা হয়। মানুষটির পরম সুন্দর শারীরিক ব্যক্তিত্ব, অতি সুগঠিত, ভারসাম্যযুক্ত ব্রোঞ্জমূর্তির আকার।...তাঁর সমগ্র বক্তৃতা এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নয় কিন্তু তার মধ্যে ছিল ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য উচ্চাঙ্গের আবেদন এবং অনবদ্য এক বিশ্বাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বাণীময় সমর্থন। বিশেষতঃ সুন্দর ছিল তার ভাষণের সমাপ্তির অংশ যেখানে তিনি বললেন, আমি খ্রীস্টকে গ্রহণে সর্বদাই প্রস্তুত কিন্তু তোমাদেরও উচিত কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে গ্রহণ করা।"—[**মেমফিস্ কমার্শিয়াল**; ১৭।১।৯৪]। "শ্রোতাদের... মধ্যে ছিলেন শহরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও সঙ্গীত-প্রতিভারা, আইনজগতের দিকপালেরা, এবং শিল্পপতিরা। বক্তার সঙ্গে অনেক আমেরিকান বক্তার পার্থক্য আছে। গণিতের অধ্যাপক তাঁর ছাত্রদের কাছে যে-বিচক্ষণতার সঙ্গে বীজগণিতের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন, ইনিও সেই ভাবে তাঁর যুক্তি উপস্থিত করেন। সর্বপ্রকার প্রতিবাদের বিরুদ্ধে নিজ ঘাঁটি রক্ষা করার ব্যাপারে নিজ শক্তিসামর্থ্যে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস। এমন কোনো বিষয় তিনি বলেন না, বা এমন কোনো দাবি তিনি করেন না, যাকে যুক্তিসঙ্গত সমাধানে নিয়ে যেতে না পারবেন।...তিনি বিশ্বাস করেন না মন অমর, কারণ মন পরাধীন; যা অপর সমস্ত-কিছু থেকে স্বাধীন নয়, তা কখনো অমর হতে পারে না। তিনি বলেন, ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে কোনো এক সিংহাসনে বসে থেকে মানুষকে তার পার্থিব সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি দেন—একথা সত্য নয়। এমন একদিন আসবে যখন মানুষ সত্যকে জেনে দাঁড়িয়ে উঠে বলবে, আমিই ঈশ্বর; আমিই তাঁর প্রাণের প্রাণ। কেন শিক্ষা দাও যে, ঈশ্বর দূরে সরে আছেন, যখন আমাদের সত্যস্বরূপ হল ঈশ্বর। আদিম পাপের শিক্ষা দেয় তোমাদের যে-ধর্ম, তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ো না, কারণ সেই একই ধর্ম আদিম পবিত্রতার কথাও বলে। যখন আদম পতিত হয়েছিলেন—তিনি পবিত্রতা থেকেই পতিত হয়েছিলেন। পবিত্রতাই আমাদের স্বরূপ—তাকে ফিরে পাওয়াই সকল ধর্মের লক্ষ্য।"—[**অ্যাপীল-অ্যাভালেঞ্চ**;

১৮।১।৯৪]। "কথাবার্তাকালে [বিবে]কানন্দ অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আচরণে নম্র এই মানুষটি আত্মসংকুচিত হয়েই থাকেন, যদি না তাঁর দেশের ধর্ম, জনগণ বা তাঁর কর্মোদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তাঁকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। তখন তিনি দৃঢ়, তাই বলে উগ্র নন। হয়ত কখনো-কখনো, যখন তিনি পাশ্চাত্যের রীতি-নীতির সঙ্গে নিজ দেশের রীতি-নীতির তুলনা করেন, তখন কথায় ঈষৎ ব্যঙ্গের আমেজ থাকে, তাকে আভাসেই বুঝতে হয়, কারণ তিনি স্বভাবে ভদ্রলোক, শিক্ষায় বিদ্বান এবং জীবনাদর্শে সন্ন্যাসী বলে সর্বদাই শালীন, কদাপি অধীর নন।...কানন্দ [প্রশ্নোত্তরকালে] রীতিমত কূটনৈতিক। যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সদা প্রস্তুত থাকলেও কখনো যদি কোনো বিষয়ের খুঁটিনাটি আলোচনাকে অযোগ্য মনে করেন, তাহলে তিনি প্রশ্নকর্তাকে হাসিয়ে এমনভাবে আমোদিত করে দেন যে, সে ব্যক্তি ক্ষুণ্ণ হন না, আবার তিনি নিজেও ধরা দিয়ে ফেলেন না। কেবল স্বদেশের নয়, সারা পৃথিবীর ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সাহিত্যে তাঁর সবিশেষ অধিকার; তার দ্বারা ঘটনাচক্রে যে-অবস্থাতেই তিনি পড়ুন না কেন, নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ। তাঁর ব্যবহার ও কথাবার্তায় সর্বদাই এক ধরনের শিশু-সরলতা থাকে, যা অপরের প্রীতি আকর্ষণ করে, এবং মানুষটি কথা শুরু করার আগেই তাঁর ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে যায়।" —[ঐ; ২১।১।৯৪]। "এই বক্তৃতার আয়োজন করেছেন কর্নেল ব্রিংকলে ও কয়েকজন ভদ্রলোক, যাঁরা প্রাচ্যদেশীয় বাগ্মীপ্রবরের বক্তৃতা শুনে ও তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় এমনই মোহিত হন যে, স্থির করেন, এই শহরের লোকজনের তাঁর কথা শুনবার সুযোগ পাওয়া দরকার। স্বামী বিবেকানন্দকে প্রকাশ্যে বা ঘরোয়াভাবে এখানে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে এবং তিনি শিক্ষিত মহলে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের বিষয়-পরিধি এমনই ব্যাপক, এবং তাঁর জ্ঞান এমনই সর্বাত্মক যে, এমনকি বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্বের বিশেষজ্ঞরাও তাঁর উক্তি থেকে শিক্ষা নেন এবং তাঁর সান্নিধ্য থেকে ভাবগ্রহণ করেন।"— [**মেমফিস্ কমার্শিয়াল**; ২১।১।৯৪]। "সামাজিক আকর্ষণের চূড়ামণি স্বামী বিবেকানন্দ এখন মিসেস জন জে বাগ্‌লির গ্রাণ্ড সার্কাস পার্কের বাড়িতে অতিথি। গতরাত্রে তাঁর জন্য আয়োজিত সংবর্ধনা-অনুষ্ঠান ডেট্রইটে এই মরশুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।...মিসেস বাগ্‌লি সংবর্ধনাসভায় সর্ব ধর্ম ও সর্ব মতের চিন্তাশীল মানুষদের সমবেত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সফল। মার্জিত হিন্দুসন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গত সন্ধ্যায় [মিসেস বাগলির আবাসে] বিশিষ্ট ডেট্রইটবাসীদের যে-সমাবেশ হয়েছিল, সে-রকম ব্যাপার বহু বৎসর এখানে ঘটেনি, এমনকি কখনো ঘটেছে কিনা সন্দেহ।"—[**ডেট্রইট জার্নাল**; ১৪।২।৯৪]। "বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মীরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছিলেন; কোনো চিরকুট হাতে না রেখেও নিখুঁত ইংরেজিতে ভাষণ দিয়েছিলেন। এবং তাঁর অনেক শ্রোতা এই মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর মহনীয় উচ্চারণের একটি কথাও যদি কেউ না বুঝতে পারে, তবু সে জানবে, সে শুনছে এক গরীয়ান সঙ্গীত।" —[**ডেট্রইট ফ্রি প্রেস**]। "স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব বাগ্মিতা এবং সুগভীর আধ্যাত্মিকতা তাঁকে সমবেত পণ্ডিতগণের মধ্যে অনন্য-সাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত করেছিল।...বিচিত্র শোনালেও সত্য, এই ভারতীয় ধর্মবেত্তা উইণ্ডি শহরে অনেককে ধর্মান্তরিত করেছেন এবং তিনি বহুপ্রকারে পূজা পেয়েছেন।...মধ্যম আকারের মানুষ তিনি, স্বজাতিসুলভ কৃষ্ণবর্ণ, ব্যবহারে অতি ভদ্র, পদক্ষেপে সুনির্দিষ্ট এবং কথাবার্তা ও হাবভাবে অতীব শালীন। তাঁর চেহারার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় তাঁর চোখ—অপূর্ব।...কণ্ঠস্বর আনন্দদায়কভাবে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন এবং উত্তম নিয়ন্ত্রিত।"—ঐ]। "তিনি মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন! রাজকীয়, মহিমান্বিত আকার, তেজ-পূর্ণ, প্রভাবশালী, শক্তিশালী! অপূর্ব কণ্ঠের প্রথম শব্দ ধ্বনিত হল। আ-হা, অপূর্ব কণ্ঠ,

সঙ্গীত শুধু সঙ্গীত, বুঝি এখন ইয়োলিয়ান বীণার মৃদু বিষণ্ণ সুর, তারপরেই স্পন্দিত ধ্বনিতরঙ্গ—আ-হা! চুপ, চারিদিকে গহন নীরবতা, সে এমন নিথরতা যাকে বুঝি স্পর্শ করা যায়, বিশাল জনমণ্ডলীর বুক উঠছে পড়ছে কেবল একটি শ্বাসে।"—[**মেরী ফাঙ্কের এইকালীন স্মৃতি**]। "গতরাত্রের বক্তৃতা পূর্ববর্তী বক্তৃতার তুলনায় কম বর্ণনাত্মক ছিল, এবং প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বিবেকানন্দ মানবিক ও ঐশ্বরিক বিষয়ের উপরে এমন দার্শনিক বয়নকার্য করলেন, এবং তাঁর বক্তব্য এমনই যুক্তিপূর্ণ ছিল যে, বিজ্ঞানকেও তিনি সাধারণ-জ্ঞান করে তুললেন। অত্যন্ত সুন্দর যুক্তির বুনন, তাতে এত উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ যে, মুগ্ধ মনে সে-দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, ঠিক যেন তাঁর স্বদেশের বহুবর্ণালঙ্কৃত হস্তনির্মিত একখানি সূচীশিল্প, প্রাচ্যের সম্মোহক সুগন্ধিতে সিঞ্চিত। শিল্পী যেমন রঙ ব্যবহার করেন, তেমনি এই শ্যামবর্ণ ভদ্রলোক কাব্যিক চিত্রকল্প প্রয়োগ করেন, বর্ণসংস্থান যথাস্থানে, ফলে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় মনে, কিন্তু তা অদ্ভুত মোহজনক একই সঙ্গে। রঙিন কাঁচের বীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখলে যেমন বহুল বর্ণবিচ্ছুরণ দেখা যায়, তেমনি ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হয় তাঁর যুক্তিগত সিদ্ধান্তগুলি, আর উক্ত যন্ত্রের এই নিপুণ প্রয়োগকর্তা তাঁর পরিশ্রমের পুরস্কার মাঝে-মাঝেই পেয়ে যান অতীব উৎসাহপূর্ণ করতালিতে।"—[**ফ্রি প্রেস**; ১৮।২।৯৪]। "এই হীদেন যে-ধরনের সুচারু ইংরেজি বলেন, তেমন সচরাচর শোনা যায় না আমাদের সাধারণ বক্তৃতামঞ্চে বা গির্জার বক্তৃতামঞ্চে, এবং তাঁর বর্ণনীয় বিষয়কে তিনি যেরকম মার্জিত বাক্‌নৈপুণ্য ও রসিকতায় সুশোভন করে রাখেন, সে বস্তুর কোনো তুলনা নেই আমাদের পরিচিত মঞ্চবক্তাদের মধ্যে। সজীব তাঁর মনীষা, একদিক থেকে অনবদ্য, এবং যদি তিনি তাঁর অপছন্দের কোনো রীতি বা মতকে বিদ্ধ করতে চান, তা করেন ছুঁচের দ্বারা, বল্লমের দ্বারা নয়। আমাদের গতানুগতিক বক্তাদের পদ্ধতি তাঁর নয়। মঞ্চের উপরে যেভাবে চলাফেরা করেন এবং কখনো-কখনো এমনভাবে কথা বলেন যে, স্বগতোক্তি মনে হয়—তখন তাঁকে দেখে জন ফিস্কে-কে [ডারউইন-মতের এক জনপ্রিয় বক্তা] মনে পড়ে যায়। বিবেকানন্দের মতো মানুষের সঙ্গকে উপভোগ করতে বা তাঁকে সমাদর করতে হিন্দু হবার প্রয়োজন নেই, হিন্দু ধর্মাদর্শের প্রতি সহানুভূতি বোধ করার প্রয়োজনও নেই। গত সপ্তাহে তিনি তিনটি বক্তৃতা করেছেন। মনে হয়, তিনি যেন বিশেষ কোনো চেষ্টা ছাড়াই ডজনখানেক সন্ধ্যায় বক্তৃতা করে যেতে পারেন, এবং প্রতি-বারই নতুন বিষয় ও তাজা চিন্তা। বক্তৃতার সময়ে তিনি কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ছেন, ভাবাই যায় না, যেমন ভাবা যায় না, সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এই কারণ ছাড়া ভাষণ শেষ করছেন!"—[**ডেট্রইট ট্রিবিউন**; ১৮।২।৯৪]। "স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বরের কাছে তাঁর আমেরিকান বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। এই প্রাচ্য ভদ্রলোক গত সপ্তাহে ডেট্রইটে এসে এমন আদবকায়দা দেখিয়েছেন যে, সকলের হৃদয়হরণ করে নিয়েছেন। সাক্ষাতে তাঁকে দেখলে বোঝা যায়, তাঁর চোখে গভীর আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা। সামাজিক সম্মেলনে তাঁর কথাবার্তা আনন্দদায়ক। বক্তৃতামঞ্চে তিনি সাবলীল এবং প্রভাবক।"—[**ডেট্রইট নিউজ**; ২০।২।৯৪]। "যদি ব্রাহ্মণ-সাধু বিবেকানন্দকে...আরও এক সপ্তাহ ধরে রাখা যায়, তাহলে ডেট্রইটের বৃহত্তম হলঘরেও লোক আঁটিবে না, তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য এতই উৎকণ্ঠা। মাথায় তুলে নাচানাচির বস্তু হয়ে উঠেছেন তিনি। গত সন্ধ্যায় ইউনিটারিয়ান চার্চে প্রতিটি আসন ভর্তি হয়ে গিয়েছিল এবং বহু লোক সারাটা বক্তৃতার সময়ে দাঁড়িয়ে শুনেছিল।"—[**ডেট্রইট জার্নাল**; ২১।২।৯৪]। "আমি [২১ ফেব্রুয়ারি বক্তৃতায়] বিচারক, মন্ত্রী, সামরিক অফিসার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, আইনজীবী এবং তাঁদের পত্নী ও পুত্রকন্যাদের আহ্বান করেছিলাম। বিবেকানন্দ 'প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ এবং তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা'-বিষয়ে দু'ঘণ্টা বক্তৃতা করেন; সকলে একেবারে শেষ পর্যন্ত গভীর

আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে মানুষ পরমানন্দে বলে, 'কোনো মানুষকে এমন বলতে শুনিনি।' তিনি কাউকে শত্রু করে তোলেন না, মানুষকে তিনি উত্তোলন করেন ঊর্ধ্বতর লোকে—উন্নীত মানুষেরা মনুষ্যকৃত মত, পথ ও নামের বাইরে গিয়ে, নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে থেকেও, তাঁর সঙ্গে সমদৃষ্টি লাভ করেন।"—[**মিসেস বাগ্‌লির পত্র**; ২১ ফেব্রুয়ারির বক্তৃতাসূত্রে]। "ডেট্রইটে তাঁর শেষ বক্তৃতায়...জনতা এমন বিপুল যে, আতঙ্ক-জনক মনে হয়েছিল। প্রবেশে ইচ্ছুক মানুষের লাইন বড় রাস্তার মধ্যে বহুদূর চলে গিয়েছিল, এবং শত-শত লোককে ফিরে যেতে হয়েছিল। বিবেকানন্দ বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। বক্তৃতার বিষয়...সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ। অপূর্ব অনবদ্য সেই ভাষণ। সেই রাত্রে আচার্যকে এক অজ্ঞাতপূর্ব আকারে দেখেছিলাম। তাঁর সেদিনকার রূপের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা এই পৃথিবীর নয়।"—[**মিসেস ফাঙ্কের স্মৃতি**]। "বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক, ধর্মবেত্তা, লেখক, বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি এই সন্ধ্যায় সিটি হলে বক্তৃতা করবেন, তিনি ইতিমধ্যেই যেসব ভদ্রলোক এম স্ট্রিটের একটি বাড়িতে গতকাল বিকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মোহিত করে ফেলেছেন। এই শান্ত মর্যাদাময় সন্ন্যাসীর বহুমুখী মনীষা, সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা এবং বহুদর্শী উদার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিত্বের অদ্ভুত বৈদ্যুতিক আকর্ষণ; তার দ্বারা এই বহু-প্রশংসিত প্রাচীন পৃথিবীর আগন্তুক এমন এক ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করেছেন, যাঁকে আমাদের এই বীরপূজক নূতন পৃথিবীতে সামাজিকভাবে জানতে পারাও একটি উদার শিক্ষা।" —[**নর্দাম্পটন ডেইলি হেরাল্ড**; ১৪।৪।৯৪]। "ধীর কোমল শান্ত অনুত্তেজিত সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর, যার মধ্যে ধৃত হয়ে আছে প্রচণ্ডতম নির্ঘোষের শক্তি ও অগ্নি, সে কণ্ঠ সরাসরি প্রবেশ করে যায় লক্ষ্যবস্তুতে, যেমন ঘটে সেই মানুষের ক্ষেত্রে যাঁর বিষয়ে বলা যায়—'তুমিই নির্ধারিত পুরুষ —হে ঈশ্বরদূত!'...বিবেকানন্দকে দেখা এবং তাঁর কথা শোনা একটা পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য, যাকে কোনো বুদ্ধিমান সৎ আমেরিকান হারাতে পারেন না, যদি তিনি বহু সহস্র বৎসর বয়স্ক একটি জাতির (যার তুলনায় আমাদের বয়স কয়েক শত!) মানসিক, নৈতিক এবং অধ্যাত্মসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম এক বিগ্রহের অত্যুজ্জ্বল আলোকোদ্ভাস দেখবার ইচ্ছাবোধ করেন।"—[**ঐ**; ১৬।৪।৯৪]। "যথার্থই বিরাট পুরুষ; সরল, ঐকান্তিক, মহান এবং আমাদের পণ্ডিতদের তুলনায় অতুলনীয়ভাবে বিদ্বান। ধর্মমহাসভায় যাতে তিনি আমন্ত্রণ পান সেজন্য প্রদত্ত তাঁর পরিচয়পত্রে হারভার্ডের এক অধ্যাপক লিখেছিলেন শোনা যায়—'আমাদের সকলের পাণ্ডিত্য জড়ো করলে যা হবে, তার থেকেও এঁর পাণ্ডিত্য বেশি।'—[**লীন সিটি আইটেম**; ১৩।৪।৯৪]। "তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, ক্লাসিক ভাস্কর্যের রূপময় দেবতা। গাত্রবর্ণ অবশ্যই কৃষ্ণ, আর চোখ!—যেন মনে পড়ে মধ্যরাত্রির নীলাকাশ।" —[**কনস্ট্যান্স টনির স্মৃতি**]। "আমাদের পুরনো রীতির শহরে সহসা একজন আগন্তুক উপস্থিত—প্রাচ্যের আচার্য ও দার্শনিক—স্বামী বিবেকানন্দ। ডাইনিংরুমে তিনি প্রবেশ করা মাত্র হঠাৎ স্তব্ধতা। বিরাট পাগড়ি ও পোষাকের হালকা রঙের পটভূমিকায় তাঁর সঘন ব্রোঞ্জবর্ণ মুখ এবং হাত।...তাঁর কৃষ্ণ নয়ন আশপাশে যেন দৃক্‌পাতও করল না। কিন্তু ঐ চোখে এমন একটা অন্তর্লীন শান্তি ও শক্তি ছিল যে, গাঢ় দাগ টেনে গেল মনে। সকল সত্যকার ব্রহ্মবাদী আচার্যের রহস্যময়তা এবং সুদূরতা তাঁর দেহাধারে ব্যক্ত।...একবারই মাত্র তাঁকে দেখেছি, সেই দর্শনেই তিনি বাক্যমাত্র উচ্চারণ না করে ভারতের সত্য স্বরূপের যে-উন্মোচন আমার কাছে করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে ভারত সম্বন্ধে ভারতীয়দের মুখে প্রভূত ভাষণ শুনেও লাভ করিনি।"—[বিখ্যাত ভাস্কর **মালভিনা হফ্‌ম্যানের স্মৃতি**]। "চিত্রপটে অঙ্কিত আকারের মতো বিবেকানন্দের চেহারা। সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো দৈর্ঘ্য [?] ভারি গড়ন, ওজন হবে ২২৫ পাউন্ড। গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু তার একটা নিজস্ব আভা আছে,

যা এশিয়াবাসীদের বর্ণের বৈশিষ্ট্য। মুখ গোল, মাংসল, এবং মাথায় রাশি-রাশি ঘন কালো চুলের ঐশ্বর্য। ঐ তরঙ্গায়িত কেশ কপালে লুটিয়ে পড়ে, এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত এসে যায়। চোখ, চুলের মতোই কৃষ্ণ, উজ্জ্বল, জ্বলন্ত। যখন হাসেন তখন নিখুঁত দাঁতের সারি দেখা যায়। চেহারা যেমন সুদর্শন তেমনি চমকপ্রদ। তদুপরি তাঁর ভালো মেজাজ আর আমুদে স্বভাব।...বয়স মাত্র তেত্রিশ হলেও বিরাট পণ্ডিত, সাতটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন, পড়তে পারেন আরও বেশি ভাষা। ইংরাজি ভাষায় খুঁত ধরার জো নেই।”—[**বাল্টিমোর আমেরিকান**; ১২।১০।৯৪]। “গতকাল বিকালে হোটেল রেনার্টের প্রধান লবিতে মেরুন-রঙের ড্রেসিংগাউন পরে...এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর কৃষ্ণবর্ণ মুখ, তাতে রহস্যময় মর্যাদা। মুখের প্রান্তরেখায় একইসঙ্গে মনন ও আবেগের মিশ্রণ। ঘন অলিভরঙের ত্বক, চোখ বৃহৎ, কৃষ্ণ এবং জ্যোতির্ময়, মাথার চুল নৈশ আকাশের মতো, এবং ললাট মুখ-বিজ্ঞানীদের চর্চার যোগ্য বস্তু। সব জড়িয়ে তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডলের গঠন ফ্রেনলজিতে বিশ্বাসীদের আনন্দপূর্ণ গবেষণার বিষয় হবে।—এই ভদ্রলোক হলেন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ-সাধু স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর আগমনে স্থানীয় ধর্মীয় মহলে দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেছে। তিনি এখন সকল পর্যবেক্ষকের লক্ষ্যবস্তু। তাঁর হাতে ছিল একটি বিশিষ্ট পত্রিকা, যেটিকে আগ্রহের সঙ্গে দেখছিলেন। মিঃ বিবেকানন্দ সানডে হেরাল্ডের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছিলেন স্বচ্ছন্দ ইংরেজিতে, উচ্চারণভঙ্গি অনেকটা শিক্ষিত ইটালিয়ানের মতো। এই দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে তাঁর ঘনিষ্ঠ ধারণা আছে দেখা গেল।”—[**সানডে হেরাল্ড**; ১৪।১০।৯৪]। “এই শহরে [ব্রুকলিন] অবস্থানকালের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে গত সন্ধ্যায় বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে যে-রকম অপূর্ব বাঙ্ময় এবং মর্মস্পর্শীরূপে দেখা গিয়েছিল, তেমন আর কখনো দেখা যায়নি। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মকে যেভাবে দেখা হয়।' নিজ পূর্বপুরুষগণের প্রাচীন ধর্ম-সম্বন্ধে পবিত্র উন্মাদনায় পূর্ণ এই সুবিখ্যাত হিন্দু তাঁর শ্রোতাদের একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। বক্তার ঐকান্তিকতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সকলে। এই তরুণ সন্ন্যাসীর তুল্য খাঁটি শিষ্য বুদ্ধের আর নেই, যিনি নিজ শক্তির বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থেকে নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন ঃ 'এই পৃথিবীতে মহত্তম নৈতিকতা খাঁটি বৌদ্ধধর্মেরই দান।' 'মহান বুদ্ধ, প্রভু বুদ্ধের' প্রতি তাঁর নমস্কার অপূর্ব সরলতায় হৃদয়স্পর্শী এবং গরিষ্ঠ বাণীতে বন্দনীয়। গতরাত্রে বিবেকানন্দের কথাগুলি কোনো এক বিশিষ্ট দর্শনের পেশাদার প্রবক্তার অভ্যস্ত বচন নয়—তা বাণীদূতের কণ্ঠস্বর, যিনি অঙ্গীকৃত সত্যকেই প্রচার করেন।” —[**ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন**; ৪।২।৯৪]। “তথাকথিত স্বাধীন চিন্তার মানুষরা, যাদের মধ্যে পড়ে নাস্তিক, জড়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবাদী এবং আরও অনেকে, ধর্মগন্ধ আছে এমন সবকিছুই যাদের গা ঘুলিয়ে দেয়, তারা ভেবেছিল এই হিন্দুটি খুবই সহজ শিকার; পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রহারে ওঁর ধর্মতত্ত্ব গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে। নিজেদের জয় সম্বন্ধে তারা এতই নিশ্চিত ছিল যে, তাঁকে নিউইয়র্কে তাদের সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। উদ্দেশ্য—তাদের প্রচুরসংখ্যক সমর্থকদের দেখিয়ে দেওয়া, তর্কবিদ্যা ও বিশুদ্ধ যুক্তির প্রবল আঘাতে কী সহজে ধর্মীয় দাবিকে খণ্ডন করে দেওয়া যায়। সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় স্বামীজীর চেহারাকে কোনোদিন ভুলব না, যখন তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে একাকী অবতীর্ণ হলেন জড়বাদের যোদ্ধাদের সামনে, যারা নিয়ম, যুক্তি, তর্ক, সাধারণজ্ঞান, বস্তু, বংশগতি, জীবনশক্তি ইত্যাদি ছেঁদো কথার ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে এসেছিল। ঐসব কথা শুনে অজ্ঞ জনসাধারণ কী না ভয় পায়! কল্পনা করুন, তাদের বিস্ময় ও আতঙ্ককে, যখন তারা দেখল, এইসব বাহ্যাস্ফোটে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, এই ব্যক্তি তাদের অস্ত্র তাদেরই দিকে স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে দিতে সমর্থ, যিনি অদ্বৈতদর্শনের যুক্তির

মতোই জড়বাদের যুক্তির সঙ্গেও সমান পরিচিত। তিনি দেখিয়ে দিলেন, তাদের বহু আড়ম্বরের পাশ্চাত্যসভ্যতা মানবভ্রাতাকে ধ্বংস করার কৌশলকে অবলম্বন করেই প্রধানতঃ অগ্রসর হয়েছে; পাশ্চাত্যবিজ্ঞান জীবন ও জগতের মূলগত প্রশ্নের মীমাংসা করতে সমর্থ নয়; বহুকথিত অভ্রান্ত বিশ্বনিয়মের কোনো অস্তিত্ব নেই মানবমনের বাইরে; বস্তুর বিষয়ে ধারণা দার্শনিক ধারণা ছাড়া কিছু নয়; এবং—অত্যন্ত ঘৃণ্য দর্শনশাস্ত্রের উপরই ভিত্তি করে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে হয় জড়বাদকে। অপ্রতিরোধ্য যুক্তির সাহায্যে তিনি তাদের ধারণার ভ্রান্তিগুলি দেখিয়ে দিলেন, সত্যজ্ঞানের সঙ্গে তুলনার দ্বারা সে-ভ্রান্তি দেখালেন না, যেসব ভিত্তির উপরে ঐ ধারণা দাঁড়িয়ে আছে ভ্রান্তি তার মূলদেশেই। দেখালেন, বিশুদ্ধ যুক্তি নিজের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে যুক্তির বাইরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ না করে পারে না; যুক্তিবাদকে শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে সে আমাদের সেইখানে পৌঁছে দেয়, যা বস্তুর ঊর্ধ্বে, জড়শক্তির ঊর্ধ্বে, ইন্দ্রিয়, মন, এমনকি চেতনার ঊর্ধ্বে বিরাজমান; এই সকলই তাঁর বিকাশ, 'যাঁকে সূর্য প্রতিভাত করতে পারে না, চন্দ্রতারকাও পারে না, পারে না বিদ্যুৎ বা অগ্নি—সেই তাঁরই দ্বারা সমস্ত কিছু আলোকিত।' এই শক্তিশালী বক্তৃতার প্রভাব পরদিন দেখা গেল, যখন জড়বাদী-শিবিরের বহু মানুষ উপস্থিত হলেন হিন্দুসন্ন্যাসীর পাদমূলে ঈশ্বর ও ধর্মের সুমহান প্রকাশবাণী শুনতে।"—[**লিয়ন ল্যান্ডস্‌বার্গের স্মৃতি**]।

আমেরিকা ১৮৯৩-৯৫ সালে বিবেকানন্দকে কি চোখে দেখেছিল, তার আভাসমাত্র এখানে উপস্থিত করলাম মিসেস বার্কের গ্রন্থ থেকে। উপাদানের তুলনায় উপস্থাপন সামান্যই। তাহলেও পাঠক বুঝবেন, কত অল্প সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রের দপ্তরে পৌঁছেছিল। বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করছি মঞ্চাসীন বিবেকানন্দের একটি রেখাঙ্কন দিয়ে ঃ

"সহসা শ্ শ্ শ্—চুপ! শান্ত পদক্ষেপে বিবেকানন্দ এগিয়ে এসেছেন; মর্যাদায় উন্নত আকার নিয়ে মধ্যবর্তী সিঁড়ির উপর দিয়ে উঠে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এইবার আরম্ভ করলেন—আর বিগলিত হয়ে গেল স্মৃতি, কাল, স্থান, মানুষ, সমস্তই। কিছু নেই, কেবল শূন্যের মধ্যে ধ্বনিত কণ্ঠস্বর। মনে হল যেন আমার সামনে দ্বার খুলে গেছে, আমি তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছি কোনো অসীম লক্ষ্যে। শেষ প্রান্ত এখনো অগোচর। কিন্তু কী আছে সেখানে, তার আলোকিত বার্তা রয়েছে ওঁর চিন্তায় ও ব্যক্তিত্বে, যিনি ঐ পথে আহ্বান করেছেন। ঐ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—অনন্তের দিব্য দিশারি।" [**দেবমাতার স্মৃতি**]

॥ ৪ ॥

ধন্যধ্বনি উঠল সমস্ত ভারতবর্ষের ভিতর থেকে। বিবেকানন্দ-নামক অজ্ঞাতপূর্ব অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের শিক্ষিত-সাধারণ স্বীকার করল—তিনিই এনে দিয়েছেন নবচেতনা। সেই স্বীকৃতির অল্প-কিছুই মাত্র এখানে উপস্থিত করা সম্ভব।

ইন্ডিয়ান মিরার, যার বিভিন্ন রচনার বহুল ব্যবহার আমরা করেছি এবং করব, তার থেকে এখানে একটি-দুটি মন্তব্য চয়ন করা যাক। আমরা আগে দেখেছি, মিরার কিভাবে বিবেকানন্দ-প্রচারের সূচনা করেছিল; ব্রাহ্ম-পত্রিকাগুলি যেখানে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সাফল্যকে সর্বাধিক বলে চালাচ্ছিল, সেই ভ্রান্তিকে কিভাবে আঘাত করেছিল। তারপর ক্রমেই সে আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে বিবেকানন্দ-বিবরণ সংকলন করে নানা সম্পাদকীয় মন্তব্য করতে থাকে। ১৮৯৩, ৬ ডিসেম্বর মিরার লিখল ঃ

"সকল দর্শকের চক্ষু একটি মূর্তিতে আটকে ছিল, ভারতের একমাত্র যথার্থ প্রতিনিধির মূর্তিতে; যেখানে তিনি গেছেন সেখানেই জয় করেছেন; সেই স্বামী বিবেকানন্দ, সন্ন্যাসীর

বেশে আবির্ভূত, সুন্দর সুঠাম আকৃতি...আর চক্ষু—বৃহৎ অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতো। মহিলারা পর্যন্ত এই বহিরঙ্গ আকারের আকর্ষণীশক্তিকে স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যখন কথা বলেন, খোলস থেকে বেরিয়ে আসে ভিতরের মানুষটি, দেখা যায়, শক্তি এখন বহুগুণিত, আর বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী হিন্দুদের বৈদিক ধর্মের প্রাণোত্তপ্ত ব্যাখ্যা শুনে যায় ভাববিহ্বলতার সঙ্গে।" [অ]

১২ ডিসেম্বর সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই কাগজ লিখল, 'তাঁর বক্তৃতায় এমন ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, যার বিষয়ে বলা যায়, একেবারে চাঞ্চল্যকর', ফলে, 'ভারত ও পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে সৃষ্ট হতে চলেছে নবযুগ।' ২০ ডিসেম্বর মিরার বিবেকানন্দের প্রথমজীবন সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পরিবেশন করে ঃ কিভাবে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যেতেন, কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে একই মঞ্চে ধর্মীয় নাটকের অভিনয় করতেন; তারপর কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, ইত্যাদি। এইসূত্রে সম্পাদক বিশ্ববিখ্যাত কেশব সেনের তুলনায় অখ্যাত যুবক নরেন্দ্রনাথের অধিক শক্তি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎবাণীর কথাও সবিস্ময়ে জানিয়েছিলেন। তারপরে সম্পাদক লেখেন ঃ

"যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁরা বলেন—বিবেকানন্দের প্রচণ্ড চারিত্রশক্তি, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, এবং প্রাচীন ঋষিসুলভ অপূর্ব মহান বৈরাগ্য।"

১৮৯৪, ২১ ফেব্রুয়ারি মিরারের সম্পাদক লেখেন, আমাদের সন্দেহ ছিল, ধর্মমহাসভার জন্য "আমরা কি এমন মানুষের সন্ধান পাব যিনি একান্তভাবে হিন্দু, অথচ সমুদ্রলঙ্ঘনে আপত্তি নেই?...তারপর যখন বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ এসে উপস্থিত হল, ধর্মমহাসভায় সামর্থ্য, প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার সঙ্গে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম উপস্থিত করেছেন, তখন আমাদের সকল দুশ্চিন্তার শেষ হল, কেবল তাই নয়, আমরা অনুভব করলাম, সর্বনিয়ন্তা, সর্বকারণকারণ ঈশ্বর ধন্য, কারণ তিনি তাঁর চির অজ্ঞেয় উপায়ে যথাস্থানে যোগ্য মানুষটিকে স্থাপন করেন।" অতঃপর স্বামীজীর বহু উৎকৃষ্ট উক্তি উদ্ধৃত করে, এবং স্বামীজীর ভূমিকা সম্বন্ধে ডাঃ বারোজের মন্তব্য উপস্থিত করে, সম্পাদক লেখেন ঃ

"স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকাভ্রমণ ও প্রচারের বাস্তব ফল সেখানে যাই হোক, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না, তার দ্বারা, ইতিমধ্যেই সভ্য পৃথিবীর কাছে খাঁটি হিন্দুধর্মের গুণাবলী বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। এই কাজের জন্য সমস্ত হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতা স্বামী বিবেকানন্দ পাবেন।"

তারপর ২১ মার্চের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, ধর্মের মহা নবযুগ আসন্ন, যখন ঘৃণা ও বিদ্বেষ নয়, প্রেম ও মিলনই আদর্শ হবে। এইসূত্রে স্বামীজীর মহান উক্তিগুলি উদ্ধৃত করার পরে লেখা হয় ঃ

"যে-সহিষ্ণুতা এবং ভাবগত উদারতা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং যা অন্যধর্মের থেকে তাকে বহুলাংশে পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য দিয়েছে—সে-বস্তুকে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে পৃথিবীর চোখে এত স্পষ্ট ও জীবন্তভাবে আর কেউ তুলে ধরেন নি।"

কলকাতার অন্যান্য সংবাদপত্র, বেঙ্গলী বা অমৃতবাজারের মন্তব্য পরবর্তী অধ্যায়ে উপস্থিত করব। এখানকার দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের ফাইল, দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেখবার সুযোগ আমরা পাইনি। তবে হরমোহনের পুস্তিকায় দেশীয় সংবাদপত্রের দু'একটি উদ্ধৃতি, আছে, তাই এখানে তুলছি, যদিও জানি, হরমোহন প্রশংসার অংশই ছেপেছিলেন, নিন্দার অংশ নয়, অথচ ধরে নিতে পারি, দেশীয় সংবাদপত্রে নিন্দা-গঞ্জনা, মুরুব্বিয়ানা ইত্যাদি মুখরোচক পদার্থ যথেষ্টই থাকত।—

বঙ্গবাসী ঃ "ধর্মমেলা। আমেরিকার চিকাগো নগরের মহামেলায় ধর্মমেলা বসিয়াছিল।

বিবেকানন্দ-স্বামী নামে এক সন্ন্যাসী এই মেলায় উপস্থিত হন। ইনিই ধর্মবক্তৃতা করিয়া ধর্মমেলায় তাক লাগাইয়া দিয়াছিলেন।"

হিতবাদী : "মাদ্রাজবাসিগণ তাঁহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে সিকাগোয় ধর্মমেলাতে উপস্থিত হইতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বিবেকানন্দ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাঁহাদেরই ব্যয়ে আমেরিকায় গমন করেন। সেখানে তাঁহার বেশভূষা ও কথাবার্তায় আমেরিকার স্ত্রী-পুরুষ মহলে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। এরূপ ধর্ম ও এরূপ লোক তাঁহারা তো ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেন নাই। বিবেকানন্দকে লইয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। যাহা হউক, ভিন্ন দেশে যে, হিন্দুর গভীর বৈরাগ্য ও ধর্মভাবের আভাও যে, বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাতে আমরা বিশেষ সুখী হইতেছি। এক সময়ে খ্রীস্টের বৈরাগ্য ও প্রেম যাইয়া নষ্টপ্রায় রোমীয় সভ্যতার নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল। এবারে হিন্দুর বৈরাগ্য ও ভক্তি যাইয়া শরীর ও বিলাসপ্রধান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্কারসাধন করিবে। নতুবা সে সভ্যতার বিনাশ অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।"

বঙ্গনিবাসী : "আমেরিকার এখন নব অভ্যুদয়। জগতের সাহিত্য-বিজ্ঞান লইয়া আমেরিকা আজ শাস্ত্রদর্শী। জগতের ধর্মগ্রন্থ বিমথিত করিয়া আমেরিকা আজ সার রত্নসকল উদ্ধার করিতে মানস করিয়াছেন। আমেরিকার একদিকে কর্ম, অন্যদিকে ধর্ম। একদিকে কর্মোপায় সিকাগোর বিরাট মেলা, অন্যদিকে জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর এক ধর্মসভা। এ-ধর্ম-সভায় যোগদান করিতে জগতের তাবৎ ধর্মসম্প্রদায় আহূত এবং সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন।...ধর্মসভার পাণ্ডারা শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"বিবেকানন্দ তরুণবয়স্ক কিন্তু বিবেকে বৃদ্ধ। বিবেকানন্দ তরুণ বয়সেই বিবেকী, তরুণ বয়সেই মুক্ত যোগী। পরমহংস মহাত্মা রামকৃষ্ণ, সনাতন আর্যধর্ম সম্বন্ধে যে-কয়েকটি অমৃতময়ী বাণী উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাহাতেই বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের তাহাই সম্বল। বিবেকানন্দ সেই সম্বলে সমগ্র ধর্মজগৎ পরিভ্রমণে শুভযাত্রা করিয়াছেন; সেই সম্বলে তিনি জগতে সনাতন ধর্মবিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

"স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ সাত্ত্বিকধর্ম—যাহার ভিত্তিতে এই জগতের সকল ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা, সেই সনাতন হিন্দুধর্মের সারগর্ভ বিষয়াবলী অতি বিশদ, অতি হৃদয়গ্রাহী এবং অতি তৃপ্তিজনকভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। স্বামীর মুখে আর্যধর্মের লক্ষণাদি শুনিয়া সমগ্র আমেরিকাবাসী নতশির হইয়াছেন। স্বামীকে শতসহস্র ধন্যবাদ।

"সেই নবীন নধর মূর্তি, সেই শিষ্ট বলিষ্ঠ গঠন, সেই স্বভাব-সরল ভাষা; বিবেকানন্দের মূর্তিদর্শনে আমেরিকাবাসী মুগ্ধ। আমেরিকার পত্রিকাসকল তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'আজ সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে মহাপুরুষ বিবেকানন্দের মূর্তিই চিত্তাকর্ষক। তাঁহার পরিণত দেহ দিব্য বলব্যঞ্জক। তাঁহার কৃষ্ণ চক্ষুতে যেন সরলতা মাখা আছে। তাঁহার প্রশান্ত হৃদয় জগতের হিতের জন্য যেন শোণিতপাতেও কাতর নয়।

"বিবেকানন্দ শাস্ত্রদর্শী; সংস্কৃত ও ইংরাজিতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। এখানকার ধর্মসভার প্রধান-প্রধান দার্শনিকগণ যখন যে-প্রশ্ন করিয়াছেন, অকুতোভয়ে বিন্দুমাত্র সময় অবকাশ না লইয়া বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়াছেন। তর্ক করিতে-করিতে প্রতিপক্ষ হাসিতেছেন, রাগিতেছেন, আকারে ইঙ্গিতে, রাগের মাথায় দু'কথা চড়া-ও বলিতেছেন, কিন্তু বিবেকানন্দ হাসি-হাসি মুখে, অল্প কথায় আপনার কথাটি কেমন সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতেছেন।

"বিবেকানন্দ ধর্মযুদ্ধে অকাতর। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমরা অধিক পরিচয় জানি না।

তবে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অপরিমেয় জ্ঞান, অকুতোসাহস ও সর্বশাস্ত্রে অসামান্য দৃষ্টিদর্শনে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হয়।"৩

অমৃতলাল রায়ের কথা আগে বলেছি। তিনি ১৮৯৪, ৯ নভেম্বরের মিরারে এক পত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন :

"স্বামী বিবেকানন্দ একক চেষ্টায় সমগ্র পৃথিবীর অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রে অপূর্ব রূপান্তর এনেছেন।"

৩০ নভেম্বর মিরারে আর একটি দীর্ঘপত্রে অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি পুনশ্চ লেখেন :

"স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই ভারতমাতার স্বার্থরক্ষা করেছেন। স্থিরবুদ্ধি, বিবেচক, দেশপ্রেমিক তিনি, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে মাতৃভূমির যোগ্য সন্তানের কাজ করেছেন। তার ফলে হিন্দু-ঋষিদের অমূল্য চিন্তা এবং বিধিনিয়মের বিষয়ে শ্রদ্ধা এবং নব ভাবনার সূত্রপাত হয়েছে। স্বামীজীই প্রথম ব্যক্তি যিনি এক্ষেত্রে হিন্দুদের জন্য পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সহানুভূতির সৃষ্টি করেছেন।...তিনি অমর হবেনই।" [অ]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত লাইট অব দি ইস্ট পত্রিকায়, স্বামীজী কোন্ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন, তা বিস্তারিত লেখা হয় ১৮৯৪ এপ্রিল সংখ্যায়। এই রচনার মধ্যে আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে বিবেকানন্দ-প্রশস্তি উদ্ধৃত করে বলা হয় : "মনে হচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দ যেন আমেরিকার চিন্তাজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছেন।" এই পত্রিকা ১৮৯৫, জানুয়ারিতে 'বিবেকানন্দ' নামে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখে, তার মধ্যে ছিল :

"যদি আমরা আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করি, বর্তমান সভ্য জগতের একেবারে প্রথম সারির একটি দেশের মধ্যে কেন তাঁর বক্তৃতা একটি প্রচণ্ড শক্তির আকারে আবির্ভূত হতে পেরেছে তার মূল হেতু জানতে চাই, তাহলে অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তেই পোঁছতে হয়, শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের অভ্যন্তরে এমন প্রচণ্ড শক্তি আছে, যা জড়বাদকে ভিত্তিতে নাড়িয়ে দিতে পারে। প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের ছিন্ন তালপত্রের পুথির মধ্যে যে-আধ্যাত্মিক আলোক সংগুপ্ত ছিল, বিবেকানন্দ কেবল তারই বাহক। আমরা যেন বিবেকানন্দের বাগ্মিতার জ্বলন্ত রূপের মধ্যে তাঁর বিপুল প্রভাবের মূলসন্ধান না করি—তাকে যেন তাঁর মতবাদের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করি, যা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাগ্রসর প্রবল আক্রমণের সঙ্গে যুঝতে সমর্থ।" [অ]

জড়বাদ কিভাবে পাশ্চাত্ত্যের, বিশেষতঃ আমেরিকার জীবনকে অধিকার করেছে, তা ব্যাখ্যা করার পরে :

"একটি বিরাট জাতির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার দুর্ভেদ্য অন্ধকার এবং বিশৃঙ্খলার উপরে বিদ্যুতের দীপ্তি নিয়ে সহসা এসে পড়ল উপনিষদের সুমহান শিক্ষা।

৩ মাদ্রাজ মেলে ১৮৯৪, ৩১ অক্টোবরে কলকাতার দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে এইচ সি উইলিয়মস্-প্রদত্ত (প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনার) একটি সংবাদ বেরোয়। তাতে পাই—ঐকালে বঙ্গবাসীর প্রচারসংখ্যা ২০,০০০, বঙ্গনিবাসীর ৮০০০, সঞ্জীবনীর ৪০০০, সাম্য-এর ৪০০০, সুলভ দৈনিকের ৩০০০, হিতবাদী ৩০০০, ভারত মিত্র ২০০০, সুধাকর ২০০০ ইত্যাদি। "দৈনিক বঙ্গবাসী এবং বঙ্গনিবাসী সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রক্ষণশীল। সঞ্জীবনী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম মুখপত্র। সাম্য সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে গোঁড়া নয়, এবং প্রজা ও কুলিদের স্বার্থের পক্ষসমর্থন করে। হিতবাদী কংগ্রেস-সমর্থক, সামাজিক ব্যাপারে উদারনৈতিক। সুধাকর গোঁড়া মুসলমান কাগজ; বিতর্কমূলক বিষয়ে মুসলমানদের ধারণা কি জানতে হলে এই পত্রিকা পড়তে হবে।"

বঙ্গবাসী এইকালে বোধহয় ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচারিত দেশীয় সংবাদপত্র।

এই অপরিচিত আলোকের বাহক একজন বত্রিশ বছরের তরুণ, যাঁর একমাত্র জীবনোদ্দেশ্য কেবল উপনিষদ প্রচার করা নয়, উপনিষদের জীবন যাপন করা। ধর্মোদ্দীপনায় জ্বলন্ত তাঁর লোকোত্তর কল্পনা, সূক্ষ্ম যুক্তিবোধ, যা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মার্জনায় তীক্ষ্ম শাণিত —তার সঙ্গে বিবেকানন্দ যোগ করে দিয়েছিলেন স্বয়ংবৃত গৃহহীন জীবনের দারিদ্র্য ও আত্মোৎসর্গ—এই সমস্ত-কিছু মিলিত হয়ে তাঁকে ধর্মমহাসভার অপর সকল প্রতিনিধির থেকে অদ্ভুত পার্থক্যে চিহ্নিত করেছিল। ভারতের এই গৈরিকবসন সন্ন্যাসীর মধ্যে আমেরিকার জনগণ তাঁদের বিশপ আর্চবিশপদের চূড়ান্ত ঐহিকতা এবং বিলাস দেখতে পায়নি। বলা হয়, উপদেশের থেকে উদাহরণ উত্তম—আর এখানেই বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তার রহস্য। আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের জন্য যত না মতবাদ বা দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োজন, ততোধিক প্রয়োজন আত্মদান ও আত্মোৎসর্গের মহান দৃষ্টান্ত। যে প্রাচীন ও মহান দর্শন ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্যকে সৃষ্টি করেছে, তারই জীবন্ত চলন্ত বিগ্রহকে ধর্মমহাসভায় সমবেত মানুষেরা প্রত্যক্ষ করল। এরই জন্য বিবেকানন্দ এক মুহূর্তে ধর্মমহাসভাকে জয় করতে পেরেছিলেন।” [অ]

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান দেশীয় সংবাদপত্র ট্রিবিউন (লাহোর) অনেক বিবেকানন্দ-সংবাদ ছেপেছে, যদিও ক্ষুদ্রাকারে, কারণ ঐকালে পত্রিকাটির আকার ছিল ক্ষুদ্র, এবং সাধারণতঃ মন্তব্যও করত সংক্ষিপ্ত। ১৮৯৪, ১৯ মে বিশেষ গৌরবের সঙ্গে সে লিখেছিল, শোনা যাচ্ছে, আমেরিকায় শুল্ক-কর্মচারীরা বিনা পরীক্ষায় ভারতীয়দের ছেড়ে দিচ্ছে, কারণ 'ভারতীয়রা ধর্মপ্রাণ মানুষ; তারা মদ্যপ নয়।' এবং অনুরূপ গৌরবের সঙ্গে এই কাগজটি জনৈক আমেরিকানের উক্তি উদ্ধৃত করেছিল, যিনি বলেছিলেন, 'যদি তোমরা [বিবেকানন্দের মতো] কয়েকজন মিশনারি পাঠাতে পারো, তাহলে তাঁরা গোটা মহাদেশকে ধর্মান্তরিত করে ফেলতে পারবেন।' হিন্দু-প্রচারকগণ আমেরিকায় হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে কি বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন, সে-বিষয়ে এই পত্রিকা ১৮৯৫, ২ ফেব্রুয়ারি লেখে :

“স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ হিন্দু-প্রচারকগণের আমেরিকাগমন সেই দেশের মানুষের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে এমন বিপুল আগ্রহের সূত্রপাত করেছে যে, আমরা লক্ষ্য করছি, কয়েকজন আমেরিকান সদ্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ফেলেছেন, যার নাম 'দি আমেরিকান, এশিয়াটিক, অ্যান্ড স্যানস্‌ক্রিট রিভাইভ্যাল সোসাইটি।' এই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে ইংরেজিতে তার অনুবাদ করানো। তদনুযায়ী সোসাইটি এজেন্ট লাগিয়ে ভারত থেকে ইতিমধ্যেই বত্রিশটি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে ফেলেছে। সেগুলি এখন অনুবাদের অপেক্ষায়। সোসাইটির আরও ইচ্ছা, অনুবাদের ও শিক্ষকতার উদ্দেশ্যে পণ্ডিতদের নিয়োগ করা।”

পুথির এই বিদেশে চালান ব্যাপারটা বর্তমানে স্বাধীন ভারতবর্ষে অত্যন্ত গর্হিত মনে হলেও সেকালে, পরাধীন অবস্থায়, বিশেষ সম্মানসূচক মনে হয়েছিল। কারণ তার দ্বারা ভারতীয় জ্ঞানের বিদেশীয় স্বীকৃতি প্রমাণিত হয়! সুতরাং এই সংবাদটি ভারতের প্রায় সর্বত্র সংবাদপত্রে মন্তব্যসহ উল্লিখিত হয়।৪

৪ যথা আর্য বালবোধিনীতে মার্চ, ১৮৯৫ সংখ্যায়, ইণ্ডিয়ান নেশনে ২৮ জানুয়ারিতে এই সংবাদ বেরিয়েছিল। এই ব্যাপারটি নিয়ে উৎসাহিত মিরার ১৮৯৫, ১৫ অগস্ট সম্পাদকীয় টীকা লিখেছিল। পুনার নেটিভ ওপিনিয়ন পত্রিকা ১৮৯৪, ১৫ জুলাই 'দি রিভাইভ্যাল অব হিন্দুইজম অ্যান্ড স্যানস্‌ক্রিট লার্নিং' নামে একটি দীর্ঘ রচনায় ভারতে সংস্কৃতচর্চার আগ্রহ বিষয়ে আলোচনা করে। এই পত্রিকার মতে, হিন্দুধর্মের যতই রিভাইভ্যালের কথা শোনা যাক, বস্তুতঃ তা হয়নি, কারণ খাঁটি পুরনো জিনিসগুলিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা দেখা যায়নি। অবশ্য ভারতে কিছু আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ জেগেছে, তার মধ্যে এক অর্থে রিভাইভ্যালের লক্ষণ আছে, পত্রিকাটি স্বীকার

বেলারীর থিয়জফিক থিংকার বহুবার পরম উৎসাহে ধর্মজাগরণে বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা বলেছিল, যথা ১৮৯৫, ১৩ এপ্রিলে ঃ

"পবিত্র হিন্দুধর্মের পূজনীয় প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর ধর্মভাবনাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছেন। বৈদিক চিন্তা সম্বন্ধে তাঁর সমর্থ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সকল ধর্মের মানুষের, বিশেষতঃ খ্রীস্টান মিশনারিদের চোখ খুলে দিয়েছে হিন্দুধর্মের উচ্চ গুণাবলী সম্বন্ধে। আমাদের ধর্মের পক্ষে শুভলক্ষণ এই যে, ইংলণ্ডের ডাঃ এইচ এস লুন শীঘ্রই হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন। আমরা সাহসের সঙ্গে বলতে পারি, দার্শনিক যুক্তিতে স্বামীজীর পূর্ণ নৈপুণ্য এবং হিন্দুধর্ম-বিষয়ে গভীর জ্ঞান বিজয়ের গৌরবলাভ করবে। আর তখন খ্রীস্টান মিশনারিরা হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সার্বভৌমিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অধিক শিক্ষালাভ করতে পারবে।"৫

স্বামীজীর ভূমিকা সম্বন্ধে বহুবার বহু উচ্চাঙ্গের সম্পাদকীয় লিখেছে দক্ষিণভারতের প্রধান দেশীয় দৈনিক, হিন্দু।৬ স্বামীজীর সংবাদ ভারতে প্রচারিত হবার অল্পদিনের মধ্যে ১৮৯৩, ২৩ ডিসেম্বরে, এই পত্রিকা যে-সম্পাদকীয় লেখে, তা তাঁর প্রবর্তক ভূমিকাকে অনবদ্য ভাবে উন্মোচন করেছিল। ঐ সময়ের মধ্যেই স্বামীজী বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের সমতুল বলে প্রতিভাত হয়েছেন এই পত্রিকার কাছে। স্বামীজী কোন্ অবস্থা থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করেছিলেন, সেই পূর্ববর্তী অন্ধকার ও পরবর্তী আলোকের রূপও এই রচনায় দেখা যাবে।—

"ভারতের জাতি ও ধর্মগুলি দীর্ঘদিন ধরে অনাথ ভিক্ষুক শিশুর অবস্থায় থেকে নিজেদের তুষ্ট এবং আনন্দিত বোধ করছিল, ভরণপোষণের ব্যবস্থা ছিল না, পোকামাকড়ের জীবন, সবাই গায়ে থুতু ছিটোয়, বড় জোর সহ্য করে অনিবার্য আবর্জনা-হিসাবে, দিনক্ষয়

করেছিল। সংস্কৃতচর্চার সঙ্গে হিন্দুধর্মের নবোত্থান ব্যাপারটি কত গভীরভাবে জড়িত, তা বলার পরে পত্রিকাটি লেখে ঃ অতি দুঃখের বিষয়, আমাদের এই অঞ্চলে [অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে] সংস্কৃতচর্চায় উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না, অথচ 'বাংলায় এবং উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে প্রাচ্য দর্শন ও সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থগুলি পড়ানোর জন্য কলেজ স্থাপিত হয়েছে।'

৫ স্বামীজীর সঙ্গে ডাঃ লুনের ধর্ম-বিতর্ক হয়নি। স্বামীজী এই ধরনের প্রকাশ্য বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন, কারণ এর দ্বারা ধর্মমহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি বিশ্বাস করতেন না, যদিও মিশনারিরা তাঁকে এ-ব্যাপারে জড়াতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। বিষয়টি পরে আলোচিত হবে। মিশনারি লুনের সঙ্গে অবশ্য হিন্দুধর্ম নিয়ে তর্ক হয়েছিল—বিবেকানন্দের নয়, বেশান্তের—যার উল্লেখ পরে করব।

৬ সমকালীন ভারতবর্ষে 'হিন্দু'র বিষয়ে বিশেষ সম্ভ্রমের মনোভাব ছিল। ১৮৭৮-৯৭ পর্যন্ত হিন্দুর ইতিহাস কার্যতঃ জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সাংবাদিক জীবনের ইতিহাস। ইণ্ডিয়ান রিভিউ এ'র ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯১৪, ফেব্রুয়ারিতে লিখেছিল, "১৮৭৮ খৃীস্টাব্দে...স্কুলগৃহ থেকে ইনি হিন্দুর সম্পাদকের চেয়ারে গিয়ে বসেন, যার প্রবর্তন করেছিলেন দু'জন সুপরিচিত সহযোগীর সঙ্গে।" কেরালার 'মাতৃভূমি' কাগজের প্রধান সম্পাদক কে পি কেশব মেনন ('দি মেল সেণ্টিনারি সাপ্লিমেণ্টে', ১৯৬৮) লিখেছেন, "জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং বীররাঘবচারী—এই দু'জন তরুণ শিক্ষক ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটির পক্ষে একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক আরম্ভ করেন। প্রথম সংখ্যা বেরোয় ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮। এই পত্রিকার উদয়ের সঙ্গে দক্ষিণভারতের রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, ১৮৯৮ সালে সম্পর্কচ্ছেদ করার আগে পর্যন্ত 'হিন্দুর সম্পাদক ছিলেন। সি করুণাকর মেনন এবং কে নটরাজন সামর্থ্যের সঙ্গে তাঁর সহকারীর কাজ করেছেন। ১৮৮৩-তে হিন্দু ট্রাই-উইকলি হয়, ১৮৮৯-তে দৈনিক।" ১৯০১ সালে হিন্দু লিমিটেড কোম্পানি হলে পুনার মরাঠা আনন্দপ্রকাশ করে যে-মন্তব্য করে (১৯০১, ১৬ জুন), তার মধ্যে সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সাংবাদিক-সামর্থ্য এবং বীররাঘবচারীর ব্যবসায়িক সামর্থ্যের প্রশংসা ছিল। এ'রা মিলিত হয়ে "হিন্দুকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশীয় দৈনিক পত্রিকা করে তুলেছেন।" সুবিখ্যাত সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিক এন সি কেলকার 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সাংবাদিকতা' নামক রচনায় (মরাঠা; ১৯০১, ২৭ জানুয়ারি) ভারতের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে

করে চলেছে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে, সে-মৃত্যুতে পৃথিবীর ভারসাম্যে নড়চড় হবার কথা নয়, —ভারতের এই আত্মলোপের ও অপমানের দীর্ঘ যন্ত্রণারাত্রি স্পষ্টতঃই এখন অবসানের পথে, তার অগৌরবের কালরাত্রি শেষ হয়ে দিগন্তে গৌরবদিনের রৌপ্য আলোকরেখা দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বদা যা দেখা যায়, কাল সমাগত হলে নির্ধারিত পুরুষ হাজির হন, যিনি নবযুগকে সন্ধান করে এনে দেবেন, চরিতার্থ করবেন জাতির আশা ও আদর্শকে। যদি কোনো জাতির জীবন রাহুগ্রস্ত হয়, বুঝতে হবে সে আর উদ্বুদ্ধ করবার যোগ্য বিরাট মানুষ সৃষ্টি করতে পারছে না যিনি জীবন ও আলোকদানে সমর্থ। পৃথিবীর কাছে ঐ জাতির প্রয়োজনীয়তার পুনঃপ্রমাণও হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত-না আবার বিরাট পুরুষ এসে জনগণের স্তিমিত প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তুলে, সংহত ও একমুখী করে দেন।... ...যে-ভারত পৃথিবীর সভ্যতার সূতিকাগৃহ, মানুষের অধ্যাত্মজীবনের উৎস ও আশ্রয়, পৃথিবীর পূর্বনির্ধারিত ধর্মাচার্য—সেই ভারত ক্রমেই অধঃপতিত হয়েছে, অবশেষে এমন হয়েছে যে, তার সন্তানেরা হারিয়েছে তাদের মাতৃভূমি, মর্যাদা, সবকিছু, সত্যই তারা কৃমিকীটের তুল্য হয়ে গেছে।

"কিন্তু সম্প্রতি কিছু সুদিনের লক্ষণ দেখা গেছে।...আমরা আমাদের মধ্যে এমন দু'এক-জনকে পেয়েছি, যাঁরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য।

"আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের অবস্থিতি অদ্ভুতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তাঁর জীবন, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা সর্বত্রই সীমাহীন উৎসাহ ও প্রশংসা সৃষ্টি করেছে। পূর্বে আর কখনো কোনো প্রাচ্যবাসী পাশ্চাত্ত্যজাতির মধ্যে এত অল্প কালে এমন প্রবল গভীর ও স্থায়ী প্রভাববিস্তার করতে সমর্থ হননি।.. তাঁর বিষয়ে আমাদের যেসব পাঠকের ব্যক্তিগত ধারণা আছে, তাঁরাই আমাদের এই কথায় নিঃসন্দেহে সায় দেবেন—[ধর্মদানের] পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের থেকে মহত্তর, যোগ্যতর, সত্যতর প্রতিনিধি আর নেই।...তিনি হিন্দু পরমহংসের খাঁটি নমুনা।...তাঁকে দেখে আমরা ধারণা করতে পারি, প্রাচীনকালের মহান হিন্দু-ঋষিরা কি রকম ছিলেন—যাঁদের আগামীকালের ভাবনামাত্র ছিল না, সর্বদাই নিমগ্ন থাকতেন উচ্চ ও পবিত্র চিন্তায়, এবং জীবন পূর্ণ ছিল কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনা ও অবিমিশ্র ঈশ্বরানুরক্তিতে। সন্ন্যাস-আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ বার বৎসরের অধিক-কাল আছেন। এই সময়ে তিনি সর্বদাই গতিশীল, শিক্ষাদানরত, প্রচারনিরত, কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধক, এবং সর্বদাই নিজের সঞ্চিত শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন মানুষকে সত্য শিব ও পবিত্রতার চিন্তায়। কে জানবে, কোন্ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে, কী দুঃখকষ্ট অসুবিধা সহ্য করেছেন। সবই তিনি করেছেন আমাদের মহান আচার্য ও ঋষিগণের প্রতি ভালবাসায়, ভারতের দরিদ্র পতিত মানুষদের দুঃখযন্ত্রণার প্রতি সহানুভূতিতে।...**জনৈক তীক্ষ্মদৃষ্টি আমেরিকান পর্যবেক্ষক তাঁর মুখাবয়বের রূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, বৌদ্ধ-ধর্মের অমর প্রবর্তকের ক্লাসিক মুখের সঙ্গে তাঁর মুখের নিবিড় সাদৃশ্য। আমরা তার সঙ্গে যুক্ত করতে চাই, সাদৃশ্য ঐখানেই শেষ হয়ে যায়নি, তা প্রসারিত হয়েছে স্বামীজীর মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের দিকেও—এবং তিনি বিশ্বজগতের সামনে নিজ ব্যক্তিত্বের**

হিন্দুকে উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন : "অর্থ সামর্থ্যহীন কয়েকজন শিক্ষিত তরুণ বুদ্ধিমত্তা এবং ধৈর্যশীল পরিশ্রমের দ্বারা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কী করতে পারেন, হিন্দু তার আদর্শ দৃষ্টান্ত। ভারতীয়রা এই দৈনিক সংবাদপত্রটিকে তাঁদের সাংবাদিক দায়িত্ব, মর্যাদা ও সামর্থ্যের উত্তম নমুনা হিসাবে উপস্থিত করতে পারেনই।"

এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দের সংবাদ যে-পর্বে ভারতবর্ষে সর্বাধিক উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল (১৮৯৩-৯৭), এবং হিন্দু স্বামীজী-সম্পর্কে উদ্দীপ্ত সম্পাদকীয়গুলি লিখেছিল, সেই কালে সুব্রহ্মণ্য আয়ার হিন্দুর সম্পাদক ছিলেন।

মধ্যে পুনর্বার শাক্যমুনি ও শঙ্করাচার্যের আদর্শ, আকর্ষণ ও শক্তিকে উন্মোচন করেছেন।" [অ] [স্থূলাক্ষর লেখক-নির্দেশে]

॥ ৫ ॥

ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রশস্তি সম্পূর্ণ বিস্ময়কর নয়, কিন্তু যদি ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সেই 'কোলাহলে' যোগ দেয়! ব্যাপারটা তখন সেকালের ভারতবর্ষের পক্ষে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য হয়ে দাঁড়ায়। স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, সেকালে এদেশে ইংরেজদের মধ্যে ভারতীয়দের বিষয়ে এমনই ঘৃণা আর ঔদাসীন্য ছিল যে, দু'এক লাইন সাহেবী প্রশংসা পেলেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির নানাবিধ ভাববিকার দেখা দিত। এমনই পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের মনোযোগ হরণ করে নিলেন, তখন সবাই চমৎকৃত হয়ে গেল একেবারে।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির পক্ষে সত্যই বিবেকানন্দকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। আমেরিকায় তাঁকে নিয়ে যে-প্রচণ্ড হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল, সে-বিষয়ে সচেতন না হয়ে উপায় কি! আমেরিকান উৎসাহাধিক্যকে না-হয় ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে ওড়ানো যায়, কিন্তু যখন ইংলণ্ডের প্রধান সংবাদপত্রগুলিতেও সংযত কিন্তু যথেষ্ট প্রশংসা বেরুল, তখন এদের কাছে প্রমাণিত হয়ে গেল, বিবেকানন্দ-ব্যাপারটা একেবারে তুচ্ছ করার নয়। একই সঙ্গে ম্যাক্স-মুলারের মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিও বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুর বিষয়ে আগ্রহ দেখালেন, অপরদিকে রোষে আক্রোশে দংশন করতে লাগল মিশনারিরা—উভয় ঘটনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠল বিবেকানন্দের শক্তির রূপ।

কলকাতার প্রধান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক স্টেটসম্যান কিন্তু বিবেকানন্দ-বিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করেনি। অল্পবিস্তর সংবাদ ছেপেছিল সে, কিন্তু তাদের মধ্যে মিশনারি কুৎসাও ছিল। এইকালে স্টেটসম্যানে একদিকে ছিল খ্রীস্টানী-প্রীতি, অন্যদিকে সাম্রাজ্য-প্রহরীর দর্পিত অবজ্ঞা। এ-বিষয়ে কলকাতার অপর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা ইংলিশম্যান আরও এককাটি বাড়া। কিন্তু তেমন মনোভাব ছিল না ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের, যার পুরো ফাইল দুঃখের বিষয় আমরা পাইনি, কিন্তু যেটুকু পেয়েছি তার মধ্যেই বিবেকানন্দের উচ্চ গুণগান ছিল। সে-রচনা পরে উদ্ধৃত করব। এলাহাবাদের দুঁদে সাহেবী পত্রিকা পায়োনীয়ারের বিস্মিত বিদ্রূপও পরে তুলব (এই পত্রিকাতেই মারউইন-মেরী স্নেলের বিবেকানন্দ-বিষয়ে রচনা বেরিয়ে সর্বত্র চাঞ্চল্যসৃষ্টি করেছিল, আগে দেখেছি)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, বোম্বাইয়ের বিখ্যাত টাইমস অব ইণ্ডিয়ার তিনটি প্রধান সম্পাদকীয় রচনার কথা, যা বেরিয়ে পুনার 'মরাঠা' কাগজকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল,[৭] অপরদিকে উৎপীড়িত করেছিল গোঁড়া খ্রীস্টানদের।

৭ মরাঠা লেখে ঃ

"The maxim that no man is a prophet in his own land applies remarkably to the Hindu Swami, who is now lecturing to enthusiastic crowds in England and America. He has not worked in vain when we find our Bombay contemporary of the *Times of India* devoting three leaders to the preachings and doings of the Swami in the Far West. To minds moulded in the narrow groove of Christian religious thought, the bright colors of Indian religious wares exhibited by a masterhand like the vicacious Swami are, we can easily say from the Swami's experiment, at once attractive and interesting." (*Mahratta*: Sep. 13, 1896)

টাইমস অব ইণ্ডিয়া ১৮৯৬, অগস্ট ৬, ২৩ এবং সেপ্টেম্বর ৯—এই তিন দিনে তিনটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় রচনায় স্বামীজীর যোগ-বিষয়ক রচনার তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করার সময়ে অত্যন্ত সহানুভূতি ও সমাদরের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে স্বামীজীর উক্তি উদ্ধৃত করে। তৃতীয় রচনাটির শেষে ধর্মবিষয়ে স্বামীজীর সুগভীর বাণী উপস্থিত করার পরে এই বলে প্রসঙ্গ শেষ করে : "আমরা বলতে পারি, এ অতি মহৎ শিক্ষা।"

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার ত্রয়ী রচনার শুরু হয়েছিল এইভাবে :

"স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে দার্শনিক হিন্দুধর্ম প্রচার করছেন। শ্রোতাদের নিজেদের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে তারা বক্তার সাক্ষাৎ ব্যক্তিত্বের মোহিনীশক্তিতে ও বাগ্মিতার অনর্গল মাধুর্যপ্রবাহে 'উদ্দীপিত।' স্বামী বিবেকানন্দ ঋষি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। রামকৃষ্ণের বিষয়ে অধ্যাপক টনী 'ইম্পিরিয়াল অ্যাণ্ড এশিয়াটিক কোয়ার্টারলি' পত্রিকার সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় অতি সুন্দর কিছু কথা লিখেছেন। যাকে বলা যায় সার্বভৌমিক হিন্দুধর্ম, ঋষি রামকৃষ্ণই তার ভিত্তি-স্থাপন করেছেন, এবং যে-ভারতসন্তান তাকে ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে বিকশিত করে তোলেন, তিনি হলেন, কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র এক্ষেত্রে তাঁর আদি অন্তর্দৃষ্টি ঋষি রামকৃষ্ণের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, মহান ব্রাহ্ম-নেতার মতোই ঋষি রামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য। এবং যদিও তিনি বাহ্যতঃ ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন নি, তথাপি তাঁর সাম্প্রতিক কথাবার্তার মধ্যে যে-ধরনের সর্বজনীনতা এবং সশ্রদ্ধ সহিষ্ণুতার মনোভাব দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে সে-জিনিসের জন্য আমরা ব্রাহ্মধর্মের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই অভ্যস্ত। আমেরিকায় প্রদত্ত তাঁর একটি সাম্প্রতিক ভাষণে, ভাষণটি অসাধারণ শক্তি ও চিন্তাশীলতায় পূর্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ 'সার্বভৌমিক ধর্মের আদর্শ' সম্বন্ধে কিছু যথার্থ গঠনমূলক চিন্তাপ্রকাশ করেছেন। অতি সূক্ষ্ম চিন্তার দ্বারা, ও-বস্তু যে-কারণেই হোক হিন্দুচিন্তার বৈশিষ্ট্য, স্বামীজী গোড়াতেই জমি পরিষ্কার করে নিয়েছেন, [ধর্মমত চাপিয়ে দিয়ে] কোনো মানুষকে আধ্যাত্মিক করা যায়, এই ভ্রান্তি তিনি দূর করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি পারো সাহায্য করো, কিন্তু ধ্বংস করো না। তুমি মানুষকে আধ্যাত্মিক করতে পারো, এই ধরনের ধারণা একেবারে দূর করো। ওটা অসম্ভব।...যেভাবে পারো খাদ্য দিয়ে যাও, পুষ্টিকর উত্তম মানের খাদ্য, কিন্তু বিকাশের ব্যাপারটা প্রকৃতির উপরে ছেড়ে দাও। ধর্মের ক্ষেত্রে তোমার নিজের আত্মা ছাড়া আর কোনো শিক্ষক নেই।" [অ]

কেবল টাইমস অব ইণ্ডিয়া নয়, খ্রীস্টানী মনোভাবের জন্য পরিজ্ঞাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক বোম্বে গেজেটও স্বামীজীর রাজযোগের আলোচনা না করে পারেনি। সে-আলোচনা টাইমস্-এর মতো অনুরাগতপ্ত নয়, এবং মাত্র (!) এক সংখ্যাতেই সমাপ্ত, স্বামীজী-সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্যও তাতে বিশেষ নেই, কিন্তু নিন্দাত্মক কোনো কথাও নেই, এবং যেভাবে সেখানে স্বামীজীর বক্তব্যের সারসংকলন করা হয়েছে, তাতে যুক্তিপূর্ণ জিজ্ঞাসার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বোম্বে গেজেটের ১৮৯৬, ৫ সেপ্টেম্বরের ঐ আলোচনার সূচনায় স্বামীজীর ধর্মের নিত্যবাণী উদ্ধৃত ছিল :

আত্মা মাত্রেই মূলে দিব্য।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই জীবনের চরম লক্ষ্য।

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম বা দার্শনিক জ্ঞান—এদের এক, একাধিক, বা সকল উপায়ের দ্বারা ঐ কাজ করো, আর মুক্ত হও।

এই হল ধর্মের মোট কথা। মতবাদ, রীতি-পদ্ধতি, গ্রন্থ, দেবালয় বা অন্য আনুষ্ঠানিকতা—ও-সকলই গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে স্বামীজীর যোগগ্রন্থের এইসব অনুকূল সমালোচনা নৈষ্ঠিক খ্রীস্টানদের কি রকম চঞ্চল করেছিল তার অন্যতম নিদর্শন বোম্বে গেজেটে প্রকাশিত 'এন ওয়াই কে' নামক পত্রলেখকের একটি চিঠি, যাতে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলা হয়, যদি খ্রীস্টান কাগজগুলিই হিন্দু যোগশাস্ত্র নিয়ে এমন হৈ-চৈ করে, তাহলে ভারতে খ্রীস্টধর্মের আর ভবিষ্যৎ কোথায়! পত্রলেখক দেখাবার চেষ্টা করেন, মিঃ বিবেকানন্দ নামক বাবুটি, যিনি ইদানীং চাঞ্চল্যসৃষ্টি করেছেন, তিনি যেসব উচ্চ-উচ্চ দাবি নিজ ধর্মের পক্ষে করছেন, সে-সবই যীশুখ্রীস্ট এবং খ্রীস্টধর্মের মধ্যে রয়েছে, বাড়তি অনেক ভালো জিনিসও রয়েছে। সে-সব ছেড়ে দিয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি নৈরাশ্যবাদী বুদ্ধের এবং চূড়ান্ত ভোগী কৃষ্ণের প্রশস্তি করবে![৮]

হিন্দু যোগশাস্ত্র মিশনারিমহলে কোন্ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে, এবং যোগকে ধর্মজগতের পক্ষে দুর্যোগ প্রমাণ করতে কিভাবে মার্ডক-প্রমুখ মিশনারিরা এগিয়ে আসবেন, পরে আমরা দেখব।

স্বামীজীর যোগ-বিষয়ক গ্রন্থগুলিকে কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি এড়িয়ে যেতে পারেনি। সুতরাং মাদ্রাজের প্রধান সাহেবী পত্রিকা মাদ্রাজ মেল[৯] স্বামীজীর রাজযোগ এবং ভক্তিযোগের উপরে কিছু ব্যবধানে দুটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে বসল। তার প্রথমটিতে (১৮৯৫, ১০ অগস্ট) গোড়ায় 'প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী' স্বামী বিবেকানন্দের বৈদেশিক কার্য-কলাপের শ্রদ্ধাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল, তারপর উপযুক্ত উৎকলন-সহ রাজযোগের আলোচনা, তারপর স্বামীজীর রচনারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা ঃ

৮ বোম্বে গেজেটে এন ওয়াই কে-র পত্রের কিছু অংশ ঃ

"Mr. Vivekananda Swami who is making so great a noise in America has, by his published speeches and essays, been producing some sensation in the land of his birth, as is evident from some leaders which have recently appeared in an Anglo-Indian journal. Mr. Vivekananda regards the Yoga System as the highest from of religious thought. But the Babu forgets that Christianity possesses all the elements which, he imagines, exist exclusively in his form of speculation, and Christianity has them in their purest and most exalted form."

বিবেকানন্দের মতবাদের নানাবিধ অসম্পূর্ণতা দেখাবার চেষ্টা করার পরে ঃ

"It is painful to see the writer in your contemporary, in imitation of Vivekananda Swami, commending Buddha and Krishna as the highest types of spiritual perfection. Buddha, inspite of his extraordinary moral excellence, was, after all a gloomy pessimist and Krishna was but a libidinous cowherd that employed his energies of mind and body, as long as there was vitality in them, in the glorification of the grossest lust."

এহেন দেবতাদের প্রশস্তি! অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে!—

"It is a matter of profound regret that some Anglo-Indian journals, which are so reticent about Christian dogma, are eloquent in dilating upon the glories of pagan error; and what wonder is there then, that the face of Christ is hid, and the voice of his apologists unheard by the people of this country!"

[*Bombay Gazette*; Sep. 30, 1896]

৯ ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে শাসক-সম্প্রদায়ের কাছে মাদ্রাজ মেলের এবং অন্য কয়েকটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেছেন ঃ

"The *Madras Mail*, the *Civil and Military Gazette* of Lahore, the *Englishman* of Calcutta and the *Pioneer* of Lucknow [Allahabad] were pillers of the press on which the British regime in India rested." [*The Mail Centenary Supplement*: Dec. 15, 1968]

"স্বামী বিবেকানন্দ সাতটি প্রাঞ্জল অধ্যায় লিখেছেন; সেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখা থেকে সংগৃহীত উদাহরণে পূর্ণ।...ন্যায়বিচারের উদার প্রশস্ত মনোভাবের দ্বারা তাঁর বক্তৃতা ও রচনাদি চিহ্নিত। অপর ধর্মসম্প্রদায়ের দোষত্রুটিকে মূলধন করতে সচেষ্ট তিনি নন। তিনি কেবল নিজ ধর্মমতের গুণগরিমার কথাই বলেন।"

স্বামীজীর এই গ্রন্থটি, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের সটীক অনুবাদ যার অন্তর্ভুক্ত, তুলনা-মূলক ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনকারীদের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হবে, এ-কথাও এই পত্রিকা লিখেছিল।

একই পদ্ধতিতে ১৮৯৬, ১৮ নভেম্বর, সম্পাদকীয় কলমে স্বামীজীর ভক্তিযোগের আলোচনা করা হয়। 'রাজযোগের মতোই আকর্ষক' এই গ্রন্থ, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের অহেতুক ভালবাসার তত্ত্বকে উপস্থিত করেছে। ভক্তিযোগে যথার্থ প্রেমব্যাকুলতা থাকে, আবার আবেগনির্ভর বলে পথভ্রান্তির সম্ভাবনাও যথেষ্ট। পুনশ্চ স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে মাদ্রাজ মেল লেখে, 'ইনি হিন্দুদর্শনের প্রশংসা যেমন করেন, তেমনি ছদ্ম-শিক্ষকদের বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী করতে একটুও দ্বিধা করেন না।'

এর আগে মাদ্রাজ মেল ১৮৯৬, ২৫ অগস্ট ই টি স্টার্ডি-কৃত নারদসূত্রের ইংরাজি অনুবাদের উপরে যে-সম্পাদকীয় লেখে, তার সূচনার বাক্যটি হল : "স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার দ্বারা ভক্তি সম্বন্ধে প্রাচ্য-শিক্ষার খাঁটি চরিত্র কী, সে-বিষয়ে যে-কিছু ঔৎসুক্য জেগেছে, সেই পটভূমিকায় মিঃ স্টার্ডির 'নারদসূত্র : অ্যান ইনকোয়্যারি ইন লাভ' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থটি একটি সংস্কৃত গ্রন্থের সযত্ন অনুবাদরূপে অভ্যর্থিত হবে।" স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, গ্রন্থটি প্রস্তুতকালে স্টার্ডি স্বামীজীর প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন এবং বইটি তিনি স্বামীজীকেই উৎসর্গ করেন।

মাদ্রাজ মেল স্বামীজী সম্পর্কে গোড়ায় সতর্কভাবে এগিয়েছিল। একেবারে শুরুতে সে স্বামীজীর কোন্ সমালোচনা করেছিল তা 'মিশনারি আক্রমণ' অধ্যায়ে আলোচিত হবে। কিন্তু ক্রমেই স্বামীজী-সম্পর্কে এঁদের উৎসাহ বাড়ে, যা তুঙ্গে পোঁছবে ১৮৯৭ সালে স্বামীজী মাদ্রাজে পোঁছলে। তার আগেও, যথেষ্ট সাবধানতার মধ্যেও, এঁদের নানা রচনায় সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল। এবং স্বামীজী ভারতীয় ইতিহাসে কোন্ অভাবিত-পূর্ব ভূমিকা নিয়েছেন, তাও স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি। ১৮৯৫, ২৮ ডিসেম্বর 'হিন্দুইজম্ ইন দি ওয়েস্ট' নামক সম্পাদকীয় আরম্ভ হয়েছিল রেভারেন্ড ডাঃ মিলারের উক্তি উদ্ধৃত করে। মিশনারিদের মধ্যে উদারনৈতিক ডাঃ মিলার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে পার্থক্যের শেষ নেই, তবু চাই সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহানুভূতি। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের প্রচারের কথা এসে গিয়েছিল, যিনি পাশ্চাত্ত্যে 'হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বক্তৃতা করছেন,' এবং সেখানকার 'কোনো কোনো উদ্যমী নাগরিককে হিন্দু যোগশাস্ত্রের রহস্যে দীক্ষিত করেছেন।' এ-ব্যাপারে স্বামীজীর ধর্মীয় অধিকার কতখানি, কিংবা তাঁর দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তিরা বারাণসী, পুরী বা রামেশ্বরের ধর্মগোষ্ঠীতে গৃহীত হবেন কি-না, সে-সব প্রশ্নের সদুত্তর এই পত্রিকার জানা নেই, কিন্তু :

"এই নূতন আন্দোলনের একটি দিক আকর্ষণের জিনিস—প্রাচ্যের মানুষের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের মানুষের জাতিগত ও ধর্মগত বোঝাপড়ার ব্যাপারটি। এর বিষয়ে আর যাই বলা হোক না কেন, এটি নতুন জিনিস। চৌদ্দশত বৎসর কি তারো বেশি সময় ধরে এই দেশে এমন-সব প্রভাব সক্রিয় রয়েছে, যা ভারতীয় জনগণের কাছে পাশ্চাত্ত্যের মহান ধর্মসমূহের দাবি হাজির করেছে। তা সত্ত্বেও একথা বলা যাবে না, ব্রহ্মণ্যধর্মের শক্তি বশীভূত হয়েছে কিংবা তাদের আত্মরক্ষার দুর্গের পতন হয়েছে।...একথা বাস্তব সত্য, অন্য ধর্মের সঙ্গে

বহু শতাব্দীর প্রতিযোগিতা, এমন-কি সংঘাতের পরেও হিন্দুধর্ম এই দেশের জনগণের ক্ষেত্রে অন্ততঃ নিজের ভূমিরক্ষা করতে পেরেছে।

"পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও আদর্শের প্রভাব কিন্তু এই ধর্মের মধ্যে এক সম্পূর্ণ নূতন তাগিদের সূত্রপাত করেছে, যার রূপ দেখতে পাচ্ছি, পাশ্চাত্ত্যে শ্রীবিবেকানন্দ-স্বামীর মিশনের মধ্যে। খুব সাম্প্রতিককালের আগে কেউই ভাবতে পারেনি, বারাণসী বা অন্য স্থান থেকে হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য পৃথিবীর সুদূরতম স্থানে দূত পাঠানো সম্ভব। আরও কম ভাবা সম্ভব, পৃথিবীর অপর প্রান্তস্থিত বাস্তববাদী লোকজনকে, জড়বাদী যদি তাদের নাও বলি, পতঞ্জলির বিখ্যাত যোগপদ্ধতিতে দীক্ষিত করা হবে!" [অ]

কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হল, তার কারণসন্ধান করার পরে (পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাই মূল প্রভাব) পত্রিকাটি লিখল ঃ

"যদি ইংলন্ড এবং আমেরিকা ভারতকে অনেক-কিছু শেখাতে পারে, তাহলে অপরপক্ষে ভারতেরও তাদের অনেক-কিছু শেখাবার আছে। অনেকেই আছেন, যাঁরা বিবেকানন্দের এই পাশ্চাত্ত্যগমন ব্যাপারটাকে বিদ্রূপের বা খোঁচানোর জিনিস ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারেন না। স্বীকার করছি, আমাদের ঐ প্রলোভন নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ধর্মচিন্তার নায়কদের মধ্যে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ বোঝাপড়া ঘটলে নিশ্চয় কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এখানে, এই উৎসভূমিতে, হিন্দুদর্শনের চর্চা করে পৃথিবী বহুল শিক্ষালাভ করেছে, এবং যেসব মানুষ এদেশ থেকে পাশ্চাত্ত্যে গেছেন, তাঁরা কেবল প্রচারক হিসাবেই যাননি, শিক্ষার্থী হিসাবেও গেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের এই সংযোগ থেকে পারস্পরিক জিজ্ঞাসা ও শ্রদ্ধার বৃদ্ধি ঘটবে।"

বাধা যথেষ্ট, অসুবিধার অন্ত নেই, যোগশাস্ত্র একেবারেই ভারতীয় ব্যাপার, পাশ্চাত্ত্যের জমিতে তার চাষ সম্ভবপর কি-না সন্দেহজনক, তবু যদি দুই ভিন্ন পৃথিবীর মানুষ 'বিবেকানন্দ-স্বামীর বিবেচক ও ধীর পরামর্শকে সর্বজনীন স্বীকৃতি দেয়, তাহলে এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে, সেখানে হিন্দু ও খ্রীস্টানেরা একত্র কাজ করতে পারবে।' বিবেকানন্দের চেষ্টায় তার সূচনা দেখা দিয়েছে। পরিণতি কি? নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে এই পত্রিকা ভাবতে চাইল ঃ "এক চিরন্তনী ইচ্ছার ধারা ধাবিত রয়েছে যুগ হতে যুগে; তারই মধ্যে সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, আর উদার বিস্তারলাভ করে মানুষের চিন্তাপ্রবাহ।"

মাদ্রাজ মেল বিবেকানন্দের আন্দোলনের মুখপত্ররূপে আবির্ভূত ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারতকে মুক্ত অভিনন্দন জানিয়েছিল। অন্য অধ্যায়ে সে বিষয়ে উল্লেখ করব।

মাদ্রাজ মেল বিবেকানন্দের সমাদরে যে সাবধানতা দেখিয়েছিল, তার চিহ্নমাত্র ছিল না অপর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দৈনিক মাদ্রাজ টাইমসের মধ্যে। সম্পাদকীয়ের পর সম্পাদকীয় লিখে গিয়েছিল এই পত্রিকা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে। যেমন তাতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তেমনি মুক্তকণ্ঠে কথা বলার সাহস। যে-কথা ভারতীয় পত্রিকা বলতে কুণ্ঠিত হবে, সেই কথা এই সাহেবী পত্রিকাটি স্বচ্ছন্দে বলেছিল। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, এই পত্রিকা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এমন-সব কথা বলেছিল, যেগুলি ধ্রুববাক্যের তুল্য। সমস্ত ভারতবর্ষের প্রায় সকল মুখ্য সংবাদপত্র দেখবার পরে, আমাদের স্বীকার করতে হবে, ইন্ডিয়ান মিরার এবং হিন্দুকে বাদ দিলে স্বামীজীর জীবৎকালে তাঁর বিষয়ে এমন উচ্চাঙ্গের এতগুলি সম্পাদকীয় আর কোনো পত্রিকা লিখতে পারেনি।১০ আমরা এখানে ১৮৯৪-৯৬-এর মধ্যে লিখিত দু'একটি রচনাকে

১০ এই সময়ে মাদ্রাজ টাইমসের সম্পাদক কে ছিলেন? এই পত্রিকা আরম্ভ হয় ১৮৬০ সালে, পরে মাদ্রাজ মেলের সঙ্গে মিশে যায়। ভারতীয়দের স্বার্থের পক্ষে কিভাবে পত্রিকাটি লড়াই করেছিল ১৮৭৬-৭৮ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে, তার বিবরণ লিখেছেন ডাঃ ভি সম্মুখসুন্দরম 'দি মেল

লক্ষ্য করবমাত্র। তারও মধ্যে ১৮৯৪, ৯ নভেম্বরের অনবদ্য সম্পাদকীয়টির আলোচনা (যা স্বামীজীর মাদ্রাজ-উত্তরের শক্তি ও সৌন্দর্যের উপরে লিখিত হয়েছিল) বর্তমানে স্থগিত রাখব, মিশনারি-কুটতার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও বিদ্রুপপূর্ণ রচনাগুলিও, এবং স্বামীজীর পত্রিকা ব্রহ্মবাদিন বা প্রবুদ্ধ ভারত-প্রসঙ্গও, স্বামীজী সম্পর্কে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতে শেষোক্ত প্রসঙ্গে কেবল এই জানালেই যথেষ্ট হবে, ব্রহ্মবাদিনের আবির্ভাবে এঁরা লিখেছিলেন, বিবেকানন্দের প্রেরণায় যার আবির্ভাব তার সাফল্য প্রায় অবধারিত এবং ভারতীয় জনগণের কল্যাণেচ্ছা যাঁদের হৃদয়ে আছে, তাঁরা এই পত্রিকাটি পেতে চাইবেনই।১১

স্বামীজীর ভক্তিযোগের উপরে একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় এঁরা লিখেছিলেন ১৮৯৬, ৫ নভেম্বর, ওভারল্যাণ্ড-সংস্করণে। যেহেতু বাইরে পাঠাবার জন্য এই সংস্করণ, এবং পত্রিকাটি ইংরাজ-পরিচালিত, তাই কিছুটা উচ্চমন্যতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তাকে ঠেলে ফুটে বেরিয়েছিল শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়। 'বিস্ময়কর এই ক্ষুদ্র বইটি', 'স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা রচিত, যিনি নূতন পৃথিবীতে হিন্দুধর্মের বার্তাদূত।' বিস্ময়ের বিশেষ কারণ বইটি 'ভাবে রীতিতে অপূর্বভাবে খ্রীস্টীয়।' প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যবাসীর ধারণা—তাতে আছে 'বিকট অশ্লীল দেবতাপূর্ণ মন্দির, সেইসঙ্গে বদ-স্বভাব দৈত্যদানার দল, যারা কেবল কলেরা, বসন্ত, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি আতঙ্ক মানবসমাজে বিতরণ করে'—সেখানে বিবেকানন্দ এনেছেন 'সম্পূর্ণ নূতন হিন্দুধর্ম', 'যার ভঙ্গি তিনি অবশ্য আয়ত্ত করেছেন দীর্ঘদিন পাশ্চাত্ত্যবাসের ফলে।' তাঁর রচনা প্রায়শঃই মনে হয়, 'গস্‌পেলের' মতো। স্বামীজীর মতাদর্শ অনুযায়ী ঈশ্বরের প্রতি অহেতুক প্রেমের চরিত্র কী, ধর্মজীবনে গুরুর ভূমিকা কী, ঈশ্বরের স্বরূপ কী, মানুষ কিভাবে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী ঈশ্বরের ধারণা করে—এইসব সম্পর্কে উদ্ধৃতিসহ বিস্তারিত আলোচনার পরে পত্রিকাটি লেখে : স্বামীজীর প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি দেখে মনে হয়, নিউইংলণ্ডের অধিবাসীদের কাছে যেন পিলগ্রিম ফাদাররা প্রচার করছেন। এবং তিনি যদি অনেক আমেরিকানের দ্বারা আত্মার গুরু হিসাবে স্বীকৃত হন, তাতে বিস্ময়ের কিছু হেতু নেই।১২

সেন্টিনারি সাপ্লিমেন্টে' (১৯৬৮)। মাদ্রাজ টাইমসের পাতায় ঐ লড়াইটা আসলে চালিয়েছিলেন উইলিয়ম ডিগ্‌বি। ডিগবি বহুবৎসর মাদ্রাজে বাস করেছেন, এবং এই দেশের স্বার্থকে নিজ স্বার্থ করেছিলেন। অথচ তিনি নিষ্ঠাবান খৃস্টান, মাদ্রাজের লর্ড বিশপের সভাপতিত্বে গঠিত 'রিলিজিয়াস কমিটির' অতি বিশ্বস্ত সদস্য। এঁর বিষয়ে উচ্চ প্রশংসা করে ডাঃ সম্মুখসুন্দরম লিখেছেন :

"There was a Christian in the strict Biblical sense, a Britisher, and, what is most relevant to-day, a journalist of the ilk of Bengamin Franklin, who made Madras his own home and has left for us to follow some of the rarest treats of journalistic excellence in the defence of the starving millions in those most gruesome years of Indian economic life. I refer to William Digby, Editor of *The Madras Times* in those years."

ডিগবি কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এ ও হিউমের এবং কংগ্রেসের পুরাতন স্তম্ভের একজন দাদাভাই নওরোজির বন্ধু ছিলেন। এই ডিগবিই সম্ভবতঃ আলোচ্য পর্বে মাদ্রাজ টাইমসের সম্পাদক-পদে থেকে স্বামীজী-বিষয়ে রচনাগুলি লিখেছিলেন বা লিখিয়েছিলেন।

১১ "Brahmavadin....is to be started 'under the advice and with the encouragement of Swami Vivekananda, who it is expected, will be one of its frequent contributors'. Started under such auspices the new magazine gives much promise of success, an issue that will be desired by all who have the welfare of the Indian people at heart." [*The Madras Times;* July 18, 1895]

১২ "It is a new doctrine, yet not repulsively antagonistic to the old; it is preached, too, in a language and a style such as one of the Pilgrim Fathers might

স্বামীজী-সংবাদ ভারতবর্ষে যখন সবে প্রচারিত হতে আরম্ভ করেছে, সেই সময়েই ১৮৯৪, ৪ জুলাই, মাদ্রাজ টাইমস গুরুপ্রসাদ সেনের 'ইনট্রোডাকশন্ টু দি স্টাডি অব হিন্দুইজম্' গ্রন্থের আলোচনাসূত্রে বিবেকানন্দ কোন্ নবচেতনা এনে দিয়েছেন, তা স্বীকার করে। কী ছিল আর কী হল—এই ব্যাপারটি তীক্ষ্ণ হাসির সঙ্গে বলেছিল পত্রিকাটি।—

"To our grandparents or even to our parents an 'Introduction to the study of Hinduism' would have sounded almost as ridiculous as an 'Introduction to the Study of Cat's Cradle' or the Study of Tops. But Hinduism has come to the front; people have found out that the wild ideas of the Ayah or the Bearer are no more an expository of Brahmanical teaching than is a Spanish peasant's exposition of Catholicity a true summary of the teachings of the Council of Trent. People have began to realise that there is such a thing as a philosophic Hinduism apart from the vulgar creed ; and Vivekananda in the great Parliament of Religions showed to a wondering world that Hinduism was really a subject of study." [*Madras Times*; July 4, 1894]

স্বামীজীর বিষয়ে হেলেন হান্টিংটনের রচনাংশ কিছু আগে আমরা উদ্ধৃত করেছি। একজন আমেরিকান মহিলার এই উদ্দীপ্ত বন্দনাকে সূত্র করে মাদ্রাজ টাইমস্ পুরো একটি সম্পাদকীয় লিখে ফেলেছিল, যার মধ্যে সুখসম্ভোগে পূর্ণ আমেরিকান মহিলার (এবং মহিলাগণের) সহসা ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-প্রীতি নিয়ে কিছু কৌতুক ছিল, ততোধিক ছিল বিস্ময়। যন্ত্রের নানারকম কেরামতি, সস্তার নভেল—এইসব জিনিসে ভরপেট আমেরিকানদের মনের পক্ষে বিবেকানন্দের দর্শন উত্তম ঔষধ—এইকথা ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে বলেও সম্পাদককে সমতুল দৃষ্টান্ত সন্ধান করতে হয়েছিল :

"দর্শনকে কোনোমতেই মেয়েলি বিষয় বলা যাবে না। তথাপি দার্শনিক এমনভাবে বিষয়টি উপস্থিত করতে পারেন, যাতে এই নীরসতম বিদ্যার চর্চায় একান্ত অনুরাগে এগিয়ে আসতে পারেন মহিলাগণ। দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়াবাসী তেমন একজন বিখ্যাত খ্রীস্টান দার্শনিক হলেন ওরিগেন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী চিন্তাবিৎ। তাঁর সমকালের এক লেখক বলেছেন, 'তিনি তাঁর গভীর চিন্তাসমূহকে এমন বাগ্মিতার দ্বারা উপস্থিত করেছিলেন যা অবর্ণনীয়ভাবে আকর্ষক এবং নিতান্ত সুন্দর।' তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল প্লেটোবাদ ও গস্পেলের সমন্বয়। সেইসব আলোচনা শুনতে দলে-দলে নারী হাজির হত তাঁর পদপ্রান্তে। ওরিগেন ছিলেন গভীরস্বভাবের মানুষ, পুরোহিত।...পুনশ্চ, একাদশ শতাব্দীতে ছিলেন ব্রেটাগ্নের মহান দার্শনিক পিটার অ্যাবেলার্ড, যাঁর গভীর দার্শনিক আলোচনা উন্মুখ হয়ে শুনত নারী পুরুষ সকলে। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ সেই একই ধরনের সাফল্য অর্জন করেছেন। মহিলারা আত্মা, ব্রহ্ম, পুরুষ, প্রকৃতি, স্ফোট ইত্যাদি নানারকম রহস্যময় শব্দের ব্যাখ্যা শুনে আনন্দবোধ করছেন।" [অ]

মাদ্রাজ টাইমস্ ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত বিবেকানন্দের 'সন্ন্যাসীর গীতি' পড়ে কবিরূপেও তাঁকে দর্শন করেছিল। ১৮৯৫, ১৯ অক্টোবরের প্রধান সম্পাদকীয় রচনার ('দি স্বামী অ্যাজ্ এ পোয়েট') গোড়ায় 'পৃথিবীর সবচেয়ে আগুয়ান জাতির মধ্যে' স্বামীজী কি শক্তির সঙ্গে

have preached in to the New Englanders ; and it would be by no means surprising if the Swami himself was discerned by a good many of our American cousins as the destined guru of their souls !" [*Madras Times* ; Nov. 5, 1896 ; Overland Ed.]

বৈদিক ধর্ম প্রচার করে বিপুল সংখ্যক অনুগামী সংগ্রহ করে ফেলেছেন, সেকথা বলা হয়েছিল। তারপর বিস্ময়ের চমক—স্বামীজী কবিরূপে আবির্ভূত! সন্ন্যাসীর কবিতা! সন্ন্যাসের আদর্শের কবিতা!!—'ইউরোপীয়দের কাছে পথচারী, গৈরিকবসন লোকগুলি যেখানে বদমাইশি আর জোচ্চুরির প্রতীক!!!' না, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়, 'এ-যুগের অন্যতম প্রভাববিস্তারকারী এই ব্যক্তির' কাব্যচেষ্টাকে তাই মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। দেখা যায়, সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের আগ্নেয় আদর্শ ঐ কবিতায় ফুটেছে, তাতে রয়েছে পরম গরিমা, আত্মার ঐকান্তিক উৎকণ্ঠার বাণীরূপ। সম্পাদকের মনে অবশ্য কিছু সংশয় জেগেছিল—কবিতায় যা বলেছেন, তাকে কি স্বামীজী এখনো জীবনে চান, চাওয়া সম্ভব আমেরিকায় এতদিন কাটিয়ে, ভারতের অরণ্যজীবনকে? কবিতার নমস্কার জানিয়ে কি স্বামীজী পূর্বজীবন থেকে বিদায় নেবেন? কিছু লঘু চতুর মুখরোচক প্রশ্ন সম্পাদক করেছিলেন, কিন্তু সমস্ত-কিছু সরিয়ে এগিয়ে এসেছিল সর্বশেষের চূড়ান্ত কথাটি:

"He is a power in his own way, and is a man worth studying."

এই আলোচনার মধ্যে বিবেকানন্দের কাব্যচেষ্টার সঙ্গে গ্যারিবল্ডির কাব্যচেষ্টার তুলনা করা হয়। আশঙ্কা ছিল, গ্যারিবল্ডির ক্ষেত্রে যা হয়েছে, স্বামীজীর ক্ষেত্রেও তাই হবে, তাঁর কাব্যপ্রয়াস হয়ে দাঁড়াবে মর্যাদাহানিকর। না, তা হয়নি। তুলনার অংশটি এই :

"In the case of a good many enthusiasts it has been a pity that they ever took to verse-making. There was Garibaldi, for example, the political enthusiast about whom the Italian Government have just been making a stir. He was a great general, but, unfortunately for his literary reputation, he took to literature when he had laid down the sword, and tried by an exceedingly uncouth and unsympathetic muse to inspire his countrymen to extra enthusiasm. On hearing the Swami had been venturing on poetry it would have been quite reasonable if his admirers had felt afraid lest in an evil moment he should have spoiled by petty verse a good deal of the dignified reputation that he has won. But there is no reason for such alarm. The Swami's poetry is of the genuine ring, and he will have added to his reputation rather than diminished it. Looking at the poem—a composition of thirteen verses—as a literary specimen, and from the Swami's religious standpoint, the reader can scarcely fail to be convinced that there is exceeding granduer in some of the lines."

['The Swami as a poet'. *Madras Times*; Oct. 19, 1895]

মাদ্রাজ টাইমসের মতো কাগজে 'কবি বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে লীডার লেখা যে, আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল তা থিয়জফিক থিংকার-এর ১৮৯৫, ২৬ অক্টোবরের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। স্বামীজী সম্পর্কে কি রকম প্রশস্তির সঙ্গে মাদ্রাজ টাইমস পুরো লীডার লিখেছে তা বলার পরে, উক্ত রচনার বেশি অংশ সে উদ্ধৃত করে। শেষ করে এই বলে :

'Verily the Swami is the celebrity of the day!'

সর্বকিছু ছাড়িয়ে গেছে মাদ্রাজ টাইমসের ১৮৯৫, ২৩ ফেব্রুয়ারির সুদীর্ঘ প্রধান সম্পাদকীয় রচনা, যার নাম 'অ্যামং দি প্রফেটস্।' একদিন মানবপুত্রের আবির্ভাব-ঘোষণায় এগিয়ে এসেছিলেন প্রাচ্যের জ্ঞানী মানুষেরা। বিশ্বইতিহাসে অন্য এক মানবের আবির্ভাব-ঘোষণায় এখানে অগ্রসর একজন পাশ্চাত্ত্যদেশীয়, যিনি প্রাচ্যবাসী এখন! তিনি তাঁর দীর্ঘ

রচনা শেষ করেন এই বলে ঃ ধর্মের কথা ছেড়ে দিলেও স্বামীজী অসাধারণ ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের মধ্যে সেই মানুষ, ভবিষ্যতে লোকে পিছন ফিরে যাঁর বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলবে—প্রফেট!

"Independently of religion, the Swami is an extraordinary man, and undoubtedly he is one of those amongst us whom men of a future age will look back to as to a prophet."

'অসাধারণ শক্তিশালী চিন্তাবীর' বিবেকানন্দের কথা এই রচনায় আছে, কিন্তু সেটা প্রাধান্য পায়নি। বিবেকানন্দের আশ্চর্য জীবন, বিস্ময়ের শিখরে-শিখরে তার সহসা-প্রকাশের ধন্য-রূপের বন্দনাই লেখক করেছিলেন। শুরু করেছিলেন এই বলে, 'একথা সত্য, কোনো মানুষই নিজ দেশে প্রফেট নন। একথা সমভাবে সত্য, কোনো মানুষ নিজ কালেও প্রফেট নন।' তারপর পরবর্তীকালে বিশ্ববন্দিত দুই সাহিত্যিকের, মিল্টন ও শেক্সপীয়ারের, দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন যাঁরা নিজকালে ছিলেন অনাদৃত বা লাঞ্ছিত। তারপর লেখক বলতে চেয়েছেন, পাশ্চাত্ত্যে, তার পরিবর্তিত জীবনযাত্রার মধ্যে, আর বোধহয় প্রফেটের আবির্ভাব সম্ভব নয়! বীরত্বের জন্য যিনি ভিক্টোরিয়া-ক্রশ পেয়েছেন, সংবাদপত্রে বারে-বারে বিজ্ঞাপিত হয়েছে যাঁর নাম, তাঁর কিন্তু রহস্যময় স্যার আর্থার হবার সম্ভাবনা নেই। এখন যিনি বিরাট খ্যাতিসম্পন্ন ধর্মপ্রচারক, তিনি তত্ত্ববিদ্যার কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত উদ্যমী বক্তার বেশি-কিছু বলে স্বীকৃতি পাবেন না। "কিন্তু ভারতে অলৌকিক কীর্তির কাল এখনো শেষ হয়নি। আপসহীন যুক্তির যুগের কাছে বিশ্বাসের যুগ এখানেও ক্রমে আত্মসমর্পণ করছে, তবু প্রফেটের সম্ভাবনা এখনো যায়নি, মানবে দেবত্বারোপের কাল—এখনো সম্ভাবনা আছে সেই মানুষের যিনি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজের অকলঙ্ক শুচিতাকে রক্ষা করবেন, অপর সকল মানুষের থেকে স্বতন্ত্র রাখবেন নিজেকে। অতীতের হিন্দু-ঋষিরা অপূর্ব চরিত্রসম্পন্ন বলে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁরা কেউ-বা বিষ্ণুর, কেউ-বা শিবের অবতার। তাঁরা প্রচার করতেন অপার্থিব শক্তিতে, দানবদের বিতাড়িত করতেন, নিরাময় করতেন ব্যাধিগ্রস্তদের। নবম শতাব্দীতে ছিলেন মহান শৈব-প্রচারক শঙ্করাচার্য, পঞ্চদশ শতাব্দীতে অলৌকিক কীর্তিকারী মহান বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্য।" এঁদেরই পাশে লেখক স্থাপন করেছেন স্বামী বিবেকানন্দকে ঃ

"এখনি বিবেকানন্দকে ঘিরে রহস্যময় কাহিনী ছড়াচ্ছে। একথা লিখিত আছে, কলিকাতা-বাসী তাঁর পরলোকগত গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁর জন্মোৎসব আগামী মাসের তিন তারিখে পালিত হবে সহস্র-সহস্র অনুরাগীর, বা ততোধিক, উপাসকের দ্বারা—তিনি তাঁর তরুণ শিষ্য এই স্বামীজীর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন। এবং অতীতের হিন্দু-ঋষিদের বিষয়ে যেমন বর্তমানে কথা ও কাহিনী বলা হয়, তেমনি আমরা অনুমান করি, ভাবী কাল পরম শ্রদ্ধাভরে এই সন্ন্যাসীর অপূর্ব কাহিনী বলবে, যিনি একদিন আকাশতলস্থ সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলবে, পৃথিবীর অপর প্রান্তের ম্লেচ্ছরা স্বামীজী-প্রদত্ত শিক্ষার বিস্তারের জন্য 'ডে'-নামক জনৈক চিকিৎসকের সভাপতিত্বে 'সর্বজনীন মন্দির' ('টেম্পল ইউনিভার্সাল') স্থাপন করেছিল। ভাবীকালে তারা এই প্রাচীন ঋষির উদ্দীপ্ত পত্র ও বক্তৃতা পাঠ করবে। শুনবে, এই তরুণ হিন্দুসন্ন্যাসীর কাহিনী ঃ পরের উপরে নির্ভর করে আমেরিকা গিয়েছিলেন, পাশ্চাত্ত্যের বিরাট শহরগুলিতে উদ্‌ভ্রান্ত অসহায় অবস্থায় ঘুরেছিলেন; তারই কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর নাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল সমগ্র পৃথিবীতে, এবং তাঁর যে-ধর্ম উদ্ভট বলে বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু ছিল, তাকে ভক্তিভরে চর্চার বিষয়বস্তু করল বিদ্রূপকারীরাই! নিশ্চয় এই কাহিনীর মধ্যে এক হিন্দু-ঋষিকে ভবিষ্যৎকালে ঈশ্বরাবতাররূপে গণ্য করার মতো যথেষ্ট উপাদান আছে।" [অ]

সম্পাদক খোলাখুলি বলেছিলেন, এখন যাঁকে আমরা জনৈক বাঙালী-বাবু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট বলে জানছি, যাঁর অধিক গুণের মধ্যে সাধারণ বাঙালীর তুলনায় বাড়তি বক্তৃতাশক্তি, বুদ্ধিমানের মতো যাকে ব্যবহার করে কার্যসাধন করেন—সেই বিবেকানন্দকে নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক কাণ্ড হবে, নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হবে তাঁর ঈশ্বরপ্রেরিত বাণীদূতের ভূমিকা। আমাদের মধ্যে যদি কোনো দেবতা বা দেবকল্প মানুষ থাকেন, তিনি অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ।—

"In all ages indeed, thaumaturgic prophets have lived, except in the present, and the probablity is that even amongst us in India now there are men who will be regarded as gods or demigods in after age. If there is any such man, it is the Swami Vivekananda. Looked at as amongst us now, he is a Bengalee Babu, a graduate of the Calcutta University who has more than the average Bengalee's gift of speech and who uses it to advantage. But it is to be anticipated that a very great deal will be made of the Swami in an after age, and we should fancy that the recognition of his apostleship is almost secure."

['Among the Prophets'; *Madras Times* ; Feb. 23, 1895]

কয়েকমাস পরে, ১৮৯৫, ১৮ জুলাইয়ের সম্পাদকীয়তে সম্পাদক খেতড়িতে রাজাকে লেখা স্বামীজীর চিঠি পড়ে পুনশ্চ বললেন—যে-সাম্যতত্ত্বের কথা এখানে স্বামীজী বলেছেন, পাশ্চাত্ত্যবাসের ফলে যা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে (!) বা বদ্ধমূল হয়েছে, তাকে যদি তিনি ভারতে ফিরে প্রচার করেন, তাহলে এক নতুন বুদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন।১৩

॥ ৬ ॥

স্বামী বিবেকানন্দই যে, প্রথম ব্যাপক সর্বভারতীয় জাগরণ আনেন, তার যথেষ্ট সমকালীন স্বীকৃতির সঙ্গে পাঠক ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের কাছে তা উপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি। ব্যাপারটা তাঁদের পক্ষে প্রশংসার নয়। বর্তমান গবেষণায় সেইজন্যই সমকালীন তথ্যের যথেষ্ট সংকলন আমাদের করতে হচ্ছে।

বিবেকানন্দ যে-জাগরণ আনলেন, তার সর্বভারতীয় চরিত্রের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলায় বা উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোনো-কোনো অংশে ধর্মান্দোলনকে

১৩ "The Swami has sent from America an Epistle of Vivekananda to the Raja of Khetri. The letter is long and eloquent.... A lengthy residence in the Land of the Free has induced, or at any rate confirmed, in the Swami a love for the equality of men. The teachings of the Vedanta are to be followed, not as explained by any Brahman commentator, but as—Luther himself might have put it—'as the Lord within you understands it!' 'This', says the Swami, 'is the way to freedom; inequality the way to bondage. No man and no nation can attempt to gain physical freedom without physical equality, nor mental freedom without mental equality.' If the Swami were to come back to India, and preach, he might possibly play the part of a new Buddha."

['A Letter from the Swami'; *Madras Times*; Aug. 27, 1895]

বা সংস্কার-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আগেই মন ও কর্মের সজীবতা এবং সক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল, যেমন বাংলায় ব্রাহ্ম-আন্দোলন, বিদ্যাসাগরের আন্দোলন বা পঞ্জাবে দয়ানন্দের আর্যসমাজের আন্দোলন ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলির সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল না, কারণ বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি এবং সেই উদ্দেশ্যের অনুবর্তীরাই তাকে গ্রহণ করে উদ্দীপিত হয়েছেন। সর্বভারতীয় জাগরণ তখনই সম্ভব হয়, যখন সমগ্র দেশের মানুষের সাধারণ স্বার্থ বা সাধারণ ভাবানুভূতি তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক চেতনা সৃষ্টি করে সেই কাজ করেছিলেন।

বিবেকানন্দ-সৃষ্ট জাগরণের কথা যখন বলছি, তখন তা যে, প্রধানতঃ হিন্দুদেরই জাগরণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে-জাগরণ অবশ্যই ধর্মকে কেন্দ্র করে। বহুধর্মের দেশে কোনো একটি বিশেষ ধর্মকে কেন্দ্র করে যে-জাগরণ, তাকে সর্বভারতীয় বলা যাবে কি-না প্রশ্ন উঠতে পারে। তার সহজ উত্তর হচ্ছে, বহুধর্মের দেশ হলেও ভারতবর্ষে হিন্দুরা শতকরা পঁচাশি ভাগেরও বেশি। এক্ষেত্রে কেবল হিন্দুদের জাগরণকেও স্বচ্ছন্দে ভারতীয় জাগরণ বলা যায়। এবং সমকালে অনেক সময়েই হিন্দু ও ভারতীয় একার্থক হয়ে গিয়েছিল। সংখ্যালঘুদের মধ্যে গরিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমানেরা ঐকালে শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর থাকায় প্রায় কোনোপ্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি। আরও স্মরণ করানো যায়, বিবেকানন্দের কালে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন আরম্ভ হয়নি (স্বাধীনতা-আন্দোলনই ব্যাপকতম জনগোষ্ঠীকে পরে স্পর্শ করেছিল), ধর্মই ছিল সর্বজনের ভাবানুভূতির আশ্রয়, তাই সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক চিত্তোত্থানকেই ঐকালের ব্যাপক জাগরণ বলতে হবে। পরবর্তীকালেও দেখা গেছে, নানা কারণে, স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রধানতঃ হিন্দুরাই অংশ নিয়েছিল, এবং রাজনীতির মধ্য দিয়ে যে-সর্বভারতীয় জাগরণের কথা আমরা বলি, তা আসলে হিন্দুদেরই রাজনৈতিক জাগরণ।

আরও স্মরণ করানো যায়, বিবেকানন্দের কার্যকলাপের ফলে হিন্দুরা প্রধানতঃ উদ্বুদ্ধ হলেও তাঁর আহ্বান কেবল হিন্দুদের জন্য ছিল না। তিনি সর্বদাই 'ভারত' শব্দ ব্যবহার করতেন, এবং ভারতীয় জনসংখ্যার যখন হিসাব দিতেন, তখন মুসলমানদের বা খ্রীস্টানদের সংখ্যাকে বাদ দিয়ে বলতেন না। বিবেকানন্দ ভারতের সর্ববিধ সমস্যার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন—তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও ছিল। তাঁর সময়েই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেছে। এই দাঙ্গায় রক্তপাত মুসলমানেরাই বেশি ঘটিয়েছে, এও তিনি দেখেছেন। সে ব্যাপারে সরকারী উস্কানির বা নিষ্ক্রিয়তার কঠোর নিন্দা তিনি করেছেন। বিবেকানন্দ সর্বদাই অন্যায়ের প্রতিবাদী। হিন্দুদের সামাজিক অন্যায়ের এই কঠোর সমালোচক মুসলমানদের অন্যায়ের সমালোচনা করবেন না, হতে পারে না। কিন্তু তাঁর থেকে মুসলমান-প্রেমিকও অল্পই সম্ভব। এবং, তাঁর পরিচিত মুসলমানেরা তাঁকে প্রভূত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। এ-বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা ও অন্যান্যরা যথেষ্ট সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লেখা তাঁর চিঠি, যার মধ্যে বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ঐস্লামিক দেহ নিয়ে ভারতের উত্থানের বিরাট কল্পনা আছে—সেটি একটি অসাধারণ সামাজিক দলিল। বিবেকানন্দের ধর্মের মহান চরিত্রের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শভিত্তিতে স্থাপিত বেদান্তকে তিনি প্রচার করেছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মে কোথাও অপরকে আঘাত করার কথা নেই, অপরকে গ্রহণ করার আহ্বানই আছে। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই তো তিনি পৃথিবীর ধর্মাচার্য। ধর্মমহাসভায় উদ্‌গীত তাঁর উদার ধর্মবক্তব্যের কিছু অংশ আমরা আগেই উপস্থিত করেছি। সেই একই বক্তব্যকে তিনি ভারতবর্ষেও দান করেছিলেন। যিনি বলেন, বিশেষ আচার-বিচার অনুষ্ঠান ধর্মের গৌণ ব্যাপার, সার অংশ হল সর্বমানবের দেবত্ব স্বীকার—তিনি যে-ধর্মের মধ্য দিয়েই আহ্বান

করুন, তা সর্বজনীন মানবধর্ম। এবং কোনো বিশেষ ধর্মধ্বজীরা যখন এই নিত্যধর্মের নিন্দায় অগ্রসর হয়, তখন তারা ক্ষুণ্ণ করে মানবমঙ্গলকেই। সেই প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রোশ বা আক্রমণের দ্বারা বিবেকানন্দের প্রগতিশীল ধর্ম সংকীর্ণ বলে প্রমাণিত হয় না, যেমন, ধরা যাক, সাম্যবাদের আদর্শের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলেরা যত সংখ্যাতেই চিৎকার করুক তাতে প্রমাণিত হয় না—উক্ত আদর্শ লোকগ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়। বিবেকানন্দ মনে করতেন, বেদান্ত কোনো বিশেষ ধর্মের একচেটিয়া বস্তু নয়, তা সকল ধর্মের সার সত্য। হিন্দুদের বিশেষ গৌরব এই, তারা ঐ তত্ত্বের আবিষ্কারক, এবং অগৌরব—সামাজিক জীবনে তার প্রবর্তনে সমর্থ হয়নি। বিজ্ঞানের সত্য বা দর্শনের সত্য যেমন কোনো বিশেষ দেশে আবিভূত হলে সেই দেশীয় হয়ে যায় না, ধর্মসত্যের ক্ষেত্রেও তাই খাটে।

একথা আমরা অবশ্য বলছি না, বিবেকানন্দের সকল কথা সকলে বুঝেছিল বা শুনেছিল। বোঝবার মতো অবস্থায় ছিল না, তাও ঠিক। বোঝবার উপযুক্ত দেহ-মনের সজীবতা তখন পরাধীন ভারতে ছিল না। বিবেকানন্দের পূর্বে কি অসীম আত্মগ্লানিতে সারা দেশ নির্মজ্জিত, তার তথ্যপ্রমাণ পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দিয়ে এসেছি। সেই মর্যাদাহীনতার অবস্থা থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে না পারলে, নিজের বা পরের প্রতি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। বিবেকানন্দের গৌরবে আত্মশ্লাঘা বোধ করে ভারতীয় জাতি কিভাবে পূর্বের অপমান ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে, তারই তথ্যে আবার প্রবেশ করব। তার আগে বলে নেব, এইকালে হিন্দুদের এই জাগরণ ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের জাগরণেরও কারণ। হিন্দুদের উত্থিত দেখে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ও একই তাগিদ বোধ করেছিল, তার পক্ষে প্রমাণ আছে।

বিবেকানন্দ যে-আগুন জেবলেছিলেন, তাতে ইন্ধন দিয়েছিলেন আরো কয়েকজন, সে-কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। ম্যাক্সমুলারের ভারত-বিষয়ক গবেষণা এবং বেদান্ত সম্পর্কে সমুচ্চ শ্রদ্ধানিবেদন, অ্যানী বেশান্তের হিন্দুধর্ম গ্রহণ এবং ভারতব্যাপী প্রচার প্রচণ্ড প্রেরণার কারণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। জ্ঞান ও কর্মে কয়েকজন ভারতীয়ের আশ্চর্য-জনক কৃতিত্বও ভারতীয় প্রতিভার বহুমুখিতা এবং বিজয়ী শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে আশা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিল। বিজ্ঞানে ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর কৃতিত্ব বিশেষ উদ্দীপনার কারণ হয়। প্রিন্স রণজিৎ সিংজী, কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, পরাঞ্জপে, অতুল চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকের নিজস্ব ক্ষেত্রে সাফল্যসংবাদ জনচিত্তে শিহরণ এনেছিল, জামসেদ টাটার ভারতীয় বিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবও তাই। এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত তথ্যনির্ভর আলোচনা আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে করব। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই জাতীয় জাগরণের অংশ হিসাবে স্বীকৃত হতে পেরেছে—মূল ব্যাপারটা বিবেকানন্দ ঘটিয়ে দিয়ে-ছিলেন বলে।

বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে তার স্বরূপে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করে কিভাবে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করেছিলেন, তা অতি সংহত অর্থগর্ভ কয়েকটি বাক্যে প্রকাশ করেছেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। বিবেকানন্দের আবির্ভাবকে তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং পরবর্তী ভারতবর্ষের গঠনে সেই আবির্ভাবের গুরুত্ব কি, তা অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময় ধরে জানবার সুযোগ পেয়েছেন। ইনি সাম্প্রদায়িক হিন্দু ছিলেন, একথা কেউ বলে না। এ'র তীক্ষ্ন মনীষা সর্বত্র সম্মানিত। এ'র মতে, 'যীশুর মরণোত্তর পুনরুত্থানের মতো হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থান'—বিবেকানন্দের দ্বারা। ১৯৬৩ সালে ইনি আরও বলেছিলেন ঃ

"বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়েছেন। তার দ্বারা রক্ষা করেছেন ভারতবর্ষকে। তিনি না এলে আমরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতাম, ফলে স্বাধীনতাও পেতাম না।"

॥ ৭ ॥

সমকালীন সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে হিন্দু-পুনরুত্থানের সংবাদগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নানা ধরনের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়াও ছিল। একদিকে আনন্দকলরব, অন্যদিকে আতঙ্কের কাতরোক্তি। এক হিসাবে আনন্দিতের উচ্ছ্বাসের তুলনায় আশঙ্কিতের মর্মপীড়ন এবং কখনো কটু কখনো ক্রূর কণ্ঠস্বরের মধ্যে এই জাগরণের অধিক স্বীকৃতি দেখা যায়। শেষোক্ত ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে প্রধানতঃ মিশনারি-পত্রিকায়, সেইসঙ্গে ব্রাহ্ম ও সংস্কারবাদীদের পত্রিকায়। এইসব পত্রিকা ঠিক কি লিখেছিল, সে-বিষয়ে অধিক আলোচনা থাকবে 'কিছু অসুখী ব্যক্তি' এবং 'মিশনারি আক্রমণ' এই অধ্যায় দুটিতে।

তবু মিশনারি পত্রিকা থেকেই দু'একটি স্বীকৃতি গোড়ায় হাজির করব। বাঙ্গালোরে শিক্ষিতদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের কাজ করতেন লন্ডন মিশনের রেভারেন্ড আর ই স্লেটার। শিক্ষিতদের মধ্যে কাজ করতেন বলে ইনি নিজ বক্তব্যকে কিছুটা সংযত ও পরিমার্জিত রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। এঁর বাৎসরিক রিপোর্ট মিশনারি পত্রিকাগুলিতে, তার বাইরেও, সমাদরের সঙ্গে উল্লিখিত হত। ১৮৯৪ এবং ১৮৯৫—এই দুই বৎসরের রিপোর্টের সারসংক্ষেপ আমরা পেয়েছি মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনে। ১৮৯৪ সালের রিপোর্টে স্লেটার বলেন (মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনে ১৮৯৫, এপ্রিলে প্রকাশিত), ভারতবর্ষে একধরনের হিন্দু রিভাইভ্যালের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তা কিন্তু হিন্দুধর্মের শক্তি ও দুর্বলতা উভয়েরই নিদর্শন। হিন্দুদের মধ্যে এখন অত্যন্ত অস্থিরতা। তারা সন্ধান করছে পথের। সামাজিক ব্যাপারে তারা পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শ গ্রহণে উন্মুখ কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে চায়--সুপ্রাচীন জাতীয় আদর্শের পুনঃপ্রবর্তন। স্লেটার বলেছিলেন, সামাজিক ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মুখাপেক্ষী হওয়া হিন্দুধর্মের দুর্বলতার লক্ষণ। হিন্দুরা যে, আসল ধর্ম সম্বন্ধে (অর্থাৎ খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসু না হয়ে, ধর্মকে নিছক তত্ত্বচিন্তা বা তর্কবিষয় করে তুলছে, তার জন্য স্লেটার দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন।

১৮৯৪ সালে যাকে 'এক ধরনের হিন্দু পুনরুত্থান' মনে হয়েছিল, ১৮৯৫ সালে তার প্রবলতা দেখে পরবর্তী রিপোর্টে স্লেটারকে আরও অনেক-কিছু বলতে হল। ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনে ১৮৯৬ এপ্রিল এবং '৯৭ মার্চ, এই দুই সংখ্যায় উক্ত আলোচনা থাকে। স্লেটারের 'সব সময়েই আকর্ষক' রিপোর্টের মধ্যে ১৮৯৫-এর রিপোর্ট অধিক চিত্তাকর্ষক ছিল এই জন্য যে, এই বৎসরে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির শতবার্ষিকী। বলাবাহুল্য এই একশ বছরে স্লেটারের জাতি এবং ধর্ম ভারতবর্ষে কি বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তার উৎফুল্ল বিবরণী ছিল। ঠগীদের মেরে, সতীদের বাঁচিয়ে, পুতুলগুলোকে নাড়িয়ে ভারতের 'মানসিক ও নৈতিক আবহাওয়াকে' কিভাবে তাঁরা অনেকটা পরিষ্কার করে ফেলেছেন, এবং 'একটি জোরালো ও প্রগতিশীল নেটিভ ক্রীশ্চান সম্প্রদায় গড়ে ফেলেছেন,' তার যথাসম্ভব উদ্দীপ্ত কাহিনী তিনি লিখেছিলেন এবং এই ভরসা প্রকাশ করেছিলেন--কোনো এক আকারে শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্ম বলবৎ হবেই। এই 'কোনো এক আকারে' কথাটার মধ্যেই সর্বকিছু ছিল। ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্মের অপ্রতিহত বিজয়-অভিযান সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস পূর্ববর্তী দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় টলে গিয়েছিল। তথাপি তিনি বিশ্বাস ছাড়েন নি, হিন্দুদের মধ্যে নব-জাগ্রত জিজ্ঞাসার প্রবণতা তাদের খ্রীস্টের পাদমূলে নিয়ে যাবে, এই আশা ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু সে-আশা যে, যত্নে সংগৃহীত, তা তাঁর লেখা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। হিন্দুদের জাগরণকে তিনি রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। রেনেসাঁসের কালে যেমন ইউরোপের পণ্ডিতেরা যুক্তিচালিত হয়ে বহুকাল-বিস্মৃত প্রাচীন পৃথিবীর সাহিত্য ও

দর্শনের স্তুতি করেছেন, হিন্দুরাও এখন তাই করছে। তবে রেনেসাঁসের পরে এসেছিল রিফরমেশন্—এখানেও তাই ঘটবে, জয় হবে খ্রীস্টীয়তার।১৪

মিশনারিরা এইসময়ে নানাদিক দিয়ে হিন্দু-পুনরুত্থান আন্দোলনের মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, তর্ক যুক্তি, আবেদন, সবকিছুই তার মধ্যে ছিল। 'বম্বে ক্যাথলিক এগজামিনার' ১৮৯৫, ৮ মার্চ সংখ্যায় 'দি রিজেনারেশন অব ইণ্ডিয়া' নামক রচনায় পরিষ্কার বলে, বেদের ধর্ম নিলে হিন্দুদের উদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা নেই। "হায়! বেদের দর্শন ভারতকে নবজীবন দেবে? গত তিন হাজার বছরে তো তা পারেনি!" এই মিশনারি লেখকের ইতিহাসজ্ঞানের অনুরূপ ছিল ধর্মজ্ঞান। "বেদে কি ধর্ম আছে' নাকি? ওতো কেবল দর্শন!"—এক জার্মান পণ্ডিতের এই উক্তি শুনিয়ে তিনি ধর্মপ্রশ্নের মীমাংসা করে ফেলেছিলেন।

মিশনারি-পত্রিকার মধ্যে হার্ভেস্ট ফিল্ড ব্রাহ্ম-পত্রিকায় বহুভাবে প্রশংসিত হত তাদের সুবিবেচক মনোভাবের জন্য। সুবিবেচনা মানে মুখ খারাপ করা নয়, যা অধিকাংশ মিশনারি

---

১৪ "Mr. Slater believes that after a while some form of Christianity will come to India quite naturally, but it may be a long time, he says, before that happens. For in the meantime the conversion of India to Christianity is the last thing that the majority of the people will dream of. The educated Hindu, while admitting that the mass of his countrymen are sunk in superstition, believes that a deeper insight into his own sacred books will lead to a faith not less sublime nor less soul-satisfying than the pure religion of primitive Christianity. There is indeed no more noticeable feature of Hinduism at the present time than its self-assurance. Mr. Slater is by no means dismayed, however, at the self-confidence and the unwonted activity displayed by zealous Hindus. For their new consciousness of strength, their spirit of patriotism, their desire to revive their ancient religion, and their determination not to break with their own social organisation until convinced of its insufficiency are qualities which they owe to their contact with Christianity."

[*Madras Christian College Magazine ;* April, 1896]

"He [Mr. Slater] remarked that while a hundred years ago religious India was wrapped soundly in the sleep of ages, there were now many signs that an awakening was taking place and that a spirit of inquiry was abroad.... *The country at large, Mr. Slater thinks, is apparently on the threshold of a great religious revolution. A wave of restlessness and of religious revival is passing over it ; and the present time may be not inaptly described as the Renaissance period in the history of the Hindus.* Just as the scholars of Europe appealed to the reason and the imagination by eulogising the speculations and poetry of the ancient world, so, says Mr. Slater, the Hindus of to-day turn to their long-forgotten literature and seek to meet the needs of society by a renovated Hinduism. And just as the awakening of Europe was followed by the Reformation, so, he says, will be in India." [Italics mine]

[*Madras Christian College Magazine ;* March, 1897]

ভবিষ্যতে রিফর্মেশন-জাতীয় খ্রীস্টীয় ধর্মবিপ্লব ভারতে ঘটবে, এই শুভ সাধু অভিপ্রায়ে কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকা সম্ভব হয়নি স্লেটারের পক্ষে, কারণ মিশনারিদের কুৎসাপ্রচারের বিরুদ্ধে বাস্তবে সক্রিয় হতে আরম্ভ করেছিল হিন্দুরা, এবং সমাজসংস্কারকেরা যে, ছদ্মবেশে মিশনারিদের পক্ষে কাজ করছেন, একথা সকলে বলতে শুরু করেছিল। তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল, খ্রীস্টের ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে যে-ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তার মূলে অনেক খ্রীস্টধর্মপ্রচারকের অখ্রীস্টান জীবনযাত্রা।

পত্রিকা করত। হার্ভেস্ট ফিল্ড তাই বলে হিন্দু-জাগরণে কম আতঙ্কবোধ করেনি। ১৮৯৫, মে সংখ্যায় 'রিভাইভ্যাল অব হিন্দুইজম্' রচনায় সে রেভারেন্ড এল পি লারসেনের উক্তি উদ্ধৃত করেছিল সতর্কবাণী হিসাবে। উক্ত রেভারেন্ড মাদ্রাজে পথপ্রচার করতেন। তিনি তাঁর এতদিনকার অব্যাহত ধর্মপ্রচারের মধ্যে সহসা একদিন শুনে তাজ্জব—এক ব্রাহ্মণ যথেষ্ট অবজ্ঞার সঙ্গে একসন্ধ্যার পথসভায় বলেই বসলেন—স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় হিন্দু ও খ্রীস্টান-ধর্মপ্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ফেলবার পরেও এখানে খ্রীস্টধর্ম প্রচার!! হার্ভেস্ট ফিল্ডকে অবশ্য স্বীকার করতে হল—বাহ্যতঃ অন্ততঃ হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখা গেছে। নানারকম আন্দোলন চলেছে, তাদের সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়বে; মনে হচ্ছে হিন্দুধর্ম তার উপরে আক্রমণের দংশন অনুভব করতে শুরু করেছে। ঐ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমেই কঠোরতর হবে, পুরাতন শাস্ত্রাদিকে নতুন আলোকে পড়ে বিচার করার চেষ্টাও করা হবে, ভ্রান্ত দেশপ্রেমের বশবর্তী হয়ে বিদেশীয় বস্তুকে পরিহার করার চেষ্টাও দেখা যাবে। সুতরাং রিভাইভ্যালিস্টদের ভাল করে চিনে নাও এবং মোকাবিলা করো।১৫

হিন্দুধর্মের নবোত্থানকে কতখানি গুরুত্বের সঙ্গে মিশনারিদের গ্রহণ করতে হয়েছিল, তা দেখা যায় হার্ভেস্ট ফিল্ডের ১৮৯৭, মে সংখ্যার 'নিও হিন্দুইজম্ অ্যান্ড ক্রীশ্চানিটি' নামক সুদীর্ঘ রচনায়। এর মধ্যে গোড়াতেই স্বীকার করা হয়েছিল হিন্দুধর্ম পূর্বের জড়তা ত্যাগ করে নূতন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হবার চেষ্টা করছে। ইংরেজ আমলে হিন্দুদের ধর্মচিন্তার বিবর্তনের ইতিহাসসন্ধানের চেষ্টাও করা হয়। যে-হিন্দুরা একদিন চার বেদ, আঠার পুরাণ, দুই মহাকাব্যের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করত তারা, মানে তাদের পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা, তাকে ত্যাগ করে অজ্ঞেয়বাদের ধর্মীয় ঔদাসীন্যকে গ্রহণ করল, ইঙ্গার-সোল, ব্রাডল'র দর্শনমতো ভাবতে লাগল, হিন্দুধর্ম কুসংস্কার, খ্রীস্টধর্মও তাই। সেই মনোভাব এখন, হার্ভেস্ট ফিল্ড স্বীকার করল, সম্পূর্ণ অদৃশ্য। এখন এসেছে নতুন জিজ্ঞাসার মনোভাব। বেদ, পুরাণ ও মহাকাব্যকে প্রামাণ্য না করে সেই জায়গায় বসানো হয়েছে উপনিষদ ও গীতাকে। [এ-জিনিস, কোনো সন্দেহ না রেখে, করা হয়েছিল স্বামীজীর প্রভাবে, যিনি ধর্মের ক্ষেত্রে বৈদিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে নির্ভর করতে, এবং উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যহিসাবে গীতাকে গ্রহণ করতে বলেছিলেন।] "সামাজিক জীবন, বাণিজ্যিক প্রয়াস, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জ্ঞান ও বুদ্ধির গতিপ্রকৃতি, আধ্যাত্মিক অস্থিরতা, সব-কিছুর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলির অনুশীলন করে, প্রশ্ন তুলে, তাদের সমর্থন বা খণ্ডন করা হচ্ছে শঙ্করাচার্যের সূক্ষ্ম অদ্বৈতদর্শনের আলোকে।" এই পরিবর্তনের মূলে ইংরাজ-শাসন। হার্ভেস্ট ফিল্ডের মতে, ইংরেজ ভারতকে সেরা-সেরা জিনিস দিয়েছে, যদিও প্রতিদানে ভারত, দুঃখের বিষয়, যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, যেহেতু ইংলণ্ডের ধর্মকে গ্রহণ করেনি। ইংলণ্ড ভারতকে দিয়েছে—শাসন ও শৃঙ্খলা, [সেইসঙ্গে কিছু বদ রাজকর্মচারী,

১৫ "There has been of late an apparent revival of Hinduism. This is manifested by certain spasmodic movements. An outcry is raised, and attempts are made to refine and spiritualise the grosser elements of Hinduism and efforts made to prevent Hindus from professing an alien faith. Such movements will doubtless multiply. There are indications that Hinduism is feeling the attacks that have been made upon it. The struggle will wax more fierce and doubtless become more intolerant. The ancient philosophers will be studied anew; the thought of the West will be read into them, and feelings of false patriotism will lead men to reject all that comes from a foreign source."

[*Harvest Field;* January, 1895]

হার্ভেস্ট ফিল্ড স্বীকার করেছিল] উৎকৃষ্ট বাণিজ্যব্যবস্থা, [ইংরেজ ব্যবসায়ীরা অবশ্য পাওনা-গণ্ডা বুঝেই নিয়েছেন], অপূর্ব শিক্ষা, [অবশ্য চরিত্রে ঐ শিক্ষা বহুলাংশে সংকীর্ণ] —আর দিয়েছে সর্বোত্তম বস্তু খ্রীস্টধর্ম। এই 'বিবেচক' পত্রিকাটি স্বীকার করে নিল, ইংরেজ-শাসন ভিন্ন ভারতে খ্রীস্টধর্মের প্রসার ঘটতে পারত না,১৬ যদিচ মহারাণীর ঘোষণাপত্রে ছিল সাধু নিরপেক্ষতার অপূর্ব ঘোষণা! ভারতে খ্রীস্টধর্মের নিশ্চিত বিস্তার যখন ঘটছে, তখনই হিন্দুদের মধ্যে এই নূতন প্রতিরোধ চেষ্টা। হিন্দুরা নানা উপায়ে তা করেছে—কোথাও জাতীয়তার কাছে আবেদন, কোথাও বুদ্ধির কাছে। আবার সে কোথাও দিয়েছে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের, বা পরিচিত সামাজিক আচরণের শ্রেষ্ঠতার দোহাই। এখন ঔদাসীন্য চলে গেছে, আক্রমণশীল প্রচারের কাল এসেছে তাদের মধ্যে। 'বক্তৃতামঞ্চে ভাষণ, সংবাদপত্রে প্রচুর লেখালেখি, শিক্ষিতজনদের মধ্যে অবিরাম আলোচনা চলেছে এই প্রসঙ্গে।' যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে শ্রদ্ধার মনোভাব থাকলেও এবং ব্রহ্মবাদিনের মতো কোনো-কোনো পত্রিকায় খ্রীস্টতত্ত্ব নিয়ে সশ্রদ্ধ আলোচনা চললেও খ্রীস্টকে মাত্র আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একজন মানুষ মনে করা হচ্ছে, কিন্তু তাঁর ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করা হচ্ছে না, তাঁর মননশক্তির অভাবের কথাও বলা হচ্ছে। আর খ্রীস্টধর্ম তো নিতান্ত মোটা ব্যাপার। সর্বদাই মিশনারিদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা চলছে এবং ভারতীয়তার বিরোধী বলে তাদের শত্রুজ্ঞান করাও হচ্ছে। হার্ভেস্ট ফিল্ড ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা করে বলল, অতঃপর খ্রীস্টকে তেত্রিশ কোটি দেবতার একজন করে নেবে হিন্দুরা, তাঁর ভাবকে আত্মসাৎ করবে, কিন্তু তাঁর ধর্মকে পরিহার করতে চাইবে। না, তা চলবে না। গোটাগুটি খ্রীস্টকে নিতেই হবে ভারতকে, যদিও তার বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত কিছু বেদান্তের আমেজ থাকবে, যেমন ইউরোপের ক্ষেত্রে গ্রীস রোমের দর্শনের ছিটে আছে তাতে।

হিন্দুধর্মের এই নবোত্থানের ক্ষেত্রে দুই প্রধান কারণকে এই পত্রিকা দেখিয়েছিল—এক থিয়জফি, যা ব্লাভাৎস্কি-আশ্রিত হয়ে ভারতে আবির্ভূত হয়। কিন্তু ব্লাভাৎস্কির অনেক-কিছু ফাঁস হয়ে যাওয়ায় যখন প্রায়.সবাই দল ছেড়ে যাচ্ছিল, তখন বাগ্মী বেশান্ত উদিত হয়ে রাশ টেনে ধরেন। বেশান্ত তাঁর বাগ্মিতাশক্তির দ্বারা হিন্দুধর্মের আগাপাশতলা সমর্থন করে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় শক্তি বিবেকানন্দ। তিনি এইপ্রকার :

"আর একজন ব্যক্তি নব্য হিন্দুধর্মের গঠনে বৃহৎ ভূমিকা নিয়েছেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেছেন এবং সেই নামেই সাধারণতঃ পরিচিত। ইনি প্রধানতঃ সময়ের সৃষ্টি। চিকাগোর ধর্মমহাসভা এঁর সামনে সুযোগের আকারে দেখা দিয়েছিল। দেখেই তাকে পাকড়ে নিয়ে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। আমেরিকা যাবার আগে তিনি সেইসব অস্থিরমতি মনুষ্যের অন্যতম ছিলেন, একালের ভারতবর্ষ যাদের উৎপাদন করছে। ইংরাজি সাহিত্য ও ধর্ম পড়ে, আশপাশের ধর্মজীবনের চেহারা দেখে বীতস্পৃহ হলেন এবং অদ্বৈতবাদ ও তাত্ত্বিক বৈরাগ্যের পক্ষপাতী হয়ে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে [অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের] যুক্ত হয়ে পড়লেন যিনি সংসারত্যাগ করেছেন এবং হিন্দুদর্শনের কোনো-কোনো উচ্চতর বিষয়কে অধিগত করেছেন। নিজের জ্ঞানগরিমা দেখাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিবেকানন্দের ছিল, পাশ্চাত্ত্য-জগতের মধ্যে প্রবেশ করে সেই হৃদয়বাসনা পুরিয়ে নিয়েছেন। তারপর স্বদেশে ফিরেছেন;

১৬ "But as England and India have become more closely drawn together, Christian influences have multiplied and its agencies have spread like a vast network—fine yet strong—all over the land. The Government, the commerce, the education have all more or less leavened with the spirit of Christianity, and Christ has thus been proclaimed."

['Neo-Hinduism and Christianity'; *The Harvest Field;* May, 1897]

বিজয়ী সেনাপতির সংবর্ধনা পেয়েছেন। সাধারণের কল্পনার চোখে ইনি বীরত্ব ও আত্ম-ত্যাগে দেবতাতুল্য; হিন্দুধর্মের উদ্ধারকর্তারূপে ঘোষিত। এবং কথিত হচ্ছে, ইউরোপ আমেরিকায় বহু ধর্মান্তর ঘটিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্যে তিনি নিজের বাণীও দিয়ে ফেলেছেন এবং সেটি ফিরে শোনাচ্ছেন নিজের দেশবাসীকে। মিসেস বেশান্তের মতো ইনি হিন্দুধর্মকে যেরকমটি আছে সেইরকমে হাজির করছেন না। পাশ্চাত্ত্যচেতনা ইনি কিছুটা নিয়ে ফেলেছেন, তার কিছু-কিছু নিজদেশে অভিব্যক্ত হলে তাকে আনন্দের সঙ্গেই দর্শন করবেন। জড়বাদী দর্শনের বিপদ সম্বন্ধে ইনি অনবহিত নন। তিনি দেখেছেন, জীবনকে তার বাস্তব বর্তমান রূপে নেবার জন্য পাশ্চাত্ত্যজগৎ কি রকম ব্যাকুল আগ্রহে ধাবিত; তার থেকে নিজ দেশ-বাসীকে ইনি বাঁচাবেন মনে করেন। তিনি জানেন, পাশ্চাত্ত্যের অনেক ভাবশক্তি তাঁর দেশেও ঢুকে পড়েছে, প্রচণ্ডভাবে সেগুলি ক্রিয়াশীল। তাদের কায়দা করে সামলাতে না পারলে হিন্দুধর্মের ভক্তগণকে আটকে রাখা যাবে না। তাই জনগণের প্রতি, এবং শিক্ষিত মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ বিশেষ বাণী আছে। জনগণের প্রতি তাঁর বাণীর মোট কথাটা এই—'যেখানে আছো সেখানেই থাকো। এই জায়গাই সেরা জায়গা। তোমার অবস্থা অন্যান্যের তুলনায় ভালো। বেশি রাগারাগি চেঁচামেচি করো না। শান্ত হও, তুষ্ট হও। তাহলেই সব ভালো।' শিক্ষিতদের প্রতি তাঁর বাণী—'আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে নিজেদের দর্শনের চর্চা করো, এবং বেদান্তের আলোকে আধুনিক আবিষ্কারাদি ব্যাখ্যা করো। ধর্মের চর্চা করো, বেদান্তের মধ্যে সমস্ত কিছুকে সমন্বিত করতে চেষ্টা করো। তা করলে যথেষ্ট সন্তোষজনক একটা মতবাদ পেয়ে যাবে।' তিনি আদর্শের উন্নত মান নিতে বলেন না, বা পৌরুষের কাছে আবেদন জানান না। তাঁর পদ্ধতি হল, চলতি ভাবধারাকে ধরে নিয়ে বেদান্তের ভাষায় সেগুলো আওড়ানো। মিসেস বেশান্তের মতোই খ্রীস্টান মিশনারিদের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসা নেই। ভারতে ফেরার পরে তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন, এবং আমেরিকার মিশনারিদের ব্যঙ্গছবি দিয়েছেন। সরাসরি আক্রমণ করেন নি, কিন্তু তাঁর বক্তৃতাগুলির অন্তর্নিহিত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়—তাঁর স্বদেশে খ্রীস্টধর্ম বলবৎ হওয়াকে তিনি একে-বারেই পছন্দ করবেন না।" [অ]

হার্ভেস্ট ফিল্ডের রচনানৈপুণ্যে সত্যমিথ্যা-মাখা বিবেকানন্দের বেশ একটা রঙিন ছবি পাওয়া গেল। ওর মধ্যে কিন্তু আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতিটি রয়েছে—হিন্দুরা বিবেকানন্দকে হিন্দুধর্মের পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করেছিল।

বিদেশী খ্রীস্টানরা নন কেবল, স্বদেশী খ্রীস্টান ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও (পরে ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়) হিন্দুজাগরণের নিন্দায় নেমে পড়েছিলেন। সিন্ধুদেশের হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত সোফিয়া কাগজে তিনি কিভাবে হিন্দু ধর্মদর্শনকে নস্যাৎ করেছেন, তা ভালভাবে পরে দেখব, এখানে এঁর সোফিয়ায় ১৮৯৪, জুন মাসে 'দি হিন্দু রিভাইভ্যাল' নামক রচনায় হিন্দুজাগরণের বিষয়ে যে-স্বীকৃতি ছিল, তাই উপস্থিত করছি ঃ

"শিক্ষিত ভারতবর্ষ তার পুরাতন ধর্মে ফিরে যাচ্ছে। ইংলণ্ড, শিক্ষিত হিন্দুকে নিজ ধর্মভুক্ত করার ব্রতে ব্যর্থ হয়েছে। সে ভারতবর্ষকে জাড্য থেকে টেনে তুলেছে, জ্ঞানালোক দিয়েছে, তার ভিতরে নবজীবন সঞ্চারিত করেছে, কিন্তু হায়, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের ধর্ম নেবে না! ইংলণ্ডের ধর্মীয় অভিপ্রায় কেন ব্যর্থ হল, সে-আলোচনা এখানে করার প্রয়োজন নেই। এখানে এই প্রশ্নাতীত সোজা কথাটা বললেই যথেষ্ট হবে, শিক্ষিত হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক খ্রীস্টান মিশনারিদের দ্বারা আমদানীকরা ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উঠে-পড়ে লেগেছে।

"নিম্নবঙ্গের সমভূমি থেকে শক্তিশালী সিন্ধুনদধৌত ভূমি পর্যন্ত, ঐতিহাসিক প্রয়াগ থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত সমগ্র ভারতে আলোড়িত উত্থান ঘটেছে, ভারতের প্রাচীন ধর্মমহিমার বিষয়ে চেতনা জাগরিত হয়েছে। প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন জ্ঞান ও দর্শন, প্রাচীন

ধর্ম নিয়ে আলোচনাই এখনকার রীতি।...চতুর্দিকে ভারতীয় ধর্মের জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং যে-কোনো বৈদেশিক জিনিস সম্বন্ধে বিরূপতা। ভারতের বাইরে থেকে এখানে কোনো আধ্যাত্মিক মঙ্গলকর জিনিস আসতে পারে না—ধর্মান্দোলনকারীরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এই ধারণা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁরা বলেন, বাইরে যদি-কিছু ভাল থাকেও তা ভারতের সুমহান আধ্যাত্মিকতার তুলনায় কিছুই নয়। বৈদেশিকদের প্রচার সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে চূড়ান্ত সন্দেহ ও বিরূপতা। জাতীয়তাই এখনকার ধর্মনীতির নিয়ন্তা। সংকীর্ণ, অন্ধ, জাতীয়তাবাদী মনোভাবই বর্তমান হিন্দু রিভাইভ্যালের মূল ব্যাপার। বৈদেশিক সত্যের আমদানীর বিরুদ্ধে একগুঁয়ে প্রতিরোধ চলেছে, যেন সত্যের 'ভারতীয়' 'ইউরোপীয়' নাম আছে!" [অ]

॥ ৮ ॥

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতেও হিন্দু-জাগরণের বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। তার পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে, পুনার দেশীয় কাগজ নেটিভ ওপিনিয়ন বিস্ময়প্রকাশ না করে পারেনি। ভারতীয় ধর্ম ইত্যাদি ব্যাপারে উদাসীন বা ঘৃণাবশ ইংরেজরা সহসা ভারতীয় ধর্মদর্শন সম্বন্ধে উদ্‌গ্রীব আলোচনা করতে আরম্ভ করেন—এই জিনিসটা দেখিয়ে দেয় তার ব্যাপকতা ও গভীরতার রূপকে। আগেই বলেছি, ভারতধর্মের আশ্চর্যজনক বৈদেশিক সমাদর তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু একে কেন্দ্র করে যে-ভারতীয় জাতিচেতনার সূত্রপাত হচ্ছে, তাতে চিন্তিত হয়েছিলেন তাঁরা। শাসক হিসাবে শাসিতের চেতনা সম্পর্কে অবহিত থাকতেই হয়। এই কারণেই সরকারী ইংরেজ কর্মচারীরা এই ধর্মান্দোলন সম্পর্কে অত বেশি সজাগ মনোভাব দেখিয়েছিলেন। সরকারী কাজে ভারতের নানা জায়গায় এঁরা ছড়িয়ে থাকতেন বলে এঁদের সাক্ষ্য খুবই মূল্যবান। নেটিভ ওপিনিয়ন ১৮৯৪, ১৫ জুলাই এ-সম্পর্কে লিখেছিল :

"Judging from our own side, we were considerably surprised to read from time to time expressions like that which forms the first part of the above heading [*The Revival of Hinduism*] emanating from numerous European officials, high or low, especially when the cry came not only from various parts of this country, for which there may be a justification, but from foreign parts of this country, for which there does not appear to be any."

লণ্ডন টাইমসের সংবাদদাতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে সংবাদ দিতে গিয়ে এইকালে 'রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের' জাগরণের কথা লিখেছিলেন।১৭ এ-সম্পর্কে অনস্বীকার্য সাক্ষ্য পাওয়া যায় স্যার অ্যালফ্রেড লায়ালের উক্তিতে, যা উদ্ধৃত হয় বোম্বাইয়ের টাইমস অব ইণ্ডিয়ার ১৮৯৫, ৬ মে'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে। 'রিভাইভ্যাল অব হিন্দুইজম্' নামক উক্ত রচনার মধ্যে বলা হয় : অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার খ্রীস্টীয় মিশন সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি বক্তৃতায় বলেছিলেন, ভারতের ব্রহ্মণ্যধর্ম মৃত; অতীতের গৌরবমাল্য

১৭ "The correspondent of the London *Times*....declares....that orthodox Hinduism is reviving throughout the country." [*Madras Times*; January 20, 1896]

পরে থেকে, এবং নিজ মতাবলম্বীদের সংখ্যাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেই সে সন্তুষ্ট। কদাপি এ ধর্ম আক্রমণশীল হতে ইচ্ছুক নয়, মিশনারি পাঠিয়ে অপরকে নিজেদের কুক্ষিগত করতে উৎসাহী নয়। ভারতের প্রধানতম ধর্ম সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ হয়েছে অবিলম্বে। অন্যান্যদের মধ্যে স্যার অ্যালফ্রেড লায়াল লেখায় ও বক্তৃতায় পরিষ্কার জানিয়েছেন—হিন্দুধর্ম অবশ্যই মিশনারি ধর্ম, প্রাণশক্তি ও কর্মশক্তিতে পূর্ণ, ক্রমাগত সে সংলগ্ন অরণ্য-অঞ্চলের ও পার্বত্যভূমির উপজাতিদের নিজ ধর্মে গ্রহণ করছে। স্যার অ্যালফ্রেড লায়াল যখন মধ্যভারতে এবং অন্যান্য স্থানে কর্মরত ছিলেন তখন সেখানকার জনগণের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধানাদি করেছেন। ব্রহ্মণ্যধর্ম মৃত বা মুমূর্ষু তো নয়ই, বরং তার মধ্যে নানাদিকে উত্থানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা এই ধর্মের পক্ষসমর্থনে বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ করছেন, পুরনো রীতিতে নয়, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক প্রথায়। অনেক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে এ-ব্যাপারে, গ্রন্থাদিও। স্যার অ্যালফ্রেড লায়ালের মতো মিঃ বার্থও ভারতীয় ধর্মবিষয়ে লিখিত বুলেটিনে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থের মধ্যে তিনি উচ্চ শক্তির প্রকাশ দেখেছেন। এই সমস্ত কথাই টাইমস অব ইণ্ডিয়ার আলোচ্য রচনায় পাই।

এই হিন্দু-উত্থানকে অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই কুটিল চোখে দেখেছিলেন। লাহোরের সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেটে (মাদ্রাজ মেলে ১৮৯৮, ২৪ ফেব্রুয়ারিতে উদ্ধৃত) এর রাজনৈতিক দিকটিকে আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করা হয়। এক পত্রলেখকের কাছে পঞ্জাবের দুর্গাপুজো অনুষ্ঠান ভয়ানক কাণ্ড এবং 'দুর্গা মাঈ কী জয়' ভয়ংকর ডাক মনে হয়েছিল। হিন্দু-উত্থান মানে ব্রাহ্মণ আধিপত্য। "দুর্গাভক্ত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করা হল, দুর্গার আগমনে মানবসমাজের কোন্ কল্যাণ হবে? ব্রাহ্মণ বললেন, মায়ের আবির্ভাবে হিন্দুদের ঝিমানো রক্তে দোলা লাগবে। তারপর ভাবোন্মত্ত জনতার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'শুনতে পাচ্ছ না ওদের চিৎকার—বন্দেমাতরম্! এই হল লাভ। বাইবেল, কোরানের চেয়ে অনেক প্রাচীন আমাদের পবিত্র ধর্ম এখনো প্রাণশক্তি দেখাচ্ছে। বৃটিশরাজ যেমন এসেছে তেমনি যখন বিদায় নেবে, এবং তাদের কথা ভুলে যাবে সবাই, তখন দুর্গা মাঈ আবার প্রকাশিত হবেন পূর্ণ প্রভায়, যেমন তিনি পূর্বে হয়েছিলেন।' ব্রাহ্মণের কথা শুনে দর্শকেরা স্পষ্টতঃ অভিভূত হয়ে বারবার চিৎকার করতে লাগল, জয় জয় দুর্গা মাঈ কি জয়!" [ঐ]

তারপর ঃ "হিন্দু রিভাইভ্যাল যতখানি শোনা যায় তার থেকেও ব্যাপক। দূর মাদ্রাজে পুস্তিকা প্রণীত হচ্ছে, এবং প্রেসিডেন্সির সর্বত্র মস্ত-মস্ত জনতার সামনে প্রচারকেরা বক্তৃতা করছেন। যেসব মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তাদের পুনর্নির্মাণ করে উজ্জ্বল রঙ লাগানো হয়েছে।" গোটা ব্যাপারটাই নির্ঘাত ব্রাহ্মণ-চক্রান্ত এবং এর রাজনৈতিক ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। "এ সবই কি ব্রাহ্মণদের তরফে যেভাবেই হোক তাদের লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের মরীয়া চেষ্টা নয়? যদি তাতে তারা সমর্থ হয়, কি হবে? স্বাভাবিক পরিণতি —বৃটিশরাজের উৎখাতের চেষ্টা—যারা ব্রাহ্মণদের টেনে নামিয়েছে সাধারণের স্তরে। বৃটিশ-রাজকে বিতাড়িত করা তাদের পক্ষে অবশ্যই বৃথা স্বপ্নের ব্যাপার, কিন্তু সেটা যে, বৃথা স্বপ্ন এটা পাকাপাকিভাবে বোঝার আগে রক্তের নদী বয়ে যেতে পারে।"

অনেকগুলি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র কিন্তু বিশেষ সহানুভূতি ও সমাদরের চোখেই এই উত্থানকে দেখেছিল। আলোচ্য বিষয়ে যেসব সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় এইসব সংবাদপত্র এইকালে লিখে গেছে, সেগুলি রচনাগুণে অনেক সময়েই উৎকৃষ্ট স্বীকার করতে হবে। দেশীয় সংবাদপত্রের তুলনায় তাদের রচনামান যে, উন্নততর তাতে সন্দেহ নেই। দেশীয় কাগজে যেখানে ভাবাবেগের প্রাধান্য, সাহেবী কাগজে সেখানে ছিল যথোপযুক্ত পটভূমিকাসহ বিশ্লেষণ। এমন হবার কারণ, প্রথমতঃ সাহেবী কাগজগুলি ব্যাপারটার সঙ্গে অনুভূতি-

যোগে জড়িত না থাকায় নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ অর্থসামর্থ্য বেশি থাকায় তারা অধিক শক্তিশালী লেখকদের সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত রাখতে পেরেছিল। তদুপরি বিদেশী বলে, এই জাগরণকে অনুরূপ ইউরোপীয় জাগরণের পাশে রেখে বিচার করতে পেরেছিল, যা করবার মতো মানসিক প্রস্তুতি ভারতীয় সংবাদপত্র-লেখকদের ছিল না, কিংবা ইউরোপীয় ইতিহাসের কোনো অংশের সংগে ভারতীয় ব্যাপারের তুলনা করবার মতো মানসিক স্বাধীনতা তাঁরা সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি।

এই পর্বে টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় ভারতের ধর্মান্দোলন বা সংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে অনেকগুলি সম্পাদকীয় আমরা দেখেছি। সংস্কার-আন্দোলনের প্রতি পত্রিকাটির বিশেষ প্রীতি ছিল, রামমোহন রায় বা কেশবচন্দ্র সেনের প্রশংসা সর্বদাই পত্রিকাটি করত, এবং ভারতের নিকট-ইতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিষয়ে মন্তব্য করতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকত। শেষোক্ত ব্যক্তিরা প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত ভারতীয় হলেও দেশীয় ভাবানুপ্রাণিত ধর্মনেতারা যে, এর মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন না, তার প্রমাণ, স্বামী দয়ানন্দ বা স্বামী নারায়ণের উপরে রচিত সম্পাদকীয়।১৮ স্বামী বিবেকানন্দের যোগগ্রন্থের উপরে এঁদের তিনটি বৃহৎ সম্পাদকীয়ের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধেও এঁরা উদাসীন থাকেন নি। অধ্যাপক টনী 'ইম্পিরিয়াল অ্যান্ড এশিয়াটিক কোয়ার্টার্লি'তে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলে এঁরা ১৮৯৬, ২২ ফেব্রুয়ারির সম্পাদকীয়তে তা নিয়ে আলোচনা করেন, যার মধ্যে কেশবচন্দ্রের নববিধানের পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবের কথা ছিল, এবং পরে ম্যাক্সমুলারের শ্রীরামকৃষ্ণ-গ্রন্থ বেরুলে তার উপরে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখেন, যার আলোচনা আমরা যথাস্থানে করব।

হিন্দু-উত্থান নিয়ে যখন চতুর্দিকে আলোচনার ঢেউ, সেইসময়ে মাদ্রাজ মেলে 'জনৈক হিন্দু'র একটি চিঠি বেরোয়, যেটিকে মিশনারিরা লিখতে পারলে খুশি হতেন। দাসজাতির অন্যতম প্রতিনিধির এই পত্রটি অত্যন্ত

---

১৮ টাইমস অব ইন্ডিয়া ১৮৯৭, ২৩ অক্টোবর 'দি মর্নিং স্টার অব হিন্দু রিফর্মেশন' নামক দীর্ঘ মূল সম্পাদকীয় রচনায় রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীদের সংস্কারকর্মের বিষয়ে আলোচনা করে। রামমোহনের ইংলণ্ড-জীবন সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের রচনার সারাংশ এতে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৯৭, ৩০ অক্টোবর 'স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী' নামক রচনায় দয়ানন্দের জীবনচিত্র দেবার পরে বলা হয়, মূর্তি দূর করার ব্যাপারে শংকরাচার্য যা পারেন নি, দয়ানন্দ তা পেরেছেন। কবীব, নানক, দেবতা তাড়িয়ে নিজেরা দেবতা হয়েছিলেন, দয়ানন্দ তা হননি। ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি আন্দোলনের সংগে আর্যসমাজের আন্দোলনের তুলনা করে বলা হয়, অন্যদের তুলনায় এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি এখনো বেশি।

জি পি পিল্লাইযেব 'রিপ্রেজেনটেটিভ ইন্ডিয়ানস্' নামক গ্রন্থের উপরে একই নামের সম্পাদকীয় নিবন্ধে (১৮৯৮, ৫ ফেব্রুয়ারি) উক্ত গ্রন্থে আলোচিত এবং অনালোচিত বিখ্যাত ভারতীয়গণ এবং তাঁদের নানামুখী কীর্তির কথা উত্থাপিত হয়। তার মধ্যে 'আমাদের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাগ্মী-ধর্ম-সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন', 'পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যাঁর মনীষা যে-কোনো জাতির পক্ষে গর্বের বিষয়,' 'ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, লাবণ্যময়ী, আকর্ষণীয়া হিন্দু কাব্য-সরস্বতী তরু দত্ত', 'উচ্চ সুরে বাঁধা জীবনবিশিষ্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভারতীয় বিধবাদের রক্ষক এবং নিঃসহায়ের সহায়', 'বিরাট আইন-প্রতিভাসম্পন্ন অথচ কোমল হৃদয়সম্পন্ন, সহায়ক ও শান্তিস্থাপক মনোমোহন ঘোষ,' 'বাংলা-ভাষার অসাধারণ সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহারকারী ঔপন্যাসিক, বাংলার স্কট বঙ্কিমচন্দ্রের' কথা পেয়েছি। পেয়েছি বোম্বাইয়ের স্যার জামসেদজী জিজিবয়, গোকুলদাস তেজপাল, নওরোজি ফার্দুনজি, কার্সনদাস মুলজি, মথুরাদাস লাওজি, বেরামজি মালাবারি, লক্ষ্মীদাস খিমজি; মাদ্রাজের স্যার শেষাদ্রি আয়ার, স্যার তানজোর মাধবরাও, রঙ্গনাথ মুদালিয়রের কথা। কিছু সহজ সাধারণী-করণও পেয়েছি : 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সি তৈরী করে লোকহিতৈষী, মাদ্রাজ রাজনীতিবিদ্ আর বাংলা বৃহৎ আন্দোলনের নেতা।' পুনশ্চ : 'বাংলায় ফলে সাহিত্য, বোম্বাইয়ে ব্যবসা, এবং মাদ্রাজে গণিত।'

"দাক্ষিণভারতের হিন্দুরা রিভাইভ্যালিজম নিয়ে যেন ক্ষেপে উঠেছে। আসল ব্যাপারটা ফক্কাকারি; ওর থেকে কোনো-কিছু ভাল হবে কিনা সন্দেহজনক। তবে ব্যাপকতর, গভীরতর যে-পরিবর্তন ধীরে সমাজের উপরে আসছে, তার চিহ্ন হিসাবে ব্যাপারটি আমাদের মনোযোগ পেতে পারে। তবে নিছক 'চিহ্নই', বেশি-কিছু নয়। আমি যে-পরিবর্তনের কথা বলছি, তা নানামুখী। আমাদের দৈনন্দিন জীবন, চিন্তাধারা, ধর্ম, শাসনব্যবস্থা ও শাসক, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা পর্যন্ত এখন পাশ্চাত্ত্য থেকে যে-মহান সভ্যতাধারা আসছে, তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আর এই বিশাল স্রোতোধারায় যদি আমরা উল্টোগতির ছোট-ছোট ঢেউ তুলবার চেষ্টা করি, তাকেও অবশ্য আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে হবে, কেননা তা ক্রিয়াশীলতার অংশ, যা সুমহৎরূপে পাশ্চাত্ত্যে বর্তমান। এইরকমই একটি উল্টো-ঢেউ হল রিভাইভ্যাল-আন্দোলন। এই আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থকেরা কল্পনা করতে পারে, তাদের উদ্দেশ্য সার্থক হবে এবং ভারতের কোটি-কোটি মানুষের জন্য তা প্রচুর শুভফল এনে দেবে; স্বপ্ননয়নে তারা দেখতে পারে যে, হিন্দুধর্ম সভ্য পৃথিবীর সর্বত্র নিজের ডালপালা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ-সবই শেষ পর্যন্ত স্বপ্নদর্শন, রিভাইভ্যালিস্টদের উত্তপ্ত কল্পনার সৃষ্টি। মাথা ঠিক রেখে যদি তারা আসল জিনিসটি দেখে নিতে পারে তাহলে তাদের কল্পনার অসারত্ব অবিলম্বে প্রতীয়মান হবে। এখনকার হিন্দুধর্ম হল বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের বিশৃঙ্খল সমষ্টি, ভারতীয় জাতির জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেগুলি উদ্ভূত হয়েছে। নামটা এক, কিন্তু এক নামের তলায় নানা পদ্ধতি। ঐ সকল ধর্মরীতির প্রত্যেকটি নিজ কালের প্রয়োজন মিটিয়ে এখন আমাদের কাছে শাস্ত্রনিবদ্ধ প্রাচীন বস্তুনিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক মানুষ তাদের ঐতিহাসিক আকর্ষণের বিষয় মনে করে মাত্র। আমাদের ঠিক অবস্থাটা যে বোঝে না, তার কর্ম নয় আমাদের মরা হাড়ে জীবন দেওয়া। ঐ হিন্দু আন্দোলন যেন আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহে পাথুরে অস্ত্রব্যবহার! প্রাগৈতিহাসিক পাথুরে অস্ত্র যেমন বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত থেকে আমাদের দেখিয়ে দেয়, আমরা কোথা থেকে কোথায় এসেছি, তেমনি প্রাচীন হিন্দুদের দোলনার বিশ্বাস আর শৈশব-ধর্মের ধারক শাস্ত্রগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়ামের শোভাবর্ধন করার যোগ্য। আমরা এখন কী? রোগা-দুব্লা একটা জাত, অন্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার মতো, বা অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলবার মতো শক্তি যার নেই, পৌরোহিত্যের অত্যাচারে যে বিধ্বস্ত, জাতিভেদে জর্জরিত, সামাজিক নানা ব্যাধিতে ভুগে কোনোপ্রকার লড়াইয়ে যে অক্ষম! আমাদের এমন কোন্ গৌরবময় বস্তু আছে যাকে গর্বের সঙ্গে জাগিয়ে তুললে জাতির সামাজিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটবে এবং তাকে নৈতিক চারিত্র দান করে কঠিন জীবনসংগ্রামে যুঝবার ক্ষমতা দেবে? নিশ্চয় তা আমাদের ধর্ম নয়! ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে বিস্ময়ের সামগ্রী আমাদের দর্শনের কথা উঠবে তো? দর্শনের পুনরুত্থান বলতে কী বুঝব? অর্থহীন কথাটা। শিক্ষিত হিন্দুদের পক্ষে এখন যদি কিছু করবার থাকে তা হল, সমাজে দৃঢ়ভিত্তিতে উত্তম আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। দোহাই, প্রাচীনদের প্রজ্ঞার চেহারা দেখাবার জন্য পুরনো পড়ো-পড়ো বাড়ির অন্ধকার গলিঘুঁজিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা যেন না করা হয়।" [অ]

মাদ্রাজ মেল অবশ্যই সাংবাদিক সাধুতায় এই পত্র ছেপেছিল, কেননা বর্তমান পত্রলেখক অনেক পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতাগর্বী হিন্দুর মনোভাবের উদ্ঘাটন করেছিলেন, কিন্তু কাগজটির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। মাদ্রাজ মেলে ১৮৯৪, ৫ জুন 'লণ্ডনের জনৈক সংবাদ-দাতার' একটি দীর্ঘ রচনা বেরোয়, 'ডাঃ লুন অ্যাণ্ড মিসেস বেশান্ত' এই নামে। মিসেস বেশান্ত ভারতভ্রমণ সাঙ্গ করে ইংলণ্ডে গিয়ে বলেন, প্রাচ্যের মহান ধর্মগুলি অবশ্যই খ্রীস্টধর্মের সমতুল, শ্রেষ্ঠতর যদি না হয়। তাতে পাদরি ডাঃ লুন তাঁর সঙ্গে ঘোরতর তর্কযুদ্ধ বাধিয়ে দেন। তার মধ্যে পাদরি-সাহেব যথারীতি হিন্দুধর্মের কুৎসার দ্বারা

স্বধর্মের গৌরব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এবং সবশেষে উচ্চ ধর্মভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো কোনো জাতির জীবনে এই রকম নৈতিক অন্ধকারের ঘন কালো মেঘ জমেনি, যা এই মুহূর্তে হয়েছে আমাদের বিরাট ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে।' তর্কে মেজাজ না হারিয়ে মিসেস বেশান্ত বলেন (বিবেকানন্দের সুরে), খ্রীস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে, হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীস্টান হতে আমি বলিনি। আমি কেবল হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মের গুণগরিমার কথাই বলেছি। "তারা কি শান্তসুন্দর মহান জীবন সৃষ্টি করেনি? মানুষকে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়নি? আনন্দের হাসিতে নিজের হাসি যোগ করেনি? সুতরাং আমাদের মানবভ্রাতাদের ধর্মীয় আদর্শের প্রতি ইষ্টক বা নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ না করে নিজ-নিজ আদর্শ-অনুযায়ী উপাসনা করলেই ভাল করব না?" মিশন্যারিদের কৃপালক্ষ্য ভারতীয় নারীদের বিষয়ে বেশান্ত বলেছিলেন, "ভারতে আমি এমন-কিছু নারী দেখেছি, যাঁরা আমার দেখা মহত্তম নারীকুলের মধ্যে পড়েন। আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা, সুকোমল অন্তর্দৃষ্টি, লাবণ্যময় মর্যাদা, এবং মধুর নম্রতার এমন সমন্বয় তাঁদের মধ্যে ঘটেছে যে, কদাচিৎ সে বস্তু দেখা যায়। ভারতের নারীকে স্বামীর হাতের পুতুল বলা অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়।" বেশান্ত ও লুনের তর্কে বেশান্তের মর্যাদাই রক্ষিত হয়েছিল। লণ্ডনের এই পত্রলেখক সব্যঙ্গে বলেছেন, ডাঃ লুন পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধটি প্রস্তুত করছেন বলে শোনা গেছে, সেটির পাণ্ডুলিপি সংশোধন করলেই ভাল করবেন। ম্যাক্সমুলারের বেদান্ত-বিষয়ে উচ্চ প্রশংসার কিছু উল্লেখ করবার পরে ইনি বলেন, ডাঃ মিলারের উক্তি উদ্ধৃত করে, ভারতে হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের মত-সংঘর্ষ পুরোপুরি আরম্ভ না হলেও বহির্ভারতে তা জোরালোভাবে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এবং সেই লড়াইয়ে ভারতের অসুবিধার কারণ ঘটেনি।

মাদ্রাজ মেলের সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশিত চার্লস জনস্টন নামক এক ব্যক্তির রচনা এইকালে অনেকবারই চোখে পড়েছে। ইনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একান্ত অনুরাগী এবং সেই বিষয়েই সাধারণতঃ লিখতেন। চিকাগোর ধর্মমহাসভা হয়ে যাবার অল্পদিনের মধ্যে, ১৮৯৩, ২৬ ডিসেম্বর, 'ইণ্ডিয়া দি মাদার অব নেশনস্' নাম দিয়ে একটি উদ্দীপ্ত রচনা লিখেছিলেন। সে-লেখা পড়লে বোঝা যায়, ধর্মমহাসভাতরঙ্গের প্রথম আঘাত যাঁদের চেতনায় লেগেছিল, ইনি তাঁদের একজন। উক্ত রচনার শুরু করেছিলেন এই বলে : "এখন থেকে একশো বছর আগে শোপেনহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্ত্য জনগণের মনোলোকে এমন প্রভাববিস্তার করবে, যা মধ্যযুগীয় পৃথিবীর উপরে রেনেসাসের প্রভাবের সমতুল বা ততোধিক।" তারপর চার্লস জনস্টন লিখেছেন, সে-ভবিষ্যৎবাণী অসার বলে মনে হয়েছিল দীর্ঘদিন। স্যার উইলিয়ম জোনস্ বা কোলব্রুক যে-সাড়া জাগিয়েছিলেন, তা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, ক্যালকাটা স্কুলের উত্তরাধিকারী ছিল না, জার্মান ভাষাতাত্ত্বিকেরা অসাধারণ পরিশ্রম করেছিলেন সংস্কৃতচর্চায়, কিন্তু পাণ্ডিত্যের কচ্‌কচিতে অনাগ্রহী পাশ্চাত্ত্যের সাধারণ বুদ্ধিজীবী-মহলে ভারত-সত্যকে ব্যাখ্যা করবার মতো কেউ ছিল না—সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে সবে, "ভারতের শ্বাস আবার পাশ্চাত্ত্যের আত্মাকে কম্পিত করতে আরম্ভ করেছে।" ভারত সম্বন্ধে ইউরোপ আমেরিকায় যে-আগ্রহ দেখা দিয়েছে, তাকে একেবারে 'উদ্দীপনা' বলতে চেয়েছেন এই লেখক, যা শোপেনহাওয়ারের ভবিষ্যৎবাণীকে সার্থক করে তোলার সূচনার রূপ। "পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে রাজ্ঞীর মতো ভারতবর্ষ" তার প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাসের মহিমার দ্বারা, অবিস্মরণীয় ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্যের নেত্রহারী আকর্ষণের দ্বারা বন্দী করে রাখে কল্পনাকে—সে তার মন, বুদ্ধি ও অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে অলৌকিক কীর্তির উন্মোচনের দ্বারা এখন পাশ্চাত্ত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে"—একথা ভাবাবেগের সঙ্গে লেখক বলেছিলেন; ধর্মমহাসভাসৃষ্ট সে-আলোড়ন

আমেরিকা ও জার্মানীতেই প্রবলতর এবং ইংলণ্ডে অপেক্ষাকৃত কম, তাও বলেছিলেন।

একই লেখক ১৮৯৫, ১ মার্চ, জনৈক ভারতীয় কবির ভারতসত্য-উন্মোচক একটি কাব্যগ্রন্থের আলোচনাপ্রসঙ্গে ভারতীয় রেনেসাঁসের চরিত্র ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় রেনেসাঁস, এঁর মতে, বহির্গত সত্যের সন্ধানী নয়; আত্মাকে আলোকিত করে যে-সত্য তারই উন্মোচক, যার বিষয়ে 'পূর্ব' কথাটি ভৌগোলিক অর্থে প্রযুক্ত হওয়া উচিত নয়, তা হল মানবহৃদয়ের পূর্বদিগন্ত, সূর্যোদয়ের স্থান।১৯

মাদ্রাজ টাইমস 'দি বেদান্ত' নামে ১৮৯৪, ১৭ অগস্টের মুখ্য সম্পাদকীয়তে একই ধারায় আলোচনা করেছিল। রেভাঃ এস ড্যানিয়েল ইণ্ডিয়ান চার্চ কোয়ার্টারলি রিভিউ-এ এক প্রবন্ধে ইউরোপ আমেরিকা কেন বেদান্তের প্রবল প্রকোপে পড়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেন। সেই সূত্রেই বর্তমান সম্পাদকীয়। সম্পাদকের মতে ক্যাথলিক-মতের যেমন অনেক শাখা, তেমনি হিন্দুধর্মেরও; তার মধ্যে বেদান্ত সর্বাধিক জনপ্রিয়। বেদান্ত সত্য কি মিথ্যা, সে আলোচনা স্থগিত রেখে একটা কথা কিন্তু স্বীকার করতে হবে—এ অতি কাব্যিক দর্শন। প্রাচীন গ্রীকরা, পরে ইহুদীরা এই দর্শন-প্রভাবিত। জার্মানরা এই দর্শনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট। শোপেনহাওয়ার বলেছেন, 'বেদান্ত আমার জীবনের সান্ত্বনা, মরণেও তাই হবে;' অধ্যাপক ডয়সন বলেছেন, 'অবিমিশ্র অবস্থায় এই দর্শন বিশুদ্ধ 'নৈতিকতার' পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থন।' রেভারেণ্ড ড্যানিয়েল বলতে চেয়েছিলেন, জার্মান-মন তত্ত্বপ্রিয় বলে তত্ত্বসার বেদান্তের অনুরাগী। কিন্তু সম্পাদকের প্রশ্ন—এখন যারা ইউরোপ আমেরিকায় বেদান্তের জন্য ব্যাকুল, তারা তো অত তত্ত্বপ্রিয় নয়, তাহলে? অবশ্যই কালধর্মে ব্যাপারটা ঘটছে। এই বিশেষ কালকে সৃষ্টি করেছেন কে? বহুলাংশে বিবেকানন্দ, যিনি পুরীর বিকট দেবতা, কাশীর বাঁদর, বা ল্যাংটা যোগীদের হিন্দুধর্মকে সরিয়ে পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষিত সমাবেশে শুদ্ধতম আলোকে হিন্দুধর্মের মার্জিত রূপকে তুলে ধরেছেন।২০

এই কাগজেই ১৮৯৪, ১৪ নভেম্বর 'পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় হিন্দুধর্মের প্রভাব' বিষয়ে

১৯ "In reading song after song, as the train hurried through Baveria.... I had felt all the time that this chaplet of verse bore a very real and intimate relation to a movement I have written much of, the movement for the revival of Oriental learning and the ideas of the East, that I have called Indian Renaissance, following a suggestion of Schopenhauer's......

"The truth of the Indian Renaissance is something better and higher; it is not that we are interested in, and imitate Eastern things and Eastern thoughts, but rather that the light of that old inward dawn that illumined these Indian thoughts.... The word Eastern is used not so much in a geographical sense, but rather as indicating the Eastern side in every man's heart, the place from within where the sunrise comes." [*Madras Mail*; March 1, 1895]

২০ "For hundreds of years the Western world has looked upon Hinduism as one of the crudest forms of heathen belief, on a par with the fetish-worship of the Hottentos.... What wonder that when one of our most learned men pronounced the Hindu system to be most attractive, and when finally a Hindu monk stood up before a crowd of men and women and put Hinduism before them in its fairest light, devested of all its gross appendages—what wonder that a number of astonished people accepted the new ideas with greedy ears."

['The Vedanta'; *Madras Times;* Aug. 17, 1894]

বারট্রাম কীর্টলির বক্তৃতা প্রকাশিত হয়, যিনি বেদান্তপ্রভাবিত পাশ্চাত্ত্য-লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার, শিলিং, ফিকটে, ম্যাক্সমুলার, ড্রুমণ্ড, হাক্সলি, স্টপফোর্ড ব্রুকস্ প্রভৃতির নাম করেন।

এইকালে প্রকাশিত প্রমথনাথ বসুর 'হিন্দু সিভিলাইজেশন্ আণ্ডার বৃটিশ রুল' নামক বইটির আলোচনাসূত্রে হিন্দুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য, তার শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ করে নেয় পত্রিকাটি। প্রমথনাথ বসুর বইটি সেকালে সর্বাধিক আলোচিত এবং বহুল প্রশংসিত গ্রন্থের অন্যতম। ভারতবর্ষের তাবৎ প্রধান সংবাদপত্রে এর উপরে সম্পাদকীয় রচিত হতে দেখেছি। হিন্দু-উত্থানের সংশ্লিষ্ট হয়ে বইটি বিশেষ মনোযোগ পায়, এবং মাদ্রাজ টাইমস ১৮৯৪, ৩১ অক্টোবর সম্পাদকীয়তে লেখে—হিন্দুরা যে, মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থরচনা করতে সমর্থ, এখানে তার অনস্বীকার্য প্রমাণ। গ্রন্থকার হিন্দু, গোঁড়া হিন্দু নন, কিন্তু কুণ্ঠিত হিন্দুও নন। তিনি বলেন, জাতিপ্রথা ভারতের ভাল ও মন্দ দুইই করেছে। এই প্রথার দরুন হিন্দুরা একেবারে ডুবে যায়নি আবার উঠতেও পারেনি; তা শৃংখলা রক্ষা করেছে, সেইসঙ্গে প্রগতির পথরোধও করেছে। সুতরাং জাতিপ্রথার বিলোপ নয়, সংস্কার প্রয়োজন। বৃটিশ শাসনের গুণ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন এই লেখক একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন, ইংরেজ তার নিজের শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনে নষ্ট করেছে ভারতের কুটীর-শিল্পকে, যার ফল কারুশিল্পীদের মৃত্যু। অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য দায়ী ইংরেজ। এক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে কারিগরি শিক্ষার উপরে জোর দিতে হবে। মাদ্রাজ টাইমসের সম্পাদক প্রমথনাথ বসুর এই সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি সত্যের খাতিরে, এবং বসুর মতের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ ঐকমত ঘটেছিল যখন বসু বলেছিলেন, ইংরেজশাসনের আদিপর্বে হিন্দুধর্মের সবকিছুকে নস্যাৎ করবার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙালী যুবকদের মধ্যে, আর এখন দেখা যাচ্ছে হিন্দুধর্মকে সমর্থন করার প্রবণতা—তবে তার স্থূল রক্ষণশীল রূপকে নয়, উচ্চ দার্শনিক রূপকেই গ্রহণ করা হচ্ছে। সর্বধর্মের সত্যকে স্বীকার করার প্রবণতা দেখা গেছে এই উত্থিত বিশুদ্ধ হিন্দু-ধর্মের মধ্যে, তাই খ্রীস্টান-ধর্মসত্যকে আত্মসাৎ করতে বাধা নেই, কিন্তু ভারতবর্ষ খ্রীস্টান হয়ে যাবে, সে সম্ভাবনা এখন দূর অস্ত্। বলাবাহুল্য, শেষোক্ত অংশে প্রমথনাথ বসু হিন্দুধর্মের নবউত্থানের কথাই বলেছেন।

ইংরেজশাসন ভারতের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট করে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে, একথা স্বীকার করার সৎসাহস যে-সাহেবী পত্রিকার থাকে, তার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন নয়, বিদেশীয় শিক্ষার অন্ধ আনুগত্য কিভাবে একটা জাতিকে আত্মভ্রষ্ট করে দিতে পারে। 'অ্যান ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (১৮৯৫, ১১ ফেব্রুয়ারি) মাদ্রাজ টাইমসের সম্পাদক হিন্দুদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার অভাবের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে এমন কতকগুলি কথা বলেছিলেন, যেগুলি নিজস্ব মৌলিকতায় উজ্জ্বল। [বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে কী গভীর ঐক্য সেখানে!] ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে মৌলিকতা দেখা যায় না—ইংরেজদের এই অভিযোগ। সম্পাদক প্রশ্ন করেছেন, যদি না দেখা যায়, তার দায়িত্ব কার—ভারতীয়দের না আমাদের? হিন্দুরা প্রাচীন যুগে মৌলিক চিন্তার জন্য বিখ্যাত ছিল। মুসলমান আক্রমণ হিন্দুদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণের সঙ্গে-সঙ্গে মানসিক স্বাধীনতাও হরণ করে নিল। মুসলমান শাসনকর্তাদের অবজ্ঞার মধ্যেও হিন্দুরা কি-রকম মৌলিক বৈজ্ঞানিক চিন্তায় সমর্থ তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের গ্রন্থ থেকে: জয়পুরের রাজা জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়সিংহ ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসি জ্যোতির্বিদের ভ্রমসংশোধন করে দিয়েছিলেন। মুসলমানের পর এল ইংরেজ আমল, তারা

নিজেদের ভাষা ও শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে পঙ্গু করে দিল ভারতীয়দের মনকে, অথচ ধিক্কার দিতেও ছাড়ল না মৌলিকতা নেই বলে! ২১

তবু ভারত জাগছে। "বস্তুতঃপক্ষে ভারতবর্ষে আমরা এখন রেনেসাঁসের সূচনাপর্বের মধ্যে আছি। বহু বৎসর ধরে 'মৃদু হিন্দু' যেন ঘুমিয়ে ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে নবজন্মের লক্ষণ। যে দিকেই তাকাই না কেন দেখতে পাই, ভারতের লোকেরা নিজস্ব-ভাবে ভাবতে ও কাজ করতে আরম্ভ করেছে।" শিল্পবাণিজ্যে, রাজনীতিতে, সাংবাদিকতায় এবং বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতির কথা বলে শেষোক্ত ক্ষেত্রে লেখক চূড়ান্ত ধিক্কার দিয়েছেন ভারতশাসক ইংরেজদের, যারা ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর মতো মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের সমাদরে অনিচ্ছুক, অথচ একই সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে মৌলিকতা নেই বলে চীৎকার করে গগন ফাটাচ্ছে! প্রবন্ধ শেষ হয়েছিল এই কথাগুলি দিয়ে :

"প্রাচীন ভারতীয়গণের মধ্যে যে-অপূর্ব মৌলিক প্রতিভা পূর্ণাকারে বর্তমান ছিল, তা নিঃসন্দেহে এখনো ভারতবর্ষে বর্তমান। ভারত যখন বিজিত, নব ব্যবস্থার নীরস শিক্ষার অধীন যখন সে, তখন তার প্রতিভা বাধাগ্রস্ত ও মূর্ছাহত। কিন্তু তা অন্তর্নিহিত হয়ে ছিলই। নবজাগরণ শুরু হয়ে গেছে। এখন আবার সে জাগবে, আরও শক্তি নিয়ে, কারণ দীর্ঘনিদ্রার বিশ্রাম সে পেয়েছে।" [অ]

"হিন্দু রিভাইভ্যাল! যদি সত্যই কোনো জাগরণ হয়ে থাকে তবে তা মৃত্যুর পূর্বের জাগরণ!"—এক তরুণ উৎসাহী মিশনারির এই কথাগুলি দিয়ে মাদ্রাজ টাইমসের ১৮৯৫, ২ মার্চের সম্পাদকীয় আরম্ভ হয়েছিল। কোন্ পরিবেশে মিশনারি-যুবকটি ঐ কথাগুলি বলেছিলেন?

"দৃশ্যটি চমকপ্রদ। মহীশূর-রাজপ্রাসাদের সুসজ্জিত গ্যালারিতে বিরাট একদল ইউরোপীয় সমবেত। মিশনারি সেখানেই উপবিষ্ট। নিকটেই তরুণ মহারাজা সপারিষদ সিংহাসনে আসীন। নিম্নে উদ্যান; সেখানকার অন্ধকারকে দগ্ধ করে জ্বলছে মশালের সারি; যন্ত্রবাদ্যের উচ্চস্বরে পূর্ণ হয়ে আছে চারিপাশ; একদল প্রাচ্য অশ্বারোহী চক্রাকারে অশ্বকৌশল দেখাচ্ছে; তার পূর্বে সারাদিন ধরে পৌরোহিত্যের দীর্ঘ কলাকৌশল দেখিয়েছে পুরোহিতেরা; বৈদিক আশীর্বচনের অবিরাম বর্ষণ তৎসহ—তারই উপরে ধ্বনিত হল মিশনারিটির কথাগুলি : হাঁ জাগরণ, তবে চিরনিদ্রার জন্য!" [অ]

মিশনারির কণ্ঠস্বরের নাটকীয় চমৎকারিত্বের জন্য সম্পাদক সে-সম্বন্ধে কিছু ভাবনা-চিন্তা করেছেন। সত্যই, দীর্ঘদিনের রোগী যখন সহসা বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখনই

২১ "And then at the top of all came the English, setting up their schools, and teaching the whole country according to novel lines. In the matter of education the English system, in the old days, was about as wooden a system as could well be conceived; and the deadening effect of endevouring to foist an English public school education upon Indian students can best be imagined. Latin nouns, Greek particles, Saxon roots for lads to whom English was a foreign tongue were the best possible mediums for blunting anything like originality that had remained in Indian students after the stormy years through which Indian scholarship had passed. The Universities are our own creation, and yet we are wont to sneer at the anxiety of candidates to pass. We have forced the study of English upon the natives of India, and when they have the courage to write or to speak we ridicule their attempts." ['An Indian Renaissance;' *Madras Times*; Feb.11, 1896]

বিস্ময়কর রচনা, শাসকজাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের পক্ষে!

সন্দেহ হয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। ইতিহাস থেকে সমর্থক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করবার চেষ্টাও তিনি করেছেন। যেমন, আইরিশ ভাষাকে পুনজীবিত করবার প্রয়াসের ফল হয়েছে তার অধিকতর মৃত্যু। যেমন, রোমীয় প্যাগানধর্ম; খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে লড়াই করে ক্রমে পরাভূত হতে-হতে সহসা চতুর্থ শতাব্দীতে তার শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল, রোম-সম্রাট জুলিয়ান দর্শনশাস্ত্রের ভক্ত, রাজত্বের বিংশ বৎসরে খ্রীস্টধর্ম ত্যাগ করে প্যাগানমতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, পুরনো জাঁক-জমক ঐশ্বর্যের প্রত্যাবর্তনও ঘটেছিল, কিন্তু জুলিয়ানের বিদায়ের পরেই অবিলম্বে তার বিদায়। মিশনারি তরুণটির মনে সম্ভবতঃ এই ইতিহাসকথাই জেগেছিল হিন্দুধর্মের রিভাইভ্যাল দেখে। কিন্তু বর্তমান সম্পাদকীয়ের লেখক মনে করেন না, সেই একই জিনিস ঘটবে ভারতের ক্ষেত্রে। একদিন বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মণ্যধর্মের উপরে আধিপত্য করেছিল, তারপর ব্রহ্মণ্যধর্মের উত্থান ঘটল, সে-বিজয় তো স্থায়ীই হয়েছে। এই যে হিন্দু-উত্থান—এ তো রাজ-শক্তির সহায়তায় ঘটেনি যে, রাজার বিদায়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাসের ঘরের মতো তা ধ্বসে যাবে! এ জাগরণ জাতীয় জাগরণ।—

"হিন্দুধর্মের বর্তমান উত্থান কি স্থায়ী হবে, না-কি এটা নিবন্ত প্রদীপের শেষ জ্বলে ওঠা? বাইরে থেকে শান্তভাবে যে বিচার করবে, তার কাছে এটা জাতীয় জাগরণ ছাড়া আর কিছু নয়।...এ আন্দোলন নিজ শক্তিতে জেগেছে। হিন্দুধর্মকে যখন একেবারে মৃত বলে মনে হয়েছিল, তখন হঠাৎ যেন দেখা গেল পুনজীবন পেয়ে গেছে।...সর্বত্রই আন্দোলন। নিঃসন্দেহে জাতীয় আন্দোলন, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, সর্বত্রই একই দৃশ্য, সর্বত্রই বিরাট জনতা জাতীয় কোনো মিশনারির বা জাতীয় কোনো ঋষির [অর্থাৎ বিবেকানন্দের] নামে বৈদ্যুতিক উন্মাদনা বোধ করছে। সংস্কৃত ছাপাখানা, সংস্কৃত বিদ্যালয়, হিন্দু ধর্মপ্রচারক, ধর্মশিক্ষার্থী ক্রমেই দেখা যাচ্ছে সর্বদিকে, কোনো আর্থিক লাভের সম্ভাবনা নেই, তবুও।...হিন্দুধর্মের এই উত্থান ব্যাপারটির গুরুত্ব অপরিসীম; ভাল দিকে হোক, মন্দ দিকে হোক, ভারতের ইতিহাসে গুরুতর পরিবর্তন ঘটাবে তা।"

॥ ৯ ॥

দেশীয় পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত জাগরণ-সংবাদের অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নেই। মিরার কিভাবে দিনের পর দিন জাগরণের পক্ষে প্রচার করেছে এবং জাগরণের সর্ববিধ সংবাদ উৎসাহের সঙ্গে ছেপেছে তা আমরা যথেষ্ট দেখেছি, পরেও দেখব। বেঙ্গলী প্রধানতঃ রাজ-নৈতিক সংবাদপত্র, ধর্মজাগরণ নিয়ে বেশি ব্যস্ততা দেখাবার কারণ ছিল না, তবু ঐ প্রবাহ থেকে দূরে সরে থাকাও সম্ভব ছিল না। কয়েক বৎসরের ধর্মপ্লাবনের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা এই পত্রিকা ১৯০০, ১৯ অক্টোবর 'দি হিন্দু রেনেসাঁস' নামক দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচনায় ঐ উত্থানের প্রবলতাকে স্বীকার করে তার যুক্তিহীন আতিশয্য সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল। "একদিন ছিল," পত্রিকাটি লিখেছিল, "যখন আমাদের যুবকেরা যা-কিছু হিন্দু তার বিষয়েই গভীর ঘৃণা বোধ করত, তাই ছিল ফ্যাশান, সেইসঙ্গে যা-কিছু ইউরোপীয় তার বিষয়েই আতিশয্যপূর্ণ অনুরাগ।" "ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার ফলেই ও-জিনিস ঘটেছিল।" শুরু হয়েছে উল্টোপাক। "এখন আমরা চলে গিয়েছি বিপরীত প্রান্তে। যা-কিছু হিন্দু তারই প্রশস্তি করে, যা-কিছু ইউরোপীয় তাকেই ঘৃণা করছি।" দুই প্রান্তেই রয়েছে 'কুসংস্কার।' ইয়ং-বেঙ্গলের উন্মত্ত বিদেশ-প্রেমের চিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত। তারই বিপরীত হিসাবে স্বধর্মানুরাগী শিক্ষিত যুবকদের এই চিত্রটি কম উপভোগ্য হবে না: "কলকাতার রাস্তায় দেখা যাচ্ছে দলে-দলে যুবক, তাদের ঘাড়ে-পড়া লম্বা চুল, ঘুরে বেড়াচ্ছে পকেট-এডিশন

গীতা নিয়ে, খুবই সম্ভব গীতার দু'চারটি শ্লোকের বেশি তারা জানে না; এবং তারা একটি মত প্রচার করে বেড়াচ্ছে যার মূল কথা হল, সবকিছু হিন্দুব্যাপার সম্বন্ধে ভক্তি বোধ করে সবকিছু পাশ্চাত্ত্যব্যাপার সম্বন্ধে ঘৃণাবোধ করা।" এই শ্রেণীর যুবকদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলার' বিধান দিয়েছিলেন, আমরা জানি। এবং বেঙ্গলীর সম্পাদক মহাশয়ও স্বামীজীর চিন্তাধারার অনুসরণ করে বলেছিলেন, হিন্দু-ধর্মে আছে প্রচণ্ড ক্রিয়াশীলতার প্রেরণা, 'পৃথিবীর ধর্মসমূহের মধ্যে এই ধর্ম সর্বাধিক প্রাকটিক্যাল,' এই ধর্মে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, ও যোগের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে (কিভাবে হয়েছে সম্পাদক মহাশয় তা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন, তার মধ্যে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি ছিল)—এমন ধর্মানুসারীরা যেন জীবনবিমুখ না হয়। সম্পাদক মহাশয় এই রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এই দুই জীবনাদর্শের সমর্থকদের মধ্যে ভাবদ্বন্দ্বের বর্ণনাও করেছিলেন, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক চরিত্র বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিদের কাছে তা আকর্ষক ঠেকবে ঃ

"হিন্দুসমাজের বর্তমান এই যে-আলোড়নের কথা বলে এলাম, তা দুই শক্তির দ্বন্দ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।...তারই পরিণতিতে আমরা হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান নামক ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছি। পুরাতন প্রগতিশীল দল, যারা ইউরোপীয় ভাবে ভরপুর, খুবই দুঃখের সঙ্গে এই আন্দোলনকে লক্ষ্য করছেন। জাপানের দিকে আঙুল দেখিয়ে তাঁরা বলেন, চেয়ে দেখ, পাশ্চাত্ত্য জীবনরীতি নিয়ে জাপান কী হয়ে দাঁড়িয়েছে—পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিই জাপানকে পূর্ব অবস্থা থেকে তুলে এনে পৃথিবীর বৃহৎ জাতিসমূহের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, ফলে এখন সে বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব।...তার অনুসরণে যদি আমরা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সামাজিক জীবন গ্রহণ করে ফেলি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ জাপানের মতোই বা তার থেকেও বেশি উজ্জ্বল। পুরনো প্রগতিশীল দল তাই বর্তমান আন্দোলনকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করেন এবং যথেষ্ট বিরক্তি দেখান। অপর-দিকে নব রক্ষণশীল দল এই নূতন আন্দোলনকে ভারতের মুক্তির একমাত্র উপায় মনে করেন ঃ দেশ বর্তমানে যে-অগণিত দোষ-দুর্বলতায় পূর্ণ তা দূর করার এই হল সর্বরোগহর মহৌষধ। তাই বহু আকাঙ্ক্ষিত রিভাইভ্যাল আনার জন্য তাঁদের উৎসাহ অন্ধ খ্যাপামির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।"

হিন্দু-উত্থানে 'প্রগতিশীলদের' অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যসভ্যতা-ভক্তদের প্রতিক্রিয়ার কিছু নমুনা এখানে যোগ করা উচিত। ধর্মীয় উত্থানের সঙ্গে জাতীয়তার সম্পর্ক দেখে মিশনারি ও প্রগতিশীল সবাই আতঙ্কিত হয়েছিলেন। মিশনারিরা জানতেন, বিশুদ্ধ ধর্মোৎসাহ বেশিদিন থাকে না, কিন্তু পরাধীন দেশে জাতীয়তা ক্রমবর্ধমান প্রবল শক্তি, সুতরাং ঐ দুইয়ের সংযোগের মতো বিপজ্জনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না ধর্মান্তরিতকরণ চেষ্টার ক্ষেত্রে। এঁরা তাই 'মিথ্যা দেশপ্রেমের' বিরুদ্ধে যথেষ্ট সত্যপ্রচারের চেষ্টা করেছেন। আর প্রগতিশীলদের আতঙ্কের হেতু, এতদিন বিদেশীয় ব্যাপারকে শিরোধার্য করে যে-সোনার মুকুট পরার গৌরব এঁরা পাচ্ছিলেন, তার মূল্য যদি ধূলিমুষ্টিতে নির্ধারিত হয়, তাহলে কেনই শিখলাম ইংরেজি, কেনই গেলাম বিলাত! 'বম্বে ক্যাথলিক এগজামিনার' ১৮৯৬, ১৩ মার্চ 'ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিজম্' রচনায় বুঝিয়েছিল, ভারতবর্ষকে খাঁটি দেশপ্রেম শিখিয়েছে ব্রিটিশরাই। সেই শিক্ষাদাতা, আচার্যের মহিমাকেই এখন ভারতীয়রা মানতে গররাজি!! বিষাদের সঙ্গে এই পত্রিকা লিখেছিল, "দেশপ্রেম ভাল কিন্তু ভাল নয় ভ্রান্ত দেশপ্রেম। ভ্রান্ত দেশপ্রেম নিজ জাতির মহিমা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা জাগায়; অন্ধ করে রাখে নিজেদের ত্রুটির বিষয়ে; অন্যান্য জাতির মধ্যে যে, শ্রেষ্ঠতর ব্যবহার, ব্যবস্থা ও সংগঠন থাকতে পারে, এই ধারণাকে ঘৃণা করতে শেখায়; ফলে তা হয়ে দাঁড়ায় অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তরুণ ভারত ভয়াবহ-পরিমাণে এই ভ্রান্ত দেশপ্রেম দেখাচ্ছে। যদি এই

হবু দেশপ্রেমিকদের কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে ভারতবর্ষ মানবসমাজে যা-কিছু উত্তম ও মহান বস্তু আছে তারই বাসভূমি, সর্বপ্রাচীন ও প্রধান সভ্যতার কেন্দ্র, সকল নাগরিক গুণের উৎসস্থল—এইসব কারণে সে ইউরোপের দর্পিত শ্রেষ্ঠত্ব-দাবিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারে এবং পাশ্চাত্ত্য থেকে কিছু শেখা যেতে পারে সে ধারণাকে ব্যঙ্গ করতে পারে। ভারতের কয়েকজন সর্বাধিক আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যাঁদের থেকে দেশপ্রেমিক আখ্যা-লাভের যোগ্যতা আর কেউ পেতে পারেন না, যথা পুনার ডাঃ ভাণ্ডারকর, কলকাতার মিঃ মজুমদার ইত্যাদি—এঁরা প্রায়ই এই আত্মস্তুতির মনোভাব, সেইসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যসভ্যতার সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ সমালোচনার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।”

ক্যাথলিক এগজামিনার ‘সত্যের খাতিরে’ বলতে বাধ্য হয়েছিল, ভারতের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন একথা বলা ভুল, কারণ তারও আগে আছে মিশরীয়, হিব্রু, ফিনিসিয়, ব্যাবিলোনিয় সভ্যতা। আর্যসভ্যতার বয়সের হিসাবে ভারত হয়ত গ্রীকদের থেকে পুরাতন কিন্তু সংস্কৃতির অগ্রগতিতে প্রথমে গ্রীকরা, পরে রোমকরা তারপর ক্রমান্বয়ে কেল্ট, টিউটন, এবং শ্লাভ জাতিসমূহ ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। ‘সংস্কৃত সাহিত্যে উত্তম বস্তু থাকলেও...তা কেবল পুরাতাত্ত্বিকদের চর্চার বিষয় হতে পারে। নৈতিক বা শিক্ষামূলক বিষয়ে নিশ্চিতভাবে এই সাহিত্য গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর। মানুষের বুদ্ধিবিকাশকে ব্যাহত করে তা; গালগল্প, মিথ্যাচার, উদ্ভটতার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।’ তৎসহ, ভারত নানা সামাজিক দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে, বিজ্ঞানে তার কোনো অগ্রগতি হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এহেন ক্যাথলিক এগজামিনারের পক্ষে কী উপাদেয় ‘কলকাতা হাইকোর্টের সুপরিচিত ব্যারিস্টার’ মনোমোহন ঘোষের আত্মধিক্কারপূর্ণ স্বীকারোক্তি। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, “ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে হিন্দুদের এই গর্ববোধকে তার ন্যায্য সীমার বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয়। প্রগতির গতিরোধ করবে এমন আত্মতুষ্টির প্রশ্রয় যেন দেওয়া না হয়। এসব কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি এইজন্য যে, দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এসে এমনকি এখানকার [ইংলণ্ডের] কিছু ভারতীয় তরুণকেও স্পর্শ করেছে। ইদানীং শুনছি, ভারতবর্ষে হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতাকে জাগ্রত করার ছদ্মবেশ নিয়ে ইংরাজ ও তাদের সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে বাধাসৃষ্টির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা চলেছে। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি, এর মানে প্রগতির প্রসারিত হাতকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া।...আমার বিশ্বাস, ইংলণ্ড ও তার সভ্যতার দানকে প্রত্যাখ্যান করার অবস্থায় আসার আগে আমাদের বহুযুগ কেটে যাবে।... সেইজন্য আমাদের স্বদেশবাসীকে না-বলে পারছি না, ঐসব প্রতিক্রিয়াশীলেরা যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এগোচ্ছে, তা আমাদের দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে গভীর বিপদের কারণ।...এই রিভাইভ্যালিস্টরা, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ড থেকেও সমর্থন পাচ্ছে।...যদি ইংরেজ-বক্তারা ভারতে গিয়ে আধুনিক সভ্যতার মন্দ দিকগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে, তাহলে তাঁরা আমার স্বদেশবাসীর একাংশের কাছ থেকে প্রচুর করতালি পাবেন। যারা করতালি দেবে, তারা যে ইউরোপীয় সভ্যতার চরিত্র জানে তা নয়, কিন্তু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে-কোনো আক্রমণে তারা উৎসাহবোধ করে, কারণ তারা ইংরেজদের বিদ্বেষের চোখে দেখার শিক্ষা নিয়েই বেড়ে উঠেছে।” [অ]

বেঙ্গলীর প্রতিদ্বন্দ্বী অমৃতবাজার পত্রিকা এইকালে বেঙ্গলীর মতো ধীর বিবেচনার ধার ধারত না। কিছু লাগসই কথা বলতে ও খোঁচাখুঁচি দিতেই তার উৎসাহ ছিল বেশি। ১৮৯৫, ১৪ অক্টোবর, ‘দি হিন্দু রিভাইভ্যাল’ নামক সম্পাদকীয় রচনাটি যথেষ্ট নাটকীয়-ভাবে আরম্ভ করেছিল সে—লণ্ডনের বেস্‌ওয়াটার স্থান-নিবাসী পার্বতীচরণ রায় নামক ব্যক্তি তাঁর উগ্র আধুনিক নাস্তিকতা ত্যাগ করে ঘোরতর হিন্দু হয়ে ভারতে ফিরে এসেছেন

মেম-বউ নিয়ে—এই মনোরম সংবাদ দিয়ে। পত্রিকা বলল, পার্বতীচরণ অনেক দৃষ্টান্তের এক দৃষ্টান্ত। কাল সত্যই বদলেছে। "পঞ্চাশ বছর আগে, ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায় স্বয়ং পাশ্চাত্ত্যদর্শনের ঝলমলানিতে নিজের চোখ ধাঁধিয়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু এখন তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে প্রবলভাবে। এখন প্রাচ্যের নিন্দা করে পাশ্চাত্ত্যের জয়ধ্বনি দিচ্ছে, এমন মানুষ খুঁজে বার করা শক্ত হবে।" আরও পরিবর্তন এই পত্রিকা দেখেছিল ঃ "বারো-চৌদ্দ বছর আগে শিক্ষিত লোকেরা একত্র হলে রাজনীতির কথা কইত; এখন সাধারণতঃ তারা ধর্মের কথা কয়।" এই পরিবর্তনে অমৃতবাজারের রাজনৈতিক হৃদয় অবশ্যই আতুর হয়েছিল, কিন্তু অমৃতবাজার আবার ভক্ত বৈষ্ণবও, সুতরাং উচ্চ বৈরাগ্যের সঙ্গে লিখল ঃ "রাজনৈতিক বিষয়াদির সঙ্গে হিন্দুরা যদি সম্পর্কত্যাগ করে, এবং পরজগতে উত্তম স্থানসংগ্রহের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, আমরা খুশি-বই দুঃখিত হব না। এ জগতে মানুষ আর ক'দিন, কয়েক বছর বই-তো নয়! এখানে সে ধনী বা দরিদ্র, মহারাজা বা ক্রীতদাস, যাই হয়ে যাক, কি এসে যায়!" [অ]

লাহোর ট্রিবিউনেও আলোচ্য বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়েছে। বর্তমান হিন্দু-জাগরণের সূত্রে প্রাচীন হিন্দুর কৃতিত্বের সংবাদ সে যত্নের সঙ্গে ছেপেছে (যথা, 'অ্যাডভান্সড্ স্টেজ অব সায়েন্স ইন ইণ্ডিয়া'; ১৮৯৪, ২৪ জুন), এবং নানা পত্রিকা থেকে হিন্দু-জাগরণ সম্বন্ধে সংবাদ সংকলন করে ছেপেছে। প্রবুদ্ধ ভারত থেকে আর অরমুথু আয়েঙ্গারের যে-রচনাটি এই পত্রিকা সংকলন করে (১৮৯৯, ২৭ জুলাই), তার মধ্যে এই জাগরণের শক্তি ও সীমাবদ্ধতার উত্তম আলোচনা ছিল। উক্ত লেখক বলেছিলেন, এই জাগরণের চরিত্র এখনো বহুলাংশে অ্যাকাডেমিক, ফলে উচ্চ সত্যসমূহ শিক্ষিতজনের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে, জনসাধারণের কাছে পৌঁছচ্ছে না, সাধারণ মানুষকে যথেষ্ট ভালবাসার সঙ্গে কাছে টানা হচ্ছে না, যাদের জন্য আশ্রয় আছে মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মে, যে-দুই ধর্ম হিন্দুর উত্থানকে স্বতঃই সুচক্ষে দেখবে না। কিন্তু সত্যই প্রবল এই আন্দোলন ঃ

"বর্তমান কালের একটি মহৎ লক্ষণ হিসাবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যথার্থ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ভারতে ও ভারতের বাইরে। যে-কোনো বই খুললেই যেন দেখা যায়, ভারতীয় ভাব সম্বন্ধে উল্লেখ বা ইঙ্গিত। অজ্ঞাত বন্ধুরা ভারতের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন। ভারতের ভিতরেও এখন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা অনেক স্পষ্টতর জ্ঞান। ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পরে আত্মাবমাননার প্রবণতা জাতীয় জীবনে বেদনাদায়কভাবে দেখা গিয়েছিল, ক্রমেই তা সরে যাচ্ছে, এবং তার পরিবর্তে জাগছে সুস্থ জাতীয়তা; নিজ দেশ ও ধর্ম সম্বন্ধে প্রীতি বাড়ছে। উপযুক্ত খাতে প্রবাহিত করতে পারলে সমগ্র দেশ এর দ্বারা উপকৃত হবে, বৃহত্তর পৃথিবীও। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান স্পষ্ট বাস্তব ব্যাপার, এবং তার দ্বারা সৃষ্ট উন্মাদনাও বিপুল।" [অ]

থিয়জফিক থিংকারে (১৮৯৫, ১৭ অগস্ট) বি এস রঘুত্তমাচার্য 'স্পিরিচুয়াল রিভাইভ্যাল' রচনায় ভারতে এবং সমগ্র পৃথিবীতে বিবেকানন্দ ও অ্যানী বেশান্তের প্রভাবে কিভাবে ধর্মান্দোলনের জোয়ার এসে গিয়েছে বলেছিলেন, এবং একই কাগজে একই মাসে প্রকাশিত সি সেলভরাজ মুদালিয়রের বক্তৃতায় ছিল ঃ "যখন কেউ দেখে, বর্তমান ভারতের সর্বাধিক বিখ্যাত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সময়োচিত আবির্ভাবের দ্বারা ভারতের কালপ্রাচীন ধর্মে নবপ্রাণতরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে, তখন তাদের পক্ষে বর্তমান ধর্মীয় উত্থানের মধ্যে স্বকর্মসাধন করতে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।" আর্য বালবোধিনী ১৮৯৫, নভেম্বর সংখ্যায় লণ্ডনে একটি 'হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠায় গভীর উল্লাস প্রকাশ করে লিখে-ছিল, এতদিন পর্যন্ত শিক্ষিত হিন্দুরা কেবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনই করেছে, কিন্তু এখন সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় আলোচনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কুণ্ঠিত নয়। এক্ষে

সমাজসংস্কারক ও ক্রীশ্চান মিশনারিরা চটতে পারে, কিন্তু এ হল কাল লক্ষণ।" "দশ বছর আগে, না, পাঁচ বছর আগেও, যদি জিজ্ঞাসা করা হত, অধিকাংশ হিন্দু হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করে কি-না, উত্তর হত নেতিবাচক। আর আজকের ভারতীয়রা নিজেদের প্রতিমাপূজক বলে পরিচয় দিতেও লজ্জিত নয়। এমন যুক্তিতে তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে, যাকে ইংলণ্ডের সবসেরা মূর্তিবিদ্বেষীও খণ্ডন করতে সাহস করবে না।"

ভারতবর্ষে এইকালে হিন্দুসংস্কৃতি প্রচারের জন্য নানা সংঘসমিতি গঠিত হয়েছে, তার মধ্যে মাদ্রাজের ইয়ং মেনস হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন যথার্থ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল, এবং সেজন্য মিশনারিদের বিরক্তির কারণও হয়েছিল।২২

চিন্তাপূর্ণ রচনার জন্য সুখ্যাত মাদ্রাজের হিন্দু থেকে এখানে দু'টি অংশ মাত্র উপস্থিত করছি, যার মধ্যে হিন্দু-জাগরণ দেখে মিশনারিদের আতঙ্কিত বিস্ময়ের কিছু নমুনা পাওয়া

---

২২ ইয়ং মেনস্ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন মাদ্রাজে ১৮৯৪-এর শেষের দিকে স্থাপিত হয়। ইয়ং মেনস্ ক্রীশ্চান অ্যাসোসিয়েশনের অনুকরণে এটি স্থাপিত, তা নামসাদৃশ্যেই দেখা যায়। স্থাপনের উদ্দেশ্য—হিন্দু তরুণদের হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেওয়া এবং শরীরচর্চাদির ব্যবস্থা করে দেহমনে তাদের বলিষ্ঠ করে তোলা। ঐ সময়ে মাদ্রাজে শিক্ষিত হিন্দু-তরুণেরা জাতীয় সংস্কৃতির ব্যাপারে কি রকম কোণঠাসা অবস্থায় ছিল, তা দেখা যায় হিন্দুতে ১৮৯৪, ৩ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত 'জনৈক হিন্দু গ্রাজুয়েটের' পত্রে। এই যুবক মাদ্রাজের তিন প্রধান কলেজে পড়েছেন—কিন্তু কোথাও হিন্দুধর্মের ছিটেফোঁটা পাননি। পচাইপ্পা কলেজে হিন্দুধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, মাদ্রাজ সরকারী কলেজে তা থাকতেই পারে না, আর মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ চালানোর কি উদ্দেশ্য, তা তার নামেই প্রকাশ। এই যুবক তাই উক্ত ইয়ং মেনস্ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন-প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। হিন্দুতে ১৮৯৪, ৬ অক্টোবরের এক রিপোর্টে দেখি, এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে, এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে মাদ্রাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন, যেমন, সি বি রমা রাও, জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, ভি রঙ্গচারিয়ার, কে জি ভেঙ্কটসুব্বাইয়া, এন সি আলাসিঙ্গা পেরুমল, এ সুব্বা রাও, পি সুব্বা রাও, বালাজি সিং, কুরথলওয়ার চেট্টিয়ার, ভি এল শেষচারিয়ার। ঐ দিনই এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে হিন্দুতে দীর্ঘ সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল, এর স্থাপনের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা যাতে করা হয়। মাদ্রাজে দলে-দলে হিঁন্দু ছেলে কলেজী শিক্ষা নিতে আসে, অথচ তাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উন্নতি ঘটাবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। একদিকে যেমন হিন্দু-পুনরুত্থান চলেছে, অন্যদিকে মিশনারিরা ধর্মান্তরকরণের প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছে, দু'একটি ক্ষেত্রে সফলও হচ্ছে; এমন অবস্থায় হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের সঙ্গে হিন্দু-ছাত্রদের পরিচয় ঘটনো একান্ত প্রয়োজন। সম্পাদক সখেদে লিখেছিলেন, ভারতের যে-দর্শন ইউরোপ আমেরিকার মন জয় করছে, তার বিষয়ে অজ্ঞ থাকছে ভারতেরই যুবকেরা!

এই প্রতিষ্ঠান কিন্তু মিশনারি ও 'প্রগতিশীলদের' গাত্রদাহের কারণ হয়। অনেক চিঠিপত্রে একে আক্রমণ করা হয়েছিল। 'জনৈক হিন্দু' মাদ্রাজ মেলে ১৮৯৪, ২ নভেম্বর, এক চিঠিতে এই প্রতিষ্ঠানকে যাচ্ছেতাই করেন (হিন্দুকে হিন্দু না মারিলে কে মারিবে!)। এই প্রতিষ্ঠান যে, ধর্মান্তরিতকরণ ঠেকাতে স্থাপিত হয়েছে—বড়ই দুঃখের সঙ্গে পত্রলেখক তার উল্লেখ করেন। "দেশের এই সংকটক্ষণে এ-দেশের খাঁটি প্রগতি-প্রেমিকেরা খুবই দুঃখ ও সংশয় নিয়ে এই আন্দোলনকে লক্ষ্য করবে।" "তবে খুশি হবে সেইসব লোক, যারা 'হিন্দু' শব্দ শুনলেই মুর্ছা যায়, অপর পক্ষে খ্রীস্টান-বিরোধিতার যে-কোনো কথাই যাদের কাণে মধুবর্ষণ করে।" অদ্ভুত যুক্তি এই ভদ্রলোকের ঃ "সেই মহীয়ান পুরুষ এবং মহীয়সী নারীগণ, যাঁরা ইতিহাসে-অতুলনীয় সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে বহু যুগ ধরে জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক নিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে—সেইসব ক্রীশ্চান মিশনারিদের হিন্দুধর্মের প্রতি খোলাখুলি আক্রমণ বা ধর্মান্তরিতকরণের চেষ্টায় হিন্দুধর্মের বিপদ ঘটবে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা খুবই ভুল করেন। বিপদ আছে আমাদের ঘরেই—বদ উৎসাহীগুলোর মধ্যে, খ্যাপাদের কল্পনাবিলাসে, কিছু প্রতারক এবং বহুসংখ্যক প্রতারিতের আচরণে।" পত্রলেখক শেষকালে মনোরম প্রশ্ন করেন—"ইয়ং মেনস্ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনের ধর্ম কী হবে? তা কি ইঁটকাঠ-পুজোর হিন্দুধর্ম, নাকি একটু উন্নত মানবদেববাদীদের হিন্দুধর্ম, যা পারিয়াকে দূর্ দূর্ করে এবং দেবদাসীদের নৃত্যে খুশি হয়, নাকি ধর্মমহাসভার নয়া হিন্দুধর্ম?"

যাবে (এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্ত অন্য অধ্যায়ে দেব)। মাদ্রাজ টাইমসের রচনাসূত্রে হিন্দুর ১৮৯৪, ৯ অগস্টের সম্পাদকীয়ের সূচনা এইভাবে ঃ

"আমাদের সহযোগী [মাদ্রাজ টাইমস] মনে করেন, 'খ্রীস্টান মিশনারিরা যে-প্রাচীন হিন্দুধর্মকে তাঁদের শিক্ষামূলক এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের দ্বারা নিকেশ করে ফেলছেন ভেবেছিলেন, তা মাত্র কিছু আহত হয়েছিল, কিন্তু মোটেই গত হয় নি, সে-লক্ষণই নেই, বরং জেগে উঠছে নতুন শক্তিতে, বর্ধিত মর্যাদায়। নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা এবং রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা জাতীয় ধর্মবিশ্বাসে যে-বলাধান করে, তারই বেগ এখানে দেখা গিয়েছে। মিশনারি এবং গভর্নমেণ্ট জনগণের পুরাতন ধর্মকে ধ্বংস করে, সেই জায়গায় খ্রীস্টীয় বিশ্বাসের বিস্তারকে ত্বরান্বিত করার যে-চেষ্টা করেছে, তার ফল বিপরীত দাঁড়িয়েছে—হিন্দুধর্ম এমন শুদ্ধিকৃত সতেজ রূপ নিয়ে আবিভূর্ত হয়েছে যে, তা উক্ত ধর্মবিশ্বাসীদের শিক্ষিত এবং যুক্তিশীল মনের কাছে অনেক বেশি বরণীয় হয়েছে এবং সভ্যজগতের কাছে তার মর্যাদাকে তুলে দিয়েছে ঊর্ধ্বে।'...আমাদের সহযোগী বলেন, 'হিন্দুধর্ম এখন পুনর্জাগ্রত, অধ্যাত্ম-ভাবসম্পন্ন এবং আধুনিকতাপ্রাপ্ত। তা ধর্মতর্কে অগ্রসর ও জাতীয় ধর্ম প্রচারে সক্রিয়।... বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, হিন্দুধর্ম পূর্বে যা কখনো ছিল না এখন তা হয়েছে—"জাতীয় ধর্ম।" এইখানেই হিন্দুধর্মের ভাবী বিরাট শক্তির উৎস। অতীতে হিন্দুধর্ম ছিল বহুপ্রকার জাতির একটি মিশ্র ধর্ম, যে-জাতিগুলি যুদ্ধে পরস্পর লড়াই করেছে এবং যাদের ধর্মবিশ্বাসে ঐক্য ছিল না। কিন্তু এখন বিদেশী শাসনাধীনে থেকে ঐসকল বিভিন্ন জাতি নিজেদের একজাতিরূপে ভাবতে আরম্ভ করেছে, এবং হিন্দুধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ ধর্ম। কয়েক বৎসর আগেও যে-ধর্মের যেন শ্বাস-ওঠার অবস্থা ছিল, অকস্মাৎ তার জন্য দেশজুড়ে এমন উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে যে, তার ফলে বিদেশীয় মিশনারিদের কার্যের সমাদর আরও কমে যাবে।'"

মাদ্রাজ টাইমসের মন্তব্য উদ্ধৃত করার পরে হিন্দু বলে, খ্রীস্টান মিশনারিরা যে, পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তদনুযায়ী শিক্ষানীতি পরিবর্তিত করবার কথা ভাবছে, সেটা সুখের বিষয়, কিন্তু সত্যই কি তাদের চৈতন্যোদয় হবে? "খ্রীস্টানধর্ম হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না, একথা অবশ্য মিশনারিদের পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব নয়। খ্রীস্টান ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম নিত্য সত্যের উপরে গঠিত হতে পারে, তা উপলব্ধি করার মতো স্বচ্ছদৃষ্টি তাদের নেই। নিত্য সত্যের ভিত্তিতে স্থাপিত হিন্দুধর্মকে যে, গ্রীক ও রোমকদের পুরাণ-নির্ভর ধর্মের মতো ধ্বংস করা যাবে না, একথা বুঝতে তারা অসমর্থ। অতীতে হিন্দুধর্ম প্রচন্ড প্রাণশক্তি দেখিয়েছে—দেখিয়েছে শত্রুর দারুণ আঘাত ও আক্রমণের মধ্যে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়। যে-ধর্ম মুসলমান-শাসনের সহস্র বর্ষব্যাপী ক্রূর অসহিষ্ণুতাকে সহ্য করেছে সাফল্যের সঙ্গে, সে খ্রীস্টধর্মের আক্রমণে বিধ্বস্ত হবে না।"

'নিও হিন্দুইজম্' নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধে (১৮৯৪, ৩১ অক্টোবর) হিন্দু একই প্রসঙ্গে লেখে, "অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সরকারী কর্মচারীরা যেমন ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ দেখে কখনো-কখনো বিমূঢ় হয়ে পড়েন, তেমনি খ্রীস্টান মিশনারিরা ধাঁধায় পড়ে গেছেন—শিক্ষিত হিন্দুরা পাশ্চাত্যের খ্রীস্টীয় সাহিত্য অধিগত করার পরে,, নিজেদের প্রাচীন ধর্মকে ঘৃণায় নস্যাৎ না-করে, খ্রীস্টধর্মকে আঁকড়ে না-ধরে, কি করে পুরনো ধর্মের প্রতিই ভক্তিভালবাসা বোধ করছে!! অর্ধশতাব্দী ধরে খ্রীস্টান মিশনারি ও খ্রীস্টান গভর্নমেণ্ট খ্রীস্টান জনগণের ভাষায় ভারতীয় হিন্দুদের শিক্ষা দিয়েছে অথচ তাদের প্রাচীন ধর্মের কবল থেকে মুক্ত করতে পারল না! শুধু তাই নয়, অন্ধ কুসংস্কারপূর্ণ ধারণাকে পরিহার করে, দেশপ্রীতিমূলক যুক্তিযুক্ত জিজ্ঞাসাসহ ঐ ধর্মকেই আঁকড়ে ধরছে অব্যাহত ভক্তিশ্রদ্ধায়!"

এই রচনার মধ্যে হিন্দু, মিশনারি-পত্রিকা মেথডিস্ট টাইমসের হতাশ উক্তি উদ্ধৃত করেছিল : "ভারতের অনেক আশাবাদী বন্ধু ভ্রান্তধারণা বোধ করে বসে আছেন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন, ভারতে যেহেতু খুনজখমের সংবাদ আর শোনা যাচ্ছে না, তাহলে সে দেশ খ্রীস্টধর্ম নিয়েই ফেলছে। কিন্তু হায়! যত ঐকান্তিক ইচ্ছাই বোধ করা যাক না কেন, তেমন কিছু গৌরবময় কাণ্ড ঘটবার সম্ভাবনা নেই। মিশনারি স্কুল-কলেজের উদার শিক্ষার সুযোগ নিয়েছে দলে-দলে ভারতীয়; মিশনারিদের বড়রকমের সহায় ও বন্ধু বলে যাদের ধরা হয়েছে, সেই তারা অকস্মাৎ নয়া হিন্দুধর্ম বলে কথিত ব্যাপারটার প্রকোপে পড়ে সর্বপ্রকার খ্রীস্টানভাব ঝেড়ে ফেলেছে; তারপর নব ধর্মের মতগুলি মেনে নিয়ে, খ্রীস্টধর্মের উত্তম বিষয়গুলির পিঠ চাপড়ে, কার্যতঃ সেগুলিকে ধিক্কার দিচ্ছে সম্ভবপর সকল উপায়ে। আগে খ্রীস্টধর্মের বিরোধীরা একলা কাজ করত, কিন্তু এখন নতুন আন্দোলনের প্রভাবে তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়ে এগোয়। বস্তুতঃ তারা খ্রীস্টধর্মের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য যেন একটি ন্যাশন্যাল লীগ গঠন করে নিয়েছে। তাদের পক্ষে দাঁড়ায় উত্তর ভারতের বহুবিধ 'সভা', মাদ্রাজের হিন্দু ট্রাক্ট সোসাইটি, কতকগুলি অত্যন্ত সুপরিচালিত সেরা ভারতীয় সংবাদপত্র, যেগুলি, কথাপ্রসঙ্গে জানানো যায়, প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের করায়ত্ত, এবং বিরাট সংখ্যক দেশীয় সরকারী কর্মচারী—যারা রয়েছে বিচারাসনে, আদালতে, কাউন্সিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, স্কুলে।"

হিন্দু প্রশ্ন করেছিল, দোষ কোথায় যদি জাতীয় ধর্মকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়? হিন্দুধর্মের শক্তি ও মহিমার কথাও সে বলল। অন্ধ অনুসরণ যে করা হচ্ছে না, তা দেখা যায়, ম্যাক্সমুলার, উইলসনের অনুসরণকারী রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের ঐতিহাসিক গবেষণায়। প্রমথনাথ বসুর গবেষণামূলক গ্রন্থের সিদ্ধান্ত-কথাও হিন্দু উপস্থিত করেছিল : "পৃথিবীতে বোধহয় এমন কোনো ধর্ম নেই, যা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের মতো স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। এমন বহুমুখী ধর্মসাহিত্যও কোথাও নেই। শিক্ষিত হিন্দুরা, তাঁরা বহুদেববাদী, অদ্বৈতবাদী, অজ্ঞেয়বাদী, পজিটিভিস্ট, যাই হোন না কেন, জ্ঞান ভক্তি প্রেম, যে-পথেই তাঁরা মুক্তিসন্ধান করুন না কেন, সকলেই তাঁদের পূর্বপুরুষগণের রচিত সমৃদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে (বর্তমানে যা সংস্কৃত পণ্ডিতদের পরিশ্রমের ফলে সহজে প্রাপ্তব্য) আলোক ও উপায় লাভ করবেনই।"

এই গৌরবের ধর্ম-যে এখন জাতীয় ধর্ম হয়ে উঠছে, সেকথা হিন্দু বলেছিল :

"ঘটনা এই, বৃটিশ শাসন যেমন ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করেছে, রাজনৈতিক দিকে জনগণের অনুভূতি যেমন বিরাট কংগ্রেস-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, তেমনি জাতীয় ধর্মের ব্যাপারে সর্বত্রই একটা পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, যা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি করছে, যাকে বলতে ইচ্ছে হয়—মিলিত মহান হিন্দুধর্ম-সংস্থা—খ্রীস্টান জাতিসমূহের অগ্রগতিতে অবিস্মরণীয় ভূমিকাগ্রহণকারী সম্মিলিত খ্রীস্টীয় ধর্মসংস্থার মতো ভূমিকা যার হতে পারে।"

বলাবাহুল্য হিন্দু এর পরে, এই ধর্মের আচার্যরূপে একজনকেই স্মরণ করতে পারে :

"স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোয় হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যের ভাষায় বলেছিলেন; 'সাধুত্ব, পবিত্রতা এবং বদান্যতা পৃথিবীর কোনো একটি বিশেষ ধর্মের একান্ত সম্পদ নহে। প্রত্যেক ধর্মমত হইতেই সর্বোন্নত চরিত্রের নরনারী আবির্ভূত হইয়াছে। এইসকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্য ধর্মসমূহ লোপ পাইয়া তাঁহার ধর্মই কেবল টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি সম্পূর্ণ কৃপার পাত্র। তাঁহাকে বলিতে পারি, প্রতিরোধ সত্ত্বেও শীঘ্রই সকল ধর্মের পতাকার উপরে লেখা থাকিবে—'সংঘাত নয় সহায়তা, বিনাশ নয় ভাবগ্রহণ, বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'" [ক্স]

লাইট অব দি ইস্ট পত্রিকা থেকে বিবেকানন্দ-ভূমিকার কথা আগে আমরা তুলেছি। ধর্মজাগরণের কথা বলতে ও তার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে এই পত্রিকা অক্লান্ত ছিল। ১৮৯৪, সেপ্টেম্বরে এ-বিষয়ে লেখে : "বিরাট হিন্দু-উত্থানের তরঙ্গে আলোড়িত হয়ে উঠছে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকাবাসীর কাছে সুমহান অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার করছেন, তখনি ভারতবর্ষে মিসেস বেশান্ত হিন্দুদের ডাক দিচ্ছেন নিজ ধর্ম ও দর্শনকে অবলম্বন করে উঠে দাঁড়াবার জন্য, যাতে হিন্দুসমাজ মূলে নাড়া খাচ্ছে। অন্যান্য আন্দোলনগুলিও ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াশীলতা দেখাচ্ছে। আর্যসমাজ, ভারত ধর্মমহামণ্ডল কিছু নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ করেছে। থিয়জফিক্যাল সোসাইটির লেখক সংস্থা হিন্দুধর্মের মুখ্য দিকগুলি দূর পাশ্চাত্যে প্রচারের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।"

১৮৯৭, এপ্রিলে 'দি হিন্দু রিভাইভ্যাল' নামে একটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদকীয় লেখে পত্রিকাটি। সেই অর্থপূর্ণ রচনাটিতে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগচারিত্রকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এই উত্থান যে পুরাতনের নকলনবিশি নয়, দৃঢ়তার সঙ্গে জানানো হয়। বিবেকানন্দ যে, কালপ্রয়োজন পূরণের জন্যই আবির্ভূত, তাও স্পষ্ট ইঙ্গিতে বলা হয়। এই আন্দোলনের চারিত্রিক নবত্বের কথা গোড়াতেই সম্পাদক লেখেন : "সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এক বৃহৎ উত্থান দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। চিন্তাসাগর গভীরভাবে মথিত হয়েছে, জড়বাদের উপরে মস্তক উত্তোলন করেছে মানুষ, মহান ও নূতন আধ্যাত্মিক-কিছুর চকিত দর্শনলাভের জন্য। বর্তমান হিন্দু-উত্থান অভিনব একটি আন্দোলন, যার কেন্দ্র ভারতবর্ষ, কিন্তু তা বেষ্টন করে আছে পৃথিবীর সকল দেশকে। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা লক্ষ্য করতে পারবেন, এই আন্দোলনের চরিত্র এমনই অনন্য যে, অতীতের অনুরূপ কোনো আন্দোলনের সঙ্গে তার সমরূপতা নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম—ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিচিত্র মিশ্রণ। বলা চলে, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বোঝাপড়ার ফল তা।" তারপর সম্পাদক বিজ্ঞানের পরিবর্তিত চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন—বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্যমোচন করতে চায়। যেভাবে সে এগোচ্ছে, তাতে কে বলতে পারে, ভবিষ্যতে ঈশ্বররহস্যের মোচন করে ফেলবে কি-না? ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান তো জড়বাদ থেকে বেরিয়ে অনির্বচনীয় সর্বব্যাপ্ত অনন্ত অস্তিত্বের দিগন্তে উপস্থিত হয়ে পড়েছে। মনস্তত্ত্বের গবেষণা মানবমনের গহনে ডুব দিচ্ছে। আধুনিক চিন্তাবিদেরা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন—জড় থেকে চেতনার উৎপত্তি হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ধর্মও তার চরিত্র বদলেছে। সে বহুলাংশে বিজ্ঞানের পরীক্ষাপদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। "সে-জন্য ধর্মের রিভাইভ্যালকে বলা চলে রিলিজিও-সায়েন্টিফিক রিভাইভ্যাল। এর যাত্রা যতখানি না হৃদয় থেকে, ততোধিক যুক্তি থেকে। বস্তুসত্যের প্রস্তরভিত্তির উপরে এর ঊর্ধ্বসৌধ নির্মিত, অভিজ্ঞতা-নামক তথ্যকে যাচাই করে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। দেহধারী, দণ্ডধারী ঈশ্বরের ধারণাকে বাতিল করে সে এই প্রত্যয়ে পৌঁছেছে—ঈশ্বর, নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নিয়মাধীন প্রকৃতির অন্তঃচারী চেতনা। বিজ্ঞানের ঝোঁক আজ অদ্বৈতবাদের দিকে।... প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তির মূলসন্ধান করে সে আদি কারণে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে দ্বৈতত্ব, বহুত্ব বজায় থাকে না।" বস্তুসত্যের মূলগত এক অস্তিত্ব স্বীকার করলেও "বিজ্ঞান কিন্তু সেই পর্যায়ে ওঠেনি, যেখান থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, বস্তুর উৎপত্তি জড় থেকে নয়, চৈতন্য থেকে।" খাঁটি ধর্ম, যা পুরোহিততন্ত্র বা সাম্প্রদায়িকতা নয়, তারও লক্ষ্য বিজ্ঞানের অনুরূপ—সত্যকে জানা। "কিন্তু ধর্ম বিজ্ঞান থেকে আরও অগ্রসর। বিজ্ঞানের কাছে যা অজ্ঞাতচরিত্র আদি কারণ, তাকে ধর্ম চেতনার দ্বারা আবৃত করেছে। ধর্মের কাছে ঐ আদি কারণ জড় নয়, জীবন্ত সত্য, তা এমন একটি অস্তিত্ব যা সৃষ্টির সর্বত্র অনুস্যূত; তা রয়েছে যেমন প্রচণ্ড শক্তিশালী মানুষের মধ্যে, তেমনি বালুকণার মধ্যেও।" এই অস্তিত্বের লক্ষণকে উপনিষদের শিক্ষার আলোকে ব্যাখ্যা করার পরে সম্পাদক লিখেছেন, "বিজ্ঞানের

অজ্ঞাত অনন্ত বস্তু—ধর্মের যাদুস্পর্শে প্রাণবান অস্তিত্বে রূপান্তরিত। ধর্মের মানুষ রহস্যের রহস্য পরম রহস্যের সামনে উপস্থিত হয় তরঙ্গিত হৃদয়, স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড নিয়ে। ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, চলে তপ্ত গভীর বিনিময়, আত্মা বস্তুজাল থেকে মুক্ত হয়ে ঊর্ধ্বতর লোকে উত্থিত হয়, যেখানে সকলই জীবন—মৃত্যু নেই কোথাও।"

আধুনিক পৃথিবীর চতুর্দিকে যে-ধর্মোত্থান ঘটেছে তার চরিত্র এই। "উপনিষদ-উৎস থেকেই প্রবাহিত এই ধর্ম।...বর্তমান হিন্দু-রিভাইভ্যালের এই কাল-লক্ষণ।" সম্পাদক 'কাল-লক্ষণ' কথাটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কাল যে, যুগে-যুগে বদলায়, পুরনো আকার কখনো নতুন কালে বর্তমান থাকে না, সেকথা বিশেষভাবে আলোচনা করার পরে এই শঙ্করপন্থী সম্পাদক সাহসের সঙ্গে বলেছেন, "আধুনিক হিন্দু রিভাইভ্যাল কদাপি শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য কিংবা চৈতন্যদেবের কালের ধর্মীয় উত্থানের পথ মাড়িয়ে চলবে না। বর্তমানের মানুষ সেকালের থেকে ভিন্ন; পরিবেশ, মেজাজ সব ভিন্ন। তাই বর্তমান অবস্থার উপযোগী হবার জন্য আধুনিক হিন্দু-উত্থান সম্পূর্ণ নূতন আকার নিয়েছে। আধুনিক ধর্ম-জাগরণ আধুনিক কালেরই উৎপাদন। কালগতিকে কে রুদ্ধ করতে পারে?"

সম্পাদকের এই সমস্ত আলোচনার লক্ষ্য বিবেকানন্দ এবং বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নব হিন্দুধর্ম। "রক্ষণশীলেরা এই নতুন ধারার গতিরোধ করতে চায়—তাকে বইয়ে দিতে চায় পুরাতন খাতে।" সম্পাদক বলেন, তা অসম্ভব। এটা কলিযুগ, এখানে সত্যযুগকে টেনে এনে ফেলা যাবে না। 'আর কলিযুগ যে অবিমিশ্র মন্দ কে বলে?' এ যুগ কি অন্যান্য যুগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে, তাদের অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করে, বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছয় নি? সম্পাদক স্পষ্ট গৌরবের সঙ্গে বলেছেন, 'কলিযুগের একটা মিশন আছে।' বিবেকানন্দ সেই মিশনের প্রতিনিধি হিসাবে আবির্ভূত—অথচ তা বুঝবার সামর্থ্য নেই অনেক রক্ষণশীলেরই। তারা বিবেকানন্দকে সেই মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয়, যা তিনি পেয়েছেন পাশ্চাত্তে। বিবেকানন্দের যথার্থ স্থান কি হবে, কালই অবশ্য তা নির্ধারণ করবে। কিন্তু সম্পাদক তাঁর বক্তব্য বলে রেখেছেন অগ্রিম :

"একজন বিরাট পুরুষ সমগ্র জাতির পক্ষে চিন্তা করেন, তিনি ব্যক্ত করেন সমগ্র জাতির ভাবানুভূতিকে। সত্য যখন এই, তখন বিবেকানন্দের সাফল্য অবধারিত।"

॥ ১০ ॥

বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় ধর্মকে জাগালেন, যাতে ভারতের জাগরণের সূচনা হল। কিন্তু তিনি কেবল ভারতেরই ধর্মকে জাগালেন? না। পৃথিবীতেও শুরু হয়ে গেল এক নতুন ধর্মচেতনার কাল। বিবেকানন্দই সেই চেতনার উৎসমুখকে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হল, 'ডায়ন্যামিক।' তিনি ডায়ন্যামিক কোন্ অর্থে? লুই বার্ক বলেছেন, 'একস্‌প্লোসিভ' অর্থে নন। অবশ্যই নন। তিনি কর্কশ গর্জনশীল কোনো পদার্থ ছিলেন না, আক্ষরিক অর্থে মোটেই বোমার মতো ফেটে পড়তেন না। তিনি যদি বিস্ফোরক হন—সে বিস্ফোরণ ভূগর্ভে, যাতে বদলে যায় ভূপৃষ্ঠ। তিনি 'সাইক্লোনিক হিন্দু মনক্ অব ইণ্ডিয়া।' এ সাইক্লোন আত্মার দিগন্তে—তিনি এনেছিলেন চেতনার মহাঝড়। কেউ-কেউ তখনই অনুভব করেছিলেন সে-ব্যাপারটা। বিবেকানন্দের নামে ব্যাপারটা কেউ স্বীকার করেছেন, কেউ নামোল্লেখ না করে তা মেনেছেন। মাদ্রাজের সুবিখ্যাত ডাঃ হেনরি মিলার,—রেভারেণ্ড স্লেটারের একটি বক্তৃতাসভায় (বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'হিন্দুধর্মের কয়েকজন সাম্প্রতিক প্রবক্তা; অর্থাৎ বিবেকানন্দ ও বেশান্ত) সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন : "হিন্দু-

ধর্মের রিভাইভ্যাল নিয়ে বহুকিছু বলা হচ্ছে। আমি বলতে চাই এটা ধর্মের রিভাইভ্যাল। আমি খুশি যে, এ-জিনিস ঘটেছে। (মাদ্রাজ টাইমস; ১৮৯৪, ১৪ সেপ্টেম্বর)।

রেভারেণ্ড মিলারের মতো করে অনেকেই কথা বলতে শুরু করেছিলেন। মিশনারিদের কণ্ঠে ক্ষেত্রবিশেষে উদারতার সুর লেগেছিল। এর মূলে যে, ধর্মমহাসভার ফল, তা স্বীকৃত হয়েছিল সমকালে। ধর্মমহাসভার বেশ কয়েক বৎসর পরে, ১৮৯৯, ১৮ জানুয়ারি, মাদ্রাজ মেল 'বেদান্তিক লিটারেচর' নামক সম্পাদকীয় রচনায় বলে : "ধর্মমহাসভার অন্য ফলাফল সম্বন্ধে যে-মতভেদই ঘটুক, একটি ব্যাপারে সকলে একমত হবেন—সকল ধর্মাবলম্বীরাই নিজেদের ধর্ম-সম্বন্ধে গভীরতর অনুশীলনের প্রেরণা পেয়েছেন, সেই সঙ্গে পৃথিবীর অপর বৃহৎ ধর্মগুলির চর্চার পক্ষেও উৎসাহ। এবং সেই স্মরণীয় সমাবেশের পরে পৃথিবীর নানাস্থানে যেসব ধর্মীয় সাহিত্য রচিত হয়েছে, সেগুলি এই মহনীয় অনুভূতির দ্বারা প্রাণবন্ত।" এই সূত্রে এই পত্রিকা কানাডার কুইনস্ ইউনিভার্সিটির প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড গ্রাণ্টের রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছিল, যার মধ্যে উক্ত প্রিন্সিপাল প্রচলিত মিশনারি-পদ্ধতির সংকীর্ণতা দেখিয়েছিলেন : "যিনি ধর্ম নিয়ে আমাদের কাছে আসবেন, তিনি যদি উচ্চম্মন্যতাসহ এসে হাজির হন, আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে ঘৃণা গোপন করার কোনো ইচ্ছাই যাঁর নেই—তিনি কদাপি আমাদের কাছে ঈশ্বরের বার্তাবহ হতে পারবেন না।...তাঁকে দাঁড়াতে হবে আমাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সমভূমিতে। আমাদের পূর্ব-কীর্তির বিষয়ে অনুসন্ধানের পরিশ্রম তাঁকে করতে হবে। আমাদের ভাষা তিনি বলবেন, আমাদের সঙ্গীত তিনি বুঝবেন, আমাদের সেরা গান গাইবেন, আমাদের সর্বোচ্চ সাহিত্যের চর্চা করবেন, আমাদের অতীতকে শ্রদ্ধা জানাবেন, দর্শনকে অনুধাবন করবেন, সহানুভূতি জানাবেন আমাদের আদর্শের প্রতি, সমাদর করবেন আমাদের জীবনের গভীরতম সত্যকে, তিনি আমাদের শ্রদ্ধা করবেন, ভালবাসবেন।...ধর্মান্তরিতকরণ—ব্যক্তিকে উপড়ে আনে, অপদার্থ হয়ে দাঁড়ায় সে, তার মনোবিকাশ হয় না। আর বাণীপ্রচার—জয় করে নেয় মানুষকে, সে মানুষ স্বয়ং শক্তিকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। বাণীপ্রচারে যে-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তা ব্যাহত হতে বা পরাভূত হতে পারে, কিন্তু কদাপি ধ্বংস হয়ে যায় না।"

খ্রীস্টান যাজক যদি এই কথা বলেন, তাহলে যাঁরা তা নন, সেই মুক্তমন ধর্মসন্ধানীরা কি বলবেন? এরিনা পত্রিকার সম্পাদক বি ও ফাউলারের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছিল হিন্দু পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনায় ('দি কামিং রিলিজন'; ১৮৯৪, ৩ জানুয়ারি)। "ফাউলার স্বীকার করেছেন, যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধীয় অলৌকিকতাকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। 'হায়ার ক্রিটিসিজম্' খ্রীস্টীয় পুরাণের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। "সৃষ্টিকর্তা বিশেষ ধরনের মনুষ্যের সেই ঈশ্বর নন, পৃথিবীর অগণিত মানুষের দারুণ কষ্টের চিৎকারের দিকে যিনি বহুকাল ধরে বধির কর্ণটি ফিরিয়ে আছেন।...বৃহৎ-আকার একটি মনুষ্যরূপে ঈশ্বরকে না দেখে এই খ্রীস্টীয় তাত্ত্বিকেরা ঈশ্বরকে প্রজ্ঞাঘন, নিয়মপ্রিয়, শক্তিচৈতন্যরূপে দেখেন।... এঁদের কাছে, ধর্ম অনন্তের জ্ঞানালোক।"

লুই বার্ক দেখিয়েছেন—এই ধর্মতরঙ্গ কিভাবে আমেরিকার উপরে আছড়ে পড়েছিল। যে-মিশনারিরা বিবেকানন্দের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁরাই একইসঙ্গে বুঝেছিলেন, কালের বদল হয়ে গিয়েছে। আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে তথ্য তুলে শ্রীমতী বার্ক দেখিয়েছেন, সহসা গির্জায় দলে-দলে লোক আসতে শুরু করেছিল, এবং যথার্থ উন্মাদনার সঙ্গে প্রচার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। "নিউইয়র্ক ও ব্রুকলিনের উপর দিয়ে ধর্মতরঙ্গ বয়ে চলেছে"—এই শিরোনামা দিয়ে 'সেণ্ট লুইস রিপাবলিক' ১৮৯৪, ২৯ জানুয়ারি যে-সংবাদ ছেপেছিল, তার শেষে ছিল : "এখনকার ধর্মোন্মাদনাকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, ১০ বছর আগেকার রীতি তা নয়। পুরাতন পদ্ধতি ছিল, অনন্ত নরকের ভয়ানক কাহিনী শুনিয়ে

পাপীদের দারুণ আতঙ্কিত করে প্রশ্নকক্ষে ঠেলে দেওয়া, যেখানে 'অভিজ্ঞতার সভা' বাকি কাজ সেরে ফেলে। এখন সেসব বদলে গেছে। এখন খ্রীস্টের সর্বশক্তিপূর্ণ প্রেমের নামে আবেদন। যাজকদের ভাষণের বিষয়—ঈশ্বরের প্রেম, এবং ক্ষমা।"

আমেরিকায় ধর্মজাগরণের কারণ কি? এক কারণ, অর্থনৈতিক মন্দা। বাস্তব দুঃখের আঘাত ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী করেছিল তাদের। দ্বিতীয় কারণ, ধর্মমহাসভা, যার প্রতিক্রিয়ায় মিশনারিরা আত্মরক্ষার্থে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে উৎসাহী। তৃতীয় এবং প্রধান কারণ—আমেরিকায় সর্বোচ্চ-শ্রেণীর একজন অধ্যাত্মনেতার উপস্থিতি।

আমেরিকায় তাঁর উপস্থিতি, ইংলন্ডে তাঁর উপস্থিতি, ভারতে তাঁর উপস্থিতি—সত্যই বিবেকানন্দের উপস্থিতির অপেক্ষা ধর্মজাগরণের বৃহত্তর কারণ সম্ভব নয়।

অ ষ্ট ম অ ধ্যা য়

জাতির কৃতজ্ঞতা

॥ ১ ॥

একজন মানুষ তাঁর দেশ ও জাতিকে সর্বোচ্চ বস্তু দিলেন—জাতিও প্রতিদানে হৃদয় উজাড় করে নিবেদন করল। আমেরিকায় স্বামীজী ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারে যে-সব কাজ করেছেন, তার অনুমোদন করতে এবং তাঁর অপূর্ব সাফল্যের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাতে বিরাট-বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হল মাদ্রাজে, কলকাতায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে। প্রথম অভিনন্দনসভা হয় মাদ্রাজে, সেইসঙ্গে দক্ষিণভারতের কয়েকটি স্থানে, তারপরে কলকাতায়। এই সভানুষ্ঠানের ব্যাপারে মাদ্রাজী ও বাঙালীদের মধ্যে স্বামীজীকে নিয়ে মধুর কাড়াকাড়ির ভাব দেখা গেল। মাদ্রাজের কাগজ লিখল, মাদ্রাজীরাই প্রথম স্বামীজীকে চিনেছে। এখন তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন বলে বাঙালীরা তাঁকে দাবি করছে। বাংলার কাগজ লিখল, সে-কথা ঠিক, তবে আমরা অনেকটা দোষস্খালন করে ফেলেছি, যেহেতু তাঁকে অভিনন্দন দেবার প্রস্তাবটা উঠেছে বাংলাদেশ থেকেই।

মাদ্রাজের হিন্দু লিখেছিল ঃ

"কলকাতা তাঁর জন্মস্থান। সে শীঘ্রই প্রকাশ্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবে তাঁর কার্যাবলীর জন্য। আর মাদ্রাজ তাঁর ধর্মমহাসভায় যাবার ইচ্ছার জন্মস্থান—সেই মাদ্রাজের পক্ষে চুপ করে থাকা উচিত হবে না। মাদ্রাজ আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারে—তার উদারতার জন্য যদি নাও হয় অন্ততঃ সেই অন্তর্দৃষ্টির জন্য যা তাকে সত্বর সাহায্যে প্রণোদিত করেছিল। স্বামীজী বিরাট হয়ে পড়েছেন, তাই কলকাতা এখন তাঁকে দাবি করছে—মাদ্রাজ অনেক আগে তাঁকে সমাদর করার মতো বিবেচনাশক্তি দেখিয়েছিল। হায়, কোনো মানুষই নিজ দেশে প্রফেট নন।"

স্বামীজী কী করেছেন যে, তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হবে—এই ধরনের কথারও চমৎকার উত্তর হিন্দু দিয়েছিল। স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে মিলবার ভূমি দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন ঘৃণা ও বিদ্বেষহীন প্রেমের রূপ—এ-সব কথা তো উক্ত উত্তরে ছিলই, তার সঙ্গে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল, "আমেরিকায় বিবেকানন্দের মিশন ভারতের ধর্মেতিহাসে যুগ-সৃষ্টিকারী ঘটনা।" সর্বোপরি হিন্দু বন্দনা করেছিল সত্যধর্মের উপাসক বিবেকানন্দের কুসংস্কার লঙ্ঘন করবার প্রচণ্ড চিত্তশক্তিকে। "পৃথিবীর মানুষ আমরা আচারের নিগড়ে আবদ্ধ," হিন্দু লিখেছিল, "প্রতিভার ধর্ম তাকে ভেদ করে অগ্রসর হওয়া।...কয়েক মাস আগে স্বামীজী যখন বোম্বাইয়ে স্টিমারের ক্যাবিনে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তিনি কালা-পানির পারে যাওয়ার বিরুদ্ধে যে-নিষেধাজ্ঞা আছে, তাকে ঠেলে সরিয়ে দেন। খুব কম লোকের পক্ষেই সন্ন্যাসীর সমুদ্রযাত্রার তাৎপর্য বোঝা সম্ভবপর, যাঁরা জানেন না যে, হিন্দু-ধর্মের অভিভাবকরূপে সন্ন্যাসীর উপরে কাল-পরম্পরায় কোন্ দায়িত্ব অর্পিত আছে।" সামাজিক জীবনে স্বামীজী কী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করলেন, তারই উদ্দীপ্ত কথা হিন্দু লিখেছিল ঃ

"That a Sannyasin should have risen so high above the cramping superstitions of his country as to have gone across the waters not only to preach but also to show by practice what real Hinduism is—is a

fact, the abundant significance of which will be realised only by the astute observer now and the generations to come in future."

মাদ্রাজের ধন্যবাদ-সভা হয় পাচিআপ্পা-হলে, শনিবার, ২৮ এপ্রিল, ১৮৯৪। "জনাকীর্ণ এই সভায়" সভাপতিত্ব করেন দেওয়ান-বাহাদুর এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার সি-আই-ই। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাজের "বহু আলোকপ্রাপ্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।"১

"পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দ," যাঁকে "মাদ্রাজের সকলে এত জানে এবং শ্রদ্ধা করে"—তাঁর সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলেছিলেন, "বাংলাদেশ এমন একটি সন্তানের জন্য অবশ্যই গর্ব করতে পারে।" সেইসঙ্গে এই বিখ্যাত সভাপতি বলেছিলেন : বিবেকানন্দ কোনো বিশেষ দেশের সামগ্রী নন; "বিবেকানন্দের আমেরিকা-ভ্রমণ এবং সেখানে তাঁর সাফল্য আমেরিকাবাসী ও হিন্দু উভয়ের পক্ষেই চরম গুরুত্বপূর্ণ।...[হিন্দুধর্মের পরম সত্য-প্রচারের ক্ষেত্রে] বিবেকানন্দ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন।" স্বামীজীর সাফল্য, হিন্দুধর্ম-জাগরণে তাঁর বিরাট ভূমিকা সম্বন্ধে আরও বহু আবেগময় বক্তৃতা ঐ সভায় হয়েছিল। রামচন্দ্র রাও-সাহেব স্বামীজী যে-ভাবে কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দুধর্মকে বহন করে নিয়ে গেছেন বিদেশের মাটিতে, তার গভীর তাৎপর্যের কথা বলেন, এবং স্বামীজীর ব্যক্তিমহিমার উল্লেখ না করে পারেন নি : "যাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্যলাভ করেছেন, তাঁরাই বলেন, যদি কেউ মাত্র এক ঘণ্টাও তাঁর সান্নিধ্যে কাটান, তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা, চিন্তার গভীরতা এবং উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতায় চমৎকৃত না হয়ে পারবেন না।" পাচিআপ্পা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক গোপালকৃষ্ণ মুদালিয়র এই সাক্ষ্য দেন : "যৌবনকাল থেকেই আমার দর্শনশাস্ত্রে আগ্রহ; বহু দূর স্থান ভ্রমণ করেছি প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে। কিন্তু স্বামীজী ছাড়া আর কাউকে পাইনি আমার প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতে। আর একজনই মাত্র আমার চিন্তার শান্তি ঘটিয়েছেন—তিরুবনমালাইয়ের মঠাধিপতি। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল হিন্দুশাস্ত্রই জানেন না, বৌদ্ধশাস্ত্রেও পণ্ডিত, এবং বাইবেল ও কোরানের অভিনিবিষ্ট পাঠক।"

ধন্যবাদ কেবল বিবেকানন্দকেই দেওয়া হয়নি, 'মহান আমেরিকান জনগণ', যাঁরা ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দুধর্মের সত্য শুনবার এবং সমাদর করবার উদারতা দেখিয়েছেন, তাঁদেরও ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। আমেরিকান জনগণকে ধন্যবাদ জানানোর প্রস্তাবটি তোলেন তৎকালীন মাদ্রাজের এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, যোগী পার্থসারথি আয়েঙ্গার, যিনি ধর্ম-মহাসভায় পঠিত হবার জন্য বিরাট প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন।২ ইনি এ'র পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে

১ উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন, রাজা স্যার এস রামস্বামী মুদালিয়র কে-টি, সি-আই-ই; এম ভেঙ্কটরাম চেট্টি; পি আর সুন্দররাম আয়ার; টি ভি শেষগিরি আয়ার; এম এ শ্রীরঙ্গচারিয়ার; দেওয়ান-বাহাদুর আর রঘুনাথ রাও; সি রামচন্দ্র রাও সাহেব; গোপালকৃষ্ণ মুদালিয়র; এম ও পার্থসারথি আয়েঙ্গার; ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার; এম বেণুগোপাল পিল্লাই; বি হনুমন্ত রাও প্রভৃতি।

২ ধর্মমহাসভায় পঠিত হবার জন্য পার্থসারথি আয়েঙ্গারের প্রবন্ধ পাঠানো সংবাদপত্রে ঘোষিত হবার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। গাদুরা মেলে ১৮৯৩, ১০ জুন বেরিয়েছিল :

"Yogi Parthasarathi Iyengar, B.A., B.L., has sent a voluminous essay on the Hindu Religion to the World's Parliament of Religions at Chicago.

এ'র বিষয়ে আরও সংবাদ পাই এম জি শ্রীনিবাসনের রচনায় :

"Dr. Barrows....had written to Dr. William Miller about the Parliament of Religions. Yogi Parthasarathi Iyengar, Alasinga's uncle and a great Vaishnava scholar connected with the Hindu League of America, informed Alasinga about it". ['Alasinga Perumal': By M. G Srinivasan; *Alasinga Perumal Centenary Souvenir;* 1965]

খ্রীস্টান ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কী কঠিন সাম্প্রদায়িকতা ছিল, এবং ধর্মবিচ্যুতির ক্ষেত্রে কোন্ দারুণ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, তার উল্লেখ করেন; তারপর উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করেন—আমেরিকানরা সেই গণ্ডী কিভাবে ভেঙেছেন। ইনি আরো বলেছিলেন, এতদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানে না এমন ব্যক্তিরা এই ধর্মের কুৎসা করে গেছে, যেমন, কোপার্নিকাস-তত্ত্বের বিরোধীরা তত্ত্বটি ঠিক-কি-বেঠিক জানার চেষ্টা মাত্র না-করে উক্ত তত্ত্ব ও তাত্ত্বিককে নিপাতের চেষ্টা করেছেন। হিন্দুধর্ম কী—তা জানাবার এবং জানবার গৌরব এতদিন অপেক্ষা করে ছিল বিবেকানন্দ ও আমেরিকান জনগণের জন্য। [হিন্দু, ১৮৯৪, ৩০ এপ্রিল; মাদ্রাজ মেল, ৩০ এপ্রিল; মাদ্রাজ টাইমস, ৩০ এপ্রিল]

মাদ্রাজের এই সভার পরে দক্ষিণ ভারতের আরও কয়েকটি মুখ্য স্থানে অনুরূপ বৃহৎ সভা হয়। ২২ জুলাই সভা হয় কুম্ভকোনমের পোর্টার টাউন হলে এবং ২৭ অগস্ট বাঙ্গালোরে সেণ্ট্রাল কলেজ হলে।

কুম্ভকোনমের সভায় দেওয়ান-বাহাদুর রঘুনাথ রাও সভাপতিত্ব করেন। মাদ্রাজের এই বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় আগে দিয়েছি। এই সভায় মাদ্রাজের দিক্‌পাল-পণ্ডিত অধ্যাপক এম রঙ্গাচার্য বক্তৃতা করেছিলেন। এঁর কথাও আগে বলা হয়েছে, পরে 'ব্রহ্মবাদিন'-প্রসঙ্গে আরও বলতে হবে।

"দীর্ঘ এবং আকর্ষক বক্তৃতায়" রঘুনাথ রাও বর্ণনা করেছিলেন, হিন্দুধর্ম কিভাবে প্রতিদিন কটু কঠিন আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে "এই সুমহান, সুপণ্ডিত, বিরাট সন্ন্যাসীর কার্যাবলী মনে হচ্ছে বিধাতার বিধান। ঐ সন্ন্যাসী নিঃসঙ্গ একক সংগ্রামে হিন্দুধর্মের মর্যাদারক্ষা করতে পেরেছেন।" অধ্যাপক রঙ্গাচার্য তাঁর "উদ্দীপ্ত উচ্চ বাগ্মিতায়" দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কিভাবে হিন্দু-ভাবাদর্শ পাশ্চাত্ত্যের ধর্মগুলি গ্রহণ করেছে। ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মানবভ্রাতৃত্বের ধারণা হিন্দুধর্ম থেকেই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তিব্বতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত যীশুর জীবনীতে তার প্রমাণ মেলে। রঙ্গাচার্য বলেছিলেন, "সেই মহাগুণী বাঙালী ব্রাহ্মণের [স্বামীজীর] সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বলবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি বলেছেন, বিবদমান নানা ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্ম-সমন্বয়ের মহাসত্য প্রচার করাই আমার জীবনোদ্দেশ্য। বৃহৎ ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্র হিন্দুধর্মই এই সত্য স্বীকার করে।" [হিন্দু]

বাঙ্গালোরের ধন্যবাদসভাকে কার্যতঃ সমগ্র মহীশূরের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বলা চলে। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহীশূরের দেওয়ান স্যার শেষাদ্রি আয়ার। "রাজ্যের সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীসহ তিনি সভায় এসেছিলেন।" সভায় ছিল "শ্বাসরোধী ভিড়;" "ঐ সমাবেশ অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ এবং প্রতিনিধি-স্থানীয়।"৩ সভাপতি "সবিশেষ প্রশংসা"

৩ "উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন, স্যার কে শেষাদ্রি আয়ার, কে-সি-এস-আই; পি চেণ্টসাল রাও (মহারাজার সভাসদ); এ রামচন্দ্র আয়ার (চীফ-কোর্টের বিচারপতি); পি এন কৃষ্ণমূর্তি (ঐ); টি আনন্দ রাও (দেওয়ানের চীফ সেক্রেটারি); ইউ পি মাধব রাও (পুলিশের ইনস্‌পেক্টার জেনারেল); সি মীনাক্ষী আয়ার (লেজিসলেটিভ সেক্রেটারি); ভি এন নরসিম আয়েঙ্গার (সেনসাস সুপারিনটেনডেণ্ট); শ্রীনিবাস চালু (মুজারাই সুপারিনটেনডেণ্ট); মীর সুজায়েত আলি খান (বাঙ্গালোরের ডেপুটি কমিশনার); আব রঘুনাথ রাও (ফার্স্ট জুডিসিয়াল অ্যাসিট্যাণ্ট কমিশনার); এল অনন্তস্বামী রাও (দেওয়ানের অফিসের আণ্ডার সেক্রেটারি); ভি নানজুণ্ডা (সাবজজ্); পি শৃঙ্গাচার্য (বাঙ্গালোরের মুনসেফ); কে পি পুত্তনা চেট্টি (পুলিশ সুপার); এ গোপাল চালু (শ্রীনিবাস মন্দিরমের প্রতিষ্ঠাতা); পি এস কৃষ্ণরাও (ডিস্ট্রিক্ট জাজ্); এস বিদ্যান্ত আয়ার (সিটি ম্যাজিসট্রেট); এস রামস্বামী আয়ার (অ্যাসিট্যাণ্ট গভর্নমেণ্ট অ্যাডভোকেট) ইত্যাদি ইত্যাদি।" এই তালিকা উপস্থিত করছি এই বিস্ময়কর ব্যাপারটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে—একজন সদ্য-বিখ্যাত তরুণ সন্ন্যাসী, যিনি দূর দেশে রয়েছেন—তাঁকে ধন্যবাদ দিতে ভারতের

করেছিলেন স্বামীজীর। অন্যান্য বক্তারা এ-ব্যাপারে পশ্চাদপদ থাকেন নি। বিচারপতি রামচন্দ্র আয়ারের কথা থেকে জানা গিয়েছিল, মহীশূরের মহারাজা স্বামীজীকে আমেরিকা পাঠানোর নিমিত্ত হয়েছিলেন। এ গোপাল চার্লুর উপরে দায়িত্ব পড়েছিল ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করার। তিনি বলেন, এ-কাজ যদি একজন রক্ষণশীল পণ্ডিত করেন যথাযোগ্য হয়। তদনুযায়ী প্রবীণ একজন সংস্কৃত-পণ্ডিত উঠে সংস্কৃতে এবং তামিলে স্বামীজীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রশস্তি করেন। কিন্তু এই সভার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিস ছিল জি জি নরসিমাচার্যের ভাষণ, যার মধ্যে স্বামীজীর জীবনচিত্র ছিল, মাদ্রাজে অবস্থানকালে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্যের রূপরেখা ছিল (যার কিছু অংশ আগেই উপস্থিত করেছি) এবং উদ্দীপ্ত ভাষায় ভারতীয় ধর্মজাগরণে স্বামীজীর ভূমিকার কথা বলা হয়েছিল।' [৬ সেপ্টেম্বরে মিরারে উদ্ধৃত বাঙ্গালোর স্পেকটেটরের বিবরণ, এবং ২৮ অগস্ট হিন্দুতে উদ্ধৃত ডেইলি পোস্টের বিবরণ থেকে সংকলিত]

॥ ২ ॥

দক্ষিণ ভারতের ধন্যবাদ-সভাগুলির বিবরণ থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়—দক্ষিণীরা স্বামীজীর সাফল্যে চমৎকৃত হলেও তাকে একেবারে অভাবিত-কিছু ভাবেন নি। তাঁদের বিস্ময় ছিল সাফল্যের পরিমাণ নিয়ে, এবং সেই কথাটি মাদ্রাজ-অভিনন্দনপত্রে লেখাও হয়েছিল। ৪ স্বামীজীর সাফল্যে অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় ছিল অপরপক্ষে কলকাতায়। "বিবেকানন্দ আমেরিকার দান ভারতবর্ষকে"—স্বামী নিখিলানন্দের এই রহস্যোক্তির (যা তিনি আমার কাছে করেছিলেন) প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, বিবেকানন্দ মাদ্রাজের দান কলকাতাকে। কলকাতার অভিনন্দন-সভায় দাঁড়িয়ে বক্তার পর বক্তা কিভাবে তাঁদের বিস্ময়কে উন্মোচন করেছিলেন, তার রূপ কিছু পরে দেখব, এখন দেখা যাক, কলকাতায় অভিনন্দন-পরিকল্পনা কিভাবে হয়েছিল। এ-ব্যাপারেও অগ্রণী ছিলেন মিরার-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, যিনি বিবেকানন্দকে প্রথম পর্বে জনচক্ষে তুলে ধরতে সর্বাধিক লেখনীচালনা করেছেন। তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ রচনাই যে, কলকাতায় সাফল্যমণ্ডিত অভিনন্দনসভার পটভূমিকা প্রস্তুত করেছিল, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

মিরার দিনের পর দিন লিখেছে—"সমগ্র সভ্য পৃথিবীর সামনে হিন্দুধর্মের যোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে স্বামী বিবেকানন্দ যে-কাজ করেছেন, তার জন্য সমগ্র হিন্দুজাতি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।" "আমরা কৃতজ্ঞ"—এই কথাটির পরে কৃতজ্ঞতাকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে প্রকাশের কথাও এসে গেল। কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের প্রস্তাবকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিরার-সম্পাদক ওঠালেন ১০ এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে ঃ

"প্রফেট নিজ দেশে সম্মান পান না—নিতান্ত প্রচলিত এই কথা। বাস্তব জীবনে প্রায়ই তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ যদি আমেরিকা না যেতেন, তাহলে এখন যত ব্যাপকভাবে তিনি পরিচিত, ততখানি হতেন কি-না খুবই সন্দেহের বিষয়।...

একটি প্রধান দেশীয় রাজ্যের তাবৎ প্রধান ব্যক্তি জড়ো হয়েছিলেন!! স্বামীজী কি ধরনের সম্মোহন বিস্তার করেছিলেন, এ তার এক আশ্চর্য প্রমাণ।

৪ মাদ্রাজ-অভিনন্দনপত্রে এ বিষয়ে লেখা হয় ঃ "We, your Hindu co-religionists, who have had the privilege of knowing you personally, never for a moment doubted that your Mission would prove an entire success....but....the success you have actually achieved has certainly exceeded our most sanguine expectation."

"আমেরিকায় প্রচারের কাজে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যে-গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেছেন, সে-বিষয়ে বিবেচনা করে হিন্দুরা যদি তাঁকে অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করে, তাহলে কৃতজ্ঞতার কর্তব্য পালন করা হবে। সেইসঙ্গে যাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বামীজীর পক্ষে আমেরিকায় এইরূপ সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হত না, সেই ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষকেও অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করা উচিত। আমাদের বিশ্বাস, সারা দেশের হিন্দু-ভ্রাতৃগণ এই প্রয়াসে সর্বান্তঃকরণে যোগদান করবেন। স্বামী বিবেকানন্দ এখনো আমেরিকায় আছেন; সেখানেই অভিনন্দনপত্র অবিলম্বে পাঠানো উচিত। আমাদের আমেরিকান বন্ধুদেরও অবশ্যই জানানো দরকার যে, আমাদের হিন্দু-ভ্রাতাকে যে প্রভূত সমাদর তাঁরা জানিয়েছেন তাকে স্বীকার না-করবার মতো অকৃতজ্ঞ আমরা নই। অভিনন্দনপত্র প্রেরণের ব্যাপারে বিলম্ব করা কোনো মতেই উচিত হবে না। এ-বিষয়ে সারা দেশের হিন্দু-ভ্রাতৃগণের মতামত জানতে আমরা ইচ্ছুক।" [অ]

স্বামীজীকে ধন্যবাদ জানাবার ইচ্ছা নরেন্দ্রনাথ সেনের মনে যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগেছিল—স্বামীজীর জীবনীতে উৎসাহীদের পক্ষে এটি প্রয়োজনীয় সংবাদ। পরে আমরা দেখব, এই স্বতঃজাগ্রত ইচ্ছার সঙ্গে স্বামীজীর প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষাও মিশে গিয়েছিল। মিরার-সম্পাদকের প্রস্তাব প্রকাশিত হবার পরে ২২ এপ্রিল মিরারে 'ট্রুথ' নামে এক পত্রলেখক তাকে জোরালো সমর্থন জানান। এই সময়ে স্বামীজীর বিরুদ্ধে যে-সব চক্রান্ত চলছিল, তার বিষয়ে এই পত্রলেখক খোলাখুলি কিছু কথা বলেছিলেন, অন্যপ্রসঙ্গে তার উল্লেখ করব, এখানে স্মরণ করাতে চাই, ইনি বিবেকানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মূল কারণটি ঠিকই ধরেছিলেন ঃ "ভারতীয় ইতিহাসে এই প্রথম একজন মানুষ বিদেশে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ রূপকে প্রচার করেছেন।" হিন্দুধর্ম-তত্ত্বের প্রকাশে বিবেকানন্দের মহনীয় রচনার অত্যুচ্চ প্রশংসা করে ইনি বলেন, "তাঁর ধর্ম ঊর্ধ্বাকাশের মতোই উদার-বিস্তার এবং তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমগ্র হিন্দুজাতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য।" ধন্যবাদ-প্রস্তাব প্রসঙ্গে ইনি লিখে-ছিলেন ঃ "মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিবেকানন্দের মহিমার সমাদর করতে পেরেছে। আমেরিকায় তিনি পূজা পাচ্ছেন। এখন বাংলার পালা—জাতীয় গৌরবের ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে হাত মেলানো।...আমার ধারণা, যিনি স্বামীজীর বক্তৃতা একবারও পড়েছেন, তিনি তাঁকে অভিনন্দন পাঠাবার ব্যাপারে যোগদান করতে দ্বিধা করবেন না। সম্পাদক মহাশয়, আপনি যে, এইরকম শ্লাঘনীয় ধর্মীয় বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন, সেজন্য আমরা আনন্দিত।"

ধন্যবাদসভা কিন্তু ঠিক তখনি কলকাতায় সংগঠন করা যায়নি। তবে মাদ্রাজ সে-কাজ আগেই করে ফেলেছে, এই সংবাদে মিরার-সম্পাদক ১ মের সম্পাদকীয় টীকায় কিছু আত্মগৌরব জ্ঞাপন না করে পারেননি ঃ "আমরা আনন্দিত, সম্প্রতি আমরা যে-প্রস্তাব করেছিলাম, তদনুযায়ী স্বামী বিবেকানন্দকে ধন্যবাদ দেবার জন্য...মাদ্রাজে পচাইপ্পা-হলে জনসভা হয়েছে।" ৪ মের সম্পাদকীয় একই কথা দিয়ে সূচনা করার পরে সম্পাদক মহাশয় লিখেছিলেন, বিবেকানন্দের মিশন তাঁর কাছে একটি "দিব্য উন্মোচন" সম্ভব করেছে —উক্ত মিশনের দ্বারা আর্য হিন্দুদের সঙ্গে পিলগ্রিম ফাদারদের বংশধর আমেরিকানদের মিলিত হবার সম্ভাবনা দেখা গেছে। এই অভিনন্দনের সূত্রে মাদ্রাজ, বাংলা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বিবেকানন্দ-ভক্তগণের মিলিত হবার সম্ভাবনা দেখা গেছে, একথাও তিনি বলেছিলেন।

কলকাতা থেকে অভিনন্দন পাঠাবার পক্ষে উৎসাহ ক্রমেই বাড়তে থাকে। কে চক্রবর্তী মিরারে (৩ জুন) এক চিঠিতে প্রস্তাবের পক্ষে জোর সমর্থন জানালেন। বিরোধী কণ্ঠস্বরও ইতস্তত ছিল। জনৈক বিজ্ঞ মাদ্রাজী "বিবেকানন্দকে নিয়ে কেন এত মাতামাতি"—এই জিজ্ঞাসায় আকুল তাঁর মনকে যখন বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে নিবেদন করেছিলেন, তখন

মিরার-সম্পাদক ১১ জুলাই তাঁর দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন।৫ ৮ অগস্টের সম্পাদকীয়তে পুনশ্চ অভিনন্দনসভার পক্ষসমর্থন আছে, এবং ৩১ অগস্টের সম্পাদকীয়তে জানানো হয়েছে—কলকাতার টাউন হলে ধন্যবাদ জানানোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। এর পরেও মিরারে প্রকাশিত কয়েকটি চিঠিতে ও সংবাদে কলকাতার ধন্যবাদসভার আয়োজনের সংবাদ পাচ্ছি, যেমন ১ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত কে চক্রবর্তীর চিঠি, যার মধ্যে মারউইন মেরী স্নেলের একটি চিঠি উদ্ধৃত ছিল, যাতে উক্ত বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিবেকানন্দকে গুরুরূপে বন্দনা করেছিলেন।৬ ৫ই সেপ্টেম্বর সভানুষ্ঠান হবে এই বিজ্ঞপ্তি মিরারে বেরিয়েছিল। সভা ঐ তারিখেই হয়। পরদিন সভার বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই, মিরার কেবল ধন্যবাদসভার যৌক্তিকতার কথাই প্রচার করেনি, তাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য কিছু সাংবাদিক কৌশলও অবলম্বন করেছিল। মাদ্রাজে ধন্যবাদ-সভা হয় এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে। কাছাকাছি সময়ে তার উপরে মিরার সম্পাদকীয় মন্তব্যও করে। কিন্তু এই কাগজে মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর বা কুম্ভকোনমের ধন্যবাদসভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় অনেক পরে—অগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে—এবং সম্ভবতঃ তা করা হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের কলকাতার ধন্যবাদসভার উদ্দীপনাকে তুঙ্গে তোলবার জন্যই।

৫ উক্ত মাদ্রাজী পত্রলেখকের তির্যক মন্তব্যের মধ্যে আর কিছু না থাক, বিবেকানন্দ কি-ধরনের উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন, তার স্বীকৃতি আছে :

"Vivekananda is the word of the hour. Everybody is full of him. Any person who does not profess the most fulsome adulation for him, is set down for a fool or worse."

বিবেকানন্দের প্রশস্তিকারী দু'একজনকে এই ভদ্রলোক প্রশংসার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন কিন্তু সদুত্তর পাননি। বড় বেদনায় ইনি বলেছিলেন, "বিবেকানন্দের আগেও তো কত বড়-বড় মানুষ এসেছেন, কই তাঁরা যখন মরলীলা সাঙ্গ করেছেন কেউ তো একগাছি মালা নিয়ে যায়নি, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি—হায়, তাঁদের কথা তো কেউ বলে না!" এই পটভূমিকায় বিবেকানন্দ হঠাৎ কী করে বসেছেন যে, এত স্তুতির বন্যা? "প্রশংসা করার আগে প্রমাণ দাও বন্ধু, প্রমাণ দাও!" তবে উদারতা এই ভদ্রলোকের সহজাত। ইনি বিবেকানন্দের গৌরবগানে বাধা দিতে চান না, গালভরা প্রস্তাবেও তাঁর আপত্তি নেই, প্রশংসা যে করে তার মঙ্গল, তবে প্রশংসা যে-পায় তার মঙ্গল হয় না সর্বদা। বিবেকানন্দের এবং হিন্দুদের মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠিত এই ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন—বিবেকানন্দকে তোমরা কি ঠিকভাবে বুঝেছ? বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের মধ্যে কি জাতিভেদের স্বীকৃতি আছে? মন্দিরের সেবাদাসীদের স্থান আছে? দারুমূর্তি আছে? তোমরা বলছ, বিবেকানন্দ ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছেন। এটা এমন-কিছু প্রশংসার বিষয় হতে পারে না। সমুদ্রযাত্রার চেয়ে ক্লান্তিকর জিনিস আরও অনেক আছে। প্রতি বছর হাজার-হাজার নরনারী আটলান্টিক পার হওয়ার ঝুঁকি নেয়।

মিরার-সম্পাদক উত্তর দিয়েছিলেন। তার মধ্যে দুটি কথা প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রথম, বিদেশে হিন্দুধর্মের মর্যাদা স্থাপন করে বিবেকানন্দ সভ্যজাতির মধ্যে ভারতবর্ষকে স্থাপন করেছেন, দ্বিতীয়, মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের বদ চেষ্টায় বাধা দিয়েছেন। অন্য কারণ না থাকলেও এই দুটি কারণ তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার পক্ষে যথেষ্ট—সম্পাদক বলেছিলেন।

৬ কে চক্রবর্তী আমেরিকাবাসীকে, বিশেষতঃ ধর্মমহাসভা-কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানোর কথা অধ্যাপক স্নেলকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। এই সহৃদয় মনোভাবের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধ্যাপক স্নেল লেখেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ধন্যবাদের প্রত্যাশী নন। তবে যদি ধন্যবাদসভার দ্বারা হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়, নিজ ধর্ম ও জাতি সম্বন্ধে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই সভা হোক। বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করে অধ্যাপক স্নেল লেখেন :

"Your personal honors should be reserved for your distinguished country-man, Paramhansa Vivekananda, a most worthy disciple of a noble teacher and one whom I am proud to hail as my friend and master."

এই সমস্ত সময়ে মিরার অধিকন্তু আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে বিবেকানন্দের সংবাদ প্রকাশ করে গেছে, যার উল্লেখ পূর্ব অধ্যায়ে করেছি।

মিরারের মতো ঝাঁপিয়ে না পড়লেও বাংলাদেশের অন্য দুই প্রধান ভারতীয় সংবাদপত্রে সমর্থনের অভাব ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি সাপ্তাহিক বেঙ্গলী রাজনৈতিক পত্রিকা হলেও ১৮৯৩, ২৫ নভেম্বরের সম্পাদকীয়তে অপরিচিত বিবেকানন্দের (আগেই দেখেছি, সুরেন্দ্রনাথ যুবক নরেন্দ্রনাথকে চিনতেন; তবে তিনি বোধহয় নরেন্দ্রনাথই যে, বিবেকানন্দ হয়েছেন, এ বিষয়ে গোড়ায় স্থির নিশ্চয় হতে পারেননি) সহসা খ্যাতিশিখরে উত্থানের কথা লিখেছিল। ৯ ডিসেম্বর এই পত্রিকায় ডেইলী ক্রনিকলের রিপোর্ট উদ্ধৃত হয়, যার মধ্যে বিবেকানন্দের মুখের সঙ্গে বুদ্ধের মুখের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্যের কথা ছিল। এবং ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার ধন্যবাদসভার রিপোর্টের শেষে এই সাফল্যমণ্ডিত সভার উদ্যোক্তাদের কার্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানানো হয়েছিল।

কলকাতার প্রভাবশালী রাজনৈতিক দৈনিক অমৃতবাজারের কর্তৃপক্ষ গোঁড়া বৈষ্ণব, বৈদান্তিক বিবেকানন্দের অবাধ প্রশংসায় গররাজি, তথাপি ১০ মার্চ, ১৮৯৪ পায়োনীয়ার থেকে স্বামীজীর সবিশেষ প্রশস্তিপূর্ণ মারউইন মেরী স্নেলের চিঠিখানির পুনর্মুদ্রণ করেছিল, এবং ১৭ জুলাইয়ের সম্পাদকীয় রচনায় বলেছিল : "আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতি বাস্তবিকই বিরাট এক মিরাকল।" ২৫ অগস্ট এই পত্রিকা সমুদ্র-যাত্রার ব্যাপারে স্বামীজীর সমালোচকদের কঠোরভাষায় নিরস্ত করে ঐ মিরাকল-তত্ত্বই উপস্থিত করেছিল :

"Vivekananda's work in America is a miracle, and he is no doubt an instrument in the hands of God."

১ সেপ্টেম্বর অমৃতবাজার কে চক্রবর্তীকে লেখা অধ্যাপক স্নেলের চিঠি ছাপে। একই তারিখে ধন্যবাদসভাকে সমর্থন করতে গিয়ে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সে যা লিখেছিল, তাকে এই পত্রিকার সর্বোচ্চ বিবেকানন্দ-প্রশস্তি বলা যায়। ঐ রচনায় বলা হয়, **"পাশ্চাত্ত্যের কাছে আমাদের জাতির মর্যাদাকে বিবেকানন্দ একলা যতখানি উত্তোলন করেছেন, ভারতের সকল রাজনৈতিক নেতা একযোগেও তা করতে পারেন নি।"**৭

॥ ৩ ॥

১৮৯৪, ৫ সেপ্টেম্বরের ধন্যবাদসভা কি-জাতীয় হয়েছিল তা জানতে হলে মিরারের বর্ণনার কাছে যেতে হবে। সভা যে জনাকীর্ণ ছিল, প্রচুর উৎসাহ সেখানে বিদ্যমান ছিল,

---

৭ অমৃতবাজারের ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সম্পাদকীয়ের শেষাংশে ছিল :

"We understand that a movement has been set on foot to hold a public meeting in Calcutta to strengthen the hands of Vivekananda and to thank the Americans for the cordial reception they gave to him. We wish the movement every success. *Vivekananda richly deserves the recognition of the services to the Hindu nation, by his countrymen. He has done much more to elevate our nation in the estimation of the people of the West than what has hitherto been done by all our political leaders put together."* [বক্রলিপি লেখক-নির্দেশে]

সে-কথা ভারতীয় এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান৮ সকল সংবাদপত্রই স্বীকার করে, কিন্তু এই সভার 'রক্তবেগতরঙ্গিত' হৃৎপিণ্ডকে সত্যই কিছুটা উন্মোচন করতে পেরেছিল মিরার, তার এক প্রেরণার মুহূর্তে।—

"The great meeting of the Hindu community last evening at the Town Hall must have furnished a striking object-lesson to every one who was present at the immense gathering. The appearance of the different castes and sub-castes, into which Hindu society is split up at the present time, on a common platform, the oneness of feeling that animated all, the common enthusiasm, the united applause, as speaker after speaker rose and resumed his seat, and the absolute sincerity of the entire proceedings, all went to show that life has begun to beat with strong pulsation once more into the veins of the Hindu nation."

(মিরার, ১৮৯৪ ৬ সেপ্টেম্বর)

বিবেকানন্দ যে, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নন, জাতির প্রতিভূ—একথা ঘন আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল একই রচনায় ঃ

"Other Hindus did visit America before him, and they, too, discoursed on religion, and were accorded respectful hearings. But it is scarcely any disparagement for them to say that they did not speak, as Swami Vivekananda had spoken. *They were representatives of creeds,* and their thoughts as well as words were narrowed down by personal idiosyncracies. *But Swami Vivekananda had appeared before the American people as the accredited messenger of the whole Hindu nation*, and he spoke in their name; and he spoke not for himself or with the dogmatism of assumed authority, but on behalf not only of modern Hindus, but also, and much more of the great sages, lawgivers, and prophets of ancient India." [বক্রলিপি লেখক-নির্দেশে]

ধন্যবাদ-সভার বিস্তৃত রিপোর্ট পাই মিরারে ৬ ও ১৬ সেপ্টেম্বরে। কলকাতার অভিজাত সমাজের অগ্রণী নেতা রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতি হয়েছিলেন, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেক রক্ষণশীল পণ্ডিতও ছিলেন, নির্ধারিত সময়ের আগেই সভাস্থল পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, ইত্যাদি। এই সভা সম্বন্ধে মিরারের দীর্ঘ বিবরণ সন্তোষজনক; আরও সুখের বিষয়, এই সভার যে-'মুদ্রিত বিবরণী' (Proceedings) সভা হয়ে যাবার পরে বেরিয়েছিল, তা আমরা এইসঙ্গে ব্যবহার করতে পারছি।৯ ঐ 'বিবরণী'তে দু'একটি অতিরিক্ত সংবাদ আছে।

'বিবরণী' থেকে পাচ্ছি, এই সভা হিন্দুসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে আহূত

৮ ইংলিশম্যান ৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখে ঃ
"The immense hall was filled to its utmost capacity, and the speeches were received with continuous cheering."
স্টেটসম্যানেও বক্তৃতাদির সারাংশসহ বিস্তৃত রিপোর্ট বেরোয়।

৯ বিবরণীটি অগস্ট, ১৯৫৯, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

হয়েছিল;১০ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এহেন সভা অভূতপূর্ব। ১১ সভায় কারা উপস্থিত ছিলেন তার তালিকাও সেখানে ছিল।১২

সভায় ইংরাজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই বক্তৃতা হয়। বাংলা বলেছিলেন পণ্ডিত ভূদেব কবিরত্ন, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু যতীন্দ্রলাল মিত্র। তাঁদের বক্তৃতার কিছু অংশ 'বিবরণী' থেকে উপস্থিত করছি, কারণ তার মধ্যে মূল বাংলা বক্তৃতা দেওয়া আছে।

ভূদেব কবিরত্ন অন্যান্য কথার সঙ্গে বলেন ঃ

"চাতক পক্ষী যখন তৃষ্ণায় কাতর হয়, তখন সে মেঘের নিকটই জলের প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়।...তাহার প্রাণের পিপাসা মেঘ ভিন্ন আর কেহ মিটাইতে পারে না।...সেইরূপ বর্তমান অবনতিগ্রস্ত ভারতবর্ষও নানাবিধ অভাব আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পড়িয়া তৃষ্ণার্ত চাতকের ন্যায় ব্যাকুল প্রাণে, কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন, আমায় একবিন্দু জল দাও, আমার পিপাসা-বিশুষ্ক-কণ্ঠে একবিন্দু শান্তিসলিল ছিটাইয়া দাও। কিন্তু পৃথিবীর জলে—পার্থিব উন্নতিরূপ সংকীর্ণ জলের ফোয়ারায় ভারতের প্রাণের পিপাসা মিটিবে না।...যাঁহারা বর্তমানকালে কেবল রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, জড়বিজ্ঞানাদি পার্থিব জলধারায় ভারতের

১০ আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব, রায় নন্দলাল বসু, বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ।

বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ খরচের ভার অনেকখানি গ্রহণ করেছিলেন।

১১ "It is not too much to say that the inhabitants of Calcutta had never before in the history of British India met together in the Town Hall or elsewhere with an object more noble, more peaceful and more elevating. It was not to consider the pressing problems of politics, or to discuss delicate questions of controversial ethics, but to turn their attention once for all with a serene attitude of mind to the cardinal principles of Hinduism.... It was truly remarkable that towards the close of the 19th century, when civilization is another name for material progress, the place assigned to the soul should be once more recognised by the sons of New India." ('বিবরণী')

১২ মিরারের রিপোর্ট এবং 'বিবরণী' মিলিয়ে সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটা তালিকা দিচ্ছি ঃ

পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন ঃ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, উমাচরণ তর্করত্ন, চণ্ডীচরণ স্মৃতিতীর্থ, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কেদারনাথ বিদ্যারত্ন, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, নন্দকুমার ন্যায়রত্ন, কৈলাসনাথ বিদ্যারত্ন, তারাপদ বিদ্যাসাগর, বেণীমাধব তর্কালঙ্কার, যদুনাথ সার্বভৌম, অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন, বৈকুণ্ঠনাথ বিদ্যারত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত বিদ্যাভূষণ।

অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ঃ বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় গণেশচন্দ্র চন্দ্র, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায়, কুমার রাধাপ্রসাদ রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (জমিদার, টাকী), রায় রাখালচন্দ্র চৌধুরী (জমিদার, বরিশাল), গুরুপ্রসন্ন ঘোষ (জমিদার), নন্দলাল মুখার্জি (ঐ), যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ঐ), ক্ষেত্রনাথ মল্লিক (ঐ), রায় শিউ বক্স বগলা বাহাদুর, জে ঘোষাল, এন এন ঘোষ (বার অ্যাট ল', সম্পাদক ইণ্ডিয়ান নেশন), মন্মথনাথ মল্লিক (বার অ্যাট ল'), জে এন ব্যানার্জি, নরেন্দ্রনাথ সেন (অ্যাটর্নি; সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান মিরার), ভূপেন্দ্রনাথ বসু (অ্যাটর্নি), কালীনাথ মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (অ্যাটর্নি), উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রমথনাথ কর (অ্যাটর্নি), গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী, শিরীষচন্দ্র রায়চৌধুরী, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন রায়, শালিগ্রাম সিং, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, হেমেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, ভূপেন্দ্রকুমার বসু, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, অধ্যাপক এম এন গুপ্ত, ললিতমোহন ব্যানার্জি, জে পাদ্‌শা, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, রাইট রেভারেণ্ড এন সাধনানন্দ (সিংহল), ডাঃ জে বি ভ্যালী (সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ), অমৃতলাল রায় (সম্পাদক হোপ), শশিভূষণ মুখার্জি (সম্পাদক, ন্যাশন্যাল গার্ডিয়ান) প্রভৃতি।

অভাব, ভারতের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহেন, তাঁহারা ভারতের মর্মকথা বুঝিতে পারেন না।... তাই আজ বিবেকানন্দ-স্বামীর মতো মহাত্মা সুদূর আমেরিকার প্রান্তরে দাঁড়াইয়া, আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাজ্যের উচ্চ আকাশে অবস্থিত হইয়া যে-ধ্বনি করিতেছেন, সেই মেঘগর্জনে সমগ্র ভারতবর্ষ আজ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, আজ তৃষ্ণার্ত চাতক বহুদিন পরে মেঘনিঃসৃত জল পান-আশায় আনন্দের বৈদ্যুতিক তেজে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় যেরূপ হিন্দুধর্মের আন্দোলন-তুফান প্রবাহিত করিয়া বর্তমান ভারতবর্ষকে আনন্দিত করিয়াছেন, এইরূপ আনন্দচিহ্ন বহুদিন দেখা যায় নাই। আজ স্বামী বিবেকানন্দ যদি রাজনীতির কথা, বাণিজ্যনীতির কথা, কিংবা অন্য কোনোরূপ পার্থিব ঐশ্বর্য-সম্বন্ধের কথা লইয়া আমেরিকায় যাইতেন, তবে এত আন্দোলন হইত কি-না সন্দেহ। তিনি হিন্দুর আত্মবিদ্যার কথা লইয়া আমেরিকায় চর্চা করিয়াছেন, তাই আজ এত আনন্দের দুন্দুভি বাজিতেছে।"

আমেরিকা বিবেকানন্দের সমাদর করেছে, সেজন্য তার উদ্দেশ্যে মুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ইনি বলেন ঃ

"বাস্তবিকই যদি হিন্দুর কিছু গর্ব করিবার থাকে, তবে এই অধ্যাত্মবিদ্যাকে লইয়া—হিন্দুর সর্বস্বধন ধর্মকে লইয়া। কিন্তু হায়, আমাদের এই নিজস্ব ধন, আমাদের এই পিতৃ-পিতামহদের সঞ্চিত ঐশ্বর্য আমরা নিজে অনাদর করিতেছি,...আর আমেরিকাবাসীগণ, যাহাদের ধর্ম, দেশ, ভাব সম্পূর্ণ আমাদের বিপরীত, তাঁহারা এই অধ্যাত্মবিদ্যাকে মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। ধন্য তাঁহাদের উদারতা! কিরূপ ভাষায় ধন্যবাদ দিলে তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তেমন ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের ভাষা এত অসম্পূর্ণ যে, এই ভাষায় তাঁহাদের উদারতার প্রশংসা করিতে গেলে তাঁহাদের প্রতি অবমাননা করা হয়। বাস্তবিক আমাদের জাতীয় সম্পত্তি আমরা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত নই, কিন্তু বিদেশীয় আমেরিকাবাসীগণই সেই সম্পত্তিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন, ইহা যখন আমি ভাবি তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে আমাতে আর আমি থাকি না, মর্মযন্ত্রণায় অধীর হইয়া নির্জনে নীরবে কাঁদিয়া ফেলি।"

বাবু যতীন্দ্রলাল মিত্র তাঁর বক্তৃতায় বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম স্মরণ করেছিলেন,[১৩] এবং যথার্থ হিন্দু হবার জন্য সকলকে ব্যাকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন। এঁর বক্তৃতায় ভাবাবেগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু অপরপক্ষে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করেছিলেন বাবু মনোরঞ্জন গুহ, যদিও আবেগ তাতে কম ছিল না। খুবই বিস্ময়ের কথা, মিরারে এঁর বক্তৃতা উদ্ধৃত হয়নি। বক্তৃতাটি 'বিবরণী'-তে না পেলে আমাদের অগোচর থেকে যেত। 'বিবরণী'তে এঁর বক্তৃতার ইংরাজি ও বাংলা দুই রূপই রয়েছে। উক্ত দুই রূপের তুলনা করলে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা রূপে (অর্থাৎ আসল বক্তৃতায়) দেখি, বক্তা বলেছিলেন, আমেরিকায় স্বামীজীর সাফল্যে ভারতের রাজনৈতিক লাভও রয়েছে।

১৩ যতীন্দ্রলাল মিত্র বক্তৃতায় মধ্যে বলেন ঃ "যাঁহার কৃপায় আজ আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে পাইয়াছি, যাঁহার মহীয়সী শক্তিসঞ্চারে আজ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের মর্মব্যাখ্যা করিতে সামর্থ্যবান হইয়াছেন, যাঁহার অপার করুণাবলে আজ আমার ন্যায় দীনহীন মূর্খ ব্যক্তিও ধর্মের আলোচনা করিতেছে, যিনি মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য অলক্ষিতে থাকিয়া, শত বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দিয়াছেন, সেই আমাদিগের গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহিমা ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।...শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম উল্লেখ না করিলে যেন সভার কার্য সম্পূর্ণ হইল না। যেন পরমহংসদেবের গুণানুকীর্তন না করিলে অদ্যকার সভাতে জীবন সঞ্চার করা হইল না। তাই বলি, আসুন ভদ্রমণ্ডলীগণ! কিছু বলিবার পূর্বে একবার প্রাণ ভরিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি।" (বিবরণী)

সেই কথা ইংরাজি রূপান্তরের কালে বাদ দেওয়া হয়েছিল, হয়ত এই আশঙ্কায় যে, তাতে স্বামীজীর কার্যাবলীর উপরে রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপিত হতে পারে। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সেইকালে ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিখ্যাত দেশকর্মী।

মনোরঞ্জনের বক্তৃতা অনেকটাই উদ্ধৃত করছি ঃ

"অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, বিবেকানন্দ আমেরিকায় যাইয়া হিন্দুধর্ম প্রচার করিয়াছেন—তাহাতে এত আনন্দপ্রকাশের কারণ কি? ম্লেচ্ছগণ কখনই হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া হিন্দু হইবে না। বিবেকানন্দের কার্যে তাঁহার নাম ও যশ যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমাদের গৌরব, স্বার্থ বা পরমার্থ কি আছে? আমার সামান্য বুদ্ধিতে আমি দেখিতে পাই, ইহাতে সত্যই আমাদের কিছু গৌরব, কিছু স্বার্থ, এবং কিঞ্চিৎ পরমার্থ আছে। আমি সংক্ষেপে আমার কথা বলিব, কেননা ইংরাজি বক্তৃতার পরে বাংলা শুনিতে হয়ত অনেকের রুচি হইবে না। (না না।)

"আমাদের ইহাতে গৌরব কি? কোনো সময়ে এক রাজরাজেশ্বরী দৈব ঘটনায় রাজৈশ্বর্য সমস্ত হারাইয়া বিদেশে অপরিচিত স্থানে কাঙ্গালিনী বেশে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিন্ন জীর্ণ মলিন বস্ত্র, উপজীবিকা ভিক্ষা। বাসস্থান তাঁহার পর্ণকুটীর। লোকেরা তাঁহাকে চির-ভিখারিণী-বই আর কিছুই জানিত না, কেহই তাঁহাকে ভিখারিণীর অধিক আদর যত্ন ও সম্ভ্রম করিত না। কিন্তু এই ঘোরতর দুঃখের অবস্থাতেও গতগৌরবের চিহ্ন-স্বরূপ একখণ্ড অমূল্য মাণিক, কাঙ্গালিনী জীর্ণবসনে থাকিয়া আপন বক্ষঃস্থলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এতদিন কেহই তাহা জানিত না; একদিন হঠাৎ মলিন বস্ত্রের অন্তরালে সেই অমূল্য রত্ন একজন দেখিতে পাইল, এবং বিস্ময়ান্বিত হইয়া অন্যান্যকে দেখাইল। তখন দলে-দলে লোক আসিয়া দেখিতে লাগিল এবং সকলেই অবাক হইল এবং বুঝিল যে, এই কাঙ্গালিনী চিরভিখারিণী নহেন। একদিন ইঁহার অতুল সম্পদ ছিল, একদিন এই কাঙ্গালিনী রাজরাণী ছিলেন। তখন সকলেই কাঙ্গালিনীকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে লাগিল, সকলের নিকটই তাঁহার সম্মান ও গৌরব হইল। সেইদিন হইতে কেহ আর তাঁহাকে ভিখারিণী বলিয়া অবহেলা করে না; কাঙ্গালিনী, ভিখারিণী থাকিয়াও সম্ভ্রমে রাজরাণী হইলেন।

"স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় যাইয়া সকলের নিকট দুঃখিনীর সেই গুপ্ত রত্নের সংবাদ দিয়াছেন। তাহাতে সকল লোকে চমকিত হইয়াছে। লোকে জানিয়াছে, দুখিনী ভারত চিরকাঙ্গালিনী নহেন। এমন অমূল্য মাণিক যাঁহার বুকে আছে, তাঁর অঙ্গেও অবশ্য বহুমূল্য পরিচ্ছদ ছিল এবং একদিন তিনি হয়ত রাজরাজেশ্বরী ছিলেন। আজই হউক বা দুদিন পরে হউক, ক্রমে ভারতের গৌরব দেশদেশান্তরে ঘোষিত হইবেই হইবে। সুতরাং বিবেকানন্দের কার্যদ্বারা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

"দ্বিতীয়। স্বার্থ কি? আমরা বিজিত জাতি। আমাদিগের যাঁহারা জেতা, আমেরিকা-বাসীদের সহিত তাঁহাদের জাতি, রক্ত ও ভাষাগত একতা আছে। আমেরিকার কার্যফল ইংলণ্ডে অপ্রকাশিত থাকে না। জেতা জাতি যদি বিজিত জাতিকে অত্যন্ত হীন মনে করে, তবে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে সংকুচিত হয় না। কিন্তু যদি জানিতে পায়, ইহারাও সম্ভ্রান্তবংশীয়, ইহাদেরও উচ্চ ধর্মচিন্তা আছে, ইহাদেরও উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে, জ্ঞানগর্ভ দর্শনশাস্ত্র আছে, জগতে ইহাদের পূর্বপুরুষগণ মহা গৌরবান্বিত ছিলেন, তবে তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না, এবং তাঁহাদিগকে সম্মান বা সমাদর করিতেও ইচ্ছা হয়।

"হিন্দুশাস্ত্রের কথা যতই পশ্চিমদেশে প্রচারিত হইবে, ততই ভারতের গৌরব পৃথিবীতে

বর্ধিত হইবে, এবং আমাদের জেতা জাতির নিকটও আমরা দিন-দিন সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইব।

"ইতিপূর্বে যাঁহারা ইউরোপে ও আমেরিকায় গিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা এদেশের ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ প্রচার হয় নাই। আমি যতদূর জানি, তাহাতে স্বামী বিবেকানন্দকেই এ-বিষয়ে আমি প্রথম ব্যক্তি বলিয়া জানি। সুতরাং তাঁহার দ্বারা আমাদের এক বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির দ্বারও প্রথম উন্মুক্ত হইল।

"তৃতীয়। পরমার্থ কি? রাজা প্রজায় সদ্ভাব না-থাকিলে রাজ্যে ধর্মসাধনের বড়ই বিঘ্ন হয়। কোনো পর্বতগহ্বরে কেহ সাধন করিতে পারেন কিন্তু আমি সামাজিক ধর্মের কথা বলিতেছি। রাজায় প্রজায় সদ্ভব না-থাকিলে বহুবিধ উপদ্রব ও চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়। শান্তিপূর্ণ রাজ্যই ধর্মসাধনের অনুকূল। রাজায় প্রজায় সদ্ভাব না থাকিলে রাজ্যে কখনই শান্তি হয় না। পরস্পরের মধ্যে সম্মান না থাকিলেও সদ্ভাবের আশা করা যায় না। বিবেকানন্দ যে-প্রণালীতে কার্য করিতেছেন, তাহাতে আজ হউক কি বিলম্বে হউক, রাজ-জাতি আমাদিগের সম্ভ্রম বুঝিতে পারিবেন এবং আশা করি পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবও জন্মাইবে, সুতরাং এই ভারতভূমি ধর্মসাধনেরও অধিকতর অনুকূল হইবে।

"আর এক কথা। হিন্দুধর্ম বড়ই উদার ধর্ম। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম বলে না যে, অন্য ধর্মে থাকিলে পরিত্রাণ হইবে না। অন্যান্য ধর্ম অধিকারী-বিশেষের জন্য, কিন্তু হিন্দুধর্ম মনুষ্যজাতির জন্য। কাজেই হিন্দুধর্মে উদারতা আছে।

"লোকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতিকেই পাপ বলিয়া জানে, কিন্তু ধর্মসাধনের পথে যতপ্রকার বিঘ্ন আছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই সর্বাপেক্ষা মহাবিঘ্ন, মহাপাপ। যদিও হিন্দুদিগের মধ্যে বর্তমানে সর্বত্র সে-উদারভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে ধর্মের ভাব অত্যন্ত উদার। এই উদার ভাবটি পৃথিবীতে প্রচারিত হইলে জগতের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কমিতে পারে। তাহা হইলে সকল সম্প্রদায়ের লোকের ধর্মসাধনের সুবিধা হইতে পারিবে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার দ্বারা এই শুভকার্যের সাহায্য হইবে, সুতরাং ইহাতে আমাদের পরমার্থও আছে।

"বিবেকানন্দ অতি উপযুক্ত সময়ে আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। এই সময়ে আমেরিকা এবং ইউরোপের লোকেরা এদেশের কথা শুনিতে চাহিতেছেন। আমি শুনিয়াছি, এদেশের কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সম্প্রতি এইভাবে এক পত্র লিখিয়াছেন যে, 'তোমরা এদেশে আসিয়া আমাদেরই কথা বলিয়া থাকো, ইহাতে আমাদের বিশেষ আকর্ষণ হয় না। তোমরা যদি তোমাদের দেশের কথা শুনাইতে পারো, তবে আমরা শুনিতে প্রস্তুত আছি। এদেশে ধর্মপ্রচার করিতে হইলে তোমাকে পাঁচ বৎসর একান্তে থাকিয়া সংস্কৃতপাঠ ও হিন্দুধর্মচর্চা করিতে হইবে, পরে আসিয়া কথা বলিলে আমরা আগ্রহের সহিত শুনিব।' বিবেকানন্দ এই উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর কর্তৃকই প্রেরিত হইয়াছেন। কেননা এখান হইতে উদ্যোগ করিয়া আপনারা তাঁহাকে পাঠান নাই। বিবেকানন্দকে ধন্যবাদ দেওয়ার পূর্বে আমাদিগের একটি বিশেষ কর্তব্য আছে। বিবেকানন্দের মূলে যাঁহার শক্তি কার্য করিতেছে, বিবেকানন্দরূপ ফুল যাঁহা হইতে রস পাইয়া ফুটিয়াছেন, সেই মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নামে সকলে একবার জয়ধ্বনি করি।

"সকলের আত্মাতেই ধর্মের বীজ্ নিহিত রহিয়াছে। এই আত্মা-নিহিত ধর্মবীজের পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বীজ এক আকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু এই বীজ হইতে যখন বৃক্ষের বিকাশ হয়, তখন ভিন্ন-ভিন্ন অংশের নানারূপ আকৃতি-প্রকৃতি হয়। শাখা প্রশাখা কান্ড গুঁড়ি পত্র পুষ্প সবই দেখিতে ভিন্ন-ভিন্ন। কিন্তু বীজের পূর্ণবিকাশ বা চরম পরিণতির নাম ফল। ফলে পৌঁছিলে তাহার পর আর আকৃতি কি গুণগত কোনো পার্থক্য

হয় না। সাধকদের জীবন বিকাশের প্রথম অবস্থা সুতরাং তাহাতে অনেক অমিল থাকিবে। সিদ্ধপুরুষেরা ধর্মবৃক্ষের ফলস্বরূপ, সেখানে কোনো অমিলন বা বিরোধ নাই। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস ধর্মবৃক্ষের একটি সুপক্ক ফল। হিন্দুধর্মের অসাম্প্রদায়িক উদার তত্ত্বের তিনি পরিস্ফুট সাকার মূর্তি। স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁহারই শিষ্য তখন ভরসা করি, তাঁহার জীবনেও এই ভাব প্রস্ফুটিত হইবে। শিষ্যের সমস্ত শক্তিই গুরুর শক্তি। সুতরাং বিবেকানন্দের দ্বারা আমরা বহু প্রত্যাশা করি।

"হিন্দুধর্ম বহু শাখাবিশিষ্ট। বিবেকানন্দ যে, সকলেরই মনোমতো কথা বলিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু তিনি হিন্দুশাস্ত্রের যে-চিন্তাপ্রণালী বিদেশে উপস্থিত করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের প্রচুর উপকার হইবে।

"আমরা দলাদলিকে নিন্দা করি কিন্তু কাজের বেলায় সকলেই দলাদলি করি। এক সাহেব তাঁহার কেরানীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু, তোমরা কাপড়-চোপড়, কলম-টলম এরূপ অনর্থক জোড়া-জোড়া কথা বলো কেন? বাবু বলিলেন, সাহেব, আমরা ভদ্রলোকেরা ওরূপ বলি না, ওরূপ বলে মুটে-টুটেরা।

"আমাদের অবস্থাও এইরূপ। তাই বর্তমান বিষয় লইয়াও মতান্তর। যাহা হউক, একদিনে-কিছু জাতীয় চরিত্র-পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু একথা সাহস করিয়া বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যে-কার্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, তজ্জন্য কেবল হিন্দু কেন, সমস্ত ভারতবাসীরই তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য। বিবেকানন্দকে সমাদর করিতে চিকাগো-ধর্মসভার সভাপতি এবং আমেরিকাবাসীগণও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আমাদের এই কৃতজ্ঞতা তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করা কর্তব্য।"

মিরারে বক্তারূপে উল্লিখিত হয়েছেন অথচ যাঁদের বক্তৃতা ছাপা হয়নি এমন আরও দুইজনের বক্তৃতার অংশ উপস্থিত করব। প্রথম বক্তা—বক্তারূপে বিখ্যাত, দেশনায়ক রূপেও, বেঙ্গলী-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি সভায় কিছু বিলম্বে উপস্থিত হন, এবং নির্ধারিত বক্তাও ছিলেন না। অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি বলেন :

"এই সভাগৃহে যখন আমি প্রবেশ করেছিলাম তখন আমার এতটুকু ধারণা ছিল না যে, অনুষ্ঠানে আমাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। বর্তমান অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এটুকু বলতে পারি, আমি এ-ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক মৌনব্রত গ্রহণ করেছি। কিন্তু যদি এই সভাস্থল থেকে উদাসীন ভাবে চলে যাই, তাহলে আমার কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে। সুতরাং সভার সভাপতি এবং সমবেত বিপুল জনমণ্ডলী যে, আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ জানিয়েছেন, তার সামনে মাথা নত করছি। আমার অপরিহার্য জীবননীতি হল, জনগণ আমার উপরে কোনো আদেশ আরোপ করলে তা পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধাকে কখনো এগিয়ে দিই না। সেই আদেশ এখন জারি করা হয়েছে, কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে স্বীকার করছি। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম আমাকে অবাঞ্ছিত আগন্তুক বলেই মনে করবে। নিজের পক্ষে তবে এইটুকু বলতে পারি, যে-ধর্ম আমার দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বস্তু, তাকে আমি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করি। হিন্দুধর্মের উচ্চ আদর্শের যত নিম্নেই আমি থাকি না কেন, আমি নিজেকে হিন্দু বলি, তা বলবও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি। আমি আমার দেশবাসীর ধর্মবিশ্বাসের সম্বন্ধে গভীরতম শ্রদ্ধা বোধ করি। এই শ্রদ্ধার জন্য আমাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, এবং ঈশ্বর যদি চান, আবার তা সহ্য করতে আমি প্রস্তুত। এই শ্রদ্ধা আছে বলে আমি সেই অপূর্ব সামাজিক ব্যবস্থার কথা ভুলিনি, যা সুদূর অতীতের প্রত্যুষলোকে বিশৃঙ্খলা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, দানবীয়তার পূর্ণ প্রকোপের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল, যাকে আমি সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত খাঁটি হিন্দুভাব বলতে পারি।

"সেই অতীতে, যে-দিনগুলির কথা মানবস্মৃতি থেকে কার্যতঃ বিদূরিত হয়ে গেছে, তখন আমাদের পূর্বপুরুষগণের ধর্মবিশ্বাস লক্ষ-লক্ষ মানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, এবং আগামী দিনগুলিতেও লক্ষ-লক্ষ মানুষকে সেই অসীম সান্ত্বনাই দেবে। ভারতের এহেন সুমহান, গৌরবমহিমাময় ধর্মকে যে-বাগ্মী প্রচারক পাশ্চাত্ত্যদেশে উদ্ঘাটন করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে গভীরতম শ্রদ্ধা, প্রবলতম কৃতজ্ঞতা বোধ না-করা কি সম্ভব? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আজ এখানে এই সভামঞ্চে যাঁরা উপস্থিত, তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাকে অবশ্যই বরণ করেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর সঙ্গে মতপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। এই গৌরবান্বিত ব্যক্তির সম্বন্ধে—তাঁর মহান অহংশূন্যতা, তাঁর উদ্দীপনা, অপূর্ব প্রতিভার সহগামী তাঁর চরিত্রের গুণাবলীর সম্বন্ধে—কার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা না উৎসারিত হয়ে উঠবে? সেই সুবিখ্যাত মানুষটি সম্বন্ধে সম্মিলিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আমরা সমবেত হয়েছি আমরা সমবেত হয়েছি, একটি জাতীয় কর্তব্যকর্মের জন্য। এহেন সমাবেশ যে-মহান উদ্দেশ্য ঘোষণা করছে—তার প্রতি আমি আমার প্রাণোত্তপ্ত সহানুভূতি প্রকাশ করছি। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং উদ্দীপ্ত ত্যাগ যেন দেশের তরুণদের মধ্যে প্রেরণাসঞ্চার করে। সকল সাফল্যের রহস্য যার মধ্যে নিহিত সেই তাঁর চরিত্রের সমুচ্চ নীতিমান আমাদের দেশবাসীর পক্ষে নিজ জীবনে বলবৎ করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে করে আমরা যে-রাজনৈতিক পরিত্রাণের জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছি, তা লাভের যোগ্য হতে পারি।"

ধন্যবাদসভায় রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ যে-বক্তৃতা করেন, তার মধ্যে স্বতঃই দেশ, জাতি, জাতীয় কর্তব্য, জনগণ প্রভৃতি কথার প্রাধান্য ছিল—বৈষ্ণবধর্মের প্রচারে বিশেষ উৎসাহী, নব বৈষ্ণব-আন্দোলনের অন্যতম নেতা টাকীর জমিদার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর বক্তৃতায় অপরপক্ষে ধর্মকথাই প্রাধান্য পেয়েছিল। স্বামীজীর বক্তৃতায়—বৈষ্ণবধর্ম উপযুক্ত স্থানলাভ করেনি, এই ক্ষোভ তিনি প্রকাশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বামীজী হিন্দুধর্মকে যথাযথভাবে উপস্থিত করেননি বলে কোনো-কোনো মহলে যে-সমালোচনা শোনা গেছে, দৃঢ়ভাবে তার বিরোধিতা করেছিলেন, বলেছিলেন, স্বামীজীর রচনা এবং বক্তৃতা ইউরোপীয় পণ্ডিত-মহলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা-সকল দূর করবে, এবং মানবসমাজ এই জেনে উপকৃত হবে যে, আসল ত্রাণের পথ রয়েছে হিন্দুধর্মের মধ্যেই।১৪

১৪ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর বক্তৃতার অংশ :

"It has been told in some quarters that Hinduism was not represented at the Parliament of Religions recently held in Chicago. I think, gentlemen, that a meeting of this kind will give the lie direct to the statement like the above. We have met here to thank Swami Vivekananda for his services in America in the cause of Hinduism. As for the Swami himself, I am sure, that he is sufficiently loyal to his religion and to his God as not to require any thanks-giving on our part for any services which he did in the past or may do in the future in the cause of his religion.... To appreciate his services, it is not at all necessary that we should agree with the Swami in all what he said; nor is it at all necessary that we should admit that the Swami's representation of Hinduism is at all complete; for I personally would have preferred that he [the Swami] had given to the *savants* of America a complete idea of Vaish-navism.... However, we should be thankful to him for what he has done. His services can be looked at from two points of view. I mean his services to the Hindus and his services to humanity. His writings and speeches, I am sure,

সভার কার্যের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে যাঁরা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক ও নেতা স্বর্গতঃ রাধাকান্ত দেব-বাহাদুরের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব-বাহাদুর, বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র কে-টি প্রভৃতি। স্যার রমেশচন্দ্রের পত্রটি পরে আমরা অন্য প্রয়োজনে উদ্ধৃত করব। অপর পত্রপ্রেরক গাজিপুরের মুনসেফ শিরীষচন্দ্র বসু লিখে পাঠিয়েছিলেন ঃ "দেরী হলেও যে হয়েছে, তাই মঙ্গল। আরও আগেই বাংলা দেশের পক্ষে বাঙালী প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ এখন এমন এক বিরাট ব্যক্তি, যাঁকে সমস্ত পৃথিবীই নিজের বলে দাবি করতে পারে।"

ধন্যবাদসভার বক্তৃতাগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান নেশনের সম্পাদক অধ্যাপক এন এন ঘোষের বক্তৃতাই নাকি সর্বোত্তম হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ সেনের বক্তৃতাও বক্তব্যের দিক থেকে উৎকৃষ্ট ছিল। আমরা আগেই বলে এসেছি, মাদ্রাজ বিবেকানন্দের প্রতিভার সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত ছিল বলে সেখানকার ধন্যবাদসভায় শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তের বিপুল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেলেও সহসা-পরিচয়ের শিহরণ দেখা যায়নি। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের জন্মভূমি বাংলাদেশ তাঁর সন্তানকে এতদিন না-চিনে ফেলে রেখে হঠাৎ চেনার উল্লাস উপভোগের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। কলকাতার ধন্যবাদসভার বক্তৃতাগুলিতে সেই বিস্ময়ের ঝলক বারে-বারে দেখা যায়। সভাপতি প্যারীমোহন বলেছিলেন ঃ "এই সন্ধ্যায় এখানে আমরা সমবেত হয়েছি—সরকারী কাজে বিশেষ গুণের পরিচয় দিয়েছেন এমন কাউকে, কিংবা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিজয়গৌরব অর্জন করেছেন এমন কাউকে ধন্যবাদ দিতে নয়—এসেছি নিছক একজন সন্ন্যাসীকে ধন্যবাদ দিতে, যাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ।" নরেন্দ্রনাথ সেন বলেছিলেন ঃ "অবশ্যই অপূর্ব সেই মানুষটি যিনি এই সামান্য বয়সে আজিকার পৃথিবীর সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশের জনগণকে বিদ্যুৎ-শিহরিত ও ঝলসিত করে দেওয়ার মতো প্রবল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব দেখিয়েছেন। কথায় বলে, বাস্তব সত্য উপন্যাসকাহিনী অপেক্ষা চমকপ্রদ। আমার মতে, বর্তমান মুহূর্তে কিছু-কিছু জিনিস ঘটছে, তা ঔপন্যাসিকের উজ্জ্বল কল্পনাসৃষ্ট কাহিনীর অত্যাশ্চর্য রূপকেও ছাড়িয়ে গেছে। পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়—আমরা কি স্বপ্নজগতে রয়েছি? নচেৎ কিভাবে আমরা ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অদ্ভুত সাফল্য এবং আমেরিকায় তাঁর পরবর্তী কার্য-কলাপের অর্থ করতে পারব?" তিনি আরও বলেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দের এই সাফল্য জাতিগতভাবে হিন্দুদের যেন নবজীবন দিয়েছে; হিন্দুদের জাতীয় ইতিহাসের একালের অন্ধকার পৃষ্ঠাগুলির উপরে সে-সাফল্য যেন অত্যুজ্জ্বল আলোকসম্পাত, তা তাদের চিত্তকে এমনই আশায় ভরিয়ে তুলেছে যার অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনো ঘটেনি।" নরেন্দ্রনাথ সেন আবেগভরে যে-সব কথা বলে গেছেন, তা স্বামীজীর সম্বন্ধে যথার্থই ঐতিহাসিক গদ্যকাব্য হয়ে উঠেছে ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই ঈশ্বরের করধৃত যন্ত্র। একথা সকলেরই জানা আছে—যখন অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয় কোনো-কিছু এবং তার কালও পূর্ণ হয়, তখন নির্ধারিত

will dispel the many wrong impressions in the minds of the European *savants* and' the scholars of other nationalities about our faith and philosophy. As regards his services to humanity I shall say this much only that it is my firm conviction—and I am glad to find that many eminent scholars in Europe are begining to think in the same direction—that the true path of human salvation lies in Hinduism and Hinduism alone. So anyone who tries to give a correct representation of the Hindu religion in these days of considerable misunderstandings and misrepresentations, is certainly entitled to our thanks for his services to the whole mankind."

পুরুষকেও লাভ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের মত পুরুষের সাক্ষাৎ প্রতিদিন পাওয়া যায় না। এদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য তিনি জন্মেছেন। অসাধারণ তাঁর স্বাভাবিক শক্তিসমূহ। তাঁর সুবৃহৎ অগ্নিবলয়ের মতো অত্যুজ্জ্বল নয়ন থেকে বিচ্ছুরিত হয় আলোক ও জীবন, জ্ঞান ও শক্তি।"১৫

অধ্যাপক এন এন ঘোষ, যাঁর বক্তৃতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছিল—তিনি যেহেতু আমেরিকা-বাসীদের ধন্যবাদজ্ঞাপক-প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন, তাই আমেরিকার বিশেষ প্রশংসা করে বলেছিলেন—সেখানকার অধিবাসীদের উদারতা, সহৃদয়তা, নতুনকে বরণ করবার ক্ষমতার কথা : "জানিনা কাকে অধিক প্রশংসা করব, সেই বাগ্মীপুরুষকে, অসাধারণ যাঁর বক্তব্য, কিংবা আমেরিকাবাসীকে, দ্রুত সক্রিয় যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি এবং অবিলম্ব সমাদরে যাঁরা প্রস্তুত।" এর বিপরীত চিত্ররূপে অধ্যাপক ঘোষ বাংলাদেশে বিবেকানন্দকে চিনতে বিলম্ব হওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন, তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশও করেন। ইতিহাসে সুপণ্ডিত এই অধ্যাপকের বক্তৃতায় কিন্তু প্রাধান্যলাভ করেছিল বিজয়ী বক্তারূপে বিবেকানন্দের মঞ্চাবতরণের ঘটনাটি, যাকে তাঁর ঐতিহাসিক বিবেক ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলে স্বীকার করে নিয়েছিল :

"এত আকস্মিক, এমন অপূর্ব সাফল্য কদাপি দেখা যায়নি। বস্তুতঃপক্ষে প্রাচ্যদেশীয় কীর্তির ইতিহাসে এহেন চমকপ্রদ ঘটনার নজির আছে কি-না সন্দেহ। একজন অখ্যাত হিন্দুসন্ন্যাসী, আধা প্রাচ্য-পোষাকে উঠে দাঁড়িয়ে এমন এক সমাবেশে বক্তৃতা করলেন, যেখানে সমবেত মানুষদের অধিকাংশই তাঁর নামোচ্চারণে সমর্থ কি-না সন্দেহ—তিনি সেই বিষয়ে বললেন, যা তাঁদের চিন্তাভাবনা থেকে বহুদূরে অবস্থিত—অথচ অবিলম্বে জয় করে নিলেন তাঁদের প্রবল অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা!!!"

এন এন ঘোষ আরও উদ্দীপ্ত হলেন বিবেকানন্দের কীর্তি স্মরণে :

"ইতিহাসে বিরল ঐ আকস্মিক অপূর্ব অদ্ভুত বিজয়। পৃথিবীর মহান ধর্মাচার্যগণ—বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, কনফুসিয়স্—কেউই প্রথম প্রয়াসে শত-শত ধর্মান্তর ঘটাতে পারেন নি। কিন্তু 'গৈরিকবসন হিন্দু-প্রচারক'-রূপে কথিত এই ব্যক্তি এক প্রযত্নে শত-শত মানুষের

১৫ নরেন্দ্রনাথ সেনের বক্তৃতার কয়েক লাইন :

"He must be a wonderful man who, at such an age, could command so overpowering a personality as to dazzle and electrify the most forward people of the day. It is said that facts are stranger than fiction. To my mind, some of the events that are occurring at the present moment far exceeded in strangeness the stories, supplied by the most vivid imagination of the novelist; and I am very much inclined to ask in astonishment—are we living in dreamland? For, how else can we account for the phenomenal success of Swami Vivekananda's visit to the Parliament of Religions in Chicago, and of his subsequent work in the United States? Such success has given almost a new lease of life to the Hindus as a nation. It has been a brilliant gleam of light in the dark pages of contemporary history of the Hindus and has buoyed them up with hope, such as they never experienced before.... Swami Vivekananda is only an instrument in the hands of God. You all know well enough that one thing has to be done, and the time is opportune, the right man is invariably found. It is not every day that we meet with such a man as Swami Vivekananda. He has been born to play an important part in the history of this country.... His large lustrous eyes, like orbs of fire, shoot forth rays of life and light, and knowledge and power."

চিত্তে যুগ-যুগ ধরে সঞ্চিত মায়াজাল কিয়দংশে ছিন্ন করেছেন, এবং সেখানে জাগিয়ে তুলেছেন এমন একটি ধর্মের নিত্যসত্যকে, যার বিষয়ে হয় তারা কখনো শোনেনি, কিংবা সর্বদাই ঘৃণার মনোভাব পোষণ করেছে।"১৬ [মিরার; ১৮৯৪, ৬ সেপ্টেম্বর]

স্বামীজীর সহসা-উদয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহলেও কতখানি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, তার অনেক পরিচয় আগে দিয়ে এসেছি। এখানে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ থেকে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি। এর সম্পাদক জে বি ড্যালী ধন্যবাদসভায় উপস্থিত থেকে সবই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইনি যে-ভাষায় বিবেকানন্দের বর্ণনা করেছেন, হিন্দু-কাগজগুলিও বোধহয় তাকে অতিক্রম করতে সমর্থ নয় ঃ

"দীর্ঘ নিদ্রার অন্তে ভারত যে আবার জাগছে, তার অভ্রান্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমেরিকায় হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য সন্ন্যাসী পাঠানো একেবারে যেন সিংহের মুখে থাবা দেওয়া! একবার শুধু ব্যাপারটা কল্পনা করুন! এই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, যাঁর বয়স মাত্র তিরিশ, ইতিমধ্যেই ধর্ম ও দর্শনচর্চা সাঙ্গ করে ফেলেছেন, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে, বিদেশী ভাষায় বক্তৃতা করে আমেরিকান শ্রোতাদের সম্মোহিত করে ফেললেন! ধীরতার সঙ্গে, প্রজ্ঞার সঙ্গে, সকৌতুক হাসির সঙ্গে, পাশ্চাত্ত্য সাধারণতন্ত্রের মনুষ্যগণকে জানিয়ে দিলেন—এই 'মৃদু হিন্দুকে' যত নির্বোধ দেখায়, সে তত নির্বোধ নয়। জানালেন, তাঁর পবিত্র ধর্ম বুড়ি ঠাকুরমার গালগল্পের জগাখিচুড়ি নয়, পরন্তু সুমহান চরিত্রের কাহিনীতে পূর্ণ। এই দরিদ্র সন্ন্যাসী—প্রাসাদবাসী এবং জাঁকজমকের পোষাকপরা লর্ড বিশপের অপেক্ষা খ্রীস্টের আকারের অনেক নিকটবর্তী। এই দরিদ্র ঘৃণ্য ভারতীয়টি ধনসম্পদ, পোষাকপরিচ্ছদ কিংবা সুরম্য ভবনের ধার ধারেন না, কিংবা মনে করেন না—প্যারিস ঘুরে সোজা স্বর্গে চলে যাওয়া যায়। এই প্যাগান ভারতীয়টি এখনো পর্যন্ত তাঁর ঈশ্বরকে ডজনখানেক জ্বলন্ত বাতির আলোকের সাহায্যে নির্দিষ্ট জায়গায় উদ্ভাসিত দেখাবার কথা ভাবতে পারেন নি।... হাঁ, জনসাধারণ বিবেকানন্দের জন্য গর্বিত—তা হওয়াই উচিত।"

ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজের সম্পাদকের ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, যা থাকার কথা নয় হৃদয়হীন, উচ্চতর সংস্কৃতিহীন, বৃটিশ ব্যুরোক্রাটদের প্রধান মুখপত্র এলাহাবাদের পায়োনীয়ার কাগজের। এই পায়োনীয়ার, কি কারণে জানি না, মারউইন মেরী স্নেলের বিবেকানন্দ-প্রশস্তি ছেপেছিল। কিন্তু সেটি প্রকাশ করার পরেই যে-টিপ্পনী

১৬ এন এন ঘোষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের 'প্রথম বক্তৃতার' অনন্যতার কথা বলেছিলেন, পরবর্তী কার্যাবলীর কথাও সেইসঙ্গে ঃ

"A triumph, more signal and more sudden, has scarcely been known in history. None of the great religious teachers of the world, Buddha, Jesus Christ, Mahomet or Confucius made converts by hundred by a first attempt. But this Hindu preacher, this orange monk as he has been called, dispelled, by one effort some of the illusions of ages from the minds of hundreds of people, and roused them to some sense of the truths of a religion, which they had neither heard of, or must have always dispised. And this in a age, not particularly distinguished for religious spirit. Vivekananda has been however, you must remember, no single speech Hamilton. His speech at the Parliament of Religions brought him into notice, but his work did not end there. In political slang, he has been often 'heckle I,' and his answers to the questions of enquirers have been quick and effective. He has been invited to address many meetings, and appears to have invariably justified expectations."

কেটেছিল, তাতে বিস্ময়, বিদ্রূপ, সংশয়, কৌতুক ও মুরুব্বিয়ানার বিচিত্র মিশ্রণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিস্ময়টিই বড় হয়ে উঠেছিল—বিবেকানন্দ যে-বিস্ময়ের আঘাতে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন দেশী-বিদেশী মানুষদের। স্বীকার করতেই হবে, পায়োনীয়ারের ঐ দীর্ঘ সম্পাদকীয়টি সুলিখিত এবং তাতে কয়েকটি মূল্যবান স্বীকারোক্তি ছিল, যেমন শেষাংশে—যেখানে বলা হয়েছিল, বিবেকানন্দের সাফল্যের দ্বারা (এবং অধ্যাপক স্নেলের চিঠির দ্বারা) প্রমাণিত হয় যে, পাশ্চাত্ত্য দেশে পুরাতন ধর্মবিশ্বাস দ্রুত শক্তি হারিয়ে ফেলছে; সেখানকার জনগণের মধ্যে তা "সংশয়ের যে-সর্বনাশ" এনে দিয়েছে তা একদিকে নতুন সংস্কারকের অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে, অন্যদিকে "সর্বপ্রকার ধর্মীয় হাতুড়েগিরি এবং আত্ম-প্রবঞ্চনারও পথ খুলে দিচ্ছে।" এক্ষেত্রে অবশ্য কোনোই সন্দেহ নেই, পায়োনীয়ারের বিবেচনায়, বিবেকানন্দ শেষোক্ত কাণ্ডের নায়ক। "যে-প্রেরণা ধর্মমহাসভা সম্ভবপর করেছে, এবং পরমহংস বিবেকানন্দের প্রচারে ইয়াঙ্কিদের উৎসাহে খেপিয়ে দিয়েছে, তা সেই একই প্রেরণা যা প্রিনস লুই ডি রোহান-সহ অন্যান্য নির্বোধ প্রতারিতদের একশো বছর আগে ক্যাগলিওস্ট্রোর কবলে ঠেলে দিয়েছিল, যা ইদানীং আবার অ্যালকেমিস্ট, সিম্বলিস্ট, মিস্টিসিস্ট এবং গণক ও জ্যোতিষীদের প্যারিসে বিরাট লাভজনক ঘাঁটি করতে সুযোগ দিচ্ছে।" অধ্যাপক স্নেল নিজ ধর্মের সম্যক অনুশীলন না করে বিশেষ অন্যায় করেছেন, হিন্দুধর্ম সমুচ্চ থেকে সর্বনিম্ন—নানা বস্তুর উদ্ভট সমাহার, স্বামী দয়ানন্দ প্রচলিত পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের প্রতি ধিক্কারে (যখন তিনি বাল্যে দেখেছিলেন মন্দিরে নৈবেদ্য ইঁদুরে খেয়ে যাচ্ছে, অথচ সর্বশক্তিমান দেবতা তাঁর আহার্যের জন্মগত অধিকার বজায় রাখতে পারছেন না!!) বৈদিক আর্যধর্ম গ্রহণ করেছিলেন—এসব কথা পত্রিকাটি না জানিয়ে পারেনি, সেই সঙ্গে পূর্বকথিত হাতুড়ে ধর্মচিন্তার উদ্বোধক বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে কেবল "অসাধারণ আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা এবং উন্নীত ভাবপূর্ণ বিশুদ্ধ দার্শনিক ব্রহ্মণ্যধর্ম" প্রচার করে ইয়াঙ্কিদের বিভ্রান্ত করছেন—এই কথা বলে নিজেদের চিন্তার স্বতোবিরোধকে হাস্যকরভাবে খুলে ধরেছিল। যে-আমেরিকা ভারতবর্ষে হাজারে-হাজারে মিশনারি পাঠিয়েছে, তার 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো' চেষ্টা নিয়েও পায়োনীয়ার হাসাহাসি করেছিল। "এত বড় তামাশা অল্পই সম্ভবপর"—পত্রিকাটি লিখেছিল—"আমেরিকান মিশনারিরা যখন ভারতের বাজারে ঘুরে বেড়িয়ে কোনোক্রমে কোনো একটিকে ধর্মান্তরিত করতে পেরে সাফল্যের উল্লাসে আত্মহারা, ঠিক তখনি একজন হিন্দু-পুরোহিত তাদের দেশে গিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেখানকার লোকে তাঁর মুখনিঃসৃত শব্দ থেকে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাশান্তির বস্তুলাভের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে!" অধ্যাপক স্নেলের চিঠি থেকে অনিবার্য হয়েছিল পায়োনীয়ারের এই বিস্ফারিত বিস্ময় ঃ "পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রিপাবলিকের সুশিক্ষিত একজন নাগরিক—যিনি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত যার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন স্টুয়ার্টদের ও গোঁড়া পোপ-পন্থীদের সংশ্রব-ত্যাগকারী, নিউ ইংলণ্ডে আশ্রয়গ্রহণকারী অনমনীয় ক্যালভিনিস্টরা, যাঁরা তাঁদের তারকাখচিত পতাকায় মতের গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠার প্রবল বাসনা মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন—সেই জাতিরই একজন মানুষ স্বীকারোক্তি করছেন যে, তাঁর দেশবাসী স্থূল ধর্মের অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে, থাকতও, যদি-না সেখানে ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান হত এবং সেই সূত্রে কমলারঙের পোষাক-পরিহিত হিন্দুস্থানের স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটত, যিনি তিমিরাচ্ছন্ন ইয়াঙ্কিদের বিপুল আলোকদান করেছেন।" এক্ষেত্রে পায়োনীয়ারের কলমে একটি কবিতাই অনিবার্য আবেগে উৎসারিত হয়েছিল, যা যে-কোনো ভাবেই হোক, বিদ্রূপে হোক শ্রদ্ধায় হোক, শেষ পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু মানুষের মনোভাবের সার্থক উন্মোচক—সেই কবিতাটিই হবে বর্তমান অধ্যায়ের উপযুক্ত সমাপ্তি-সঙ্গীত ঃ

Do I sleep ? Do I dream ?
    Do I wonder or doubt ?
Are things what they seem
    Or is visions about ?

নবম অধ্যায়

কিছু অসুখী ব্যক্তি

॥ ১ ॥

মাদ্রাজ ও কলকাতার ধন্যবাদ-সভায় দাঁড়িয়ে অনেক বক্তাই বলেছিলেন, 'এই যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এতে কিন্তু স্বামীজীর কোনো প্রয়োজনই নেই, এ কেবল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও কর্তব্যের প্রকাশ। মাদ্রাজের ধন্যবাদ-সভা প্রসঙ্গে 'হিন্দু' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঐকথা লিখেছিল;১ সেখানকার সভায় দাঁড়িয়ে বক্তা সি রামচন্দ্র সাহেব তাই বলেছিলেন; কলকাতার সভা-প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' বক্তব্য ছিল একই প্রকার; ২ বক্তা যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীও তাই বলেছেন।৩

স্বামীজী সম্পর্কে এঁদের এই বক্তব্য অতীব সত্য, তার সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পরে দেব, কিন্তু এখানে আমাদের দুঃখের সঙ্গে জানাতে হবেই—বিবেকানন্দের পক্ষে ধন্যবাদ-প্রাপ্তি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। শুধু দুঃখ নয়, লজ্জাও বোধ করছি, কারণ কলুষিত ইতিহাসের এমন কয়েকটি পৃষ্ঠা আমাদের সামনে খোলা রয়েছে যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—ব্যক্তিগত এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ মানুষকে কতখানি নামাতে পারে! সেই ঈর্ষার নখদ্রংষ্ট্রার সামনে দাঁড়িয়ে সিংহহৃদয় বিবেকানন্দকেও অপরের সাহায্য চাইতে হয়েছিল!! একই সঙ্গে, মানবমহত্ত্বের কী সমুচ্চ বিকাশও দেখতে পেয়েছি। যে-বিবেকানন্দ কাতরভাবে ভারতবাসীর সমর্থন চাইলেন, সে-সমর্থন এসে উপস্থিত হবার পরে যখনই আশু প্রয়োজন মিটে গেল, তখনই তিনি ক্লান্ত হয়ে বললেন, আর নয়, আর নয়। সন্ন্যাসী বললেন, আমার আর প্রশংসায় দরকার নেই, কারণ তিনি নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রশংসা চাননি, তাঁর মধ্য দিয়ে ভারত ও বিশ্বের কল্যাণের যে-ব্রত উদ্‌যাপিত হচ্ছিল, সেই ব্রতের জন্য ঐ নমস্কার-নৈবেদ্যের প্রয়োজন ছিল। এইকালে বিবেকানন্দের জীবননাট্য অসাধারণ এক সৃষ্টি, তা সংঘাতে গতিতে ক্ষিপ্র তীব্র, বেদনায় গভীর এবং উন্মোচনে মহান।

স্বামীজীর জীবনের এই অংশের কথা উৎকৃষ্টভাবে রচনা করেছেন মেরী লুই বার্ক। এই পর্যায়ের আলোচনায় তাঁর বইয়ের সাহায্য আমাদের বিশেষভাবে নিতে হবে। কিন্তু আমাদের বর্ণনার বিষয় মূলতঃ ভারত-সংক্রান্ত বলে প্রথমে স্বামীজীর সংবাদ ভারতে কোন্

১ হিন্দু লিখেছিল ঃ
"Viewed from the standpoint of the Swami, this thanks-giving was a merely unmeaning conventionality and therefore unnecessary." [*Hindu;* May 1, 1894]

২ হিন্দু পেট্রিয়ট ১৮৯৪, ৬ সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখে ঃ
"The object of the meeting as we view it, was to afford opportunities for emphasizing the religious revival, for to an ascetic, devoid of all earthly vanities and imbued with the teachings of Gita, human praise and human censure are alike matters of indifference."

৩ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেছিলেন ঃ
"As for the Swami himself, I am sure, that he is sufficiently loyal to his religion and to his God as not to require any thanks-giving on our part for any services which he did in the past or may do in the future for the cause of his religion."

জাতীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণে দৃষ্টি দেব। প্রধান প্রতিক্রিয়ার কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলে এসেছি—বিবেকানন্দের সাফল্যে অপরিসীম বিস্ময় ও শ্রদ্ধাবোধ, বিবেকানন্দের গৌরবে জাতির আত্মগৌরবের অনুভূতি—ধন্যবাদ-সভার ভাষণসমূহে এবং সংবাদপত্রের রচনায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। এ-বিষয়ে আরও কিছু সাক্ষ্য উপস্থিত করতে চাই। কলকাতার সমাজের উপরে প্রথম প্রতিক্রিয়ার রূপ সুন্দর ফুটিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর স্মৃতিকথায়। অংশতঃ তা উদ্ধৃত করছি ঃ

"এই সময়ে খ্রীস্টানেরা মহা চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং কে এস ম্যাকডোনাল্ড নামক জনৈক পাদরি একটি ইংরেজি প্যামফ্লেট ছাপাইয়া হেদুয়ার ধারে ও বিডন উদ্যানের নিকট বিতরণ করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক নিন্দা ও আবোল-তাবোল লেখা ছিল।...হরমোহন সেই প্যামফ্লেট লইয়া কালী-বেদান্তীর (স্বামী অভেদানন্দ) খ্রীস্টান আত্মীয়ের নিকট যাইলেন। তিনি ও ম্যাকডোনাল্ড উভয়ে মিলিয়া প্যামফ্লেটখানি বাহির করিয়াছিলেন। হরমোহন মিত্র যখন সেই আত্মীয়ের সহিত নানাবিধ কথা কহিলেন ও কালী-বেদান্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বিশেষ সম্মান করিতে লাগিলেন, তখন বিহারীলাল চন্দ্র বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং অবশিষ্ট প্যামফ্লেটসকল আর বিতরণ করিলেন না।8

"পাদরিদের আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করি। পাদরিরা আপনাদের মধ্যে একটি সভা করিলেন। হরমোহন মিত্র কোনোপ্রকারে খবর পাইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন। পাদরিরা গভর্নমেণ্টকে দিয়া কোনোপ্রকার উৎপাত করাইতে পারে, এইরূপ একটা চেষ্টা করিতেছিল। [স্বামীজীর কাজের উপরে রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপই ছিল উদ্দেশ্য; এ-বিষয়ে পরে অনেক সংবাদ দিয়েছি]। এবং সেইভাবে আমেরিকায় পত্র পাঠাইয়াছিল। হরমোহন মিত্র এই সকল কথা শুনিয়া আসিয়া সকলকে বলিয়া দিল। অতুলচন্দ্র ঘোষ একদিন হাইকোর্ট হইতে ফিরিবার সময়ে কোনো বিশিষ্ট খ্রীস্টান উকিলকে এইসকল কথা বলিলেন। খ্রীস্টান উকিলটি যদিও স্পষ্টভাবে সে-সকল কথার কোনো প্রত্যুত্তর

8 কালী-বেদান্তী অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বিহারীলাল চন্দ্র। তিনি অভেদানন্দের পিতা রসিকলাল চন্দ্রের প্রথম পক্ষের সন্তান। বিহারীলাল, বিখ্যাত খ্রীস্টান পাদরি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। কালীচরণ ও বিহারীলাল খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিহারীলালের ধর্মান্তরে পিতা রসিকলাল খুবই মর্মাহত হন।

বিহারীলাল দেশীয় খ্রীস্টান-সমাজে প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। "খ্রীস্টান-সমাজে কালীমোহন [-চরণ] বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সহধর্মীরা তাঁহাকে *devout Christian* or যীশুখ্রীস্টের পরম ভক্ত আখ্যা দিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বিহারীলাল কালীমোহনের ন্যায় খ্রীস্টানধর্ম প্রচার করিতেন। তাঁহারা ইংরাজি ভাষায় সুবক্তা ও গ্রন্থরচয়িতা ছিলেন। বিহারীলাল কলিকাতায় রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে পেনশন লইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ত্যাজ্যপুত্র করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।" [স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবনকথা' থেকে সংকলিত]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বিচিত্র সামাজিক ইতিহাসের খণ্ড চিত্র এখানে পাচ্ছি। দুই ভাইয়ের এক ভাই ধর্মান্তর গ্রহণ করে খ্রীস্টধর্মের বিশিষ্ট প্রচারক হয়েছেন, অন্য ভাই স্বধর্মে থেকে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক হয়েছেন বিদেশে। রসিকলাল চন্দ্রের পরিবার ঐকালের আলোড়িত অথচ গভীর আন্তরিক সামাজিক ইতিহাসকে যেন স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দেখা যাচ্ছে, বিহারীলাল বিবেকানন্দ-নিন্দার প্যামফ্লেট ছাপছেন, ভাই কালীপ্রসাদ বিবেকানন্দের সমর্থনে কলকাতায় ধন্যবাদসভার সংগঠনে মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছেন।

ম্যাকডোনাল্ড ও বিহারীলালের বিবেকানন্দ-বিরোধী যে-প্যামফ্লেটের কথা মহেন্দ্রনাথ বলেছেন, তার সন্ধান আমরা পাইনি, কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের লেখা বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের প্রতি বিদ্বিষ্ট মিথ্যায় পূর্ণ কিছু রচনা পেয়েছি, যার পিছনে অভেদানন্দের ভ্রাতা বিহারীলাল চন্দ্রের হাত থাকতে পারে। 'মিশনারি আক্রমণ' অধ্যায়ে সে-সব বিষয়ে আলোচনা হবে।

দিলেন না...কিন্তু তাঁহার মুখভঙ্গি ও হাবভাব হইতে অতুলচন্দ্র ঘোষ বুঝিতে পারিলেন যে, গুপ্তভাবে একটা কান্ড চলিতেছে। অতুলবাবু আসিয়া ঐসকল কথা সকলকে বলিয়া দিলেন। খ্রীস্টানরা কিছুদিন ধরিয়া এরূপ প্যামফ্লেট, বক্তৃতা ও চিঠিপত্র লিখিয়া আপনাদের ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল।

"ভাই প্রতাপচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া নানাপ্রকার কুৎসা করায় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সকল কথা স্বীকার করিয়া লইল, এবং পৌত্তলিক ধর্ম পুনরায় উত্থান করিতেছে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। সন্ন্যাস-ধর্মটা যে, অতি ভুল পথ, ইহা তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিশেষ বাড়াবাড়ি বা কোনো অনিষ্টকরভাবে কার্য করেন নাই, [কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, পরে দেখব] মতভেদমাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, বা সাম্প্রদায়িক-ভাবে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপ দেখিয়া সাধারণ হিন্দুসমাজ ব্রাহ্ম-সমাজের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। উদাহরণস্বরূপ দুই-একটি ঘটনা দেওয়া হইল। মহেন্দ্র মিত্র সুরেশ মিত্রের মধ্যম ভ্রাতা। তিনি তখন শিয়ালদহ ও হাওড়ার ছোট আদালতে জজিয়তি করিতেন। বেশ বয়স হইয়াছিল। তাঁহাদের বাড়িতে রাজমোহন বসু নামক কেশব-বাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জনৈক ব্রাহ্ম সকালবেলা চা-পান করিতেন। পাড়া-প্রতিবেশী, ও নিত্য যাতায়াত থাকায় তাঁহার সহিত বেশ হৃদ্যতা ছিল ও মানুষটিও সৎ ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব এমনই জিনিস যে, একদিন তাঁহাকে যখন সকলে জিজ্ঞাসা করিল যে, প্রতাপবাবু নাকি নরেনের নিন্দা করিতেছেন?—তখন কেশববাবুর সমাজের লোক রাজমোহনবাবু অল্পবিস্তর প্রতাপ মজুমদারকে সমর্থন করিলেন এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেও বলিতে লাগিলেন। এই আর কি, বৃদ্ধ মণি মিত্তির ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। প্রথমে উভয়ের কথা-কাটাকাটি চলিল, তারপর গালাগালি, শেষে মারামারির উদ্যোগ। রাজমোহনবাবু দ্রুতপদে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ মণি মিত্র তাঁহাকে মারিবার জন্য রাস্তায় ধাবিত হইলেন। রাস্তার লোক দুই বৃদ্ধের কান্ড দেখিয়া অবাক। রাজমোহন বসু পলাইয়া গেলেন, মণি মিত্র ফিরিয়া আসিয়া রাগে গাল পাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, নরেন্দ্রনাথকে নিন্দা করা ও তাঁহাকে নিন্দা করা সমান ব্যাপার।

"একদিন সকাল দশটার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট দিয়া হরমোহন মিত্র দৈ-এর তিজেল ভাঁড় হাতে লইয়া আসিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ব্রাহ্মের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ভদ্রলোকটি বলিয়া ফেলিলেন, 'কি হে, তোমাদের নরেনের ব্যাপার তো সব শোনা যাচ্ছে। প্রতাপবাবু এসে তো সব বলে দিচ্ছে।' এইকথা শুনিবামাত্র হরমোহন মিত্রের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটিকে অজস্র গালি দিতে লাগিলেন এবং শেষে রাস্তার খোয়া তুলিয়া প্রায় মারেন আর কি!...

"প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, সেই যে নরেন ছোঁড়াটা, যে ভ্যাগাবন্ডের মত পথে-পথে ঘুরে বেড়াত, সে এক লম্বা জামা পরে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, চিকাগো-পার্লামেন্টে গিয়ে তো হাজির! সে আবার লেকচার করতে লাগল, সে আবার বেদ-বেদান্তের ওপর কথা কয়! মায়াবাদের অযৌক্তিক কথা, আর পৌত্তলিক ধর্ম সমর্থন করে। সে-সব জিনিস কি এ-যুগে চলে? যত-সব বাজে জিনিস। ছোঁড়া এমনি অসভ্য যে, রমণীদের সম্মুখে বসেই চুরুট টানে। আর কি-যে সব লেকচার করে, তার মাথামুন্ডু নেই, হাউড়ের মত আবোল-তাবোল ইত্যাদি।

"এই সময়ে ইংরেজি ভাষায় বাঙালীদের পরিচালিত দৈনিকপত্র একমাত্র ছিল ইন্ডিয়ান মিরার, অপর সমস্ত কাগজ সাপ্তাহিক ছিল [সম্পূর্ণ সত্য নয়; অল্পদিন আগে অমৃত-বাজার দৈনিক হয়েছে, হিন্দু পেট্রিয়টও], নাম যশ ও নির্ভীকতায় ইন্ডিয়ান মিরার তখন শ্রেষ্ঠ। নরেন্দ্রনাথ সেন তাহার সম্পাদক ছিলেন; যখন যে-বিষয়ে লেখা উচিত বিবেচনা

করিতেন নির্ভীকভাবে তাহাই লিখিতেন, কাহাকেও ভয়ডর করিতেন না। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যখন নানাস্থানে স্বামীজীর নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রতাপচন্দ্রের কথা শুনিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যদিও নরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট আত্মীয়, কিন্তু ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া নরেন্দ্রনাথ সেন নির্ভীকভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি আপন বৈঠকখানায় বসিয়া সকলের সম্মুখে প্রতাপ মজুমদারকে মুখ ছুটাইয়া গালি দিতেন। রাগের মাথায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক যে-প্রকার কথা বলেন, তিনি সেই প্রকার বলিতেন। তাহার ভিতর তাঁহার আন্তরিক ভাব এই কথায় প্রকাশ পাইয়াছিল— 'দেখ দেখি, একটা নিঃসম্বল বাঙালীর ছেলে, বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে নিজের দেশের জন্য, নিজের জাতের জন্য, নিজের ধর্মের জন্য লড়াই করছে, কি করে বিদেশীর কাছে এদেশের একটু সম্মান হয় তার চেষ্টা করছে—আর একটা বুড়ো মিন্‌ষে কোথায় তার হয়ে সেখানে দুটো কথা বলবে, তা নয়, তার নিন্দে করে কিসে তার অনিষ্ট হয়, তার চেষ্টা করছে! লোকটার বুকে কি এতটুকুও পেট্রিয়টিজম্‌ নেই! এরাই হচ্ছেন বলিয়ে-কইয়ে লোক! যদিও তিনি আপনার বৈঠকখানায় মুখ খুলিয়া আপনার প্রাণের কথা বলিতেন, কাগজে কিন্তু একটু সংযতভাবে লিখিতেন। তিনি তাঁর সংবাদপত্রে, নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশববাবুর নিকট কিরূপ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, এবং কেশববাবু হইতে নরেন্দ্রনাথ কত শ্রেষ্ঠ হইবেন সে-বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন—সেইসব পুরাতন কথা তুলিয়া প্রত্যহ ইণ্ডিয়ান মিরারে লিখিতে লাগিলেন। এই কয়েক মাসের ইণ্ডিয়ান মিরার পড়া আবশ্যক, কারণ তাহাতে স্বামীজীর বিষয় জানিবার ও শিখিবার অনেক জিনিস আছে।

"নরেন্দ্রনাথ সেন ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রত্যহ স্বামীজীর বিষয়ে সুখ্যাতি করিয়া লেখাতে শীঘ্রই হাওয়ার পরিবর্তন হইল। দেশের ভিতর জাতিগত সম্মানবোধ ও জাতিগত প্রেম উদ্ভূত হইল। সকলেই তখন হিন্দুনামে পরিচয় দিতে শ্লাঘা বোধ করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক বলিয়া পূর্বে যেমন হীন বা আমতা-আমতাভাবে কথা বলিতেন সে ভাবটা কাটিয়া গেল। বুকে একটা দৃঢ়তা আসিল, এবং নিজেরা যে খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মদের অপেক্ষা ধর্মভাবে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ একটা তেজী ভাব উঠিল। মোট কথা, হাতে-পায়ে-বুকে সকলেরই যেন একটু তেজ আসিল। জাতিগত ভাবের এই প্রথম অভ্যুদয়। মুমূর্ষু বিষণ্ণভাব ত্যাগ করিয়া সজীব তেজী-ভাবটি ধীরে-ধীরে সকলের ভিতরে আসিল। নরেন্দ্রনাথ সেন ইণ্ডিয়ান মিরারে এই সময়ে এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে এই স্থলে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হইল।"

এই চিত্তাকর্ষক স্মৃতিকথার মূল্য অপরিসীম। বর্তমান গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিমহিমার রূপ-প্রদর্শনে নিশ্চয়ই যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রধান একটি বর্ণনীয় বিষয় হল, বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নবজাগরণের যথার্থ সূচনা দেখানো। বিবেকানন্দ যে, হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের হোতা নন, তিনি যে ভারতীয় রেনেসাঁসের নায়ক—এই বক্তব্যের পক্ষে এই জাতীয় স্মৃতিকথার গুরুত্ব সবিশেষ। এর ভিতর থেকে, নরেন্দ্রনাথ সেন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—এই দুই সম্পর্কের ভাইয়ের বিপরীত ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি; দেখতে পাচ্ছি—বিবেকানন্দের সাফল্যে খ্রীস্টান মিশনারিদের গাত্রদাহ ও গোপন চক্রান্তকে, যাতে অংশ নিচ্ছেন বিহারীলাল চন্দ্র এবং বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছেন তাঁরই বৈমাত্র ভাই কালীপ্রসাদ চন্দ্র—অপরপক্ষে একইসঙ্গে বিবেকানন্দের গৌরবে সাধারণ মানুষের গৌরবানুভূতি। এইসব বিষয়ে আরও একটু খুঁটিনাটি আলোচনার প্রয়োজন আছে।

॥ ২ ॥

আমরা আগেই বলে এসেছি, যদিও ধন্যবাদ-সভার বক্তাগণ বলেছিলেন, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কোনই প্রয়োজন নেই ধন্যবাদের, তবু সত্যই তার প্রয়োজন হয়েছিল, এবং সে-প্রয়োজন কেন, কোথায়, তার কিছু পরিচয় পেলাম উপরের স্মৃতিকথায়। খ্রীস্টান মিশনারি ও মজুমদার-প্রচারিত কুৎসার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের সমর্থন স্বামীজীর পক্ষে সত্যই আবশ্যক ছিল।

আমেরিকায় স্বামীজীকে কি-জাতীয় অপপ্রচার ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে-বিষয়ে একটা অস্পষ্ট ধারণা আমাদের গড়ে উঠেছিল স্বামীজীর জীবনী ও পত্রাবলী পড়ে। তিনি যে, আমেরিকায় একটা লড়াই চালিয়েছিলেন—সেটা ঐসব সূত্র থেকে খাপছাড়াভাবে বোঝা যায়। কিন্তু সে-লড়াই যে কী প্রচন্ড, যার একদিকে দলবদ্ধ জ্বালা, দংশন, গরল, অন্যদিকে একক পুরুষসিংহের বিরল শক্তিপ্রকাশ—এই অসাধারণ কাহিনীর কথা আমাদের সম্পূর্ণ জানা ছিল না। সেই ইতিহাসকে প্রথম পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর গ্রন্থে উন্মোচন করেছেন মেরী লুই বার্ক। স্বামীজীর প্রচলিত জীবনী পাঠ করে আমাদের ধারণা হয় : তাঁর গোটা ব্যাপারটাই অলৌকিক—অলৌকিকভাবে ধর্মমহাসভায় তাঁর কণ্ঠে সরস্বতী ভর করে-ছিলেন, তার ফলে এক বাক্যে তিনি সারা আমেরিকাকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর জয়ের রথ গড়িয়ে চলেছিল আমেরিকার শহরে-শহরে, তারপরে ভারতের পথে-প্রান্তরে—সমস্ত ব্যাপারটাই খুব সোজা, কারণ তা যে অলৌকিক!! শ্রীমতী বার্ক তাঁর রচনার দ্বারা আমাদের এই ধরনের ভ্রান্তি দূর করতে পেরেছেন। তাঁর গ্রন্থপাঠের পরে অবশ্য শেষ পর্যন্ত মনে হয়, ব্যাপারটা বোধহয় অলৌকিকই ছিল, কারণ কোনো মানুষের পক্ষে একক এতবড় লড়াই চালানো সম্ভব বিশ্বাস হয় না। বাস্তবিক, লুই বার্কের বই পড়ার আগে বিবেকানন্দের সংগ্রামী চেহারার আকার যেন যথার্থ জানতাম না। এইটুকু জেনেছিলাম, তিনি প্রচন্ড নির্ভয় মানুষ ছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ কোথায়? সে প্রমাণ আছে কি কয়েকটি তীব্র বক্তৃতায় বা শারীরিক সামর্থ্যের অল্পবিস্তর দৃষ্টান্তে? শ্রীমতী বার্ক স্বামীজীর আসল সংগ্রামক্ষেত্রে আমাদের নিয়ে গেছেন।

আমেরিকায় সেই লড়াই স্বামীজীকে প্রধানতঃ চালাতে হয়েছিল খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে। মিশনারিদের পার্শ্বরক্ষা করেছিলেন কিছু ভারতীয় খ্রীস্টান, কয়েকজন ব্রাহ্ম-প্রচারক এবং থিয়জফিস্ট দল।

বিবেকানন্দ আমেরিকায় খ্রীস্টান মিশনারিদের অর্থসংগ্রহের পথে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মিশনারিরা ভগবান্ খ্রীস্টের শুভনাম প্রচারের জন্য পৃথিবীর নানা দিকে বেরিয়ে পড়তেন—নানা অসভ্য দিকে—এবং এই ব্রতপালনের জন্য তাঁদের টাকার দরকার হত। টাকা আসত চাঁদা থেকে। যাঁরা চাঁদা দিতেন, তাঁদের হৃদয় বিগলিত হত অসভ্য মানুষের করুণ অবস্থার চিন্তায়। প্রচার-কল্যাণে তাদের অবস্থা যত করুণ, শোচনীয়, যত নরকনিমগ্ন —চাঁদার পরিমাণ তত বেশী। সুতরাং ভারতের কালা মানুষগুলির অসহ্য কুসংস্কারের চেহারা শত-শত সচিত্র পুস্তক-পুস্তিকার দ্বারা[৫] লক্ষ-লক্ষ আমেরিকানের কাছে পোঁছে,

৫ লুই বার্ক ১৮৫৮-তে প্রকাশিত ক্যালেব রাইট নামক লেখকের *India and its Inhabitants* গ্রন্থের (৩৫৫ পৃষ্ঠার বই) পরিচয় দিয়েছেন। লেখক নাকি তথ্যসংগ্রহের জন্য ভারতভ্রমণ করে-ছিলেন। বইটিকে আমেরিকানরা কিভাবে গোগ্রাসে গিলেছিল বোঝা যায়—দু'বছরের মধ্যে এই বই ৩৬,০০০ বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, এই সংবাদ থেকে। স্বামীজী অনেক সময়ে এই বইটির (এবং এই-জাতীয় অন্যান্য বইয়ের) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন :

"আমেরিকায় শিশুপাঠ্য বইয়ে ছবিতে দেখা যায়—হিন্দু-মা গঙ্গায় কুমীরের মুখে নিজের

তাদের হৃদয়কে ব্যথা-বেদনায় তরল ক'রে তুলে, রৌপ্যপ্রবাহ হয়ে, বাঁধা পড়ত মিশনারি-বাঁধে। সুন্দরভাবে সবকিছু চলছিল—এমন সময়ে বিবেকানন্দ-নামক ঐ উৎপাত! বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে কোনো-কোনো আমেরিকান তো বলেই ফেললেন—এমন মানুষের দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠানো! এবং বিবেকানন্দও স্পর্ধার সঙ্গে সেখানে বলে বসলেন—পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় ধর্মের দিক দিয়ে ভারত পিছিয়ে তো নেই-ই বরং বহু দিকে এগিয়ে রয়েছে। বিবেকানন্দ ঐসব কথা বললেন অকাট্য বচনে, অপূর্ব ভাষণে। সেই সঙ্গে আবার তিনি যোগ করে দিলেন—*Religion is not the crying need of India now*—ভারতে ধর্ম যথেষ্ট আছে, নেই অন্ন; সে বড় দরিদ্র; যদি তার জন্য টাকা খরচ করতে চাও তার খাদ্যের জন্য তা করো, তার বৈষয়িক উন্নতির জন্য তা করো'। বিবেকানন্দের প্রচারের ফলে মিশনারিদের চাঁদার খাতে বিশেষ ঘাটতি পড়ল।৬

চাঁদার খাতে ঘাটতির কথা লুই বার্ক নানা প্রমাণে জানিয়েছেন। আমরা অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত একটি সাক্ষ্যের উল্লেখ করতে পারি। ম্যাক্সিম-গানের আবিষ্কারক বিখ্যাত হিরাম ম্যাক্সিম, যিনি আবার ধর্ম ও দর্শনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, এক্ষেত্রে মূল্যবান সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, তা উদ্ধৃত করছি ঃ

সন্তানকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন—মায়ের রঙ ঘোর কালো, কিন্তু শিশুটির রঙ সাদা করা হয়েছে, যাতে তার শিশু-পাঠকগণ হতভাগ্য শ্বেত-শিশুটির প্রতি সমবর্ণের সহানুভূতি বোধ করতে পারে! —এবং সেই সহানুভূতির প্রেরণায় বাল্যকাল থেকেই মিশনারি-ফান্ডে চাঁদা দিয়ে যেতে পারে!!"

"একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে—একটি লোক নিজের হাতে তার স্ত্রীকে আগুনে পোড়াচ্ছে, যাতে মেয়েটি পেত্নী হয়ে স্বামীর শত্রুদের জ্বালাতে পাবে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সত্যবাদী মিশনারিদের বই ও বর্ণনা থেকে জানা গেছে—কলকাতার রাস্তায় ধর্মান্ধদের বুকের উপর দিয়ে রথ চলেছে (তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন)—এবং ভারতের প্রত্যেক গ্রামে একটি করে পুকুর আছে, যা শিশুর হাড়ে বোঝাই।"

যত ভয়াবহ বর্ণনা তত টাকা—মিশনারি-পকেটে। মাঝে-মাঝে উল্টো উৎপত্তিও হয়। স্বামীজীর এক বন্ধুর বাড়ির চাকরানিকে পাগলা-গারদে যেতে হল ঐ-সব বক্তৃতা শোনার ফলে। 'তার পক্ষে নরকাগ্নির ডোজ একটু বেশি হয়ে পড়েছিল।'

৬ কলকাতার মহাবোধি পত্রিকায় ১৮৯৫ অক্টোবরে মিশনারিদের চাঁদা-ঘাটতির কথা বেরিয়েছিল, সেই সঙ্গে মিশনারিদের আতঙ্কিত চাঞ্চল্য ও চেষ্টার কথাও। ধর্মপাল লিখেছিলেন ঃ

AGGRESSIVE CHRISTIANITY :—A friend writes to me from America: "I must tell you that I am informed by a gentleman in Washington that several native Hindu Christians, also some Ceylonese Christians, have been imported to America by the Christian Mission Board to counteract the influence of the Orientals. They are lecturing in churches everywhere, and in public halls, where non-churchgoers will attend. There is no doubt that Christian ministers are frightened, and will use every effort in their power to refute what has been said and done by Orientals during and since the Parliament. By their own statements, there has been less money collected for foreign missions than ever before."

বীরচাঁদ গান্ধী পুনার মরাঠায় (১৮৯৬, ১৬ ফেব্রুয়ারি) প্রেরিত এক পত্রে জে ই অ্যাবট নামক জনৈক মিশনারি-সমর্থকের সমালোচনার উত্তরে লিখেছিলেন ঃ

"About the 'cheap sympathy found both in England and America consisting in depreciating missionary effort, in praising Hinduism etc.' When the church and missionary income is decreasing, especially since the Parliament of Religions, such a complaint is natural."

এক্ষেত্রে ভারতস্থ মিশনারিদের স্বীকৃতি খুবই মূল্যবান। আমেরিকান মাদুরা মিশনের ১৮৯৬-এর রিপোর্টে পাই ঃ

"কয়েক বছর আগে চিকাগোয় একটি ধর্ম-কংগ্রেস হয়েছিল। অনেকেই বলেছিলেন, ও-জিনিসটি সম্ভব হতেই পারবে না। যেখানে প্রতিটি দলই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত এবং অপরে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, সেখানে বোঝাপড়া কি করে হতে পারে? তাহলেও এই ধর্ম-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে প্রতি বছরে আমেরিকার দশ লক্ষ ডলারের বেশি বাঁচিয়ে দিয়েছিল; সেই সঙ্গে বলাই বাহুল্য বিদেশে বহু আমেরিকানকে প্রাণ দিতে হয়নি। এবং এই সকলই ঘটিয়েছিলেন একজন সাহসী সৎ মানুষ। কলকাতায় [?] যখন ঘোষিত হয়েছিল যে, চিকাগোয় ধর্মমহাসভা হবে, তখন কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ী [?] আমেরিকানদের কথা হুবহু বিশ্বাস করে একজন সন্ন্যাসীকে তাদের দেশে পাঠালেন—তাঁর নাম বিবেকানন্দ, পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মসংঘের প্রতিনিধি তিনি। এই সন্ন্যাসীর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, বিরাট পাণ্ডিত্য; তিনি ইংরেজি বলেন ওয়েবস্টারের মত। [ধর্মমহাসভায়] আমেরিকান প্রোটেস্টাণ্টরা অপর সকল সম্প্রদায়ের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, খুবই সহজে বাজিমাত করবেন। প্রভূত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কার্যসূচী ধরে তাঁরা এগোচ্ছিলেন। ভাবখানা ছিল—'দেখ না, কি-ভাবে তোমাদের উড়িয়ে ছেড়ে দিই।' কিন্তু তাঁদের দেবার মধ্যে ছিল কতকগুলো পুরনো বস্তাপচা তোতাপাখির বুলি, যা নোভাস্কটিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিটি ক্ষুদ্র গ্রামে, পল্লীতে পুনঃপুনঃ আওড়ানো হয়েছে বছরের পর বছর ধরে।

"কিন্তু বিবেকানন্দ যখন কথা বললেন, তারা দেখল, এবার সামনে নেপোলিয়ান, যুঝতে হবে তাঁর সঙ্গে। বিবেকানন্দের প্রথম বক্তৃতা ঐশ্বরিক উন্মোচন ভিন্ন আর কিছু নয়। তাঁর প্রতিটি কথা রিপোর্টাররা উন্মুখ হয়ে লিখে নিয়ে টেলিগ্রাফ-যোগে ছড়িয়ে দিয়েছিল সারা দেশে—তা বেরিয়েছিল হাজার-হাজার সংবাদপত্রে। বিবেকানন্দ হয়ে দাঁড়ালেন *Lion of the day*, শীঘ্রই তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বিপুল হয়ে দাঁড়াল। তাঁর বক্তৃতাকালে এত শ্রোতার সমাগম হত যে, কোনো হলঘরেই তাদের আঁটত না। এশিয়ায় তারা বাজে কতকগুলো মেয়ে এবং বোকা-সোকা অর্ধশিক্ষিত কতকগুলো লোক, সেইসঙ্গে লক্ষ-লক্ষ ডলার পাঠিয়েছে বছরের পর বছর ধরে, উদ্দেশ্য—সেখানকার দরিদ্র, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন হিদেনদের ধর্মান্তরিত করে, তাদের নরকে পতিত আত্মার উদ্ধার; আর এখানে দেখল, সেই 'পতিত' মানুষদের

"The year has been one of testing to both faith and loyalty. The grant from America was reduced 50 per cent, and all the workers had to face the painful position of giving up schools and reducing salaries.... As might be expected, those who were less attached to the work thought it a good opportunity to sever their connection with the Mission and go where they could get larger salaries." [*Harvest Field*; July, 1897]

আমেরিকান আর্কট মিশনের ১৮৯৬ সালের রিপোর্টের উপরে হার্ভেস্ট ফিল্ড ১৮৯৭ নভেম্বর সংখ্যায় মন্তব্য করে ঃ

"We have been accustomed of late to hear of the cutting down of home grants to American Missions in India; and we are not astonished, therefore, to learn that the Arcot Mission had to face the work of 1896 with a reduced allotment from the Board in America, and that as a consequence the missionaries had to consider the necessity of having to cut off some important branch of their work. They came to the conclusion that, if additional funds were not immediately forthcoming, they would have to sacrifice their schools for non-Christians."

এই স্বীকারোক্তির পরে কি করে আশা করা যায়, বিবেকানন্দ ভারতের মিশনারিদের ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পাবেন? হীদেনদের রুটির দৈন্য-খনি থেকে যারা এত বছর খৃস্টান সংগ্রহ করে এসেছে, তারা কিভাবে নিজেদের রুটিহীন অবস্থায় দেখার সম্ভাবনায় পুলকিত হবে!!!

একটি নমুনাকে, যিনি এই পরিমাণে ধর্ম ও দর্শন জানেন যে, দেশের সমস্ত পাদরি ও মিশনারি মিলিয়েও তা জানেন না। এই প্রথম তাদের কাছে ধর্মকে আনন্দময় রূপে উপস্থিত করা হল। তারা স্বপ্নেও যা কোনোদিন ভাবতে পারেনি, দেখল ধর্মের মধ্যে তাই রয়েছে। এঁর সঙ্গে তর্ক অসম্ভব। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে খেলায়, ইনি তেমনি পাদরিদের নিয়ে খেলা করতে লাগলেন। মিশনারিরা ভয়ানক আতঙ্ক বোধ করল। তারা কী করবে এখন? তাহলে কী করল তারা? যা তারা সর্বদা করে এসেছে তাই করল—শয়তানের চর বলে তাঁকে ধিক্কার দিল। কিন্তু কা-জ-টা তিনি সম্পন্ন করে ফেলেছেন—বীজ বপন করেছেন—আমেরিকানরা ভা-ব-তে আরম্ভ করে দিয়েছে, তার ফলে। তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল : 'এই লোকটির দেশে সেই সব মিশনারি পাঠিয়ে আমরা টাকা নষ্ট করব, যারা এঁর সঙ্গে তুলনায় ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানে না? না, সে-কাজ আর নয়।' এবং তার ফলে বছরে মিশনারি-আয় দশ লক্ষ ডলারেরও বেশি পড়ে গেল।" [অ]৭

সুতরাং সর্বনাশ। ব্যাপারটা যতক্ষণ ধর্মনৈতিক স্তরে থাকে ততক্ষণ বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু অর্থনৈতিক অসুবিধা ঘটানো! আমেরিকার ধর্মবেদী থেকে কি পরিমাণে ধুলো উড়েছিল, *Vive Kananda* কিভাবে *Vale Kananda* হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তা মেরী লুই বার্ক তাঁর গ্রন্থে প্রচুর তথ্যযোগে হাজির করেছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন, বহু-দিনের সঞ্চিত ধারণা কিভাবে একটি মানুষ প্রায় বদলে দিয়েছিলেন এক বছরের চেষ্টায়। এবং সেই ধারণা-বদল ব্যাপারটা কী দুঃসহ অন্যায় ঠেকেছিল অনেকের কাছে। ভারতগামী একজন আমেরিকান যখন শুনেছিলেন, সেখানে গিয়ে তিনি আর সতীদাহ দেখতে পাবেন না, বা জগন্নাথের রথের তলায় আত্মবিসর্জন, তখন তিনি রাগে-দুঃখে আক্ষেপ করে বলে-ছিলেন, তাহলে ঐ পোড়া দেশে যাওয়া কিসের জন্য? প্রাচ্যরহস্যের তাহলে রইল কি? ইস্ কবিতাই নষ্ট!!

৭ প্রবুদ্ধ ভারত (১৯১৯) এই অংশটি স্যার হিরাম স্টিভেনস্ ম্যাক্সিমের *Li Hung Chang's Scrap Book* থেকে উদ্ধৃত করেছিল।

হিরাম ম্যাক্সিমের রচনার যে-অনুবাদ করেছি, তা আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। তাই মূল কয়েক লাইন তুলে দিচ্ছি :

"This monk (Vivekananda) was of commanding presence and vast learning, speaking English like a Webstar.... The American Protestants, who vastly outnumbered all others, imagined that they would have an easy task.... When, however, Vivekananda spoke, they saw that they had a Napoleon to deal with. His first speech was no less than a revelation....Vivekananda became the lion of the day.... No hall could hold the people who flocked to hear his lecture. They had been sending silly girls and half-educated simpletons of men, and millions of dollars to Asia for years, to convert the poor benighted heathen and save his alleged soul; and here was a specimen of the unsaved who knew more of philosophy and religion than all the parsons and missionaries in the whole country. Religion was presented in an agreeable light for the first time to them. There was more in it than they had ever dreamed; argument was impossible. He played with the parsons as a cat plays with a mouse, they were in a state of consternation. What could they do? What did they do? What did they always do—they denounced him as an agent of the devil."

॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দের সংগ্রামী চেহারার কিছুটা আভাস দেবার জন্য লুই বার্কের বই থেকে অল্প কিছু সংবাদ সংকলন করে দেওয়া দরকার। এই সংক্ষিপ্ত সংকলনে, পাঠককে সতর্ক করে দিতে পারি, বিবেকানন্দের মহানায়ক-রূপ যৎসামান্যই পাওয়া যাবে।

ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকা যাবার সময়ে স্বামীজী যে-সকল অভিপ্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে মনে হয়, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে মিশনারি-কুৎসার বিরোধিতা করাও ছিল। কিংবা তা যদি না থাকেও, আমেরিকাতে উপস্থিত হওয়ার পরেই বহুপ্রকার বিচিত্র বিরূপ মন্তব্যের সম্মুখীন হয়ে তাঁর মনে অবিলম্বে ঐ ইচ্ছা জেগেছিল। সুতরাং দেখতে পাই, ধর্মমহাসভায় দাঁড়াবার আগেই তিনি সতীদাহ, জগন্নাথের রথের সামনে আত্মবিসর্জন ইত্যাদি বিষয়ে তিক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পরাধীন ভারতের দারিদ্র্য-প্রসঙ্গে বলছেন, 'উত্তম-উত্তম আইডিয়ায় মাথাভর্তি মিশনারিরা জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রশিল্প শিক্ষা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থাই ভারতে করেন নি।' [সালেম ইভনিং নিউজ; ১৮৯৩, ২৯ অগস্ট]

ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হয়ে অতঃপর স্বামীজী দেখলেন—খ্রীস্টান-যাজকদের অসহ্য মুরুব্বিয়ানা ও অন্ধ গোঁড়ামির চেহারাকে। দেখলেন, ক্যাথলিক-প্রধানের জন্য ধর্মমহাসভার কেন্দ্রে সুসজ্জিত সিংহাসন, যাঁর আশপাশে হীদেনদের এনে হাজির করা হয়েছে আপাত উদারতার পরিচয় দিতে, আসলে তাদের তুচ্ছতাকে খুলে ধরার তামাশা দেখাতে। বিবেকানন্দ কিন্তু পাশার দান উল্টে দিলেন। অপ্রত্যাশিত সেই আবির্ভাবে দুটি ফল হল। একদিকে খ্রীস্টানদের পক্ষে কিছু উদারতার মনোভাব দেখা গেল, অন্যদিকে ফেটে পড়ল প্রচণ্ড রোষ ও আক্রোশ। লীম্যান অ্যাবট, মারউইন মেরী স্নেল, অ্যালফ্রেড ডবলিউ মর্মোর, রেভারেণ্ড ই এল রেক্সফোর্ড প্রমুখ কেউ-কেউ উদার মনোভাব দেখিয়েছিলেন (রেভারেণ্ড রেক্সফোর্ড বলেছিলেন, কোনো স্থূল নিষ্ঠুর হস্ত যেন মানুষের হৃদয়-মনের অধীশ্বর দেবমূর্তিকে ধ্বংস না করে! যে-মানুষ পূজা করছে, সেই বলার অধিকারী, সত্যই সে পূজা করে যাবে কি-না!)—আর কটু সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির রেভারেণ্ড টি ই স্লেটার, যিনি ইতিমধ্যেই বেদনিন্দা করে গ্রন্থরচনা করে ফেলেছেন, (এঁর কথা পরে আরও বলতে হবে), রেভারেণ্ড জোসেফ কুক, যিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পাপের অভিজ্ঞতাকে জুড়ে আত্মায় শান্তি আনার ব্যবস্থা করতে পারে, এমন ধর্ম খ্রীস্টধর্ম ছাড়া আর কেউ নয়।' রেভারেণ্ড কুক এমনই প্রচণ্ড পাপ-খ্যাপা ছিলেন যে, তিনি চেয়েছিলেন পাপ-নামাবলীর একটি বিশেষ কবিতা যেন তাঁর সমাধিস্তম্ভে খোদাই করে রাখা হয়, যার একটি স্তবক এই প্রকার :

Endless sin means endless woe.
Into endless sin I go,
If my soul, from reason rent,
Takes from sin its final bent.

এঁদের কাছে বিবেকানন্দের পাপবাদ-বিরোধিতা একেবারে ধর্মদ্রোহিতা। আর বিবেকানন্দের সে কী ভাষা, যার শব্দে-শব্দে জ্বলছে যজ্ঞাগ্নিশিখা :

"*Children of Immortal Bliss*—what a sweet, what a hopeful name! Allow me to call you, brethren, by that sweet name—heirs of immortal bliss! Yea, the Hindu refuses to call you sinners. Ye are the Children

of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth—sinners! It is a sin to call a man so. It is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. You are souls immortal, spirits free, blest and eternal."

কিছুদিন পরে তিনি খ্রীস্টানদের আদিম পাপতত্ত্বের বিরুদ্ধে অপূর্বভাবে উপস্থিত করেছিলেন আদিম পবিত্রতা-তত্ত্বকে।—

"Be not deluded by your religion teaching original sin, for the same religion teaches original purity. When Adam fell he fell from purity. Purity is our real nature, and to regain that is the object of all religion."

নাড়া খেল আমেরিকা এই অপরিচিত কিন্তু অনস্বীকার্য সত্যের উন্মোচনে; বিস্ময় ও বিদ্রূপ মেশানো কবিতা লেখা হল এই বিষয়ে,৮ হীদেন বিবেকানন্দের অপরাপর ধর্মীয় কদভিপ্রায়ের বিষয়েও।৯ যে-বিবেকানন্দ বলতে পারেন, এই বিশ্ব, ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি, তাঁর সম্বন্ধে জোসেফ কুক গলা ফাটিয়ে না বলে পারলেন না, 'অক্ষমণীয় আহাম্মকি', উত্তরে 'প্রাচ্যদেশীয়রা খোঁচা-দেওয়া শান্ত অবজ্ঞার হাসি হেসে' বললেন, সৃষ্টির আদি আছে বলার চেয়ে স্বতঃস্পষ্ট উদ্ভট কথা আর কিছু হয় না।' নাগরকর, মজুমদারের মতো কোনো-

৮ *Aunt Hannah on the Parliament of Religions* নামক কবিতার একটি স্তবক, বিবেকানন্দের পাপবাদ-বিরোধিতা প্রসঙ্গে ঃ

Then I heered th' han'some Hindu monk, drest up in orange dress,
Who sed that all humanity was part of God—no less,
An' he said we was *not* sinners, so I comfort took, once more,
While th' Parl'ment of Religions roared with approving roar.

উপভাষার চিহ্ন-লক্ষণ যথেষ্ট আছে কবিতাটিতে, কৌতুক এমনকি বিদ্রূপের ছোঁয়াও আছে, কিন্তু সম্ভ্রমপূর্ণ বিস্ময়ও লক্ষণীয়।

৯ বিশপ হেবারের একটি সুপরিচিত কবিতা ছিল হীদেন-মুক্তির বিষয়ে। তার বক্তব্য— গ্রীনল্যান্ডের তুষার-পর্বতাঞ্চল থেকে ভারতের প্রবাল-উপকূল পর্যন্ত সর্বস্থান হতে ডেকে পাঠানো হচ্ছে, এসো তোমরা, আমাদের দেশকে ভ্রান্তির শিকল ছিঁড়ে মুক্ত করো! আফ্রিকার রৌদ্রোজ্জ্বল পর্বতের গা বেয়ে নেমে-আসা স্বর্ণাভ বালুকায়, সিংহল দ্বীপের উপর দিয়ে মন্দ বেগে বয়ে-যাওয়া মসলা-সুগন্ধি বাতাসে, নানা দেশের প্রাচীন নদীতে এবং বৃক্ষ-লতায় আচ্ছন্ন প্রান্তরে ঈশ্বরের অঢেল সৌন্দর্যবর্ষণ, কিন্তু হায়, সেখানে আসলে ফাঁক—অন্ধ হীদেনরা কাঠ ও পাথরের সামনে মাথা নোয়াচ্ছে!! এই কবিতাটির প্রথম লাইন ছিল—"From Greenland's icy monutains, from India's coral strands', শেষ লাইন, "The heathen in his blindness bows down to wood and stone.' এই কবিতারই প্যারডি করা হয়েছিল ডেট্রইটের ইভনিং নিউজ পত্রিকায় (১৮৯৪, ১৪ ফেব্রুয়ারি), যদিও বিপরীত অর্থে। এখানে হীদেনরা মুক্তির বার্তা এনেছে আমেরিকার খ্রীস্টানদের কাছে। ডেট্রইটে স্বামীজী মিসেস বাগলির (ভূতপূর্ব গভর্নরের পত্নী) অতিথি হয়েছিলেন। উক্ত সংবাদের সূচনায় তাই বলা হয়েছিল 'যে-সব খ্রীস্টান হিন্দু হতে চায়, তারা যেন মিসেস বাগলির বাড়িতে আবেদন করে।' তারপর উক্ত প্যারডি ঃ

From Canada's icy mountains, from Florida's sunny strands,
Where California's fountains roll down their golden sands,
From many a Michigan river, from many a western plain,
We've called him to deliver our souls from error's chain.
What though our handsome city will make an artist smile;
Where every fancy pleases and only man is vile;

কোনো ভারতীয় খ্রীস্টানী শাসনকে তোয়াজ করতে চাইলেও তা ভেসে গিয়েছিল বিবেকানন্দ-প্রমুখের দাহকর বিরুদ্ধ বাক্যস্রোতে। সুতরাং মিশনারিরা সংঘবদ্ধ হয়ে পড়লেন দ্রুত, চতুর্দিকে তাঁদের কনফারেন্স বসল, শোনা যেতে লাগল কণ্ঠে-কণ্ঠে 'ধর্মমহাসভা পৃথিবীর বৃহত্তম জুয়াচুরি' (অনেকের সঙ্গে সেকথা বললেন, রেভারেন্ড জি টি সুলিভ্যান), এগিয়ে এলেন রেভারেন্ড হিউম, রেভারেন্ড পেণ্টিকস্ট, তাঁদের ভারতীয় অভিজ্ঞতার কালি-লেপা কাহিনী নিয়ে (পেণ্টিকস্ট বললেন, "ভারতের সহস্র-সহস্র মন্দিরে রয়েছে শত-শত পুরোহিতানী;...তাঁরা বেশ্যা কারণ তারা পুরোহিতানী, তারা পুরোহিতানী কারণ তারা

In vain with lavish kindness great Vishnu's gifts are shown,
The Christian in his blindness is fighting for the bone.

অনেক কবিতাই লেখা হয়েছিল। ডেট্রইট ইভনিং নিউজ পত্রিকায় ১৮৯৪ ১ মার্চ 'ক্রিশ্চান অ্যাণ্ড হীদেন' নামক ব্যঙ্গ-কবিতার শরলক্ষ্য ছিল মিশনারিরাই। কবিতার লেখক জে ডবলিউ-ডবলিউ মিশনারিদের মনোভাব অনুযায়ী বিবেকানন্দকে শয়তানের পোষাকেই মুড়ে দেন এবং সেই দুর্ধর্ষ শয়তানের বিরুদ্ধে ধর্মযোদ্ধাদের সাজো-সাজো চেহারাকেও ফুটিয়ে তোলেন। উক্ত কবিতার কিছু অংশ ঃ

When Chapman waved the Christian banner
In a mild and graceful manner....
Stirring souls of men and women
Up against the dreadful foeman.
'In hoc signo vinces' shouted,
Showed that dangers all were scouted.

But, alas! that prince of evil,
Most properly yclept the devil,
Sly old barbed-tailed, split-hoofed minion,
Issued from his hot dominion
Full of argument and knowledge,
Gathered in experience college,
Came within these precincts urban,
Wearing flowing robes and turban;
Hoofs and tail beneath them did he,
Called himself Kananda did he,
Put his Hindoo logic neatly,
And overthrew our force completely.

All was silence round about us—
The heathen monk, by George, did rout us—
And were feeling rather sickly
'Till other forces gathered quickly.
They rose like locusts in the air,
Aspiring like a heartfelt prayer;
And here they are from hills and pairies,
Bold-hearted College Missionaries!

Hip! Hip! Hur—stay, our great rejoicing
May have a slightly hasty voicing;
Our solid front may still be hollow,
As who knows, brethren, what may follow?

বেশ্যা"), ভারত-কুৎসার নবজোয়ারে ভেসে গেল ভদ্রসংস্কৃতির শেষ চিহ্নটুকু,১০ যেতেই পারে—"একটি ধর্মান্তরের জন্য যেখানে আমেরিকানদের ২৫-৩০ হাজার ডলার খরচ করতে হয়," সেখানে আমেরিকাতে "একজন হীদেন এসে নিজ ধর্মপ্রচার করবে, দলে-দলে লোক তার পিছনে ছুটবে, হাজার-হাজার লোক তাকে খাতির করবে, অসহ্য! অসহ্য! ক্ষমার অযোগ্য!"

সত্যই অসহ্য, কারণ লোকটি মিথ্যা প্রমাণ করতে চাইছে এই বহুপ্রচলিত সুলিখিত মিশনারি-কবিতাকে ঃ

পুতুল-পূজিকা মাতা দাঁড়ায়ে হোথায়,
ওদের পবিত্র নদী ঐ বয়ে যায়।
মাতৃহস্ত এইবার দূরে ছুঁড়ে দিল
নদীমধ্যে, নিজ বক্ষ হতে সন্তানেরে।
আ-হা শোনো, শুনি আমি, কিবা আর্তধ্বনি,
নারকী রাক্ষস তার ধরেছে শিকার,
কিংবা দেখি অন্ধ রক্ত-নদীর তরঙ্গ
নিয়ে গেল আঁকুপাকু সেই সন্তানেরে।
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ক্রমে কান্নাস্বর,
তবু আসে কাঁপা-কাঁপা হয়ে কর্ণপরে,
তারি মধ্যে স্থির মাতা পাথর-হৃদয়
নির্বিকার শুনে যায় শিশুমৃত্যুরব।
পাঠাও পাঠাও হোথা বাইবেলখানি,
বাণী তার পেঁৗছে যাক অসাড় হৃদয়ে,
হয়ত তখন নারী না-মেরে সন্তানে
স্নেহময়ী মাতা হয়ে পালিবে যতনে। [অ]

লোকটির স্পর্ধা বটে—বিদ্রূপ করছে মিশনারি-সংস্কৃতিতে লালিত হৃদয়বান, বিশেষতঃ হৃদয়বতীদের নানা সঙ্গত প্রশ্নকে!—

মহিলার প্রশ্ন—'একথা কি সত্য, আপনারা সদ্যোজাত শিশুকে গঙ্গায় ফেলে দেন?'

স্বামীজী—'তার আগে বলুন মহাশয়া, আমি শুনেছি, থ্যাংকস্-গিভিং-এ আপনারা সদ্যোজাত শিশু পরিবেশন করেন—একথা কি সত্য?'

১০ জনৈক পাদরির বক্তৃতার অংশ ঃ

"Take India....Caste is universal. Tyranny is immemorial. Woman is degraded. Polygamy abounds. Infanticide is common. Lying and theft are habitual.... Ignorance and slavery and immorality compose the real trinity of Hindustan." (*Discoveries;* 136)

ভারতাগত আর এক পাদরি বললেন ঃ

"The land is full of idols....of all sorts representing gods and goddesses, fabulous creatures, and beasts and reptiles. Many of these images are monstrous, repulsive, obscene.... All the foulest crimes that have ever entered into the imagination of man are to be found in the characters of some of the divinities that they worship." (*Ibid,* 266)

প্রশ্ন—'আপনারা নদীতে কুমীরের মুখে শিশুকে ছুঁড়ে দেন?'
উত্তর—'হ্যাঁ, তবে আমি বেঁচে ফিরেছি।'

আতঙ্কিত মহিলা—'কি ভয়ঙ্কর! আপনাদের দেশে নাকি মেয়ে জন্মালেই তাকে কুমীরের মুখে ফেলে দেওয়া হয়?'
বিনয়ে অবনত বিবেকানন্দ—'নিশ্চয় নিশ্চয়। সেই জন্যই তো এখন ভারতে প্রসবাদি-কর্ম পুরুষদেরই করতে হচ্ছে!'

দয়াবতী মহিলা—আচ্ছা স্বামীজী, ভারতে তো কুমীরের মুখে শিশুদের ফেলে দেওয়া হয়—আমি শুনেছি, বাচ্ছা মেয়েদেরই বিশেষভাবে ফেলে দেওয়া হয়—এ-রকম বৈষম্য কেন?
বেদনায় মুহ্যমান বিবেকানন্দ—'সত্যি, মেয়েদের উপরে অন্যায় নিষ্ঠুরতা। কিন্তু উপায়ই বা কি! কুমীরগুলো এমন পাজি যে, নরম মেয়ে-মাংস ছাড়া আর কিছু খেতে চায় না।... যেমন ধরো না, আমাকেও কুমীরের মুখে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু বজ্জাত কুমীরগুলো আমাকে কালো আর মোটা দেখে বিরক্ত হয়ে চলে গেল। নিজের কালো মোটা চেহারা দেখে আমার যখন লজ্জা হয়, তখন আবার মনে ভাবি, মোটা বলেই তো কুমীর গিলতে পারেনি। তখন ঠাণ্ডা হই।'

'আমি আজো বেঁচে আছি'—স্বামীজী তাঁর সমস্ত ঐশ্বরিক মহিমা নিয়ে খাড়া হয়ে ওঠেন—দ্বিতীয় বুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে হাসতে থাকেন—মিশনারিদের দিকে ইঙ্গিত করে সুবিশাল অহঙ্কারের সঙ্গে বলেন—
'I am the heathen they came to save!'

এক্ষেত্রে একটি পথই আছে সংগঠনে পারদর্শী পাশ্চাত্ত্য ধর্মপ্রচারকদের কাছে—কনফারেন্স বসিয়ে স্থির করা—কি করে 'শয়তানের অনুচরটিকে' দ্রুত শেষ করে ফেলা যায়। সারা আমেরিকা জুড়ে তেমন অজস্র সভার একটি, 'এই মহাদেশে বৃহত্তম' বলে ঘোষিত, ডেট্রইটের মিশনারি-সভা যাতে প্রায় দু'হাজার ডেলিগেট যোগ দিয়েছিলেন (যাঁদের একটা বড় অংশ এসেছিলেন পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে) সেই সভায় এমন প্রচণ্ড ঐকান্তিকতার সঙ্গে খ্রীস্টান-মহিমা এবং হীদেন-কালিমা উদ্ঘাটন করা হয়েছিল যে, ক্রিশ্চান অ্যাডভোকেট পত্রিকা লিখেছিল সোল্লাসে—বিবেকানন্দ-ধোঁয়া উড়ে গেছে—ভাগো বিবেকানন্দ!
"What a splendid antidote the convention was for Vive Kananda and his lectures! Came just in the nick of time. The glamour produced by his suave sophistries vanished like mist before the stalwart faith and living experience of men who have met and coped with heathenism on its ground. *Vale* Kananda!"
রৌদ্র ও বীভৎস রসের আশ্চর্য সাহিত্য অনর্গল প্রবাহিত হতে লাগল রেভাঃ টি ডি উইট ট্যালমাগের কলম থেকে :
"হিন্দুর কাছে গঙ্গা পৃথিবীর সেরা নদী কিন্তু আমার কাছে সমুদ্রগামী বীভৎসতম পাপের প্রবাহ ছাড়া কিছু নয়।...বেনারস হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে পদদলিত করেছে—একটি দানবের থুর পড়েছে আর একটি দানবের বিকট ঘাড়ে। বেনারস দূষিত আবর্জনার রাজধানী, দুর্গন্ধের রাজধানী, অশ্লীলতার রাজধানী।"
"চিকাগো-ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের পক্ষে যত কথাই বলা হোক না কেন, ঐ ধর্ম বস্তুত-

পক্ষে পুরুষকে পশু করে, নারীকে করে নিম্নতম-শ্রেণীর ক্রীতদাসী। ভারতবর্ষের নারী হওয়ার চেয়ে আমি ঘোড়া, গরু, কুকুর হতেও রাজি। একজন হিন্দুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সর্বনাশ হল—তার হিন্দুজন্ম।"

এবার যথার্থ বীররস, উৎসাহ যার অবলম্বন ঃ

"মিশনারিরা মহাব্যস্ত—কেউ গির্জায়, উপাসনালয়ে, হাটে-বাজারে।...হিন্দুধর্ম তার সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গে [বেনারসে] আক্রান্ত।১১...খ্রীস্টধর্ম নামিয়ে দিয়েছে হীদেনধর্মের পতাকা।...সেই দিন ধেয়ে আসছে যখন হিন্দুধর্ম হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়বে।...গোটা ভারতকে গ্রাস করে ফেলবেন খ্রীস্ট।...কুসংস্কার এবং পাপের সকল মন্দির মসজিদ রূপান্তরিত হবে গির্জায়।...মুসলমানধর্মের শেষ মসজিদ ক্রিশ্চান-গির্জায় পরিবর্তিত হবে। শেষ বৌদ্ধমন্দির বদলে হবে খ্রীস্টীয় আলোকের দুর্গ। হিন্দুধর্মের সর্বশেষ পুতুল নিক্ষিপ্ত হবে আগুনের মধ্যে।"

পুরুষের সংগে সমানাধিকারে কিংবা তাদের থেকে অধিক-অধিকারে বিশ্বাসী আমেরিকান নারীদের একাংশ, যাঁরা 'চার্চ-উইমেন' নামে খ্যাত, এক্ষেত্রে পেছিয়ে থাকতে পারেন না, বিশেষতঃ অর্থপ্রিয় মিশনারিদের মুষ্টিবন্ধ হয়ে যখন তাঁরা দীর্ঘদিন কুৎসাকথনে, অর্থদানে ও সংগ্রহে ব্রতী আছেন। সমকালীন একটি আমেরিকান গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, "এঁরা সম্পাদকদের আতঙ্ক, মিশনারি-সমিতিগুলির ভরসা এবং বক্তাগণের সহজ শিকার।.... চড়া কালো সিল্কের বিকট পোষাকে মোড়া এঁরা চিহ্নিত মনুষ্য, স্বচ্ছ নদীতে নগ্ন শিশুদের দেখলেই লজ্জায় আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠেন [অশ্লীলতা-নিবারণী শুচিতায় অবশ্যই; যে-কারণে কুকুরকে প্যান্ট বা গাউন পরাতে, টেবিলের অলজ্জ চতুষ্পদকে মোজায় ঢাকতে এঁরা আন্দোলন করেন; ভক্তিমতী পাপবাদীরূপে সাহায্য করেন আদম বা ইভের বস্ত্রসংগ্রহে], তখন আশে-পাশে পিছনে থাকেন এঁদের মানোমতো সংগী পাদরি ও সংস্কারকেরা।" "এঁরা অগণ্যসংখ্যক। কাংস্যকণ্ঠ, একবগ্গা নীতিবাদী, 'বিশুদ্ধ আলোকপ্রাপ্ত নারীত্ব'-রূপে ঘোষিত ব্যাপারের ধ্বজাধারিণী। অগণিত সমিতি স্থাপন করে, আত্মনির্ধারিত ন্যায়যুদ্ধে

১১ হিন্দুধর্মের দুর্গে ঢুকে তাকে আঘাত হানার দুঃসাহসিকতার মূলে দুটি জিনিস ছিল, একটি, ভারতে খ্রীস্টান ইংরাজের দোর্দণ্ড শাসন, দ্বিতীয়, হিন্দুদের ঐতিহাসিক সহিষ্ণুতা। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত লুই রুশোলে নামক লেখকের *India and Its Native Princes—Travels in Central India and in the Presidencies of Bombay and Bengal* নামক গ্রন্থে মিশনারি-ঔদ্ধত্যের বিপরীত হিন্দু-সহিষ্ণুতার এই চিত্র ঃ

"কোন্ দেশে এমন দৃশ্য সম্ভবপর আমি জানি না—যা আমি বারাণসীর একটি চত্বরে স্বচক্ষে দেখেছি। হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মীয় কূপ জ্ঞানবাপী থেকে দশ পা দূরে জায়গাটি। জ্ঞানবাপী এবং শিবমূর্তির মধ্যবর্তী সেই স্থানে একজন প্রোটেস্টান্ট মিশনারি গাছতলায় চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় খ্রীস্টধর্ম প্রচার করছে, সেই সংগে পৌত্তলিকতার ভ্রান্তি দেখাচ্ছে। তার জমকালো শার্ট-কলারের ভিতর থেকে নির্গত কাংস্যকণ্ঠ আমি শুনছিলাম। যে-সব শ্রোতা বেশ সম্ভ্রমপূর্ণ মনোযোগের সংগে তাকে ঘিরেছিল, তাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো তেড়ে-ফুড়ে উঠছিল ঃ 'তোমরা পুতুল-পূজক! ঐ যে কালো পাথরটাকে তোমরা পূজা করো, ওটাকে খাদ থেকে তুলে আনা হয়েছে—আমার বাড়িতে পাতা পাথরের চেয়ে ওটা বেশি ভালো পাথর নয়।'

"এই ধিক্কারে কিন্তু কোনো গুঞ্জনধ্বনি উঠল না। মিশনারির কথা অবিচলিতভাবে শ্রোতারা শুনল। তবে তার তাত্ত্বিক বক্তব্য সম্বন্ধে শ্রোতারা এখন-তখন দু'একটি প্রশ্ন করতে লাগল, মহাবীর প্রচারক যথাসাধ্য উত্তর দিল। মিশনারির সাহসের প্রশংসা আমরা করেই ফেলতাম যদি-না হিন্দুদের সুপরিচিত সহিষ্ণুতা বেচারাকে ঐ গৌরব থেকে বঞ্চিত করে রাখত। এই সহিষ্ণুতাই মিশনারিদের কাছে সবচেয়ে নৈরাশ্যকর, কারণ তাদের একজন আমাকে বলেছিল, 'আমাদের পণ্ডশ্রম। তুমি কদাপি এমন মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না, যার নিজ ধর্মে এমন বিশ্বাস যে, তার ধর্মের বিরুদ্ধে যত আক্রমণই করা হোক না কেন তা সে শুনে যেতে পারে মুখের রেখামাত্র কুঞ্চিত না করে।'"

অবতীর্ণ হয়ে, এ'রা উৎপীড়িত ও ভয়ত্রস্ত করতেন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের, এবং সর্বত্র শুঁকে-শুঁকে বেড়াতেন 'কোথা পাপ কোথা পাপ'—সে-গন্ধ সেখানেও পেতেন যেখানে পাপের অস্তিত্ব নেই।" পরিবর্তিত পৃথিবীর সমস্যার বিষয়ে অনবহিত এই মহিলাগণ, "বিশেষ ধরনের অনড় এক খ্রীস্টানীর উগ্র সমর্থক" এবং "অনেক সময়েই মনস্তাত্ত্বিকদের মনোযোগের বিষয়বস্তু"—এ'রা ভারতবর্ষ এবং বিবেকানন্দের কুৎসায় মিশনারিদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হবেন, ধরে নেওয়া যায়।

বিদেশে ভারতবর্ষের মর্যাদারক্ষায় অবতীর্ণ বিবেকানন্দকে কী ধরনের উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল, তা সমকালীন আমেরিকান সংবাদপত্রে এক পত্রলেখক বর্ণনা করেছিলেন (ডেট্রইট ফ্রি প্রেস-এ জাস্টিসিয়া; ১৮৯৪, ২৩ ফেব্রুয়ারি) ঃ

"ব্যক্তিগতভাবে কানন্দের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করা হয়েছে, তার খবর জানার পরে আমাদের সম্বন্ধে তাঁর দু'একটি তির্যক মন্তব্য মোটেই বিস্মিত করে না। চিকাগোয় থাকা-কালে সেখানকার ফ্যানাটিক মহিলারা তাঁর যথেষ্ট নিগ্রহ করেছে এবং কুৎসা করেছে—হাঁ, আমেরিকান মহিলারা! এই শহরে (ডেট্রইটে) প্রায় প্রতি ডাকে তাঁর নামে এসেছে অত্যন্ত অপমানজনক রাশি-রাশি চিঠি। সাধারণের সামনে শব্দমাত্র উচ্চারণ করার আগে এক মহিলা, ধিক্ তাঁকে, নিতান্ত কটুভাবে তাঁকে মুখের উপর সরাসরি আক্রমণ ও নিন্দা করেন, সেই বাড়িতে, যেখানে বিবেকানন্দ আতিথ্য নিয়েছিলেন এবং উক্ত মহিলাটিকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বক্তৃতা-ব্যুরোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যখন তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন, তখন আমাদের দেশের রীতি-নীতির সঙ্গে তিনি পরিচিত নন, এই সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত অন্যায় শর্ত তাঁর উপরে আরোপ করে জঘন্য ব্যবহার করা হয়েছিল এবং যতপ্রকার সম্ভব ব্যবসায়িক নীচতা দেখানো হয়েছিল। আমাদের গোঁড়া গির্জা-গুলির বেদীতে দাঁড়িয়ে পাদরিরা প্রায় বন্য ভাষায় তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন, যাঁরা তিনি কী বলেছেন সে-বিষয়ে মাত্র সংবাদপত্রের অসম্পূর্ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে অতীব বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন! কী সাহসে জানি না, এইসব ব্যক্তি তাঁর কথা না শুনেই তাঁর বিচার করেন।"

পরিস্থিতিটি খুলে বর্ণনা করেছিল ডেট্রইট ট্রিবিউন পত্রিকা এক সম্পাদকীয় রচনায় ঃ

"খ্রীস্টধর্মের সর্বনাশকাল সমুপস্থিত, যেহেতু অন্ধকার-নিমগ্ন কোনো একটি হিন্দু বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে উত্তম 'রাণীর ইংরেজিতে' জানিয়েছেন, ভারতে প্রেরিত মিশনারিরা তাঁর স্বদেশীয় ধর্ম সম্বন্ধে সুবিচার করেন নি—একথা কোন্ নিরপেক্ষ বুদ্ধির কাছে বিশ্বাস-যোগ্য মনে হবে? সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন কেউ ভেবে উঠতে পারছে না, কেন খ্রীস্টীয় জ্ঞান এবং সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম প্রতিভূরূপে স্বীকৃত বিশ-পঁচিশ জন প্রতিভাবান রক্ষণশীল পাদরি এক দরিদ্র প্যাগানকে প্রকাশ্যে বিধ্বস্ত করতে গির্জা-বেদীর গদী চাপড়ে ধুলো ওড়ানোর প্রয়োজন বোধ করলেন—যে-প্যাগানটি একলা বিদেশে দাঁড়িয়ে তাঁর পিতৃপুরুষের ধর্মের পক্ষসমর্থন করেছেন, যখন তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে আছে লক্ষ-লক্ষ খ্রীস্টান, বহুযুগ ধরে যাদের রীতি-নীতি, অভ্যস্ত অনড় সামাজিক জীবন, ও ধর্মজীবন গঠন করে দিয়েছে খ্রীস্টান মানুষ ও খ্রীস্টান শিক্ষকেরা।...

"সোজা ভাষায়, একটি বৃহৎ শহরের খ্রীস্টান ধর্মযাজকেরা অন্য সব প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে একযোগে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করবেন একজন অবিশ্বাসী হীদেনের বিরুদ্ধে, যিনি হয়ত কথাসূত্রে গির্জার চলতি ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দু'চার কথা বলেছেন—ব্যাপারটা ওঁদের পক্ষে ঠিক মর্যাদাজনক নয়। শ্রোতাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কোনো শ্রদ্ধা থাকলে কোনো পাদরির পক্ষে বলা সম্ভব নয়—পৃথিবীতে মাত্র একটি ধর্মই আছে! মনে রাখা ভাল, অধিকাংশ মানুষই সারা সপ্তাহ মাথায় ঘিলু নিয়েই ঘুরে বেড়ায় [অর্থাৎ গির্জার রবিবারের

ভাষণের কাছে তা বাঁধা রেখে আসে না], এবং একথা ধরে নেওয়া যায়, যে-মত তারা বোঝে বা বিশ্বাস করে, তাকেই আঁকড়ে থাকবে। আলোচনার মুখ বন্ধ করা বৃথা নির্বুদ্ধিতার কাজ। এটা সত্যই উদ্ভট ব্যাপার—কোনো প্রোটেস্টাণ্ট পাদরি পূর্বাহ্ণে স্থির করে দেবেন, তাঁর অনুগত 'মেষগণ' কেবল তাঁর পুরো অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রচারকগণের ভাষণই শুনে যাবে!! ধর্ম-বিতর্কে ফল নেই একথা সত্য, কিন্তু অন্যস্থানের মানুষের চিন্তা ও চিন্তাপ্রণালী জানার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। মিশিগানের পরলোকগত এক সমাদৃত ও সম্মানিত বিশপ প্রাচ্য ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠসূত্রে বলেছিলেন, 'ধর্মবিষয়ে তুলনামূলকভাবে পড়বার সময় এসে গেছে।' বিবে-কানন্দ সেই বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।"

সহস্র-সহস্র ভিন্নধর্মী মানুষের দ্বারা পরিবৃত সেই নিঃসঙ্গ হীদেনটি কিন্তু এমনই আগ্নেয় অস্তিত্ব যে, কিছু সংখ্যক মানুষকে পুড়িয়ে খাদহীন সোনা করলেন; আর বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ, তাদের ভিতরে স্বর্ণগত কোনো পদার্থ ছিল না বলে, তাঁর ঝলকে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল। ডেট্রইটে স্বামীজী যখন এক ইউনিটারিয়ান চার্চের মঞ্চে প্রথম বক্তৃতা করেছিলেন, এবং ভারতীয় সমাজের নৈতিক শক্তির কথা বলে ধর্মান্তরকরণের অসারত্বের কথা জানিয়েছিলেন, তখন ঐ সভার রক্ষণশীল সভাপতি বিশপ নিন্‌ডে পড়ে-ছিলেন বিপদে, অতঃপর তাঁর মুখাপেক্ষীদের সন্তুষ্ট করতে হয়েছিল তাঁর ভারতভ্রমণের কিছু অরুচিকর অভিজ্ঞতার কথা বলে। সংবাদপত্রে ঝড় উঠেছিল, বিবেকানন্দের সমালোচনায় ভরে গিয়েছিল তাদের পৃষ্ঠাগুলি, কিন্তু যেহেতু সত্য বলার মতো সাহসী আমেরিকানের অভাব কখনই হয় নি, তাই জনৈক ও পি ডেলডক (মিসেস বার্কের সন্দেহ, ইনি ছদ্মনামে কোনো বিখ্যাত লেখক) বিবেকানন্দের পক্ষে কলম তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যখন আমরা শত-শত মিশনারি ভারতে পাঠাচ্ছি, তখন একজন মাত্র হিন্দু-মিশনারিতে এত আপত্তি কেন? একটু নিরপেক্ষ ন্যায়পরতার প্রয়োজন নেই কি?' তারপর আরও খুলে বললেন, 'আমি খুবই জানি, বিবেকানন্দ বিশপ নিন্‌ডের [নিন্দাত্মক] পত্রের কোনো উত্তর দেবেন না, কারণ ধর্ম-বিতর্কের ক্ষেত্রে নীরবতাই তাঁর শ্রেয়ঃনীতি। তিনি [বিবেকানন্দ] বলেন, বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোনো বিবাদ থাকা উচিত নয়, কারণ যিনি অপর ধর্মের বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন তিনি নিজ ধর্মের উপরে টেনে আনেন কলঙ্ক। বিবেকানন্দ খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নি। তিনি কেবল এই বলেছেন—বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধর্ম—এই পর্যন্ত। খ্রীস্টধর্ম কিছুসংখ্যক মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে সমর্থ, অপরপক্ষে হিন্দুধর্ম ভারতের মানুষের প্রয়োজন অধিকভাবে পূরণ করে থাকে, কারণ তা তাদের উচ্চতর নীতি শিক্ষা দেয়, যাকে অন্যান্য জাতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।"

ই জে নামক আর এক পত্রলেখক তীক্ষ্ন বিদ্রূপের সঙ্গে লিখেছিলেন, "আমাদের খ্রীস্টধর্মের পক্ষে অনেক বেশি গৌরবের ব্যাপার হত যদি বিবেকানন্দের এই বক্তব্য বিশপ নিন্‌ডে মেনে নিতেন যে, ভারতবর্ষে তুলনামূলকভাবে অল্প মদ্যাসক্তি রয়েছে। পরিবর্তে তিনি বিবেকানন্দের কথার ভ্রান্তি প্রমাণে অগ্রসর হলেন, যদিচ স্বীকার করে নিলেন, একটি খ্রীস্টান দেশ [ইংলন্ড], বৌদ্ধধর্মের চেয়ে অনেক উচ্চ ধর্ম ও সংস্কৃতির অধিকারী বলে যে দাবি করে, সে ভারতীয়গণের মতো ধর্মপ্রাণ মিতাচারী মনুষ্যগণের মধ্যে উক্ত পাপাভ্যাস চালু করছে কেবল মুনাফার অতৃপ্ত লালসায়! বিবেকানন্দ আর আমাদের এমন কী নিন্দা করেছেন—ওর দ্বারা যতখানি কলঙ্কের ছাপ লেগেছে আমাদের অহঙ্কৃত খ্রীস্টধর্মের গায়ে!" ইনি আরও লিখেছিলেন, "আমাদের মিশনারিরা কি যাদের আমরা প্যাগান-ধর্ম বলি তাদের বিষয়ে বিবেকানন্দের মতো সম্ভ্রম ও মাধুর্যসূচক আচরণ করেন? তিনি এখানে ধর্মান্তর করতে আসেন নি, বস্তুতঃপক্ষে শেষ বক্তৃতায় সে-জাতীয় কোনো অভিপ্রায় নেই তিনি জানিয়েছেন।...সত্য কথা বলতে কি, তিনি যখন প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যে মুক্তির

(আমাদের স্যালভেশনের প্রতিশব্দ) জন্য আকৃতিময় প্রয়াস লক্ষ্য করেন, সে-মানুষ যে-ধর্মমত বা পথেরই হোক না কেন—তখন তাঁর সেই প্রশস্ত উদারতা আমাদের মাথা লজ্জায় নামিয়ে দেয়। একটি ইউনিটারিয়ান গির্জায় ক্রিশ্চান, ইহুদী এবং অন্য নানা ধরনের শ্রোতার সামনে একজন মেথডিস্ট বিশপ [নিন্ডে] জনৈক বৌদ্ধ [হিন্দু] সন্ন্যাসীকে পরিচায়িত করে দিচ্ছেন—মনে হয়েছিল এটা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বেড়া ভেঙে ফেলার উদ্যোগ। কিন্তু কি দুঃখের কথা, বিশপ-মহোদয় তাঁর এই প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য পরদিন প্রভাতী সংবাদপত্রসমূহে এক-চতুর্থ কলমব্যাপী ক্ষুদ্রাক্ষরে ঠাসা ছাপা বক্তব্যসহ ক্ষমাপ্রার্থনা করা প্রয়োজন মনে করলেন, কারণ—উক্ত সভায় জনৈক বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ [বিবেকানন্দ] গোঁড়া খ্রীস্টানী মত প্রচার করেন নি!!"

ডাঃ রাব্বি গ্রসম্যান তাঁর গির্জার ভাষণে ['বিবেকানন্দ আমাদের কী শিখিয়েছেন?'] বলেছিলেন, "বিবেকানন্দের ধর্ম, মতবাদের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়। আমাদের মতও অনেক সময়ে সীমা লঙ্ঘন করে, তবে ধর্মের শালীনতার সীমাকে!" "আমরা পাশ্চাত্ত্য-জগতের মানুষ, আমাদের আকাশে অবস্থানকারী এক ঈশ্বর আছেন। বিবেকানন্দের ঈশ্বর আছেন মাটির পৃথিবীতেই। আমাদের ঈশ্বর শুরু থেকেই দিব্যভাবে অলস। কেবল ব্যতিক্রম ঘটে যখন হতভাগ্য ব্যক্তিরা প্রতি রবিবার তৈলাক্ত প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বর-মহোদয়কে কিছু কাজকর্ম দেন এবং বহুপ্রকার করুণা বিতরণের দায়িত্বে নানাস্থানে প্রেরণ করেন। আসুন আমরা এই হিন্দুর কাছ থেকে শিখে নিই—ঈশ্বর ছিলেন আছেন থাকবেন চিরদিন, সর্বত্র সর্বসময়—তিনি আছেন প্রতিটি ফুলে-ফলে, আছেন আকাশে-বাতাসে, আছেন আমাদের প্রতিটি হৃদয়স্পন্দনে। গত শনিবার সন্ধ্যায় কানন্দ বলেছেন, আমি তোমাদের যীশুকে গ্রহণ করি, যেমন গ্রহণ করি সকল স্থানের সকল কালের শ্রেষ্ঠ ও মহান-দের। কিন্তু তোমরা আমাদের কৃষ্ণকে হৃদয়ে তুলে নেবে কি? না, সে-কাজ তোমরা করতে পারবে না, করতে সাহস করবে না—তথাপি তোমরা সংস্কৃতিসম্পন্ন আর আমি হীদেন!'"

বিবেকানন্দের ভাষণের সুরে সুর মিলিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন ডেট্রইটের আর এক ধর্ম-যাজক—রেভারেন্ড রীড স্টুয়ার্ট, বিষয়—"প্রাচ্য আমাদের কাছে কোন্ দ্বার খুলে দিয়েছে?" বিবেকানন্দের মতো করেই তিনি বলবার চেষ্টা করেছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রকৃতির কথা। বিবেকানন্দের কথা তিনি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী বাঁচবার অধিকার আছে; বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি—সভ্যতার নানা পর্যায়ে অবস্থান করে; কেউ কোনো এক বিষয়ে উন্নত, অন্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্তী, তাই বলে কোনো এক বা একাধিক বিষয়ে নিজেদের উন্নতির জন্য অপরকে ধিক্কৃত করার অধিকার কারো নেই—যেখানে অন্য বিষয়ে অন্য জাতি উন্নত হয়ে আছে। শ্রেষ্ঠ বস্তুর আদান-প্রদানের দ্বারাই কেবল লাভবান হতে পারে বিভিন্ন জাতি। "অপর জাতির দোষ দেখাবার জন্য অর্ধ পৃথিবী অতিক্রম করিয়ে মিশনারি পাঠাবার প্রয়োজন নেই।" মিশনারিরা প্রাচ্য ঘুরে এসে সে-সব দেশের পাপের কথাই বলে থাকেন এদেশে, অথচ যখন সে-দেশে ছিলেন, তখন সেখানে পাশ্চাত্ত্যের গুণের কথাই শুনিয়েছেন! তাঁদের বইয়ে কেবল পাওয়া যায়, জগন্নাথের রথের তলায় ঝাঁপ দিচ্ছে ধর্মান্ধ মানুষ, বিধবারা পুড়ছে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে, ভক্তরা নানাভাবে আত্মনিগ্রহ করছে, বৃদ্ধ পিতামাতা অবহেলা ঔদাসীন্যের জন্য মরছে, মায়েরা ছুঁড়ে দিচ্ছে ভয়ানক কুমীরের মুখে নিজের শিশু সন্তানকে। এই অংশ-সত্যের কারবারীদের সতর্ক করে বলেছিলেন রেভারেন্ড রীড—এক্ষেত্রে আমেরিকা থেকে ঘুরে গিয়ে প্রাচ্য মানুষেরাও বলতে পারেন—এখানে প্রতি সহস্রে এতজন খুনে, এতজন চোর, এখানে মদের স্রোত বইছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের ছড়াছড়ি, সরকারী ও বেসরকারী দুর্নীতি প্রচুর, শিশুহত্যা কম নয়। রেভারেন্ড রীড অপরপক্ষে প্রাচ্য

মিশনারিদের সতর্ক করেও বলেছিলেন, ক্রিশ্চান মিশনারিদের ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন তাঁরা না করেন। জাতিসমূহ যদি নিজেদের শ্রেষ্ঠবস্তুর বিনিময় করে, তবে কত না মঙ্গল ঘটবে! "এক জাতির অলঙ্কৃত হস্তীদন্ত অন্য জাতির স্বর্ণের মধ্যে কি চমৎকার ভাবেই না বসিয়ে দেওয়া যায়! প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা স্থাপন করা উচিত পাশ্চাত্যের বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবোধের উপরে।"

কিন্তু পাদরিদের মধ্যে গ্রসম্যান বা রীড—এ'রা সংখ্যাগুরু নন—হিউম, কুকদেরই প্রাধান্য সেখানে। সংবাদপত্রে তার ফলে যে-মতযুদ্ধ বেধেছিল, বিবেকানন্দ যদিও সযত্নে তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন, বীরচাঁদ গান্ধী বা পুরুষোত্তম রাও তেলাং তা করেন নি, এবং তাঁরা উপযুক্তভাবে ঢালের অপরদিকটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ, বিতর্কে প্রবেশ না করে, কেবল নিজের কথাই বলে গিয়েছিলেন—আর সে কি দারুণ কণ্ঠ!—

"তোমরা খ্রীস্টান নও! না, জাতিগতভাবে তোমরা খ্রীস্টান নও! যাও, খ্রীস্টে প্রত্যাবর্তন করো! যাও তাঁর কাছে, এই পৃথিবীতে যাঁর মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও ছিল না। 'পাখীর আছে নীড়, পশুর আছে আস্তানা, কিন্তু মানবপুত্রের নেই মাথা রাখার কোনো স্থান।' বিলাসের ভাষায় তোমাদের ধর্ম প্রচারিত—ভাগ্যের কি পরিহাস! ছেড়ে দাও এই রীতি, যদি বাঁচতে চাও! ছেড়ে দাও! যদি বাঁচতে চাও, ফিরে যাও তাঁর মধ্যে। ঈশ্বর আর কুবেরের উপাসনা একসঙ্গে হয় না। তোমাদের এই সম্পদ—খ্রীস্টের কাছ থেকে? এই অধর্মের কথাকে খ্রীস্ট প্রত্যাখ্যান করবেন। কুবের যে-সম্পদ দেয়, তা ক্ষণস্থায়ী—যথার্থ কীর্তি আছে প্রভুর মধ্যেই। যদি তোমরা তোমাদের অভূতপূর্ব সম্পদ এবং খ্রীস্টের আদর্শ মেলাতে পারো, ভালই। যদি না পারো তাহলে সম্পদ ছেড়ে তাঁর কাছে ফিরে যাও। ছেঁড়া কাপড়ে থাকাও ভাল যদি খ্রীস্ট সঙ্গে থাকেন, আর তাঁকে ছেড়ে প্রাসাদে থাকলেও অধঃপাত।"

"কোনো নির্দয় সমালোচনা করতে চাই না, তবু একটা কথা বলব। তোমরা একজনকে শিক্ষা দিয়ে, গড়ে-পিটে তৈরী করে, পোষাক-পরিচ্ছদে সাজিয়ে, মাইনে-সহ পাঠিয়ে দাও—কিসের জন্য? তারা আমাদের দেশে গিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষ, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমস্ত কিছুকে নিন্দা করে অভিশাপ দেবে বলে! মন্দিরের কাছে এগিয়ে গিয়ে তারা বলবে, 'তোমরা পৌত্তলিক, তোমরা নরকে যাবে।'...এই তোমরা, যারা নিন্দা-মন্দ করার শিক্ষা দাও, তোমাদের উদ্দেশ্যে যদি আমি অত্যন্ত সদুদ্দেশ্যেও সমালোচনার বাক্যমাত্র উচ্চারণ করি, তখনি তোমরা কুঁকড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে, 'কদাপি আমাদের স্পর্শ করো না, হুঃ, আমরা হলাম আমেরিকান!'...যখন তোমাদের পাদরিরা আমাদের সমালোচনা করতে অগ্রসর হন, তাঁরা যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন ঃ যদি গোটা ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে উঠে ভারত-মহাসাগরের তলায় যত পাঁক আছে সমস্ত তুলে নিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে ছুঁড়ে দেয়, তাহলেও তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা করছ তার লক্ষাংশের একাংশও ফেরত দেওয়া হবে না।"

"তোমাদের দম্ভ আর বড়াইয়ের শেষ নেই। কিন্তু বলতে পারো, অস্ত্র ছাড়া তোমাদের খ্রীস্টধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? সমস্ত পৃথিবীতে তেমন একটি জায়গা দেখাও। একটি মাত্র জায়গা—একটি মাত্র—দুটি নয়—খ্রীস্টধর্মের ইতিহাস থেকে তার উল্লেখ খুঁজে এনে দাও। আমি জানি [হে আমেরিকানগণ!] তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন—না হয়ে উপায় ছিল না, নচেৎ খুন হতে হত। এই ইতিহাস।"

"এই দেশে তোমরা সেই মানুষের প্রশংসা করো যে রাগে না, আর তাকে নস্যাৎ করো যে রেগে যায়। অথচ এই দেশের হাজার-হাজার লোক প্রতিদিন ঈশ্বরকে রাগী আসামীর ভূমিকায় দাঁড় করাচ্ছ। যখন রোম পুড়ছিল তখন নীরো প্রেমসে বীণা বাজাচ্ছিলেন বলে

সবাই নীরোকে ধিক্কার দেয়, অথচ তোমাদেরই দেশের হাজার-হাজার মানুষ ঈশ্বরকে নীরোর কাজ করতেই দেখতে চাইছে।"

'পৃথিবীর সভ্যতায় ভারতবর্ষের দান'—এই বিষয়ে স্বামীজী একটি উদ্দীপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানে দর্শনে সঙ্গীতে সাহিত্যে শিল্পে ভারতবর্ষ তার সম্পদ উজাড় করে দান করেছে পৃথিবীকে। বিনিময়ে পৃথিবী কী দিয়েছে তাকে? অগণিত পাণিপথ ও পলাশীর শ্মশান-প্রান্তরের দিকে অশ্রুরক্ত আঁখি মেলে বিবেকানন্দ বললেন :

"বিনিময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীর কাছ থেকে পেয়েছে কেবল ধিক্কার, অভিশাপ, ঘৃণা। পৃথিবী, ভারতের সন্তানদের রক্তস্রোতের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে, তাকে হৃতসর্বস্ব নিঃস্ব করেছে, তার পুত্রকন্যাকে করেছে ক্রীতদাস। সেই ক্ষতের উপরে এখন সে অপমানের নুন ছড়াচ্ছে—তার কাছে এমন একটি ধর্মকে প্রচার করছে যা অপর ধর্মের বিনাশের দ্বারাই পুষ্ট হতে পারে। কিন্তু ভারত ভীত নয়। অন্য কোনো জাতির কাছে সে কৃপাভিখারী নয়। আমাদের একমাত্র দোষ আমরা জয় করবার জন্য লড়াই করি না। কিন্তু আমরা সত্যের নিত্যরূপে বিশ্বাস করি।...ভারতের বাণী—শান্ত মহত্ত্ব, ধৈর্য, মাধুর্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। কোথায় গেল গ্রীকরা—পৃথিবীর একদা-অধীশ্বর যারা? অদৃশ্য তারা। কোথায় গেল রোমকরা, যাদের রণবাহিনীর পদক্ষেপে টলমল করত পৃথিবী। নেই তারা। কোথায় গেল আরবেরা—পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যারা ছুটতে পেরেছিল তাদের পতাকা নিয়ে আটলাণ্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত? কোথায় গেল লক্ষ-লক্ষ মানুষের নির্মম ঘাতক সেই স্পেনীয়রা? তারা প্রায় নেই এখন। হৃদয়বান জাতির সন্তানগণের নৈতিকতাকে ধন্যবাদ, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। পৃথিবী একদিন তার জয়োৎসবের দিন দেখবে।"

॥ ৪ ॥

মিশনারিরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিবেকানন্দের উপরে। এবং তাঁদের মদত দিলেন তাঁদেব কিছু ভারতীয় ভ্রাতা। তাঁরা সকলে আবার খ্রীস্টান নন। ভারতীয় সভ্যতার মহান পক্ষ-সমর্থনকারীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও কুৎসার সংগ্রামে মিশনারিরা পেলেন কিছু ভারতীয়ের সমর্থন?? কথাটা বিচিত্র লাগলেও সত্য। ঐ ভারতীয়গণ যে, আমাদের অতীব দোষপূর্ণ ভারতীয় সমাজের সাধু সংস্কারক! সংস্কারই তাঁদের জীবনব্রত। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ যদি দেখিয়ে দেন, বহু দোষ সত্ত্বেও পৌত্তলিক ভারতীয় সমাজের ধর্মবোধ অন্য কারো চেয়ে কম নয়—তাহলে অবশ্যই সুসংস্কৃত সংস্কারকদের অসুবিধা ঘটে। ধরা যাক, ভারতীয় সমাজে প্রচুর দোষ আছে, সেগুলির সংস্কার আবশ্যক, তাহলে সেই কাজের জন্য সংস্কারকও দরকার, নিশ্চয়, অস্বীকার করে কে? কেবল প্রশ্ন করা যায়, সংস্কারকেরা কি বিদেশে গিয়ে স্বদেশের কুৎসা না-করে দেশহিত করতে পারতেন না? এঁদের পক্ষে অবশ্য বলা যায়, এঁরা নিতান্ত সাধুতায় ও সরলতায় নিজেদের নোংরা কাপড় বিদেশের ঘাটে আছড়ে কেচেছিলেন। সে-ক্ষেত্রে এ প্রশ্নও উঠবে—তাই যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁদের উক্ত সাধুতা ও সরলতাকে তাঁরা পাশ্চাত্যসমাজের দোষ-উদ্ঘাটনেও কেন প্রয়োগ করলেন না?[১২]

১২ এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছেন, তা স্মরণ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ, যিনি ব্রাহ্মসমাজের মানুষ এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে জীবনদৃষ্টির ব্যাপারে যাঁর বহু পার্থক্য ছিল, তিনি ১৯২০ সালে শ্রীযুক্ত রায়ের কাছে, বিদেশে ভারতের কুৎসাকারী ভারতীয়দের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে স্বামীজীর আত্মমর্যাদার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "আমরা এই স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব লজ্জা

সর্বোপরি, বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগের চরম অনুক্ত কারণ—তাঁর অদ্ভুত জনপ্রিয়তা। সেটা মোটে সহ্য করা যায় না। স্বামীজী বলেছিলেন, সব যায়, পোড়া হিংসাটা যায় না।

এইখানে, একটু থেমে, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক মত-পন্থীদের সুবিধার্থে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে দেওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের অনেকে যে, বিবেকানন্দকে শত্রুজ্ঞান করেছিলেন, তা কেবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশে নয়, তাঁদের সম্প্রদায়-স্বার্থের দিক দিয়েও। যে-ব্রাহ্মসমাজের শক্তি পূর্ব থেকেই ক্ষয় পাচ্ছিল (এ-বিষয়ে 'যথার্থ মহাত্মা' অধ্যায়ে আমরা অনেক সংবাদ দেব), তার উপরে বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত হিন্দু-উত্থান চূড়ান্ত আঘাতের মতো এসে পড়ে। স্বতঃই অনেক ব্রাহ্মসমাজীর চিত্তে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতিতে বিবেকানন্দের প্রতি অপ্রীতি জেগেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণও এ-ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন (সে-প্রসঙ্গ পরে)। ব্রাহ্ম-বিবেচনায়, এ-ব্যাপারে প্রধান দোষী দুই ব্যক্তি—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং বিবেকানন্দ-স্বামী। বিজয়কৃষ্ণের প্রভাব জনজীবনে ব্যাপক হয়নি, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এককালের এই সম্মানিত প্রভাবশালী আচার্য বহু ব্রাহ্মকে উক্ত সমাজ থেকে সরিয়ে এনে ভিতরে ধ্বংস ঘটিয়েছিলেন। আর বিবেকানন্দ (হায়, তিনিও একদা-ব্রাহ্ম) হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ ঘটিয়ে, এবং স্বদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও আত্মসংস্কারের আন্দোলন এনে, ব্রাহ্ম-সংস্কার-আন্দোলনের বিস্তারের পথ সংকুচিত করে দেন। মজুমদার যে, স্বামীজীকে ব্রাহ্মসমাজের বিনাশের অন্যতম কারণ মনে করেছিলেন, তা অধ্যাপক রাইটকে ১৮৯৪, ২৪ মে তারিখে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠিতে পাই। উক্ত চিঠিতে স্বামীজী ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মধর্ম ও তার নেতাদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব খুলে লিখেছিলেন (পত্রটি অল্প পরে বেশি অংশে উপস্থিত করব)। তার মধ্যে আলোচ্য প্রসঙ্গে পাই, "যদি মজুমদার মনে করেন, আমি তার [ব্রাহ্মসমাজের] মৃত্যুর অন্যতম কারণ, তাহলে তিনি খুবই ভুল করেছেন। আমি এখনো তার সংস্কারপ্রচেষ্টার বড় সমর্থক। কিন্তু ঐ ফক্কা-ধর্ম প্রাচীন বেদান্তের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ নয়। এখানে আমি কি করব? আমার দোষ কোথায়?"

হিন্দু-উত্থানের ফলে ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতির বিষয়টি সমকালীন পত্র-পত্রিকায় ইতস্ততঃ আলোচিত হয়েছিল। মজুমদার তাঁর ইনটারপ্রেটার কাগজে ব্রাহ্মসমাজে সাধু সন্ন্যাসী ফকির ইত্যাদির প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রীতি দেখে তিক্ত-বিরক্ত মন্তব্য করেন। ভক্তির অতিনাটকের প্রতি ব্রাহ্মদের আসক্তি তাঁর কাছে মহাপাপ বলে মনে হয়েছিল, এবং এ-ব্যাপারে দায়ী করেন ব্রাহ্মসমাজত্যাগী আচার্য বিজয়কৃষ্ণকে।[১৩] মজুমদারের এ মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিল লাইট

হীনতা ভীরুতা প্রচার করে এদের কাছে আদর কাড়তে ছুটব? তা হয় কখনো? এরা আর যাই পারুক না কেন কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না নিশ্চয় জেনো। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই-সেই গুণ, সেই-সেই সম্পদ, সেই-সেই সাধনার কথা বলি যার দ্বারা ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাই তো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। আমার মনে আছে নিবেদিতাকে তিনি কীভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্য-কীর্তির তত্ত্বে; তাঁর কাছে বলেননি, আমরা দীনহীন, কৃপার পাত্র। বলতেন ঃ ভারতের বড় দিকটার পানে চোখ তুলে তাকাও, তার বাইরের দারিদ্র্যকে বড় করে দেখো না। আমেরিকার সামনে তিনি মাথা উঁচু করে বলেছিলেন, ভারতের ধর্মতত্ত্বের মহিমার কথা।"

১৩ ইনটারপ্রেটার লিখেছিল ঃ

"It is a notorious fact that many of our fellow-religionists have begun to show a strange fancy for Sanyasis, Fakirs, Sadhus, and religious mountbanks of all sorts. This is largely owing to the defection of a well-known Brahmo

অব দি ইস্ট পত্রিকা ১৮৯৪ জুন সংখ্যায়। 'দ্রুত ভাঙনের পথে ব্রাহ্মসমাজ,' এই পত্রিকা বলেছিল, এবং বিজয়কৃষ্ণের নিন্দাকারী মজুমদারকে সমঝে দিয়েছিল এই বলে—ধারাবাহিক ভাবসমাধির মধ্যে বর্তমান আচার্য বিজয়কৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতায় কেশবচন্দ্রের চেয়ে অনেক উন্নত। প্রাণহীন মতের কচ্‌কচি ছেড়ে যদি ব্রাহ্মরা আনন্দ ও শান্তিদায়ক ধর্মের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না—সম্পাদক তীক্ষ্ণভাবে জানিয়েছিলেন। এই সম্পাদকের বিষয়ে আমরা অধিকন্তু জানাতে পারি, তিনি বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন।

হিন্দু-উত্থান সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র মেসেনজারেও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। অ্যানী বেশান্ত "এলাহাবাদের কোনো পুতুলের প্রসাদ" খেয়েছেন, "কুম্ভমেলার সময়ে গঙ্গাস্নান" করেছেন এটা মেসেনজারের কাছে ঘৃণাপূর্ণ বিরক্তির কারণ হয়েছিল, সাধারণ সমাজভুক্ত "বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের" কাছে মনে হয়েছিল, বেশান্তের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধারণাসমূহ "আধা হজম-হওয়া স্থূল বস্তু।" মেসেনজারে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ, "মধ্যযুগীয় ধ্বংস ও অধঃপতনের জগৎ থেকে সদ্য-নির্গত অর্ধশিক্ষিত হিন্দুজাতির" সম্বন্ধে বেশান্তের কতকগুলি লম্বা দাবিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল, ভারতীয় আর্য সভ্যতার পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির কাছে ঋণের ব্যাপারটি। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানগরিমার দ্বারা 'অর্ধশিক্ষিত হিন্দুদের' ঊর্ধ্বে আসীন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতগুলিকে ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাইট অব দি ইস্টের ১৮৯৪ মার্চ সংখ্যায়, তার দ্বারা অন্ততঃ এইটুকু দেখা গিয়েছিল, 'সুপণ্ডিত কিন্তু দলীয় ধারণায় আবদ্ধ' ব্রজেন্দ্রনাথের বিপরীত বক্তব্যের সমর্থক কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত আছেন।

নববিধান সমাজ এইকালে এমনই স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে যে, বন্ধুদের সহজ মন্তব্যকেও অসহজ অর্থে গ্রহণ করতে থাকে। লোকগণনার ফলে দেখা গেছে, ব্রাহ্মরা কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ এবং তাঁদের সংখ্যা চার হাজারের সামান্য বেশি, সুতরাং তাঁদের উচিত আর্য-সমাজীদের মতো প্রচার-উৎসাহ গ্রহণ করে অন্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়া, বিশেষতঃ সামনেই রয়েছে ছোটনাগপুর, যেখানে খ্রীস্টান মিশনারিরা তেড়ে-ফুড়ে কাজ করছে, সেখানে ব্রাহ্ম-মিশনারিরা যেতে পারেন—বেঙ্গলী কাগজের এই মন্তব্য (১৯০২, ১৮ মে) ইউনিটি অ্যান্ড দি মিনিস্টার কাগজকে অত্যন্ত চটিয়ে দেয়। তাঁরা রাগের মাথায় খ্রীস্টান মিশনারিদের বিষয়ে একটা সত্য কথ বলে ফেলেন—ওঁদের মতো 'ভাত-খ্রীস্টান বা রুটি-খ্রীস্টান' তৈরি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমরা সেরা লোকদেরই দলে আনতে চাই, 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মানবতা-বোধের দ্বারা চালিত হয়েই অপরের উপকার করা উচিত, ধর্মান্তরকরণের জন্য নয়।' এক্ষেত্রে বেঙ্গলীর 'সদুপদেশকে' তাঁরা 'তামাশা' ছাড়া আর কিছু মনে করেন নি।

ব্রাহ্ম থেকে খ্রীস্টান হয়েছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়)—যথেষ্ট অনুকম্পার সঙ্গে সোফিয়া কাগজে ১৮৯৪ জুন সংখ্যায় সমকালীন ব্রাহ্মসমাজের

missionary, one of the earliest and best followers of Keshub Chunder Sen in times gone by. This gentleman, the lineal descendant of a Vaisnava saint, took to the old Hindu devotee ways after he got estranged from his leader, and found no satisfaction elsewhere. His example led away a good many at first, and since then a regular epidemic has grown in the direction of superstituous reverence for the theatricals of Hindu devoteeism. The disease is most prevalent in the Sadharan Somaj, but it is slowly infecting every other section of the community. We think it is high time to draw notice to the evil, and if possible to provide for it."

দুর্গতির কথা লিখেছিলেন। বোঝাতে চেয়েছিলেন, বিদেশীয় বস্তু ভারতীয় ধর্মে ঢোকাবার দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, তার থেকে পুরো খ্রীস্টান হওয়া ভাল ঃ

"যাঁরা বিদেশীয় মতাদর্শ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চান, তাঁদের কাছে ব্রাহ্মসমাজের ভাগ্য বিষাদজনক সতর্কবাণী। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ ও প্রচারকগণ তাঁদের অভিনব মতের সমর্থন খুঁজতে গোটা হিন্দুশাস্ত্র আঁটঘাট করেছেন, তাকে হিন্দু-পোষাক পরাবার জন্য তাঁরা হেন চেষ্টা নেই করেন নি, কিন্তু সকলই বৃথা। 'সৃষ্টিকর্তা ভগবানে' বিশ্বাস করার দোষে দোষী ব্রাহ্মরা—ঈশ্বরের ঐ গুণ-কল্পনাকে হিন্দুদর্শন ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্রাহ্মসমাজ জন্মান্তরবাদে অবিশ্বাস করে দোষী—যে-মত হিন্দুর ধর্মীয় মতসমূহের মেরু-দণ্ড। ব্রাহ্মসমাজ যীশুখ্রীস্টকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে স্থাপন করে দোষী—তার ঐ কাজ হিন্দুধর্মের গৌরবের পক্ষে চূড়ান্ত অপমান। ব্রাহ্মসমাজ ধর্মদ্রোহিতা করেছে—তার শাস্তি তাকে পেতে হবে। সে শাস্তি—হয় স্বাভাবিক মৃত্যু, নয় আত্মসমর্পণ। একসময়ে ব্রাহ্মধর্ম খুবই জনপ্রিয় ছিল—এখন তার দশা কি? প্রাচীন ঐতিহাসিক ধর্মের দ্বারা একেবারে গ্রাস হবার অবস্থায় সে এসে গেছে। এই সমাজের কিছু-কিছু প্রগতিশীল সভ্য 'হিন্দু' নাম ছাড়ার অত্যন্ত বিপক্ষে। আবার অনেকে অভ্রান্ত গুরুবাদ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি হিন্দুমতের পক্ষে প্রকাশ্য সমর্থন জানাচ্ছেন, এবং হিন্দুদের কুসংস্কারপূর্ণ ভক্তিপদ্ধতি গ্রহণ করে ফেলেছেন।" [অ]

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল রেভারেন্ড জেমস হারউড, যিনি ব্রাহ্মধর্মকে 'ইউনিভার্সাল' এবং হিন্দুধর্মকে 'ন্যাশন্যাল' মনে করতেন—তিনি মাদ্রাজের 'ইনকুয়েরার' পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা সম্বন্ধে যা লেখেন, তাকে উদ্ধৃত করে থিয়জফিক থিংকার ১৮৯৭, ৫ জুন সংখ্যায়। এই মিশনারির হাতে ব্রাহ্মসমাজ সর্বাধিক প্রীতি এবং হিন্দু-উত্থানের নায়ক বিবেকানন্দ যথোচিত বিতৃষ্ণা লাভ করেছিলেন। তিনি লেখেন ঃ

"ভারতে পদার্পণ করা থেকেই আমি হিন্দুধর্মের রিভাইভ্যালের কথা শুনছি। এই ব্যাপারটিই, সাধারণভাবে, ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতি বন্ধ করার, অন্ততঃ ব্যাহত করার, অন্যতম কারণ রূপে নির্দেশিত হয়। অনেকেই উক্ত সমাজ থেকে সরে পড়েছেন, একথা হয়ত সত্য নয়, কিন্তু কেউ-কেউ গেছেন। তবে সভ্যসংগ্রহের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে গেছে। বিশ-তিরিশ বছর আগেকার অবস্থায় যেখানে অনেকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম নিতে পারতেন, তাঁরা এখন প্রাচীন ধর্মের আশ্রয়েই রয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ কাছের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়াই ভালো, এই নীতি অনুযায়ী তাঁরা ভিতর থেকে সংস্কারে বিশ্বাস করেছেন। এইভাবে, ব্রাহ্মধর্ম এক-দিকে তার আভ্যন্তরীণ বিবাদের জন্য তাঁদের কাছে কম আকর্ষক ঠেকেছে, অন্যদিকে হিন্দু-ধর্মকে যদি অধিক আকর্ষক না-করাও হয়, অন্ততঃ অধিক গ্রাহ্য করে তোলা হয়েছে।

"শেষোক্ত ব্যাপারটি ঘটতে পেরেছে নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মসমাজের জন্যই, অন্ততঃ অংশতঃ। প্রত্যেক রিফর্মেশনের সঙ্গে কাউণ্টার-রিফর্মেশন ঘটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লুথারের কার্য-ফল কেবল প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়নি, রোমান ক্যাথলিক চার্চেও দেখা গেছে, তাঁরা কাউন্সিল অব ট্রেণ্ট থেকে নিজেদের ঘর গুছোতে আরম্ভ করেন। জন ওয়েসলি বৃহৎ সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন—তা বৃহত্তর হতে পারত যদি-না চার্চ অব ইংলণ্ড জাড্য ঝেড়ে উঠে পড়ত। ইংরেজ ইউনিটারিয়ানরা যে-সব মত ও আদর্শ প্রচার করছেন, তা তাঁদের নিজেদের দলবৃদ্ধি করা অপেক্ষা অপরাপর খ্রীস্টান সম্প্রদায়গুলিকে প্রভাবিত করেছে।...এ-জিনিস ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তারা যাদের নবজাগরণের হেতু এমন অনেকের কাছ থেকে ঘৃণাপূর্ণ ব্যবহার লাভ করেছে।...ব্রাহ্মসমাজ যে-ঈশ্বরবাদে ('থীজম্') বিশ্বাস করে, তা মূলতঃ বিশ্বজনীন। হিন্দু-পুনরুত্থানের অঙ্গীভূত আর্যসমাজেরও অনুরূপ বিশ্বাস কিন্তু তা যুক্তি বা মানুষের বিবেকবোধকে প্রামাণ্য না করে বেদকে প্রামাণ্য করেছে। স্বামী

বিবেকানন্দ, যিনি পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ চাঞ্চল্যকর ব্যক্তি, তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতোই বৈদান্তিক দর্শনকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলে তার উপর ঢলে পড়েছেন। আগে তিনি ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, তখন তাঁকে নিতান্ত সাধারণ মানুষ মনে করা হত। এখন সদ্য তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় হিন্দুধর্মের বিজয়পতাকা ওড়ানোর খ্যাতি নিয়ে (যার মধ্যে, আমার অনুমান, যথেষ্ট অতিরঞ্জন আছে) ভারতে ফিরেছেন। তার ফল—জনগণ তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছে কেবল জনপ্রিয় প্রচারক হিসাবে নয়, বিশেষভাবে **হিন্দুধর্মের প্রচারক হিসাবে।** তারা তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে নিয়ে নিজেরা টেনেছে। তাঁর ভাষণ শুনতে সমবেত জনতা নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশী আইনের প্রয়োগ প্রয়োজন হয়েছিল—জনতা সেই মানুষটির চতুর্দিকে জুটেছিল যিনি বিদেশে স্বদেশীয় ধর্মের জয়ঘোষণা করেছেন। ধর্মীয় উৎসাহ সংক্রামক, জাতীয়তা বা জাতীয়তার নাম নিয়ে যা চলে, তাও সংক্রামক। আর যখন ধর্মীয় উৎসাহ এবং জাতীয়তা সম্মিলিত হয়, তখন তো জনগণের মাথা একেবারে ঘুরে যায়। সেই বস্তুই মাদ্রাজে ঘটেছে, ঘটতে যাচ্ছে আমার ধারণা কলকাতায়, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ গেছেন। দুটি জায়গাতেই যথাকালে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। তবে তাঁর বিষয়ে যা জানতে পেরেছি তা হল—তাঁর ব্যক্তিত্বে চৌম্বকশক্তি আছে, অসাধারণ তাঁর বাগ্মিতা, কিন্তু লেগে-থাকার ক্ষমতা তাঁর কম, যার অভাবে স্থায়ী ফল সৃষ্টি করা যায় না।

"ব্রাহ্মধর্ম তাই তার ভাব-ব্যাপকতার জন্য দ্রুত বিস্তারের আশা করতে পারে না, বিশেষতঃ যখন ধর্মের ক্ষেত্রে জাতীয়তার প্রবল স্রোত বইছে।"

॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবিত বোম্বাইয়ের প্রার্থনা-সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি যে একই জাতীয় হবে, স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যায়। প্রার্থনা-সমাজের মুখপত্র সুবোধ পত্রিকার (ইংরাজি ও মরাঠি, দ্বিভাষী পত্রিকা) সকল সংখ্যা দেখার সুযোগ আমরা পাইনি। যা-কিছু দেখতে পেয়েছি, তার মধ্যে কলকাতার ব্রাহ্ম-পত্রিকাগুলির মতো মুক্ত বিদ্বেষ না দেখা গেলেও চাপা রাগ যথেষ্ট। হিন্দু-জাগরণ সম্বন্ধে বক্র মন্তব্যে পত্রিকাটি পূর্ণ ছিল, এবং এই সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা বক্তৃতায় লেখায় ভারতীয় সমাজের ক্ষতবর্ণনা যথেষ্ট করেছেন, যা মিশনারিদের অনুগমন করেই তাঁরা করেছিলেন। এই পত্রিকার কিছু মত অন্য অধ্যায়ে উপস্থিত করব।

প্রার্থনা-সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের কেউ-কেউ সমাজসংস্কারক হিসাবে পুনার 'সুধারক' পত্রিকা চালাতেন। এই মরাঠি পত্রিকার কিছু মন্তব্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, এবং সেগুলি স্বামী বলরামানন্দ অনুবাদ করে দিয়েছেন। দেখা যাবে, সরাসরি আক্রমণ না করেও পত্রিকাটি বিবেকানন্দ এবং হিন্দুসমাজ (যা 'বিবেকানন্দকে না বুঝেই তাঁর পিছনে তালি বাজাচ্ছে') —উভয়কেই খোঁচা দেবার চেষ্টা করে গেছে। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে এই পত্রিকা দেখাবার চেষ্টা করেছে—বস্তুতঃপক্ষে বিবেকানন্দ হিন্দু-ধর্মাচার মানেন না, সুতরাং তাঁকে নিয়ে হিন্দুরা মাতামাতি না করলেই ভাল করবেন। অর্থাৎ এঁদের চেষ্টা—উদ্বুদ্ধ জনগণের থেকে তাদের নেতাকে বিচ্ছিন্ন করে, আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়া। সুধারকের মন্তব্যগুলিও আমরা পরে যথাস্থানে উপস্থিত করব।

প্রার্থনা-সমাজের নেতা এন জি চন্দ্রভারকর হিন্দু-উত্থানে সংস্কারকার্যের বিঘ্ন ঘটবে, এই দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে নানা কাতরোক্তি করতে থাকেন। মাদ্রাজ হিন্দু সোস্যাল রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সম্মেলনে তিনি বলেন—দেশের উপর দিয়ে এই যে হিন্দু-পুনরুত্থানের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, এ-বস্তু সংস্কারকার্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে, তিনি, আশ্বাস

দেন, উক্ত আন্দোলনে টিকে-থাকার মতো প্রাণশক্তি নেই বলে সংস্কারকদের দুশ্চিন্তারও কারণ নেই।১৪ [ইনিই অনেক বছর পরে বিবেকানন্দকে ভারতীয় নবজাগরণের নায়ক বলবেন]

চন্দ্রভারকর ও অন্যান্য ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকেরা যেহেতু 'সর্বদাই পুরো আন্তর্জাতিক', কদাপি জাতীয়তাবাদী নন, তাই বিদেশীর সামনে স্বদেশীর নোংরা ঘাঁটতে তাঁদের কোনোই দ্বিধা ছিল না, যদিও উক্ত আন্তর্জাতিকতা পুনার মরাঠার মতো জাতীয়তাবাদীর কাছে আত্মমর্যাদা-হানিকর বলে মনে হয়েছিল। ডাঃ ফেয়ারবার্ন ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন প্রচারক মিশনারিরূপে। বোম্বাইয়ে তাঁর সংবর্ধনাসভায় প্রার্থনা-সমাজের ডাঃ ভাণ্ডারকর একেবারে প্রাণ-মন খুলে দিয়েছিলেন। "প্রার্থনা-সমাজীরা সর্বদাই খ্রীস্টান মিশনারিদের কাছে প্রেরণালাভ করেছেন। সেকথা মাননীয় মিঃ চন্দ্রভারকর 'হিন্দু রিফর্ম' বিষয়ে তৃতীয় প্রবন্ধে খোলাখুলি স্বীকার করেছেন।" "এক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক, [ডাঃ ফেয়ারবার্নের মতো] অতীব পণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান মিশনারির সমক্ষে ডাঃ ভাণ্ডারকরের হৃদয়-বাঁধ ভেঙে যাবে, এবং নিজ স্বভাবানুরূপ সরলতা-সহায়ে অনিয়ন্ত্রিত অনর্গল স্বীকারোক্তি করে যাবেন।" ঐ স্বীকারোক্তি প্রার্থনা-সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে। মরাঠা ডাঃ ভাণ্ডারকরের বক্তৃতা থেকে জেনেছিল (যাকে প্রকাশ করেছিল ১৮৯৮, ১১ ডিসেম্বর সংখ্যায়)—"ইউরোপীয় প্রভুদের দ্বারা প্রদত্ত বিজ্ঞান ও ভাবরাজি লাভ করে, কিছুসংখ্যক মানুষ ধর্মীয় কুসংস্কার ভেঙে সমাজসংস্কার আনার অভিপ্রায়ে একটি গুপ্তসমিতি স্থাপন করেন; প্রার্থনা-সমাজের সূচনা সেখান থেকেই।" এই গুপ্তসমিতিতে যাঁরা যেতেন তাঁরা একত্রে নিষিদ্ধ আহারাদি করে জাতি ভাঙতেন, যদিচ জাতি যে ভেঙে ফেলেছেন, এই প্রলয়ংকর খবরটি বাইরের কাউকে জানতে দিতেন না। তদুপরি জাতিপ্রথা ভাঙার আদর্শপ্রীতি অপেক্ষা অনেকের মধ্যে নিষিদ্ধ বস্তুর স্বাদগ্রহণের রসনালোলুপতা প্রাধান্য পেয়েছিল, যাঁরা পরে গণ্ডগোল দেখে সমিতির রেকর্ড চুরি করে সরে পড়েন, পাছে তাঁদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ফাঁস হয়ে যায়। ডাঃ ভাণ্ডারকর অবশ্য স্বীকার করেন, প্রার্থনা-সমাজের যথেষ্ট ব্যাপ্তি বা অগ্রগতি হয়নি। শ্রীযুক্ত চন্দ্রভারকরও একই কথা মেনে নেন, "প্রার্থনা-সমাজ সদস্যসংখ্যায় বা সদস্যদের ঐকান্তিকতা বা উদ্দীপনার দিক দিয়ে বিশেষ অগ্রগতি দেখাতে পারে নি।"

প্রার্থনা-সমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের এইসব স্বীকারোক্তি প্রচুর আমোদের সঙ্গে মরাঠা গ্রহণ করেছিল। প্রার্থনা-সমাজ গোড়ায় ছিল গুপ্তসমিতি? তার মানে, তার সদস্যদের নৈতিক সাহস একেবারেই ছিল না! কোনো পরিণত চিন্তা-সহায়ে তাঁরা এগোন নি! কতকগুলি বিশৃঙ্খল-মনের লোকের কাণ্ড ঐ ব্যাপারটি! তাছাড়া এই সমাজ কেবল যথেচ্ছাচারীদেরই আশ্রয় দেয়নি—চোরেদের আশ্রয়ও দিয়েছিল—যারা নথিপত্র সরিয়ে ফেলল!! এবং নেতারা, যাঁরা নিঃসন্দেহে সাধুপুরুষ, তথাপি উক্ত চোরদের সহ্য করে যাচ্ছেন!!!

মরাঠার বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে ক্রমেই ঘৃণা যুক্ত হয়েছে ঃ

"একজন বহিরাগতের কাছে এইসব কথা বলে ডাঃ ভাণ্ডারকর অত্যন্ত অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কথাগুলি কেবল যে প্রার্থনা-সমাজ আন্দোলনের প্রতি সুবিচার করেনি তাই নয়, হিন্দু হিসাবে তাঁর আত্মমর্যাদার সঙ্গেও ব্যাপারটা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে

১৪ "Dealing with the outlook from the reformer's point of view, he [Chandavarkar] said that the wave of Hindu revivalism which was passing over the country must be regarded as a hindrance to their work. But he expressed his belief that his revival of orthodox Hinduism has no element of permanence or vitality in it, and that therefore there was nothing in it to discourage the reformer."

[*Madras Christian College Magazine;* January, 1897]

সবাই জানেন, কোনো ইউরোপীয়ের সামনে, তিনি যে-চরিত্রের বা যে-পদমর্যাদারই হোন না কেন, ডাঃ ভাণ্ডারকর আত্মহারা হয়ে পড়েন। সম্ভবতঃ ডাক্তার মহাশয় আপাদমস্তক আন্তর্জাতিক, সারা পৃথিবীকে আত্মীয় বিবেচনা করে ধেয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন, কিন্তু পৃথিবী দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁকে প্রায়ই ঠেলে সরিয়ে দেয়, যা তিনি তাঁর উৎকট আলিঙ্গনের অন্ধ আবেগের ক্ষণে বুঝতে পারেন না। মিশনারিদের মধ্যে কিছু ভালো লোক থাকতে পারে, কিন্তু মিশনারিরূপে অর্থাৎ খ্রীস্টধর্মে অপরকে ধর্মান্তরকরণের ব্রতধারীরূপে, তাঁরা স্পষ্টতঃই আমাদের শত্রু, এবং যদিও এইসকল উত্তম মানুষগুলিকে ধর্মপথে চলবার সময়ে আমরা আমাদের ভ্রাতা বিবেচনা করব, তথাপি এঁদের সামনে মুখ খোলার ব্যাপারে সাবধানও থাকব। মিশনারিরা আমাদের উপরে খ্রীস্টধর্মের ছত্রছায়া বিস্তারের ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, এবং সেই কারণে তাঁদের সেরা ব্যক্তিরাও আমাদের কথা ও কাজের বিকৃত ব্যাখ্যা করবেন। এক্ষেত্রে, ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তির বিকৃত ব্যাখ্যা মিশনারিদের রচিত বিকৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোন্ বদ-বিপত্তি ঘটাতে পারে, সহজেই বোধগম্য।" [অ]

মরাঠা মধুরভাবে বলেছিল :

"ডাঃ ভাণ্ডারকরের বক্তৃতাটি নিশ্চয় ডাঃ ফেয়ারবার্নের কাছে খুবই উদ্দীপক মনে হবে। আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি, এই বক্তৃতার একটি কপি তিনি তাঁর ভ্রমণের স্মারক হিসাবে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন—তাঁর ধর্মান্তর-অভিযানের বিজয়-পুরস্কার-রূপে।"

ভাণ্ডারকরেরা বিবেকানন্দকে কোন্ চোখে দেখবেন, না বললেও চলে।

॥ ৬ ॥

আমেরিকায় বিবেকানন্দ আক্রান্ত হলেন সর্বদিকে। সেই সুসংগঠিত ক্রূর অধর্মযুদ্ধের বেদনামথিত রূপ উন্মোচন করেছেন শ্রীমতী বার্ক। তাঁর মতে, ১৮৯৪ সালের জুন মাস স্বামীজীর জীবনের 'অন্ধকার যুগ।' স্বামীজীর বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে মিশনারিরা বিবেকানন্দের মাতৃভূমি ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—প্রচারবেদী ও সংবাদপত্রের স্তম্ভ থেকে গরল উঠেছিল ভারত-সম্বন্ধে। বিবেকানন্দ যখন তাতে দমলেন না, তখন তাঁকে নূতনভাবে বিপাকে ফেলবার চেষ্টায় মিশনারিরা মজুমদার ও নাগরকর প্রভৃতির মারফত একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে ফেললেন : যে-বিবেকানন্দ নিজেকে এখন সন্ন্যাসী বলে প্রচার করে, সে আসলে একটা ভ্যাগাবন্ড ছোঁড়া, আমেরিকায় আসার পরে গেরুয়া চড়িয়েছে, সে কারো প্রতিনিধি নয়। বিবেকানন্দ আত্মপ্রতিনিধি—এই কথা আত্মনির্ভর অনেক আমেরিকানের কাছে বিষম আপত্তিকর ঠেকল। স্বামীজী ভাবলেন, এ নিন্দা এখনি দূর করা যাবে; মাদ্রাজীরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছে, আমার পক্ষে সার্টিফিকেট তারাই পাঠাবে; এবং, যে-কলকাতায় আমার জন্ম, সেখানকার মানুষ তাদের ধর্মের ও সংস্কৃতির জন্য আমি এই যে-কিছু করেছি, তার জন্য কৃতজ্ঞতায় আমার কাজ সমর্থন করতে দেরী করবে না।

অপরপক্ষে মিশনারি প্রভৃতির চেষ্টা থেমে ছিল না। মিশনারি ও মজুমদার স্বামীজীকে জোচ্চোর প্রমাণের চেষ্টা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, ব্যাপারটাকে মজবুত করবার জন্য স্বামীজীর নৈতিক অধঃপতনের কথাও রটাতে লাগলেন। স্বামীজীর আমেরিকান বন্ধুদের প্রতি প্রীতি ও দায়িত্বে অস্থির হয়ে, তাঁদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, জঘন্য মানুষটি সম্বন্ধে তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে আসতে লাগলেন। তারপরে মজুমদার ভারতে ফিরে তাঁর চিত্তাকর্ষক পাশ্চাত্ত্য-অভিজ্ঞতাকে অধিকতর আকর্ষক করে তুললেন—ঐ হঠাৎ-বিখ্যাত ব্যক্তিটির কীর্তিকাহিনীর

সরস উপস্থাপনের দ্বারা। বিবেকানন্দ বুকের রক্ত তুলে আমেরিকায় গিয়েছিলেন দেশের হিতসন্ধানে, ভারত-ধর্মের সত্য উন্মোচনে—তিনি অবস্থার পাকে হয়ে দাঁড়ালেন মিথ্যাবাদী; অতি শুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী তিনি—প্রচারগতিকে হয়ে পড়লেন চরিত্রহীন!!

স্বামীজীর জীবনের এই অধ্যায়ে মিশনারি ও মজুমদারের ভূমিকার চেহারা লুই বার্কের গ্রন্থের *Trials and Triumph* অধ্যায় থেকে যে-কেউ দেখে নিতে পারেন। বর্ণনার সূত্র রক্ষার জন্য আমরা এখানে সরাসরি স্বামীজীর পত্রাবলী থেকে কিছু-কিছু অংশ উদ্ধৃত করব। এ-সবের মধ্য থেকে দেখা যাবে, জনসভার ধন্যবাদে বিবেকানন্দের প্রয়োজন থাকা যদিও স্বাভাবিক নয়, তবু অবস্থাচক্রে তা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল, এবং তাঁকে সমগ্র জাতির পক্ষে ধন্যবাদ জানানোর ঔচিত্য-চিন্তা যদিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিরার-সম্পাদকের মাথায় উঠেছিল, কিন্তু তা কার্যকর হবার আগেই স্বামীজীকে তাঁর বন্ধু ও শিষ্যগণকে পত্র লিখে অনুরোধ করতে হয়েছিল ধন্যবাদ-সভার আয়োজন করার জন্য। সত্যের জয় অবশ্যই হয়, কিন্তু বড় বিলম্বে এইটেই মানবজীবনের ট্রাজেডি।

॥ ৭ ॥

আত্মপ্রচার সম্বন্ধে স্বামীজীর স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার রূপ পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আমরা কিছুটা লক্ষ্য করে এসেছি। আত্মগোপন করার জন্য যিনি নামগোপন করেন, তিনি কতখানি প্রচারবিমুখ, তা সহজেই বোঝা যায়। খবরের কাগজের হুজুক সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব দেখা যায় আমেরিকার পথে জাহাজ থেকে আলাসিঙ্গাকে লেখা ১৮৯৩, ১০ জুলাইয়ের পত্রে ঃ "ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে; খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্বদা মনে রাখবে, নাম-যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।" ধর্মমহাসভায় যোগদানের পূর্বে ২০ অগস্ট একই ব্যক্তিকে লিখেছেন ঃ "আমরা হৃদয়শূন্য, মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে ও তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রের প্রবন্ধসমূহকে গ্রাহ্য করি না।" বিবেকানন্দ মানুষটি কত বিস্ময়কর চরিত্রের, সাধারণ ধারণার কতখানি বহির্বর্তী কাণ্ড, তা এই 'নাম-যশের' ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে। চিকাগো-ধর্মমহাসভা শেষ হয়েছিল ১৮৯৩, ২৭ সেপ্টেম্বর। তিনি কি জাতীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সংবাদপত্রে তাঁর বিষয়ে কী লেখা হয়েছিল, তা আর না বললেও চলবে। কিন্তু সেই সাফল্যের সংবাদ আলাসিঙ্গাকে প্রথম লিখে পাঠালেন কবে?—ধর্মমহাসভা শেষ হবার এক মাসেরও বেশী সময় পরে—২ নভেম্বর। স্বামীজীর ঐ চিঠিতে ধর্মমহাসভার কিছু বর্ণনা ছিল, এবং তাঁর বিষয়ে সংবাদপত্রের প্রশংসার অল্প কিছু উদ্ধৃতি। স্বামীজী বোধহয় এটুকুও লিখতেন না যদি-না লিখতে দায়বদ্ধ থাকতেন এবং কৃতজ্ঞতাবদ্ধ—আলাসিঙ্গা যে, দ্বারে-দ্বারে ঘুরে অর্থসংগ্রহ করে তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন। সে-কর্তব্য অবশ্য স্বামীজী এক মাস পেরিয়ে যাবার আগে পালন করেন নি!! এবং কত সংক্ষেপে নিজের সংবাদটুকু সেরেছিলেন—তার পরেই আলাসিঙ্গাকে কর্তব্যের উপদেশ দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। ঐ যে-সামান্য অংশটুকু লিখে পাঠিয়েছিলেন, তার সঙ্গে যোগ করে দিতে ভোলেন নি, "পত্রটি প্রকাশ করিও না।"

২ নভেম্বরের পরে আরও প্রায় দু'মাস কাটল, ২৭ ডিসেম্বর স্বামীজী বেলগাঁওয়ের হরিপদ মিত্রের চিঠি পেলেন। পরদিন ২৮ ডিসেম্বর তাঁকে মোটামুটি বিস্তৃত যে-উত্তর দিলেন, তাতে নিজের জন্য ব্যয় করলেন মোট এক লাইন, "ভারতবর্ষের খবরের কাগজে চিকাগো-বৃত্তান্ত হাজির—বড় আশ্চর্যের বিষয়; কারণ আমি যাহা করি গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি।" আরও মাস-খানেক কাটল। ২৪ জানুয়ারি মাদ্রাজী ভক্তদের উদ্দেশ্যে

যে-পত্র লিখলেন, তার মধ্যে ছিল, "আমি আশ্চর্য হইলাম যে, আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌঁছিয়াছে।" ঐ "অনেক কথার" মধ্যে অনেক প্রশংসার কথা ছিল, দু'একটি সমালোচনাও ছিল, যথা আমেরিকার ইন্টিরিয়র পত্রিকায় স্বামীজী-বিরোধী রচনা। স্বভাবতঃই তাই স্বামীজীকে ইন্টিরিয়র পত্রিকার "গোঁড়া নীলনাসিক" স্বভাবের কথা জানাতে হয়েছে। এই প্রথম স্বামীজী ভারতে পাঠানো চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে মিশনারি-আক্রমণের কথা জানিয়েছেন। এই পত্রের সঙ্গেই স্বামীজী *Paper on Hinduism* সংবাদপত্র থেকে কেটে পাঠান, তৎসহ শ্রেষ্ঠ আমেরিকান সংবাদপত্রের প্রশংসার কিছু-কিছু অংশ। এ-জিনিস তিনি করলেন ধর্মমহাসভা শেষ হবার প্রায় চার মাস পরে, যা করতেন না যদি-না মাদ্রাজী ভক্তদের চিঠি থেকে বুঝতে পারতেন যে, ভারতে তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ-রকম প্রচার শুরু হয়ে গেছে। মাদ্রাজের গুরুভক্ত, স্পর্শকাতর যুবকগুলির মুখরক্ষার সহায়ক কিছু বস্তু তাঁকে অনিচ্ছাতেও পাঠাতে হয়েছিল।

এর পরে ১৮৯৪, ২৯ জানুয়ারি জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসকে [এবং পরে ৩ মার্চ সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়রকে] যে-পত্র লেখেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের কোনো উল্লেখ নেই। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে-পত্র লেখেন,১৫ তার শুরুতে আছে, "এদেশে আসিয়া অবধি তোমাদের পত্র লিখি নাই," অর্থাৎ তিনি তাঁর আবাল্য বন্ধু ও অতিপ্রিয় গুরুভাইদের প্রায় দশ মাস কোনো চিঠি লেখেন নি, এবং চিকাগো ধর্মমহাসভায় আশ্চর্যজনক সাফল্যের পরেও পাঁচ মাস সে-বিষয়ে উল্লেখমাত্র না করে থাকতে পেরেছিলেন!! এক অদ্ভুত মানুষ, নিজের গৌরব সম্বন্ধে যাঁর উদাসীনতা প্রায় অলৌকিক।

ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ঐ চিঠিতে স্বামীজীর প্রথম [?] আমেরিকায় মজুমদারের অপপ্রচারের কথা খুলে লেখেন। স্বামীজীর এমন লেখার পিছনে সংবাদজ্ঞাপন ছাড়া আরও উদ্দেশ্য ছিল মনে হয়। ইতিমধ্যে মজুমদার দেশে ফিরেছেন (১৮৯৪, ২৪ জানুয়ারি তিনি কলকাতায় ফেরেন); কলকাতায় ফিরে তিনি অপপ্রচার আরম্ভ করে দিতে পারেন, তা স্বামীজী হয়ত অনুমান করেছিলেন, কিংবা সে-বিষয়ে কোনো সূত্রে সংবাদ পেয়েছিলেন। স্বামীজী ঐ পত্রে লেখেন ঃ "প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার-মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি। পরে যখন চিকাগো-সুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙে পড়তে লাগল তখন মজুমদার-ভায়ার মনে আগুন জ্বলল।...দাদা, আমি দেখে-শুনে অবাক। বল্ বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি? তোর খাতির তো যথেষ্ট এদেশে। তবে আমার মতো তোদের হল না, তা আমার কি দোষ?...মজুমদার পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে। 'ও কেউ নয়, ঠক জোচ্চোর; ও তোমাদের দেশে এসে বলে, আমি ফকির', ইত্যাদি বলে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগড়ে দিলে। ব্যারোজ-প্রেসিডেণ্টকে এমনি বিগড়ালে যে, সে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও কয় না। তাদের পুস্তকে প্যাম্ফলেটে যথাসাধ্য আমায় দাবাবার চেষ্টা। কিন্তু গুরু সহায় বাবা! মজুমদার কি বলে! সমস্ত আমেরিকান নেশন যে আমায় ভালবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মত মানে—মজুমদার করবে কি? পাদ্রী-ফাদ্রীর কি কর্ম? আর এরা বিদ্বানের জাত। এখানে 'আমরা বিধবার বে দিই, আর পুতুলপূজা করি না'—এসব আর চলে না—পাদ্রীদের কাছে কেবল চলে। ভায়া, এরা চায় ফিলজফি, *learning*, ফাঁকা গপ্পি আর চলে না। ধর্মপাল ছোকরা বেশ,...ভাল মানুষ। তার এদেশে যথেষ্ট আদর হয়েছিল। দাদা, মজুমদারকে দেখে আমার আক্কেল এসে গেল। বুঝতে পারলুম, 'যে নিঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থকং তে কে ন

১৫ পত্রাবলীতে এই পত্রের তারিখ দেওয়া আছে ১৯ মার্চ, তা ভুল। এ বিষয়ে বেণীশংকর শর্মার গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জানীমহে'—ভর্তৃহরি। [যাহারা নিরর্থক পরের অনিষ্টসাধন করে, তাহারা যে কিরূপ লোক বলিতে পারি না]। ভায়া, সব যায়, ঐ পোড়া হিংসেটা যায় না। আমাদের ভিতরও খুব আছে। আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা, হাম্‌বড়া—আর কেউ বড় হবে না।"

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে লেখা স্বামীজীর এই চিঠির উত্তর কলকাতার গুরুভাইদের কাছ থেকে নিশ্চয় সত্বর তিনি পেয়েছিলেন, এবং তার মধ্যে কলকাতায় মজুমদারের নোংরা প্রচারের কথা ছিল। ১৮ মার্চ, মেরী হেলকে (চিকাগোয় যাঁদের বাড়িতে স্বামীজী থাকতেন) স্বামীজী যে-চিঠি লেখেন, তার অখণ্ডিত পাঠ লুই বার্ক তাঁর বইয়ে দিয়েছেন—তার মধ্যে পাই ঃ "মজুমদার কলকাতায় ফিরে গেছেন এবং সেখানে প্রচার করছেন যে, বিবেকানন্দ আমেরিকায় সর্বপ্রকার পাপ-কাজ করে বেড়াচ্ছেন, বিশেষতঃ সবচেয়ে জঘন্য ধরনের অসচ্চরিত্রতার কাজ!!! ঈশ্বর তাঁকে করুণা করুন! তুমি দুঃখিত হয়ো না, আমার চরিত্রের কথা আমার স্বদেশের লোক খুবই ভালভাবে জানে। আমার আবাল্য সঙ্গী গুরুভাইরাও আমাকে এমনভাবে জানে যে, এইসব ওঁচা কথায় তারা কদাপি বিশ্বাস করবে না। মজুমদারের বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড দেখে তারা উপহাসের হাসি হাসছে। কিন্তু ঐ হল তোমার আমেরিকার 'অপূর্ব আধ্যাত্মিক' মানুষের চেহারা! তবে তাদের দোষ নেই। যতক্ষণ না মানুষ সত্যকারের আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠে, অর্থাৎ যতক্ষণ না সে নিজের আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ অন্ত-দৃষ্টি লাভ করে, সে-অবধি সে কোনটা খাঁটি কোনটা ভুষি-মাল চিনতে পারে না, ফাঁকা লম্বা কথার সঙ্গে গভীর ভাবের পার্থক্য করতে পারেনা।...বেচারা মজুমদারের জন্য দুঃখ হয়—সে এতখানি নামতে পারল!! সে বলেছে যে, আমেরিকার নারীদের সঙ্গে আমি পশুর মতো নোংরা জীবন কাটাচ্ছি!! ঈশ্বর বুড়ো খোকাটিকে আশীর্বাদ করুন—ভরসা করি আমেরিকার নারীগণ আমার সম্বন্ধে ভালই জানে।"

মজুমদারের মিথ্যাপ্রচারে দুঃখিত হতে স্বামীজী তাঁর স্নেহের হেল-ভগিনীটিকে নিষেধ করেছিলেন, যদিও জানতেন, তাঁর মতো পবিত্রস্বভাব মানুষ-সম্বন্ধে ঐ ধরনের জঘন্য কুৎসায় তাঁর বন্ধুগণের দুঃখ অনিবার্য। খ্রীস্টের স্তুতি করে যে-মজুমদার আমেরিকায় 'অপূর্ব আধ্যাত্মিক মানুষ হয়েছিলেন—বিদ্রূপসহ তাঁর আসল চেহারা স্বামীজী দেখিয়ে দিয়ে-ছিলেন। অতঃপর ৯ এপ্রিল স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে যে-চিঠি লেখেন, বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে সেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই চিঠিতেই স্বামীজী প্রথম তাঁর কাজ সমর্থনের জন্য সভা আহ্বান করতে বলেন। স্বামীজীর চরিত্র যাঁদের জানা আছে তাঁরাই বুঝবেন, এই অনুরোধ করবার আগে স্বামীজীকে কি পরিমাণে সহ্য করতে হয়েছে! নিজের উপরে যিনি নির্ভর করতে অভ্যস্ত, এবং সে-বিষয়ে অত্যন্ত অভিমানী, তাঁকে অপরের সাহায্য-ভিখারী হবার পূর্বে কতখানি না সংকোচ জয় করতে হয়েছিল!! এবং বিপক্ষের দংশন তখন না জানি কোন্‌ পর্যায়ে পৌঁছেছিল!!! এই চিঠিতে স্বামীজী মজুমদারের চমৎকার যুদ্ধকৌশল দেখিয়ে দিয়েছেন। আমেরিকায় মজুমদার বলেছিলেন, বিবেকানন্দ পরিচয়হীন জোচ্চোর, কারণ মজুমদার বেশ জানতেন, বিবেকানন্দ পরিচয়পত্র নিয়ে আসেন নি। সুদূর আমেরিকা-বাসীর পক্ষে মজুমদারের কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করাও শক্ত। সুতরাং কথাগুলো অগত্যা সত্য হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে ভারতে ফিরে বললেন—বিবেকানন্দ আমেরিকায় ব্যভিচারে মগ্ন—ভারতবাসীর পক্ষেও আমেরিকায় গিয়ে কথাটার সত্য-মিথ্যা যাচাই করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু, এখানে আর একটি অনুমান করতে পারি—বিবেকানন্দের চরিত্র অনুধাবন করে মজুমদার বুঝেছিলেন, তিনি যে-অস্ত্রে বিবেকানন্দকে বধ করতে চাইছেন, সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার মত নীচে নামা বিবেকানন্দের পক্ষে সম্ভব নয়।

৯ এপ্রিলের ঐ পত্রে স্বামীজী অধিকন্তু সম্ভব হলে কলকাতায় অনুরূপ একটি সভা আহ্বান করবার জন্য কলকাতার ভক্তদের অনুরোধ জানাতে লিখেছিলেন।

মিশনারি ও ব্রাহ্ম-প্রতিনিধিদের আক্রমণে স্বামীজী এমনই উদ্ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, এপ্রিল মাসে তাঁর কাছে যখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত, তাঁর কার্যের প্রশংসামূলক একটি পুস্তিকা গিয়ে হাজির হল, সেটিকে তিনি ঈশ্বরের দান মনে করলেন। এই সঙ্গে তিনি জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসের একটি 'চমৎকার' চিঠিও পেয়েছিলেন। পূর্বোক্ত পুস্তিকা পেয়ে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হৃদয়ে স্বামীজী ২৬ এপ্রিল ইসাবেল ম্যাককিণ্ড্লিকে লিখেছিলেন ঃ "তুমি ভারতের কাগজপত্রের যে-ডাক গতকাল পাঠিয়েছ...তার মধ্যে আমার সম্বন্ধে কলকাতায় প্রকাশিত একটি ছোট পুস্তিকা রয়েছে, যাতে আমার জীবনে অন্ততঃ একবারের জন্য দেখতে পেলাম, প্রফেট তাঁর নিজ দেশে সম্মানিত হলেন। ওর মধ্যে আমার সম্বন্ধে আমেরিকান ও ভারতীয় পত্র-পত্রিকার রচনাংশ উদ্ধৃত আছে। কলকাতার সংবাদপত্রের অংশগুলি আবার বিশেষভাবে তৃপ্তিদায়ক, যদিও সেগুলি এতই গালভরা যে, তোমাকে পুস্তিকাটি পাঠাতে চাই না। তারা আমাকে 'সুবিখ্যাত,' 'অপূর্ব অদ্ভুত' ইত্যাদি বহুবিধ আজে-বাজে কথায় ভূষিত করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে তারা বহন করে এনেছে সমগ্র জাতির হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা।" এই চিঠিতেই মিরারে নরেন্দ্রনাথ সেনের রচনার উল্লেখ ছিল ঃ "ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে, আমি না চাইতেই। আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্রের ঐ সম্পাদক কে জানো—যিনি আমাকে অত প্রশংসা করেছেন এবং আমেরিকায় আমি হিন্দুধর্ম প্রচার করতে এসেছি বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন?—তিনি মজুমদারের সম্পর্কের ভাই!! বেচারা মজুমদার, ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে, মিথ্যে কথা বলে, নিজ উদ্দেশ্যেরই ক্ষতিসাধন করল। প্রভু জানেন, আত্মসমর্থনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা আমি করিনি।"

কিন্তু স্বামীজীর এই পরিতৃপ্তি ও আনন্দের পরিমাণ কি তাঁর সুতীব্র যন্ত্রণার অনুরূপ ছিল! একটি মানুষের (যিনি নাকি 'অপূর্ব আধ্যাত্মিক') ঈর্ষাকলুষিত নিষ্ঠুরতা উদ্দিষ্ট অপর মানুষটির পক্ষে কী অপরিসীম যন্ত্রণার কারণ হতে পারে, তার রক্তচ্ছবি পাই একই চিঠিতে ঃ "এখন আমি আর কারো কথা গ্রাহ্য করি না; আমার নিজের দেশের লোক আমার সম্বন্ধে কী বলল তাও নয়; কেবল একটি জিনিস—আমার বুড়ি মা এখনো বেঁচে আছেন, সারা জীবন তিনি বহু কষ্ট পেয়েছেন, তার মধ্যেও তিনি মানুষ ও ঈশ্বরের সেবায় আমাকে দান করতে পেরেছেন—কিন্তু তিনি যদি শোনেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ আশার, সবচেয়ে ভালবাসার সন্তানটি দূর দেশে গিয়ে পশুর মত জঘন্য নীতিহীন জীবন কাটাচ্ছে—মজুমদার কলকাতায় গিয়ে যে-কথা রটাচ্ছে—তাহলে সে-সংবাদ তাঁকে একেবারে মেরে ফেলবে।"

১ মে'র মধ্যে নিশ্চয় মিরারের অনেক প্রাসঙ্গিক অংশ স্বামীজীর কাছে পৌঁছে যায়। ১ মে তারিখে তিনি ইসাবেল ম্যাককিণ্ড্লিকে লেখেন ঃ "গতকাল ভারত থেকে সংবাদপত্রের যে-সব অংশ এসেছে, তা তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেগুলি পড়ে অনুগ্রহ করে মিসেস ব্যাগলির কাছে পাঠিয়ে দিও। ঐ সংবাদপত্রটির সম্পাদক হচ্ছেন মিঃ মজুমদারের আত্মীয়। বেচারা মজুমদারের জন্য এখন দুঃখ হয়!!"

মে মাসে স্বামীজী পূর্বোক্ত পুস্তিকা ও কিছু চিঠিপত্র ডাঃ রাইটকে পাঠান—তিনি 'প্রতারক' নন, তা প্রমাণ করতে। মিশনারিদের ও মজুমদারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিবেকানন্দ যে প্রতারক, তা প্রায় স্থির হয়ে গিয়েছিল। ডাঃ রাইটকে কাগজপত্রগুলি পাঠাবার কারণ, স্বামীজীর জীবনী-পাঠকমাত্রে জানেন, উক্ত অধ্যাপক পরিচয়পত্রহীন বিবেকানন্দের ধর্মমহাসভায় যোগদানের নিমিত্ত হয়েছিলেন; এবং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর প্রশস্তি প্রবাদবাক্যেরই তুল্য। স্বামীজী কাগজপত্র ডাঃ রাইটকে পাঠিয়ে লিখেছিলেন, "হে সহৃদয় বন্ধু, সর্বপ্রকারে আপনার সন্তোষবিধান করতে আমি নৈতিকভাবে বাধ্য।" যাঁর ঈর্ষার জন্য তাঁর

এই দুর্গতি, সেই মজুমদারের সম্বন্ধে লেখার সময়েও স্বামীজীর অপূর্ব ঔদার্য ও মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে ঃ "বুড়ো প্রচারকের আক্রমণকে আর আমি গ্রাহ্য করি না, কিন্তু মজুমদার যে-রকম ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরছেন তা আমাকে ভয়ানক আঘাত দিয়েছে। প্রার্থনা করি, তাঁর চৈতন্য হোক, কারণ তিনি উত্তম ও মহান মানুষ, সারাজীবন অপরের মঙ্গল করতে চেয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা আমার আচার্যদেবের একটি কথাই আবার প্রমাণিত হল— 'কাজলের ঘরে থাকলে তুমি যত সেয়ানাই হও না কেন, গায়ে ছিটে-ফোঁটা কালি লাগবেই।' সাধু ও পবিত্র হবার যত চেষ্টাই কেউ করুক না কেন, যতক্ষণ মানুষ সংসারে আছে তার স্বভাব কিছু পরিমাণে নিম্নগামী হবেই। ভগবানের পথ সংসারের বিপরীত দিকে। ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য একসঙ্গে কারো জীবনে এসেছে—বিরল, অতি বিরল ক্ষেত্র তা।"

কিন্তু স্বামীজীর এই চিঠি এবং সেই সঙ্গে পাঠানো পুস্তিকাটি, লুই বার্ক বলেছেন, "মনে হয় অধ্যাপক রাইটকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারেনি, অন্ততঃ স্বামীজী তাই মনে করেছিলেন।" সুতরাং স্বামীজী ২৪ মে অধ্যাপককে আবার যে-চিঠি লিখলেন তার সঙ্গে 'ভারতের গ্ল্যাডস্টোন' নামে খ্যাত হরিদাস বিহারীদাস,১৬ এবং খেতড়ির মহারাজের চিঠি

১৬ হরিদাস বিহারীদাস যে তাঁর চারিত্রশক্তি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ পশ্চিম ভারতে, উচ্চ সম্মানিত পুরুষ ছিলেন, তা তাঁর দেহত্যাগের (মৃত্যু ৫৫ বৎসর বয়সে; ১৭ জুন, ১৮৯৫) পরে টাইমস অব ইণ্ডিয়ার দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য (১৮৯৫, ১৮ জুন) থেকে বোঝা যায়। ওর মধ্যে পাই, হরিদাস গুজরাটের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, যার আর একজন সন্তানও বিখ্যাত—সর্দার-বাহাদুর বেচারাদাস বিহারীদাস, যিনি বোম্বাই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। শিক্ষা শেষ করে হরিদাস বিহারীদাস নিজ বাসস্থান নডিয়াডের সামাজিক কার্যকলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ইত্যাদি হন। কিন্তু স্বগ্রামে তাঁর মুখ্য কীর্তি, যে-জন্য সমগ্র গুজরাটে যথার্থ দেশহিতব্রতীরূপে স্বীকৃত হন—তা হল, কৃষিকর্মে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন। এই কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল বলেই সরকারী কাজে যোগদান করার পরে তিনি রাজস্ব-প্রশাসনে অসাধারণ দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন। ভবনগরে বিচারপতির পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল—এমন গুণপনা দেখিয়েছিলেন যে, "কাথিয়াবাড়ের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের বিশেষ সুপারিশে বোম্বাই সরকার তাঁকে ওয়াধওয়ান দেশীয় রাজ্যে রাজার নাবালকত্ব-কালে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তারপর বোম্বাই-সরকার তাঁকে ওয়াংকানের-এর শাসকের পদে বসান, সেখানে থেকে ইডার রাজ্যের দেওয়ানপদে, শেষে ১৮৮৩-এ গুজরাটের প্রধান দেশীয় রাজ্য জুনাগড়ের দেওয়ানপদে। পদটি গুরুদায়িত্বের, কঠিন তার কার্যপরিচালনা।" কারণ বৃটিশ সরকারের কাছে এই রাজ্যের মর্যাদা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হরিদাস "সাহস ও অব্যাহত পরিশ্রমের দ্বারা সংকট-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে," তাকে কাটিয়ে, রাজ্যটিকে এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি যখন তার শাসনভার ত্যাগ করলেন, তখন সেখানকার আর্থিক অবস্থা উন্নত, রেল চালু হয়ে গেছে, এবং কাথিয়াবাড়ের সেরা শাসিত দেশীয় রাজ্যের সুনাম অর্জন করেছে। হরিদাস এমনই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন যে, নবাব তাঁর অবসর-প্রস্তাবে কোনোমতে রাজি হতে চাননি। আফিম-কমিশনের সদস্য হওয়ায় তিনি এক বছরের ছুটি নেন। পরে নবাব আবার তাঁকে দেওয়ান-পদে ফিরিয়ে আনেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি জোর করে অবসর নেন, এবং সহসা কয়েকদিনের জ্বরভোগের পরে মারা যান।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া হরিদাসের দীর্ঘ জীবনচিত্র দেবার কালে বারে-বারে তাঁর প্রজ্ঞা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করেছে, প্রশংসা করেছে "তাঁর উচ্চ চরিত্র, কর্তব্যনিষ্ঠা, সহৃদয়তা এবং পুরাতন ধরনের জীবনযাত্রার সরলতার বিষয়ে।" কাথিয়াবাড়-রাজনীতির প্রধান পুরুষ যে তিনিই ছিলেন, একথাও সে বলেছিল। বোম্বাইয়ের অপর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক বোম্বে গেজেটও হরিদাসের মৃত্যুর পরে তাঁর 'মন ও হৃদয়ের উচ্চ গুণাবলীর' প্রতি সমুচ্চ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। বোম্বে গেজেটের ভাষায় (১৮৯৫, ২২ অক্টোবর), "হরিদাস সেই বিরল ব্যক্তিদের একজন যিনি কেবল সম্মান আকর্ষণ করেন না, ভালবাসাও অর্জন করেন।" বোম্বাইয়ের দুজন প্রাক্তন গভর্নরের উক্তি সে উদ্ধার করেছিল। লর্ড রী লিখেছিলেন, "He was a friend of mine, for whose judgement and opinions I had the greatest regard.... Men like [him]....are very rare in India and in all countries." লর্ড হ্যারিস লেখেন, "His sound common sense and great experience

পাঠিয়ে দিলেন। এই চিঠি লুই বার্ক অধ্যাপক রাইটের কাগজপত্রের মধ্যে পেয়েছেন। স্বদেশীয় মানুষদের অযথা কুৎসায় আহত স্বামীজী খেতড়ির মহারাজের কাছে লেখা চিঠিতে খুবই নৈরাশ্য প্রকাশ করেছিলেন। উত্তরে মহারাজা সুগভীর ভক্তির সঙ্গে লেখেন :

"আমার থেকে বহু বহু গুণে জ্ঞানী যিনি, তাঁকে উপদেশ দেবার প্রয়োজন আমার নেই, তবু সাহস করে বলতে পারি, আমাদের স্বদেশবাসী কেউ আপনার পিছনে কুৎসা করেছে বলে আপনার বীতশ্রদ্ধ হওয়া উচিত নয়, কারণ 'ক্রয়-বিক্রয়ের বেলায় কাচ হল কাচ আর মণি হল মণি।' পাশ্চাত্ত্যের মহান সভ্য জনগণের কাছ থেকে কিছু সাহায্য নিয়ে মাতৃভূমির উন্নতিসাধনের যে-পরিকল্পনা আপনি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন, তাকে আপনার মতো মানুষও যদি ত্যাগ করেন—কে আর তা সফল করার কল্পনা কখনো করতে পারবে? আমি যদিও সর্বদাই আপনাকে কাছে পেতে চাই, কেননা কে জানে এ-জীবন কতদিন থাকবে, তবু আমার স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়। আমি নিশ্চয় অনুরোধ করব—দীন-দরিদ্র ভাগ্যহত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের জন্য আপনি যথাসাধ্য করে যান।...আপনার পবিত্র সান্নিধ্যলাভের জন্য আমাদের এমনই আকুলতা যে, ইচ্ছা হচ্ছে লিখি, আপনি শীঘ্র ফিরে আসুন, কিন্তু অপরপক্ষে সেকথা লিখতে কলম থেমে যাচ্ছে, বিপরীত কথাই লিখছি আমি—আপনি এখন সেই দেশেই থাকুন যেখানকার মানুষ মানবরত্নকে চিনে নেয়।"

in administration were a great source of strength to rely on when advice was needed."

অপর পক্ষে মাদক-বিরোধী আন্দোলনে উৎসাহী খৃস্টান পত্রিকা বোম্বে গার্ডিয়ানের কাছে উক্ত আন্দোলনে হরিদাসের অকুণ্ঠ সমর্থন বিশেষ সাধুবাদের কারণ মনে হয়েছিল। ১৮৯৫, ২২ জুন সংখ্যায় সে লিখেছিল, "In the death....of Mr. Haridas Viharidas, India has lost one of her most ardent Temperance reformers.... Mr. Haridas had the gratification of seeing the total prohibition of intoxicating liquors in the State [of Junagadh] during his term of office."

সমগ্র ভারতবর্ষে হরিদাস বিশেষভাবে খ্যাত হন আফিম-কমিশনের কর্মতৎপর সদস্যরূপেই। কিন্তু গুজরাটে তিনি যে, অন্যতম প্রধান বা প্রধানতম দেশীয় রাজনৈতিক ছিলেন, যিনি দেশের শিল্পবাণিজ্য ব্যাপারেও অগ্রণী চিন্তাবিদের ভূমিকা নিয়েছিলেন, একথা স্বীকার করেছিল পুনার মরাঠা ১৮৯৫, ২৩ জুনে। মাদ্রাজের হিন্দু বলেছিল, "No administrator of Native States was held in higher regard than this lamented gentleman." বাংলাদেশের বেঙ্গলীর কাছে (১৮৯৫, ৬ জুলাই) প্রাধান্য পেয়েছিল নিতান্ত সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে তাঁর 'দেশের শ্রেষ্ঠ সফল প্রশাসক হয়ে ওঠা' ব্যাপারটি। কিন্তু মহৎ ব্যক্তি-মানুষটিকে ফুটিয়েছিলেন বোম্বাইয়ের পার্শী সংস্কারক ও লেখক মালাবারি, তাঁর ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটরে ১৮৯৫, ২৩ জুনে : "বহু বৎসর হয়ে গেছে—একদা ওয়াধওয়ানে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দপূর্ণ সৌভাগ্য হয়েছিল বর্তমান লেখকের।...গভীর রাত্রে বসে তাঁর সঙ্গে যে-ভাববিনিময় হয়েছিল, তার স্পষ্ট স্মৃতি বর্তমান লেখকের আছে। সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কালে হরিদাস আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, জনগণের যথার্থ বন্ধুরূপে, সম্পূর্ণ সৎ এবং নিষ্ঠাবান কর্মীরূপে, এবং বিশ্বস্ত সেবকরূপে।...অতখানি বিনয় এবং আত্মলোপের মনোভাব না থাকলে তিনি আরও অনেক ঊর্ধ্বপদে অধিষ্ঠিত হতেন। অনেক বৎসর ধরেই তিনি অবসর নিতে চেয়েছেন। কয়েকমাস আগে যখন জুনাগড়ের কাজ ছেড়ে দেন, তখন বর্তমান লেখক তাঁকে চাপ দিয়ে বলেন, আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য গ্রহণের সুযোগ এবার জনগণকে দিন। তাতে তিনি করুণভাবে বলেন, 'দয়া করে আমাকে অব্যাহতি দিন। যে-কটা দিন বাকি আছে, ঈশ্বরের সেবায় যেন সেগুলি নিয়োগ করতে পারি।' এখানেই দেখিয়ে দিলেন—যথার্থ হিন্দু তিনি। আমার বন্ধু মোটেই জানতেন না, শীঘ্রই এই জীবনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হবে এবং তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে শ্রেষ্ঠভাবে উৎসর্গ করতে পারবেন। কিন্তু যদিচ তিনি সেরা পুরস্কার বহন করে চলে গেলেন, ভারতকে বিদায়ের দ্বারা করে গেলেন দরিদ্রতর। তিনি সর্বাঙ্গীণ-ভাবে উত্তম মানুষ ছিলেন, এবং যদিও তথাকথিত অনেক বিরাট মানুষের চেয়ে অধিক উপকারী মানুষ ছিলেন, তথাপি নিজের উচ্চ গুণাবলী সম্বন্ধে ছিলেন সর্বদাই অসচেতন।"

অধ্যাপক রাইটকে স্বামীজী যে-চিঠি লেখেন, তার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে এই পত্রে লিখিত তাঁর মনোভাবের কথা আগেই জানিয়েছি। বাকি বিষয় ঃ "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তা কেবল সমাজসংস্কারের ব্যাপারে। আর আমি সর্বদাই মনে করেছি [সাধারণ ব্রাহ্মসমাজীদের মতো করে?] মজুমদার এবং [কেশব]চন্দ্র সেন সিন্‌সিয়ার নন। আমার সে-মত ত্যাগ করার কোনো কারণ এখনো ঘটেনি। অবশ্য ধর্ম-বিষয়ে আমাদের পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার প্রভূত মতপার্থক্য। তার প্রধান অংশ হল, আমি সন্ন্যাসকে (অর্থাৎ সংসারত্যাগকে) সর্বোচ্চ আদর্শ মনে করি, আর তিনি মনে করেন তা পাপ। সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজীরা সন্ন্যাসী হওয়াকে পাপকার্য মনে করে থাকেন!"

সংবাদপত্রের এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের প্রশংসা হয়ত আমেরিকায় স্বামীজীর নিজস্ব বন্ধুদের হৃদয়ে বিশ্বাস সঞ্চার করতে পেরেছিল, কিন্তু হিন্দুসমাজের সমবেত প্রকাশ্য সমর্থন-ভিন্ন আমেরিকার সাধারণের মধ্যে তাঁর প্রতিনিধিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে মিশনারি বা অন্যান্যদের আক্রমণ একটুও কমেনি বরং বেড়েছিল এবং ইন্টিরিয়র প্রভৃতি সংবাদপত্রের সমালোচনা তাঁর বন্ধুদের যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছিল। স্বামীজী ৯ এপ্রিলের চিঠিতে আলাসিঙ্গাকে সভা করতে বলার পরে অদ্ভুতকর্মা আলাসিঙ্গা ও তাঁর বন্ধুরা ২৯ এপ্রিল বিরাট আকারে তা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ২০ জুন পর্যন্ত সে-সভার কোনো সংবাদ আমেরিকায় পৌঁছায়নি। সভা হয়ে যাবার পৌনে দু'মাস পরেও সে-বিবরণ কেন আমেরিকায় পৌঁছায় নি, তার এক বিচিত্র কারণ মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, যা বিশ্বাস-যোগ্য কি-না বলতে পারব না ঃ "যে-ব্যক্তিকে কাগজপত্র পাঠাবার কথা বলা হয়েছিল, সে নাকি তার কোনো গুরুত্ব না বুঝে কাগজখানি নিয়ে টেবিলের টানার মধ্যে পুরে রেখে দিয়েছিল, এবং মাসখানেক সে-বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। আলাসিঙ্গা মনে করেছিলেন, অভিনন্দনটি পাঠানো হয়ে গেছে।" ভারতবর্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন না পাওয়ায় স্বামীজীর অবস্থা কি-রকম শোচনীয় হয়ে পড়েছিল তা কিছুটা বোঝা যায় হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা স্বামীজীর ২০ জুনের চিঠিতে ঃ "পিছনে যারা আমার কুৎসা করেছে তারা পরোক্ষেও আমার উপকার করেনি, প্রভূত ক্ষতি করেছে, যেহেতু আমাদের হিন্দুসমাজ আমি যে তাদের প্রতিনিধিত্ব করি, এই কথা জানাবার জন্য একটা আঙুলও নাড়ায়নি। আমেরিকাবাসীরা আমার প্রতি যে-সহৃদয়তা দেখিয়েছে, তার জন্য তাদের ধন্যবাদ দিতে, আমি তাদের প্রতিনিধিত্ব করি—এই কথা জানাতে কি আমার দেশবাসী দুটো কথাও লিখে পাঠিয়েছে? পক্ষান্তরে মিঃ মজুমদার, বোম্বাইয়ের নাগরকর বলে একটা লোক, এবং পুনার সোরাবজি নামে একটি খ্রীস্টান মেয়ে আমেরিকার লোকজনদের বলেছে, আমেরিকায় হাজির হয়েই মাত্র আমি সন্ন্যাসীর বেশ চড়িয়েছি, আমি পুরো জোচ্চোর।[১৭] আমার সমাদরের ক্ষেত্রে

---

১৭ এই সময়ের আর একটি চিঠিতে স্বামীজী হরিদাস বিহারীদাসকে ঈর্ষাতুর মজুমদার প্রভৃতির কুকীর্তির বিষয়ে লিখেছেন, সেই সঙ্গে বীরচাঁদ গান্ধীর প্রশংসনীয় সংগ্রামশক্তির কথাও ঃ

"Now here is Virchand Gandhi, the Jain, whom you well knew in Bombay. This man never takes anything but pure vegetables even in this cold terrible climate, and tooth and nail tries to defend his countrymen and religion. The people of the country like him very well, but what are they doing who sent him over? They are trying to outcast him!!! Jealousy is a vice necessarily generated in slaves. Again it is jealousy that holds them down.

"Here were Mozoomdar and other Hindus, they were trying to lecture and get money thereby. They did something, but I succeeded better than they—why, I did not put myself as a bar to totheir success. It was the will of the Lord.

অবশ্য আমেরিকানদের উপরে ঐ প্রচার প্রভাব বিস্তার করেনি, কিন্তু কাজের ব্যাপারে অর্থ-সাহায্যের ক্ষেত্রে ফল মারাত্মক হয়েছে, কারণ তারা সাহায্যের হাত একেবারে গুটিয়ে ফেলেছে। এই যে এক বৎসর যাবৎ আমি এখানে আছি—এর মধ্যে ভারতবর্ষের নাম-করা একজন মানুষও কি দেখা গেল যিনি আমেরিকানদের জানিয়েছেন যে, আমি জোচ্চোর নই! তার উপর মিশনারিরা সর্বদা আমার একটা-কিছু ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং ভারতের খ্রীস্টান কাগজগুলি আমার বিরুদ্ধে যা-কিছু লিখছে তাই ব্যস্ত হয়ে খুঁজে নিয়ে এখানকার কাগজে ছাপাচ্ছে। আপনি এইটুকু জেনে রাখুন, এখানকার মানুষ ভারতের খ্রীস্টান ও হিন্দুর মধ্যে তফাতের কথা সামান্যই জানে।"

উদ্ধৃতির শেষাংশে দেখতে পাই, ভারতবর্ষের মিশনারি-(এবং ব্রাহ্ম-) পত্রিকাগুলি, যাদের প্রচার নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল—সেগুলি কিভাবে আমেরিকায় গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়ে বিবেকানন্দ-বিরোধীদের সুবিধা করে দিচ্ছিল। এই পত্রে স্বামীজী যদিও লিখেছেন, কুৎসা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত সমাদরে ঘাটতি হয়নি, কেবল ভারতীয় কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের বিষয়েই ক্ষতি হয়েছিল, তবু এই মহাপ্রাণ মানুষটি ভিতরে-ভিতরে তাঁর বন্ধুদের কাছে কতখানি সংকুচিত ছিলেন তা দেখা যায় চিঠির শেষের দিকে, যেখানে তিনি হেল-পরিবারের জন্য একটি উপহার পাঠাতে অনুরোধ করার পরে ঐ পরিবারের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে ঃ "এই পরিবারটি আমায় সর্বদা আশ্রয় দিয়েছে এবং আমাকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেছে। আমার স্বদেশীয়রা এবং এদের নিজেদের পাদরিরা কুৎসা করা সত্ত্বেও, এবং তাদের কাছে আমি কোনোপ্রকার প্রমাণ বা পরিচয়পত্র না নিয়ে আসা সত্ত্বেও, তারা পিছিয়ে যায়নি।"

এর পরে ২৮ জুন স্বামীজী জনৈক মাদ্রাজী শিষ্যকে (আলাসিঙ্গা নন) লেখা চিঠিতে জ্বালা-যন্ত্রণাকে উজাড় করে দিলেন। দেখা গেল, ক্ষোভে দুঃখে, অপমানে লজ্জায় বি-বে-কা-ন-ন্দে-র হৃদয়ও ভেঙে পড়ার মুখে। স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "তোমাদের পত্রে ক্রমাগত শুনছি, ভারতে আমাকে সকলে খুব সুখ্যাতি করছে, কিন্তু সে তো তুমি জানছ আর আমি জানছি, কারণ আলাসিঙ্গার পাঠানো তিন বর্গ-ইঞ্চি কাগজের টুকরো ছাড়া আমার সম্বন্ধে লেখা হয়েছে এমন ভারতীয় কাগজ স্বচক্ষে দেখিনি। অন্যদিকে ভারতের খ্রীস্টানরা যা-কিছু বলছে তাই সযত্নে সংগ্রহ করে মিশনারিরা নিয়মিত এখানে প্রকাশ করছে এবং বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আমার বন্ধুরা যাতে আমাকে ত্যাগ করে, সে চেষ্টা করছে। তাদের উদ্দেশ্য ভালভাবেই সফল হয়েছে যেহেতু ভারত থেকে আমার পক্ষে একটা শব্দও এখানে এসে পৌঁছায় নি।

But all of these....expect that Jain Gandhi, have fabricated most horrible lies about me in this country !! and at my back !!"

বীরচাঁদ গান্ধী ঈর্ষার নীচতার বাইরে ছিলেন, কেবল তাই নয়, স্বামীজীর জনপ্রিয়তাকে স্বীকার করার মতো উদার্যও তাঁর ছিল। আমেরিকায় মজুমদার ও মিশনারিদের প্রথম কুৎসাপর্বের বেশ কয়েক মাস পরে আমেরিকার সুপরিচিত 'এরিনা' পত্রিকার ১৮৯৫ জানুয়ারি সংখ্যায় লিখেছিলেন ঃ

"At the Parliament of Religions....it was a fact that at least a third and sometimes two-thirds of the great audience of Columbus Hall would make a rush for the exits when a fine orator from India had closed his speech. It was even a very noticeable fact that, long before the close of the great Parliament, some of my countrymen, made popular by the Parliament, were used as a drawing card to hold the great audiences, and in this way thousands were compelled to sit and listen to long, dry, prosy papers by Christians. They showed plainly that they were not interested, but there they sat enduring with much mummuring, expecting the next speaker might be one of the popular Orientals whose name was usually first on the bulletin board." [*Dicoveries;* 68-69]

ভারতের হিন্দু কাগজগুলি আমাকে আকাশে চড়াতে পারে, কিন্তু তার একটি কথাও আমেরিকায় হাজির হয়নি, যার জন্য এদেশের অনেকেই আমাকে জোচ্চোর ভাবছে। এখানকার ঈর্ষাকাতর হিন্দুদের সাহায্যে পুষ্ট মিশনারিদের আক্রমণের সামনে বলার মতো আমার একটা কথাও নেই। এখন মনে হচ্ছে, মাদ্রাজের কতকগুলি ছোকরার পীড়াপীড়িতে ধর্মমহাসভায় আসা আমার পক্ষে আহাম্মকি হয়েছে—তারা তো বালক বই আর কিছু নয়। অবশ্য অনন্ত কালের জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু তারা গুটিকতক উৎসাহী ছোকরা ভিন্ন আর কি, যাদের বাস্তব কাজের ক্ষমতা একদম নেই। আমি এখানে কোনো পরিচয়পত্র নিয়ে আসিনি। এখন আমি মিশনারি ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধিতার মুখে কি করে প্রমাণ করব যে, আমি জোচ্চোর নই? আমি মনে করেছিলাম যে, গোটাকতক বাক্যব্যয় করা ভারতের পক্ষে কঠিন কোনো কাজ হবে না। মনে করেছিলাম, মাদ্রাজ ও কলকাতায় কিছু সম্ভ্রান্ত লোকের সভা ডেকে সেখানে আমার প্রতি সহৃদয়তা দেখানোর জন্য আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ-প্রস্তাব পাস করিয়ে সেটা সরকারীভাবে অর্থাৎ অনুষ্ঠানের সম্পাদক মারফত আমেরিকায়, বিশেষতঃ ডাঃ ব্যারোজের কাছে, পাঠানো এবং বস্টন, নিউইয়র্ক, চিকাগো প্রভৃতি স্থানের সংবাদপত্রে তাকে প্রকাশ করতে অনুরোধ জানানোর চেয়ে সহজ কাজ আর-কিছু হতে পারে না। এখন দেখছি, ভারতের পক্ষে এটা একটা ভয়ংকর কঠিন কাজ। এক বছরের মধ্যে আমার পক্ষে কেউ একটা টু শব্দও করলে না, অন্যদিকে সবাই বিপক্ষে—তোমরা ঘরে বসে আমার সম্বন্ধে কি বলো না বলো, এখানে তার কে কি জানে? দু'মাসের বেশি হয়ে গেল, এ-বিষয়ে আলাসিংগাকে লিখেছিলাম। সে আমার চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিলে না। আশংকা হয়, তার উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে।...প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এ-দেশে আমি জুয়াচোর হয়ে দাঁড়ালাম! পরিচয়পত্র না নিয়ে ধর্মমহাসভায় আসাই আমার আহাম্মকি হয়েছিল। ভেবেছিলাম, অনেকেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে।...মাদ্রাজী খোকার দল...সারাদিন বাজে কথা, আর যেই কাজের সময় এল অমনি কারো পাত্তা নেই!! বোকারামেরা পঞ্চাশটা লোক জড়ো করে, কতকগুলো সভা করে, আমাকে সাহায্যের জন্য গোটাকতক ফাঁকা কথা পাঠাতে পারলে না, তারা আবার জগৎকে শিক্ষা দেবার বড়-বড় বচন ঝাড়ে।"

স্বামীজীর ক্ষতবিক্ষত হৃদয় একেবারে খুলে গেল ঃ

"বিদায়, হিন্দুদের যথেষ্ট দেখা গেল। এখন প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমার কর্মফলের কাছে মাথা নামিয়ে দিলাম। যাইহোক, আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না।...মাদ্রাজীরা আমার জন্য যতটা করেছে আমি ততটা পাবার উপযুক্ত ছিলাম না। তারা তাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত আমার জন্য করেছে। কিন্তু আমারই আহাম্মকি হয়েছিল, ক্ষণকালের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমরা হিন্দুরা এখনো মানুষ হইনি। আমার আহাম্মকি, আমি ক্ষণকালের জন্য আত্মনির্ভরতা হারিয়ে হিন্দুদের উপরে নির্ভর করেছিলাম—তাতে এই কষ্ট পেলাম। প্রতি মুহূর্তে আশা করেছি, এই বুঝি ভারত থেকে কিছু এল। না, একটুও কিছু এল না। বিশেষতঃ গত দু'মাসের প্রতিটি মুহূর্ত কী যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে! ভারত থেকে একটা সংবাদপত্রের টুকরো পর্যন্ত নয়! আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করতে লাগল—মাসের পর মাস—কিন্তু কিছু এল না, একটা আওয়াজ পর্যন্ত নয়। ফলে অনেকে শীতল হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত আমাকে ত্যাগ করলে। কিন্তু এ হল মানুষের, পশুবৎ মানুষের উপর নির্ভর করার শাস্তি, আমার দেশবাসী তো এখনো মনুষ্যপদবাচ্য হয়ে ওঠেনি। নিজেদের প্রশংসা শুনতে তারা খুব তৈরী, কিন্তু যখন ফিরে অপরের জন্য সামান্য বাক্যব্যয় করার সময় আসে, তাদের টিকি দেখা যায় না।

"মাদ্রাজী যুবকদের আমার অনন্ত ধন্যবাদ, প্রভু তাদের সদাসর্বদা আশীর্বাদ করুন। কোনো ভাব প্রচার করার পক্ষে আমেরিকা জগতের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র—তাই আমি শীঘ্র আমেরিকা ত্যাগ করবার কল্পনা করছি না। কেন? এখানে খেতে পরতে পাচ্ছি, সকলে

কত সহৃদয়, আর সবকিছুই দু-দশটা ভাল কথা শোনানোর জন্য! এমন মহান জাতকে ছেড়ে দিয়ে, পশুপ্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ, মস্তিষ্কহীন, অনন্ত যুগের কুসংস্কারে আবদ্ধ দয়াহীন, মমতাহীন হতভাগাদের দেশে কি করতে ফিরে যাব? সুতরাং আবার বলি—বিদায়।...অনুগ্রহ করে জি জি, আলাসিঙ্গা, সেক্রেটারি এবং অপর সকলকে আমার অনন্তকালের আশীর্বাদ জানাবে, আমি সর্বদা তাদের কল্যাণপ্রার্থনা করছি, আমি তাদের উপর বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইনি—অসন্তুষ্ট হয়েছি নিজেরই উপর। জীবনে এই একবারই অপরের সাহায্য পাবো, এই আশা করার মতো ভয়ানক ভুল করেছি—তার শাস্তিও পাচ্ছি। এ আমারই দোষ, তাদের নয়। প্রভু মাদ্রাজের সকলকে আশীর্বাদ করুন। তারা অন্ততঃ বাঙালীদের চেয়ে বহু গুণে উন্নত—বাঙালীরা কেবল আহাম্মক ছাড়া কিছু নয়, তাদের প্রাণ নেই, বুঝবার ক্ষমতা নেই। বিদায়, বিদায়, আমি এখন সমুদ্রবক্ষে তরণী ভাসিয়েছি—যা হবার হোক।'১৮

স্বামীজী লিখেছেন, জীবনে একবার মাত্র অপরের উপরে নির্ভর করার মতো ভয়ানক ভুল করেছিলেন। অপরের সাহায্যের উপরে নির্ভরতার ব্যাপারে কথাটা হয়ত সত্য, কিন্তু যে-কথা ভেবে এই কথাগুলি বলেছিলেন, তা ভাবার সত্যই কারণ ছিল না—"নিঃস্বার্থহৃদয় মাদ্রাজী যুবকবৃন্দ" তাঁর জন্য যথাসাধ্যই করেছিলেন তা আগেই দেখে এসেছি। মাদ্রাজের ধন্যবাদ-সভা স্বামীজীর এই ২৮ জুনের চিঠির দুমাস আগে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, ব্যবস্থার দোষে সে সংবাদ স্বামীজীর কাছে পৌঁছয়নি। বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে যখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরগুলি পূর্ণ, ঠিক তখনি সেই ধ্বনির একটুকু অংশলাভ করবার জন্য কাতর হয়ে অপেক্ষা করছেন উদ্দিষ্ট মানুষটি—এর থেকে ট্রাজি-কমেডি আর কি হতে পারে! ঈশ্বরের প্রতি নিগূঢ় অভিমানে ঈশ্বরতনয়ের মন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল—আর ঈশ্বর তখন

১৮ স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজী ভক্তদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন। ঐসব ভক্তরা স্বামীজীকে যথেষ্টই জানতেন, সুতরাং তাঁরা স্বামীজীর ভাষার মধ্যে স্বামীজীকেই দর্শন করতেন—একটুও ক্ষুণ্ণ হননি সেই জন্য। জি জি নরসিমাচার্য ১৮৯৪, ২৯ নভেম্বর স্বামীজীকে লিখেছেন :

"আপনার কাছ থেকে এসেছে, এমন কোনো কিছুই রূঢ়-কর্কশ নয়, বাড়াবাড়ি নয়, আমাদের কাছে। আমরা যে-কয়জন এখানে আছি, এতদিন আমরা আবদ্ধ ছিলাম রক্তমাংসের বস্তু-বন্ধনে; কিন্তু এখন অন্যতর এক স্থিতিস্থাপক বন্ধনের অস্তিত্ব অনুভব করছি, যা তার আনন্দমধুর রশ্মিতে সমগ্র বিশ্বকে বেঁধে ফেলতে পারে, যা এতদিন চোখের আড়ালে থেকে গিয়েছিল—আমাদের কয়েকজনের কাছে অন্ততঃ তার নাম **বিবেকানন্দ**।...আপনি কি আমাদের ভালবাসেন না? নিশ্চয় বাসেন। আমরা কি এখনো অজ্ঞান শিশু নই, যাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে? যতদিন না প্রভুর দেখা পাই, কেমন করে বিশ্রাম নেবো আমরা?"

বিবেকানন্দ-সংবাদ ভারতে নবজাগরণ এনেছে, এবং মিশনারিরা কিভাবে তাকে প্রতিহত করতে উঠে-পড়ে লেগেছে, সে-বিষয়ে ইনি লেখেন : "আমার আগেকার চিঠিগুলিতে ইঙ্গিত করেছিলাম, আপনি ওখানে [আমেরিকায়] যা-কিছু করেন, তাই প্রবলতর শক্তিতে ভারতে ফিরে আসে। প্রত্যেকেই এখানে এখন আকাশ-বাতাসে ধর্মকে অনুভব করছে। অধঃপতিত হীনেদের বন্ধু কিছু মিশনারি সহসা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে আবহাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর বলে অনুভব করে, তার সবকিছুর জন্য আপনাকেই দায়ী মনে করছে, এবং আপনার উদ্দেশ্যে দূর সমুদ্রপারে বর্শা-বল্লম ছুঁড়ে দিচ্ছে।"

আলাসিঙ্গা এবং কিডি একই সঙ্গে স্বামীজীকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কিডি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত বচনে মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের মাদ্রাজ থেকে বদলি হওয়ার সংবাদ দিয়ে লিখেছিলেন, "সম্ভবতঃ তিনি তাঁর মাদ্রাজের কার্য সমাধা করে ফেলেছিলেন—আপনাকে মাদ্রাজে পরিচায়িত করে দিয়ে।"

আলাসিঙ্গা ধর্মজাগরণ-প্রসঙ্গে লেখেন : "আমরা যতই মনে করতে চেষ্টা করি না কেন, বর্তমান ধর্ম-জাগরণে আমাদের কিছু ভূমিকা আছে, কিন্তু দেখছি, নিজেদের মধ্যে সে প্রত্যয় জাগছে না। আমরা একেবারে কিছুই করিনি। সব-কিছুই করেছে আপনার ভিতরে জ্বলছে যে-অধ্যাত্ম-অগ্নি, তাই। আপনি চান, আমরা আপনার সহযাত্রী হই। কিন্তু যখন দেখি, কি বিরাট কাজ আপনি করছেন, তখন আমাদের হতাশ মনে এই কথাটা ওঠে—ক্ষণকালের জন্যও আপনার ভার লাঘব করবার মতো কিছু করে উঠতে পারলাম না।"

তাঁর কিছু নিষ্ঠুর লীলার আনন্দ উপভোগ করছিলেন সন্তানের ভ্রান্তিজাত দুঃখের রূপ দেখে। অবশেষে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে স্বামীজী কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে ১৪ মে তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় "বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্তো হিন্দুধর্মের প্রচার" বিষয়ে বক্তৃতার রিপোর্ট পেলেন, যে-সভায় বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ও পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, এবং পেলেন বহু প্রত্যাশিত আলাসিঙ্গার পত্র—যে-পত্র 'সারা দেশ ঘুরে' তাঁর কাছে পৌঁছেছিল—তাতে তিনি মাদ্রাজ-অভিনন্দন সভার কথা জানলেন। এ চিঠি পেয়ে সভার প্রস্তাবাদি কিভাবে আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে এবং ডাঃ বারোজ ও ডাঃ রাইটকে পাঠাতে হবে, তা লিখে পাঠালেন ১১ জুলাইয়ের চিঠিতে। অনেক ধাক্কা খেয়ে বোধহয় স্বামীজীর জ্ঞান হয়েছিল; নিজ স্বভাবের অননুরূপ এক সিদ্ধান্ত তিনি করে ফেলেছিলেন : "আমি এইবার নিয়মিত-ভাবে কাজ করব স্থির করেছি। কলকাতায় লেখো, তারা আমার ও আমার কাজ সম্বন্ধে কাগজে যা-কিছু বেরোয়, কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে যেন পাঠায়। তোমরা মাদ্রাজ থেকেও পাঠাতে থাকো।" নিয়মিত কাজ করার প্রতিজ্ঞাকে এবং সংবাদপত্রের রিপোর্ট চেয়ে পাঠানোকে স্বামীজীর স্বভাবের অনুরূপ নয় কেন বলেছি, তা তাঁর জীবনী পাঠকমাত্রে জানেন। তাঁর থেকে বাস্তববোধসম্পন্ন প্রফেট যেমন বিরল—কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁর বহু নির্দেশ থেকে তা সহজেই প্রমাণ করা যায়—ঠিক তেমনি, প্রফেট ছিলেন বলেই, তাঁর ঐ বাস্তববোধ নিজের সম্বন্ধে জাগরূক ছিল না। আর নিজের বিষয়ে রচনা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে?—অল্পদিনের মধ্যেই দেখব, স্বামীজী ত্রাহি-ত্রাহি করে উঠেছেন সংবাদপত্রের ভালবাসার আক্রমণে।

স্বামীজীর এই ১১ জুলাইয়ের পত্রের একাংশে আছে : "যদি কলকাতা থেকেও বড়-বড় নাম দিয়ে এ-রকম সব আসে (অর্থাৎ অভিনন্দনপত্র), তাহলে আমেরিকানরা যাকে বলে *boom* তাই পাব—যুদ্ধের অর্ধেক জয় হয়ে যাবে।"

স্বামীজীর ভাগ্যচক্র এই সময়ে দ্রুত ঘুরতে থাকে। জুন মাসের শেষ পর্যন্ত তাঁর চোখের সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু ছিল না; জুলাই মাসের গোড়ার দিকে মাদ্রাজ অভিনন্দন-সভার সংবাদ পেয়ে কিছুটা মানসিক স্বস্তি পেলেন; কিন্তু তা সম্পূর্ণ আনন্দজনক হয়নি যতক্ষণ-না ঐ সংবাদ আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা হল ৩০ অগস্ট। বস্টন ইভনিং ট্রানস্ক্রিপ্টে ঐ তারিখে কেবল মাদ্রাজ-সভার প্রস্তাবগুলিই বেরুল না, তার উপরে অনুকূল সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হল; ৩১ অগস্ট 'চিকাগো ইন্টারওসান' কাগজ একই ধরনের সম্পাদকীয় লিখল; ২ সেপ্টেম্বর লিখল নিউইয়র্কের 'সান' কাগজ; এবং ৩ সেপ্টেম্বর সেখানকার 'ডেইলী ট্রিবিউন।' এই সকল সংবাদের মধ্যেই এসে পড়ল কলকাতা-অভিনন্দনের সংবাদ।

মাদ্রাজ-অভিনন্দন স্বামীজীর কাজের কতখানি সহায়তা করেছিল, তা তিনি ২৫ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন : "আমি এখন মাদ্রাজীদের *Address*, যা এখানকার সব কাগজে ছেপে ধূমক্ষেত্র মেচে গিয়েছিল, তারই জবাব লিখতে ব্যস্ত। যদি সস্তা হয় তা ছাপিয়ে পাঠাবো, যদি মাগ্‌গি হয় তো type-writing করে পাঠিয়ে দেব। তোমাদেরও এক কপি পাঠাবো—ইণ্ডিয়ান মিরারে ছাপিয়ে দিও।" মাদ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তরের মধ্যে তিনি মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়েছিলেন তা বুঝতে পারা যায় যখন দেখি যে, ২৯ সেপ্টেম্বর আলাসিঙ্গাকেও একই কথা লিখেছেন : "আমি তোমাদের অভিনন্দনের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত আছি। ইহা ছাপাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। তা যদি সম্ভবপর না হয়, খানিকটা-খানিকটা করিয়া ইণ্ডিয়ান মিরার ও অন্যান্য কাগজে ছাপাইবে।" মাদ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তর প্রকাশের জন্য স্বামীজীর অত্যধিক আগ্রহের কারণ—ভারতের উদ্দেশ্যে এই হল স্বামীজীর প্রথম প্রকাশ্য মেসেজ।

২২ অক্টোবরের মধ্যে আমেরিকার সংবাদপত্রে কলকাতার অভিনন্দন-পত্র প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।

॥ ৮ ॥

এতক্ষণ আমরা একদিকের চিত্র দেখছিলাম—আমেরিকায় বিবেকানন্দ-বিরোধীদের কার্য-কলাপ, তাতে স্বামীজীর প্রাথমিক বিপত্তি ও সেই বিপত্তি কিভাবে স্বামীজী কাটিয়ে ওঠেন—তারই ইতিহাস। আমেরিকায় সংঘাতের ইতিহাস পূর্ণভাবে উপস্থিত করিনি, ভারতীয় চিত্রটি সম্পূর্ণ করবার জন্য তার খসড়া-মাত্র হাজির করেছি। এবার পুনশ্চ ভারতীয় পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করব। স্বামীজীর সাফল্যসংবাদ ভারতের বৃহত্তর জনগণের মধ্যে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের বৃহৎ অংশে, সাদরে সংবর্ধিত হলেও তাঁর সকল মত সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। প্রচলিত রক্ষণশীল হিন্দুধারণার অনেকগুলিই তিনি ভেঙেছিলেন, এবং তা ভেঙে কোনোই কুণ্ঠাবোধ করেননি, সুতরাং তাঁর জীবনরীতির বা মতের বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। সর্বোপরি একটা প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছিল—যাকে তিনি হিন্দুধর্ম বলে প্রচার করছেন, তা কি যথার্থ হিন্দুধর্ম? এ-প্রশ্ন হিন্দুধর্মের মতো জটিল ও বহুমতবিশিষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে উঠবেই। স্বামীজী জাতি ও ধর্মের গৌরব বর্ধন করেছেন, একথা মেনে নিয়েও অনেকে তাঁর মতবাদকে সম্পূর্ণ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এছাড়া তাঁর সাফল্যে যে-সব সম্প্রদায়ের বা ব্যক্তির স্বার্থে আঘাত লেগেছিল, তারা যে, তাঁর বিরোধিতায় নেমে পড়েছিল, তা না বললেও চলবে, এবং সে-বিষয়ে অনেক-কিছু বলে এসেছি ইতিপূর্বে।

প্রথমেই, যে-মহল থেকে তাঁর বিরোধিতা স্বাভাবিক নয়, সেখানেও কেউ-কেউ নাকি তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন বিস্ময়কর সংবাদ আমরা পেয়েছি। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, প্রথম পর্বে রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর ভিতর থেকেই নাকি কেউ-কেউ তাঁর বিরোধিতা করে-ছিলেন। এর আগে আমরা দীর্ঘ আলোচনায় দেখাবার চেষ্টা করেছি, স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার সংবাদ রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে কতখানি জানা ছিল। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্যগণের অনেকেই তাঁর পাশ্চাত্ত্যযাত্রার সংবাদ জানতেন। আমেরিকায় স্বামীজীর অভাবিত কৃতিত্ব-সংবাদে তাঁর গুরুভাইরা স্বতঃই আনন্দে অভিভূত হন। কিন্তু স্বামীজীর কর্মাদর্শকে সকল গুরুভ্রাতা মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে পাই, ১৮৯৭ সালে তিনি ভারতে ফেরার পরে তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত মানবসেবামূলক কর্মাদি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের অনুরূপ কি-না—এ-প্রশ্ন তুলেছিলেন স্বামী যোগানন্দ। স্বামীজী তার উত্তরে কী বলেছিলেন, এবং কি স্মরণীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল ঐ কথোপকথনকালে—স্বামীজীর জীবনীতে তা একটি অপূর্ব খণ্ডকাহিনীর বিষয়বস্তু। এ সমস্ত কথা স্বামীজীর জীবনীতে আছে, নেই অন্য একটি কথা—স্বামীজীর সাফল্যসংবাদ ভারতে পৌঁছানোর পরেই আলমবাজার-মঠের গুরুভাইদের দু'একজন সাময়িকভাবে বিশেষ কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে-ছিলেন। এই সংবাদ পেয়েছি মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা থেকে। তিনি জানিয়েছেন, স্বামীজীর বেদান্তভিত্তিক বক্তৃতার রিপোর্ট আলমবাজার-মঠে উপস্থিত হলে তার বিষয়-বস্তুতে কেউ-কেউ, বিশেষতঃ স্বামী প্রেমানন্দ খুশি হননি। বক্তৃতাগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ না থাকায় প্রেমানন্দ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে থাকেন যে, নরেন্দ্রনাথ বিশেষ অহঙ্কারী হয়ে উঠেছেন, কেবল নিজের নাম জাহির করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলছেন না, আর সেটা তার পক্ষে স্বাভাবিক, সে কখনই ঠাকুরকে মানত না, মুখের উপরে তর্ক করত, চোট-পাট জবাব দিত; এখন সে ঠাকুরকে সরিয়ে নিজের মতই প্রচার করছে, ইত্যাদি। স্বামী প্রেমানন্দ অতঃপর হরমোহন মিত্র প্রভৃতি কয়েকজনকে জুটিয়ে স্বামীজীর সমালোচনা করে বেড়াতে

থাকেন। প্রথম-প্রথম অন্য গুরুভাইরা ব্যাপারটাকে লঘুভাবে নিয়েছিলেন, এবং স্বামী প্রেমানন্দকে উস্‌কে দিয়ে মজাবোধ করতেন। পরে তাঁরা বিরক্ত হন। এর কিছুদিন পরে আলমবাজার-মঠে প্রেরিত এক চিঠিতে স্বামীজী লেখেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করা হয়নি বলে কেউ যেন উদ্বিগ্ন না হন। এখানে প্রথমেই তাঁর নাম করতে গেলে লোকে সেরূপ সম্মান না দেখাতে পারে, সেইজন্য প্রথমে নিজের পা জমিয়ে নিতে হচ্ছে, বেদান্তের কথা বলতে হচ্ছে, ইত্যাদি। স্বামীজীর এই চিঠি পড়বার পরে স্বামী প্রেমানন্দের মত সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিনি বলতে থাকেন, তাই তো, আমরা যে-সব কথা বলাবলি করছিলাম নরেন সেখানে বসে সে-সব কথা টের পেয়েছে, তাহলে নরেনের দেখছি শক্তি জন্মেছে; তা তো হবেই, তিনি নরেনকে কত ভালবাসতেন; নরেন ঠিকই বলেছে, নিজেকে একটু দাঁড় করাতে না পারলে গুরুকে অন্যে মানবে কেন? না, আমি আর ওসব কথায় নেই, নরেন যা বলে তাই আমার মত।

মহেন্দ্রনাথের এই স্মৃতিকথার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে একটু বিচার করা ভাল, যেহেতু এই কথা অন্যত্র কোথাও পাইনি। রামকৃষ্ণ মিশন-প্রকাশিত জীবনী-গ্রন্থগুলিতে বিস্ময়কর সত্য-প্রীতি দেখা যায়, যোগানন্দ-প্রমুখের সঙ্গে স্বামীজীর মতসংঘর্ষের কথা মিশন-প্রকাশিত জীবনী থেকেই পেয়েছি; এবং গুরুভাইদের বহু কঠোর সমালোচনা স্বামীজী তাঁর পত্রা-বলীতে করেছেন—তাও মিশনের প্রকাশিত বইয়ে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং প্রেমানন্দ-স্বামীর এই বিরোধিতার ব্যাপারটি যদি তাঁরা প্রকাশ না করে থাকেন তাহলে এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে। বিশেষতঃ মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথার সকল তথ্যকে সম্পূর্ণ প্রামাণিক বলে মিশন স্বীকার করে না, কারণ স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের কয়েকজনের জীবিতকালে মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা বেরিয়েছিল, তাঁরা কোনো-কোনো ঘটনা ঠিকভাবে লেখা হয়নি বলে আপত্তি করেছিলেন। তাছাড়া মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, স্বামী প্রেমানন্দের মতো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাঁর লেখায় উপযুক্ত স্থান পাননি। এর পিছনে প্রেমানন্দ-সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথের কোনো ব্যক্তিগত বিরূপতা ছিল কি-না, বলতে পারব না।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও এক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত তথ্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না, এবং মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থ ক্রমেই পরিচিত হয়ে উঠছে বলে বিচার না করে ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়, বিশেষতঃ আমার পক্ষে, কারণ স্বামীজী কি-ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলেন তাই যখন আমার আলোচনার মুখ্য বিষয়। এবং এখানে জানিয়ে দেওয়া যায়, স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে যদি ব্যাপারটার উল্লেখ না থাকে, তার কারণ হয়ত, স্বামীজীর জীবনীর পক্ষে ব্যাপারটা সামান্য, এবং সত্যই তাই।

মহেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত তথ্যকে যদি মোটামুটি মেনেও নেওয়া হয়, তবু স্বীকার করতে হবে, প্রদত্ত সংবাদে কিছু ফাঁক আছে। স্বামী প্রেমানন্দ ঠিক কতদিন পর্যন্ত বিরোধিতা করে-ছিলেন ঠিক বুঝতে পারছি না। ১৮৯৪-এর মাঝামাঝি সময়ে আলমবাজার-মঠে পাঠানো স্বামীজীর একটি চিঠি থেকে অনুমান করা যায়, স্বামীজীর কোনো-কোনো কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে প্রেমানন্দ তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। স্বামীজী আলমবাজার-মঠে পাঠানো চিঠিতে তার উত্তরে লেখেন ঃ "বাবুরামের (প্রেমানন্দের) লম্বা পত্র পড়লাম।...বাবুরাম অনেক delirium বকেছে।" মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, এই পত্রটির সঙ্গে আর একটি পত্র আলমবাজার-মঠে এসেছিল, যার মধ্যে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের নাম প্রচার না করায় ভক্তদের বিচলিত হতে বারণ করেন, এবং সেই পত্র দেখেই প্রেমানন্দ-স্বামীর মত বদলে যায়, কারণ তিনি মনে করে-ছিলেন, নরেন্দ্রনাথ বহু দূর থেকে আলমবাজার-মঠের কথাবার্তা বুঝবার শক্তি অর্জন করেছেন। মহেন্দ্রনাথের কথা আক্ষরিকভাবে সত্য হতে পারে না যেহেতু উল্লিখিত চিঠিতে স্বামীজী প্রেমানন্দের পত্রপ্রাপ্তির কথা বলেছেন। সুতরাং মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় কিছু

কালের গণ্ডগোল হয়েছেই। তবে একথা এখানে জানানো যায়, এর কাছাকাছি সময়ে স্বামীজী চিঠিতে যেমন অন্ধ অবতারবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন, তেমনি একই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে চরিত্রাংশে অন্য সকল অবতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতে দ্বিধা করেননি। অধিকন্তু, ১৮৯৪-এর শেষের দিকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী বলেছেন ঃ "দাদা, এমন চক্ষু আছে যা ৭০০০ ক্রোশ দূরে দেখে—একথা সত্য বটে।"

সুতরাং মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় কালের গণ্ডগোল স্বীকার্য। অবশ্য এমনও হতে পারে, ঐ যে-পত্রে স্বামীজী বাবুরামের delirium-পূর্ণ চিঠির উল্লেখ করেছেন, সেটি পাবার আগে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুল্লেখে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ ছিল—সে-চিঠি পেঁছবার আগেই প্রেমানন্দ তাঁর অভিযোগপূর্ণ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবং স্বামীজীর সেই চিঠিটি পত্রাবলীতে নেই।

এই সমস্ত সম্ভব-অসম্ভব অনুমানে আর কালক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। এখানে বক্তব্য, প্রেমানন্দের ঐকালীন আচরণ সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথার মোট বক্তব্যকে (খুঁটিনাটি সব তথ্যকে নয়) অগ্রাহ্য করি না, এই জন্য যে, প্রেমানন্দের পক্ষে ঐ ধরনের আচরণ একেবারে অস্বাভাবিক নয়। প্রেমানন্দ সর্বোচ্চশ্রেণীর আধ্যাত্মিক পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ঈশ্বরকোটি বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুযায়ী তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ঈশ্বরকোটি মোট সাত জন—তার মধ্যে পাঁচজন সন্ন্যাসী এবং দুজন গৃহী। গৃহীরা হলেন, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। সন্ন্যাসীরা হলেন, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ। শেষোক্ত পাঁচজনের মধ্যে যোগানন্দ ও প্রেমানন্দ কোনোদিনই কর্মে আসক্ত নন। ব্রহ্মানন্দ অতীব অন্তর্মুখ চরিত্র হয়েও পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে কর্মশক্তির প্রভূত বিকাশ দেখান, যার জন্য স্বামীজী বলেছিলেন, রাখাল রাজ্য চালাতে পারবে। স্বামী নিরঞ্জনানন্দও উভয় শক্তিতে সমৃদ্ধ ছিলেন, যদিও তাঁর কর্মশক্তির স্পষ্ট ফল আমরা বিশেষ লক্ষ্য করি না। বহিরঙ্গ কর্ম সম্বন্ধে অনাগ্রহী যোগানন্দের স্বামীজীর কর্মনীতির বিষয়ে আপত্তির কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি, এখানে যদি প্রেমানন্দের আপত্তির ঘটনাটি উত্থাপন করি তাহলে কাহিনীটি বোধহয় পূর্ণায়ত হয়।

একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখব, স্বামীজীর কথাবার্তা বা মতাদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ করার স্বাভাবিক হেতু ছিলই, অন্ততঃ প্রেমানন্দের মতো মানুষ তা সহজেই করতে পারতেন। প্রেমানন্দ গুরুগতপ্রাণ। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বকে তিনি বৈষ্ণবের ঐকান্তিক ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। বাবুরামের মধ্যে এই বৈষ্ণবতা লক্ষ্য করেই স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস-নাম দিয়েছিলেন প্রেমানন্দ। ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মধ্যেও এই বৈষ্ণব ভাবপ্রাণতা ছিল, কিন্তু তাঁরা গৃহী ছিলেন—প্রেমানন্দ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। জ্ঞানের পথে গুরুকে গ্রহণ করা অপেক্ষা ভাবের পথেই তাঁকে পেতে চেয়েছিলেন। নম্রতা, চরিত্রমাধুর্য এবং শুদ্ধসত্ত্ব স্বভাবের জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন, এবং তাঁর সমাধিকালে অল্প যে-কয়েকজন তাঁকে যন্ত্রণা না-দিয়ে স্পর্শ করতে পারতেন, প্রেমানন্দ তাঁদের অন্যতম। অপরদিকে নরেন্দ্রনাথ প্রচণ্ড পৌরুষের মূর্তি, ভিতরে ভাব-প্রেম যতই থাক বাইরে জ্ঞানের জ্বলন্ত আকার, যে-কোনো ভাববিহ্বলতাকে আঘাত করে উল্লসিত। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে পর্যন্ত তিনি রেহাই দেননি—প্রেমানন্দ-প্রমুখের ভাবপ্রাণতা তাঁর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত তো হতই। নিশ্চয় কিশোর বাবুরামের পক্ষে নরেন্দ্রনাথের আপাত উগ্র বুদ্ধিবাদ ও সংশয়বাদের ভিতরে ঢুকে অগ্নি-গলিত হৃদয়ের স্বরূপ সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব হয়নি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন কেই-বা তাঁকে তখন সম্পূর্ণ বুঝেছেন—সুতরাং বাবুরামের কোমল মন বহুভাবে বিরক্ত, বিক্ষত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের সংশয়তীক্ষ্ম আচরণে। এ-ব্যাপারে প্রেমানন্দের মন কতখানি পীড়িত ছিল তার চরম নিদর্শন দেখা যায় স্বামীজীর সাফল্যসংবাদ আসার পরে। মহেন্দ্র-

নাথের বিবরণ-অনুযায়ী প্রেমানন্দ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যদি তা হয়ে থাকেন তার মূলে আছে পূর্বসঞ্চিত দুঃখ এবং সেই দুঃখের মূলে বলাই বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অনন্যনিষ্ঠ ভক্তি।১৯

আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করা যায়। পরিব্রাজক-জীবনে নরেন্দ্রনাথ গাজিপুরের যোগী পওহারী-বাবার কাছে যোগকৌশল শিক্ষার জন্য যান, এবং এমন এক সময় আসে যখন তিনি শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য পওহারী-বাবার কাছে দীক্ষা নেবেন স্থির করেন। ইতিপূর্বে বরাহনগর-মঠে অধ্যাত্মসাধনাকালে নরেন্দ্রনাথ ও কালীপ্রসাদের (অভেদানন্দ) অতিরিক্ত পাঠানুরাগ অনেক গুরুভাইয়ের ভাল লাগেনি, অন্ততঃ অভেদানন্দ তাঁর আত্মকথায় তাই বলতে চেয়েছেন। বইপড়া বিদ্যাকে ভাবোন্মাদ সন্ন্যাসীদের কেউ-কেউ ধর্মপথে বিঘ্নজ্ঞান করেছিলেন। এর পরে নরেন্দ্রনাথ ও অনেকে পরিব্রজ্যায় বেরিয়ে পড়েন। তারই মধ্যে যখন সংবাদ এল—নরেন্দ্রনাথ অন্য গুরুকে গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তখন বাবুরাম-মহারাজ স্বতঃই বিচলিত হয়েছিলেন—বোধহয় সর্বাধিক বিচলিত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তাহলে তাঁর পূর্ব আশঙ্কা সত্য হবার পথে! অথচ নরেন্দ্রনাথকে বর্জন করাও সম্ভব নয়—শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে কোন্ চোখে দেখতেন বাবুরাম তা কারো চেয়ে কম জানতেন না। ভাবের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সংঘর্ষ হলেও, তিনি যে 'আমাদের সর্বস্ব'—এ-বোধ বাবুরামের ছিলই। সুতরাং বিচলিত বাবুরাম নরেন্দ্রনাথকে ফেরাতে গাজিপুরে ছুটলেন, এবং তাঁকে নরেন্দ্রনাথ অত্যধিক রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দিলেন।২০ নরেন্দ্রনাথ যদিও পওহারী-বাবার কাছে দীক্ষা নেন নি, কেননা বুঝেছিলেন যে, 'রামকৃষ্ণের জুড়ি নেই'—তবু মনে হয়, বাবুরামের মনে সন্দেহের বীজ থেকে গিয়েছিলই। তারপরে নরেন্দ্রনাথ আমেরিকায় গেলেন, তাঁর বক্তৃতার অভূতপূর্ব সমাদর হল, অথচ সে-সব বক্তৃতায় গুরুর নাম নেই—সন্ন্যাসী শিষ্যের পক্ষে যা করা ন্যূনতম কর্তব্য। এতদিন পর্যন্ত যে-সন্দেহ বাবুরামের মনে ধিক্-ধিক্ করছিল, তা এবার দাউ-দাউ করে উঠল। নাতিখ্যাত নরেন্দ্রনাথই যখন 'অহঙ্কারে পূর্ণ,' (নম্র মানুষের কাছে নরেন্দ্রনাথের শক্তিবাহুল্য ও-সন্দেহ সর্বদাই জাগাত), তখন বিখ্যাত বিবেকানন্দ যে, গুরুত্যাগী হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

১৯ নরেন্দ্রনাথের একান্ত অনুগত শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) পর্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে নরেন্দ্রনাথের আচরণে কতখানি উত্যক্ত হয়ে উঠতেন, তার একটি দৃষ্টান্ত অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবনকথা'র মধ্যে দিয়েছেন। শশী পূজা ও ঠাকুরঘরের ভক্ত—অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী। "নরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস-গ্রহণের পর গোড়ার দিকে ঠিক এই ধরনের নিত্যপূজা সমর্থন করিত না। তাহাতে শশীর সঙ্গে তাহার মাঝে-মাঝে বাদানুবাদও হইত। ঘটনা ঘটিল যে, যখন একদিন নরেন্দ্রনাথ শশীর নিত্যপূজার বিরুদ্ধে খুব জোর করিয়া বলিতে লাগিল, তখন শশী বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মাথার চুল মুঠা করিয়া ধরিয়া তাহাকে ঠাকুরঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।"

নরেন্দ্রনাথ এই ঘটনায় একেবারেই রুষ্ট হননি, অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন, কারণ ওর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল 'শ্রীগুরুর প্রতি শশীর পরম নিষ্ঠা।'

২০ স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে এ-সম্পর্কে লিখেছেন : "বরাহনগরের সাধুরা স্বামীজীর দীর্ঘানুপস্থিতি ও বাবাজীর (পওহারী-বাবা) সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে বেশ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তাই স্বামী প্রেমানন্দ ঐ সময়ে গাজিপুরে আসিয়া তাঁহাকে বরাহনগরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বামীজী ইহাতে রুষ্ট হইয়া সম্ভবতঃ আত্মগোপনের জন্য অন্যত্র চলিয়া যান।...(স্বামীজীর এক পত্রে) বাবুরামের প্রতি কঠোর ব্যবহারের জন্য অনুশোচনাও দেখা যায়।...৩১শে মার্চের পত্রে প্রমদাবাবুকে তিনি প্রেমানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'তাঁহার সহিত আমি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি। অর্থাৎ আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছি।...আমার গুরুভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি? মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবারাত্রি কি যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে?'" (যুগনায়ক, ১ম পৃ-২৫৯)

এই হল এইকালে প্রেমানন্দের বিবেকানন্দ-বিরোধিতার (যদি সত্য হয়) পটভূমিকা। এর পিছনে স্পষ্টতঃ গুরুভক্তি ভিন্ন আর কিছু নেই। এবং দেখি, প্রেমানন্দ যখনই জানলেন, বিবেকানন্দ গুরুত্যাগী নন, তখনই তাঁর মনোভাব বদলে গেল। সে-কথাও আমরা মহেন্দ্র-নাথের স্মৃতিকথা থেকে পাচ্ছি। প্রেমানন্দ উচ্চশ্রেণীর আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন বলেই তাঁর মধ্যে গুরুভক্তির সংস্কার এত দৃঢ়মূল ছিল, যা তাঁকে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সাময়িক-ভাবে চালিত করেছিল, তারপরে ঐ গুরুভক্তির আলোকেই যখন নরেন্দ্রনাথের কার্যবিধির সমর্থন পেলেন, তখন চিরদিনের জন্য স্বামীজীর কাজের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেলেন।

এখানে একটি বিচিত্র তথ্যের উল্লেখ করতে পারি। শোনা যায়, স্বামীজী প্রেমানন্দকে শিষ্য করতে নিষেধ করেন, বলেন—প্রেমানন্দ শিষ্য করলে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে অন্য গুরু-ভাইদের শিষ্যদের সংঘর্ষ হবে। প্রেমানন্দও তদনুযায়ী শিষ্য করেননি। এই তথ্যটি আলোর ঝলক এনে দেয়। প্রেমানন্দের চরিত্রের শান্ত মহিমা, আকর্ষণী শক্তি, বৈষ্ণবীয় ভক্তিপ্রাণতা অজস্র মানুষকে মুগ্ধ করত, তাদের প্রাণে শান্তির স্পর্শ দিত, তাপিত হৃদয় জুড়োবার জন্য দলে-দলে মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসত। তিনি মঠের 'মা' হয়ে বিরাজ করতেন। স্বামীজী জানতেন, প্রেমানন্দ দীক্ষা দিতে শুরু করলে অজস্র সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসবে, এবং প্রেমানন্দকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবের গোষ্ঠী গড়ে তুলবে। অথচ স্বামীজীর মতে, বেদান্তই শ্রীরামকৃষ্ণের মেসেজ। অদ্বৈতশীর্ষ সেই বেদান্তকে রামকৃষ্ণ-সংঘের মধ্যে অটুট রাখার জন্যই স্বামীজী প্রেমানন্দকে দীক্ষা না-দিতে অনুরোধ করেছিলেন এবং প্রেমানন্দ তা রক্ষা করেন।২১

এখানে একটু থেমে আমাদের চিন্তা করা উচিত, বিবেকানন্দের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা কী পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করেছিলেন। এইসব অন্তর্মুখ সন্ন্যাসী, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেয়ে যাঁরা অধ্যাত্ম আনন্দলোকে প্রবেশ করেছেন, ঈশ্বরসাধনাই যাঁদের একমাত্র জীবনোদ্দেশ্য—তাঁরা তাঁদের এক গুরুভ্রাতার নির্দেশ মান্য করে কর্মমার্গ অবলম্বন করলেন—তাঁদের এই সমবেত আত্মলোপ কি আশ্চর্য বস্তু নয়! ঐ যে-গুরুভ্রাতার

২১ প্রেমানন্দের ভাব-প্রেমের বিষয়টিতে জোর দিয়ে আমরা বোধহয় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করছি। এ ভাব-প্রেম প্রচলিত বৈষ্ণবীয় ভাবালুতা নয়, এবং মানুষটি মোটেই নাকের-জলে চোখের-জলে কাদা-কাদা পদার্থ ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তো প্রচলিত ধারণার বিপরীত কথাই বলেছিলেন : 'বাবুরামের ভাব হবে না, জ্ঞান হবে।' অর্থাৎ প্রেমানন্দের প্রেম জ্ঞানে পোড়ানো। একবার তার অসাধারণ এক প্রকাশ ঘটে। তিনি মালদহে গেছেন উৎসব উপলক্ষে। ইতিমধ্যে তিনি স্বামীজীর সেবাকর্মকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে ফেলেছেন। উপস্থিত সকলকে সেই বিষয়েই উৎসাহিত করছেন। এক ভক্তের প্রত্যাশা ছিল অন্যরকম। তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "মহারাজ, আমরা একটু প্রেম-ভক্তির কথা শুনতে এসেছিলুম—।" ভক্তটি কয়েকবারই ঐ কথা বললেন। তখন ফিরে গর্জে উঠলেন প্রেমানন্দ—"কাকে বলব প্রেমভক্তির কথা? অধিকারী কোথায়? ঘটনা শুনুন। পসারী ডেকে-ডেকে ফিরছিল—'প্রেম নেবে গো! প্রেম নেবে গো!' শুনে অনেকে এগিয়ে এল। পসারী বলল, 'প্রেম নাও, বিনিময়ে দাও কাঁচা মাথা।' তখন সবাই ভয়ে পিছিয়ে গেল। হাঁ—সবাই মুখে প্রেমভক্তি চায়—প্রেম খুব সস্তা তো!"

প্রেমের জন্য—দেশপ্রেমের জন্য—কাঁচা মাথা দিতে প্রস্তুত হরিকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে [পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়] নিয়ে বেলুড়মঠে গেছেন (১৯১০), সেখানে প্রেমানন্দ তাঁদের সে-রাত্রের জন্য আটকে দিয়েছেন। রাত্রে খাওয়ার পরে হরিকুমার প্রেমানন্দের কাছে স্বামীজীর কথা শুনতে চাইলেন। "স্বামীজীর কথা বলতে-বলতে বাবুরাম-মহারাজ যেন ডুবে গেলেন। স্বামীজীর ভালবাসা? ওরে, তোদের সে-জিনিস কি করে বোঝাবো? বাবুরাম-মহারাজ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।"

হরিকুমার লিখেছেন, "আমরা অবাক হয়ে গেলুম, নতুন জিনিস দেখলুম। একজনের ভালবাসার কথা বলতে আর একজন কাঁদে!" [বিশ্ববিবেক]

নির্দেশ তাঁরা স্বীকার করলেন, তিনি চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে যত বড়ই হোন, নিশ্চয় গুরু রামকৃষ্ণের মূর্তিকে এঁদের কাছে আচ্ছন্ন করতে পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের এই মহত্ত্বের কথা জগতের ধর্মেতিহাসে লিখিত থাকা উচিত—তাঁরা গুরুর পাশে গুরুভ্রাতাকে বসাতে পেরেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে বিবেকানন্দ যে-মানবসেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, বিবেকানন্দের কাছ থেকে সেই দায়িত্ব তাঁরা সমবেতভাবে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

আমেরিকায় সাফল্যের সংবাদ স্বামীজী কেন সত্বর আলমবাজার-মঠে পাঠাননি সেই প্রসঙ্গও এখানে উত্থাপন করা যায়। আমরা দেখেছি, ধর্মমহাসভার প্রায় পাঁচ মাস পরে তিনি আলমবাজার-মঠে চিঠি পাঠান, যদিও তার বেশ-কিছু আগে আলাসিঙ্গা বা খেতড়ির মহারাজ প্রভৃতিকে একাধিক পত্র লিখেছেন। প্রিয় গুরুভ্রাতাদের কাছে এত দেরিতে চিঠি পাঠাবার কারণ কি—আত্মপ্রচারে অনিচ্ছার জন্য? নিশ্চয়ই, তাতে সন্দেহ নেই, তবু একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। আমাদের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে কি-না জানি না, তবু উপস্থিত করছি। বরাহনগর-মঠে থাকার সময়ে এবং পরিব্রাজককালেও স্বামীজী নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও সেই বাণী কার্যকর করার উপায় সম্বন্ধে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে ধারণাগত পার্থক্য অনুভব করেছিলেন। ঈশ্বরপ্রাপ্তিকে বিবেকানন্দও জীবনের প্রধান লক্ষ্য জানতেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্ববাণীকে বিশ্বে প্রচার করার এবং তারই আলোকে মানুষের প্রত্যক্ষ দুঃখ দূর করার যে-তাগিদ তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন, তা ব্যক্তিসাধনার সঙ্গে সমষ্টিকল্যাণ-সাধনার প্রয়োজনও তাঁর কাছে বড় করে তুলেছিল। মনে হয়, এই প্রয়োজনবোধ সকল গুরুভাইয়ের মনে সম্পূর্ণ জাগেনি। বৃহত্তর বিশ্বে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, (নিজ স্বভাবের আকর্ষণেও বটে) নরেন্দ্রনাথ যখন ভাবসাধনার সঙ্গে জ্ঞানানুশীলন করছেন, তখন তাঁর সেই পাঠানুরাগকে অনেক গুরুভাই সুচক্ষে দেখেননি, একটু আগেই বলে এসেছি। অন্য গুরুভাইরা তাঁর ধারণাকে অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শকে গ্রহণে রাজি ছিলেন না বলে নরেন্দ্রনাথ হয়ত অভিমান বোধ করতে পারেন, হয়ত ভাবতে পারেন, যদি তিনি শক্তির বিকাশ দেখাতে না পারেন তাহলে তাঁর গুরুভ্রাতারা তাঁর বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সব কথা বলেছেন তার পূর্ণ তাৎপর্য অনুভব করবেন না, আর যদি সে শক্তি দেখাতে পারেন তাহলে গুরুভ্রাতারা নিজেদের ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে না মিললেও শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি স্মরণ করে তাঁর পিছনে দাঁড়াবেন—সেই শক্তির পূর্ণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত হয়ত স্বামীজী তাঁর গুরুভ্রাতাদের সংবাদ দেননি, হয়ত ভেবেছিলেন, যে-শক্তির দ্বারা তিনি চালিত সেই শক্তিই তাঁর গুরুভ্রাতাদেরও তাঁর নিকটে আকৃষ্ট করবে—সে-শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের, বিবেকানন্দের নয়।

এখানে আরও বলা যায়, স্বামীজী জানতেন, গুরুভ্রাতাদের জয় করার উপরই তাঁর 'মিশনের' সাফল্য নির্ভর করছে। যে-সব তরুণেরা তাঁর অনুগামী হয়েছে, তারা অসামান্যভাবে ঐকান্তিক এবং তাঁর জন্য জীবনপাত করতে প্রস্তুত, একথা স্বামীজী জানতেন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই সন্ন্যাসী নয় বা হবে না। অথচ স্বামীজীর বিশ্বাস, সন্ন্যাসের স্পর্শের আগুন ছাড়া ভারতের মনে আলো জ্বালানো সম্ভব নয়। আবার পুরনো ধরনের সন্ন্যাসী হলেও চলবে না, নতুন রীতির সন্ন্যাসী চাই, যারা অনাসক্ত থেকেও মানবকল্যাণে অগ্রসর হবে, প্রত্যেক মানুষে একই পরমাত্মার বিকাশ জেনে নিয়ে। এমন সন্ন্যাসী তখন কেবল বাংলা দেশেই ছিলেন, কয়েকটি মাত্র, যাঁরা রামকৃষ্ণের ছোঁয়া পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ জানতেন, তাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ মানুষগুলির চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন রামকৃষ্ণের স্পর্শে মুক্ত ঐ মানুষগুলিকে। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি 'মাদ্রাজের প্রিয় যুবকদল' নয়, কলকাতার 'কয়েকটি কপর্দকহীন মানুষের' হাতেই সমস্ত ভার সমর্পণ করেছিলেন—যে-মানুষগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অগ্নি জ্বলছিল।

রামকৃষ্ণগোষ্ঠী-সংক্রান্ত সমসাময়িক তথ্যের মধ্যে আর একবার প্রবেশ করা যাক। আমরা কিছু আগে দেখে এসেছি, কলকাতা থেকে প্রকাশিত স্বামীজী-সংক্রান্ত ভারতীয় ও আমেরিকান সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি-সংবলিত একটি পুস্তিকা পেয়ে স্বামীজী বিশেষ সংকট-ক্ষণে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন। এই পুস্তিকাটি, এবং মহেন্দ্রনাথ দত্ত এইকালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণ কর্তৃক প্রকাশিত যে একটি পুস্তিকার কথা বলেছেন, দুটি যদি একই পুস্তিকা হয়, তাহলে বলতে হবে, স্বামীজীকে সাহায্যকারী পুস্তিকাটি স্বামীজীর সাহায্যের জন্যই কিন্তু বিশেষভাবে রচিত হয়নি। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "বাবুরাম-মহারাজ, হরমোহন মিত্র ও আর জনকয়েক মিলিয়া এক পুস্তিকা ছাপাইলেন। সেই প্যামফ্লেটের নীচে রহিল 'স্বামী বিবেকানন্দ' ছোট-ছোট অক্ষরে, উপরে *'Disciple of Lord Ramakrishna'* বড়-বড় অক্ষরে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে মানে না; সে নিজের মত প্রণয়ন করিয়াছে; এক্ষণে নিজের নাম জাহির হইয়াছে বলিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু বলিয়া মানে না; সেই জন্য সে যে *Lord Ramakrishna Paramhansa*-এর শিষ্য, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল।" বেলুড়-মঠ গ্রন্থাগারে রক্ষিত, ১৮৯৪, মার্চ মাসে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা আমরা দেখেছি, যা ৫০০০ ছাপা হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে বিতরণের জন্য—সেই পুস্তিকাতে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নয়, স্বামী বিবেকানন্দের নামই উপরে আছে, এবং সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ "লর্ড রামকৃষ্ণের" শিষ্য একথা লেখা থাকলেও লর্ড রামকৃষ্ণ অপেক্ষা স্বামী বিবেকানন্দের নামের টাইপ বড়। এই পুস্তিকাতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রশংসামূলক ভারত ও আমেরিকার সংবাদপত্রের মত উদ্ধৃত রয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই পুস্তিকা এবং মহেন্দ্রনাথ-কথিত পুস্তিকা একই, এবং মহেন্দ্রনাথের স্মৃতি তাঁর সঙ্গে কিছু প্রতারণা করেছিল। পুস্তিকাটিতে 'লর্ড রামকৃষ্ণ,' 'স্বামী বিবেকানন্দ' অপেক্ষা বড় অক্ষরে ছাপা না-হলেও মোটামুটি বড় অক্ষরেই ছাপা, এবং স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হলেও বইয়ের প্রচ্ছদপত্রে বড় অক্ষরে "স্বামী বিবেকানন্দ, ডিসাইপল্ অব লর্ড রামকৃষ্ণ" লেখা ব্যাপারটা কিছু বিসদৃশ। অধিকন্তু মহেন্দ্রনাথ এই পুস্তিকা প্রকাশের পিছনের উদ্দেশ্য জানতেন। সুতরাং তাঁর স্মৃতিতে বইটির টাইপ সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্তি এসে গেছে।

স্বামীজী এই পুস্তিকাটি পেয়ে বিপদের মধ্যে কতখানি বল পেয়েছিলেন, তা আমরা পূর্বে দেখে এসেছি। এখানে আমরা ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা অবশ্যই দেখছি। স্বামীজীর গুরুভক্তি সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত না-হলে বোধ হয় ঐ পুস্তিকাটি অত শীঘ্র বের হত না, এবং স্বামীজীও তাঁর প্রয়োজনের ক্ষণে সেটিকে পেতেন না। তবে স্বামীজী এই পুস্তিকা-প্রকাশের পিছনের উদ্দেশ্য জানতে (বা অনুমান করতে) পারেননি তা নয়। ১৮৯৫-তে রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী রাগে ও বিরক্তিতে ফেটে পড়ে নিষ্কর্মার অবতারবাদের যে-তীব্র সমালোচনা করেছেন, তার মধ্যে মনে হয়, এই পুস্তিকাটির ইঙ্গিত ছিল। তিনি লিখেছিলেন ঃ "রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। তিনি পরোপকার করিতে আসিয়াছিলেন, নিজের নাম ঘোষণা করিতে নহে। চেলারা গুরুর নাম করে—গুরু যা শেখাতে এসেছিলেন তাতে জলাঞ্জলি দেয়—দলাদলি তার ফল।" স্বামীজী এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে, পৌরাণিক অবতারবাদকে একেবারে মূলে নাড়া দিয়ে বলেন; "ফল কথা, আমি বৈদান্তিক। সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখতে পাচ্চি না। অবতার মানে—যাঁহারা সেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত।" তিনি "ডিসাইপল্ অব লর্ড রামকৃষ্ণ," এই কথার উত্তরে বললেন ঝাঁঝের সঙ্গে ঃ "আমি পরমহংসের চেলা নই, আমি কারুর চেলাপত্র নই, আমি সারদার

(ত্রিগুণাতীত)২২ চেলা—যারা আমার মনের মতো কাজ করবে, আমি তাদের চেলা।" স্বামীজীর এই সকল উক্তি যে, পূর্বোক্ত পুস্তিকাকে লক্ষ্য করে তার প্রমাণ ঐ চিঠিতেই আছে : "আমার নামে যদি তোমাদের দল বাঁধার সহায়তা হয়, তাহলেই আমি লীডার বটি, নইলে আমি কেউ নই! এই সত্য বটে! আমি ওতে নাই। আমি যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য এবং তোমরাও যে তাই, এইটি বই লিখে ছাপাতে যত্ন তো যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমি যে আজ ৬ বৎসর ঘণ্টাপত্র ত্যাগ করার জন্য বলছি, তাতে কারুর কান পাতা নেই।"২৩

এ-ব্যাপারে আরও একটি অপরিচিত তথ্যের উল্লেখ এখানে করা যায়। কলকাতা ধন্যবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হবার কয়েকদিন আগে ১৮৯৪, ৩১ অগস্ট বাগবাজারে রামকৃষ্ণ-ভক্তদের একটি ঘরোয়া সভা হয়। সেই সভায় আলোচিত ও গৃহীত প্রস্তাবের উপর নির্ভর করে রচিত একটি দীর্ঘ পত্র স্বামীজীর কাছে পাঠানো হয়। পত্রটি মিরারে বেরিয়েছিল ১৩ সেপ্টেম্বরে। এর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রশংসার সঙ্গে হিন্দুধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যানও যথেষ্ট ছিল। পত্রের উদ্দেশ্য প্রশংসা ও শিক্ষাদান উভয়ই। পত্রপ্রেরকেরা স্বামীজীর জন্য অবশ্যই গর্বিত, কিন্তু তাঁরা স্বামীজীর কথা তুলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীকেই শিক্ষা দিতে ছাড়েননি। পত্রের রচনাভঙ্গি সেইজন্য ঈষৎ আমোদের সৃষ্টি করবে। এই পত্রেও বিবেকানন্দ যে, রামকৃষ্ণের শিষ্য, তা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পত্রটি আকারে বিরাট। তার বিবেচনা-ভারী, হিসেবী রচনাভঙ্গি থেকে মনে হয়, রচয়িতা ছিলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)। স্বামীজীর পক্ষে এটি ধৈর্য ধরে পড়া সম্ভবপর ছিল বলে মনে করিনা। এখানে গোটা চিঠিটি উদ্ধৃতও করা সম্ভব নয়, কেবল রচনার নমুনা দেবার জন্য অল্প-কিছু উদ্ধৃত করছি:

"Following your great master, the Lord Ramkrishna Paramahangsha Deva at whose hallowed feet you enjoyed in common with many other equally fortunate brethren the rare privilege of receiving your spiritual education, and by him inspired you have once more brought before the world at large the message of peace and good-will by setting forth the cardinal principles of Hinduism with a view to show mankind how best to approach the problem of life—a problem which every [one] since the creation of man, in all ages and in all countries, has been uniformly pressing for salution.

"You say, in the first place, that the end of life is *to see* God—to realise Him alike in ourselves and in the universe, and that in the second place, the means to this end is the love of God (*Premvakti*)—a love which should be disinterested (*ahaituki*), not proceeding from either fear or punishment or the expectation of reward in this world or the next; and that such a love which enables us to realise our ideal

২২ ত্রিগুণাতীত একজন কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ-শিষ্য। এঁর বিষয়ে কিছু তথ্য "সাময়িকপত্র-প্রবর্তক বিবেকানন্দ" অধ্যায়ে দেওয়া হবে।

২৩ "লর্ড রামকৃষ্ণ" নিয়ে স্বামীজী খুবই বিরক্ত ছিলেন। ব্যাপারটা নিয়ে রেগেছেন এবং হেসেছেন, দুইই। ১৮৯৫-এ লেখা এক চিঠিতে (২১৯ সংখ্যক) তিনি বিরক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে লিখেছেন : "হরমোহন কি-একটা Lord রামকৃষ্ণ পরমহংস করেছে? Lordটা আবার কি—English Lord না Duke?...খালি আমরা লর্ড রামকৃষ্ণের শিষ্য! বলি, ও লর্ড রামকৃষ্ণ ব্যাপারটা কি হে? হরমোহনটা তো আধপাগলা বই নয়—ও কি-একটা লর্ড রামকৃষ্ণ লেখে বল তো? লর্ড, ডিউক আবার কি হে? খেপাগুলোর জ্বালায় অস্থির।"

of perfection must essentially be based upon purity of body, mind and soul. You point out in this connection that the teaching in the Vedas on this point agrees with that in the Purans, that while on the one hand the Rishis say that God is to be worshipped as the one beloved, the Lord Sri Krishna, one of the Pauranic incarnations, teaches Judhisthira exactly the same thing. You further remind us..."

॥ ৯ ॥

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে স্বামীজীর কীর্তিতে উত্তেজনার সঞ্চার হলেও সংশয় সম্পূর্ণ যায়নি। ঐ মহলে তিনটি প্রসঙ্গ বড় হয়ে উঠেছিল—সমুদ্রযাত্রা, খাদ্যাখাদ্যবিচার ও অব্রাহ্মণের সন্ন্যাসে অধিকার। প্রথম বিস্ময়ের রোমাঞ্চ দূর হয়ে যাবার পরে রক্ষণশীল সমাজের কোনো-কোনো অংশে ঐ প্রশ্নগুলি ক্রমেই আকারে বাড়তে থাকে। অভেদানন্দ-প্রমুখ স্বামীজীর গুরুভাইরা যখন কলকাতা-অভিনন্দনসভার আয়োজন করতে থাকেন, তখন রক্ষণশীল-মহল থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন তাঁরা পাননি। এই প্রসঙ্গে কলকাতার ধন্যবাদ-সভা সংগঠনের পটভূমিকা সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা পুনশ্চ উদ্ধৃত করছি ঃ

"শশী-মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) কালী-বেদান্তীর (অভেদানন্দ) সহিত পরামর্শ করিয়া অতিশীঘ্র একটি সভা করিয়া স্বামীজীকে অভিনন্দন প্রেরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"কালী-বেদান্তী (আলমবাজার-) মঠ হইতে আসিয়া (বাগবাজারে) বলরামবাবুর বাড়িতে রহিলেন এবং সান্ন্যাল-মহাশয়, শরৎ-মহারাজ (সারদানন্দ) ও অন্যান্যের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য স্থির করিলেন। মনোমোহন মিত্র অফিস হইতে আসিয়া যতটুকু সময় পাইতেন ততটুকু এই কার্য করিতেন এবং অন্য অনেক লোকও ইহার ভিতরে ছিল। কালী-বেদান্তী মহা উদ্যমে[২৪] কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের বাড়িতে যাতায়াত করিয়া, নানাপ্রকার কথাবার্তা কহিয়া অনেককে রাজি করিলেন। কিন্তু কেবল বাঙালীকে লইয়া সভা করিলে তো চলিবে না, সেইজন্য বড়বাজারের মাড়োয়ারীদের নিকট যাইতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালী-বেদান্তী, হরমোহন মিত্র, মনোমোহন মিত্র ও আরও কয়েকজন লোক মিলিয়া বড়বাজারের এক বিশিষ্ট মাড়োয়ারীর বাড়িতে গিয়া

২৪ কলিকাতা ধন্যবাদসভার ব্যাপারে অভেদানন্দ-স্বামী যে অত্যন্ত পরিশ্রম করেছিলেন, স্বামীজীর চিঠি থেকেও তা দেখা যায়। ১৮৯৪-এর এক পত্রে (১৪৬ সংখ্যক) স্বামী বিবেকানন্দ অভেদানন্দকে লিখেছেন, "তোমার পরিশ্রম অত্যন্ত হইয়াছে, তার জন্য তোমায় কি ধন্যবাদই-বা দিই!" ১৮৯৫-এর এক পত্রে (২০৯ সংখ্যক) তিনি লিখেছেন, "কালী ও যোগেন টাউন-হল মিটিং কেমন উত্তমরূপে সিদ্ধ করিল—কত গুরুতর কার্য!"

মহেন্দ্রনাথ দত্ত অন্যত্র অভেদানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিষয়ে লিখেছেন—"কালী-বেদান্তী প্রাণপণে এই সময়ে খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মতো তিনি দিন-রাত্র কাজ করিতেন। পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট অর্থসংগ্রহ করিয়া সভার কার্যপ্রণালী মুদ্রিত করা, সভার রিপোর্টগুলি নানা প্রেসে পাঠানো প্রভৃতি সমস্ত কার্যই তিনি সাধনার মতো করিয়াছিলেন।"

স্বামী অভেদানন্দ 'আমার জীবনকথা'র মধ্যে এই সভার যে-বিবরণ দিয়েছেন, তার সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণের প্রায় আক্ষরিক ঐক্য আছে।

মহেন্দ্রনাথ এবং অভেদানন্দ এই সভার ব্যাপারে সাহায্যকারী হিসাবে যাঁদের নাম করেছেন, বিস্ময়ের কথা কোথাও যোগেনের (যোগানন্দ) উল্লেখ নেই, অথচ তাঁর পরিশ্রমের সংবাদ পত্রযোগে জেনে স্বামীজী নিজের চিঠিতে তার জন্য প্রশংসা করেছেন।

আসার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। মাড়োয়ারী মহোদয় শুনিয়াই তো প্রথম শুরু করিলেন, সব্ ভ্রষ্ট্ হ্যায়! হিন্দু হয়ে ফিরিঙ্গির সঙ্গে আহার করিতেছে, ও লোগ্ তো ভ্রষ্ট্ হ্যায়! তর্ক ও যুক্তিতে তাঁহাকে বোঝানো দুষ্কর। মনোমোহন মিত্র মাড়োয়ারীর আচারব্যবহার বেশ বুঝিতেন, তাই তদনুযায়ী বলিলেন, 'বাবুজি, আপকা নাম কোর্ম্‌টি মে চড়্ গিয়া।' ব্যস্, কোর্ম্‌টি মে চড়্ গিয়া! সে একটা মস্ত ব্যাপার। সুতরাং মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মত পরিবর্তন করিলেন।

"সভাপতি নির্বাচন করিবার জন্য শ্রীমনোমোহন মিত্র, নগেন্দ্রনাথ মিত্র [বসু?], ভূপেন্দ্রকুমার বসু, চারুচন্দ্র বসু ও অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পট্টবস্ত্র পরিয়া গুরুদাসবাবু বাহিরে আসিলে তাঁহাকে প্রস্তাবিত সভার সভাপতি হইতে অনুরোধ করা হয়। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ও মাননীয় ব্যক্তি এইজন্য তাঁহারই এই সভায় সভাপতি হওয়া উচিত—এইকথা সকলে বলিতে থাকিলে প্রথম হইতেই তিনি বিশেষ উৎসাহহীনতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত বহু আলোচনা হইল। তিনি শেষে বলিলেন, কোনো বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ নাম গুরুদত্ত নহে, শাস্ত্রমতে শূদ্রের সন্ন্যাসে অধিকার আছে কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে এবং সন্ন্যাসী হইয়া ম্লেচ্ছদেশে গমনেও বিশেষ প্রত্যবায় আছে, এরূপ অনেকে বলেন; সুতরাং এই বৃদ্ধ বয়সে কোনো ধর্মসভায় বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বা তাহাতে সভাপতি হইব না স্থির করিয়াছি। বিশেষতঃ যে-সব কার্যে সামাজিক বা ধর্মবিষয়ে মতভেদ আছে তাহাতে আর যাইতে চাই না। তাঁহার কথা শুনিয়া মনোমোহন মিত্র বলিলেন, আপনি বৃদ্ধ বয়সের কথা বলিলেন, তাহা হইলে আমরা বলি, আপনি পঞ্চাশোর্ধ্ব, শাস্ত্র হিসাবে তো আপনার কর্ম ছাড়িয়া বনে যাওয়া উচিত। উত্তরে গুরুদাসবাবু বলিলেন, তা আর পারিতেছি কই? তাহাতে মনোমোহন মিত্র বলিলেন, তাহা হইলে যতদিন আছেন ততদিন ধর্মকার্যে যোগদান করা উচিত। ইহার উত্তরে গুরুদাসবাবু বলিলেন, আপনারা দেখিবেন, আমি কখনও প্রকাশ্য ধর্মসভায় যোগদান করিব না। তখন নগেন্দ্রনাথ মিত্র বলিয়া উঠিলেন, আপনি ম্লেচ্ছদেশে যাওয়ায় দোষ দিলেন, কিন্তু আপনি তো শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ হইয়াও চিরকাল ম্লেচ্ছের চাকরি করিলেন। শাস্ত্রে এই পাপে তুষানলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। শুনিয়া গুরুদাসবাবু অ্যাঁ-অ্যাঁ করিতে লাগিলেন।২৫

"ইহার পরে কয়েকজন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত দেখা করিতে উত্তরপাড়ায় যান। তাঁহাকে সভাপতি হইতে বলিলে তিনি স্বামীজীর বিষয়ে শুনিতে চান। তখন তাঁহাকে আমেরিকান সংবাদপত্রের কতকগুলি কাটিংস দেখানো হইল। তাহার মধ্যে *'After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation'*—এই অংশটুকু পড়িয়া তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত ও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আপনাদের আর কিছু বলিতে হইবে না। তিনি আমেরিকায় গিয়া হিন্দুধর্মের জন্য এই যে সম্মানলাভ করিতে পারিয়াছেন, এর জন্য *India should remain eternally grateful to him.*২৬

২৫ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু কলিকাতা ধন্যবাদসভায় উপস্থিত ছিলেন, যদিও কার্যাবলীতে অংশ নেননি।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বীকৃতির ব্যাপারটি রক্ষণশীল মহলে বিশেষভাবে জ্ঞাত ব্যাপার ছিল। রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে যিনি স্বামীজীর (এবং শ্রীরামকৃষ্ণের) সম্বন্ধে সবচেয়ে কটু সমালোচনা করে গ্রন্থরচনা করেছিলেন সেই আসামের পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গররাজি হওয়ার ঘটনাটিকে আহ্লাদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

"১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টাউন-হলে সভা হইল। টাউন-হল তখন মেরামত হইতেছিল, সেইজন্য উপরকার হলটির মধ্যস্থলে সভা হয়।...

"রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের '**স্বামী** বিবেকানন্দ' কথাটিতে আপত্তি থাকায় '**ব্রাদার** বিবেকানন্দ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, কারণ কায়স্থ সন্ন্যাসী হইতে পারে কি-না তখনো সে-বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল।"

কলকাতা-সভার পিছনের ইতিহাস বেশ-কিছু অংশে উপরের স্মৃতিকথা থেকে পেলাম। শিক্ষিত এবং অভিজাত হিন্দুদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কি-ধরনের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বর্তমান ছিল, তার চেহারা দেখার পরে আমরা বুঝতে পারি, স্বামীজী কেন এই শ্রেণীর উপরে ভরসা রাখেন নি, বা অন্যকে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। সে যাইহোক, নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও কলকাতার ধন্যবাদ-সভা অসামান্যভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, যার অনুরূপ এই শহরের ইতিহাসে পূর্বে দেখা যায়নি, তা সমসাময়িক সাক্ষ্য থেকে পূর্বে আমরা জানিয়েছি। সভা কতখানি সফল হয়েছিল, "অনুসন্ধান" পত্রিকার নিম্নের বিদ্রূপযুক্ত মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় ঃ

বিবিধ প্রসঙ্গ

টাউন হলের সভা। বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, টাউন হলে হিন্দুদিগের এক সভা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য, চিকাগোর ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং আমেরিকা-বাসিগণ যে স্বামীজীকে বিশেষ সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহার জন্য তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এই সভায় চারি সহস্রের অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভা সম্বন্ধে বড়ই একটি রহস্য আছে। **হিন্দু পেট্রিয়ট** বলিতেছেন, ইহা হিন্দুদিগের সভা; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্ম সহযোগিনী **সঞ্জীবনী** বলিতেছেন যে, বিবেকানন্দ এক সময়ে তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন গায়ক ছিলেন, এবং তিনি চিকাগো মেলায় যে-ধর্ম প্রচার করেন তাহা হিন্দুধর্ম নয় ব্রাহ্মধর্ম, সেই কারণে সেদিনকার সভায় অনেক ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং এ সভাকে হিন্দুসভা না বলিয়া ব্রাহ্মসভা বলা উচিত। এদিকে একজন আমেরিকা-প্রবাসীকে হিন্দু বলিতে সহযোগী **বঙ্গবাসী** প্রস্তুত নহেন; সুতরাং টাউন হলের সভায় বঙ্গবাসীর চিহ্নিত হিন্দু রাজা প্যারীমোহন সভাপতি হইলেও তাঁহার মতে উহা হিন্দুসভা নহে। এখন বল্ মা তারা, আমরা দাঁড়াই কোথায়? [১৩০১, ২৯ ভাদ্র]

উপরের উদ্ধৃতির সংবাদে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ ওর মধ্যে উল্লিখিত তিনটি পত্রিকার দুটির ফাইল দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। সেই দুটির একটি, সঞ্জীবনীর

২৬ এখানে আমাদের দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় কিছু ভুল থেকে গেছে। রাজা প্যারীমোহন টাউন-হল সভার অনেক আগেই স্বামীজীর কীর্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। কলকাতার ধন্যবাদসভার আড়াই মাসেরও বেশী আগে ১৪ মে, ১৮৯৫-তে মিনার্ভা থিয়েটারে এক সভায় ধর্মপাল বিবেকানন্দের সাফল্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উপস্থিত করে-ছিলেন—সেখানে রাজা প্যারীমোহন উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মনে হয়, মিনার্ভা থিয়েটারের ঐ ১৪ মে'র সভায় উপস্থিত হবার জন্য যখন উদ্যোক্তারা তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তখন মহেন্দ্রনাথ-কথিত কথাবার্তাগুলি তাঁর সঙ্গে হয়েছিল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়েও একই কথা বলা চলে, কারণ তিনিও মিনার্ভা থিয়েটারের বক্তৃতাসভায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য ব্যাপারে মহেন্দ্রনাথের মতোই অভেদানন্দেরও একই ধরনের স্মৃতির গণ্ডগোল হয়েছে।

পরিচালক ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কৃষ্ণকুমার মিত্র। এই কাগজটি ছিল রাজনীতি-ঘেঁষা। অনুসন্ধানে সঞ্জীবনীর মত যে-ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার থেকে মনে হয়, এই সময়ে অন্ততঃ, ব্রাহ্মসমাজের উদারতর অংশে বিবেকানন্দের কার্যকলাপ শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল। তবে এ-সম্বন্ধে আরও সংবাদ না পেলে নিশ্চিত কিছু বলা শক্ত। দ্বিতীয় কাগজ বঙ্গবাসী ছিল হিন্দু রক্ষণশীলতার ধ্বজাধারী। এই পত্রিকার কাছে হিন্দুর পক্ষে কালাপানির পারে যাওয়া অক্ষমণীয় অপরাধ। তদুপরি বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর পরিচয়ধারী, সুতরাং তাঁর অপরাধ, ব্যাকরণকে লঙ্ঘন করে, 'অক্ষমণীয়তম।' এই পত্রিকার তীব্র আক্রোশের চেহারা পরে আরও দেখব, যখন বিলাতফেরত বিবেকানন্দের দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রবেশ নিয়ে গণ্ডগোল বাধবে। সে-ইতিহাস, এবং বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার আরও নানা সংবাদ, পরবর্তী একটি অধ্যায়ে হাজির করব।

উল্লিখিত তৃতীয় পত্রিকা হিন্দু পেট্রিয়টের কিছু সময়ের ফাইল দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে পূর্বোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য রয়েছে। হিন্দু পেট্রিয়ট ছিল অভিজাত জমিদারদের মুখপত্র, উচ্চমহলে প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট, এহেন কাগজে বিবেকানন্দের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্ভ্রম ও সমাদরপূর্ণ যে-রকম মুক্ত মন্তব্য করা হয়েছে, তার থেকে বোঝা যায়, এইকালে বাংলার অভিজাত সমাজের একাংশ অন্ততঃ বিবেকানন্দের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। স্বামীজীর সম্মানে অনুষ্ঠিত টাউন-হলের সভা, এই পত্রিকার মতে, *"Great demonstration," "Unique demonstration*।" "দেশের নানাদিকে ঐহিক বিকাশের সঙ্গে ধর্মের এই যে সুনিশ্চিত জাগরণের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, সেটি এই কালের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা"—পত্রিকাটি লিখেছিল। "যে-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, তার গভীরতা ও অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করা যায় না। বিবেকানন্দ-স্বামীর মতো ঐকান্তিক উৎসাহী তরুণ ভক্তেরা যখন এই আন্দোলনে নেমে পড়েছেন তখন, তাঁদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে ততই, উৎপন্ন ফসলের সম্ভারও বেড়ে উঠবে একই পরিমাণে।"

হিন্দু পেট্রিয়টের আর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। বিবেকানন্দ-প্রভৃতির সন্ন্যাস যেখানে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতো ধর্মব্রতী মানুষের কাছে লোফার ও ভ্যাগাবণ্ডের কাজ বলে প্রতীয়মান (যার রূপ পরে দেখব), সেখানে সেই একই জিনিস ঐহিক বিষয়াসক্ত হিন্দু পেট্রিয়টের কাছে পরম বিস্ময়কর ত্যাগের দৃষ্টান্তরূপে প্রতিভাত। পথে-পথে ভিখারীর মতো ঘুরে-বেড়ানো বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইরা হিন্দু পেট্রিয়টের অভিজাত দৃষ্টিতে অপদার্থ চরিত্রের মানুষ বলে মনে হননি। ধরে নেওয়া যেতে পারে, অভিজাত-মুখপত্র আভিজাত্য কাকে বলে জানতেন!! "স্বামীজীর প্রথম জীবনের একটি জিনিস আমাদের কাছে অসাধারণ বলে মনে হয়। তিনি বাংলার সেরা এক পরিবারের সন্তান, আর্টসে গ্রাজুয়েট, শহরের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন, এবং পিতা ও খুল্লতাতের পথানুসরণ করে স্বাধীন ও সম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন করার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ফলে তাঁর সামনে এমন একটি কর্মজীবন উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল, যা তাঁকে প্রায় নিশ্চয় করে ঐহিক শক্তি, সমৃদ্ধি এবং পদমর্যাদা দান করত, যে-কোনো বাঙালীর আকাঙ্ক্ষার বস্তু যা। কিন্তু তিনি, যাকে কর্তব্য বিবেচনা করেছেন তার আহ্বানে, পৃথিবীর সেই সমস্ত আশা-উল্লাসকে স্বেচ্ছায় সানন্দে ত্যাগ করে নিজের তরুণ উদীয়মান জীবনকে উৎসর্গ করলেন নিজ দেশবাসী এবং মানবজাতির জন্য।" [অ]

বিবেকানন্দের সাফল্যে এই পত্রিকা ভারতের রাজনৈতিক লাভের দিকও লক্ষ্য করেছিল (যা করেছিলেন মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, পূর্ব অধ্যায়ে দেখে এসেছি)। ভারতকে বিদেশীরা, মিশনারিরা যে-ভাবে দেখান, তাই যে তার আসল চেহারা নয়, অন্যতর এক মূর্তিও আছে,

শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য সেই রূপকে বিশ্বের সেরা মানুষদের সামনে উন্মোচন করেছেন বিবেকানন্দ, যা বিদেশে আনবে ভারতের অধিকার-স্বীকৃতি, এবং স্বদেশে আনবে জাতীয় জাগরণ :

"The singular success of Swami Vivekananda in the land of the Cute Yankee illustrates to what height a Hindu's powers of persuation can be developed and orthodox or hetrodox, the Swami has earned our undying gratitude if only for his having succeeded in nearly convincing a vast and representative assembly like that which he addressed at Chicago, that the Hindu as depicted in missionary tracts is not a reality...Representatives of the most advanced ideas of the present age...united in paying homage to that Hinduism which the Swami boldly claimed to be the mother of religions. Questions of orthodoxy and hetrodoxy apart, *there can be no doubt of the high political value and significance of the signal success of the Swami.* And if bigotry cavils at such work, it is only what could be expected. We live in an age when the country's cause must be pleaded and vindicated away from our shores, and if before the representatives of assembled nations our representatives can demonstrate that morally, spiritually or intellectually we have not gone down whatever our material circumstances may be, much will be done in the way of national regeneration. Thus we regard the demonstration held yesterday in honour of Swami Vivekananda."২৭ [Italics mine] [*Hindoo Patriot*; 1894, Sep. 6]

॥ ১০ ॥

স্বামীজী হিন্দুধর্মের যে-লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিকর সমালোচনা এসেছিল পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত এক বিশিষ্ট হিন্দুর পত্রিকা থেকে। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বা এন এন ঘোষ তখন শিক্ষিত হিন্দুসমাজে খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি ব্যারিস্টার, অধ্যাপক, লেখক। ইণ্ডিয়ান নেশন নামে তাঁর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। এর মধ্যে ধর্মমহাসভায় পঠিত স্বামীজীর 'পেপার অন হিন্দুইজম্'-এর কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়, হিন্দু-ধর্মের মতো জটিল ধর্মকে কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে প্রকাশ করা কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং স্বামীজী যে-প্রবন্ধ পড়েছেন, তা কেবল বক্তব্যে অ-পর্যাপ্ত তাই নয়, একইসঙ্গে ত্রুটিপূর্ণ, অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্তহীন। এ-ব্যাপারে প্রথম দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয় ২৬ মার্চ, ১৮৯৪, রচনার নাম 'হিন্দুইজম্।' ২ এপ্রিল 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে ঐ রচনার

২৭ স্বামীজী যদিও নিজের কাজের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়াতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের পাশ্চাত্ত্য সমাদরে ভারতের রাজনৈতিক লাভের সম্ভাবনা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। আলা-সিঙ্গাকে ১৮৯৬, ৬ মে তিনি লেখেন :

"যদি তোমরা ডজন-খানেক সুশিক্ষিত দৃঢ়চিত্ত মানুষকে ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচারের জন্য পাঠাতে এবং কয়েক বছর তাদের সেখানে থাকার খরচ জোগাতে, তাহলে তোমরা নৈতিক এবং রাজ-নৈতিক উভয় দিকে ভারতের প্রভূত উপকার করতে পারতে। যে-মানুষ ভারতের প্রতি নৈতিক সহানুভূতি বোধ করে, সেই তার রাজনৈতিক বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়।"

সমর্থনে হরিচরণ মুখার্জির চিঠি বেরোয়। এ-সম্পর্কে সাধারণ কিছু আলোচনা থাকে ৯ এপ্রিলের 'অকেশন্যাল নোটস্'-এর মধ্যে। ঐ তারিখেই স্বামীজীর মতের সমর্থনে 'বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি' যা লেখেন, সম্পাদক বিস্তৃতভাবে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। ২১ মে পুনশ্চ স্বামীজীর মতবিরোধী সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'প্রোটিয়ান হিন্দুইজম্'-এর (*Protean Hinduism*) মধ্যে। ২৮

স্বামীজীর মতের বিরুদ্ধে এই পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান নেশনের অবাধ সমালোচনা বা নিন্দা। মনে হয়, এই কাজ করে ফেলার পরে সম্পাদক-মহাশয় কিছু বিবেকদংশন বোধ করেছিলেন; বুঝেছিলেন যে, বিবেকানন্দের আবির্ভাবের, এবং তাঁর বাণী ও রচনার বিরাট মহিমার সঙ্গে অনুচিত গদাযুদ্ধের এই প্রয়াস। কিন্তু তিনি কেন ঐরকম করেছিলেন তার সম্বন্ধে কিছু অদ্ভুত তথ্য মহেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন : "স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতাটি যেমন কলিকাতায় আসিল, তিনি (এন এন ঘোষ) তাঁহার পত্রিকায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিলেন।...কিন্তু পরের সপ্তাহে পূর্ব প্রবন্ধ প্রকাশ করা যে তাঁহার ভুল হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিলেন।...সেই সময়ে পূর্ব প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, মাদ্রাজ হইতে কে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া দেন, অনবধানতাবশতঃ সেটি বিশেষ না পড়িয়াই সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই ভুলের জন্য তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন।"

মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় একটি তথ্যগত ভুল প্রথমেই চোখে পড়ে; প্রথম সপ্তাহের প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সম্পাদক পরের সপ্তাহে দুঃখপ্রকাশ করেননি, বরং বেশ-কিছু সময়

২৮ 'প্রোটিয়ান হিন্দুইজম্' রচনার মধ্যে বহু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল— হিন্দুধর্মের খাঁটি চেহারা দেখানো কারো সাধ্যে নেই। "হিন্দুধর্ম কি? মিসেস বেশান্তের মতে তা থিয়জফির সঙ্গে অভিন্ন।...বিবেকানন্দের মতে তা বেদান্তধর্ম।...কোনো-কোনো অনুরাগী খৃস্টান, এবং কিছু ব্রাহ্মের মতেও, হিন্দুধর্ম হল, খৃস্ট বাদ দিয়ে খৃস্টানধর্ম। অন্য দৃষ্টিতে তা বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে একাত্ম। সাধারণভাবে বলতে গেলে, সাকার ভগবানে অবিশ্বাসী, সৃষ্টি সম্বন্ধীয় যে-কোনো দার্শনিক মতই হিন্দুধর্ম, যা মানুষকে বাসনাত্যাগে প্রণোদিত করে।" এই লেখকের উদ্দেশ্য যে, সাম্প্রদায়িক তর্ক-বিতর্ক বাধানো, এবং বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সাধারণ হিন্দুর মনকে বিষিয়ে তোলা, তা সহজেই বোঝা যায় তাঁর অন্যান্য মন্তব্য পড়লে। ইনি প্রশ্ন করেছিলেন, বেদ-উপনিষদই যদি হিন্দুধর্মের ভিত্তি, তাহলে ব্রাহ্মধর্মের থেকে তাকে পৃথক করা যাবে কি করে? ব্রাহ্মণের গরু খেতে বা শূদ্র বিয়ে করতে বাধা থাকবে কোথায়? ও-বস্তু তো বৈদিক যুগে চলত। সে-যুগে জাতি-প্রথা ছিল না, বিয়ের সময়ে শালগ্রাম শিলা আনা হত না। হিন্দুদের সতর্ক করে ইনি লেখেন, "হিন্দুরা যেন বেদের ধর্মের সঙ্গে তাদের ধর্ম ও দর্শনকে এক করে ফেলার পরিণাম ভেবে দেখে। সবাই সেক্ষেত্রে ব্রাহ্ম হয়ে পড়বে। তারা সবাই গরু খাবার স্বাধীনতা পাবে, বিবাহ সম্বন্ধে জাতি-প্রথা ভাঙবার সুযোগ পাবে, বিধবাদের বিয়ে দেবে, ১৬ কি ২০ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হবে, [সেকালে যার কল্পনা করলে সবাই শিউরে উঠত], এবং মেয়েদের নিজেদের স্বামী বাছবার স্বাধীনতা থাকবে [সর্বনাশ!]। তখনো কি তারা হিন্দু থাকবে?" বিবেকানন্দ ও ধর্মপাল যে-ভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য দেখাচ্ছেন, তাতে হিন্দুদের বৌদ্ধ হয়ে পড়ার সম্ভাবনার ভয়ও এই লেখক দেখিয়েছিলেন। এবং ইনি বিদ্রূপের সঙ্গে বলেছিলেন, বিবেকানন্দ আর কিছু না করুন, সমুদ্রযাত্রার সমস্যা সমাধান করে ফেলেছেন। "হিন্দুরা যদি বিবেকানন্দের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে, এবং মেনে নেয় যে, সমুদ্রপারে গিয়ে তাঁর জাত যায় নি, তাহলে কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের সমুদ্রযাত্রা-আন্দোলনের বিরোধিতা করবার কোনো অধিকার কি তাদের আছে? কুমার বিনয়কৃষ্ণ চান, সমুদ্রযাত্রাকালে যাঁরা হিন্দুজীবনযাত্রা রক্ষা করবেন তাঁদের জাত যাবে না—তাঁর সে বক্তব্যের প্রচণ্ড বিরোধিতা করা হয়েছে। সেই বিরোধিতাকে কি এখন বজায় রাখা যাবে?"

দুষ্টবুদ্ধিতে লেখাটি পূর্ণ। মহেন্দ্রনাথের কথাই সত্য মনে হয়—এটি ইণ্ডিয়ান নেশনের সম্পাদকের রচনা নয়। কারণ এর মধ্যে তিনি যে-সব মত প্রকাশ করেছেন সেগুলি এইকালে প্রকাশিত তাঁর সকল ধারণার সঙ্গে মেলে না। এই ধরনের লেখা আমি বাংলার বাইরের পত্র-পত্রিকায় দেখেছি।

ধরে কয়েকটি রচনায় পূর্ব বক্তব্যকে সমর্থন করে গেছেন। তাহলেও আমাদের ধারণা, মহেন্দ্রনাথের কথায় সত্য আছে। মাদ্রাজ থেকে সত্যই হয়ত কেউ স্বামীজীর 'পেপার'-এর সমালোচনা করে ঐ রচনাটি পাঠিয়েছিলেন—পাণ্ডিত্যের বাহাদুরী দেখাবার ইচ্ছায় সেটিকে সম্পাদক ঈষৎ পরিবর্তনের পরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ করেন, পরে সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত রচনার পক্ষে না দাঁড়ালে মান থাকে না বলে কয়েকবার তিনি প্রকাশিত বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তিবিস্তার করে গেছেন, কিন্তু কাজটা কতখানি অন্যায় তা একইসঙ্গে বুঝেছিলেন। তাঁর সেই মানসিক অস্বস্তির পরিচয় পাওয়া যায় ২০ অগস্টের সম্পাদকীয় টীকার মধ্যে, যেখানে তিনি কুণ্ঠিতভাবে স্বামীজীর উক্তির সাহায্য নিয়ে নিজ বক্তব্যের পোষকতা করতে চেয়েছেন। এন এন ঘোষের দৃঢ়তা ও মহত্ত্বের পক্ষে বলতে হবে তিনি তাঁর ঐ অসার সমালোচনার দ্বারা কতখানি অন্যায় করেছেন, তা কলকাতার ধন্যবাদ-সভায় দাঁড়িয়ে আত্মগ্লানির সঙ্গে বলেছিলেন :

"এই সভা কেবল অপরকে ধন্যবাদ দেবার জন্য আহূত হয়নি, পরন্তু আমাদের লজ্জা ও গ্লানি মুছে ফেলবার জন্যও আহূত হয়েছে। বিবেকানন্দ একজন বাঙালী, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে তিনি আমেরিকা গেছেন, কিন্তু আমরা তাঁকে কোনোপ্রকার স্বীকৃতি দিই নি, কোনো সাহায্যই করিনি।...আর এখন আমেরিকায় গিয়ে তিনি বিজয়মাল্য লাভ করেছেন বলে... আমরা এগিয়ে এসেছি—সাফল্যের উপাসক রূপে! এবং তাঁকে সম্মানিত করার ছুতো করে নিজেদের মান বাড়াবার চেষ্টা করছি।...অনন্ত অগৌরব আমাদের, জাতিগতভাবে আমরা কদাপি আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষদের সমাদর করবার মতো গুণপনা দেখাই নি।" [অ]

শ্রীযুক্ত এন এন ঘোষ যখন উপরের কথাগুলি বলছিলেন, তখন আমেরিকাযাত্রার আগে বিবেকানন্দকে সাহায্য না-করার বিষয়ে আক্ষেপই মাত্র ছিল না—বিবেকানন্দের সাফল্যসংবাদ প্রকাশিত হবার পরেও বিরোধী দংশনগুলির সম্বন্ধে ইঙ্গিত ছিল।

একই বক্তৃতায় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর পত্রিকায় পূর্বে বিবেকানন্দের 'পেপার'-এর বিষয়ে যেসব অভিযোগ করা হয়েছিল তার সবকিছুকেই নস্যাৎ করেছিলেন। স্বামীজীর রচনার সম্বন্ধে তাঁর পত্রিকায় বলা হয়েছিল—*"Superficial," "lacks philosophical depth and accuracy," "loose in reasoning*।" বক্তৃতায় তিনি স্বামীজীর ভাষণের প্রশংসা করে বললেন, "[The lectures] we can read, appreciate and admire।" আরও বললেন,

"Vivekananda spoke with lucidity and grace and a logical power which astonished and charmed his audience".

এতৎসত্ত্বেও বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তির কথা বুঝতে মানুষের ভুল হয় কেন? অধ্যাপক কারণ জানালেন :

"সক্রেটিসের কাল থেকে এখন পর্যন্ত সময়ে অগণ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যেখানে মহান আচার্যগণের শিক্ষা তাঁদের সমসাময়িকদের দ্বারা কেবল অসমাদৃত হয়েছে, তাই নয়, পরিষ্কারভাবে তাদের ঘৃণা করা হয়েছে, সক্রোধে তাদের আক্রমণ করা হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত তাঁদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের কারণ হয়েছে।"

আমরা আগেই দেখেছি, এন এন ঘোষ বলেছিলেন যে, সক্রেটিস প্রভৃতির তুলনায় বিবেকানন্দ ভাগ্যবান, এমনকি বুদ্ধ, খ্রীস্ট, মহম্মদ বা কনফুসিয়াসের তুলনায়, কারণ শেষোক্ত আচার্যদের প্রভাব যেখানে প্রথমেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেনি, সেখানে বিবেকানন্দ প্রথম চেষ্টাতেই বহু-শত মানুষকে "ধর্মের মূলগত সত্য সম্বন্ধে বোধে উন্নীত করেছেন।" স্বামীজীর পরিমাণজ্ঞান ও বিনয়বোধ অবশ্য বুদ্ধ, যীশুর সঙ্গে তাঁর তুলনার ব্যাপারটিকে

পরিপাক করতে পারেনি, তিনি বিরক্তিপ্রকাশ করেছিলেন২৯ (যদিও ঐ সময়ে আমেরিকায় অনেকেই তাঁকে বুদ্ধ যীশুর অবতার ভাবছিলেন) ৩০—কিন্তু ঐ তুলনার দ্বারা এন এন ঘোষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, স্বামীজীর বক্তৃতা দর্শনবিদ্যার প্রদর্শনী নয়, উপলব্ধিরই প্রকাশ; তা ভাষণ নয়, তা বাণী। এবং সেইজন্যই ভগিনী নিবেদিতার এই কথাগুলি কী গভীরভাবে সত্য!—

"চিকাগো ধর্মমহাসভায় ভাষণ দেবার জন্য স্বামীজী যখন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি 'হিন্দুদের ধর্মীয় ধারণাসমূহের বিষয়ে' বলতে উঠেছিলেন—একথা বলা যায়; কিন্তু তিনি যখন শেষ করলেন তখন তারই মধ্যে 'আবিভূর্ত' হয়েছে 'হিন্দুধর্ম'।" "যে-সকল সত্য তিনি প্রচার করেছেন সেগুলি তিনি জন্ম না নিলেও সমান সত্য থাকত। এমনকি একথাও বলা যায়—সমান প্রামাণ্য থাকত। প্রভেদ হত এই—সেগুলির মধ্যে আধুনিক স্বচ্ছতা ও তীক্ষ্নতা, পারস্পরিক সংগতি ও ঐক্যবোধের অভাবের জন্য সেগুলিকে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য হত। তিনি যদি জন্ম না নিতেন তাহলে যে-শাস্ত্রগুলি আজ সহস্র-সহস্র মানুষের কাছে জীবনের পরমান্ন বহন করছে, সেগুলি পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য বিচার-বিতর্কের বিষয় হয়েই থাকত। পণ্ডিত নন, তিনি আধিকারিক আচার্য। কারণ তিনি যে-শিক্ষা দিয়েছেন, তার সাক্ষাৎ উপলব্ধির গভীরেও তিনি অবতরণ করেছেন এবং সেখান থেকে উঠে এসে অন্ত্যজ পারিয়া ও বিদেশীদের কাছে তার রহস্য উন্মোচন করেছেন।"

নিবেদিতা স্বামীজীর রচনাবলী সম্বন্ধে সাধারণভাবে যেকথা বলেছিলেন, তা বিশেষ-ভাবে সত্য তাঁর আলোচ্য 'হিন্দুধর্ম' নামক রচনা সম্বন্ধে এবং একথা সাহসের সংগে বলা যায়, আর কোনো ভারতীয়ের কোনো রচনা সম্বন্ধে নিবেদিতার নিম্নের কথাগুলি এমনভাবে সত্য নয় ঃ

"স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মধ্যে বৃহত্তর পৃথিবীর মানুষেরা যে শুধু দেববাণী লাভ করেছে তাই নয়, একই সংগে হিন্দুসন্তানেরা পেয়েছে স্বীয় ধর্মবিশ্বাসের মহাসনদ। আধুনিক যুগের ব্যাপক ভাবশিথিলতার মধ্যে হিন্দুধর্মের এমন একটি প্রস্তরভিত্তির প্রয়োজন ছিল যেখানে সে ভরসার আশ্রয় পাবে, প্রয়োজন ছিল প্রামাণিক আপ্তবাক্যের, যার আলোকে তার আত্মদর্শন ঘটবে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সেই বস্তুই হিন্দুকে দিয়েছে।"

এন এন ঘোষের নামে প্রকাশিত সমালোচনার অংশীদার কিন্তু দেশের বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজ ছিল না। স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' রচনার মধ্যে যে, প্রফেটের কণ্ঠ শোনা গেছে—তা সমকালেই স্বীকৃত হয়েছিল। পুনার মরাঠা কাগজের কাছে এই রচনাটির এমনই গুরুত্ব যে, স্বামীজী এর লেখক বলেই তাঁর উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের ধন্যবাদসভার প্রস্তাবকে পত্রিকাটি সমর্থন জানিয়েছিল ১৮৯৪, ৬ মে-র সম্পাদকীয় রচনায়। মরাঠার মতে বিবেকানন্দ ঐ রচনার মধ্যে 'হিন্দুধর্মের যথার্থ নীতি ও তত্ত্বগুলিকে' প্রকাশ করেছেন। এখানে পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, মরাঠার তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, যিনি

২৯ ১৮৯৫ সালের এক চিঠিতে ('বাণী ও রচনায়' ২৪১ সংখ্যক পত্র) স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দ-স্বামীকে লেখেন ঃ "সারদার পত্রে অবগত হইলাম, এন ঘোষ আমাকে যীশুখৃীস্টাদির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ও-সকল আমাদের দেশে ভাল বটে, কিন্তু এদেশে ছাপাইয়া পাঠাইলে আমার অবমানের সম্ভাবনা। আমি কাহারও ভাবে ব্যাঘাত করি না। আমি কি মিশনরি?"

৩০ যেমন, সমকালীন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি এলা হুইলার উইলকক্স স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার পরেই পত্রে (১৮৯৫, মে) লিখেছিলেন ঃ "আমার বিশ্বাস, ইনি কোনো বিরাট সত্তার অবতার—হয়ত বুদ্ধের, হয়ত খৃীস্টের।"

ঐকালের মধ্যেই হিন্দু তত্ত্ববিদ্যার প্রধান পণ্ডিতদের একজন হয়ে উঠেছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তিলক ইংরেজিনবিশ পল্লবগ্রাহী কৌতূহলী বিদ্যাভিমানী ছিলেন না।

'হিন্দুধর্ম' রচনার গভীরতা ও ভাবসৌন্দর্যের প্রশংসা মিরারেও বেরিয়েছিল। ১৩ এপ্রিল 'এইচ এন সি' নামক পত্রলেখক স্বামীজীর উক্ত রচনার ভাষা ও বক্তব্যের উচ্চ প্রশংসা করে বলেন, স্বামীজীর 'বিবেকানন্দ' নাম আক্ষরিকভাবে সত্য।৩১ 'ভারত' পত্রিকা ঐ রচনা সম্বন্ধে লেখে, "রচনাটি সোনার চেয়ে দামী।" মিরারে ২২ এপ্রিল 'ট্রুথ' নামক পত্রলেখক লেখেন, ওটি "মহামূল্য মাণিক্য।" ইণ্ডিয়ান নেশনে ওর বিষয়ে "বালকোচিত" সমালোচনা বেরিয়েছে, সেকথা বলার পরে একই পত্রলেখক লেখেন ঃ "চরম হাস্যকর ব্যাপার হল, সুপণ্ডিত সম্পাদক মহাশয় বেদান্তের তুরীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে শকুন্তলা ও মেঘদূতের দুটি শ্লোকের সাহায্যে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেনি।" কে কৃষ্ণমাচারিয়ার আর্য বাল বোধিনীতে লেখেন (১৮৯৮, জানুয়ারি) ঃ This little pamphlet [on Hinduism] is worth a million."

এখানেই ব্যাপারটির শেষ হয়নি। এন এন ঘোষ বোধহয় ভাবতে পারেননি যে, তাঁর নিন্দাত্মক রচনাগুলির সুযোগ বিবেকানন্দ বিরোধিগণ, বিশেষতঃ খ্রীস্টান মিশনারিগণ চরমভাবে গ্রহণ করবে। বিবেকানন্দ তাঁর রচনায় অদ্বৈত বেদান্তকেই হিন্দুধর্মের পরম সত্য বলে উপস্থিত করেছিলেন কিন্তু একই সঙ্গে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের মধ্যে কিভাবে অন্য মত-সমূহ সমন্বিত রয়েছে, তাও দেখিয়েছিলেন। স্বভাবতঃই স্বামীজীর এই সিদ্ধান্ত একেশ্বর-বাদী ব্রাহ্ম, দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব মানতে রাজি ছিলেন না; খ্রীস্টানরা তো নয়ই। সুতরাং কটাক্ষ এল বৈষ্ণবদের কাছ থেকে। আর ব্রাহ্ম ও খ্রীস্টানেরা তো এন এন ঘোষের সমালোচনাকে মাথায় তুলে নিলেন। অথচ স্বামীজীর মতের সমালোচক বিলাতফেরত এন এন ঘোষ ব্রাহ্ম নন, খ্রীস্টান নন, পুরো হিন্দু। অবস্থা দাঁড়াল—তিনি যেন হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করতে খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মদের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন। সেজন্য কিভাবে লজ্জা ও কুণ্ঠার সঙ্গে অনুতাপ করেছিলেন, তা কিছু দেখেছি, আরও বেশীভাবে দেখব বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে খ্রীস্টানী আক্রমণের ইতিহাস-সন্ধানের কালে।

বিবেকানন্দ 'হিন্দু' নন, 'নিও হিন্দু' (*Neo-Hindu*), তাঁর প্রচারিত হিন্দুধর্ম শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম নয়—আধুনিক চিন্তা এবং খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মধারাপুষ্ট অভিনব পদার্থ—এই প্রোপা-গ্যাণ্ডায় ব্রাহ্ম ও খ্রীস্টানেরা এমনই সরব ছিল যে, কলকাতার ধন্যবাদ-প্রস্তাবে লিখতে হয়েছিল ঃ

"১৮৯৩, ১৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার আপনি ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত ভাষণের মধ্যে হিন্দু-ধর্মের সাধারণ নীতির বিষয়ে যা বলেছেন, একটি বক্তৃতার পরিসরের মধ্যে তার থেকে প্রাঞ্জল ও নির্ভুল উপস্থাপন সম্ভব নয়।"

এই মন্তব্য স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' রচনাকে লক্ষ্য করেই।

বিখ্যাত বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র কে-টি, ধন্যবাদসভার সমর্থনে যে-পত্র পাঠান,

৩১ "No sooner had I read a few sentences than my attention was entirely arrested by the pamphlet.... The appropriate use of every word....justifies us to come to the conclusion that he has gained a thorough mastery over the English language. The way in which he explained what was implicity meant by the authors of the Vedanta philosophy, indicates his power of penetration into the subject. He is fairly entitled to the epithet *Vivekananda*."

[Letter of H. N. C.; *Mirror*, April 13, 1894]

তাতেও স্বামীজীর ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মকেই যথার্থ হিন্দুধর্ম বলে স্পষ্ট দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা হয়েছে ঃ

"That great services have been rendered to the cause of Hinduism by Srimut Vivekananda Swami at the Parliament of Religions at Chicago, and that they are gratefully appreciated by the Hindus, cannot in my opinion be questioned. But I have heard that some persons professing other religions think that the address of the Swami to the Parliament of Religions on the 19th September, 1893, is not a correct exposition of the Hindu religion. I believe that this opinion proceeds from their ignorance of the principles upon which the Hindu religion is founded."৩২

॥ ১১ ॥

এইকালে স্বামীজীর মত ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নানা বিরোধী প্রচারের ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশের কালে বলে নেওয়া দরকার, ঐসব সমালোচনা বা নিন্দা বৃহত্তর জনমানসে বিশেষ দাগ কাটতে সমর্থ হয়নি, স্বামীজীর মহান প্রকাশকে সাধারণে ঊর্ধ্ববাহুতে অভিনন্দিত করেছিল। এর পিছনে নরেন্দ্রনাথ সেনের প্রবল প্রচারের বিরাট ভূমিকা ছিল, আগেই সেকথা বলে এসেছি; এখানে আর একজনের মহৎ ভূমিকার কথা জানাতে হবে, তাঁর নাম অনাগারিক ধর্মপাল। দূরবর্তী দেশে অপরিচিত জনৈক বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের সমর্থনে খুব ভাল-কিছু বক্তৃতা করে বিদেশীদের মুগ্ধ করেছেন—সংবাদপত্রের রিপোর্ট-মারফত লোকে সে-কথা জেনেছিল, রোমাণ্টিক বিস্ময়ে তাকে আস্বাদন করেছিল—তারপর যখন ঐ বিস্ময়ের নায়ক সম্বন্ধে বিরোধী প্রচার আরম্ভ হয়ে গেল এবং ধর্মমহাসভায় যোগদানকারী জনৈক বাঙালী তাতে অংশগ্রহণ করলেন, তখন কিছু সংশয় স্বতঃই জেগেছিল। এক্ষেত্রে ঐ সংশয়কে দূর করতে পারেন তিনিই, যিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দাবি করতে সমর্থ। ধর্মপালের মধ্যে যেন

৩২ মাদ্রাজ ধন্যবাদসভায় স্বামীজীর উদ্দেশ্যে প্রেরণের জন্য যে অভিনন্দনপত্র পঠিত হয়, তার মধ্যেও হিন্দুধর্মের যথার্থ উদ্গাতারূপে তাঁর প্রশস্তি করা হয়েছিল। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের রূপ কী, তা মাদ্রাজ বাংলার চেয়ে বেশী জানত। ঐ অভিনন্দনপত্রের কয়েক লাইন ঃ

"I (Chairman of the meeting) have the honour to state that I give expression to the general feeling, both in our Presidency town and throughout Southern India, that you have laid the entire Hindu Community under immense obligations of gratitude by your powerful, telling and authoritative exposition of the religion of the sages and prophets of India.... We admire the convincing thoroughness of your demonstration that our Holy scriptures enunciate universal and unchanging spiritual laws; that their central conception lies in the truth that man is to become divine by realising the divine, 'not by believing but by being and becoming'; and that all religious systems are with the Hindus so many different paths to that heaven of supreme bliss and peace, which is freedom from the bondage of matter, and from the change and mutation which, while it continues, prevents the soul from realising its truly divine nature. Your exposition of Sri Krishna's ethical teaching has also been thorough and appropriate...." [*Mirror;* Aug. 8, 1894]

সেই ঈশ্বরপ্রেরিত মানুষকে দেখা গেল, যিনি শুধু ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন না, শ্রোতাদের দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত, অভিনন্দিত বক্তাও ছিলেন—তিনি যখন কলকাতার সভায় দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন তখন যুদ্ধজয় হয়ে গিয়েছে। আর সে কী সাক্ষ্য, রূপকথার কাহিনীকেও যেন ছাড়িয়ে যায়!—

"Mr. Dharmapala says that life-size portraits of Swami Vivekananda are found hung up in the streets of Chicago, with the words *Monk Vivekananda* beneath them and thousands passers-by, comprising men of all classes, are observed to do obeisance to these portraits in the most reverential way." "Mr. Dharmapala is of opinion that the success of the religion Parliament was, to a great extent, due to Swami Vivekananda." [*Mirror*, Ap. 12, 1894]

এই পর্যায়ে স্বামীজীর জনপ্রিয়তার ও সমাদরের পক্ষে ধর্মপালের সাক্ষ্যের গুরুত্ব বোঝা সম্ভব নয় যদি-না সেই সময়কার বিদ্বেষ-কলুষিত, সংশয়াবিল পরিবেশের কথা জানা থাকে। সেই পরিস্থিতিতে ধর্মপাল যা করেছিলেন, তার জন্য সকলেরই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ধর্মপাল তখন বাংলার ও ভারতের শিক্ষিতসমাজে পরিচিত চরিত্র। ভারতবর্ষে নব বৌদ্ধ-আন্দোলন আরম্ভ করার চেষ্টা তিনি করছেন, মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেছেন কলকাতায়, এবং সোসাইটির মুখপত্র মহাবোধি জার্নালও চালু হয়েছে। বিনয়ী ও উৎসাহী ধর্মপাল কলকাতায় যে-পরিচিতিলাভ করেছিলেন, ধর্মমহাসভার ব্যাপারে তা আরও বিস্তারলাভ করে। তাঁর সাফল্যসংবাদ কিভাবে এদেশীয় কাগজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তার অল্পবিস্তর বিবরণ আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি। ভারতীয় জনচক্ষে ধর্মপালও ধর্মমহাসভার অন্যতম প্রধান চরিত্রের মহিমালাভ করেছিলেন। সুতরাং এহেন ধর্মপাল যখন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রচারিত উজ্জ্বল সংবাদগুলির সত্যতার পক্ষে মুক্ত-কণ্ঠ নিয়ে দাঁড়ালেন তখন সকল সংশয়ের বাষ্প উড়ে গেল।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ধর্মপালের যে-বক্তৃতাংশ উপরে উদ্ধৃত করেছি, তারও অনেক আগে একই বিষয়ে ধর্মপালের সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৯৩, ৮ ডিসেম্বরের মিরারে দেখি ধর্মপাল জাপান থেকে লিখেছেন : "আমার মিশন সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। ভ্রাতঃ বিবেকানন্দ আমেরিকান জনগণের মনের উপরে নিজ জীবন ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা অনপনেয় প্রভাব মুদ্রিত করেছেন। আমাদের এখন দারুণ সময়। বিবেকানন্দ সবচেয়ে প্রিয় প্রতিনিধিদের একজন।" এর পরে ১২ এপ্রিল, ১৮৯৪-এর মিরারে জনৈক পত্রলেখক বিবেকানন্দ-বিষয়ে ধর্মপালের বক্তব্য লিখে পাঠান, যার কিছু অংশ পূর্বে আমরা উদ্ধৃত করে এসেছি। ১৯ এপ্রিলের মিরারে আলমবাজার-মঠের সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক ধর্মপালের আপ্যায়নের সংবাদ বেরোয়। ২২ এপ্রিল একই কাগজে জনৈক পত্রলেখক লেখেন যে, ধর্মপালের কথাগুলি বিবেকানন্দ-বিরোধীদের দ্বারা প্রচারিত কুৎসার উপযুক্ত জবাব। অতঃপর ১২ মে এই কাগজের একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়—মিনার্ভা থিয়েটারে ধর্মপাল 'আমেরিকায় হিন্দুধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন, সেখানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে জাপানের মুখ্য ধর্মাচার্যও (*His Holiness the High Priest of Japan*) উপস্থিত থাকবেন। তারপরে ১৮ মে'র সংবাদপত্রে ধর্মপালের বক্তৃতার বিবরণ বেরুল। ঐ সভা সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রমাণ সভার বিপুল ভিড় এবং সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই কতখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন ও কী গৌরবে ভূষিত হয়েছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী-মারফত তার সাক্ষাৎ বিবরণ পেতে কলকাতায় আগ্রহের সীমা ছিল না। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহারাজা বাহাদুর

স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন, "রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র কে-টি, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, রায় কানাইলাল দে-বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবু রমানাথ ঘোষ, বাবু যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক, বাবু বিপিনবিহারী মিত্র, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী, বাবু শরৎচন্দ্র দাস, সি আই-ই, বাবু পশুপতিনাথ বসু, মিঃ জে ঘোষাল। সভায় কয়েকজন দেশীয় মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।" ইতিপূর্বে ১২ এপ্রিলের মিরার থেকে আমেরিকায় বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সমাদর সম্পর্কে ধর্মপালের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি, যাতে তিনি চিকাগো শহরের পথে বিবেকানন্দের টাঙানো ছবির সামনে পথচারীদের শ্রদ্ধা-নিবেদনের কথা বলেছিলেন—ঐ কথাগুলি ধর্মপালের কাছ থেকে সংগ্রহ করে 'জনৈক হিন্দু বন্ধু' মিরারে পাঠিয়েছিলেন। ১৪ মে তারিখে ধর্মপাল প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে ঐ কথাগুলিই আবার মুক্ত-কণ্ঠে বললেন। সে রিপোর্ট অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ থেকে সংগ্রহ করে মিরার ১৮ মে তারিখে প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ৬ জুলাই তারিখে একই বিষয়ে মিরারে অধিক বিস্তৃত রিপোর্ট বেরোয়, সম্পাদকীয় মন্তব্যও সেই সঙ্গে। ধর্মপাল বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আমেরিকার ধর্মীয় অবস্থার কথা বলেছিলেন—সেই পটভূমিকায় বিবেকানন্দের উজ্জ্বল আবির্ভাবের মহিমার কথাও—

"চৌম্বক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রূপবান, সুঠাম, আমাদের প্রিয় ভ্রাতা বিবেকানন্দ [আমেরিকায়] আর্য ধর্মের সত্য ও সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। সেখানে হিন্দুধর্মের একেবারে যথার্থ বিবরণদানের সমুদয় কৃতিত্ব স্বামী বিবেকানন্দেরই।" "আমি কোনো দ্বিধা না রেখেই বলতে পারি, ধর্মমহাসভায় মহান ও উত্তম হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অপেক্ষা অন্য কেউই অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেননি।...আমাদের এই উত্তম ভ্রাতা আমেরিকার জনগণের বুদ্ধিমান ও আলোকপ্রাপ্ত অংশকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন যে, ভারতবর্ষ সত্য-দর্শন ও ধর্মের উদয়ক্ষেত্র এবং পীঠস্থান। আপনাদের এই কথা জানাতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দেবেন একথা বিজ্ঞাপিত হওয়া মাত্র আসনসংগ্রহের জন্য তাড়াহুড়া পড়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সমস্ত চিকাগো শহরে টাঙিয়ে বিজ্ঞাপিত করা হয় যে, তিনি এই-এই বিষয়ে এবং এই-এই স্থানে বক্তৃতা দেবেন। তিনি যেখানেই যান জনতা তাঁকে ঘিরে ফেলে, এবং তিনি যে-কথাই বলুন, লোকে পরমাগ্রহে তা শোনে।"৩৩

৩৩ ধর্মপালের বক্তৃতার অংশ ঃ

"When day after day his (Dharmapala's) brother lectured to a vast concourse of people in the Parliament of Religions at Chicago who listened to him with rapt attention, the papers were filled with descriptions of the 'magnetic presence' of the 'handsome Hindu Monk' whose life-sized picture had been placed in one of the public places. (*Indian Daily News*)

"A true and beautiful picture of the Aryan religion has been exhibited to them (to the Americans) by our friend, Swami Vivekananda, and to him all credit is due for the promulgation of the exact idea of Hindu religion in America.... I can unhesitatingly say that, in the Parliament of Religions there was no figure that attracted more attention than that great and good Hindu monk, Vivekananda.... Our good brother Swami Vivekananda has done a great and inestimable service not only in bringing forward the pure doctrines of Hindu philosophy, but has succeeded in convincing the intelligent and enlightened portion of the American public of the fact that India is the mother and seat of all true philosophy and metaphysics. I would tell you when Swami Vivekananda was advertised to speak, there would always be a rush for seats.

ধর্মপাল ঐ সভায় উৎসাহের মাথায় এমন-সব কথা বলেছিলেন, যা নিয়ে ব্রাহ্ম ও খ্রীস্টানেরা বিদ্রূপ করতে কখনই ছাড়বে না। তিনি বলেছিলেন ঃ "সুতরাং আমি আপনাদের বলতে পারি, যদি তাঁর (স্বামীজীর) চরিত্রের মানুষ আমেরিকায় যান, তাহলে সহস্র-সহস্র লোক স্বধর্ম ত্যাগ করে উপনিষদের গভীর দর্শনের অনুগামী হবে। স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের উদারকর দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।"৩৪

ধর্মপালের চরিত্রের সাধুতা ও সরলতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা বলতে পারি, দাস-জাতির সাধারণ ঈর্ষা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন, যার থেকে, পরম দুঃখের বিষয়, ভারতের কিছু বিখ্যাত ধর্মনেতা মুক্ত ছিলেন না। ধর্মপালের উদারতাও অসামান্য, নচেৎ তিনি সকল প্রতিনিধির মধ্যে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও ভাষণকে শ্রেষ্ঠ বলতে পারতেন না, সেখানে তিনি স্বয়ং একজন সমাদৃত প্রতিনিধি। বিবেকানন্দের সমাদরকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, সেই ভাবেই বিশ্বস্ততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাহলেও বলতে হবে, বিবেকানন্দকে তিনি একজন বিশেষ সফল ব্যক্তির বেশি ভাবতে পারেননি—ঐ সাফল্য যে, বাগ্মিতা বা সাধারণ ব্যক্তিত্ব থেকে আসেনি, এসেছিল বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে, তা মনে হয় সম্পূর্ণ-ভাবে ধারণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ধর্মমহাসভায় অন্য সকলেই বক্তা ছিলেন, প্রফেট ছিলেন একজনই—তাঁর নাম বিবেকানন্দ—ধর্মপাল তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি, যদি পারতেন তাহলে বক্তৃতার মধ্যে কদাপি বলতে পারতেন না—"Send-on some young men like Swami Vivekananda" কিংবা "I am confident that there are more young men like him in Bengal।" ধর্মপাল বুঝতে পারেননি যে, বিবেকানন্দ কোনো দেশে কোনো কালে একাধিক থাকেন না।

সে যাই হোক, ধর্মপালের এই বক্তৃতা বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের পক্ষে প্রত্যাশিত শুভ-বর্ষণের কাজ করেছিল। যে নরেন্দ্রনাথ সেন বিবেকানন্দের সমর্থনে অনলস প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে লিখলেন ঃ

"ধর্মপালের এই ভাষণ আমাদের কাছে অধিকতর আনন্দের হেতু হয়েছে এইজন্য যে, স্বামীজীর আমেরিকার কার্যাবলী সম্বন্ধে আমরা যে-সব কথা লিখে এসেছি তা এখন প্রকাশ্যে অভ্রান্তভাবে স্বীকৃত হল। তদুপরি আনন্দ এই, স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায়, তারপরে আমেরিকার নানা গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাকেন্দ্রে, যে-অসাধারণ কীর্তি রেখেছেন, তাকে তুচ্ছ করার চেষ্টা কোনো-কোনো মহলে আমরা লক্ষ্য করেছি—সেই শোচনীয় প্রয়াস এখন শোচনীয়ভাবেই ব্যর্থ হয়ে গেল। এবং [ধর্মপালের] এই অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত বৌদ্ধ-সাক্ষ্য ভবিষ্যতে যদি স্বামীজীর গুণপনাকে তুচ্ছ করার চেষ্টা করা হয়, তাকে নিষ্ফল করে দেবে। আমেরিকায় স্বামীজীর কার্যের মূল্য সম্বন্ধে কেবল মিঃ ধর্মপালই নন, তাঁর থেকে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি—যিনি জাপানের মহামহিমান্বিত বৌদ্ধ ধর্মাচার্য ছাড়া আর কেউ নন—একই সাক্ষ্য দিয়েছেন।"

ধর্মপালের বক্তৃতা নরেন্দ্র সেনের মর্যাদাকে আশ্বস্ত করেছিল, আর তা বহু দূরবর্তী বিবেকানন্দকে তাঁর জীবনের চরম সংকটক্ষণে দিয়েছিল ধরে ভাসবার কাঠের টুকরো।

The picture of Swami Vivekananda was placarded all over the city of Chicago.. Wherever he went, the people thronged round him, and great was the interest shown by them in everything he said." [*Mirror*, July 6, 1894]

৩৪ "I, therefore, tell you that if men of his (Vivekananda's) character go to America, thousands would be converted into followers of the deep philosophy of the Upanishad. The Swami is the best exponent of the liberalising doctrine of the Upanishad." (*Mirror*, July 6, 1894)

বিবেকানন্দ এই সভার বিবরণ পেয়ে কতখানি বিহ্বল হয়েছিলেন, তা দেখা যায় হেল ভগিনীদের কাছে লেখা তাঁর ৯ জুলাইয়ের চিঠিতেঃ

"জয় জগদম্বে! আশাতীত পেয়েছি। প্রফেট মর্যাদা পেয়েছে—প্রচণ্ডভাবে! সন্তানের প্রতি মায়ের করুণা দেখে শিশুর মত কাঁদছি—তিনি তাঁর দাসকে কখনো ত্যাগ করেন না। যে চিঠিখানি তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, তাই সকল কিছু ব্যাখ্যা করে দেবে; আর আমেরিকার লোকদের কাছে ছাপা কাগজপত্রগুলি আসছে। ও-সবের মধ্যে যাঁদের নাম আছে তাঁরা আমাদের সমাজের শিরোমণি। সভাপতি ছিলেন কলকাতার প্রধান অভিজাত পণ্ডিত, যাঁরা মর্যাদা সরকারের দ্বারা অনুমোদিত—মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। চিঠিটি থেকেই সব সংবাদ তোমরা দেখে নেবে। ভগিনীগণ! কী পাষণ্ড আমি! তাঁর এত দয়ার মধ্যে থেকেও বিশ্বাস বিচলিত হয়। অথচ প্রতি মুহূর্তে দেখছি আমি তাঁরই হাতে রয়েছি। এত পাই তবু নৈরাশ্যে ডুবি! ভগিনীগণ! ভগবান একজন আছেন—আছেনই—তিনি পিতা, তিনি মাতা—তিনি কখনো তাঁর সন্তানকে ত্যাগ করেন না—না—না—কখনো না। বিচিত্র উদ্ভট সব মত ছেড়ে দিয়ে শিশুর মতো তাঁর আশ্রয় নাও। আর লিখতে পারছি না—কাঁদছি, একেবারে মেয়েদের মতো।"

॥ ১২ ॥

মিশরের উদ্দীপনাময় প্রচার, তাতে অন্যান্য সংবাদপত্রের সমর্থন, ধর্মপালের প্রত্যক্ষদর্শীর ভাবাবেগপূর্ণ সাক্ষ্য—এরা মিলিত হয়ে স্বামীজীর বিরুদ্ধে নিন্দার ছেঁড়া পাতাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এই সময়ের কিছু পূর্ব থেকেই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত-সমাজে শ্রদ্ধা-পূর্ণ আগ্রহের সূত্রপাত হয়েছিল; তার মূলে ছিল বৃহত্তর ভারতের ক্ষেত্রে ম্যাক্সমুলারের বৈদিক গবেষণা ও থিয়জফিক্যাল সোসাইটির উৎসাহী প্রচার; বাংলার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর অনুবর্তীদের রচনা, সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্রের প্রেরণা। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য। এইজন্য ক্ষুদ্র হলেও ঐকান্তিক একটি গোষ্ঠী প্রথমাবধি স্বামীজীর পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। বিরোধীদের অকারণ দংশনও স্বামীজীকে পরোক্ষ সাহায্য করেছে, কারণ ঐ অনুচিত আক্রমণকে ঘৃণার সঙ্গে প্রতিহত করতে অনেকে এগিয়ে এসে-ছিলেন। স্বামীজীর 'পেপার অন হিন্দুইজম্' কি-জাতীয় বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল দেখেছি। ঐ রচনার ভাষা-সৌন্দর্য এবং ভাবমহিমা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও অদ্বৈত বেদান্ত-ভিত্তিতে হিন্দুধর্মকে স্থাপনের চেষ্টাকে সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে গেল স্বামীজীর মাদ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তর পড়ে। মাদ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তরের মধ্যে হিন্দুধর্মের তত্ত্বগত লক্ষণ নির্দেশের চেষ্টা স্বামীজী যত না করেছেন, তারও বেশি উপস্থিত করেছিলেন সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাবগত ঐক্যের রূপকে, সেইসঙ্গে এক বিরাট আহ্বানকে—হিন্দুধর্মের প্রাণসত্যকে স্বীকার করার জন্য। উপনিষদের উৎসবারি আহরণ করেই কিভাবে ভারতের সকল সম্প্রদায় প্রাণলাভ করেছে, দৃষ্টান্তযোগে স্বামীজী তা দেখিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি কিছু বিরোধী সমালোচনার উত্তর দেবার চেষ্টাও করেন। সর্বোপরি উন্মোচন করেন নবজাগ্রত ভারতমাতার এক অপূর্ব দর্শনকে।

মাদ্রাজ টাইমসে স্বামীজীর এই উত্তর-পত্রের সঙ্গে সেণ্ট পলের বিখ্যাত পত্রাবলীর তুলনা করা হয়েছিলঃ

"সুমহান খ্রীস্টান প্রচারক [সেণ্ট পল] দূর দেশ থেকে যে-সব পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং সেই পার্চমেণ্টের উপরে লেখা পত্রগুলির উপরে করিন্থিয়ান, ইফিসিয়ান এবং গলাসিয়ানরা যে-ভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ত, ঠিক সেই শ্রদ্ধার ও অনুরাগের সঙ্গে সুমহান হিন্দু-প্রচারকের

প্রেরিত শব্দগুলিকেও গ্রহণ করা হবে, মনে হয়।...এমন-কি আমরা এ-আশাও প্রায় করতে পারি, করিন্থ বা ইফিসাসের নাগরিকেরা সেণ্ট পলের পত্রকে যে-ভাবে স্বাগত জানাত, মাদ্রাজের নাগরিকেরা স্বামীজীর পত্রকে তারও বেশি অনুরাগের সঙ্গে আবাহন করবে। সেণ্ট পল তাঁর পত্র-পাঠকদের কাছে অপরিচিত মানুষ ছিলেন ; একটি নবভূমিষ্ঠ এবং বাঁচার জন্য আকুতিপরায়ণ ধর্মবিশ্বাসের রজ্জুর দ্বারাই তাঁরা আবদ্ধ ছিলেন। অপরপক্ষে স্বামীজী ভারতবাসী, স্বয়ং ভারতীয়, তাঁর পত্র-পাঠকদের সঙ্গে ধর্মবন্ধন এবং রক্তবন্ধন দ্বারা তিনি যুক্ত, এবং উক্ত ধর্ম বাঁচার জন্য সংগ্রামশীল নবজাত কোনো ধর্ম নয় [সেণ্ট পলের সময়ে খ্রীস্টধর্ম যা ছিল], পরন্তু পৃথিবীর সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় ধর্মের অন্যতম, সংগ্রামশীল অবশ্যই, কিন্তু সে-সংগ্রাম বহু বৎসরের উপহাস ও উৎপীড়নের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে শুদ্ধিকৃত প্রাণশক্তির মধ্যে জাগ্রত হবার জন্য।...স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সংগ্রাম করে একদল ঔপনিবেশিক একটি নূতন জাতি গঠন করবার চেষ্টা করছে, তার প্রাণচেতনার চেয়ে অনেক প্রবল প্রাণচেতনায় সঞ্জীবিত থাকে একটি প্রাচীন জাতির মানুষ, যারা উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে।... মাদ্রাজের নাগরিকেরা সত্যই ভাবোদ্দীপনায় প্লাবিত-চিত্ত হয়ে উঠবে যখন তারা তাদেরই একজন, বহু দূরবর্তী সেই সুমহান হিন্দু-প্রচারকের পত্র পাঠ করবে, যিনি তাদের কালপ্রাচীন ধর্মমতের গৌরব-সংরক্ষণের জন্য অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করে যাচ্ছেন।"

ভারতের জাতীয়তার উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী, বিশেষতঃ পত্রাবলীর বিপুল প্রভাবের কথা সংশিলষ্ট ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন। সে-বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আমরা গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে দেব। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলবে, নবজাগ্রত জাতির কাছে বিবেকানন্দের পত্রাবলী গীতাতুল্য হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, মাদ্রাজ টাইমসে মাদ্রাজ-উত্তরের বিষয়বস্তুর প্রশংসাই কেবল করা হয় নি, তার 'সহজ প্রত্যক্ষ ভাষার অসীম সৌন্দর্য' এবং 'অপূর্ব আকর্ষণে'র কথাও বলা হয়েছিল। স্মিত কৌতুকের সঙ্গে সম্পাদক লেখেন, যে-বিবেকানন্দ হয়ত একদা তাঁর বাল্যকালে স্যাক্সনদের সুন্দরী ভাষাকে বারে-বারে খুন-জখম করেছেন, সেই হত্যাকারী এখন নিহতের পুনরুত্থান ঘটিয়েছেন, তার অঙ্গে যোগ করেছেন নূতন একটি সৌন্দর্য।৩৫

দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলিও স্বতঃই উদ্দীপ্ত হয়েছিল মাদ্রাজ-উত্তরে। লখনৌ অ্যাড-

৩৫ স্বামীজীর ইংরেজি ভাষার উপরে মাদ্রাজ টাইমসের মন্তব্য মূলে উদ্ধৃত করা উচিত:

"Two things strike us on reading the Swami's epistle. The first is the exceeding beauty of his language, which, a residence in the land of Western wit and wisdom has by no means impaired. If the Swami's language is capable of development—a possibility which Mr. Oscar Wilde thinks is a mark of mediocrity—the raciness of American thought and expression has added new grace to his style. Letting the numerous Sanskrit references and quotations mean what they may, we find a wonderful charm in the simple straightforward eloquence the Swami's English, such as makes us marvel when we realise that the language flows from one whose baby tongue lipsed Bengali, and by whom English was learned, not in child-like simplicity from the 'Bible' or the 'Peep of Day' at a rosy-faced mother's knee, but labouriously and hideously from a school-reader amid a class of sing-song Bengali boys. It is possible that the author of this epistle was once upon a time a murderer of the fair Saxon tongue, and that now the murderer has raised his victim to life again, adorned with one more beauty, with which own originality has endowed her!"

ভোকেট (১৮৯৪, ১৮ নভেম্বরের মিরারে উদ্ধৃত) লিখেছিল, "এই রচনাটি যথার্থই স্বামীজীর যোগ্য সৃষ্টি—গভীর প্রজ্ঞায় এবং উচ্চ দার্শনিক চিন্তায় পূর্ণ।" 'পাওয়ার' পত্রিকা বলেছিল (১৮৯৪, ২৪ নভেম্বরের থিয়জফিক থিংকারে উদ্ধৃত)—"এটি অত্যুচ্চ বাণীসৌন্দর্য এবং প্রগাঢ় পান্ডিত্যে পূর্ণ।" মিরার বলেছিল (১৮৯৪, ৪ নভেম্বর)—"এই উত্তরটি একটি অসাধারণ দলিল—প্রখ্যাত স্বামীজীর ধর্মধারণার প্রমাণপত্রের তুল্য। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, যেখানেই এটি পড়া হবে, সেখানেই সকলের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করবে, সেইসঙ্গে এই বিস্ময় না জেগে পারবে না—বয়সে এত নবীন হয়েও স্বামীজী কিভাবে ওহেন পান্ডিত্য অর্জন করলেন! এই দলিলের প্রতিটি ছত্রেই বিদ্যাবত্তার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায় এবং তৎসহ দেখা যায়, এদেশের অগণ্য ধর্মসম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের রূপ—ভারতীয় শাস্ত্রাদির সঙ্গে পরিচয় তো বলাই বাহুল্য।... আর যে-ভাষায় তিনি ঐ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, তার থেকে উত্তম ভাষাও সম্ভব নয়।"

মাদ্রাজ-উত্তরে কেবল শাস্ত্রজ্ঞান বা ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকাশ ছিল না—ছিল একইসঙ্গে অসাধারণ দেশপ্রেম : "এই দলিলের উপরে পাঠকগণ যখন চোখ বুলোবেন, তখন প্রত্যেকেই একটি বিষয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রত্যয়বোধ না করে পারবেন না, তা হল—জন্মভূমির প্রতি লেখকের তীব্র গভীর ভালবাসা—ভারতের প্রতি ব্যাকুল প্রাণের টান।...দেশ ও ধর্মের প্রতি সেই প্রেম তাঁর স্বচ্ছন্দগতি লেখনীর মুখে সৃষ্টি করেছে উজ্জ্বল শব্দরাজি এবং রূপময় চিত্রকল্প।"

মাদ্রাজ-উত্তর লেখার আগেই স্বামীজী তাঁর মতাদর্শের বিরুদ্ধে ভারতের কোনো-কোনো স্থানে যে-সকল আপত্তি উঠেছিল, তাদের বিষয়ে অল্পবিস্তর জেনেছিলেন। মাদ্রাজ-উত্তরে তিনি কিছু-কিছু জবাব দেন এবং তা ছিল খুবই মর্যাদাপূর্ণ। আমেরিকায় টাকা তোলার জন্য মিশনারিরা যে-ধরনের ভারত-কুৎসা করে, তার প্রতিবাদও করেছিলেন। বলে-ছিলেন, তিনি মিশনারিদের বিরোধী নন, কিন্তু তাদের গ্লানিপ্রচার-নীতির বিরোধী। মিশনারিরা ভারতের নিন্দা করেন কিন্তু উল্টোপক্ষে তাঁদের দেশের এমন বাস্তব বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, যার কাছে "মিশনারি-অঙ্কিত ভারতের কাল্পনিক চিত্র নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।" কিন্তু "বেতনভুক্ নিন্দুক হওয়া আমার জীবনের লক্ষ্য নয়।" ভারতীয় সমাজের কুৎসাকথনে মিশনারিদের সহযোগী ভারতীয় সমাজসংস্কারকদের প্রয়াসকে একটি উপমার দ্বারা ফুটিয়ে-ছিলেন—"বন্ধুর গায়ে মশা বসিয়াছে দেখিয়া সেই গল্পের মানুষটি যেমন দারুণ আঘাতে মশার সঙ্গে বন্ধুকেও মারিয়া ফেলে, তেমনি সংস্কারকেরা সমাজের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া সমাজকেই একেবারে ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।" শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁদের চেষ্টার ফল ভালই হয়েছে—"আমাদের নিশ্চেষ্ট সমাজরূপ দৈত্যকে জাগরিত করিতে সংস্কারোন্মত্ততার এই বৈদ্যুতিক আঘাতের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।" সন্ন্যাসধর্মের বিরুদ্ধে মজুমদার-প্রভৃতির আক্রমণের কিছু উত্তরও তিনি দেন (পরে সে-প্রসঙ্গ আসবে), এবং ছোট-খাট আরও নানা সমালোচনার উত্তর—কিন্তু প্রধান উত্তর ছিল ইন্ডিয়ান নেশনের কঠোর সমালোচনার, কারণ সেগুলি জনৈক কৃতবিদ্য হিন্দুর রচনা-রূপে প্রকাশিত, যার তাত্ত্বিক বক্তব্যের প্রচুর ব্যবহার করছিল বিরোধীপক্ষ (পরেও তা করবে)। এই উত্তর দেবার কালে বাংলাদেশের ধর্মধারণা সম্পর্কে স্বামীজী খুব বড়-কিছু শ্রদ্ধা প্রকাশ করে উঠতে পারেন নি, কারণ চৈতন্য ও রামকৃষ্ণকে বাদ দিলে, এমন কোনো ধর্মাচার্যের কথা ভাবতে পারেন নি, যিনি সর্বভারতীয় ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে স্থানাধিকারে সমর্থ। "আমাদের কতকগুলি স্বদেশী বঙ্গবাসী হিন্দুধর্মের এই পুনরুত্থানকে 'অভিনব বিকাশ' বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্যই 'অভিনব' বলিতে পারেন, কারণ হিন্দুধর্ম সবে বাংলাদেশে প্রবেশ করিতেছে। এখানে এতদিন ধর্ম বলিতে কেবল আহার-বিহার ও বিবাহ-সম্বন্ধীয়

কতকগুলি দেশাচার বুঝাইত।" রামকৃষ্ণ-শিষ্যরা হিন্দুধর্ম বলে যে-ভাব প্রচার করছেন, তা শাস্ত্রানুমোদিত কি-না, তার পুরো উত্তর যদিও উক্ত 'ক্ষুদ্র পত্রে' দেওয়া সম্ভব নয় বলে স্বামীজী মনে করেছিলেন, তথাপি যথেষ্ট উত্তরই দিয়েছিলেন, যার সূচনায় সুমধুরভাবে বলেছেন—"আমি কখনও এরূপ তর্ক করি নাই যে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থ হইতে হিন্দুধর্মের যথার্থ ধারণা হইতে পারে, যদিও তাঁহাদের কথা 'অমৃতসমান', এবং যাঁহারা শোনেন, তাঁহারা 'পুণ্যবান।' হিন্দুধর্ম বুঝিতে হইলে বেদ ও দর্শন পাড়িতে হইবে, এবং সমুদয় ভারতের প্রধান-প্রধান ধর্মাচার্য এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের উপদেশাবলী জানিতে হইবে।" এবং "সৃষ্টির অনাদি রূপ" সম্বন্ধে খ্রীস্টানগণ-অনুমোদিত যে-আপত্তি ইণ্ডিয়ান মেশন উত্থাপন করেছিল, তার যথোচিত খণ্ডনও স্বামীজী করেছিলেন।

মাদ্রাজ-উত্তরের মূল বিষয় কিন্তু সমসাময়িক সমালোচনার উত্তরদানের প্রয়াসে সীমাবদ্ধ ছিল না—হিন্দুধর্মের মধ্যে কিভাবে সকল সম্প্রদায় মিলিত হয়েছে, তাকেই উন্মোচন করেছিলেন মহনীয় ভাষায়। স্বামীজী দেখিয়ে দেন—শ্রুতির (অর্থাৎ বেদ বা বেদান্ত) উপরে ভিত্তি করে সকল হিন্দু-মত গঠিত হয়েছে। কেবল হিন্দুর মতসমূহ নয়, বৌদ্ধ ও জৈন মতের দার্শনিক ভিত্তিও শ্রুতি-নির্ভর। এই সূত্রে একটি দীর্ঘ টানে ভারতের ধর্মেতিহাসের রেখাচিত্র আঁকেনঃ

"যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ চিন্তাপ্রণালীর কেন্দ্রে গিয়া প্রাচীন ও বর্তমান সকল ভারতীয় চিন্তাধারা পতিত হইয়াছে, যদি কেহ জানিতে চাহেন, নানা শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট হিন্দুধর্মের মেরুদণ্ড কোথায়, তখন নিঃসন্দেহে বলিতে হইবে—ব্যাসসূত্রেই সব-কিছু সমন্বিত।

"হিমালয়স্থিত অরণ্যানীর হৃদয়স্তব্ধকারী মহাগাম্ভীর্যের মধ্যে, মন্দাকিনীর গভীর সুরধ্বনির সহিত মিশ্রিত অদ্বৈত-কেশরীর 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়'-রূপ বজ্রগম্ভীর রবই কেহ শ্রবণ করুন ; কিংবা কান পেতে শুনুন বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জে-কুঞ্জে 'পিয়া পীতম্'—এই কূজন; বারাণসীর মঠসমূহে সাধুদিগের গভীর ধ্যানে কেউ যোগদান করুন; কিংবা নদীয়ার মহাপ্রভুর ভক্তগণের ভাবোন্মাদ নৃত্যে অংশ নিন; বড়গেলে, তেঙ্গেলে প্রভৃতি শাখাযুক্ত বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী আচার্যগণের পাদমূলে উপবেশন করুন, অথবা মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্যদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করুন ; তিনি শ্রবণ করুন ঐহিক শিখদের সমরনির্ঘোষ 'ওয়া গুরুকী ফতে', কিংবা 'উদাসী' ও 'নির্মলা'দিগের গ্রন্থ-সাহেবের উপদেশাবলী; কবীরের সন্ন্যাসী-শিষ্যগণকে 'সৎ সায়েব' বলিয়া অভিবাদন করুন ; বা সানন্দে শুনুন সখীভজন; রাজপুতনার বিখ্যাত সংস্কারক দাদূর অপূর্ব প্রজ্ঞার মধ্যে, কিংবা তাঁহার শিষ্য রাজা সুন্দরদাস হইতে আরম্ভ করিয়া নিচলদাস পর্যন্ত লেখকদের রচনাবলীর মধ্যে অবগাহন করুন (নিচলদাসের বিখ্যাত গ্রন্থ বিচারসাগরের প্রভাব গত তিন শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে সর্বাধিক বিস্তৃত) ; কিংবা এমন-কি উত্তর-ভারতের ভাঙ্গী মেথরগণের মুখে তাঁহাদের লাল গুরুর উপদেশাবলী শ্রবণ করুন—তিনি দেখিবেন যে, এই সমস্ত আচার্য ও তাঁহাদের মতসমূহের ভিত্তিরূপে রহিয়াছে একমাত্র শ্রুতি, গীতা যার ঐশ্বরিক টীকা, শারীরক ভাষ্য যার প্রণালীবদ্ধ বিবৃতি এবং সকল সম্প্রদায়সহ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া লাল গুরুর দরিদ্র ঘৃণ্য মেথর শিষ্যগণ যাহার নানামুখী বিকাশ।"

দক্ষিণভারত কিভাবে আর্যধর্মকে রক্ষা করেছে, জন্ম দিয়েছে শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণের, হিন্দীভাষী জনগণের মধ্যে কিভাবে বেদান্ত-ভাবনা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিভাবে পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর কাছ থেকে ধর্মীয় প্রেরণালাভ করে, অপূর্ব ভাবপ্রেমে উত্থিত হয়ে বাংলার চিত্তজাড্যকে দূর করেছিলেন, তাকে যুক্ত করেছিলেন

গোটা ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের সঙ্গে, কেবল তাই নয় ব্যক্তিপ্রতিভায় নিজ প্রভাবকে মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের সর্বত্র—অনবদ্যভাবে এসব কথা স্বামীজী মাদ্রাজ-উত্তরের মধ্যে বলেছিলেন। জোর দিয়ে বলেছিলেন তাঁর চিরদিনের সেই কথাটি—ধর্ম মানে ঈশ্বরকে পাওয়া, কিংবা ঈশ্বর হওয়া। মানুষের দুর্বল রূপ কখনো দেখবে না—দেখবে তার শক্তির রূপ—তবেই জাগবে ব্রহ্মশক্তিঃ

"Let us take our stand on the one truth in our religion—the common heritage of the Hindus the Buddhist and Jains alike—the spirit of man—the Atman of man—the immortal, birthless, all-pervading, Eternal Soul of man whose glories the Vedas cannot themselves express, before whose majesty the universe with its galaxy upon galaxy of suns and stars and nebulae is as a drop. Every man or woman, nay, from the highest Devas to worm that crawls under our feet, is such a spirit, evoluted or involuted. The difference is not in kind but in degree.

এই আত্মতত্ত্ব মানব সভ্যতায় ভারতের বিশেষ দান। বহু সহস্র বৎসরের সাধনায় ভারতবর্ষ এই সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছে—এই সাধনার দ্বারাই ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ—সে ইউরোপ নয়। "ভারতবর্ষ যদি মরে যায় তবেই সে ইউরোপ হতে পারবে।"

"ভারতবর্ষ কি মরিবে, মরিতে পারে?"—স্বামীজীর বুক চিরে এই প্রশ্ন বেরিয়ে এল—

"ভারতবর্ষ যদি মরে তাহা হইলে পৃথিবী হইতে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার বিনাশ ঘটিবে, নৈতিক আদর্শের চরম প্রকাশগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, সকল ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিনষ্ট হইবে, মৃত্যু হইবে ভাবুকতার। তাহার স্থানে দেব-দেবীরূপে রাজত্ব করিবে কাম ও বিলাস—অর্থ হইবে তাহার পুরোহিত—প্রতারণা, পশুবল ও প্রতিযোগিতা তাহার পূজানুষ্ঠান, এবং বলির বস্তু—মানবাত্মা।"

সুতরাং বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান, যা একমাত্র তিনিই করতে পারেনঃ

"ঘর যদি অন্ধকার থাকে, 'অন্ধকার অন্ধকার' বলিয়া সর্বদা চিৎকার করিয়া দুঃখ করিলে অন্ধকার দূর হইবে না—আলো লইয়া আইস। জানিয়া রাখো—যাহা কিছু নেতিবাচক, ধ্বংসাত্মক, দোষদর্শনাত্মক, তাহা চলিয়া যাইবেই যাইবে; যাহা কিছু ভাবাত্মক, অস্তিবাচক, গঠনমূলক তাহাই অবিনাশী, তাহাই চিরকাল থাকিবে। এসো, আমরা বলি, 'আমরা সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, আমরাই ব্রহ্ম; শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।' অগ্রসর হও, অগ্রসর হও! জড় নয়, চৈতন্যই লক্ষ্য।...আলো আনো, অন্ধকার আপনিই চলিয়া যাইবে। বেদান্ত-কেশরী গর্জন করুক, শৃগালগণ গর্তে পলায়ন করিবে।...

"ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশসহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, বৈরাগীর ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না তোমরা দুর্বল, বাস্তবিক সেই আত্মা সর্বশক্তিমান। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরণস্পর্শে যে-মুষ্টিমেয় যুবকদলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখো। আসাম হইতে সিন্ধু, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা তাহারা প্রচার করিয়াছে। তাহারা পদব্রজে বিশ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া

তিব্বতের রহস্য ভেদ করিয়াছে।৩৬ তাহারা চীরধারী হইয়া দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছে। কত অত্যাচার তাহাদের উপর দিয়া গিয়াছে, পুলিশ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, কারাগারে তাহারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।৩৭...

"এখন তাহারা বিংশতিজন মাত্র। কালই তাহাদের সংখ্যা দুই সহস্রে পরিণত করো। বাংলার যুবকগণ! তোমার দেশের জন্য ইহা প্রয়োজন, পৃথিবীর জন্য ইহা প্রয়োজন। অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি তোমরা জাগাইয়া তোল; সে শক্তি তোমাদিগকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণতা—সব কিছু সহিবার সামর্থ্য দিবে। বিলাসপূর্ণ গৃহে বসিয়া, জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবৃত থাকিয়া, অল্প-স্বল্প শখের ধর্ম করা অন্য দেশের পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্তরের প্রেরণা উচ্চতর। ভারত সহজেই মুখোস চিনিতে পারে। মুখোস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও। মহৎ হও। ত্যাগ করো। ত্যাগ ভিন্ন কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না।...সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নাম-যশ, পদ—এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া, মানবদেহের শৃঙ্খলদ্বারা এমন একটি সেতু নির্মাণ করো যাহার উপর দিয়া লক্ষ-লক্ষ মানুষ জীবনসমুদ্র পার হইবে।....

"তুমি কোন্ পতাকার নিম্নে থাকিয়া চলিতেছ, তাহা দেখিও না। তোমার পতাকা নীল, সবুজ বা লাল—তাহা গ্রাহ্য করিও না। সমুদয় রঙ মিশাইয়া প্রেমের শুভ্রবর্ণের তীব্র জ্যোতি প্রকাশ করো। কর্মে আমাদের প্রয়োজন, ফল আপনিই হইবে। যদি কোনো সামাজিক নিয়ম তোমার ব্রহ্মত্বলাভের প্রতিকূল হয়—আত্মার শক্তির সামনে তাহা টিকিবে না। ভবিষ্যৎ কী, আমি দেখিতে পাইতেছি না, দেখিবার আগ্রহও নাই;

৩৬ অখণ্ডানন্দ এবং ত্রিগুণাতীত তিব্বতে গিয়েছিলেন। এইকালে ইণ্ডিয়ান মিরারে ত্রিগুণাতীতের তিব্বত-ভ্রমণকাহিনী বেরিয়েছিল।

৩৭ স্বয়ং স্বামীজীর পিছনে পরিব্রাজক-জীবনে পুলিশ লেগেছিল। অখণ্ডানন্দ-স্বামী অবিরত পুলিশের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন, আটকও হয়েছেন।

পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজীর পিছনে পুলিশের ফেউ লাগার বিষয়ে কিছু সংবাদ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিকথায় পাই। এমন-কি যখন তিনি বরাহনগরে মঠ স্থাপন করে গুরুভাইদের সঙ্গে পাঠে-সাধনায় নিমগ্ন আছেন, তখনও পুলিশের উপদ্রব ছিল। একদা স্বামীজীর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত বড়দরের এক গোয়েন্দা-অফিসার স্বামীজীকে সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণের ছল করে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান। তারপর কি হল, নগেন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন ঃ

"সহসা তিনি [পুলিশ-অফিসার] গলা নামিয়ে, কুটিল চোখে তাকিয়ে বললেন, 'এখন বলে ফেলো দিকি, আসল ব্যাপারটা কি? তোমার ওসব [ধর্ম-কর্মের] গালগল্প দিয়ে আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না, তা তুমি জানো। তোমাদের সব খেলাই ধরে ফেলেছি। তুমি আর তোমার দল বাইরে ধর্মের খোলস পরে আছো, কিন্তু আমার হাতে স্পষ্ট খবর আছে, তোমরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ।' স্তম্ভিত, রুষ্ট বিবেকানন্দ বললেন, 'কি বকছেন বাজে! ষড়যন্ত্র? তার সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়?' 'সেইটেই তো জানতে চাইছি'—পুলিশ অফিসার শীতলভাবে বললেন; 'আমি নিশ্চিত যে, তোমরা জঘন্য মতলব করছ, আর তুমিই দলের পাণ্ডা। এখন সমস্ত কথা খুলে বলো। আমি দেখব যাতে তুমি অ্যাপ্রুভারের ছাড়ান পাও।' বিবেকানন্দ বললেন, 'যদি সব কিছুই আপনি জানেন, তাহলে আমাদের আস্তানায় খানাতল্লাস করে আমাদের গ্রেপ্তার করছেন না কেন?' এই বলে বিবেকানন্দ ধীরে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বিবেকানন্দের প্রচণ্ড শক্তিশালী চেহারা, মল্লযোদ্ধার মতো—অন্যদিকে পুলিশ অফিসারটি রোগা-পটকা শুঁটকে প্রাণী। বিবেকানন্দ তাঁর দিকে এবার ঘুরে বললেন, 'ছল করে আপনি আমাকে আপনার বাড়িতে ডেকে এনেছেন, এখানে আমার ও আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে মিথ্যে অভিযোগ করছেন। এই হল আপনার চাকরি। অন্যদিকে অপমানের প্রতি-রোধ না করতেই আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যদি আমি অপরাধী ও ষড়যন্ত্রকারী হতাম, তাহলে এখানে টুঁ শব্দ করার আগে আপনার ঘাড় মটকে চলে যেতে কোনো অসুবিধা ছিল না। সে যাই হোক, আপনি শান্তিতে থাকুন, আমি চললুম।' এই বলে, সেই মহাবীর পুলিশ অফিসারকে বাক্যহত ভয়ার্ত অবস্থায় রেখে, দরজা খুলে বিবেকানন্দ বেরিয়ে এলেন।" ['রেমিনিসেনসেস্']

কিন্তু আমি একটি দৃশ্য সাক্ষাৎ-জীবনের মতোই স্পষ্ট দেখিতেছি—আমাদের সেই প্রাচীনা মাতা আবার জাগিয়া উঠিয়াছেন, পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। যাও, শান্তি ও আশীর্বাদের সহিত সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার নাম ঘোষণা করো।"

বিবেকানন্দের এই বাণী, যা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে পারে, কলকাতায় কী প্রবল আবেগতরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, তার কিছু পরিচয় মেলে মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়। স্মরণ রাখতে হবে, বিবেকানন্দের ভাষায় পূর্বে কেউ ভারতবর্ষকে আহ্বান করেন নি, এবং বিস্ময়ের কথা, পরেও ভারতবর্ষে সে-ভাষার অধিকার কারো আসেনি।

মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"মাদ্রাজ হইতে যে-অভিনন্দন পাঠানো হইয়াছিল, স্বামীজী প্রত্যুত্তর লিখিয়া শশী-মহারাজকে এক প্রস্থ পাঠাইয়া দেন...আলমবাজার-মঠে বসিয়া শশী-মহারাজ মাদ্রাজ-অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরটি পড়িতে লাগিলেন, আর সকলে বসিয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। পড়িতে-পড়িতে শশী-মহারাজ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একেবারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। সে কি তাঁহার বুক ফুলাইয়া বসা, মুখের ভঙ্গি, গলার আওয়াজ! যেন শশী-মহারাজই স্বয়ং বক্তৃতা করিতেছেন।

"দুই চারিদিনের মধ্যে বক্তৃতাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে শহরে যেন হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কি ট্রামে, কি স্কুল-কলেজে, কি অফিসে—সর্বদিকে ঐ কথা। বাঙালী জাতির আত্ম-শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। জাতিগত ভাব, জাতিগত ইচ্ছা, জাতিগত প্রাধান্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। হাটে-বাজারে, এমন-কি গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকদিগের ভিতরও বাঙালী সন্ন্যাসীর কথা আলোচনা হইতে লাগিল। একের বিজয় যেন সকলের বিজয় হইয়া উঠিল। এরূপ ভাব আর কখনও বাঙালী জাতির ভিতর দেখা যায় নাই। প্রত্যেক লোকের মধ্যে মহাবীরের ভাব উঠিতে লাগিল। সকলেই যেন বিশ্ববিজয়ী। এরূপ সাহসপূর্ণ উন্মাদনার বাণী বাঙালী পূর্বে শোনে নাই। শহরময় একটা গম্‌গমে ভাব। এই সময় হইতে প্রকাশ্যে কেহ আর স্বামীজীর নিন্দা করিতে সাহস করিত না, কারণ তাহা হইলে যুবকদের নিকট প্রহার খাইবার সম্ভাবনা ছিল। যুবকেরা তখন উত্তেজনায় অস্থির। অবিলম্বে বক্তৃতাটি সংস্কৃত শ্লোকসহ কালী-বেদান্তীর তত্ত্বাবধানে প্যামফ্লেটরূপে প্রকাশিত হইল। প্যামফ্লেট-খানি খুব বিক্রয় হইতে লাগিল।...

"স্বামীজীর সুখ্যাতিতে যখন বাংলাদেশে হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে, সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্য, ওজস্বিতা, নির্ভীক ভাব ও নিষ্ঠার বিষয়ে নানা কথা বলিতেছে, তখন গিরিশবাবু (বাংলার প্রধান নট ও নাট্যকার) বড় বড় কথায় বা প্রবন্ধে মতপ্রকাশ করিলেন না, তিনি আশ্চর্যান্বিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একদিন বলিলেন, 'ওহে, এ হল কী! এ যে মিরাকলের দিন ফিরে এল! বহু শতাব্দী আগে নাকি মিরাকল হত, এখন যে চোখের সামনে দেখছি। এ যে বুদ্ধি-বিবেচনাকে ছাড়িয়ে গেল! এ কি তর্কে যুক্তিতে বুঝিতে হয়! একটা শক্তি পিছনে না দাঁড়ালে এ কাজ কেউ করতে পারে?' এই কথা বলিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।...

"যোগেন-মহারাজের (যোগানন্দ) বৃদ্ধ পিতা চৌধুরী-মহাশয় বাংলা কাগজে ও লোকের মুখে স্বামীজীর সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন।...তিনি একদিন সকালবেলা আলমবাজার-মঠে আসয়া ভিতর-বাড়ির পূর্বদিকে ছাতটিতে ক্ষিপ্রপদে পায়চারি করিতে ও মাথা নাড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে একটু স্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, ওহে ভিটেশ্বর (শশী-মহারাজ মঠ আগলাইয়া থাকিতেন বলিয়া এই সম্বোধন), 'এ হল কী! নরেন যে সকলকে ছাপিয়ে উঠল! এখন যে বুদ্ধ-শঙ্করের দলে চলে গেল! সাধারণ লোকের হিসেবে আর রইল না!

ব্যাপার হল কী! অ্যা, বন্ধ, শঙ্কর যে, আবার ফিরে এল!' এই সব কথা বলিয়া খানিক মৌনভাবে রহিলেন, তারপর আবার ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন, উত্তেজিত ও অধীর হইয়া অন্য কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না।"

॥ ১৩ ॥

বিবেকানন্দ-বিরোধী সমসাময়িক চক্রান্ত-কাহিনীতে আবার প্রবেশ করা যাক। ইদানীং আমরা লক্ষ্য করেছি, কোনো-কোনো মহলে স্বামীজীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তথ্যগত বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য—ঐ জাতীয় কুৎসা-প্রচারের পক্ষে প্রমাণ তো স্বামীজীর নিজের পত্রাবলী! তিনি উড়ো খবরে উত্তেজিত হয়ে ঐসব ভিত্তিহীন ক্ষোভ-রোষ প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের বক্তব্য যাঁদের, তাঁদের জ্ঞাতার্থে কিছু সমকালীন সংবাদ জানানো প্রয়োজন। তবে এখানে বলাই বাহুল্য, যাঁরা কুৎসা করেন, তাঁরা সেগুলি সাধারণভাবে সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করেন না; এবং সংবাদপত্র যখন ঐ ধরনের অপকর্মের প্রতিবাদ করে, কিছুটা পরোক্ষভাবেই তা করতে বাধ্য হয়।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ইউনিটি অ্যান্ড দি মিনিস্টার'-এর ভূমিকা প্রথমে লক্ষ্য করা যাক। ইতিপূর্বে দেখেছি, ৯ নভেম্বর, ১৮৯৩, স্টেটসম্যানে এবং ১১ নভেম্বর মিরারে স্বামীজী সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ ও সম্পাদকীয় বেরোনার আগে পর্যন্ত সময়ে মিনিস্টার *Vurkanand*—এই নামটি ছাড়া বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আর কিছু বস্তু ভারতীয় পাঠককে উপহার দেয়নি, অথচ ধর্মমহাসভায় সর্বাধুনিক সংবাদ প্রকাশের দায়িত্ব পত্রিকাটি গ্রহণ করেছিল এবং তা পালন করছিল—কেবল মজুমদার ও নাগরকরের কৃতিত্ব-সংবাদ পরিবেশন করে! এই পরিস্থিতিতে স্টেটসম্যান ও মিরার যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ব্যক্তির গৌরবময় সাফল্যের কথা জানালো, তখন কাগজটি বিশেষ অসুবিধায় পড়ল। অগত্যা তাঁরা ১৯ নভেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে বাধ্য হলেন :

CERTAIN people were curious to know how an orthodox Hindu crossed the *Kalapani*, ate and drank in a *Mlechcha* style and presented himself in the Parliament of Religions. Vivekananda-Swami, who created sensation in the Religious Congress at Chicago by his novel appearance and impressive address, is described as a Brahmin representative of the Hindus of Madras. It would interest our readers to learn that he is not a Madrassi Sannyasi but a Bengali graduate of the Calcutta University. His real name is Babu Narendro Nath Dutta. He was of a Kayastha caste. It was a mistake to call him a Brahmin. He is a nephew of our late friend Tarak Nath Dutt of Simla who was an Adhyeta of the Adi Brahmo Somaj. Narendro Nath was for sometime a Brahmo, and with his sweet voice led the orchestra of a certain Brahmo Somaj of this city. He was for a time one of the actors in Nava Brindaban Theatre when our Minister [Keshub Chunder Sen] was in the flesh. After passing the B.A. examination he was studying the law, but he was moved to sit at the feet of the late venerable Ramkrishna Paramahansa of Dakshineswar, after whose death *he betook*

himself to the life of a mendicant and showed an example of self-sacrifice. He travelled mostly on foot almost the whole of Hindustan and was sent to Chicago by the Hindus of Madras. He is intelligent, energetic and self-sacrificing, but what we apprehend is that he is not Hindu of the old orthodox school; he is a representative of the Neo-Hindus." [Italics mine]

এই লেখাটি যদিও উপায়ান্তরহীন হয়েই লিখতে হয়েছিল কারণ ধর্মমহাসভার সর্বপ্রকার সংবাদ-প্রকাশের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এই পত্রিকাটিতে স্বামীজীর বিষয়ে কোনো মন্তব্য বেরোনার আগেই মিরারে তাঁর সম্পর্কে বিদেশী সংবাদপত্রের একটি সুদীর্ঘ সংবাদ ও একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়ে গেছে—তবু আমাদের স্বীকার করতেই হবে, উপরে উদ্ধৃত অংশটিই এই পত্রিকার ইতিহাসে (১৯০২ পর্যন্ত) স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে সর্বোত্তম মন্তব্য। সাম্প্রদায়িক কারণে পত্রিকাটি স্বামীজীর সংবাদ গোড়ায় চেপে রেখেছিল বোঝা যায়, কিন্তু তখনো পর্যন্ত বোধহয় বিবেকানন্দকে 'লোফার' 'ভ্যাগাবণ্ড' রূপে হাজির করার নির্দেশ পত্রিকাটির কাছে পৌঁছয়নি। সুতরাং উদ্ধৃত মন্তব্যের সূচনায় ঈষৎ বিদ্রূপ থাকলেও, এবং পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের বিচারে বিবেকানন্দ 'নিও-হিন্দু' হয়ে দাঁড়ালেও, বিবেকানন্দের যথেষ্ট প্রশংসা লেখাটির মধ্যে ছিল। **সবচেয়ে মজার কথা হল, মজুমদার আমেরিকায় যা প্রচার করছিলেন—বিবেকানন্দ আগে সন্ন্যাসী ছিলেন না, আমেরিকায় এসে গেরুয়া চড়িয়েছেন ইত্যাদি—সেই প্রচারের কথা জানা না থাকার জন্য এই পত্রিকায় স্বামীজীকে আত্মত্যাগের পরম দৃষ্টান্ত এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, 'বিবেকানন্দ পরিচয়হীন জুয়াচোর'—মজুমদারের এই কুৎসার জবাবেই যেন লেখা হয়েছিল—বিবেকানন্দকে মাদ্রাজের হিন্দুগণ প্রতিনিধি করে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন।**

স্বামীজীর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে প্রচারকার্য ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪, মিরার আমেরিকান পাদরিদের অপপ্রচারে মজুমদারের যোগদানের বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। কেশব সেন ও মজুমদারের আত্মীয় নরেন্দ্রনাথ সেন মজুমদারের উল্লিখিত কার্যে কতখানি মর্মাহত হয়েছিলেন, তা মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা-মারফত আগেই জেনে এসেছি। ২১ ফেব্রুয়ারির সম্পাদকীয়তে নরেন সেন লিখলেন ঃ

"যেমন আশা করা গিয়েছিল তাই ঘটেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দুধর্ম সহসা উন্নীতরূপে আত্মপ্রকাশ করায় কিছুসংখ্যক আমেরিকান পাদরি নৈরাশ্যে মরীয়া হয়ে স্বামীজীকে আমেরিকার জনগণের চোখে হতমান করবার চেষ্টা করছে, যে-প্রচেষ্টায় তারা, আমরা শুনে দুঃখিত, হিন্দুজাতিভুক্ত এক ব্যক্তির সাহায্য পেয়েছে।"

এই ফেব্রুয়ারি মাসেই মজুমদারের প্রচেষ্টার কথা স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে লিখে পাঠিয়েছেন, তা আগেই দেখেছি।

এর পরে ২৫ মার্চ মিনিস্টার বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে-সম্পাদকীয় মন্তব্য করল, তাতে প্রথমতঃ মিরারের সম্পাদকীয়গুলির বিষয়ে কটাক্ষ করা হল, কারণ সেগুলিতে বিবেকানন্দের অত্যুচ্চ প্রশংসা ছিল; দ্বিতীয়তঃ কেশব সেনের উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব-বিষয়ে মিরারের মন্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হল। দ্বিতীয় প্রসঙ্গের আলোচনা আমরা যথাস্থানে করব। এখানে লক্ষ্য করতে হবে, ইতিমধ্যেই স্বামীজী-সম্পর্কে এই পত্রিকার সকল সাধু উক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেছে, বক্র কটাক্ষ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সেই সঙ্গে দেখা যায়, 'খাঁটি রক্ষণশীল হিন্দু' সম্বন্ধে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধা হঠাৎ অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। এই পত্রিকার কয়েকমাস পূর্বের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যে-'সন্ন্যাসী-ভিক্ষুক' বিবেকানন্দ 'আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত'-স্বরূপ তিনি এখন 'নব্য হিন্দুর' এতটুকু

বেশী কিছু নন। প্রশ্ন করা যায়, এই পত্রিকার কাছে বিবেকানন্দ এমন কি অপরাধ করে ফেলেছেন যার জন্য কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর এহেন ভাগ্য-বিপর্যয়!! একটি উত্তরই সম্ভব-পর—এর মূলে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 'সুদীর্ঘ স্তুতিবচনগুলি'—আমেরিকার মনুষ্যগণ ও সংবাদপত্রসমূহ তা করাতে মজুমদার চটে গিয়েছিলেন এবং ভারতীয় মনুষ্যগণ ও সংবাদপত্র-সমূহ তা করাতে চটেছিলেন মিনিস্টারের কর্তারা। ২৫ মার্চের উল্লিখিত সংবাদটি এই :

"The Indian Mirror has published several long leaders in praise of the Neo-Hindu Babu Norendra Nath Dutta alias Vivekananda in some of its late issues. We have no objection to the publication of such panegyrics on the Sanyasi, but since the time he came to us to act on the stage of the Navavrindaban theatre or sang hymns in one of the Brahmo Samajes in this city, we know him so well, that no amount of newspaper writing could throw any new light on our estimate of his character. We are glad that our old friend lately created a good impression in America by his speeches, but we are aware that Neo-Hinduism of which our friend is a representative is not orthodox Hinduism. The last thing which the latter would do is to cross the kalapani, partake of the Mlechha food and smoke endless cigars and the like. Any follower of modern Hinduism cannot command that respect from us which we entertain for a genuine orthodox Hindu. Our contemporary may try to do his best to promote the reputation of Vivekananda, but we cannot have patience with him when he published glaring nonsense."

ইউনিটি অ্যান্ড মিনিস্টারের এই মন্তব্য যতখানি ভারতের জন্য লিখিত, ততোধিক পরিমাণে আমেরিকার জন্য। ভারতবর্ষ তার গৌরবান্বিত সন্তানের বিরুদ্ধে এইসব ক্ষুদ্র কামড় আর গ্রাহ্য করছিল না, কিন্তু আমেরিকার মিশনারি-প্রভাবিত কাগজগুলি এই জাতীয় কিছু সংবাদের জন্যই যেন উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। ইতিপূর্বে এই কাগজে স্বামীজীর যে-প্রশংসা করা হয়েছিল সেই অংশ নয়, স্বামীজীর বিরুদ্ধে এর কটাক্ষই আমেরিকায় "সকলের দ্বারা উদ্ধৃত হতে লাগল, যারা কোনো না কোনো কারণে তাঁর খ্যাতি নষ্ট করতে চেয়েছিল।" মিনিস্টারের এই সংবাদটি অন্যান্য ভারতীয় খ্রীস্টান কাগজে প্রকাশিত বিবেকানন্দ-নিন্দার সহযোগে কিভাবে পরমাদরে বস্টন ডেইলি অ্যাডভারটাইজার প্রভৃতি কাগজে উদ্ধৃত হয়েছিল, দেখা যেতে পারে।

বস্টন ডেইলি অ্যাডভারটাইজারের ১৬ মে, ১৮৯৪-এর প্রবন্ধটি নিম্নোক্ত প্রকার :

ভারত থেকে আগত প্রফেট-প্রবর

খুব বেশি দিনের কথা নয়, বস্টন-অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম আকর্ষণের ও চর্চার বিষয়-বস্তু ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে যেমন হাজারখানেক বছর আগে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছে, ঠিক সেইভাবে বর্তমানে বস্টনে সাধারণের চিত্তভূমে হিন্দু-ধর্ম বৌদ্ধধর্মকে হঠিয়ে স্থান করে নিয়েছে। সে-বস্তুর মূলে অংশতঃ হিন্দু-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের উপস্থিতি ও বক্তৃতা, যিনি ধর্মমহাসভায় যথেষ্ট আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিলেন।

ভারতবর্ষে তাঁর মর্যাদার প্রমাণরূপে তিনি মাদ্রাজের পচাইপ্পা কলেজের রসায়নের এক অধ্যাপকের একটি চিঠি হাজির করেছেন। এখন, ভারতবর্ষ খুবই দূর

দেশ, সুতরাং এখানকার খুব কম লোকেরই জানার কথা যে, পচাইপ্পা কলেজ ভারতবর্ষে খ্রীস্টান-বিরোধী ভাবের কেন্দ্রস্থল, এবং সেখানকার সংশ্লিষ্ট মানুষেরা ব্রাড্‌লো ও ইঙ্গারসোলের আক্রমণাত্মক রচনা থেকে খ্রীস্টধর্ম বিষয়ে জ্ঞানসংগ্রহ করে থাকে। বিবেকানন্দ যদিও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে ওহেন সূত্র থেকে সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন, তথাপি আমাদের ধারণা, এদেশে তিনি পূর্বোক্ত-প্রকার চূড়ান্ত খ্রীস্টধর্ম-বিরোধী জড়বাদের সঙ্গে নিজ মতপার্থক্য জানিয়েছেন।

ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ যে-মনোযোগ লাভ করেছিলেন তার সম্বন্ধে মুদ্রিত রিপোর্ট যখন ভারতবর্ষে পেঁছিল, তখন সে-দেশের সংবাদপত্রগুলি তার উপরে এবং তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তুর উপরে মন্তব্য করে। ভারতীয় সংবাদপত্রের সেই সকল মন্তব্যের মধ্যে আমাদের চোখে পড়েছে ক্রিশ্চান পেট্রিয়টের বক্তব্য। এটি দক্ষিণভারতের প্রধান খ্রীস্টান পত্রিকা, ভারতীয় খ্রীস্টানদের দ্বারা সম্পাদিত, যাঁদের একজন ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ১৮৯৩, ৭ ডিসেম্বর এই পত্রিকা লিখেছে ঃ

"'বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করে যে-তরুণ হিন্দু-সন্ন্যাসী চিকাগোয় হাজির হয়েছিলেন, আমেরিকান পত্র-পত্রিকায় যদিচ তিনি ব্রাহ্মণ বলে উল্লিখিত হয়েছেন, এবং সেই ভ্রান্ত ধারণা যদিচ সমর্থন করেছেন আমাদের সহযোগী বেঙ্গলী, আমরা নিশ্চিত ভাবে জেনেছি—বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ নন—তিনি কলকাতা হাইকোর্টের উকিল সিমলা-নিবাসী মৃত বাবু তারানাথ দত্তের পুত্র বাবু (অর্থাৎ মিস্টার) নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া কেউ নন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিমান গ্রাজুয়েট, এবং খুব সম্প্রতি সন্ন্যাস নিয়েছেন।'

"কলকাতার ইভানজেলিক্যাল রিভিউ এপ্রিল সংখ্যায় মন্তব্য করেছে ঃ [মন্তব্যটি অল্প পরে ইণ্ডিয়ান মেসেনজারের ৮ এপ্রিল মন্তব্যের মধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে]

"নিম্নলিখিত অংশটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার কাগজ থেকে সংকলিত। মজুমদার যে-সমাজের প্রধান ব্যক্তি, এটি সেই ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র।—

[অতঃপর উদ্ধৃত হয়েছে মিনিস্টার কাগজের ২৫ মার্চ সংখ্যার মন্তব্য, যা আমরা পূর্বেই উৎকলন করেছি।]"৩৮

সুতরাং দেখা গেল, পরাধীন দেশের একজন তরুণ সন্ন্যাসী—যিনি প্রচলিত কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে, বিদেশে গিয়ে নিজ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমা প্রচার করেছেন নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও—তাঁকে ভারতের একটি সংস্কারকামী পত্রিকা এমন একটি শ্লেষবহুল রচনা উপহার দিল, যা তাঁর সম্মান নষ্ট করার কাজে বহুভাবে ব্যবহৃত হল বিদেশে। এই পত্রিকা ও এর সমর্থকদের মধ্যে বিবেকানন্দকে 'নব্য হিন্দু' প্রমাণ করার বিশেষ চেষ্টার হেতুও বোঝা যায়। বিবেকানন্দ যদি একবার সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি বলে গৃহীত

৩৮ ভারতের খ্রীস্টান পত্রিকাগুলির চরিত্র উপরের সংবাদ থেকেই বোঝা যাবে। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের গর্বে অধীর পত্রিকাটি বিবেকানন্দের পিতার নাম পর্যন্ত ঠিক-ভাবে লিখতে সমর্থ নয়!

বস্টন ডেইলি অ্যাডভারটাইজারের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন জনৈক পত্রলেখক। উক্ত পত্রিকার ১৭ মে সংখ্যায় প্রকাশিত সেই পত্রে লেখক জানান, ভারতের খ্রীস্টান পত্রিকাগুলি এবং একটি ব্রাহ্মপত্রিকার মন্তব্যকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা পাবার যোগ্য তারা নয়, ইণ্ডিয়ান মিরার, অমৃতবাজার ইত্যাদি হিন্দু কাগজগুলিই বৃহত্তর জনমতের বাহক, যাঁরা স্বামীজীর মর্যাদার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। লুই বার্ক জানিয়েছেন, স্বার্থবাদীরা কিন্তু পত্রলেখকের বক্তব্যকে মূল্য না দিয়ে মজুমদার-পন্থীদের বিরূপ কথাগুলিকেই ফাঁপিয়ে হাজির করেছিল।

হন, তাহলে তিনি 'হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি নন'—এই প্রচার বাধা পায়, শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দকে নিজ সন্তান বলে গ্রহণ করলে সমগ্র হিন্দুসমাজে আত্মগৌরবের উদ্দীপনা ঘটে, আত্মগ্লানি থেকে সে কিছুটা মুক্তি পায়, সে নতুনভাবে জেগে উঠে অনুভব করতে পারে—তাদের সমাজদেহে দোষ অবশ্যই আছে কিন্তু তার জন্য এতদিনকার ঐতিহ্যময় ধর্মকে কেটে-ছেঁটে বিদেশীদের কাছে মুখরক্ষার উপযোগী একটি দেশমূত্তিকাবর্জিত মতমাত্র-রূপে উপস্থিত করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং আমাদের এই বিচিত্র বিপরীত কাণ্ড দেখতে হল—রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের সংস্কারকামীরা রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের চরিত্ররক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাদের সতর্ক করে বলছে—সাবধান! নব্য হিন্দু বিবেকানন্দ তোমাদের কেউ নয়!!

যাই হোক, এই পত্রিকার শুভচেষ্টা যখন সফল হল না, যখন বিবেকানন্দের সমুদ্রযাত্রা, ম্লেচ্ছরীতির আহার ইত্যাদি সত্ত্বেও 'হিন্দু' নামেই, 'নব্য হিন্দু' নামে নয় (রক্ষণশীল আচারী হিন্দু হিসাবে অবশ্য নয়)--ভারতে সকলের দ্বারা গৃহীত হলেন, তখন পূর্বেই পতিত হিন্দুসমাজের এই নব অধঃপতনে বিমর্ষ হয়ে মিনিস্টার ২২ এপ্রিল তারিখে লিখল ঃ

"It is always unpleasant to controvert the statement of persons who misrepresent plainest facts. The unpleasantness is the greater when we have to deal with the misstatements of people whom we consider as friends and who are supposed to know the real state of things. The *Indian Mirror* is unceasing in writing about Vivekananda, Ramakrishna Paramhansa and Keshub Chunder Sen. We assure our contemporary that we have no grudge whatever at the eulogies that may be passed on Vivekananda. Whether he is an orthodox Hindu or a Neo-Hindu, or whether some of his practices are un-Hindu or Mlechha, the Hindus are the best judges, for ourselves we are glad that one of our countrymen has in the name of Hinduism, earned the good opinion of a certain section of the American people."

॥ ১৪ ॥

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা—আদি, সাধারণ ও নববিধান। আদি সমাজ তখন কার্যতঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই আবদ্ধ। ঠাকুরবাড়ির শীর্ষপুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের জনক। তাঁর মহান আভিজাত্য ও ধর্মপ্রাণতা সমগ্র দেশের সম্ভ্রমের বস্তু ছিল। স্বামীজী মহর্ষিকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন; তাঁর ধর্মজীবনের ইতিহাসে প্রথম পর্বে মহর্ষির উল্লেখ আমরা পেয়েছি। মহর্ষিও স্বামীজীকে বিশেষ স্নেহ করতেন। আমেরিকা থেকে ফেরার পরে স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের দর্শনে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়েছিলেন। নিবেদিতার পত্রে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ রয়েছে, পরে যথাস্থানে তা আমরা উপস্থিত করব। ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের আরো নানা সংবাদ পৃথক অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলে নিতে পারি, ঠাকুরবাড়ির অভিজাত শিক্ষিত সন্তানগণ হিন্দু-পুনরুত্থান আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখলেও কটু কলহের প্রবৃত্তি প্রকাশ্যে তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ দেখা যায়নি। উল্টোপক্ষে ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁদের দুটি সাময়িক পত্রিকায় স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে, এমন-কি এক সময়ে দেশসেবার

ব্যাপারে আদি সমাজের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের সম্ভাবনাও দেখা গিয়েছিল।

স্বামীজী ব্রাহ্মসমাজের যে-শাখার সদস্য হয়েছিলেন, যার সদস্যপদ তিনি নিজে কখনো ত্যাগ করেন নি, তা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, আমরা আগেই জেনে এসেছি। অধ্যাপক রাইটকে লেখা তাঁর পত্র থেকে আমরা দেখেছি, স্বামীজী বলেছেন, সাধারণ-সমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং সাধারণ-সমাজের সংস্কারকার্যের তিনি সমর্থক। শিবনাথ শাস্ত্রী যে, নরেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে জানতেন ও নরেন্দ্রনাথের খোঁজে যে, তাঁদের বাড়িতে আসতেন—সেকথা প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবান ডায়ন্যামিক চরিত্রের যুবক স্বতঃই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আবার স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা, এহেন নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে গিয়ে পড়ায় খুবই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েছিলেন। 'দলত্যাগী' নরেন্দ্রনাথকে তাঁরা ক্ষমার চোখে দেখেননি। সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যাদুপ্রভাব সম্বন্ধেও তাঁরা সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। সেইজন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবতরঙ্গে গা ভাসান দিয়ে কেশবচন্দ্র যেমন পরবর্তীকালে তাঁর ভক্তমণ্ডলীতে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন, সে-জিনিস শিবনাথের ক্ষেত্রে হতে পারেনি, কারণ সাবধানী বিচক্ষণ শিবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রেখেও নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করে চলতে পেরেছিলেন। কেশবচন্দ্রের ধর্মোন্মাদনা, খ্রীস্টপ্রীতি, ভাবাবেশ, ঈশ্বরাদিষ্টের ভূমিকাগ্রহণ সাধারণ-সমাজীদের কাছে বিশেষ সন্দেহজনক ঠেকেছিল। শিবনাথ প্রভৃতি কেশবেরই সহযোগী ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তাঁরা কেশবের সমর্থক। কিন্তু যখন অতি-প্রগতিশীল কেশব স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ করে নিজের ১৩ বছরের মেয়ের বিয়ে দিলেন কুচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে, এবং সেই নিয়মভঙ্গে ঈশ্বরের হাত পর্যন্ত দেখলেন, তখন নিয়মতান্ত্রিক, যুক্তিবাদী শিবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতিরা ধর্মাচার্যের কথায় ও কাজে এতখানি ব্যবধানকে ঈশ্বরবিধান বলে মনে করতে রাজি হলেন না। ফলে পুনশ্চ দলভঙ্গ হল এবং কেশবের নববিধানের সঙ্গে শিবনাথ প্রভৃতির দ্বারা নবগঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঘোরতর সংঘর্ষের সূচনা ঘটল। এই সংঘর্ষ থেকে শিবনাথের মতো ধীর বিচারশীল মানুষ যে-অভিজ্ঞতার শিক্ষা নিয়েছিলেন, তা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সশ্রদ্ধ অথচ নিরাপদ ব্যবধান রাখতে তাঁকে প্রণোদিত করেছিল। এই বিবেচনাশক্তিই শিবনাথ-চরিত্রের প্রধান গুণ। এরই জোরে তিনি উচ্চ প্রশস্তি এবং অহেতুক নিন্দার মধ্য দিয়ে পথ করে চলতে পারতেন। ফলে তিনি হয়ত আত্মহারা আবেগের সৃজনশীল প্রতিভা দেখাতে পারেননি, কিন্তু ন্যায়বিচারের চেষ্টা তাঁর মধ্যে ছিলই। এখানে কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে, শিবনাথের ন্যায়বিচারের অংশ বিবেকানন্দ পাননি। কারণ, আগেই বলেছি, এঁদের বিবেচনায় বিবেকানন্দ দলত্যাগী। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—যিনি সাধারণ-সমাজের অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন, তিনি এবং বিবেকানন্দ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি দুর্বল করার ব্যাপারে প্রধান দুই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তাহলেও বিবেকানন্দের বেদান্তের উপর এঁরা এঁদের দাবি ত্যাগ করেননি এবং এঁদের সমাজভুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঞ্জীবনী পত্রিকায় বলা হয়েছিল—বিবেকানন্দের ধন্যবাদ-সভায় অনেক ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন কারণ বিবেকানন্দ আমেরিকায় ব্রাহ্মধর্মই প্রচার করেছেন—এও আগে দেখেছি। এখানে বলে নেওয়া উচিত, ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন পায়—তার মূলে ছিল এই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের আবেগহীন যুক্তিপন্থিতা ও নিষ্ঠা। বাংলাদেশের সেইকালের বহু প্রতিভাবান মনস্বী ব্যক্তি এই সমাজভুক্ত ছিলেন।

আমরা আগে একথাও বলে এসেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ইন্ডিয়ান মেসেনজার

একেবারে সূচনাতে বিবেকানন্দ-সম্পর্কে কিছু সংবাদ পরিবেশন করেছিল। বিবেকানন্দ-সংবাদ গোপন করবার হীনতা এই পত্রিকার যেমন ছিল না, তেমনি তাকে অধিক মাত্রায় প্রচার করবার উৎসাহও এঁরা বোধ করেননি। সুতরাং ধর্মমহাসভার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কয়েক সংখ্যা পরে, সম্ভবতঃ প্রাপ্ত বিবরণের মধ্যে বিবেকানন্দ-সংবাদের আধিক্য লক্ষ্য করে, সেই বিবরণ-প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়—তাও আমরা দেখে এসেছি। মেসেনজার পত্রিকার পরবর্তী বিবেকানন্দ-সংবাদ ১ এপ্রিল তারিখে—তা আর কিছু নয় ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত 'পেপার অন হিন্দুইজম্'-এর বিরোধী সমালোচনার উদ্ধৃতি। তারপরে ৮ এপ্রিল মেসেনজারে পুনশ্চ স্বামীজী সম্বন্ধে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হল। সেটি এই :

SWAMI VIVEKANANDA *ALIAS* BABU NORENDRANATH DUTTA, B.A.

This is how the *Indian Evangelical Review* delivers itself upon Swami Vivekananda and his work in America :—

> "Until we had heard from Chicago we are not aware that we had such a genius among us in Calcutta as it now seems we have. It only proves the truth of the words of Jesus—'A prophet is not without honour save in his own country.' More than this, evidence of the truth of Christianity we have in our Swami. What he taught as Hinduism and what gave power and influence to his words was the large admixture of Christian truth which he taught and which he received as a student in one of the Christian Missionary colleges of Calcutta, and truth too, which is the very opposite of the error which is the foundation stone of the Hinduism which he professed to teach, Viz : (1) the brotherhood of man and (2) the Lordship of God of the conscience. The caste system of Hinduism antagonises both, and persecutes, as far as the Christian Government permits, any who chooses to act under the influence of either. A man who chooses to eat with a brother man, or to obey his enlightened conscience in the matter of religious duty, and is baptized, will by Hinduism all over India be persecuted by the death of his soul and body; and yet this Babu goes across the seas and continents to tell the Parliament of Religions that Hindus do not persecute and that Hindus love all men as brethren. We do not wonder that Mr. Hume goes home sick at heart over Indian and its men of light and leading."

Vivekananda was certainly ill-advised in indulging in an indiscriminate and therefore unjustifiable attack upon Christianity, but that does not, to our thinking, justify the tone certain missionary journals have assumed towards him in particular and the Hindu people in general. It is certainly true that "a man who chooses to obey his

enlightened conscience in the matter of religious duty and is baptised" is subjected to persecution and social ostracism. But inquitous as such persecution admittedly is, we are, in bare justice, bound to say, that it is not true of Hinduism alone. How were those Englishmen, for instance who "chose to obey their conscience in the matter of religious duty" and embraced Mohamedanism built a mosque at Liverpool, treated by their Christian countrymen? What sort of treatment has been accorded to Mahomed John Webb, the American convert to Islam, by his fellow Americans? As to the treatment accorded to non-Christians, and to each other, by some of the Christian nations who pretend monopoly to all virtue, less said the better. Not that we seek justify the errors of Hinduism or we care to defend what this young-man Norendranath might have said at Chicago, but it is certainly unjust to hold Hinduism responsible for his utterances and fasten every blame upon it. The best criticism that we have come accross on Vivekananda's lectures on 'Hinduism' in America, is from the pen of a Hindu critic which we produced from the *Indian Nation* in our selection columns last week. We commend perusal of this criticism to the reverend editor of the *Indian Evangelical Review*. Making use of strong words is not necessarily good criticism.

মেসেনজারের এহেন চর্বিত সমালোচনার উত্তর দেন এক পত্রলেখক মিরারের ২২ এপ্রিল সংখ্যায়। ঐ পত্র-মধ্যে স্বামীজীর 'পেপার'-এর প্রভূত প্রশংসা ছিল, এবং বিবেকানন্দ হিন্দু-ধর্মের জন্য যা করেছেন তার প্রতি অকুণ্ঠে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল বিবেকানন্দের সাফল্যে মিশনারি ও ব্রাহ্মদের গাত্রদাহের কথা :

"আমি দেখে খুবই দুঃখিত যে, স্বামী বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সাফল্য খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রচণ্ড ঈর্ষা এবং মনের জ্বালার সৃষ্টি করেছে—তারা তাঁর সুনাম নষ্ট করাব জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে তারা লেখায় এবং কথাবার্তায় পুরো যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু হারা-লড়াই লড়ছে তারা। স্বামীজী এখন বিশাল শক্তিধর পুরুষ। তাঁর বৈদগ্ধ্য, বাগ্মিতা, সম্মোহক ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর সামনে হিন্দুধর্মের নূতন ভাবমূর্তি হাজির করেছে।...

"বিবেকানন্দের ধর্ম ঊর্ধ্বাকাশের মতোই প্রসারিত। তাঁর জীবনোদ্দেশ্য সমগ্র হিন্দু-জাতিরই জীবনোদ্দেশ্য। কিন্তু কী বেদনাদায়ক ও বিস্ময়কর কাণ্ড—ধর্মমহাসভার জনৈক ভারতীয় প্রতিনিধি, উদীয়মান তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি নীতিবাদের প্রচারক—তিনি স্বামীজীর বিষয়ে মিথ্যা বিবরণ প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, যা আমরা দেখলাম, বৌদ্ধ-প্রতিনিধি মিঃ ধর্মপালের দ্বারা পুরো মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে গেল।...

"আবার সেদিন দেখা গেল, শ্রদ্ধেয় স্বামীজী খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছেন, এই অজুহাতে তাঁর উপর বিষ ঢেলে দিয়েছে একটি ব্রাহ্ম-পত্রিকা [মেসেনজার]—দুঃখের ছবি বটে!—উক্ত পত্রিকার সম্পাদক-মহাশয় স্বামীজীর বক্তৃতাটি পড়বার পরিশ্রম না করেই তার বিচারে প্রবৃত্ত হতে পারলেন! স্বামীজীর বক্তৃতার মধ্যে একটি বাক্যও নেই যাতে তিনি কোনো ধর্মকে আক্রমণ করেছেন। সর্বজনীন সহিষ্ণুতার বিগ্রহ তিনি। তিনি সকল ধর্মকে সত্য বলে স্বীকার করেন, এবং তাঁর ভাষণ গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার মৃত্যুঘণ্টা-স্বরূপ। ঈর্ষা

ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মানুষ যা-ইচ্ছে-তাই বলতে পারে, কিন্তু স্বামীজীকে ধিক্কৃত করার জন্য তাদের প্রয়াস পাথরে মাথা ঠোকার মতোই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।”

মেসেনজারের আচরণ সত্যই বিস্ময়কর। একেবারে গোড়ার দিকে স্বামীজী-বিষয়ে আমেরিকান কাগজের দু'এক লাইন প্রশংসাসূচক বক্তব্য উদ্ধৃত করার পরে (যখন উক্ত বিবেকানন্দ কে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি)—পরবর্তী যে-সংবাদ সে দিল, তার একটি, কোনো এক ভারতীয় হিন্দু-পত্রিকার বিবেকানন্দ-বিরোধী সমালোচনা, অন্যটি, ভারতের এক খ্রীস্টান-পত্রিকার নিন্দাবচন। এবং শেষোক্ত মিশনারি-পত্রিকার অযৌক্তিক বক্তব্যের আংশিক সমর্থনে লেখা হল—স্বামীজী খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে 'নির্বিচার সুতরাং অযৌক্তিক আক্রমণ' করেছেন, যদিও সে 'আক্রমণ' যথার্থতঃ কী, তা বলার প্রয়োজন বোধ করল না। সবচেয়ে কৌতুকের কথা, খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর তথাকথিত 'আক্রমণ'—মেসেনজার খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে যে-আক্রমণ করেছিল, তার চেয়ে একচুল বেশি নয়—কেবল তফাত এই, এই পত্রিকা খ্রীস্টানদের সমালোচনা করেছিল নিজের ঘরে বসে, আর বিবেকানন্দ করেছিলেন তাদের ঘরে গিয়ে, নির্বান্ধবে। লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামীজীর পক্ষে আমেরিকান পত্র-পত্রিকা-সমূহে রাশি-রাশি প্রশংসা ছাপা হলেও সেগুলিকে উদ্ধার করার প্রয়োজন এঁরা বোধ করেননি। ভারতবর্ষ যখন নিজের এক সন্তানের গৌরবে আনন্দে অধীর, সেইসঙ্গে অধিকতর আনন্দদায়ক সংবাদের আশায় উন্মুখ, তখন তার উৎসাহে জলনিষেক করে উদ্ধৃত করা হল বিবেকানন্দ-বিরোধী একটি মিশনারি সমালোচনা এবং একটি দেশীয় হিন্দু সমালোচনা!! সম্প্রদায়ের বাইরে দেশগৌরব অনুভবের ক্ষমতা এঁরা সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলেছিলেন। মিশনারি-আক্রমণের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের পক্ষে যে-কটি কথা এঁরা বলতে পেরেছেন, তার কাতর কুণ্ঠিত চেহারা করুণার উদ্রেক করে, এবং সম্পাদক-মহাশয় তারপরে যখন বিবেকানন্দ-সমর্থনের দায়মুক্ত হয়ে ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার 'সেরা সমালোচনার' দিকে মিশনারি পত্রিকাটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেন, তখন আমরা অনুভব করি, তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। বিবেকানন্দের এবং হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মিশনারি মার্ডকস্ কিছু-দিনের মধ্যেই কুৎসাগ্রন্থ রচনা করবেন এবং তাতে ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার ভূরি-ভূরি উদ্ধৃতি থাকবে, তখন আমরা সঙ্গতভাবেই ধারণা করব, এই পত্রিকার সম্পাদক তাঁর সাজেশনের তৎপর স্বীকৃতি দেখে পুলকিত হয়েছিলেন!!

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা—প্রতাপ মজুমদারের দার্জিলিঙ-বক্তৃতা। বক্তৃতাটি দেওয়া হয় জুন মাসে—তার মধ্যে মজুমদার তাঁর অপ্রকাশ্য জ্বালা প্রকাশ্যে উজাড় করে দেন। এ জ্বালা তিনি আর একবার উন্মুক্তভাবে উদ্ঘাটন করবেন যখন ম্যাক্সমুলারের 'রিয়েল মহাত্মন্' প্রবন্ধের উপর মন্তব্য করবেন। যথাস্থানে সে-কথা আসবে। প্রতাপচন্দ্রের বক্তৃতার বিবরণ ২৪ জুন, ১৮৯৪-এর মিনিস্টার কাগজ থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ

“Bhai Protap Chunder lately delivered a lecture in the Darjiling Town Hall on 'India in the world'. Our brother after alluding to the cordial welcome which had been given at the Chicago Exhibition to all representatives from India, expressed a disappointment that Hinduism had not sent a really orthodox exponent. The lecturer said, he was very sorry to see how eagerly his countrymen swallowed the indiscriminate flattery which some foreigners lavished upon them. They danced to every tune that these flatterers played. What was the good of ancient glory, if the moderns would not imitate their fore-fathers;

and were content only to make a noise about the achievements of former days."

প্রতাপচন্দ্রের এই বক্তৃতাকে নিঃশব্দে পরিপাক করা মিরারের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। 'রক্ষণশীল হিন্দুদের' সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্র সহসা যে-ভাবব্যাকুল প্রীতি দেখালেন কিংবা বৈদেশিক সমাদর সম্বন্ধে স্বদেশবাসীর লুব্ধতার উপরে যে-জ্বালাময় ধিক্কারবাণী বর্ষণ করলেন, তা অনিবার্য করে তুলল কতকগুলি প্রশ্নকে—রক্ষণশীলদের সম্বন্ধে মজুমদারের এই ভালবাসার পিছনে কি বিবেকানন্দকে সাধারণ হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায় নেই, এবং বিদেশীকৃত 'নির্বিচার স্তুতি' গলাধঃকরণের বিরুদ্ধে তাঁর উপরি উদ্ধৃত বিতৃষ্ণা কি উক্ত স্তুতি অন্যপাত্রে (বা অপাত্রে!) ন্যস্ত হওয়ার জন্য আসেনি? তিনি কি একই বিতৃষ্ণা বোধ করেছিলেন যখন একেবারে শুরুতে মিনিস্টার তাঁর সম্বন্ধে মিশনারি পত্রিকা-গুলির নানা 'স্তুতি' (যার কিছু সংকলন আমরা দিয়েছি) ছেপেছিল? ৪ অগস্ট মিরারে মজুমদারের দার্জিলিঙ-বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ বেরুল। মিরার বিশেষ জোরের সঙ্গে, ও বহু যুক্তির সঙ্গে, দেখিয়ে দিল—স্বামীজী কিভাবে জটিল, বহুপর্থবিভক্ত হিন্দুধর্মের সর্বোত্তম ঐক্যমূলক রূপের প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন, এবং তাঁর সাফল্য কিভাবে অভিনন্দিত হয়েছে সর্বত্র। "স্বামীজী যা-কিছু বলেছেন, তার সবকিছুর সঙ্গে আমরা যদিও একমত নই, তথাপি নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি যে, তাঁর ভাষণ হিন্দুধর্ম-নামক পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও জটিল ধর্মপ্রণালীর পরিচ্ছন্ন, পক্ষপাতহীন, দার্শনিক এবং আলোকিত উপস্থাপনা।" মজুমদারের ক্ষোভের কারণ খুলে বে-আব্রু করে দিল মিরার ঃ

"খুব অল্পদিন আগেও বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারই আমেরিকায় বাগ্মিতা ও ধর্মপ্রাণতার জন্য উচ্চ সম্মানিত একমাত্র বাঙালী। কিন্তু তিনি এখন দেখছেন—স্বামী বিবেকানন্দ নামক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সেখানে হাজির। লোকে কানাঘুষা করে বলছে, পূর্বোক্ত ব্যক্তি পরবর্তী ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকারে পরাঙ্মুখ, এই ভয়ে যে, আমেরিকায় বুঝি তাঁর নাম-যশ মুছে দেয় তরুণ সন্ন্যাসীটি! আমরা অবশ্য যথেষ্ট উদারহৃদয় মানুষ—উপরের মন্তব্যে মিঃ মজুমদারের চরিত্রে যে-ধরনের কলঙ্কারোপ করা হয়েছে, তিনি তার ঊর্ধ্বে বাস করেন, এমন বিশ্বাস করতে রাজি আছি।"

স্বামীজীর বিরুদ্ধে অযথা নিন্দার চক্রান্তে রোষক্ষুব্ধ মিরার ৮ অগস্ট বস্টন ইভনিং ট্রানস্ক্রিপ্টে স্বামীজীর মহিমা-বর্ণনার উল্লেখ করে লিখল ঃ

"আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলেন, তথাপি আমেরিকায় স্বামীজী এবং তাঁর কাজকে ছোটো করে দেখাবার চেষ্টা করছেন। আমেরিকার জনগণের কাছে স্বামীজীর চরিত্রের গ্লানিকীর্তন করে তাঁর সুনাম নষ্ট করার জন্য মিশনারি ও ইউনিটারিয়ানদের মধ্যে লজ্জাজনক গুপ্ত ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের বিষয়ে বাস্তবিকই আমরা অবহিত হয়েছি। খ্রীস্টধর্মাবলম্বী জনগণের মধ্যে জনৈক হিন্দুর প্রভাব দেখে মিশনারিদের ঈর্ষাতুর হওয়ার ব্যাপারটি আমরা বুঝতে পারি।...কিন্তু এইসব মিশনারিদের কীর্তির যদি কোনো ক্ষমা থাকেও, সেইসব হিন্দুর জন্য কোনো ক্ষমাই নেই, যারা এমন এক ব্যক্তির ক্ষতি করতে আরম্ভ করেছে বা ক্ষতি করতে সচেষ্ট দলে যোগ দিয়েছে —যিনি খ্রীস্টান দেশের বৃহৎসংখ্যক মানুষের কাছে হিন্দুধর্মকে সমুচ্চে উত্তোলন করার জন্য অসাধারণ কাজ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এবং আমেরিকায় তাঁর বিরাট কাজ সম্বন্ধে যে-সব লোক ঈর্ষাতুর, তাদের বিষয়ে আমাদের মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু স্বামীজীর ক্ষতি করার সকল চেষ্টার বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দুজাতি প্রতিরোধ করবে। সকল খাঁটি হিন্দু স্বামীজীর পাশেই আছেন।" [অ]

মিরারের প্রচণ্ড প্রতিবাদ মিনিস্টারকে বিচলিত করেছিল। ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের যথার্থ কোনো প্রতিনিধি ছিল না—মজুমদারের এই উক্তিকে মিরার খণ্ডন করে—ডাঃ বারোজ-রচিত ধর্মমহাসভার ইতিহাস থেকে তথ্য দিয়ে। মিনিস্টার ১৯ অগস্ট তার উত্তর দিতে গিয়ে লিখল ঃ

"We believe the Indian Mirror has committed a mistake by hazarding the above statement. Babu Protap Chunder nowhere said that there was no exponent of Hinduism in the Parliament of Religions but what he said was that there was no representative of orthodox Hinduism in the Religious Congress. Babu Protap Chunder could not have said as stated by our contemporary; for he himself was invited to the Parliament of Religions to represent Hinduism which none else could do better. Babu Norendra Nath alias Vivekananda also was one of the Hindu representatives in that august assembly, but we have said it more than once that he might have done a good work there in his own way and have creditably represented a certain phase of Hinduism, but he could by no means be said to have been an orthodox Hindu representative. For no orthodox Hindu would cross the Kalapani and pertake un-Hindu food with Europeans. In all these respects he was on the same footing with the young Bengal."

অপূর্ব রচনা—আত্মখণ্ডনের অনবদ্য নমুনা! পাঠকদের মনে থাকতে পারে, ২২ এপ্রিল, ১৮৯৪-এর সম্পাদকীয় রচনায় মিনিস্টার বলেছিল, বিবেকানন্দ রক্ষণশীল হিন্দু কি-না সে বিচারের দায় হিন্দুসমাজের, তাঁদের নয়। এখন কিন্তু মজুমদারের পক্ষসমর্থনে ঐ প্রশ্নের মীমাংসার ঝুঁকি তাঁদের আবার নিতে হল, এবং পরম আনন্দের বিষয়, দায়ে পড়ে মজুমদারকে হিন্দু-প্রতিনিধি বলে এ'দের ঘোষণা করতে হল, যদিও সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন হিন্দুসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করতেই তাঁরা নিরবধি সচেষ্ট এবং সে ব্যাপারে আদি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিপরীত ভূমিকায় ছিলেন তাঁরা।

আরও একটি প্যারাডক্সের মীমাংসা দুঃসাধ্য। আমরা দেখেছি, মজুমদারের বড় দুঃখ—ধর্মমহাসভায় কোনো রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন না। আমরা এও দেখেছি, পুনঃপুনঃ এই পত্রিকাটি বলেছে—কালাপানি পার হলে কেউ রক্ষণশীল হিন্দু থাকবে না। তাহলে চিকাগো ধর্মমহাসভায় রক্ষণশীল হিন্দুর অভ্যুদয় কিভাবে সম্ভব—যেখানে কালাপানি পার না হয়ে চিকাগোয় কোনোমতেই যাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বন্ধ্যাপুত্রের মত অসম্ভব ব্যাপারের জন্য মজুমদারের এত ব্যথা উঠল কেন এবং কেনই-বা এই পত্রিকা করুণ আর্তনাদের সঙ্গে সেই ব্যথাকে নিজ দেহে ভরে নিল?

স্বামীজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি নন, এই অপপ্রচারে ক্ষুব্ধ মিরার-সম্পাদক ৮ অগস্ট যে-সম্পাদকীয় লিখেছিলেন, তাতে অতিভাষণ কিছু ছিল এবং তা থাকবার কারণও ঘটেছিল। প্রথম কারণ—বিরোধী প্রচারের সঙ্গে পাল্লা সমান রাখার চেষ্টা; দ্বিতীয় কারণ—বস্টন ইভনিং ট্রানসক্রিপটের একটি বিরাট বিবেকানন্দ-সংবাদ, যা মিরারের স্তম্ভে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল একই তারিখে। মিরার উৎসাহের আধিক্যে বলে ফেলেছিল ঃ স্বামীজী আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। ধর্মমহাসভায় হাজির হয়ে স্বামীজীর শুধু হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করার দরকার ছিল—তাতেই সমবেত আমেরিকানদের বিজয়। নগরে-শহরে তাঁর

আমন্ত্রণ। তাঁর কাজ সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি এলেন, দেখলেন, জয় করলেন, ইত্যাদি।৩৯

মিরারের এই ভাবাবেগের পূর্ণ সুযোগ নিল বিরোধীপক্ষ। স্বামীজী যে, সত্যই ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিটের প্রথম ভাষণে সমবেত আমেরিকানদের মন জয় করে নিয়েছিলেন —এটা ঐতিহাসিক সত্য; কিন্তু যারা সমালোচনা করতে চাইল তারা প্রসঙ্গবিচ্যুত করে, ধর্মমহাসভার উল্লেখ না করে, 'পাঁচ মিনিটে আমেরিকা-জয়' নিয়ে বিদ্রূপ শুরু করল। স্বামীজীর সাফল্যের যে-সব সংবাদ আমেরিকান সংবাদপত্র-মারফত ভারতে পৌঁছেছিল, তা পড়ে *Veni Vedi Vici*-র প্রতিধ্বনি করার লোভ স্বাভাবিক এবং উচ্ছ্বাসপূর্ণ লেখায় এই জাতীয় উক্তি থাকেই—কিন্তু বিরোধীপক্ষ অতখানি সুবিবেচনায় প্রস্তুত থাকে না, যখন তা না-করলেই বিদ্রূপের সুবিধা। অথচ ঐ ৮ অগস্টে মিরারে প্রকাশিত বস্টন ইভনিং ট্রানস্ক্রিপ্টের উদ্ধৃতির অংশবিশেষ পড়লে মিরারের উচ্ছ্বাস কত স্বাভাবিক মনে হয়। ট্রানসক্রিপ্টের দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে এমন অংশও ছিল [লেখাটি অংশতঃ পূর্বে দিয়েছি, এখানে পুনশ্চ দিচ্ছি] —"বিবেকানন্দ সত্যই বিরাট পুরুষ, মহান, ঐকান্তিক, সরল এবং আমাদের পণ্ডিতগণের সঙ্গে তুলনায়—অতুলনীয়ভাবে পণ্ডিত। এমন কথা শোনা গেল, হারভার্ডের এক অধ্যাপক ধর্মমহাসভায় যাতে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষের কাছে যে-চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাতে লেখেন—'ইনি আমাদের সকলকে একসঙ্গে জোটালে যা হয়, তার থেকেও বড় পণ্ডিত।'...সর্বশ্রেণীর লোক তাঁর কথা শুনতে সমবেত। বিশেষতঃ বৃত্তিজীবী মানুষেরা তাঁর চিন্তার অকাট্য রূপে এবং যৌক্তিকতায় সবিশেষ আকৃষ্ট। তাঁর বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলী একমাত্র বৃহৎ অপেরা-হাউসেই আঁটে। অদ্ভুত ভালো ইংরেজি বলেন। যেমন রূপবান তেমনি উত্তম মানুষ। তাঁর বক্তৃতার বিবরণ যথেষ্ট জায়গা নিয়ে ছাপা হয়েছে ডেট্রইটের সংবাদপত্রগুলিতে।...ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দকে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত আটকে রাখা হত, যাতে সেই অবধি শ্রোতারা উপস্থিত থাকে। কোনো এক বড্ড গরম দিনে, গদ্যময় বক্তা যখন না-থেমে নাগাড় বকে যাচ্ছেন, আর শয়ে-শয়ে লোক বাড়ি যাবার জন্য উঠে পড়েছে, ঠিক তখনি যদি সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—শেষ হবার ঠিক আগে স্বামী বিবেকানন্দ অল্প-কিছু বলবেন—তাহলে হাঙ্গাম মিটে গেল, সভাপতি-মহাশয় উক্ত উত্ত্যক্ত শত-শত শ্রোতাকে সুশৃঙ্খল শান্তিতে উপবিষ্ট পেয়ে যাবেন। কলম্বাস-হলে চার হাজার মানুষ গরমে হাতপাখা নাড়তে-নাড়তে অপর বক্তার বক্তৃতার সময়ে হাসিমুখে এক ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা বসে থাকবে—কেননা তারপরে যে, বিবেকানন্দের ১৫ মিনিটের বক্তৃতা শোনা যাবে।"

মজুমদারের বহুভাগ্য! বিবেকানন্দ রক্ষণশীল হিন্দুর প্রতিনিধি কি-না, এই বিতর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ব্রাহ্মসমাজের দুই মুখপত্র নিজেদের বিসম্বাদ সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে পরস্পর হাত মেলাল!! মিরারের ৮ অগস্টের সম্পাদকীয় মন্তব্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র মেসেনজারের বিশেষ সুযোগ করে দিল। মিরারের উক্ত সম্পাদকীয়-সূত্রে মেসেনজারে একটি খ্রীস্টান পত্রিকার ব্যঙ্গবচন উদ্ধৃত হল এবং পাছে মেসেনজারকে কেউ একদেশদর্শী বলে ফেলে—একটি গোঁড়া হিন্দু-পত্রিকার উক্তিও সে তুলে ধরল। বস্টন ইভনিং ট্রানসক্রিপ্ট

৩৯ "It is another Hindu (Vivekananda) who may be said to have set the Missisipi on fire.... The Swami had only to put in appearance and speak of the faith of his nation for five minutes to conquer the minds of the Americans, assembled in the Parliament, by the nobleness of the word he preached to an expectant people. The immense excitement he created in Chicago will not be easily forgotten.... He has been invited from city to city and town to town. Truly it may be said of Swami Vivekananda's work in America that he went, spoke and conquered." (*Mirror*, August 8, 1894)

পত্রিকা বিবেকানন্দের মহিমা সম্বন্ধে যে-সব কথা লিখেছিল, তা মেসেনজারের সম্পাদকের চিত্তে কিছুমাত্র আনন্দের সঞ্চার তো করলই না, উপরন্তু তিনি অন্যদিকে স্বামীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করলেন—তিনি খ্রীস্টানদের তোয়াজ করে তাদের মন ভোলাচ্ছেন। এই অভিযোগ করার সময়ে সম্পাদক-মহাশয় একেবারে ভুলে গেলেন, মাস পাঁচেক আগে (৮ এপ্রিল) তিনি বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন, বিবেকানন্দ খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে 'নির্বিচার সুতরাং অযৌক্তিক আক্রমণ' চালিয়েছেন। তাছাড়া বিবেকানন্দ কি করছিলেন সম্পাদক-মহাশয় যদি জানতেন। যদি জানতেন—সেই অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ একক সংগ্রামের কথা—আমেরিকায় মিশনারিদের বিরুদ্ধে তিনি যা চালাচ্ছিলেন। বিস্ময়ের কথা, এই সম্পাদকের মনে হল—স্বামীজী শত সহস্র *missionaries of Christ* চাই বলে আমেরিকানদের তোয়াজ করছেন (*missionaries of Christ* চাইলেই পাওয়া যায় না, তা কোটিকে গুটিক মেলে—একথা সম্পাদক বিস্মৃত হলেন কিভাবে!), কিন্তু তিনি যে, সতীদাহ বা কুমীরের মুখে ছেলে ছুঁড়ে-দেওয়া প্রভৃতি নিয়ে মিশনারিদের ভারত-বিরোধী প্রচারের বিরোধিতা করছেন এবং তার দ্বারা আমেরিকানদের তোয়াজ করছেন না—বস্টন ইভনিং ট্রানসক্রিপ্টের বর্ণনার সেই অংশ তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল কিভাবে?

মেসেনজারের উক্ত ২ সেপ্টেম্বরের সংবাদ এই ঃ

THE MAN WHO CONQUERED AMERICA IN FIVE MINUTES

It took Columbus many weary months to discover America, but a nineteenth century Bengali youth, Babu Norendranath Dutta alias "Vivekananda" took but five minutes to conquer the New World, if we are to believe what the *Indian Mirror* says. So even Caesar's famous *Veni Vedi Veci* has been beaten by this exploit. But this is what a Christian contemporary says with regard to Vivekananda, his Hinduism and his influence in America :

> "The *Indian Mirror* is at a loss to know the reason of the Brahmo Missionary Mr. P. C. Mozoomdar's ignoring Vivekananda's work and influence in America. Our information is that Mr. Mozoomdar has heard of the Hindu *yogi* here in India more than he ever heard of him in America, and he was not aware that the famous Hindu *yogi* has caused any stir in American religious circles. The exaggerated accounts that have appeared since, are from the pen of those who had somehow or other imbibed the notion that there was not a spark of truth in Hinduism and that any votary of Hinduism must necessarily speak unmitigated nonsense. But these men were agreeably surprised to hear some of the lofty truths of religion common to all the great religions of the world, and they were so much favourably impressed with the man that they lost the balance of their mind and gave vent to their feelings in extravagant and unguarded language which when analysed proves to be the veriest garbage and utterly misleading."

But our Christian contemporary need not have been so hard upon this 'Brahmin' for he could not have retained ground in America in five minutes even, though he might have conquered it in as many minutes, unless he had reconciled himself to the well-known tactics of pandering to the vanity of the populace by telling the Americans that Hindus 'wanted missionaries of Christ by the hundreds and thousands.' He asked the Americans to have Christianity 'preached in every village corner of India (vide *Boston Evening Transcript*, quoted by *Indian Mirror* in its issue of 8th. August last). With regard to assertion made in certain quarters Vivekananda went across the Atlantic as a representative of the orthodox Hindus, we may note that *Dharmapracharak* of Beneras ignores Babu Narendranath Dutta a Hindu preacher and repudiates the work done by him in America. The *Dharmapracharak* says that 'one special feature of Hinduism is its observance of caste-system, and had Vivekananda Swami referred to it in its lectures he would never have pleased the Americans. He clearly says that caste has nothing to do with the religion. It is only a social division. The Americans might be pleased with such exposition but it cannot brighten the hopes of Hindu Community. Hindus have reason to be pained rather than delighted by such statement of the Swami.' etc.

Just imagine that a person repudiating caste and wishing to see Christianity preached in village corner of India, claimed as a representative of orthodox Hinduism. Mrs. Besant too, conquered India by flattering its people. The latest style of conquest, it seems, is to go over to the enemy's camp."

মেসেনজারের এই লেখার পূর্ণ সুযোগ স্বভাবতঃই নিয়েছিল খ্রীস্টান পত্রিকাগুলি। ইণ্ডিয়ান ক্রীশ্চান হেরাল্ড পত্রিকা কেমন তৃপ্তির সঙ্গে মেসেনজারের সমর্থনে বিবেকানন্দের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করেছিল, তা দেখতে পাই ১১ সেপ্টেম্বরের মিররে। খ্রীস্টান পত্রিকাটি মেসেনজারের সকল কথার কার্যতঃ পুনরাবৃত্তি করে লিখল ঃ

"আমাদের ব্রাহ্ম-সহযোগী মেসেনজার আমাদের মতোই বুঝতে অসমর্থ—বিবেকানন্দ কিভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমেরিকায় আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাতে পারেন—যে-কথা ইণ্ডিয়ান মিরার পুনঃপুনঃ সজোরে জানাচ্ছেন—যদি-না তিনি সম্পূর্ণ পৃথক কোনো ব্যক্তি হন। সহজাত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ খাঁটি হিন্দুর পক্ষে আমেরিকান অথবা ইউরোপীয়ের সহানুভূতি প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। ধর্ম-শিক্ষক হিসাবে যদি তিনি সত্যই কিছু প্রভাব সেখানে অর্জন করে থাকেন তাহলে আমাদের [ব্রাহ্ম] সহযোগী যে-সিদ্ধান্ত করেছেন তাই অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়—বিবেকানন্দ যে-হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন বলা হচ্ছে, সেই হিন্দুধর্মকে তিনি ঝেড়ে ফেলেছেন।...বস্তুতঃ তিনি বাইবেল ও খ্রীস্টধর্মের বিশিষ্টার্থক ভাষা যথাসম্ভব ব্যবহার করেছেন, যদিও খ্রীস্টানদের পক্ষে তার যে-বিশেষ তাৎপর্য আছে তাকে রক্ষা করেন নি, অর্থাৎ সেগুলিকে তিনি অ-স্বাভাবিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এ না-হলে কতকগুলি সংবাদপত্র তাঁর যে-প্রভাবের কথা বলছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।"

বিবেকানন্দ রক্ষণশীল হিন্দুর প্রতিনিধি কি-না—মিশনারি ও ব্রাহ্মদের সেই মাথাব্যথার ওষুধ কেবল মিরারই দেয়নি—কড়া ডোজে দিয়েছিল বৈষ্ণব-মুখপত্র অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮৯৪, ২৫ অগস্ট। তার অংশ ঃ

"স্বামী বিবেকানন্দ 'রক্ষণশীল' হিন্দু কি-না, এই বক্র কটাক্ষের মূলে আছে মিশনারি-প্রভাব। বিবেকানন্দকে ভালবাসা মিশনারিদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। স্বতঃই তারা তাঁকে ভূপাতিত করতে চায়। কিন্তু বিবেকানন্দ রক্ষণশীল হিন্দু নন কেন? তা কি এইজন্য, ওঁরা যা বলেন, বিবেকানন্দ কালাপানির পারে গেছেন ও স্লেচ্ছ খাদ্য খেয়েছেন? কিন্তু হিন্দুধর্ম হিন্দুর উপরে যে বিধিনিষেধ আরোপ করে, তার সীমার মধ্যে মুক্তাত্মা সন্ন্যাসীরা পড়েন না। স্বামীজী সেই শ্রেণীর মানুষ।"

খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মদের পরবর্তী কটাক্ষ ও বিদ্রূপের সুযোগ এল 'বাল্টিমোর ঘটনা'কে কেন্দ্র করে। ঘটনাটি এই ঃ স্বামীজী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে বক্তৃতা-সফর করছিলেন; তিনি ব্রুম্যান-ভ্রাতৃগণের (তরুণ বয়সেই সুপরিচিত তিন ভাই—ওয়ালটার, হিরাম ও কার্ল) দ্বারা বাল্টিমোরে আমন্ত্রিত হন। লুই বার্ক লিখেছেন ঃ "আমরা জানিনা, স্বামীজী কি-কারণে এই আমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন, কিংবা জানিনা, ব্রুম্যানরা কিভাবে তাঁর সংগে যোগাযোগ করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁরা বস্টনে স্বামীজীর সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার কথা তুলে স্বামীজীকে বাল্টিমোরে আসতে প্ররোচিত করেন। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি স্বামীজীর খুবই প্রিয়। ব্রুম্যানদের প্রাণশক্তি এবং খোলা স্বভাবও স্বামীজীকে আকৃষ্ট করতে পারে। রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও এই ভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে একথা অবশ্যই বলা যায়, তাঁরা অন্ততঃ প্রাণোদ্দীপিত ছিলেন।" "কিন্তু ব্রুম্যানদের আতিথেয়তা নিখুঁত হয়নি। আতিথেয়তার রীতিভংগ করে, হয়ত তার কোনো না কোনো অনিবার্য কারণ ছিল, তাঁরা স্বামীজীকে হোটেলে রেখেছিলেন। সেই হোটেলে রাখার ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থাও আবার তাঁরা পূর্বাহ্নে করে রাখেন নি। বয়সে তরুণ হলেও ব্রুম্যানদের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না, বাল্টিমোরের বর্ণবিদ্বেষ সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। তাঁরা নিশ্চয়ই জানতেন যে, তাঁদের কৃষ্ণচর্ম-বিশিষ্ট অতিথি সম্বন্ধে হোটেলের বুদ্ধি-বিবেচনাহীন কেরানীরা কি-রকম সন্দিগ্ধ, রূঢ় ব্যবহার করবে। তথাপি স্বামীজী বাল্টিমোরে পৌঁছবার পরে তাঁকে নিয়ে রেভাঃ ওয়ালটার ব্রুম্যান একের পর এক তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে হাজির হতে লাগলেন শুধু বিতাড়িত হবার জন্য।...শেষ পর্যন্ত রেভারেণ্ড ওয়ালটার ব্রুম্যান তাঁকে বাল্টিমোরের সবচেয়ে দামী হোটেল রেনার্টে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন, সেখানে তাঁর জন্য একটি ঘর জোগাড় হলে তাঁকে স্বেচ্ছামত থাকবার সুযোগ দিয়ে চলে এলেন। পরবর্তী দৃশ্য যা জানি তা হল, সানডে হেরাল্ড পত্রিকার একজন রিপোর্টার গিয়ে দেখলেন, স্বামীজী হোটেল-লবিতে রাজকীয় প্রশান্তি নিয়ে আসীন।"

বাল্টিমোরে স্বামীজীর বক্তৃতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে স্থানীয় 'সান' পত্রিকা যে-বিবরণ প্রকাশ করেছিল তার মধ্যে হোটেলে স্থানলাভ সম্বন্ধে তাঁর অসুবিধার কথাও ছিল ঃ "শনিবার বাল্টিমোরে পৌঁছবার পরে বিবেকানন্দের ব্রোঞ্জ-রঙের চামড়ার জন্য হোটেলে স্থান পেতে কিছু অসুবিধা হয়েছিল। রেভারেণ্ড ওয়ালটার ব্রুম্যান তাঁকে নিয়ে চারটে হোটেল ঘোরার পরে অবশেষে তিনি রেনার্টে অতিথি হিসাবে গৃহীত হন।"

উল্লিখিত ঘটনাটি নিউইয়র্ক ইণ্ডিপেনডেণ্ট কাগজ-মারফত নিম্নোক্তরূপে ভারতে পৌঁছেছিল ঃ

"ভারত থেকে আগত 'হাই প্রিস্ট' মিঃ বিবেকানন্দ, যিনি ধর্মমহাসভায় বিশেষ চাঞ্চল্যের

সৃষ্টি করেছিলেন, এবং এই দেশে তদবধি থেকে গেছেন ব্রহ্মণ্যধর্মের প্রচারের এবং খ্রীস্টানধর্মের সমালোচনার জন্য—তিনি এখন খ্রীস্টানদেশের বিষয়ে যথার্থ অভিযোগ নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন। কারণ তিনি যখন সম্প্রতি এদেশের সর্ববৃহৎ খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের হেড-কোয়ার্টার বাল্টিমোরে এসেছিলেন, তখন তাঁর বর্ণের জন্য একটি-ভিন্ন সকল প্রথম শ্রেণীর হোটেলের দরজা তাঁর মুখের সামনে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেখানে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর মাথার সরল (অর্থাৎ যা নিগ্রোদের মত কুঞ্চিত নয়) কেশ দেখে তারা ধাঁধায় পড়েছিল, কিন্তু তাঁর কালো চামড়া দেখে বুঝেছিল, লোকটি কোনো একজাতীয় নিগার, সুতরাং লোকটিকে ভদ্রলোকদের বিছানায় শুতে দেওয়া যায় না, বা ভদ্রলোকের টেবিলে বসতে দেওয়া যায় না।"

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিবেকানন্দের প্রতি অবিচারে কিছু ক্ষুণ্ণ নিউইয়র্ক ইণ্ডিপেনডেণ্টের রিপোর্টে একটি ভুল (স্বেচ্ছাকৃত নাও হতে পারে) থেকে গেছে। বিবেকানন্দ প্রথম শ্রেণীর হোটেলে নয়, (যা এই কাগজটি লিখেছে), নিম্নশ্রেণীর হোটেলেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন।৪০ নিউইয়র্ক ইনডিপেনডেণ্টের কাছে বিদেশী অতিথিকে প্রথম শ্রেণীর হোটেলে নিয়ে যাওয়া অনুচিত কিছু নয়, কিন্তু আমেরিকার অবস্থা সম্বন্ধে অনবহিত ভারতীয় পাঠকদের কাছে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব। স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে ২৬ ডিসেম্বর ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে পাঠান। ঘটনা আরও গড়ালে মাদ্রাজী শিষ্যদের কাছে পুনশ্চ ও-বিষয়ে তাঁকে লিখতে হয়েছিল। ১৮৯৫, ১ জুলাইয়ের চিঠিতে আলাসিঙ্গাকে লেখেন ঃ "আমি এদেশে খুব বড় হোটেলে পূর্বে কখনো থাইনি, আর কোনোরূপ হোটেলে খুব কমই খেয়েছি। বাল্টিমোরে ছোট হোটেলওয়ালারা অজ্ঞ—তারা নিগ্রো ভেবে কোনো কালা আদমীকে স্থান দেয় না। সেইজন্য ডাঃ ব্রুম্যানকে, আমি যাঁর অতিথি দিলাম, ঐখানে একটা বড় হোটেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল, কারণ তারা নিগ্রো ও বিদেশীদের মধ্যে প্রভেদ জানে।"

বাল্টিমোর ঘটনার ব্যাখ্যা ভারতে নানা জনে নানাভাবে করে। খ্রীস্টান-সভ্যতার পক্ষে ঘটনাটি কলঙ্কজনক—এই বক্তব্য নিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয় ইণ্ডিয়ান নেশনে ও হিন্দু পেট্রিয়টে। ১০ ডিসেম্বর, ১৮৯৪, ইণ্ডিয়ান নেশন বলে, "খ্রীস্টান ভ্রাতৃসংঘে প্রবেশের জন্য বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর প্রয়োজন। মানুষ সবাই ভাই—নিগ্রোরা বাদ।" ৫ ডিসেম্বর হিন্দু পেট্রিয়ট নিউইয়র্ক ইণ্ডিপেনডেণ্টের বিবরণ ও মন্তব্য উদ্ধৃত করার পরে তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে লেখে ঃ

"এখন, ঐ ধরনের ঘটনা যদি আমেরিকার 'সর্ববৃহৎ খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের হেড কোয়ার্টারে' ঘটে, তাহলে ঐ প্রগতিশীল দেশের সাম্য এবং মনুষ্যগণের ভ্রাতৃত্ব কোথায় গেল— যাকে নাকি উক্ত সমাজের ভিত্তিস্বরূপ মনে করা হয়! আমাদের আশঙ্কা হয়, 'সর্ববৃহৎ খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে' সর্বাপেক্ষা অল্প খ্রীস্টীয় গুণ রয়েছে, এবং, স্বয়ং খ্রীস্ট যদি ভারতীয় সাধুর পোষাক পরে বাল্টিমোরের হোটেলওয়ালার সামনে হাজির হতেন, তাহলে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, ভারতীয় তরুণটির বরাতে যা জুটেছে বলে শোনা গেছে, সিরিয়ার প্রফেটের বরাতে তা ছাড়া আর কিছু জুটত না। নিউইয়র্কের ধর্মীয় পত্রিকায় যে-ধরনের খ্রীস্টান লেখক রয়েছেন, তাঁদের তুলনায় উক্ত ভারতীয় তরুণ খ্রীস্টের আদর্শের অনেক নিকটবর্তী।" [অ]

৪০ বাল্টিমোর-ঘটনার বিষয়ে স্বামীজী মিসেস ওলি বুলকে লিখেছিলেন ঃ "বাল্টিমোরের নিম্নশ্রেণীর হোটেলওয়ালাদের কাছ থেকে অসম্ব্যবহার পাওয়ার যে-কাহিনী শুনেছেন, তা নিয়ে দুঃখিত হবেন না। ওটা ব্রুম্যান-ভ্রাতাদেরই দোষ। তারা কেন আমাকে নীচু হোটেলে নিয়ে গেল?"

ইণ্ডিয়ান নেশন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট খ্রীস্টীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে যতখানি বিরূপতা বোধ করেছিল, ব্রাহ্ম-মুখপত্র মেসেনজার কিন্তু তেমন-কিছু অনুভব করবার কারণ দেখে নি। বিবেকানন্দের প্রতি অসম্ব্যবহারের বিষয়ে মৃদু আপত্তি সে করেছিল সত্য কিন্তু তার কটাক্ষের আসল লক্ষ্য হল—বিবেকানন্দই!! ২ ডিসেম্বর মেসেনজারে নিউইয়র্ক ইণ্ডিপেনডেণ্টের মন্তব্যের অংশ উদ্ধৃত করে বলা হল ঃ

"We do not know to whom pity more—Vivekananda or the Christians of 'the head quarters of the largest Christian denomination' in America, who accorded to that gentleman such a shabby and un-Christian treatment. In one point, however, we would crave leave to correct an erroneous impression of the writer in the *Independent*. Had Mr. Vivekananda been really 'the high priest' from India, he would have spurned the idea of seeking accommodation in a 'first class' or any hotel, where *Mlechchas*, whose touch would in that case have been abomination to him, and the *Mlechchas* would not have had an opportunity of setting him down as a heathen and a 'culled pusson.' The exchange of such compliments does not appear at all conducive to the growth of spiritual life."

মিরার স্বভাবতঃই এই ধরনের মন্তব্যের কঠোর প্রতিবাদ করে—৭ ডিসেম্বর সংখ্যায়। স্বামীজীর দ্বারা প্রচারিত হিন্দুধর্মের মহিমার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, ভারতের গৌরববৃদ্ধির জন্য তাঁর প্রচেষ্টার মূল্য অগ্রাহ্য করে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই মুখপত্রটি দিনের পর দিন কিভাবে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষণ করে এসেছে, তা দেখেছি। স্বামীজীর পক্ষের সংবাদগুলির উল্লেখ না করে, বিরুদ্ধ সংবাদকে (প্রধানতঃ মিশনারি সূত্র থেকে সংগৃহীত) লোকলোচনে তুলে ধরতে উৎসাহের অবধি ছিল না পত্রিকাটির। বিবেকানন্দ আমেরিকায় উপনিষদ ও গীতার উপর নির্ভরশীল বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম প্রচার করেছেন—গীতা ও উপনিষদের ভক্ত এই পত্রিকার দৃষ্টি তাতে আকৃষ্ট হল না কেন? প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের উপরে অসহ্য মুরুব্বিয়ানা চাপিয়ে এই পত্রিকা বিবেকানন্দ-নিন্দার যে-প্রয়াসে অবতীর্ণ হয়েছিল, তার স্বরূপ খুলে ধরল মিরার উল্লিখিত ৭ ডিসেম্বরের সম্পাদকীয় টীকায় ঃ

"স্বীকার করি, আমরা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারছি না, কেন আমাদের সজীব সহযোগী ইণ্ডিয়ান মেসেনজার স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকায় তাঁর কার্যাবলীর বিরুদ্ধে বিষাক্ত তীর ছোঁড়ার কোনো সুযোগই ছাড়তে রাজি নন! আমাদের সহযোগীর ধর্মীয় অথবা নৈতিক স্পর্শকাতরতায় আঘাত লাগতে পারে, স্বামীজী তো তেমন কিছু বলেন নি বা করেন নি। ইণ্ডিয়ান মেসেনজার সর্বদাই উপনিষদ এবং ভগবদ্‌গীতার নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এসেছেন; বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায়, পরে আমেরিকার অগণিত খ্রীস্টান সভাকক্ষে, গির্জায় বা উপাসনালয়ে তাছাড়া আর কিই-বা প্রচার করেছেন?... সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িকতা বা ঘৃণাপূর্ণ ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়েই মাত্র কেউ, পৌত্তলিক বা ব্রাহ্ম তিনি যাই হোন, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের মহান কার্যের কুৎসা করতে পারে।"

মিরারের স্পষ্ট কথায় বিব্রত মেসেনজার একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করল ৯ ডিসেম্বরে *Vivekananda and Ourselves* নামক সম্পাদকীয়তে। মিরারের মন্তব্য উদ্ধৃত করার পরে মেসেনজার উক্ত সম্পাদকীয়তে লিখেছিল ঃ

"We are accused of having shot 'poisoned darts to Swami Viveka-

nanda.' Will our contemporary point to any single remark made by us, which can be fairly called a poison dart? We think we may rightly assume that the pungent paragraph quoted above has been inspired by the perusal of a note headed, "Treatment of Mr. Vivekananda by Americans," which appeared in our last issue. Our readers are aware that the note contained an extract from the *New York Independent*, which stated that the Swami, having visited Baltimore, 'had been refused admission to every first-class hotel to which he applied but one' and reproduce the comments we made on the above statement, that our readers may better judge of the justice of the *Mirror's* accusation."

[মেসেনজারের ২ ডিসেম্বরের মন্তব্য পুনরুদ্ধৃত। তারপর—]

"Now is there anything in the above which our contemporary may fairly take exception to? We pitied those who, why calling themselves Christians, had accorded to a foreigner sojourning in their land such un-Christian treatment; and we pitied Vivekananda who having assumed the title of a Hindu monk, placed himself in a situation which was strangely inconsistent with the character in which he has posed before the world; and we repeat that the idea of a Hindu Swami depending on the hospitality of first-class hotels, has something of incongruity in it. As the *Independent* had described Mr. Vivekananda as 'the high priest from India,' we were perfectly justified in pointing out that the description was not correct, and that a Hindu high priest would never have sought accomodation in an American holel. If this is 'shooting poison darts' then the meaning of the phrase is, saying anything which the *Mirror* does not like. We have often commented upon the doings of Vivekananda and his admirers, and we know our comments have not been acceptable to the *Indian Mirror*, but surely our contemporary does not hold that it is not permissible to differ from him? If the *Mirror* will point definitely to any expression or opinion on our part, to which the language it has been used can be justly applied, we shall be glad to discuss the matter."

মেসেনজারের কটু মনোভাবের সঙ্গে আর বৃথা সংঘাত প্রয়োজন মনে করেনি মিরার। সমগ্র দেশ যখন একজন ব্যক্তির গৌরবে গৌরবান্বিত, তখন তাঁর বিরুদ্ধে মিশনারিদের নিন্দাবচনগুলি খুঁটে-খুঁটে জোগাড় করা ও তার উপরে নিরপেক্ষতার ভড়ংসহ মন্তব্য করার নামই যে 'বিষাক্ত শর' নিক্ষেপ করা—এ যে না-বুঝবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। আরও মজার কথা, গোটা ব্যাপারটাই ভুলের উপরে দাঁড়িয়েছিল। বিবেকানন্দ হোটেলের দরজায়-দরজায় ঘোরেননি, তাঁকে যাঁরা আহ্বান করেছিলেন, তাঁরাই তাঁকে নিয়ে সেই কাজ করেছিলেন, এবং কালা আদমী বলে নীচু হোটেলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হলে বাধ্য হয়ে ফার্স্ট-ক্লাস হোটেলে তাঁকে তোলা হয়েছিল। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এমন মুখরোচক সংবাদ পাওয়ার পরে ঘটনার আসল চেহারা সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধিৎসার অভিপ্রায় থাকতে পারে না মেসেনজার পত্রিকার, কিন্তু যিনি বিদেশে গেছেন তাঁকে যে কখনো-কখনো হোটেলে উঠতে

হতে পারে, বা তাঁর আমন্ত্রকেরা তাঁকে হোটেলে তুলতে পারেন—এমন সম্ভাবনীয়তার কথা কি মেসেনজারের মাথায় আসতে পারত না? মেসেনজার কি আমেরিকাকে একেবারে ভারত ভেবেছিল! অথচ যতদূর শোনা যায়, কূপমণ্ডূক রক্ষণশীল হিন্দুদের তুলনায় সংস্কার-পন্থীরা কালাপানির পরপার সম্বন্ধে বেশী সংবাদ রাখতেন!

মেসেনজার মিররকে রণে আহ্বান করেছিল। মিরর যখন তাতে সাড়া দিয়ে শহীদ হবার কোনো ইচ্ছা দেখালো না, তখন মেসেনজার নির্ভয়চিত্তে কটক র‍্যাভেনশ' কলেজের লেকচারার জে জি দে-র একটি চিঠি ছেপে ফেলল। তার মধ্যে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের বিষয়ে মেসেনজারের সমালোচনাদির বিশেষ প্রশংসা ছিল। জে জি দে এমন কথাও লিখেছিলেন ঃ

"The very idea of a Hindu monk and high priest seeking admission into a first-class hotel in America...will make our fathers shudder in their graves."

এই সব 'বিষাক্ত' বা 'মধুসিক্ত' শরে বিদ্ধ হয়েও মিরর যখন কোনো উত্তর দিল না, তখন মেসেনজার বুঝল, এখন পরিস্থিতির উপর তার পূর্ণ আধিপত্য। সুতরাং এবার করুণার ন্যায়বিচারে বিবেকানন্দের পক্ষে তার দু'একটি কথা বলা দরকার। তাই খ্রীস্টানদের ইণ্ডিয়ান উইটনেস কাগজে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যা লেখা হয়েছিল, তার অংশ-বিশেষের প্রতিবাদ পর্যন্ত করে বসল তার ৩০ ডিসেম্বর সংখ্যায়!—

"[INDIAN WITNESS writes :] 'There are heathen, but very few, who are better than their religions; but an instance to prove the degeneration consequent upon the Hindu belief : Swami Vivekananda, is said by the Indian native papers to be an imposter; they say he is a Bengali Babu of low caste, and has assumed a Madrasi Brahmin name to hide his identity and low origin. If all this be true and it is not denied, Vivekananda ought to receive from everyone the treatment he got from the Baltimore hotels when they refused to entertain him. They did so because of the color of the skin. That was wrong. They should have refused him hospitality because morally black.' (*Indian Witness*)

"Whether 'the heathen religions are not filled with that which is elevating'...We would ask the *Indian Witness* to name the 'Indian native papers' which have called Vivekananda 'a Bengali Babu of *low caste*' and have said that he has assumed a Madrasi Brahmin name to hide his identity and *low origin.*' The italics are ours. Vivekananda is not of low caste, nor is the name assumed by him a Madrasi Brahmin name as such. Our criticisms with respect to Vivekananda have been misunderstood in certain quarters, and we are all the more concerned therefore that nothing that is unjust should be said of him by other persons which may, by interested cliques, be attributed to us. Whether Vivekananda is 'morally black,' is a question which we leave to be settled between the *Indian Witness* and the *Indian Mirror.* It is of course the 'energising power of the Holy Ghost' that enables our

Christian friends to assume a high moral tone while abusing those whose misfortune it is not to be within the pale of Christiandom."

বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে খ্রীস্টানী কুৎসার বিরুদ্ধে মেসেনজারের এই প্রতিবাদ মেসেনজারের পক্ষে প্রচণ্ড কাণ্ড—আমাদের স্বীকার করতেই হবে। প্রশংসনীয় তার নির্লিপ্ত নিরানন্দ নিরপেক্ষতা। অবশ্য বিবেকানন্দ যেহেতু মেসেনজারের সম্পত্তি নন, ইণ্ডিয়ান মিরারেরই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনি 'নৈতিকভাবে কৃষ্ণবর্ণ' কি না—সে-প্রশ্নের ফয়সাল্লার দায় ইণ্ডিয়ান মিরারেরই—উদারভাবে এই ফতোয়া দিয়েছিল ইণ্ডিয়ান মেসেনজার।

আর একটু মজার কথা এখানে আছে। ইণ্ডিয়ান উইটনেস-এর উদ্ধৃত অংশে দেখি—বিবেকানন্দ তাঁর নীচু জাত গোপন করার জন্য এবং নাম ভাঁড়ানোর জন্যই নৈতিকভাবে দূষিত। মেসেনজার তার প্রতিবাদ করেছে। তাহলে তিনি 'নৈতিকভাবে কৃষ্ণবর্ণ' কিনা এই প্রশ্ন মীমাংসার ভার অন্যের উপর চাপানোর কারণ কি? সে কি, প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে *Morally Black* কথাটি বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে নাড়াচাড়া করতে পেরে সম্পাদক সুখবোধ করছিলেন—এই জন্য!!

দশম অধ্যায়

ভারতে মিশনারি আক্রমণ

॥ ১ ॥

'ভারতের নবজাগরণ' অধ্যায়ে বিবেকানন্দের ভূমিকা যেখানে দেখিয়েছি, সেখানে স্বচ্ছন্দে এসে যেতে পারত ভগীরথের উপমা, যিনি দগ্ধ ভারত-সন্তানের উপরে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মৃতসঞ্জীবনী গাঙ্গ্যবারি বইয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান অধ্যায়ে তাঁর ভূমিকা বোঝাতে দুটি উপমা আসবে বিদেশী পুরাণ থেকে—এক হারকিউলিসের, বহু বৎসরের মিশনারি-সঞ্চিত স্তূপীকৃত কুৎসা-জঞ্জালকে যিনি ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন; দুই প্রমিথিউসের, মানবজাতির জন্য যিনি আলোকগর্ভ অগ্নি আহরণ করেছিলেন, আর সেই 'পাপের' কারণে তাঁকে শিকলে বেঁধে তাঁর দেহের রক্তে ঠোঁট ডুবিয়ে রক্ত-মাংস খেয়েছে শকুনেরা। কিন্তু যারা সে-কাজ করেছে, তারা কেবল প্রাচীন পুরাণের শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের কথাই জানত—জানত না নবপুরাণের ছিন্নশিকল প্রমিথিউসকে।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, জগতের নিয়ম কেউ এড়াতে পারবে না। এ-জীবনে যত প্রশংসা পেয়েছি, নিন্দাও পেয়েছি সেই পরিমাণে—দু'দিকেই পাল্লা সমান।

বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে মিশনারি-আক্রমণের প্রচুর সংবাদ আগে দিয়েছি, বিশেষতঃ আমেরিকায়। এখানে আমরা ভারতের দিকেই বিশেষ নজর দেব। ভারত খ্রীস্টানরা যদিও সংখ্যালঘু, কিন্তু রাজার ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রবল প্রভাবশালী। মিশনারিদের অর্থের অভাব ছিল না, কেননা ভারতকে শোষণের অর্থ তাঁরা পেতেন, বিদেশ থেকে ধর্মান্তরের উদ্দেশ্যে পাঠানো টাকাও, সরকারী কর্মচারীদের প্রশ্রয় যথেষ্ট ছিল তাঁদের প্রতি, এবং চামড়ার রঙ শাদা বলে কালা আদমীদের মাথার উপর দিয়ে হাঁটবার সাম্রাজ্যিক সনদও তাঁরা লাভ করেছিলেন—সুতরাং বিবেকানন্দ-উৎপাতকে নষ্ট করার নানা পথ গ্রহণ করতে তাঁদের অসুবিধা হয়নি।

উক্ত নানা পথের অন্যতম পথ—বিবেকানন্দের কার্যাবলীর উপরে 'রাজনৈতিক' শব্দটি দেগে দেওয়া, এবং সে-কাজ তাঁরা করবার চেষ্টা করেছিলেন। খ্রীস্টানী শাসনের বদান্যতা ও হৃদয়বত্তার ঢাক-ঢোলের বিরুদ্ধে স্বামীজী কিছু উল্টোকথা শুনিয়েছিলেন আমেরিকায়—সেজন্য তাঁর 'রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের' দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার সুযোগও দেখা দিয়েছিল। ভারতবর্ষেও কোনো-কোনো বক্তা বা সম্পাদক স্বামীজীর কার্যাবলীর দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক লাভের সম্ভাবনা আছে, ভালো মনে একথা বলেছিলেন, তারও কদর্থ করার সম্ভাবনা ঘটেছিল। এক্ষেত্রে স্বামীজী কঠোরভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন। ১৮৯৪, ২৭ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে তিনি আলাসিঙ্গাকে লেখেন : "কলকাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও উক্তি নিয়ে যেসব বই বেরিয়েছে, তার মধ্যে একটি জিনিস দেখতে পাই—তাদের কতকগুলি এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যা আমার রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রকাশক মনে হয়। কিন্তু আমি রাজনীতিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নই। আত্মতত্ত্বই আমাদের একমাত্র গ্রাহ্যের জিনিস—ওটি ঠিক হলে সবই ঠিক হয়ে যাবে।...সুতরাং তুমি কলকাতার লোকদের সতর্ক করে দেবে, আমার লেখা বা কথার উপরে কদাপি যেন মিথ্যা করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরোপ

করা না হয়। কি আহাম্মকি!...শুনলাম, রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুজ্জে নাকি খ্রীস্টান মিশনারিদের এক সভায় বলেছেন, আমি রাজনৈতিক প্রতিনিধি। একথা যদি প্রকাশ্যে বলা হয় তাহলে তাঁকে আমার হয়ে প্রকাশ্যে আহ্বান করে বলবে, ঐ কথাগুলি তিনি কলকাতার কোনো পত্রিকায় লিখে প্রমাণ করুন। আর তা না পারলে ঐ আহাম্মকির কথাটা প্রত্যাহার করুন। এটা ওদের চালাকি। আমি খ্রীস্টান সরকারগুলির সত্য সমালোচনায় কিছু কড়া কথা সাধারণভাবে বলেছি, কিন্তু তার মানে নয়, রাজনীতি আমার চর্চার বিষয় বা রাজনীতি-জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আছে। যাঁরা ভাবেন, ঐ সব বক্তৃতা থেকে অংশ তুলে সেগুলি ছেপে আমাকে রাজনৈতিক প্রচারক হিসাবে হাজির করা খুব মস্ত ব্যাপার—তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি—হে ঈশ্বর! এইসব বন্ধুদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো!"

স্বামীজীর ঐ কথাগুলির এই অর্থ নয় যে, তিনি ভয়ে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। তিনি রাজনীতির কপটতাকে, স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করতেন। ঐ চিঠির দুদিন আগে কলকাতায় লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী নিজ অনুগামীদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকবার নির্দেশ দেবার পরেই লিখেছেন—"তবে যদি পুলিশ-ফুলিশ পেছনে লাগে তোদের —দাঁড়িয়ে জান্ দে। ওরে বাপ্, এমন দিন কি হবে যে, পরোপকারায় জান্ যাবে? ওরে হতভাগারা, এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয়। বড় লোক তাঁরা—যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন। এই হয়ে আসছে চিরকাল। একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার লোক তার উপর দিয়ে নদী পার হয়।"

অপ্রকাশ্যে স্বামীজীর বিরুদ্ধে কোন্ কলকাটি নাড়ানো হচ্ছিল, তার ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব নয়, বা আমরা তা করতে সমর্থ হইনি (কিছু আভাস অবশ্য সমকালীন সংবাদ-পত্রে পেয়েছি, মহেন্দ্রনাথের পরবর্তী স্মৃতিকথাতেও), কিন্তু প্রকাশ্য অভিযোগ আমরা কিছু জোগাড় করতে পেরেছি।

মাদ্রাজ মেল, যে-অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজটি কিছুদিনের মধ্যে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে দাঁড়াবে, সে কিন্তু একেবারে গোড়ার দিকে, বিবেকানন্দ-সংবাদ যখন সবে ভারতে প্রকাশিত হয়েছে সেই সময়ে, অত্যাচারী খ্রীস্টান-শাসনের বিরুদ্ধে স্বামীজীর উক্তির কঠোর সমালোচনা করেছিল—১৮৯৩, ১৮ নভেম্বর, মূল সম্পাদকীয় রচনায়। বৃটিশ-শাসন সম্বন্ধে এ-ধরনের কথাবার্তা প্রত্যেক ইউনিভার্সিটির আন্ডার-গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রেরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছে, এবার কেবল বক্তৃতার পটভূমিকা বদলে গেছে, কেননা আমেরিকার ধর্মমহাসভায় বিদ্বজ্জন-সমাবেশে বিবেকানন্দ কথাগুলি খোলাখুলি বলেছেন—মাদ্রাজ মেল লিখেছিল। এই কাগজ বিবেকানন্দের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিস্তারিত আপত্তি করে, সর্ব-পরিচিত সেইসব কথা হাজির করার দরকার নেই। একই তারিখে মাদ্রাজের অপর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক মাদ্রাজ টাইমস (কিছুদিনের মধ্যে যে একেবারে বিবেকানন্দ-ভক্ত হয়ে দাঁড়াবে) বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে বিশপ হোয়াইটমোরের সমালোচনা তুলে ধরে। রেভারেণ্ড টি এইচ হোয়াইটমোর আগে মাদ্রাজে মিশনারির কাজ করতেন, তারপরে ইংলণ্ডে ফিরে যান। ধর্মমহাসভার ফলাফল সম্বন্ধে তিনি "লণ্ডনের এক দৈনিকে একটি আকর্ষক পত্র লেখেন।" তাতে তিনি ইতস্ততঃ ভাল-মন্দ কথার মধ্যে বিবেকানন্দকেই মূল আক্রমণের লক্ষ্য করেন, কারণ বৃটিশ-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কটাক্ষ করার স্পর্ধা বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন। "ধর্মমহাসভার এই অপূর্ব সমাবেশ থেকে যদি ভারতে ইংলণ্ডের প্রভাব এবং সেখানে তার বহু যুগব্যাপী রাজনৈতিক ও লোকহিতকর কার্যাবলীর সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটা খুব দুঃখজনক ফলাফল হয়ে দাঁড়াবে"—হোয়াইটমোর বলেছিলেন। ইনি যে-ভাবে ও ভাষায় বিবেকানন্দের সমালোচনা করেছিলেন, তাকে খুব সুখকর বলে মাদ্রাজ টাইমস মনে করতে পারে নি, কিন্তু পত্রিকাটির মতে, দোষী বিবেকানন্দই, কারণ তাঁর কড়া কথাগুলিই উক্ত

বিশপের কড়া কথার জন্ম দিয়েছে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে তরবারি নিয়ে ইংরেজ ভারতে এসেছে। বিবেকানন্দের এই "সস্তার ব্যঙ্গের" উত্তরে দামী গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিশপ বলেন, "তাঁদের বিরুদ্ধে তরবারির অভিযোগ কি করে করা যাবে যাঁরা ভারতের জঙ্গলে এপাশ-ওপাশ গেছে এসেছে, তপ্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে বহু কষ্টে পথ হেঁটেছে, খোলা নৌকায় সামান্য খাদ্যে বিরাট নদীতে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে যাতায়াত করেছে, এমন-সব বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, যার সামনে এইসব বাবু-সন্ন্যাসীরা ভয়ে শতবার পিছিয়ে যেত।" বিশপ যখন বলেছেন, তখন কথাগুলি নিশ্চয় সত্য; ঐ কাজগুলি যাঁরা করেছিলেন তাঁরা তরবারি-ধারী খ্রীস্টান সাম্রাজ্যবাদী বা তাঁদের পার্শ্বচর ধর্মসাম্রাজ্য-বাদী নন, নিছক প্রেম-রাজ্যবাদী, এবং বাবু-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কিভাবে ভারতের পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাও যখন উক্ত বিশপের বিশেষভাবে জানা ছিল তখন তাকে অবশ্যই সত্য বলে মেনে নিতে হবে, এবং ধরে নিতে হবে যে, মিশনারিরা ভারতীয় নারীদের নিন্দা না করে কেবল তাদের উপকারের চেষ্টাই করে গেছেন, আর, ভারতবর্ষে তাঁরা মোটেই মদ চালান দেন নি। খ্রীস্টান-সাম্রাজ্যবাদীদের নিন্দা করে বিবেকানন্দ আর কিছু না করুন একটি কাজ করেছিলেন—এই গোপন খবরটি তিনি টেনে বার করেছিলেন, মিশনারিরা কিছু হীদেনকে তাদের পাপপূর্ণ হীদেন-অবস্থাতেও বন্ধুবৎ দেখে থাকেন এবং হীদেনদের ধর্মে কিছু-কিছু ভাল বস্তু আছে মেনে নেন। বিশপের যথার্থ উক্তি ঃ "আমি এবং আমার মতো শত-শত মিশনারি কি, হিন্দু-বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে উল্লসিত হই না? আমরা কি তাদের সঙ্গে খেলি না, খাই না [হিন্দুরা রাজি হয়?], বেড়াই না [একই কম্পার্ট-মেণ্টে?],১ তাদের বাড়িতে যাই না? এবং কি করি না! আমরা কি তাদের পরিশীলিত আচরণে, ভদ্রতায়, শিক্ষায়, এবং লোকহিতের মনোভাবে উল্লসিত হই না? এর নাম কি তাদের পায়ে দলা?" হিন্দুর প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্র এবং ঋষিগণ ধন্য, তাঁরাও প্রশংসালক্ষ্য হলেন! —"আমরা হিন্দুধর্মের প্রাচীন প্রফেটদের শ্রদ্ধা করি, এবং সত্য সম্বন্ধে তাঁদের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সমাদর করি।"

বিশপ হোয়াইটমোরের বক্তব্য উপস্থিত করবার পরে মাদ্রাজ টাইমসের সম্পাদক বলে-ছিলেন ঃ

"মোদ্দা কথা, এই বিশেষ সন্ন্যাসীটিকে অবশ্যই এক ধরনের কংগ্রেসওয়ালা বলতে হবে। দুঃখের বিষয়, তিনি ইংলণ্ডে নেই, থাকলে অবিলম্বে সত্য বেরিয়ে পড়ত। বস্তুতঃপক্ষে সন্ন্যাসী যে ভ্রান্ত, সে-বিষয়ে আমাদের কোনোই সন্দেহ নেই।"

বিবেকানন্দ বৃটিশ-শাসনের সমালোচনা করেছেন, একথা অনেক মিশনারিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে ব্যস্ত ছিলেন। মিশনারি-কুলে স্বামীজীর 'প্রধান শত্রুদের একজন'

১ দেশীয় খৃস্টানেরা সাহেব-খৃস্টানদের পদাঘাত মাঝে-মাঝে লাভ করত। ট্রিবিউনের লুধিয়ানা-সংবাদদাতা তেমন একটি সংবাদ ট্রিবিউনে প্রকাশ করেন, বেঙ্গলী সেটি উদ্ধৃত করে ১৯০১, ১২ জানুয়ারি। সংবাদটি এই ঃ

"As a general rule, European and Eurasians detest the very idea of travelling Indians in the same compartment; but I was of opinion that the missionaries, who come out to preach the gospel of love to the Indians all the way from England and America, would be exceptions to this rule. But, strange, as it would seem, even they would not condescend to travel with Indians in the same compartment. The other day, three A.P. missionaries were going to N.W.P. A poor Indian Christian was sitting in the Intermediate Class, reserved for Sahib Logs. They kicked out the poor Indian from the compartment."

[*Bengalee;* January 12, 1901]

রেভারেন্ড হিউম সে-কাজ করেছিলেন হার্ভেস্ট ফিল্ডে ১৮৯৫, মে সংখ্যার এক রচনায়। মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ পত্রিকায় ১৮৯৩ ডিসেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয়তে তাঁকে পরিষ্কার রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর সমতুল বলা হয় :

"Some of the representatives of the Oriental faiths. . .displayed to perfection the tricks of the Indian political agitator; and by their cleverness and eloquence some of them gained immense popularity and commanded a respect which they did not deserve."

স্বামীজীর রাজনৈতিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে সতর্কবাণী ভারতীয়দের মধ্য থেকেও এসেছিল, যাঁরা এই সহসা-জনপ্রিয় সন্ন্যাসীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আপদজনক মনে করেছিলেন। এঁদেরই একজন, এ শঙ্করিয়া, পি-এফ-এইচ-এস, মাদ্রাজ টাইমসে ১৮৯৫, ১০ অক্টোবর চিঠি লিখে এই দেশপ্রেমিক-রাজনৈতিকের মতলব সম্বন্ধে রক্ষণশীলদের সমঝে দেবার চেষ্টা করেন। এই চিঠিতে একটি প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত পাই—মহীশূরের মহারাজা স্বামীজীর রাজনৈতিক মনোভাব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এ-সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আগেই দিয়ে এসেছি। খেতড়ির রাজাকে লেখা স্বামীজীর চিঠির সূত্রে শঙ্করাইয়া লেখেন :

"আমার বিশ্বাস, হিন্দুরা বিবেকানন্দের বাগ্মিতা-প্রবাহে ভেসে যাবে না, যিনি [আসলে] রাজনৈতিক-দেশপ্রেমিক, কিন্তু ধর্মীয় মুক্তির বাহক হিসাবে আবির্ভূত। [খেতড়ির রাজাকে লিখিত পত্রে] একস্থানে তিনি 'ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণের বিলীন হওয়ার' কথা বলেছেন, অন্যস্থানে তাদের বংশধরদের প্ররোচিত করেছেন যাতে তারা জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে জাগিয়ে তোলে।...ক্ষত্রিয়দের শক্তিকে জ্ঞানময় বলবার পরে ব্রাহ্মণদের আনুষ্ঠানিকতাকে নিষ্ঠুর দাসত্ব বলতে তাঁর আটকায় নি। আমার বিশ্বাস, মহীশূরের পরলোকগত মহারাজা আমার সঙ্গে একমত হতেন—বিবেকানন্দ কোনো সন্ন্যাসীর মডেল নন—পরমহংস তো দূরের কথা।"

॥ ২ ॥

সিপাহীযুদ্ধের পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা খানিক বুঝেছিল যে, বেয়নেট ও বাইবেলের একত্র অবস্থান যদিচ ষোলআনা কল্যাণকর, কিন্তু উক্ত সহাবস্থানে অসুবিধা ঘটলে সরকারী ভাবে বাইবেলকে দূরে থাকতে বলাই ভাল। এরই নাম ভারতীয় প্রজাপুঞ্জ সম্বন্ধে ভিক্টোরিয়ার সুবিখ্যাত ধর্মনিরপেক্ষতা। সাম্রাজ্যবাদীদের এই ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতো কোনো-কোনো ব্যক্তি অসুখী হলেও২ অধিকাংশ হীদেন ভারতবাসী

২ মজুমদার নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি পত্রিকায় ভারতে বৃটিশ-শাসন প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

"The English did not go to India with a religious propaganda. Their rule has been no-religious rule. The neutrality of their educational policy has indeed produced a good deal of scepticism among the younger generation of Hindus."

মজুমদার অবশ্য এই নীতির ভালো দিকের কথাও তুলেছিলেন। কিন্তু শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংশয়বাদ ছড়িয়েছে, একথা বেঙ্গলী কাগজ মানতে পারেন নি চতুর্দিকে হিন্দু-উত্থানের রূপ দেখে। সম্পাদক লেখেন :

"We cannot accept the view put forward by Mr. Mozoomdar that the neutrality of the Government educational policy has produced a good deal of scepticism among the younger generation of Hindus. This was no doubt true forty years ago.... Scepticism is now at a discount. The younger generation of Hindus....are apparently resolved to go back to the ancient fold, strengthened

খুশিই হয়েছিল, এবং বৃটিশ-শাসকদের বারে-বারে ঘোষণাটি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু ঘোষণা অনুযায়ী কাজ প্রায়শঃই হত না, হওয়া সম্ভবও নয়, যখন মহাপ্রাণ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধের উন্মাদনায় থাকতেন। এক্ষেত্রে বাংলার গভর্নর স্যার চার্লস ইলিয়ট এবং অন্যান্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শাসকদের উৎসাহ কতদূর হবে, সহজেই বোধগম্য।

খ্রীস্টান-শাসকদের মনোভাব সম্বন্ধে ভারতীয়দের বক্তব্য অমৃতবাজারের একটি সম্পাদকীয়ের অংশ উপস্থিত করলেই বোঝা যাবে। অমৃতবাজারের ১৮৯৫, ১ এপ্রিলের 'হিন্দুজ্ অ্যান্ড আদার রেসেস্' রচনায় আছে ঃ

"এখানে কারণ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু হিন্দুধর্ম পৃথিবীর চোখে সহসা উঠে পড়েছে। কয়েক বছর আগেও ধারণা ছিল, হিন্দুধর্মে হেন নোংরা জিনিস নেই যা মিলবে না। আর এখন তার সবচেয়ে তিক্ত বিরোধীকেও কিছুটা খাতির করে কথা বলতে হয়। কল্পনা করুন, সেদিন রেভারেন্ড ডাঃ মিলার মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় স্বীকার করে বসলেন, এই পৃথিবীতে হিন্দুধর্মের একটি দেয় উচ্চাদর্শ আছে।...জনৈক মিশনারির কাছ থেকে এহেন একটি সার্টিফিকেট মিরাকল ছাড়া কিছু নয়।...

"আধুনিক সভ্যতা-সৌধ...যে-ভাব ও ভাবনার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, তা পৃথিবীতে অনন্ত দুষ্কৃতির হেতু।...অনেক বছর আগে, মিঃ ম্যাকলীনই সম্ভবতঃ বোম্বে গেজেটে (পত্রিকার তিনি তখন সম্পাদক) লিখেছিলেন—ভারতের সকল শাসকেরা যেন তাঁদের পূর্ব-সূরীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হন, কেননা তাঁরা ভারতের মতো সম্পত্তিটি ইংরাজ-জাতির ভোগের জন্য রেখে গেছেন। এই লেখকের মতে, ভারতের মতো জমিদারী আছে বলে ইংরেজরা এ-জগতে সবচেয়ে সুখী প্রাণী। ইংরেজরা সাধারণভাবে ভারতকে রাণীর মুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন মনে করে। একজন লেখক, তাঁর নাম এখন ঠিক মনে পড়ছে না, ঘোষণা করেছিলেন যে, ইংরাজ-জাতির কাছে ভারতবর্ষ 'ঈশ্বরের অমূল্য রত্ন।'

"এই সেদিন একজন অত্যন্ত উৎসাহী খ্রীস্টান, তাঁকে অবশ্যই অতি অমায়িক হিন্দু-বিদ্বেষী বলা যাবে, প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, খ্রীস্টানদের ভগবানই খাঁটি ভগবান আর হিন্দুদের ভগবান শয়তান। বিচিত্র তাঁর যুক্তি। তিনি বলেন, যেহেতু ইংরাজদের ভগবান ইংরাজকে ভারতের প্রভু করেছেন, আর নেটিভদের করেছেন তাদের দাস, সুতরাং নিশ্চয়ই ইংরাজদের ভগবান খাঁটি ভগবান, ইত্যাদি। মিঃ ফিপসনের পৃথিবীব্যাপ্ত সহানুভূতি, পৃথিবীর গহন অভ্যন্তরের মনুষ্যগণের দিকেও প্রসারিত—তিনি কিন্তু ইংরাজরা ভারতের প্রভু, এই চিন্তার সুখ ত্যাগ করতে পারেন নি।

"এই ধারণা অনুযায়ী, আধুনিক সভ্যতার উচ্চ সৌধ দাঁড়িয়ে আছে এই ভাব-ভিত্তির উপরে ঃ সেই হল সবচেয়ে সুখী ভাগ্যবান ব্যক্তি, যার সম্পত্তি আছে, সোনা আছে, কর্তৃত্ব আছে।...

"হিন্দু-ধারণায়, মানুষ এ-জগতে অল্পদিনের জন্য এসেছে, সুতরাং তার উচিত শ্রেষ্ঠতর পরজীবনের জন্য চেষ্টা করা [পুণ্যকর্ম করে]। মানুষ যখন রাজকীয় প্রভুত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, তখন সে সোনা বা কর্তৃত্বের চেয়ে বেশি-কিছু চায়। যখন তারা নিজেদের জন্য সোনা চায় তখন তারা অপরের জন্য দারিদ্র্যও চায়। যখন তারা নিজেদের জন্য কর্তৃত্ব চায় তখন একইসঙ্গে চায় অন্যের দাসত্ব। কারণ সোনার কোনো দামই নেই যদি তুমি তার দ্বারা গরিব

and fortified by the virility and vigour which the strong intellectual food of the West has imparted to them." [*Bengalee*; Dec. 23, 1900]

লোকের মাথা কিনতে না পারো। কর্তৃত্ব নিয়ে কি হবে যদি-না সেটা অপরের উপর প্রয়োগ করা যায়।...

"প্রথম বিরাটতম ইউরোপীয়ান—আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট। তিনি কাঁদতেন—জয় করবার মতো কোনো দেশ নেই বলে! তাঁর প্রাণের বাসনা ছিল, এবং যদি তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী হন ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা ছিল—হে প্রভু, আমাকে অগণিত দেশ দাও, যাদের আমি জয় করতে পারি, এবং সেখানকার লোকদের খুন করতে পারি। শেষ বিরাট ইউরোপীয়ান হলেন মিঃ গ্লাডস্টোন, আধুনিক সভ্যতার সুন্দরতম সৃষ্টি, পাশ্চাত্যসংস্কৃতির নিখুঁত ফল-বিশেষ। তিনি মিশরকে আয়ত্তে রাখতে চান কারণ ও-জায়গাটি ইংরেজদের কেরিয়ার তৈরী করার ক্ষেত্র হবে। তাঁর প্রাণগত অভিপ্রায়, তিনি যেন কিছু পরাধীন জাতি পেয়ে যান, যারা তাঁর স্বদেশবাসীর কেরিয়ার তৈরীর সুযোগ করে দেবে।...

"ঈশ্বর মানুষকে নিজের আকার দিয়ে বড় সুন্দর করে তৈরী করেছেন।...সেই মানুষই তার মনুষ্য-ভ্রাতার দিকে বন্দুক তুলে গুলি করে তাদের শুইয়ে দিচ্ছে—আধিপত্যের জন্য। এই শোচনীয় অবস্থায় মানুষ নেমেছে। যে-সব ইংরেজ বলে, ইংলণ্ড ভারতের তুলনায় ঈশ্বরের অধিক পক্ষপাতের দেশ কারণ তারা ভারতের প্রভু, ইচ্ছেমতো ভারতীয়দের গারদে পুরতে পারে—সেই ইংরেজরা যেন তাদের বাইবেলকে লোহার সিন্দুকে পুরে রেখে তার চাবিটিকে আটলাণ্টিক মহাসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।"

অমৃতবাজারের ১৮৯৫, ৫ নভেম্বরের সম্পাদকীয়ের অংশ :

"'গ্লাডস্টোন গোঁড়া খ্রীস্টান'—এই কথা বলে আমরা কোনো অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে চাই নি। তিনি অত্যাচারের দানব তুরস্কের সুলতানের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। খ্রীস্টানরা সাধারণত এই ধারণা পোষণ করেন—অপরদের বিরুদ্ধে ভগবান তাঁদের দলেই আছেন। কিন্তু ভগবান তো সকলকেই সৃষ্টি করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি একের পক্ষে এবং অন্যের বিরুদ্ধে থাকতেই পারেন না। তুরস্কের সুলতানের হয়ে কথা বলতে পারি—এমন কোনো উপাদান আমাদের হাতে নেই। কিন্তু আমরা মনে করি, মিঃ গ্লাডস্টোন যদি সাধারণভাবে যে-কোনো দুরাত্মার হাত থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন, সেটা উপযুক্ত কাজ হত। খ্রীস্টান হিসাবে তিনি অনেক বেশি প্রেমমধুর কাজ করতেন যদি বলবানের লোভের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেন।...খ্রীস্টানদের লোভ-লালসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই হত জীবিত সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ মিঃ গ্লাডস্টোনের যোগ্য কাজ। বিশুদ্ধ আত্মরক্ষার প্রয়োজনের বাইরে যারা মানবভ্রাতাকে জবাই করতে পারে, তারা খুব ভাল লোক হতে পারে, কিন্তু ভাল খ্রীস্টান নয়, খ্রীস্টের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে-টুকু বুঝেছি তদনুযায়ী বলতে পারি।...আমাদের যদি স্মৃতিভ্রান্তি না হয়, তাহলে যেন মনে পড়ে, বাইবেলে একটি বাণী আছে—যারা তরবারি ব্যবহার করে তারা তরবারিতেই ধ্বংস হবে। খ্রীস্টের পরিষ্কার শিক্ষা—এক গালে চড় খেলে অন্য গাল ফিরিয়ে দাও। আলেক-জান্দ্রিয়ায় বোমাবর্ষণ করে নিরীহ নারী পুরুষ শিশুর দুর্গতি ঘটানো হয়েছে—বাইবেলের কোন্ অংশে এর সমর্থন মিলবে? যখন কোনো ভালো খ্রীস্টান অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, তখন ঈশ্বরের কাছে প্রথমে তাঁকে প্রমাণ দিতে হবে—উক্ত প্রার্থনা করবার অধিকার তিনি অর্জন করেছেন। বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে গেছেন—যে-ইংলণ্ড সশস্ত্র মহাদেশের অংশ।...যে-কোনো মূল্যে ঐহিক সম্পদ সংগ্রহ করো—ইউরোপের অন্য দেশগুলির মতো ইংলণ্ডও এই ভাবের মধ্যে ডুবে আছে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবভ্রাতৃত্বের যে-নীতির কথা বিবেকানন্দ বলেন, তা ইংলণ্ডের মাটিতে শিকড় ঢোকাতে পারবে না।"

খ্রীস্টের অনুগ্রহেই ইংলণ্ড (অনুগ্রহের কারণ ইংলণ্ড ধর্মে খ্রীস্টান) ভারতবর্ষকে পদানত করেছে—একথা কারো পক্ষে সুস্থ-বুদ্ধিতে ভাবা বা লেখা সম্ভবপর বলে এখন মনে হয় না, কিন্তু একদিন তা সগৌরবে সম্ভবপর ছিল—লণ্ডনের 'দি ক্রীশ্চান' নামক একটি সাপ্তাহিকের নিম্নের মন্তব্য পড়লে বোঝা যায় ঃ

"While some think that we have been set in the midst of the earth to subdue it, to make its peoples subservient, to gather and use its riches, thus tempting ourselves into pride and oppression, others believe that Christ has did this [English] nation arise and win and worked for Him."

মন্তব্যটি উদ্ধৃত করে অমৃতবাজার ১৮৯৬, ২০ জানুয়ারি লেখে ঃ

"ধরা যাক, যীশুখ্রীস্ট ইংরেজ-জাতিকে তাঁর হয়ে পৃথিবী জয় করবার দায় দিয়েছিলেন, কিন্তু সে-কাজ কি করতে হবে ম্যাক্সিম-গানের দ্বারা? ঐ কি স্বর্গরাজ্য বিস্তারের উপায় —বেয়নেট উঁচিয়ে এগোনো এবং অবিরাম গুলি-গোলা বর্ষণ করা? আশঙ্কা হয়, কোনো মানুষের পক্ষে, বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ইংরেজ-মানুষের পক্ষেও, একইসঙ্গে পৃথিবী এবং স্বর্গের রাজত্ব করা সম্ভব নয়। যাঁরা স্বর্গে রাজত্ব করতে চান তাঁদের এ-জগতে তার আশা ত্যাগ করতেই হবে। ম্যাক্সিম-গান, কূটনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির দ্বারা স্বর্গরাজ্য জয় করতে পারলে খুবই সুবিধা হত সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈশ্বর অন্যপ্রকার নির্ধারণ করেছেন, অন্ততঃ যীশুখ্রীস্ট তাই করেছেন। মাদ্রাজের জনৈক অত্যুৎসাহী মিশনারি সেদিন বলেছেন, ঈশ্বর ইংরেজদের দলেই আছেন, হিন্দুদের দলে নেই, কারণ তিনি যে ইংরেজদের রাজত্ব দিয়েছেন আর হিন্দুদের দিয়েছেন দাসত্ব! না, ও-কথা ঠিক নয়। ঈশ্বর করুণাময়। যে যাকে প্রাণভরে চায়, তাকে তিনি তাই দেন। ইংরেজ পৃথিবীর রাজত্ব চেয়েছিল, তাকে তাই দিয়েছেন। হিন্দুরা পরজগতের রাজত্ব চেয়েছে, সে তা পাবেই। অবশ্য আমরা সঠিক বলতে পারব না, ঈশ্বর হিন্দু ও ইংরেজদের জন্য কোন্ ব্যবস্থা করে রেখেছেন, দুজনেরাই তাঁর সন্তান, তবে ঈশ্বর যখন ন্যায়পর, তখন যেহেতু তিনি এই পৃথিবীতে রাজত্ব দিয়েছেন ইংরেজদের, দাসত্ব দিয়েছেন হিন্দুদের, তাই পরজগতে হিন্দুদের রাজা এবং ইংরেজদের দাস করে পাল্লা সমান রাখবেন।"

শান্তি-সম্মেলন এবং ইংরেজের উগাণ্ডা-যুদ্ধ যখন একই সঙ্গে চলেছে, তখন অমৃত-বাজার ১৮৯৯, ২৮ মে লিখেছিল ঃ

"রাডিয়ার্ড কিপলিংয়ের মনোভাব মোটামুটি সাধারণ ইউরোপীয়ের মনোভাব। ইউরোপীয়রা তাঁদের যুদ্ধ-নামক লাভজনক ব্যসনটি বজায় রাখবেন, যা তাঁদের সুখও দেবে, সৌভাগ্যও দেবে, এবং একইসঙ্গে তাঁরা সকল জাতির পিতা শ্রীভগবান সম্বন্ধে বড় বিনীত প্রণামটিও রক্ষা করবেন। তাঁদের অভিপ্রায়—যদি সম্ভব হয়, যুদ্ধকাণ্ডকে খ্রীস্টানীকাণ্ড করে ফেলো। এক হাতে বাইবেল অন্য হাতে রাইফেল নিয়ে খ্রীস্টান-জাতিরা যুদ্ধকে তাঁদের দেবতার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলবেন।...শান্তি-সম্মেলনে একটি কথা সব-কিছুর মীমাংসা করে দিতে পারে, কিন্তু সেই কথাটি কেউ চেষ্টা করে বলবেন না, তা হল—ভগবানের প্রিয় সন্তান আমরা—আমরা আর যুদ্ধ করব না। ও-কথার বদলে ওঁরা বলবেন, এসো আমরা যুদ্ধ করে যাই, তবে কিছু কম জোরের সঙ্গে। একদা কোনো এক লোকহিতৈষী বাংলাদেশের জাত-চোর বেদিয়াদের বহু মাস ধরে চুরি ছেড়ে দেবার জন্য বুঝিয়েছিলেন। শুভবুদ্ধি, মর্যাদা, স্বার্থ সব-কিছুর দোহাই দিয়ে এমন আবেদন করেছিলেন যে, মনে হয়েছিল, তিনি তাদের মনে দাগ কেটেছেন। জোরালো এক ভাষণের পরে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা চুরি-চামারি ছেড়ে দিতে রাজি তো?' তারা বলল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।' লোকহিতৈষী

বললেন, 'তাহলে এবার দিব্যি করো।' বেদিয়ারা তখন গোপনে আলোচনা করে নিল। তারপর তাদের মুখপাত্র বলল, 'এখন পুজোর সময়, আমাদের বড় লাভের সময়। এই সুবিধার সময়টিতে শুধু একবার চুরি করে নিতে দিন, তারপরেই জন্মের মতো ছেড়ে দেবো।'"

বেঙ্গলী ১৯০২, ১৬ মার্চ শিলাস কে হকিং-এর একটি দীর্ঘ রচনা উদ্ধৃত করে—যার নাম *War As a Christian Institution*। তীব্র ব্যঙ্গাত্মক এই লেখাটির গোড়ায় যুদ্ধের বীভৎস রূপের বর্ণনা করার পরে বলা হয়, এইসব কান্ড-কারখানা দেখে অনেক খ্রীস্টানের মনে বিশ্রী সন্দেহ জাগতে আরম্ভ করেছে, যুদ্ধ বুঝি খ্রীস্টীয় অনুষ্ঠান নয়! সেইসব রক্তহীন দুর্বল মনের মানুষদের প্রাণে শক্তিসঞ্চার করতে কিভাবে পাদরিরা সদাপে এগিয়ে এসেছেন, তার কিছু বিবরণ লেখক দিয়েছিলেন। ব্রিস্টলের পাদরি রেভারেন্ড বার্নার্ড স্নেল বুয়োর যুদ্ধের উপরে লেখা তাঁর গ্রন্থে যুদ্ধকে 'ঈশ্বরবিধান' বলে ঘোষণা করেছিলেন। এঁর অনেক কথাই বিতৃষ্ণার সঙ্গে লেখক উদ্ধৃত করেন। আমরা নমুনা হিসাবে অল্প কিছু দিচ্ছি ঃ

"[Rev. Bernard Snell] assures us that 'there have been diseases which only the sword could relievc us.' 'When injustice has been deep seated, when opprcssion and corruption have spread themselves, it was better that the cause of right should bc pleaded by shots of cannons and revolvers than wrong should continue unrebuked.' Further on he tells us that 'war is one of God's judgements in world; yet carnage is God's daughter.' 'When war is just it is necessary, when war is necessary it is just.'"

খ্রীস্টান ধর্মযাজকের যুদ্ধলালসাকে বিদ্ধ করবার জন্য কিছু ধারালো বাক্যব্যয় করার বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না উক্ত লেখকের পক্ষে। তবে তাঁর লেখায় ধার একটু বেশিই ছিল। আমি অল্প কয়েক লাইন মাত্র তুলছি ঃ

"হাঁ, 'যখন যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত তখন তা প্রয়োজনীয়, এবং যখন প্রয়োজনীয় তখন তা ন্যায়সঙ্গত'—এর থেকে পরিষ্কার কথা আর কি হতে পারে? কয়েক হাজার ইংরেজ, যারা বিদেশে সোনা কাড়াকাড়ি করতে গেছে...তাদের সাহায্য করতে যুদ্ধের কুত্তা ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই দরকার।...নিশ্চয় আমাদের উপরে এই খ্রীস্টীয় দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—খুন করো কিংবা আমাদের নিজেদের ৩০,০০০ সৈন্যকে খুন হতে দাও; ৬০,০০০ বা ৭০,০০০ লোককে আহত করো বা হতে দাও; দেশের কুড়ি কি তিরিশ কোটি মুদ্রার সম্পদ নষ্ট করো, এবং বপন করো ঘৃণা ও তিক্ততার বীজকে, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যার শস্য ঘরে তুলতে পারে।"

"যখন আমরা স্মরণ করি, কিভাবে প্রজাগণের কার্যের স্বাধীনতা এবং বাক্যের স্বাধীনতার মতো 'দুষ্ট' মতবাদকে নিকেশ করে দেওয়া হয়েছে,...যখন চিন্তা করি, কিভাবে আমবা বাৎসরিক তিন কোটি মুদ্রার খরচ বাড়িয়েছি, এবং আমাদের অনিচ্ছাতেই অবশ্য, দুটি বর্ধিষ্ণু উপনিবেশকে হা-হা করা মরুভূমিতে পর্যবসিত করেছি, যখন স্মরণ করি, এই যুদ্ধ হাউস অব কমনস্-এ সকল বিরোধী দলকে চূর্ণ করে দিয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছে গোটা দেশে উদারনৈতিক দলকে, এবং বিশেষাধিকার ও সম্পদভোগী সুমহান [রক্ষণশীল] দলটিকে নবশক্তিতে বলীয়ান করে দিয়েছে, যখন আরও স্মরণ করি যে, যুদ্ধশেষে শান্তি ফিরলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫০,০০০ সৈন্য রাখতে হবে,...তখন কেই-বা মুহূর্তের জন্য দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের উপকারিতা এবং আশীর্বাদে সন্দেহ করবে?"

বহু ইংরাজ-শাসকের এবং মিশনারিদের চেষ্টায় সাম্রাজ্যের সঙ্গে খ্রীস্টানী ঘন আলিঙ্গনে জড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট ১৮৯৪, ৩১ জুনের সম্পাদকীয়তে এ-বিষয়ে লেখে ঃ

"কেবল মিশনারিরা নন, এমন-কি উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত ভারতের ইংরাজ রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত এই ছলনা [ভারত শীঘ্রই খ্রীস্টান হয়ে যাচ্ছে] বজায় রাখার ষড়যন্ত্রে যুক্ত। প্রাক্তন লেফট্‌ন্যাণ্ট গভর্নর, কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্যরা দেখেছেন—স্বদেশের নর-নারীর কাছে ভারতের মিশনারি-প্রচেষ্টার সমর্থন করে, তার উপরে পবিত্র গোলাপজল ছিটানো নিঃসন্দেহে লাভজনক। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক সাম্প্রতিক মিশনারি-কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেছিলেন লর্ড নর্থব্রুক—তিনি ভারতীয় ছাত্রদের খ্রীস্টীয় সাহিত্য পড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তাঁর অনুসরণ করে স্যার ফিলিপ হাচিনস্ (ভারতে তাঁর ৩৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিনীত উল্লেখ করার পরে) বলেন, হাঁ, মাননীয় লর্ড বাহাদুরের কথা অতীব সত্য। তারপর ওঠেন এক মিশনারি (তাঁর বক্তব্য নিঃসন্দেহে উচ্চ করতালিতে অভিনন্দিত), এই স্তম্ভিতকর মন্তব্য করেন, 'অনেকেই অনুভব করছেন, ভারতে খ্রীস্টধর্মের প্রভাব এমন প্রচণ্ড যে, যদি-না সে প্রভাব খণ্ডন করবার জন্য প্রবল কোনো চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেখানে শীঘ্রই দেখা যাবে—হিন্দুধর্মের অল্পই অবশিষ্ট আছে।'"

এইসকল মিশনারিকে কেবল 'কল্পনাপ্রবণ' বলে হিন্দু পেট্রিয়ট অব্যাহতি দেয়নি, কার্যতঃ ধাপ্পাবাজ লোভী মানুষ বলেছিল, কারণ যদিও তারা জানত, ভারতকে খ্রীস্টান করা সম্ভব নয়, ('শিক্ষিত হিন্দুরা এইটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি ধরে যে, তাদের ধর্ম খ্রীস্টধর্ম থেকে অনেক উচ্চাঙ্গের; যার সোনার খনি আছে সে কি টিনের খেলনা চায়?') তবু স্বদেশবাসীর কাছে ভারতের আশু ধর্মান্তরের উজ্জ্বল ছবি হাজির করেছে, কারণ :

"গায়ে-গতরে খেটে-খাওয়া ইংরেজ বা স্কচ চাকরানিরা, প্রাপ্য বেতনের অর্ধেক মাত্র যারা পায়, তারা কি তার থেকে বহু কষ্টে কয়েক শিলিং বার করে সানন্দে তাদের বিদেশস্থ মিশনারিদের ভরণপোষণের জন্য দিয়ে দিতে পারত, যদি তারা জানত যে, ভারতের খ্রীস্ট-ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ঐ পয়সাটা জলে পড়ল!"

হিন্দু পেট্রিয়ট বহু শত বৎসর ধরে ভারতকে খ্রীস্টান করার চেষ্টা এবং তার ব্যর্থতার কথা বলতে গিয়ে মিশনারিরা কী ধরনের জাল-জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েছে, তার কিছু তথ্য পরিবেশন করেছিল।৩

লর্ড নর্থব্রুক বা স্যার ফিলিপস্ হাচিনস্ তাঁর খ্রীস্টীয় অভিপ্রায়ে রাজকর্মচারী-মধ্যে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। যেমন, মিশনারি-পক্ষপাতের জন্য কুখ্যাত ছিলেন বাংলার গভর্নর স্যার চার্লস ইলিয়ট, দেশীয় মহলে যাঁর সম্বন্ধে বিরাগের শেষ ছিল না। এই ব্যক্তি হিন্দুদের 'অর্ধ সভ্য' এবং 'নিম্নশ্রেণীর মানুষ' মনে করতেন। ইনি বলেছিলেন, যদি কখনো দেখা

---

৩ চার শতাব্দী ধরে ভারতকে খ্রীস্টান করবার চেষ্টা চলেছে। সেই চেষ্টার ব্যর্থতার কথা বলার পরে হিন্দু পেট্রিয়ট লেখে :

"The missionaries of the Church of Rome fared no better. Xavier with all his zeal despaired of success and after recommending the introduction of the horrors of the inquisition turned his back upon India in sheer disgust. Robert de Nobilibus and Dubis adopted a very different tactics but with no better success. They proclaimed that they belonged to a higher order of Brahmins than those of India and actually went the long [way] of forging a fifth Veda, containing the quintessence of Christianity. It was apocryphal Veda.... that had suggested to the mind of Voltaire, the theory, upon which later discoveries have thrown much corroborative light, that Christianity was borrowed from sacred writings of the Brahmins Jesuit Father Beschi went further and actually swore on a forged document, in the presence of Brahmins, that it was descented from Brahma." [*Hindoo Patriot*; June 30, 1894]

যায়, ইংরেজ-শাসকেরা হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার যথেষ্ট ক্ষতি-পূরণ তারা করেছে ভারতে খ্রীস্টধর্মের উপহার হাজির করে।৪ এই "মহামান্য গভর্নরের দার্জিলিঙয়ের কুঞ্জভবনে বৎসর-বৎসর মিশনারি-কনফারেন্স বসেছে" এবং মিশনারিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্যার চার্লস হিন্দুদের বদগুণের আলোচনা করেছেন।৫ একবার সেই ধারা-বাহিকতায় ছেদ পড়লে অমৃতবাজার আহ্লাদে লিখেছিল (১৮৯৫, ১৭ জুন), "আমরা দেখে আনন্দিত, মহামান্য গভর্নর-বাহাদুর এই বৎসর হিন্দুদের জন্য বিরাগমূলক কিছু উপহার দিয়ে উঠতে পারেন নি।" হিন্দুদের বিরুদ্ধে স্যার চার্লসের অন্যতম অভিযোগ ছিল, তারা বাইবেলকে ভালবাসে না, যে-অপ্রীতি কিন্তু মুসলমানদের নেই; মুসলমানেরা বাইবেলকে ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদা দেয়। স্যার চার্লস এইসব কথা বলবার সময়ে যে, নিছক স্বধর্মপ্রীতি দেখাচ্ছিলেন না, স্বদেশপ্রীতিও দেখিয়েছেন, তা ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলি খুলে দেখিয়েছিল। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদসৃষ্টি করতে চাইছিলেন। নিরপেক্ষতার সব অভিপ্রায় বিসর্জন দিয়ে স্যার চার্লস যে-সব আচরণ করছিলেন, তা মহারাণীর ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা সম্বন্ধে কটু সন্দেহ জাগিয়েছিল ভারতীয় মহলে এবং ১৮৯৫, ২৩ জুনের সম্পাদকীয়তে মরাঠা তা খুলেও লিখেছিল।৬

৪ "Sir Charles Elliot called them [the Hindus] 'a half-civilized' and 'inferior race'. He said that if the English rulers even oppressed them, that was more than compensated by the Christianity that they have offered their subjects."

[*Amrita Bazar* ; Aug. 1, 1898]

৫ "What, however, made these [Missionary] Conferences [at Darjeeling] memorable were the utterances of Sir Charles Elliot. They showed bigotry, ignorance and uncharitableness, and coming from a man of his position they naturally gave great offence. Fancy, he called the Hindus 'dark,' he called them 'heathens,' and all that. To make his remarks more telling His Honour shewed, at the same time, that he had a better opinion of the Mussalmans who, he thought, were a degree above the Hindu heathens in India."

[*Amrita Bazar;* June 17, 1985]

৬ "One point however in His Honour's [Sir Charles Elliot's] speech is a serious one, which in our opinion, will require all official ingenuity to satisfactorily explain away. If there is one fixed principle that rules Government policy, it is that of perfect religious neutrality. The death of a famous missionary in Bombay and a public discussion of his doings which followed it about twenty years ago, resulted into certain revelations which showed clearly that the mutual relations of Government and Christian missionary societies whose *raison d'etre* in India was purely the conversion of the people, were not occasionally not in harmony with that policy.... If men in high places like Sir Charles Elliot publicly avow that they are 'auxiliaries' of Christian missionaries, and are ready and willing to add, to use His Honour's own words 'their weight and impact to theirs', we ask, are they not adding to that suspicion about the policy of religious neutrality and thereby discrediting the Government."

[*Mahratta ;* June 23, 1895]

বাইবেল-প্রীতির আবরণে স্যার চার্লস মুসলমানদের পিঠ চাপড়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগাতে চাইছিলেন, এবং তা শাসকদের রাজনৈতিক মতলবের অংশ, তা অন্য সূত্রেও বোঝা যায়। বোম্বে গার্ডিয়ানের ১৯০০, ৪ অগস্টের সংবাদে দেখি, লর্ড সলসবেরী মিশনারিদের নিষেধ করেছেন মুসলমানদের যেন ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করা না হয়—তাতে রক্তের নদী বয়ে যেতে পারে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা জানানোর প্রয়োজন অবশ্য তিনি বোধ করেন নি।

স্যার চার্লসের নিরপেক্ষতার কাছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের অপরাধ অপরাধই নয়।

খ্রীস্টীয় ধর্মোপদেশ যদি সেণ্ট পলের কাছ থেকে না এসে স্যার চার্লসের মতো ব্যক্তির কাছ থেকে আসে, কিংবা আসে সেইসব মিশনারিদের কাছ থেকে, যারা বিলাসে আকণ্ঠ ডুবে থেকে বুভুক্ষু ভারতবাসীদের জন্য ধর্ম-রুটি বিলোতে চায়, তাহলে হে ঈশ্বর রক্ষা করো—এই জাতীয় কথা যখন মরাঠা ও অন্যান্য সংবাদপত্র লিখেছিল, তখন এর বিপরীত প্রান্তে ছিল, আমরা ধরে নিতে পারি, স্যার চার্লস-জাতীয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মিশনারিদের প্রভূত প্রেমপূর্ণ কৃতজ্ঞতা। সুতরাং স্যার চার্লস যখন বিদায় নিলেন, তখন হার্ভেস্ট ফিল্ড তাঁকে বহু ধন্যবাদ দিয়েছিল, সেইসঙ্গে সে কলকাতা মিশনারি কনফারেন্স-প্রদত্ত মানপত্রটি এবং স্যার চার্লস-প্রদত্ত উত্তরটি ছেপেছিল, যার মধ্যে উভয় পক্ষের আঁতাতের চেহারাটা খোলাখুলি দেখা গিয়েছিল।৮

ধর্মের প্রয়োজনে যদি নাও হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে যে, ভারতকে ধর্মান্তরিত করা দরকার, তা মিশনারিরা খোলাখুলি বলতে আরম্ভ করেছিলেন। ইংলণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারিরা প্রায় সকলে এক সুরে রা দিয়েছিলেন—লণ্ডন-মিশনের বাঙ্গালোর শাখার

তিনি দোষী খ্রীস্টানদের যেভাবে ছাড়ান দিতেন, তা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ ডেইলি নিউজের কাছে অমার্জনীয় মনে হয়েছিল। সে লেখে :

" Sir Charles Elliot is too ready to protect with the aegis of his authority men who forget they are gentlemen, dealing with gentlemen of an ancient race.. We hold no brief for either side, but we venture to suggest more firmness on the part of Sir Charles Elliot in dealing with such cases, else his own reputation will suffer, and the authority of an English Saheb will be shorn of the lofty sense of justice for which we are all so justly proud."

[Quoted in the *Indian Nation* ; Sep. 17,, 1894]

৮ স্যার চার্লসকে মিশনারি-সম্মেলন যে-মানপত্র দিয়েছিল, তার কয়েক লাইন :

"We, the members of the Calcutta Missionary Conference, beg to approach you....with a humble expression of our grateful appreciation.... The position of a Christian ruler of a non-Christian province is one of admitted delicacy and difficulty. While observing, however, the limits imposed by the religious policy of the British Government in India, it has been your privilege at every call of duty, to be a pronounced witness for our Lord and Master. As president of the Tract Society you have uniformly evinced an active interest in its operations, recognising in them a valuable auxiliary in the education of the masses as well as an effective medium for the dissemination of truth.... Your emphatic testimonies, from time to time, to the utility and success of missionary enterprise, and your recent kindly enunciation of the proper attitude to be maintained towards Indian Christians....will ever be borne in thankful remembrance."

[*Harvest Field;* January, 1896]

এই মানপত্র পেয়ে বিদায়ী গভর্নর-বাহাদুর অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি জানালেন, যত সংবর্ধনা সম্প্রতি তিনি পেয়েছেন, এইটাই সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী, এটি না পেলে তাঁর কষ্টের শেষ থাকত না। ট্রাকট্-সোসাইটির সভাপতি হিসাবে তাঁর সম্মতিতে সত্যের আলোকবর্ষী, অর্থাৎ হিন্দুধর্মের কুৎসাবর্ষী, বহু পুস্তিকা বেরিয়েছিল, সেই গর্বে অধীর হতে গিয়ে, আরো কত কি করবার ছিল অথচ করতে পারিনি, এই ক্ষোভে আর্ত হয়ে পড়ে স্যার চার্লস বলেছিলেন :

"You have accurately expressed the difficulty of the position in which a Christian Lieutenant Governor is placed, bound as he is, by the orders of the Queen, to abstain from any directly proselytising act. For it is impossible for us to shirk or conceal the feeling that our own religion is the one which we consider pre-eminently excellent, and that the morality of our faith is what is most desirable for this country."

মাঝারি মিশনারি রেভাঃ স্লেটার থেকে৯ বিরাট মাপের মিশনারি—কলকাতার লর্ড বিশপ ডাঃ ওয়েলডন পর্যন্ত। স্লেটার-জাতীয় ব্যক্তিদের ধারাবাহিক অভিসন্ধিমূলক কথাবার্তায় গা না-করতেই ভারতীয় জনগণ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কথাটা যখন ভাইসরয়ের বন্ধু, ইংলন্ডের বিখ্যাত প্রাক্তন শিক্ষাবিৎ এবং বর্তমানে উগ্র ধর্মপ্রচারক, এদেশের প্রধান খ্রীস্টান ধর্ম-আমলা ডাঃ ওয়েলডনের মুখ থেকে বেরুল, তখন এদেশবাসীর পক্ষে ব্যাপারটা কিছু চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে, নিতান্ত মিশনারি-ভক্ত ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মারকে পর্যন্ত বলতে হল, জনসাধারণের পয়সা খেয়ে বৃহত্তর জনসাধারণের ধর্মবোধে যদি এমন আঘাত করা হয়, তাহলে ব্যাপারটা মারাত্মক দাঁড়াতে পারে—না না—মিউটিনি নয়—তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছিল সোস্যাল রিফর্মার কিন্তু কথাটা আর কেউ নয়, সোস্যাল রিফর্মারই যখন উচ্চারণ করেছিল, তখন বোঝা গিয়েছিল, ভারতীয় মনোভাবের তীব্রতার রূপ।১০

ওয়েলডনের বেপট ধর্মোৎসাহ সোস্যাল রিফর্মার-সম্পাদককে এমন পীড়িত করেছিল যে, তিনি বোধহয় তাঁর জীবনের সর্বাধিক তিক্ত একটি মিশনার-বিরোধিতার রচনা লিখে ফেলেছিলেন। আবেগের মাথায় তিনি এই সত্যটি স্বীকার পর্যন্ত করেছিলেন—ভারতের মতো ধর্মসহিষ্ণুতা আর কোথাও নেই; কেবল বর্তমানে নয়, অতীতেও, নচেৎ কয়েকশত বৎসর ধরে ভারতের গভীর অভ্যন্তরে ঢুকে নিরুপদ্রবে মিশনারিদের পক্ষে (পরধর্মনিন্দা-সহ) ধর্মপ্রচার করা সম্ভব হত না। ওয়েলডন-সম্বন্ধে ঘৃণার সঙ্গে সম্পাদক লিখেছিলেন, পৃথিবীতে ধর্ম-রাজনীতিকের তুল্য বজ্জাত আর কেউ নয়।১১ এই পত্রিকাকে স্বীকার করতে হয়েছিল, ভারতে খ্রীস্টান-সংখ্যা বাড়ার মূলে আছে বৃটিশ-শাসন।১২

৯ "Says Mr. Slater....the Christian evangelisation of India, and especially of the educated classes, is of vital importance to the influence of England in India, and to the very stability of British prestige and power."

[*Madras Christian College Magazine* ; March, 1898]

সঞ্জীবনী চীন-প্রসঙ্গে জনৈক ইংরাজের রচনা থেকে একই বিষয়ের সমর্থন পেয়েছিল :

"Writing on China, an Englishman has said that the missionaries enter foreign countries on the pretext of spreading the Gospels and thus pave the way for British dominions. So that, it is illogical to say that Christianity spreads with the spread of British rule. Rather, on the pretext of spreading the Gospels, the British acquire dominion."

[Quoted in *Bengalee ;* July 14, 1901]

১০ "To the vast majority of the people of this country,....the ecclesiastical department of the Government of India is an injustice and an anomaly.... The chief of this department [Dr. Welldon] takes it into his head to make speeches calculated to offend, if not exasperate the religious feelings of the mass of the population which pays for its unkeep. It is a time to seriously consider whether it will rot be wise, as it will certainly be economical, to dispense with a department·which an individual freak might so easily convert into an agency of dissemination of dangerous discontent in the country. Let us not be misunderstood. We do not apprehend a second Mutiny, still less a general insurrection,.... [but] we fear that it may have the effect of impairing the confidence of the more ignorant classes of the people in the good faith of the Sircar whose subordinate the Bishop is." [*Indian Social Reformer* ; July 21, 1901]

১১ "The erstwhile Headmaster of Harrow [Dr. Welldon] has descended to the level of an ecclesiastical politician. Now, in the whole history of the world, there has been a no more mischievous character than the priest-politician. 'An

হ্যারোর হেডমাস্টার ডাঃ ওয়েলডন পাণ্ডিত্য ইত্যাদির জন্য খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর ভক্তসংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত হয়ে কল্পনাতীত গোঁড়ামির পরিচয় যখন দিতে লাগলেন, তখন অনেকে তিক্তভাবে একদেহে দুই ওয়েলডনের কথা বলতে শুরু করেছিল।১৩ অমৃতবাজার খোলাখুলি বলল—মহামাননীয়া রাণীর প্রতিনিধি হয়ে ভারতে এসেছেন ভাইসরয়, আর যীশুখ্রীস্টের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন ডাঃ ওয়েলডন—দুজনে এদেশের শাসনভারটা ভাগাভাগি করে বহন করছেন।১৪ ডাঃ ওয়েলডন ভারতবাসীকে খ্রীস্টান হতে আহবান করেছিলেন, তাতে মরাঠা লিখেছিল (১৯০১, ১১ অগস্ট): এই ধর্মদ্রোহিতার কথাটা ওয়েলডন উচ্চারণ করতে পেরেছেন ধর্মের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় নেই বলেই। আর সেটাই স্বাভাবিক। অবতারতত্ত্ব ভারতই ভাল বোঝে, অন্যত্র বোঝে না, তার প্রমাণ, খ্রীস্ট-অবতারকে পেরেক ঠুকে মেরে ফেলেছে তারা। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে খ্রীস্ট অপরের পাপ নিয়েছেন?—রাম কহো! অজ্ঞান মানুষরা জানে না যে, সবকিছুই হয় কর্মফলে।

বিশপ ওয়েলডন ধারণা করে ফেলেছিলেন—ভাল-মতো মিশনারি-পাঠানো হয়নি বলেই ভারত খ্রীস্টান হয়ে পড়েনি (বেঙ্গলী, ১৯০১, ২৮ জুলাই), সুতরাং এখন একমাত্র কাজ—ভারতকে মিশনারি দিয়ে ভাসিয়ে দাও (ঐ, ১৯০১, ৮ নভেম্বর)। ভারতকে যদি খ্রীস্টান না করে ফেলা হয়, তাহলে সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ, কেননা নেটিভ খ্রীস্টান ছাড়া ভারতে কেউ লয়্যাল নয়। শেষ [সত্য?] কথাটি বলে বিশপ ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন, দলে-দলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রাজকর্মচারী আপত্তি জানালেন, ভারত-সরকারের পক্ষেও প্রতিবাদ জানানো হল১৫ এবং কম প্রতিবাদ এল না, যখন তিনি বললেন, ভারতে সেকুলার শিক্ষা-

ant,' Bacon has said, 'is a shrewd thing in a garden,' and so is a priest in politics. Speaking of conversion of Indians to Christianity, Bishop Welldon is reported to have said: 'Not only does the conversion mean that the natives stand in a near relation of sympathy to their rulers, but it means that if the non-Christian religions of India were to get the upper hand, the lives of the Christians in India would not be worth a very long purchase'.

"The Bishop's object evidently is to make out that the evangelisation of India is even more a political than a religious necessity. Christianity means the British flag, and therefore, on the principle of mutual support the British Government should support the missionary movement in India."

[*Indian Social Reformer*; July 7, 1901]

১২ "Native Christian talent is better appreciated and finds an easier mart in an age when Christianity is the religion of the ruler. There is no gainsaying, we believe, that Christianity owes not a little of its proselytising success to the political fact that the Government is composed of its followers."

[*Ibid.*, April 30, 1899]

১৩ বেঙ্গলী ১৯০১, ১৮ অক্টোবর ক্যাপিটাল পত্রিকা থেকে *Two Dr. Welldons* নামক রচনাটির অংশ তুলেছিল। একই কাগজ ১৯০১, ৮ নভেম্বর ডাঃ ওয়েলডনের চরিত্রের মধ্যে বিপরীত গুণ-সমাবেশ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের মন্তব্য উৎকলন করে।

১৪ "He [Dr. Welldon] is a friend of the Viceroy; and they have come together to rule India, one as the representative of the Queen, the other as the representative of Jesus Christ. Dr. Welldon declared that the duty of England was to make India Christian, and he really obtained a pledge from Lord George Hamilton to be allowed a free hand in regard to the propagation of Christianity."

[*Amrita Bazar*; Feb. 8, 1899]

১৫ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার অ্যান্টনি ম্যাকডোনেল বলেন (লণ্ডন টাইমসে

ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে, সুতরাং সর্বত্র বাইবেল আবশ্যিক পাঠ্য করো। মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর এবং দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ ডানকান পর্যন্ত ডাঃ ওয়েলডনের মতের প্রতিবাদ না করে পারলেন না।১৬

ডাঃ ওয়েলডন যদিও ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু মানুষটি আদিতে শিক্ষক বলে পেশাদার রাজনৈতিকের মতো ভাবগোপন করতে পারেন নি। তাই সমালোচনার ঝড়ের মধ্যে তাঁকে ভারত ত্যাগ করে চলে যেতে হয় কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই—অজুহাত অসুস্থতা। মডারেট বেঙ্গলী, তার পক্ষে অপরিচিত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, বিশপের কথা ও কাজে ফাঁক দেখিয়ে দিয়েছিল (১৯০২, ১৮ জানুয়ারি): একদা ইনি মহা বীরত্বের সঙ্গে বলেছিলেন, বিদেশে মন্দ আবহাওয়ার মধ্যে মিশনারিদের মরাও ভাল, কিন্তু তারা যেন কাজ ছেড়ে না চলে আসে—সেই একই ব্যক্তি কাজ ছেড়ে পালালেন স্বাস্থ্যের কারণে! বেঙ্গলী বিশপের সস্তার চোখের জল নিয়েও বিদ্রূপ করেছিল (১৯০১, ৩১ অক্টোবর): "ব্রাইটনে সম্প্রতি-প্রদত্ত এক সারমনে তিনি ভারতে নেটিভ-পাড়ার দৃশ্যের কথা স্মরণ করে চোখের জল ফেলেছেন। ঢোল পেটাতে দেখলে তাঁর কোমল হৃদয় ব্যথায় ধক্-ধক্ করে, বলির পাঁঠা দেখলে চোখে জল ঝরে, মড়া নিয়ে যাচ্ছে শবযাত্রীরা, দেখে তাঁর হৃদয় পুড়ে যায় লজ্জা আর মনস্তাপে। বিশপের এই কথা শোনার পরে জানতে বড়ই ইচ্ছা যায়, ইউরোপীয়-পাড়া, বিশেষতঃ পার্বত্যনিবাসে তাদের আস্তানা দেখলে তাঁর মনে কোন্ প্রতিক্রিয়া হয়? উনি তো দাবি করেছেন—কোয়েটা থেকে ক্যালকাটা, সিমলা থেকে তুতিকোরিন—সব জায়গার মনুষ্যসমাজকে চেনেন।" বিশপের অধীনস্থ মিশনারিদের দিকেও এই পত্রিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল (১৯০১, ৮ নভেম্বর): "ভারতে খ্রীস্টান মিশনারিদের কাজকর্ম অল্পই। মাঠের পদ্মফুলটির মতো তাঁরা ফুটে থেকেই খালাস। মর্ত্যে দেবদূতদের আগমনের মতোই কালে-ভদ্রে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। আর তাদের পাবার জন্য মিশনারিরা তাঁদের সবচেয়ে প্রভাবশালী বন্ধু দুর্ভিক্ষের সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করেন। ভারতে যত লোক খ্রীস্টান হয়েছে, মনে হয়, তার সাড়ে নিরানব্বই ভাগ দুর্ভিক্ষ-খ্রীস্টান।"১৭

প্রকাশিত)—ভারতে কেবল নেটিভ ক্রীশ্চানরাই লয়্যাল, (অন্য কেউ নয়)—একথা ভারত-সরকারের মত নয়। [বেঙ্গলী, ১৯০১, ২ অগস্ট]।

১৬ ডাঃ ডানকানের অভিমত বেরিয়েছিল 'দি ইম্পিরিয়াল অ্যান্ড এশিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রিকায়, যার সারাংশ বেরোয় বেঙ্গলীতে ১৯০২, ৩১ জানুয়ারি।

অমৃতবাজারের ১৯০২, ২ জানুয়ারিতে পাই, ডানকানের মতোই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন স্যার লেপেল গ্রিফিন, স্যার চার্লস স্টিভেনস্, মিঃ পেনিংটন, মিঃ কুক ইত্যাদি। ডাঃ ওয়েলডন হুমকি দিয়ে বলেন, খ্রীস্টধর্ম না নিলে ভারত নাস্তিকতার গাড্ডায় পড়বে। তার প্রতিবাদ করেছিল অমৃত-বাজার, সোসাইটি অব আর্টস-এ প্রদত্ত মিস নোবলের [নিবেদিতা] বক্তৃতার উল্লেখ করে, যাতে মিস নোবল হিন্দুগৃহের উচ্চ নৈতিকতা ও ধার্মিকতার কথা বলেছিলেন।

১৭ শর্তাধীনে লোকসেবায় কিন্তু মিশনারিরা লজ্জিত নন। তাঁরা যে-রুটি দেন, তা খ্রীস্টের রুটিও বটে। স্বয়ং বিশপ ওয়েলডন সগর্বে বলেছিলেন, যে-মিশনারি ওষুধ দেন, তিনি ধর্মপ্রচারে সবচেয়ে সাহায্য করেন। দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন, দুর্গম খাইবার-পাসের মধ্যে মনরো নামক মিশনারি ঢুকে গিয়ে স্থানীয় লোকদের ওষুধ দেওয়ার ফলে দশ হাজার লোককে খ্রীস্ট ভজাতে পেরেছেন। বিশপের কল্পনাসমৃদ্ধ উৎসাহে জলনিষেক করে বেঙ্গলী ১৯০১, ১৪ জুলাই লিখেছিল, ওয়েলডনের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। পাদরি মনরো থাকেন খাইবার-পাসে নয়, রানাঘাটে।

কী প্রেরণায় দেশীয় লোকে খ্রীস্টান হয়, সে-বিষয়ে লর্ড কার্জনের ধারণা এই :

"As observed by Lord Curzon somewhere, 'Many a native becomes a Christian in order to get a situation as a servant or clerk, and it is not infrequently happens that a shady character will suddenly find salvation for the sake of the material advantages or protection which it may be expected to confer upon him'." [*Mahratta*; April 13, 1902]

এবং বেঙ্গলী ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে, কঠোর সতর্কবাণী-সহ দেখিয়ে দিয়েছিল—অতীতে সাম্রাজ্যবাদী খ্রীস্টানীর বরাতে কি দুর্গতি ঘটেছে। ১৯০১, ৬ জুলাইয়ের সম্পাদকীয় রচনায় এই পত্রিকা লিখেছিল, ধর্মের গোঁড়ামি একবার অধিকার করলে আর রক্ষা নেই। নচেৎ ডাঃ ওয়েলডনের মতো বিখ্যাত শিক্ষাবিৎ কি করে 'ইম্পিরিয়াল ক্রীশ্চানিটির' পতাকাবাহী হয়ে ওঠেন, যেখানে ইতিহাস-পাঠকের জানা আছে, ফার্দিনান্দ-ইসাবেলের দ্বারা গঠিত সাম্রাজ্য এই গোঁড়ামির জন্য পরে কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল, ধ্বংস হয়েছিল একই কারণে চতুর্দশ লুইয়ের সাম্রাজ্য :

"সুতরাং ইতিহাসের শিক্ষা এই—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের গাঁটছড়া বাঁধার চেষ্টা করলে তার পরিণতি সাম্রাজ্যের এবং জাতিসমূহের ধ্বংস। বিশপ ওয়েলডন উক্ত দুই পৃথক বস্তুকে পরিণীত করবার অসম্ভব চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন, যা Toma de Torquemade-এর প্রতিভা কিংবা বিখ্যাত বুর্বন রাজার লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তি সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছিল।

"ইংলণ্ডে সদ্য-প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বিশপ ওয়েলডন পরিষ্কার আলোয় তাঁর ইম্পিরিয়াল ক্রীশ্চানিটিকে খুলে দেখিয়েছেন। বিশপ ওয়েলডন সেইসকল প্রাচীন ভাবধারার পাদরিকুলের মধ্যে পড়েন, যাঁদের বিশ্বাস, খ্রীস্টধর্মের মধ্য দিয়ে না গেলে পরিত্রাণ নেই....বিশেষতঃ চার্চ অব ইংলণ্ডের মতবাদের মধ্য দিয়ে না গেলে—আর বিশপ ওয়েলডন ঐ চার্চের অন্যতম প্রিন্স। সুতরাং বিশপ ওয়েলডনের অনড় বিশ্বাস—ভারতের ত্রিশ কোটি কালা আদমী যদি তাঁর বা তাঁর ধর্মভ্রাতৃগণের পৌরোহিত্য স্বীকার না করে, তাদের উদ্ধার হবে না।... বিশপ ওয়েলডনের ধারণা—ভারতের লোকেরা বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন নয়; আনুগত্য ব্যাপারটা প্রধানতঃ রয়েছে ভারতের কালা খ্রীস্টানদের মধ্যে। একটি কালো আত্মাকে খ্রীস্টান-পালে ঢোকানো মানে ভারতের বৃটিশ-শাসনের পক্ষে একটি অনুগত কালা আদমীকে পেয়ে যাওয়া।...রাজানুগত ভারতীয় উৎপাদনের ওয়েলডনীয় ব্যবস্থাপত্র হল—কোনো একটা হিন্দু বা মুসলমানকে পাকড়াও, তার গা থেকে পুরনো ধর্মের চামড়া ছাড়িয়ে নাও, হোলি ওয়াটারে তাকে চোবাও বা উক্ত বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে তার গায়ে ঢেলে দাও, তারপর খ্রীস্টধর্ম ভজিয়ে দাও তাকে, সেইসঙ্গে অন্য কালারা তাকে শেষ করে দিতে পারে, এই ভয় তার মনে ঢুকিয়ে দাও—এইভাবে তাকে গড়ে তোলো অনুগত কালা আদমী হিসাবে।...এমন ভাবে ভারতের খ্রীস্টান মিশনগুলি দুই কর্ম একসঙ্গে করছে—খ্রীস্টের সেবা এবং সাম্রাজ্যবাদের সেবা।"

তিক্ত পরিহাসের সঙ্গে বেঙ্গলী প্রশ্ন করেছিল :

"বিশপ ওয়েলডন আমাদের জানাবেন কি—যদি ভারতবাসী আমরা সদলবলে খ্রীস্টান হয়ে পড়ি, তাহলে ইংরেজ জুরীরা তৎক্ষণাৎ ইংরেজ ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্বন্ধের কথা ভুলে গিয়ে কর্তব্যপালনে অগ্রসর হবে? কিংবা ইংরেজরা আমাদের আর নেটিভ ভাববে না—একেবারে নিজেদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দেবে? তবে খ্রীস্টের শ্বেতচর্মী অনুগামীরা যখন 'নেটিভ' ক্রীশ্চান কথাটা বলে, তখন তো ও-বিষয়ে বিশেষ ভরসার কারণ দেখি না।"

নেটিভকে খ্রীস্টান বানিয়ে সমস্তরে তুলবার কোনো বাসনা শাসক বা ধর্ম-শাসকদের ছিল না। প্রয়োজন হল, সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা, নেটিভ খ্রীস্টানরা তার সহায়ক হবে—এই ছিল মনোভাব। মরাঠা ১৯০২, ১৩ এপ্রিল লিখেছিল :

"সাম্রাজ্যবাদীরা...হিসেব করে থাকে—ভারতের প্রতিটি নেটিভ খ্রীস্টান সাম্রাজ্য-মন্দিরের এক-একটি ইস্টক-বিশেষ, যে-মন্দির থেকে রাজনৈতিক শক্তি, বিশেষাধিকার এবং লোভনীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি বিস্তারিত হচ্ছে। অধিকন্তু, খ্রীস্টধর্ম যেখানে যায়, সেখানকার সমাজ-

সংস্থাকে নাড়িয়ে আলগা করে ফেলবার ক্ষমতা সে ধরে, যা বিস্তারকামী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অমূল্য জিনিস।

"এইসব জিনিস মনশ্চক্ষে ধরে রেখে মিশনারি-সোসাইটিগুলি যথেষ্ট পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে, এবং নিরপেক্ষতার দায়বদ্ধ বৃটিশ সরকার নীরবে কিন্তু আশান্বিত কৌতূহলের সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে। বেশ ঠান্ডা মাথায় হিসেব করে কাজটা করা হচ্ছে। খ্রীস্টধর্মের বন্ধুগণ ধর্মান্তর-কারখানার উৎপাদনের মান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না, পরিমাণ নিয়েই মাথাব্যথা, কারণ তাঁদের বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত সংখ্যার জোরেই তাঁরা কাম ফতে করতে পারবেন।"১৮

১৮ দুর্ভিক্ষ-খৃীস্টানের কথা ইতিমধ্যে অনেকবার এসেছে। পরেও আসবে। বিষয়টি সংবাদপত্রে বহুল উল্লিখিত। এখানে এ-সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ ধরে দেওয়া যাক। অন্য পত্রিকার সাক্ষ্যে প্রয়োজন নেই—মিশনারি-কাগজ হার্ভেস্ট ফিল্ড ১৯০০, জুন সংখ্যায় আর্কট মিশনের বাৎসরিক রিপোর্ট ছেপেছিল, যার মধ্যে ভয়াবহ প্লেগের বর্ণনাসহ ঐ সুযোগে খৃীস্টান করার বিবরণ ছিল। তাতে পাই, ২০২ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৩৫০ জন শিশুকে ব্যাপটাইজ্ করা হয়েছে। ঐ রিপোর্টে অবশ্য দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করা হয়, এতৎসত্ত্বেও ঐ বৎসর মোট খৃীস্টানের সংখ্যা বাড়েনি কারণ অনেকেই হিন্দুধর্মে ফিরে গেছে। ৫০০ জন লোক সরে পড়েছে, গোটা-গোটা পরিবার পুতুলপুজোয় আবার লেগে পড়েছে—এমন সংবাদ ওর মধ্যে ছিল।

স্বামীজী আমেরিকায় থাকাকালে দুর্ভিক্ষ-খৃীস্টানের কথা বলেছিলেন। তাঁকে সমর্থন করে লাহোর ট্রিবিউন ১৮৯৪, ২১ জুলাই লেখে,

"This just remark has awakened many Christians in America to the sense of the utter unworthiness of the method of proselytism, followed by Christian missionaries in India."

মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকা দুর্ভিক্ষ-খৃীস্টানের সংবাদ ছাপলে জনৈক মিশনারি তার প্রতিবাদ করেন। হিন্দু মুখের মতো উত্তর দেয় খৃীস্টান পত্রিকা হার্ভেস্ট ফিল্ডের স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করে ঃ

"We do not know if our [missionary] correspondent has been a reader of the missionary journal, *The Harvest Field*, for any considerable time. If he has been, he should have noticed a series of letters,....from the pen....of the Rev. W. W. Holdsworth, M.A., justifying the conduct of the missionaries in making famine-stricken people Christians before rendering them any help. Nor is this the only piece of evidence to offer. Some amount of sensation was caused by the publication, not long ago, of a letter written by a missionary lady, working in the Central Provinces during the last famine, offering thanks to God for the 'spiritual harvest' yielded her by the famine.... There are whole villages of Christians in Southern India. But in no case was the wholesale conversion a matter of choice, so far as our information goes, either baptism went hand in hand with offer of rice doles or it came so soon after them that the people who received them had little time to realise the debt they owed to their benefactors. With them it was a choice between Christianity and a horrible death by starvation." [*Hindu*; April 21, 1899]

দুর্ভিক্ষ এলেই বহু মিশনারির মনে স্বর্গীয় (কিংবা নারকীয়) উল্লাস দেখা দিত। অমৃতবাজার ১৮৯৭, ২৬ ফেব্রুয়ারি সম্পাদকীয় রচনায় ঐ রকম এক মিশনারি-স্ফূর্তির সংবাদ দিয়েছিল ঃ

"The famine is a windfall for the missionaries, and the mad priest at Bombay only echoed the general missionary feeling when he said that it was visitation from Heaven for the purpose of converting the heathens."

ঝাঁসিতে দুর্ভিক্ষের সুযোগে মিশনারিরা ঝেঁটিয়ে খৃীস্টান করতে থাকায় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা পায়োনীয়ার পর্যন্ত আপত্তি করতে বাধ্য হয়। সেই সূত্রে অমৃতবাজারের ঐ সম্পাদকীয়, যার মধ্যে সে বলেছিল ঃ "তরবারি এবং কোরানের মধ্যে একটিকে বাছতে বলা যেমন অন্যায়, তেমনি অন্যায়—অনাহার বা খৃীস্টধর্ম, এর কোনো একটিকে বাছতে বলা। যে-অনাথের কোনো সংস্থান নেই,

সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মান্তরের প্রশ্নকে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা যখন মিশনারি ও সরকারী-মহলে দেখা গেল, তখন শিক্ষিত ভারতবাসীর মনোভাব কী দাঁড়িয়েছিল বোঝাই যায়। উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারীদের প্রাণের কথা মাঝে-মাঝেই বেরিয়ে পড়ে এদেশবাসীকে সচকিত করে তুলছিল। টি এ এইচ ওয়ে নামক জনৈক আই-সি-এস অফিসার প্রকাশ্য বক্তৃতায় বললেন, "ভারত যতদিন না খ্রীস্টান হচ্ছে, স্বাধীনতার যোগ্যই হবে না।" (হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৮৯৬, ৪ ফেব্রুয়ারি)। অসহায় ক্রোধের সঙ্গে এদেশের মানুষকে দেখতে হয়েছিল—কিভাবে তাদেরই খরচে তাদের ধর্ম কেড়ে নেওয়ার আয়োজন চলেছে। বোম্বাইয়ের কাইজার-ই-হিন্দ্-এর মতো নিতান্ত রাজভক্ত পার্শী কাগজ ১৮৯৬, ১৪ জুন *The Burden of Christianity* নামক সম্পাদকীয় রচনায় এ-সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য না করে পারেনি। ভারতের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য লণ্ডনে কমিশন বসেছিল, সেইসূত্রে এই পত্রিকা লেখে :

"আর্থিক ব্যাপারে ভারতীয়দের প্রধানতম অসন্তোষের একটি বিষয় বিশেষভাবে ওখানে আলোচিত হওয়া উচিত—ভারতে 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম'-সংক্রান্ত খরচের প্রশ্নটি। খাঁটি অর্থে ভারতে কোনো 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' নেই। তবে শাসকবর্গের খ্রীস্টধর্ম নামক ব্যাপারটি আছে বটে, যা হীদেনদের টাকা খেয়ে বেঁচে আছে। প্রসঙ্গটি ঠিক সময়ে উত্থাপন করেছে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা। আমাদের বিশ্বাস জনসাধারণ এবং সংবাদপত্রগুলি এ-বিষয়ে মনোযোগী হয়ে, ভারতের সবচেয়ে বীভৎস একটি আর্থিক ক্ষতের চেহারাকে খুলে দেখিয়ে দেবে। 'টাকা টাকা' করে ভারত-সরকার সর্বদাই চেঁচাচ্ছেন।...টাকার অভাবেই জনকল্যাণের সদিচ্ছাকে তাঁরা কার্যকর করতে পারছেন না।...ভারতীয়দের উপর অনুচিত প্রচণ্ড করভার চেপেছে, প্রাণান্তকর অবস্থা।...হতভাগ্য করদাতারা আর অধিক রক্তপাতের অবস্থায় নেই।... করদাতাদের কষ্টার্জিত অর্থকে আপত্তিকর যেসব উপায়ে শাসকেরা ব্যবহার করছে, আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। অন্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এখন সরকার কর্তৃক খ্রীস্ট-ধর্মসংস্থার ভরণপোষণের প্রসঙ্গটি তুলে ধরা যাক। প্রশ্ন করা যাক—মিউটিনির পরে, এই সংস্থাকে বজায় রাখতে সরকারের, ঠিকভাবে বলতে গেলে জনসাধারণের, কত টাকা খরচ হয়েছে? টাকার পরিমাণ শুনলে চোখ কপালে উঠে যাবে। কারণ হিসেব করে দেখা গেছে, আমাদের দেশবাসী এক কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ডের উপর ব্যয় করেছে এই জন্য যে—ভারতে কর্মরত মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ মনুষ্য যাতে খ্রীস্টধর্মের সাপ্তাহিক ডোজ থেকে বঞ্চিত না হন—যা ইংলণ্ডে থাকাকালে প্রতি রবিবার তাঁদের কণ্ঠে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়!! অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার—শুনলে শিউরে উঠতে হয়। অত্যন্ত নির্যাতিত, দারুণভাবে করপীড়িত জনসাধারণের অর্থের

তাকে আশ্রয় দেবার নাম করে খ্রীস্টান করে ফেলার পদ্ধতি—বিচার, বিবেক, পৌরুষ, নীতিবোধ সমস্ত-কিছুর বিরোধী। যদি কোনো হিন্দু এর প্রতিবাদ না করেও, এই লজ্জাজনক নীচতার প্রতিবাদে খ্রীস্টানদের এগিয়ে আসা উচিত।"

দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষে যখন পঞ্চাশ লক্ষ লোক মারা যায় তখন সরকার একটি দুর্ভিক্ষ-কমিশন গঠন করেন, যার সুপারিশ পার্লামেণ্ট মেনে নেয়। তার মধ্যে দুর্ভিক্ষে অনাথ শিশুদের প্রসঙ্গটি ছিল। কমিশন বলেছিল, দুর্ভিক্ষকালে অজস্র অনাথ শিশু সরকারের হাতে এসে পড়ে, যাদের পূর্বে তুলে দেওয়া হত মিশনারিদের হাতে—শিশুদের তারা খ্রীস্টান করে ফেলত। কিন্তু ওটা অনুচিত কাজ। প্রথমতঃ চেষ্টা করতে হবে, ঐসব শিশুরা যাতে স্বধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে উপযুক্ত আশ্রয় পায়। যারা সে-রকম আশ্রয় পাবে না, তাদের রক্ষণারেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং সরকারের—মিশনারিদের নয়।

"The Famine Commissioners, it will be seen, discussed and settled the 'proselytism' question. They were as anxious as any Hindu or Mussalman could be, that 'the State should not take advantage of the helpless position of such orphan to encourage proselytism'. Nay, they went further and insisted that 'it (the state) is bound to make the provision for their moral and physical welfare'."

এই নির্লজ্জ অপব্যয়ের সমর্থনে কোনো ন্যায়-নীতি দেখাতে সরকার সমর্থ নন। ভারতীয় আমরা—খ্রীস্টধর্মে আমাদের কী প্রয়োজন, বিশেষত শাসকদের খ্রীস্টধর্মে? ওতে আমাদের লাভ কি? ওটা যদি কেবল ইংরেজদের প্রয়োজনের ব্যাপার হয়, খরচটা তারাই করুক না কেন—আমাদের কি দায়? পরাধীন দেশের শাসকেরা পরাধীন লোকের টাকায় ভোগে-সুখে থাকবে—প্রত্যেক পরাজিত জাতির এই দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা—পৃথিবীর চারদিকে তাকালে তাই দেখি। সুতরাং ও-ব্যাপারে আমরা গজ্‌গজ্‌ করতে পারব না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, নীচতার একটা পর্যায়ের সামনে গিয়ে অন্ততঃ ভদ্রতা থমকে দাঁড়ায়। এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায়, গ্রেট ব্রিটেনের মতো একটা দেশের পক্ষে ভারতের কাছ থেকে ইংলিশ চার্চের ভরণপোষণের খরচ আদায় করা অত্যন্ত নীচতার কাজ, যখন ভারতবাসী ধর্মে খ্রীস্টান নয়, পরন্তু নিজ ধর্মে সম্পূর্ণ সুখী।"১৯

রাজনীতির সঙ্গে খ্রীস্টধর্মকে কিভাবে জুড়ে দিয়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে, তার ইতিহাসের কিছু অংশের সঙ্গে পরিচিত হবার পরে আমরা বুঝতেই পারি—ঐ পথে বাধা সৃষ্টি করে বিবেকানন্দ মিশনারিদের কাছে কোন্‌ অক্ষমণীয় অপরাধ করেছিলেন। বিবেকানন্দ নিজেকে রাজনীতিতে জড়াতে চান নি, কিন্তু রাজনীতির বড় কাজটা তিনি করে ফেলেছিলেন—সৃষ্টি করেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তা। কিভাবে সে-কাজ করেছিলেন, সমসাময়িক ইতিহাস থেকে তা তথ্যসহ দেখিয়েছি। ব্যাপারটা পরবর্তী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়ায় নি। ঐতিহাসিক-প্রধান ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারই কেবল বিবেকানন্দকে ভারতীয় জাতীয়তার জনক-রূপে নির্দেশ করেন নি, কে এম পানিক্কর ও অন্যান্যরাও তা করেছেন। বিবেকানন্দের জাতীয়তা সংকীর্ণ প্রয়োজনে সৃষ্ট রাজনৈতিক জাতীয়তার থেকে কোন্‌ অর্থে বৃহত্তর ও মহত্তর, তা পাণিক্কর অনবদ্যভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"বিদেশী শাসনাধীনে থাকার ফলে যে-রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়, তা কিন্তু ভারতকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারত না। ৪০০ বছরের উপর অটোম্যান শাসনের অধীনে ছিল বলকান-অঞ্চল, ভারতের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র আকার তার, তবু ঊনবিংশ শতাব্দে দেখা গেল তা অখণ্ড রইল না। ভারতীয় জাতীয়তাকে প্রাণশক্তি ও গতিশীলতা দিয়েছে এবং শেষপর্যন্ত অন্ততঃ তার বৃহৎ অংশকে এক-রাষ্ট্ররূপে গ্রথিত

১৯ ধীর-স্থির 'হিন্দু'ও কি যথেষ্ট তিক্ত কণ্ঠে এ-সম্পর্কে লেখেনি? ১৮৯৪, ১৯ ফেব্রুয়ারির সম্পাদকীয়তে সে লেখে ঃ

"এটা কি স্থায়ী অবিচার এবং লজ্জার ও অমর্যাদার বিষয় নয় যে, ক্রীশ্চান যাজকদের একটি প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান করদাতাদের টাকায় চলে? এবং আরও লজ্জার বিষয় নয় কি যে, চার্চ এমন একটি সরকারের কাছ থেকে টাকা খাচ্ছে, যে-সরকার ঋণে ডুবে আছে, এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একেবারে অত্যাবশ্যক জিনিসের উপর ট্যাক্স বসাচ্ছে?" "আদিকাল থেকে ক্রীশ্চান চার্চ সরকারের সাহায্যে বিস্তারলাভ করেছে—সরকারের বাহু প্রসারিত হয়েছে খ্রীস্টধর্মের বিস্তারে। তথাপি খ্রীস্টান পত্রিকাটি ঘোষণা করেছে—কয়েকজন গোঁড়া ধর্মান্ধ হিন্দু কি-একটা মামলা আদালতে নিয়ে গেছে, সেটা হিন্দুধর্মের অপমানের বিষয়! শ্রীরঙ্গমের মন্দির অন্ততঃ নিজ ধর্মের বাইরের লোকের টাকায় চলে না—তা কোনো মুসলমান কি খ্রীস্টানের তহবিল ফাঁক করছে না।" "দেশীয় খ্রীস্টান যেমন জঘন্যভাবে হিন্দুধর্মের নিন্দা করে, হিন্দু যদি সে-ভাবে খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে কথা না বলে, তার মানে নয় সে খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে, তার মানে, হিন্দুরা গভীরভাবে বিশ্বাস করে, সে-রকম বিশ্বাস কেবল হিন্দুরাই করতে পারে—যেহেতু প্রত্যেক ধর্মকে সেই ধর্মাবলম্বীরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাই তাদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ সহিষ্ণুতার মনোভাব রাখা উচিত। নচেৎ পবিত্র কুমারীর সন্তানতত্ত্ব—হনুমানের লাফ দিয়ে সমুদ্রপারে গমনের চেয়ে কম উদ্ভট নয়, কিংবা, মারা যাবার পরে মৃতের পুনরুত্থান, কারো উপরে চিরযৌবনের বরদানের মতোই সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ব্যাপার।"

করেছে হিন্দুদের মধ্যে অখণ্ডতাবোধ—সে-জিনিস বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দের সৃষ্টি। এই নূতন শঙ্করাচার্য সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে হিন্দু-ধর্মধারণাগুলিকে অখণ্ডভাবে গ্রথিত করে গেছেন। তিনি কেবল হিন্দুচেতনার উদ্বোধন করেছিলেন তাই নয়, হিন্দুর পুনর্জাগরণের পটভূমিকায় বেদান্তের সর্বজনীন সত্যকে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর পূর্বে যে-সব হিন্দু-আন্দোলন হয়েছিল, তারা সবাই স্থানীয় ও সাম্প্রদায়িক—সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি। আর্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, দেবসমাজ, প্রভৃতি আন্দোলন নিজস্ব-ভাবে খুবই মূল্যবান, কিন্তু তারা একইসঙ্গে সংস্কার-আন্দোলনের প্রাদেশিক চরিত্রকে উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল। বিবেকানন্দই প্রথম হিন্দু-আন্দোলনকে তার জাতীয়তার চেতনা দিলেন এবং পরবর্তী সকল আন্দোলনের মধ্যে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত করলেন।" [অ]২০

ভারতীয় জনজীবনে স্বামীজীর প্রভাব বিস্তারিত হয়ে যাবার পরে, কালব্যবধানে দাঁড়িয়ে, ঐতিহাসিক পাণিক্কর যে-বিচারমূলক সিদ্ধান্ত করেছেন, বিস্ময়ের কথা, কার্যতঃ সেই একই সিদ্ধান্ত করেছিলেন স্বামীজীর আন্দোলনে আকৃষ্ট জনৈক আমেরিকান—আন্দোলনের সূচনাপর্বের মধ্যেই! আমেরিকার 'কেমব্রিজ কনফারেন্সের ডিরেক্টর' ডাঃ লুইস জি জেনস 'সায়েন্স, মেটাফিজিক্স অ্যান্ড ন্যাচারাল ল' নামক রচনায় (প্রবুদ্ধ ভারতে ১৮৯৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় উদ্ধৃত) যে-সব কথা বলেছিলেন, তার অংশ এই ঃ

"দার্শনিক চিন্তার আবাসগৃহ ভারতবর্ষে বর্তমানে অতি অসাধারণ এক আন্দোলন চলেছে। বার-চৌদ্দ বছর আগেও ভারতের শিক্ষিত তরুণেরা প্রধানতঃ অজ্ঞেয়বাদী ও জড়বাদী দর্শনে ডুবে ছিল। খ্রীস্টধর্ম প্রাদুর্ভূত হবার আগে রোম-সাম্রাজ্যের নগরগুলিতে যে-ধরনের মনোভঙ্গি ছিল, সেই একই মানস-পরিস্থিতি এখানেও—প্রাচীন বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রখর সংশয় কিন্তু খ্রীস্টধর্ম কিংবা অন্য কোনোপ্রকার ধর্মধারণা সম্বন্ধে স্পষ্ট লক্ষণীয় আসক্তিও অনুপস্থিত। আজ সেই ভারতে শ্মশান থেকে উত্থিত হচ্ছে বেদান্ত, হাতে আগামী শতাব্দীর জন্য আলোকের মশাল; চিন্তাশীল হিন্দুদের হৃদয়-মন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সে নূতনভাবে স্পর্শ করেছে। এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ পরিধির নয়, যেমন ছিল এক কি দুই দশক আগেকার আন্দোলনগুলি—আর্যসমাজ বা ব্রাহ্মসমাজের মতো সামান্য সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ। এ আন্দোলন সমগ্র জনগণের। প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তারই পুনরুত্থান ঘটেছে—এবং বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অপর ধর্মমত-সমূহের শ্রেষ্ঠবস্তুর দিকে।...এই দেশে (আমেরিকায়) তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের উচ্চারিত অনবদ্য বাণী—প্রতিধ্বনিত ও সোল্লাসে অভ্যর্থিত হয়েছে জাতি-বর্ণনির্বিশেষে বিপুলসংখ্যক মানুষের দ্বারা—কলকাতার টাউন-হলে, মাদ্রাজে, এবং বৃটিশ-ভারতের অন্যান্য অংশে। [না, তৎসহ দেশীয় রাজ্যেও]। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে বিবেকানন্দ জনতার উদ্দীপ্ত অভিনন্দন পেয়েছেন। স্বদেশে তিনি শিক্ষামূলক আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছেন, যার দ্বারা দূরপ্রসারী কল্যাণ সাধিত হবে।

"এক কি দু'বছর আগে আমার সঙ্গে একজন হিন্দু ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ হয়—তিনি বাণিজ্য ও শিল্প-সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য এখানে এসেছিলেন। যখন জানলাম, তিনি বিবেকানন্দের কথা জানেন, যদিও তাঁর বাসস্থান থেকে বহুদূরে থাকেন—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে এবং আমেরিকায় তাঁর কার্যাবলী সম্বন্ধে ভারতে সাধারণভাবে

২০ পাণিক্কর তাঁর *The Determining Period of Indian History* গ্রন্থে এই মন্তব্য করেছেন। উদ্বোধন শতবার্ষিকী সংখ্যায় (১৯৬৩) শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ থেকে মন্তব্যটি উৎকলন করেছি।

কতখানি জানা আছে? সোৎসাহে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার ধারণা, সব হিন্দুই বিবেকানন্দের কথা জানে।' এই নূতন আন্দোলনের সাহিত্য ইতিমধ্যেই বিপুলাকার ধারণা করেছে। লেখকদের মধ্যে আছেন উদার সংস্কৃতিসম্পন্ন ও সামর্থ্যসম্পন্ন ভারতীয় পণ্ডিতগণ এবং সেইসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের মতো ইউরোপীয় পণ্ডিত। এই আন্দোলন যে, প্রতিক্রিয়াশীল নয়, পরন্তু প্রগতিমুখে ক্রমবিকশিত—প্রাচীন দর্শনকে নবযুগের উপযোগী আকারে স্বীকরণের প্রয়াস—তা বোঝা যায় তার এই সত্য স্বীকারের লক্ষণীয় শক্তিতে : 'পাশ্চাত্ত্যসভ্যতারও কিছু মূল্য আছে প্রাচ্যসভ্যতার কাছে, যেমন আছে প্রাচ্যসভ্যতার মূল্য পাশ্চাত্ত্যের কাছে।' ভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়েছে। ভারতের ভূমি ত্যাগ করে সমুদ্রপারে যাত্রা সম্বন্ধে স্মরণাতীত কাল ধরে হিন্দুদের মধ্যে যে-কুসংস্কার বর্তমান ছিল, তার শক্তি ইতিমধ্যেই হ্রাস পেয়েছে। এখন পাঁচশোর বেশি ভারতীয় ইংলণ্ড রয়েছে, আমাদের এখানেও তারা বিরলদৃশ্য নয়। এই যোগাযোগের দ্বারা, (যার পরিমাণ বৎসরে-বৎসরে বাড়বে) বিজ্ঞান এবং ঐহিক অগ্রগতি মিলিত হবে নূতন আধ্যাত্মিক জাগরণের আশাপ্রদ দর্শনের সঙ্গে—এবং দুই গোলার্ধ একত্র হবে সর্বজনীন মানবভ্রাতৃত্বের উচ্চতর জীবনবোধে।"

॥ ৩ ॥

ইতিমধ্যেই আমরা 'ভারতে নবজাগরণ' অধ্যায়ে ঐ নবজাগরণের মিশনারি-স্বীকৃতি সম্বন্ধে অনেক সংবাদ তুলেছি। 'কিছু অসুখী ব্যক্তি' অধ্যায়ে—আমেরিকায় মিশনারি-চাঞ্চল্য এবং বিবেকানন্দকে চূর্ণ করার প্রচেষ্টার কাহিনীও দেখেছি। ভারতের ক্ষেত্রে সেই একই চেষ্টার ইতিহাসে যখন আমরা প্রবেশ করেছি, তখন ভারতে হিন্দু-পুনরুত্থানে মিশনারি-প্রচেষ্টা কতখানি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তার সংবাদ পরিবেশন করা প্রয়োজন। আমরা দেখতে পাব, একাদিকে বিক্ষিপ্তচিত্তে এই উত্থানের প্রভাব স্বীকার করছেন মিশনারিরা, বিষাদের সঙ্গে জানাচ্ছেন, তাঁদের টাকার অভাবের কথা, চার্চে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার কথা, সেইসঙ্গে বলছেন—ধর্মান্তর ক্রমেই অত্যন্ত কঠিন, কার্যতঃ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শেষোক্ত প্রসঙ্গটি নানাপ্রকার কারণের সঙ্গে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং অবস্থার মোকাবিলার জন্য কনফারেন্সের পর কনফারেন্স বসেছে—সর্বত্রই নৈরাশ্যের সুর। আমেরিকা বা ইংলণ্ডের সম্মেলনগুলিতে বীরভাব বজায় রাখার চেষ্টা করা হলেও, ভারতের শক্তিহারী বিশ্রী আবহাওয়ায় তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। লণ্ডনে আই-এম-এস কনভেনশনের এক বিবরণ দিয়েছিল বোম্বে গার্ডিয়ান ১৮৯৫, ২৬ অক্টোবর সংখ্যায়, তার অংশ :

"ভারতের কয়েকজন মিশনারি বলেন, ভারত 'ভবিষ্যতের বিরাট সংগ্রামক্ষেত্র।' জনগণের প্রাচীন বিশ্বাস ক্রমে বদলে গেলেও বিশুদ্ধ গস্‌পেলের প্রতি বিরোধিতা কিভাবে সেখানে পূর্ববৎ প্রবল আকারে বর্তমান আছে, তা তাঁরা বর্ণনা করেন। সালেমের রেভাঃ ডবলিউ রবিনসন বলেন, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সভ্যতার আনুষঙ্গিক জিনিস জাতিপ্রথা ভাঙতে পারে নি। জাতিপ্রথা ভেঙে গেছে বলা নিতান্ত আহাম্মকি। ওকে ভাঙতে পারে একমাত্র যীশুখ্রীস্টের গস্‌পেল। বেলারীর রেভাঃ এডউইন লুইস বলেন, হিন্দুধর্ম ভেঙে পড়ছে, এমন ধারণা তাঁর নয়। ভারতে অনেক জায়গায় সুবিধামতো গেড়ে বসতে হবে, কেননা অনেক দুর্গ অধিকার করতে হবে। হিন্দুরা প্রাচীন ধর্মকে রক্ষা করার প্রচণ্ড চেষ্টা করছে। ভারতে মিশনারিদের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুতর বাধা দিচ্ছে তরুণ ভারতের শক্তিশালী, প্রাগসর, সংস্কারবাদীরা। তারা মিশনারিদের বিরোধী নয়। কোনো-কোনো দিকে তারা মিশনারি-কাজে সহানুভূতিসম্পন্ন—কিন্তু তাদের খ্রীস্টান হবার অভিপ্রায় নেই। এই লোক-

গুলিই যুদ্ধের সম্মুখ-সারিতে এগিয়ে এসে সেই দুর্গগুলিকে অধিকার করে রেখেছে, যে-গুলি জয় করার কথা মিশনারিদের। সুতরাং ইংলণ্ডের চার্চের সর্বোচ্চ সৃষ্টিগুলিকে—অত্যুত্তম যাদের প্রতিভা, নিবেদিত যাদের বুদ্ধি, হোলি গোস্টের দ্বারা সম্পূর্ণ অধিকৃত যারা—তাদের পাঠাতে হবে ভারতে।"

এই সংবাদের সঙ্গে বোম্বে গার্ডিয়ান জানিয়েছিল, কলকাতায় যদিও হিন্দু-উত্থানের নিদর্শন তেমন লক্ষণীয় নয়, কিন্তু বোম্বাইয়ে চলেছে দারুণ রিভাইভ্যাল। সেখানে খোলা জায়গায় খ্রীস্টানী প্রচারের সময়ে চেঁচিয়ে দুয়ো দেওয়া হচ্ছে, ইঁট-পাটকেলও কখনো-সখনো ছোঁড়া হচ্ছে। প্রকাশ্যে পরধর্মের কুৎসা করার অখণ্ড সুবিধা হারিয়ে গভীর বিমর্ষতার সঙ্গে এই পত্রিকা লিখেছিল--হায়, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানেরাই কেবল ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে, খ্রীস্টানেরা নয়।

ইংলণ্ডে অ্যাংলিকান কমিউনিয়নের আর এক সম্মেলনে সুবিখ্যাত ভারত-তাত্ত্বিক স্যার মনিয়ের উইলিয়মস বিদেশগত মিশনারিদের কর্তব্য সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছিলেন, তাতে তাঁর ভারতপ্রেম অবশ্যই প্রকাশিত হয়নি। মাদ্রাজ মেলে ১৮৯৪, ২০ জুন প্রকাশিত সংবাদের অংশ ঃ

"স্যার মনিয়ের উইলিয়মস ভারতে মিশনারি-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে চার্চের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি রচনা পড়েন। তার মধ্যে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মহারাণীর তিরিশ কোটি প্রজার মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষও খাঁটি খ্রীস্টান নয়, যেখানে কম পক্ষে কুড়ি কোটি লোক নিজেদের হিন্দুধর্মভুক্ত বলে। স্যার মনিয়ের প্রশ্ন করেন—[এখানকার] অনেক লোক কি সত্যই জানে, ভারতের তিন-চতুর্থাংশ লোকের এই হিন্দুধর্ম জিনিসটি আসলে কি? এই হিন্দুধর্ম, যা ব্রহ্মকে দেবতারূপে স্বীকার করে, দাবি করে যে, সে পৃথিবীর সকল ধর্মকে আলিঙ্গন করে আছে, খ্রীস্টধর্মকেও। তার বিশ্বাস—খ্রীস্টধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি রূপ, কেবল তা পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারার উপযোগী করে গঠিত। এই ধারণাকে সজোরে অগ্রাহ্য করার পরে অবশ্য স্যার মনিয়ের বিশেষভাবে বলেন, তাই বলে মিশনারিরা যেন যে-ধর্ম থেকে লোককে ধর্মান্তরিত করতে চান, তার বিষয়ে গালমন্দ না করেন। হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থ ভিতর থেকে বুঝে নিয়ে এমনভাবে তার সম্মুখীন হওয়া দরকার যাতে তার জায়গায় খ্রীস্টধর্মকে বসিয়ে দেওয়া যায়।"

আমেরিকায় ডাঃ বারোজের নেতৃত্বে একই ধরনের কনফারেন্স বসেছিল, সে-প্রসঙ্গ পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হবে, এখানে আমেরিকার আর একটি কনফারেন্সের কথা বলছি, যেখানেও ডাঃ বারোজ উপস্থিত থেকে বক্তৃতাদি করেছিলেন। নিউইয়র্কের এই ইকুমেনিক্যাল কনফারেন্সে (প্রবুদ্ধ ভারতে ১৯০০ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর সংখ্যায় যার বিবরণ পেয়েছি) ধর্মীয় উদ্দীপনার নির্ঘোষের সঙ্গে কিছু অগত্যা-স্বীকৃতিও ছিল। "মানবসমাজের অপর সকল ধর্মমতকে পদদলিত করবার খ্রীস্টানী গোঁড়ামি" প্রচণ্ডভাবে মুখব্যাদান করেছিল এখানে—প্রাচ্যের এক মিশনারির কণ্ঠে সদর্পে ঘোষিত হয়েছিল—"বাইবেলই সবচেয়ে বড় মিশনারি।" একটি আমেরিকান পত্রিকা নিষ্ঠুরভাবে এই প্রশ্ন করেছিল ঃ

"বাইবেল সবচেয়ে বড় মিশনারি!! —অভ্রান্ত, অক্ষয়, অজর, অমর!!! কিন্তু খ্রীস্টধর্মী পণ্ডিতেরাই যে ঘোষণা করছেন, উক্ত খ্রীস্টীয় শাস্ত্র ভুলে ভর্তি! তাহলে এই 'সর্বশ্রেষ্ঠ মিশনারির' কি দশা দাঁড়াচ্ছে? স্মরণ রাখতে হবে, খ্রীস্টীয় পণ্ডিতদের এই [হায়ার] ক্রিটিসিজ্‌মের ব্যাপারটি ইতিমধ্যেই শিক্ষিত হীদেন-জগতে জানা হয়ে গেছে। বৌদ্ধ এবং মুসলমানেরা জিজ্ঞাসা করতে পারে, 'কি করে আমাদের ধর্মের জায়গায় তোমরা তোমাদের ধর্ম বসাতে পারো যখন তোমাদের খ্রীস্টান-জগতের পণ্ডিতেরাই তোমাদের ধর্মের ঐশ্বরিক অধিকারের দাবিকে নস্যাৎ করছেন?' বস্তুতঃপক্ষে মিশনারি-আন্দোলনের সবচেয়ে বড় যে-

শত্রু পিছন থেকে আক্রমণ করছে সে হল—'ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মিশনারি বাইবেলের' বিরুদ্ধে ঐ [হায়ার] ক্রিটিসিজম।"২১

পত্রিকাটি আরও বলেছিল, বাইবেল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের সমালোচনা যদি সত্য হয়, তাহলে এই যে হাজার-হাজার বই অনুবাদ করে বিভিন্ন ভাষায় ছাপা হচ্ছে—সে সবই তো মায়ার খেলা হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

আরও নানা বাধার কথা উঠেছিল। ডাঃ বারোজ স্বীকার করলেন, খ্রীস্টান-শাসনের বিকট চেহারার জন্য খ্রীস্টধর্মের প্রসার নিরুদ্ধ হয়ে গেছে। আরও বললেন, এই ধর্মের সঙ্গে কুৎসিত দুর্নীতিকতা ছড়িয়েছে। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, প্রাচ্যমুখী মদের গাড়ি, আফিমের গোলা, সরকারী কর্মচারীদের অভদ্র নিষ্ঠুর হামবড়াই ব্যবহার, জারজ-জাতির উদ্ভব—প্রাচ্যবাসীর চোখে খ্রীস্টধর্মের উৎপাদন বলে প্রতীয়মান হয়। পাশ্চাত্ত্য থেকে নাস্তিকতার রাশি-রাশি সাহিত্য গিয়েও প্রাচ্যবাসীদের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে—পাশ্চাত্ত্যে খ্রীস্টধর্ম গতায়ু। ডাঃ বারোজের এই তালিকায় ডাঃ স্পারা যোগ করে দিলেন—প্রাচ্যের মানুষ দেখেছে পাদরিরা গত শতাব্দীতে সর্বপ্রকার সংস্কার-আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে—দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা-সুদ্ধ। তাদের সাধারণের সঙ্গে যোগ নেই, গণতন্ত্রে আস্থা নেই—খ্রীস্টের বাণী অগ্রাহ্য করে তারা শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। প্রাচ্যে যারা মদের সেচকার্য করে খ্রীস্টধর্মের ফলনে বিশ্বাসী, তাদের উদ্দেশ্যে তীব্র ব্যঙ্গ-বর্ষণ করেছিলেন ব্রুকলিনের ডাঃ থিওডোর সি কুইলার।—

"সমবেত ধর্মবন্ধুগণ! সুস্বাগতম্! আপনারা এখানে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করতে দেন না জানি। যদি দিতেন তাহলে এই প্রস্তাব তুলতাম ঃ 'হীদেন-দেশে খ্রীস্টবাণীর প্রসারের পক্ষে সবচেয়ে গুরুতর বিঘ্নের একটি—সেখানে খ্রীস্টান-দেশ থেকে মদের চালানী। তাই এই প্রস্তাব নেওয়া হল—আমাদের খ্রীস্টধর্মের কেন্দ্রে কিছু বেশি করে খ্রীস্টভাব ঢুকিয়ে দেওয়া হোক।'...প্রগতিশীল ইংলণ্ড ও আমেরিকার মানুষেরাও হীদেন-দেশে গিয়েছে—তাদের এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে বোতল। বাইবেল যদি একজনকে খ্রীস্টের কাছে নিয়ে আসে, বোতল দশটি লোককে চির নরকে পাঠিয়েছে।...আমরা গর্ব করি আমাদের জাতীয় পতাকার জন্য। সেই গৌরবের পতাকা আজ উড়ছে ম্যানিলার ৪০০ মদের ভাঁটির উপরে। (ধিক্! ধিক! ধ্বনি)। হাঁ, ধিক্! ধিক্! ধিক্! যদি ঐ পতাকাকে ঐসকল নরককুণ্ডের

২১ 'হায়ার ক্রিটিসিজম্' ব্যাপারটা কী, স্বামীজীর লেখা থেকে দেখা যাক ঃ

"ঈশা নামক কোনো পুরুষ কখনো জন্মেছিলেন কি-না, এ নিয়ে বিষম বিতণ্ডা। নিউ টেস্টা-মেণ্টের যে চার পুস্তক, তার মধ্যে 'সেণ্ট জন' নামক পুস্তক তো একেবারে অগ্রাহ্য হয়েছে। বাকি তিনখানি—কোনো এক প্রাচীন পুস্তক দেখে লেখা—এই সিদ্ধান্ত; তাও ঈশা-হজরতের যে-সময় নির্দিষ্ট আছে, তার অনেক পরে।

"তার উপর যে-সময় ঈশা জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি, সে সময় ঐ য়াহুদীদের মধ্যে দুইজন ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন--জোসিফুস আর ফিলো। এঁরা য়াহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঈশা বা ক্রিশ্চানদের নামও নাই; অথবা রোমান জজ তাঁকে ক্রুশে মারতে হুকুম দিয়েছিল, এর কোনো কথাই নাই। জোসিফুসের পুস্তকে এক ছত্র ছিল, তা এখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ হয়েছে।

"রোমকরা ঐ সময়ে য়াহুদীদের উপর রাজত্ব করত, গ্রীকেরা সকল বিদ্যা শেখাত। এঁরা সকলেই য়াহুদীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন, কিন্তু ঈশা বা ক্রিশ্চানদের কোনো কথাই নাই।

"আবার মুশকিল যে, যে-সকল কথা, উপদেশ বা মত নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রন্থে প্রচার আছে, ও-সমস্তই নানা দিগ্‌দেশ হতে এসে খৃস্টাব্দের পূর্বেই য়াহুদীদের মধ্যে বর্তমান ছিল এবং হিলেল্ প্রভৃতি রাব্বিগণ (উপদেশক) প্রচার করছিলেন। পণ্ডিতেরা তো এইসব বলছেন, তবে অন্যের ধর্ম সম্বন্ধে যেমন সাঁ করে এক কথা বলে ফেলেন, নিজের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে তা বললে কি আর জাঁক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন। এর নাম হায়ার ক্রিটিসিজম্।" ['পরিব্রাজক']

উপরে ওড়াতে হয়—ওদের অর্ধনমিত করে রাখো!—ঐ পতাকা, যাকে আমরা বাইবেলের পরেই ভালবাসি।"

কিন্তু মিশনারিরা ঐ সমাবেশে মদের বোতলে নয়, হিন্দুধর্মের ভাণ্ডেই অধিক পাপ দর্শন করেছিলেন। রেভাঃ ডাঃ জেকব চেম্বারলিন বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম এখন পাপের ধর্ম, অপরাধের ধর্ম, নীতিহীনতার ধর্ম। হিন্দু-পুনরুত্থানের উল্লেখ করে বলেছিলেন, হিন্দুরা খ্রীস্টকে না নিয়ে খ্রীস্টানধর্মের নৈতিকতাকে নিয়ে ফেললেই সর্বনাশ! ও-ব্যাপারটা মিশনারিদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হবে। না, ও-কাজ করতে দেওয়া হবে না। হিন্দুধর্মের পতাকা আসলে ঝুলে পড়েছে। এখন সেটাকে নামিয়ে যতক্ষণ-না খ্রীস্টধর্মের পতাকা সেখানে ওড়ানো যাচ্ছে, ততক্ষণ যেন মিশনারিরা ঘাঁটি রক্ষা করে। আরো টাকা চাই তার জন্য। চাঁদা দাও। রেভাঃ চেম্বারলিন তারপর স্বর্গের দিকে দু'হাত হঠাৎ বাড়িয়ে দিয়ে, মাথা পিছনে হেলিয়ে মুখ উঁচু করে চিৎকার করে বলে ওঠেন—ওগো ক্ষমাময় যীশু! এইভাবেই কি তোমার করুণায় আমরা উদ্ধার পেয়ে যাবো না?

একই সমাবেশে মিঃ টেলর বড় দুঃখে বলেছিলেন, "ঈশ্বরের আদেশ, পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ে গস্‌পেল ছড়াও। অথচ চীনে প্রতি মাসে দশলক্ষ লোক মরছে—হায়! ঈশ্বর ছাড়াই!! হীদেনদের মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বের অন্ধকারের চেহারা যাঁরা জানেন—কী আতঙ্কে হীদেন-মন পূর্ণ থাকে, সে-বিষয়ে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে—তাঁরাই বুঝবেন, আমার কথার সত্যতা। হীদেনরা জানে তারা পাপী, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের অসীম ত্রাস, কেবল তারা জানে না তারা মরছে আশাহীন অবস্থা নিয়ে—তারা কোনো ঈশ্বরকে জানে না—জানে না তাঁর উদ্ধারের শক্তিকে। তাদের কাছে আমরা নিয়ে যাচ্ছি গস্‌পেল।"

এই সম্মেলনেই ডাঃ বারোজ তাঁর খ্রীস্টীয় পাণ্ডিত্যের এবং 'কাণ্ডজ্ঞানের' চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে পুত্রহারা যুবতীর সুপরিচিত কাহিনীটি তিনি শোনান। যুবতী মৃতপুত্রকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে গিয়েছিলেন, বুদ্ধ তাঁকে এমন বাড়ি থেকে শ্বেতসরিষা আনতে বলেন, যেখানে কখনো মৃত্যুশোক প্রবেশ করেনি। দ্বার হতে দ্বারে ব্যর্থ সন্ধানের পর যুবতী বুঝেছিলেন—জন্মের মতো মৃত্যুও সংসারের নিয়ম। বুদ্ধের কাছে গেলে তিনিও বললেন—কালের এই বিধান—এ জীবন চিরস্থায়ী নয়।

এই কাহিনীটিকে ডাঃ বারোজ ফলিয়ে বর্ণনা করেন। বুদ্ধের শেষ উক্তিটি শোনাবার পরে নাটকীয়ভাবে বলেন—

"বুদ্ধ কেবল এইটুকুই বলতে পারলেন! মৃত্যুর সামনে সান্ত্বনা দেবার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ অসহায়তা এমন বেদনাদায়কভাবে আর কিসে ফুটেছে?"

সবই ঠিক, তবু ডাঃ জে চেম্বারলিনকে অনেকের এই নৈরাশ্যজনক ধারণার কথা জানাতে হল—"ভারতের খ্রীস্টধর্মান্তর অসম্ভব।" মহাক্রোধে তিনি বললেন, "উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরাই পরম শত্রু—তাদের সঙ্গেই আমাদের প্রধানতঃ লড়তে হবে। জাতিপ্রথাকে তাড়াতেই হবে, নচেৎ খ্রীস্ট সেখানে ঢুকতে পারবেন না। এই প্রথা শিকলের মতো তাদের বেঁধে রেখেছে, কিন্তু তারা মনে করে, ওটা মাণিক্যখচিত সোনার শিকল। ওটা বড় প্রিয় তাদের কাছে।"

ভারতে মিশনারি-সম্মেলনগুলিতে কিন্তু ওহেন উগ্র কথাবার্তা কমই বলা হয়েছিল, অন্ততঃ প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে তাই পাই। রেভাঃ জে হাডসনের বাড়িতে এক সম্মেলনে রেভাঃ স্লেটার (হার্ভেস্ট ফিল্ডের ১৮৯৩, ডিসেম্বর সংখ্যায় পাই) বিচক্ষণভাবে হিন্দুধর্মের চরিত্র বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।—হিন্দুধর্ম তত্ত্বচিন্তাতে আবদ্ধ, বাস্তব প্রয়োগে নামে না, তা কোনোমতে একটি ধর্ম নয়, বহু ধর্মের সমষ্টি, তার মূলে ভাব—মানুষ ও ঈশ্বর মূলে এক, মানুষের আত্মা ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে ইত্যাদি। রেভাঃ স্লেটার স্বীকার করেছিলেন, গস্‌পেলের কিছু ভাব আগে থেকেই হিন্দুধর্মে আছে, কিন্তু ঈশ্বর মানুষ

এক, এই মারাত্মক প্যানথীজম্ সব খেয়েছে, মারাত্মক জন্মান্তরবাদও তাই—ওসব-বস্তু কেবল খ্রীস্টধর্মের আলোকেই সংশোধিত হতে পারে, হিন্দুদের অবতারবাদও খাঁটি ঈশ্বরকে (অর্থাৎ খ্রীস্টকে) চাপা দিয়েছে, এবং বেদে কিছু প্রার্থনা থাকলেও প্রতিশ্রুতি নেই, যা মাত্র আছে বাইবেলে। আর একটি সমাবেশে রেভাঃ হাডসন মিশনারিদের প্রস্তুতি সম্বন্ধে নানা লোকের মত নিয়ে আলোচনা করেন। মিশনারিরা হিন্দুদর্শন, সংস্কৃত ইত্যাদি পড়লেই ভাল করবেন, লোকজনের সংগে বেশি মেলামেশার দরকার নেই, বহুদিন মেলামেশার পরে যা শিখবেন, তা দু'চার দিনেই কোনো পাকা মিশনারি শিখিয়ে দিতে পারবেন—এই ছিল এক পক্ষের মত। অন্য পক্ষ বলতে চান, কেবল বই পড়ে কিছু হবে না, লোকজনের কাছে হাজির হতে পারবে এমন ধার্মিক লোক চাই। শেষোক্ত মতে উৎসাহিত জনৈক তরুণ মিশনারি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হিন্দুদর্শনের অনেক বই আমি জুটিয়েছি, সেগুলো কি এখনি পুড়িয়ে ফেলব? (হার্ভেস্ট ফিল্ড; ১৮৯৪ অগস্ট)।

কলকাতার এণ্টালিতে ব্যাপটিস্ট চ্যাপেলে 'বেঙ্গল ক্রীশ্চান কনফারেন্স' বসেছিল ('হিন্দু'র ১৮৯৪, ১৯ অক্টোবরের রিপোর্ট), সভাপতিত্ব করেছিলেন রেভাঃ টি সি ব্যানার্জি। আলোচনার বিষয় ছিল, "হিন্দুধর্মের সাম্প্রতিক নববিকাশ এবং খ্রীস্টধর্মের সুসমাচার-প্রচারের উপর তার প্রভাব।" রেভাঃ সি এন ব্যানার্জি বলেন, হিন্দুধর্ম ঠিক কী, তা জানা যদিও কঠিন, তবু মিশনারিদের কর্তব্য তার চর্চা করা। বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন রেভাঃ কে সি ব্যানার্জি। এই সুপরিচিত বাঙালী মিশনারি সূচনায় বলেন, বহুদিন আগে তিনি যখন প্রচারকার্যে নেমেছিলেন তখন হিন্দুধর্মের নিয়ন্তা ছিলেন গুরু-পুরোহিতেরা, এখন আর সেদিন নেই; এখন শিক্ষিত লোকে ধর্মচর্চায় এবং ধর্মপ্রচারে নেমে পড়েছে। পরিস্থিতির এমনই বদল ঘটেছে যে, রেভাঃ কালীচরণ ব্যানার্জি উদার না হয়ে পারেন নি। তিনি বলেন, "ভালই তো শিক্ষিত হিন্দুরা ধর্মচর্চা করছে! বলতে দ্বিধা নেই, যতবেশি হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা হবে, তত বেশি সত্যের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। শেষে সত্যই যে জয়ী হবে, তা না বললেও চলে। আমার বিশ্বাস, হিন্দুরা নিজধর্মের চর্চা করার ফলে তার ত্রুটি ও শূন্যতা দেখবে এবং তখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না।" রেভাঃ কালীচরণ এই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন, হিন্দুরা যদি নিজেদের মন্ত্রগুলির মানে বুঝে ফেলে, তাহলেই তাদের অসারত্ব বুঝে যাবে তারা। ফলে হিন্দুদের শাস্ত্রচর্চায় খ্রীস্টধর্মের আখেরে উপকারই হবে।

যতই মুখাকৃতি অবিকৃত রাখার চেষ্টা করুন, রেভাঃ কালীচরণ ব্যানার্জি তাঁর বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারেন নি। ইণ্ডিয়ান উইটনেস পত্রিকায় কলকাতার মিশনারি-কনফারেন্সের যে-বিবরণ বেরিয়েছিল (হার্ভেস্ট ফিল্ডে ১৮৯৪ অগস্ট সংখ্যায় উদ্ধৃত) তাতে দেখি, রেভাঃ কালীচরণ ব্যানার্জি "ভারতের মিশনারি-সমস্যার উপরে ধর্মমহাসভার সম্ভাব্য প্রভাব" সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি ধর্মমহাসভা কি প্রচণ্ড ক্ষতির কারণ হয়েছে, তা নানা কারণ-সহ দেখাবার চেষ্টা করেন। অত্যন্ত নৈরাশ্যের সংগে তিনি বলেন, (১) ভারতের প্রচলিত বিশ্বাস—সব ধর্ম সত্য, তা এবার জোরদার হবে; (২) ভারতের মৃত বা মৃতপ্রায় ধর্ম নবজীবন পাবে; বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি মারউইন মেরী স্নেল বলেছেন, ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম বিরাট সম্মান পেয়েছে—তাঁকে ধন্যবাদ দেবার জন্য বিরাট সভার আয়োজন হচ্ছে—তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে, হিন্দুধর্ম কিভাবে আত্মঘোষণায় উদ্যত; (৩) খ্রীস্টধর্মকে তোয়াজ করে নিজ ধর্মের শক্তি বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করা হবে, যা করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতিরা; (৪) খ্রীস্টধর্মের তত্ত্বের উপরে খ্রীস্টানদের নৈতিক আচরণের চেহারাকে চাপাবার চেষ্টা করা হবে (অর্থাৎ খ্রীস্টানদের নৈতিক দুষ্ট চরিত্রের কথা তুলে খ্রীস্টধর্মের মর্যাদাহানির চেষ্টা করা হবে); (৫) হিন্দুরা দুটি বিপরীত ছবি পাশাপাশি তুলে ধরবে—একদিকে আমেরিকায় হিন্দুধর্মের কী খাতির অন্যদিকে ভারতে

মিশনারিরা ঠিক উল্টোকাজই করছে; তার মানে মিশনারিরা হিন্দুধর্মকে আক্রমণের ক্ষেত্রে স্বদেশীয় চার্চের বিরোধিতাই করছে; (৬) ভবিষ্যতে মিশনারি-কর্মচারিদের উপর এই উত্থানের ধাক্কা পড়বে। এইসব বিষ কাটাবার জন্য রেভাঃ কালীচরণ মিশনারিদের কর্তব্য উপদেশ করেন ঃ (১) আরো আপসহীনভাবে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করো; (২) ধর্মসভা-দ্বারা এদেশে যে-সব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তাকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে ফেলো; এবং (৩) আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের কাছে অবিরত প্রার্থনা করতে থাকো।

সম্মেলনে উপস্থিত কেউ-কেউ অবশ্য রেভাঃ কালীচরণের মতো ভয়ত্রস্ত হননি। তাঁদের একজন তো বলেই ছিলেন, ধর্মমহাসভার ঐ ন'দিনের মজা'র প্রভাব বেশিদিন থাকবে না। কিন্তু বাস্তববাদী এক মিশনারি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা বোধ না করে পারেন নি—আগামী পাঁচ বছর অন্ততঃ ধর্মমহাসভার জন্য মিশনারিদের বাংলার হাটে-বাজারে, গাঁয়ে ফ্যাসাদে পড়তে হবে—সবাই ধর্মমহাসভার কথা তুলে নানা অসুবিধাজনক প্রশ্ন করবে।

এই সভার সভাপতি তাঁর ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অপূর্ব কল্পনাবিকাশ করে যে-কথা বলেছিলেন, তা সমালোচিত হয়েছিল সমকালে ঃ

"সভাপতি তাঁর সমাপ্তি-ভাষণে বলেন, তাঁর বিশ্বাস, ধর্মমহাসভা খ্রীস্টধর্মের বিস্তারেই সাহায্য করবে। তিনি বলেন, নিজেই নিজেকে উপাধি দান-কারী যে স্বামী-ব্যক্তিটি ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থন করেছিলেন—তিনি নিজেই এক সময়ে খ্রীস্টান হবার পথে অনেকখানি এগিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে-পথ থেকে তিনি ফিরে আসেন নিজের কোনো-কোনো খ্রীস্টান আত্মীয়ের অযোগ্য জীবনযাত্রা দেখে, এবং যে-মিশন ইনস্টিটিউশনে তিনি পড়তেন সেখানকার একজন মিশনারির আহাম্মকির জন্য। এই মিশনারিকে তিনি কতকগুলি কঠিন বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলেন। তখন মিশনারি-মহোদয় তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণের কাছে যেতে বলেন। ছাত্রটি তখন রামকৃষ্ণের কাছে যান, যার পরিণতি—ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে তিনি দণ্ডায়মান! উক্ত মিশনারি যদি স্বধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত হতেন, যা তাঁর হওয়া উচিত ছিল, তাহলে এই স্বামী-ব্যক্তিটি ধর্মমহাসভায় দাঁড়াতেন —কিন্তু ভারতীয় খ্রীস্টান-ধর্মের প্রতিনিধিরূপে।"

জগাখিচুড়ির অনবদ্য দৃষ্টান্ত উপরের বক্তব্যটি। ইন্ডিয়ান মিরার বলল (১৮৯৪, ৩ জুলাই)—বিবেকানন্দের বন্ধুরা জানিয়েছেন—তিনি কোনোদিন খ্রীস্টান হতে গিয়েছিলেন, একথা সর্বৈব মিথ্যা। তাছাড়া বিবেকানন্দকে নয়, অন্য এক ব্যক্তিকে জেনারেল অ্যাসেমরিজ ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেস্টি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছিলেন—ধর্মপ্রশ্নের মীমাংসার জন্য। মিরার আরও বলল, বিবেকানন্দ স্বয়ং-সন্ন্যাসী নন, তাঁর গুরু তাঁকে সন্ন্যাস দিয়েছেন, মাদ্রাজের হিন্দুরা তাঁকে নির্বাচন করেই ধর্মমহাসভায় পাঠিয়েছেন। "আমাদের নিশ্চয় এই প্রত্যাশা করার অধিকার আছে—খ্রীস্টীয় নৈতিকতার এইসব বড়ঠাট্টাই-কারীগণ অন্য ধর্ম ও তার প্রচারকদের নিন্দা-মন্দ করার সুখকর্ম-সাধনের কালে তথ্য সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছুটা মমত্ব দেখাবেন"—মিরার লিখেছিল।

বিবেকানন্দকে রামকৃষ্ণের কাছে ঠেলে পাঠাবার অভিযোগে যিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন মিশনারি-সম্মেলনের সভাপতির কাছে, তিনি কিন্তু স্বয়ং গোঁড়া খ্রীস্টানই ছিলেন, এবং পরধর্ম-বিদ্বেষের কারণে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীপাঠক-মাত্রে উইলিয়ম হেস্টির সঙ্গে তাঁর বিতর্কের কথা জানেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৮৮২ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এই বিতর্ক চলেছিল। শোভাবাজার রাজবাটীর এক বৃদ্ধা মহিলার আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধের একটি বিবরণ স্টেটসম্যানে বেরোয়, যাতে শ্রাদ্ধস্থলে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ

বিশিষ্ট ইংরাজি-শিক্ষিত হিন্দুরা উপস্থিত ছিলেন। পুতুলের সামনে এতগুলি শিক্ষিত হিন্দুর উপস্থিতি দেখে হেস্টি ক্ষেপে যান এবং স্টেটসম্যানে পত্রযোগে উক্ত শ্রাদ্ধের শ্রাদ্ধ করেন, তৎসহ ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও। তারপর চিঠির পর চিঠি লিখে প্রচলিত মিশনারি-পদ্ধতিতে হিন্দুধর্মের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারে ব্রতী হন। তার মধ্যে "রক্তপিপাসু বিকট কালী," "হস্তীমুণ্ড গণপতি," 'কামুক কৃষ্ণের' প্রতি যথোচিত ঘৃণাবর্ষণ ছিল; "পাপের প্রতিমূর্তি দেবদেবীকে" আশ্রয় দিয়েছে যে-হিন্দুধর্ম তা যে "দানবিক ধর্ম," যা "নীতিহীনতার গহ্বরে পতিত ভারতবর্ষের সকল দুর্গতির মূলে," তা জানা গিয়েছিল, এবং একদা-আলোককন্যা ভারতবর্ষ বর্তমানে "বেশ্যা-জননী" হয়ে যেখানে অবস্থান করছে, সেখান থেকে তাকে তুলে "বিশুদ্ধ পুণ্যজীবনে স্থাপন করতে পারে একমাত্র খ্রীস্টধর্ম"—তাও বুঝতে অসুবিধা হয়নি হেস্টির রচনা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে হেস্টির পত্রের প্রতিবাদ করেন—সেই প্রতিবাদ হেস্টিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে। পরে যখন তিনি ছদ্মনামের পশ্চাদ্বর্তী লেখকের পরিচয় জানেন তখন 'বাংলার ওয়াল্টার স্কটের' উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করে লেখেন—আসল স্যার ওয়াল্টার স্কট স্বয়ং দেখিয়ে গিয়েছেন, রোমাণ্টিক অতীতের নব-উপস্থাপনায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না—ধর্মের ক্ষেত্রে একথা আরও সত্য। ১৮৮২, অক্টোবর মাসে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গে যে-কথা রেভারেণ্ড হেস্টি বলেছিলেন, সেই কথাটাকে ঠিক এগার বছর পরে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছিলেন হেস্টিরই এক প্রিয় ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দ, যে-কাহিনী আমরা এতগুলি পৃষ্ঠা ধরে বর্ণনা করে আসছি। হেস্টির পূর্বোক্ত কথাগুলি ছিল এইঃ

"এই ঊনবিংশ শতাব্দী যতদূর দেখতে পেয়েছে, তা হল—হিন্দুধর্মের আছে কেবল বাজে খোসা, তার ভিতরে শাঁসের চিহ্নমাত্র নেই। তা একেবারে শূন্যে পূর্ণ—কপিল এবং তাঁর মতো অন্যান্যরা সেকথা বলেছেন, কেবল বলছেন না 'রামচন্দ্র।' তার অক্ষিহীন অক্ষি-কোটরে প্রাণ, আলোক বা প্রেম সঞ্চারিত করার চেষ্টা বৃথা—বৃথা তার ঠক্‌ঠকে নড়বড়ে হাড়ে নতুন রক্ত-মাংসে পুরে দেওয়ার প্রয়াস। তার কম্পমান উন্মুক্ত কঙ্কালদেহের মধ্যে যতই উঁকি-ঝুঁকি দিই না কেন কোথাও যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবনের শ্বাস প্রবাহিত হতে দেখব না।" ২২

বঙ্কিম-হেস্টির পত্র-যুদ্ধ হয়েছে ১৮৮২ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আর নরেন্দ্রনাথ শ্রীরাম-কৃষ্ণের সাক্ষাতে প্রথম গেছেন তার এক বছর আগে—১৮৮১ নভেম্বরে। সুতরাং হেস্টি যদি নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে স্বধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার অভিপ্রায়ে তা করেন নি, যা বলতে চেয়েছেন মিশনারি সম্মেলনের পূর্বোক্ত সভা-পতি। ১৮৮১-র হেস্টি অত্যন্ত অসহিষ্ণু ধর্মান্ধ খ্রীস্টান—তাঁর হিন্দুধর্ম-বিষয়ক পত্রাবলী থেকেই প্রতীয়মান।

কিন্তু তিনি সত্যই নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেছিলেন। 'যুগনায়কে' পাই, রেভাঃ হেস্টি একদিন ইংরেজি ক্লাসে গিয়ে ছাত্রদের ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'একস্‌কারশন্‌' কবিতাটি বোঝাবার সময়ে বলেছিলেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যধ্যান করবার সময়ে কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ অতীন্দ্রিয়রাজ্যে প্রস্থান করতেন। ঐ মানসিক অবস্থা অবশ্য অত্যন্ত বিরল—এক-জনকেই মাত্র হেস্টি ঐ অবস্থায় যেতে দেখেছেন—তিনি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রত্যক্ষ-দর্শী হরমোহন মিত্র ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে ঘটনাটির পটভূমিকা ব্যাখ্যা করেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা ছাত্ররা না বুঝতে পারায় ইংরেজির অধ্যাপক রেগে ক্লাস ছেড়ে

২২ হেস্টির চিঠিগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজি গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাওয়া যাবে। বঙ্কিম-হেস্টি বিতর্ক-পত্রগুলির একটি সুলিখিত ভূমিকা সম্পাদক দিয়েছেন।

চলে যান। প্রিন্সিপাল হেস্টি তখন সেই ক্লাসে আসেন। তিনি ছাত্রদের দোষ না দিয়ে বলেন, অধ্যাপকই ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বোঝেন না। কবির সমাধি হত। শেষে তিনি বলেন, 'দক্ষিণেশ্বরে এমন এক ব্যক্তি আছেন, যাঁর সমাধি হয়। তোমরা তাঁকে দেখে এসো।'

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে হিন্দুধর্মের শ্রাদ্ধকারী রেভাঃ হেস্টি একই সঙ্গে কালীপূজক রামকৃষ্ণের কাছে মিশনারি-কলেজের ছাত্রদের যেতে বলছেন, ব্যাপারটা বিস্ময়কর বটে! এর এই ব্যাখ্যা হতে পারে—হেস্টি অশ্রদ্ধাপরায়ণ হলেও জিজ্ঞাসু ছিলেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মোট ধারণা খুব খারাপ হলেও স্বচক্ষে দেখা হিন্দু-যোগীর সমাধিকে তিনি চোখ বা মন বুজে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। আর একটি ব্যাখ্যা সম্ভব—হেস্টি তাঁর পূর্বসঞ্চিত বদ্ধ ধারণার ভিতরে থেকেও বদলাতে শুরু করেছিলেন—বাইরে যখন হিন্দুধর্মের নিন্দা করছেন, অন্তরে তখন এই ধর্ম তাঁর মনে নূতন চেতনাস্রোত এনে দিয়েছে, এবং তা, আমরা অনুমান করতে ইচ্ছা করি—রামকৃষ্ণের প্রভাবেই। রামকৃষ্ণের প্রভাব কি বিচিত্র অথচ অনিবার্যভাবে ক্রিয়াশীল হয়, তার সাক্ষ্য অন্যান্যের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দিয়ে গেছেন—সেই প্রভাব কি ব্রজেন্দ্রনাথ-কথিত 'কবি দার্শনিক ও অধ্যাপক' হেস্টির মনে পড়েনি? তিনি কি হিন্দুধর্ম থেকে রামকৃষ্ণে না গিয়ে রামকৃষ্ণ থেকে হিন্দুধর্মে চলে আসার চেষ্টা করেন নি। হেস্টি যে বদলেছিলেন তার পরোক্ষ প্রমাণ পূর্বোক্ত মিশনারি-সম্মেলনের সভাপতির কটূক্তি, যিনি অবশ্যই পরিবর্তিত হেস্টি-সম্বন্ধে কিছুদিন থেকেই গভীর বিদ্বেষ বোধ করছিলেন, এবং বিবেকানন্দ-সূত্রে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে ফেলেন। হেস্টির পরিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ আছে—বিবেকানন্দের সাক্ষ্য। বিবেকানন্দ হেস্টির পরিচিত ছাত্র ছিলেন, তা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন। হেস্টি নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন্ অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তা বিবেকানন্দ-জীবনী থেকে উপস্থিত করেছি 'অপরিচিত সন্ন্যাসী' অধ্যায়ে। হেস্টি-সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি পাই নিবেদিতার ডায়েরী-নির্ভর স্মৃতিকথা থেকে। ১৮৯৮, মে-জুন মাসে আলমোড়ায় থাকাকালে স্বামীজীকে নিবেদিতা প্রভৃতির মধ্যে একজন প্রশ্ন করেন—স্বামীজীর উপর খ্রীস্টধর্ম ও মিশনারিদের প্রভাব কতদূর? প্রশ্নটা স্বামীজীর কাছে হাস্যকর মনে হয়েছিল। খ্রীস্টের চরিত্রের সরাসরি অনুরাগী তিনি, টমাস-আ-কেম্পিসের ইমিটেশন অব ক্রাইস্টের অনুবাদক তিনি, তথাপি মনে করেন নি—আনুষ্ঠানিক খ্রীস্টধর্ম বা তার প্রচারকদের কোনই প্রভাব আছে তাঁর মধ্যে। কিন্তু এই সূত্রে তাঁর জীবনের একমাত্র মিশনারি রেভাঃ হেস্টি সম্বন্ধে স্নেহপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেনঃ

"তিনি খুব গর্বের সঙ্গে তাঁহার জীবনের একমাত্র মিশনারি সংস্পর্শের কথা বলিলেন—তিনি হইলেন তাঁহার বৃদ্ধ স্কটল্যান্ডবাসী শিক্ষক মিঃ হেস্টি। এই উষ্ণমস্তিষ্ক বৃদ্ধ স্বল্পতম ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, তাঁহার গৃহ তাঁহার মতোই ছাত্রগণেরও গৃহ। তিনিই প্রথম স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাঠান [অর্থাৎ রামকৃষ্ণের কাছে যেতে বলেন ; কিন্তু স্বামীজী তখনি যান নি ; পরে ঘটনাচক্রে কলকাতায় উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়], এবং তাঁহার ভারত-বাসের শেষ দিনগুলিতে প্রায়ই বলিতেন, **'হাঁ বৎস, তুমি ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ—যথার্থই সব ঈশ্বর।'** [অর্থাৎ মিশনারিদের পরম ঘৃণার প্যানথীজম্-কে অনুভূতিযোগে হেস্টি সত্য বলে মেনে নিলেন।] স্বামীজী উৎসাহভরে বলিলেন, 'আমি তাঁর সম্পর্কে গর্বিত, কিন্তু তোমরা নিশ্চয় বলবে না, তিনি আমাকে খুব বেশি খ্রীস্টান-ভাব দিয়েছিলেন।' বস্তুতঃপক্ষে দেখা গেল, তিনি মাত্র ৬ মাস [জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে] তাঁহার ছাত্র ছিলেন—যেহেতু প্রেসিডেন্সি কলেজ অত্যন্ত অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য তাঁহাকে পরীক্ষায় পাঠাইতে রাজি হয় নাই, যদিও তিনি পাস করিবেনই, এরূপ আশ্বাস তাঁহাদের দিয়াছিলেন।" **[স্থূললিপি লেখক-নির্দেশে]**
['স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' ; ভগিনী-নিবেদিতা]

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। চেষ্টা করেও মিশনারিরা নৈরাশ্য গোপন করতে পারেন নি। বাঙ্গালোরে শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচারকার্যের ১৮৯৫ সালের যে-রিপোর্ট রেভাঃ স্লেটার পেশ করেছিলেন, তার নৈরাশ্যের সুরের কথা হার্ভেস্ট ফিল্ড ১৮৯৫ এপ্রিল সংখ্যায় উল্লেখ করেছিল।২৩ একই কাগজে ১৮৯৭ জুলাই সংখ্যায় আমেরিকান মাদুরা মিশনের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখি, চার্চের অবস্থা ভালো নয়, অনেকেই পাপে ধরা দিচ্ছে , এমন কি তাতে নির্লজ্জ তারা, কোনো শৃঙ্খলা মানছে না, চার্চ-মেম্বারদের এমন অবস্থা অত্যন্ত বেদনা-দায়ক। খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সামাজিক প্রতিরোধের কথাও সদুঃখে বলা হয়েছিল। এই কাগজের অগস্ট সংখ্যাতেও একই নৈরাশ্যের কথা। কুড়ি বছরের মধ্যে এমন দুর্গতি দেখা যায়নি—পত্রিকাটি বলেছিল। একদিকে দুর্ভিক্ষ প্লেগ কলেরা ভূমিকম্প, অন্যদিকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতি-বিদ্বেষ, যার জন্য মিশনারিদের কাজের অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। পত্রিকাটি মিশনারিদের সতর্ক করে বলল, সমালোচনা যেন অতিরিক্ত তিক্ত না হয়। মিশনারিরা বলতে লাগলেন (মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনের ১৮৯৭ জুলাই সংখ্যায় পাই), যত্রতত্র স্কুল খুলে লাভ নেই। আগে মনে হয়েছিল, স্কুল খুললেই খ্রীস্টান! কোথায় তা? মিছিমিছি হিন্দু ছেলেগুলোকে পড়াবার পরিশ্রম করব কেন?

বহু বৎসর ধরে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মিশনারিদের বর্তমান বিষাদ হিন্দু-জাগরণের অকাট্য প্রমাণ। মিশনারিরা সরাসরি স্বীকারও করেছিলেন ব্যাপারটাকে। ধর্মান্তরে কী প্রচণ্ড অসুবিধা ঘটছে, সেকথাও বলেছিলেন। ইতিহাসের প্রয়োজনে আমি বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সংবাদ তুলছি। এর এক প্রান্তে ছিল—খ্রীস্টান দেশগুলিতে জনসাধারণ বিদেশে মিশনারি পাঠানোর ব্যাপারে অনিচ্ছাবোধ করেছে, যে-ধরনের অনেক উল্লেখ আগে করেছি, এখানে আরও জানাতে পারি, অন্ততঃ "আমেরিকার বোর্ড অব ফরেন মিশনস"-এর সেক্রেটারি ডাঃ ক্লার্কের স্বীকৃতির কথা২৪, উল্টোদিকে ভারতে কার্যরত মিশনারিদের স্বীকৃতি—যথা

২৩ "Mr. Slater [says]....India is being stirred as she never was before.... Mr. Slater appears to be somewhat pessimistic with regard to the future. He says: 'Christianity and Hinduism are now meeting face to face, and the great lament, which we as missionaries have to raise, is in respect to the *tone of mind* generally prevalent in the country. To so many minds, religious truths appear to be little more than the material on which to exercise the ingenuity of controversy and speculation.... Spirit of false patriotism....is abroad.... If one had not firm faith in the instinctive religiousness of Hindu nature, as well as in the unfailing power of the Gospel of Christ....the outlook would be disheartening." ['Slater's Report'; *Harvest Field*; April, 1895]

হিন্দুধর্ম ও দর্শনের পক্ষে লেখনীচালনা করে হিন্দু-লেখকগণ স্লেটার-প্রমুখকে কি পরিমাণে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন, উপরের উদ্ধৃতিতে তার স্পষ্ট স্বীকৃতি। "শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচার-কার্যে নিযুক্ত" খ্রীস্টীয় তত্ত্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত রেভাঃ স্লেটার ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা প্রভৃত তত্ত্ব-কথার দ্বারা হিন্দুধর্ম-দর্শনকে এতদিন পর্যন্ত তচ্‌নচ্‌ করার সুখবোধ করেছেন—এইবার উল্টো মার খেয়ে বলতে হল তাঁদের—ধর্ম ব্যাপারটা দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের বিষয় নয়। এবং বিশ্বাস করবার চেষ্টা করতে হল, হিন্দুরা স্বভাবে যেহেতু ধর্মপ্রাণ তাই একদিন স্বভাবের টানেই খাঁটি ধর্ম অর্থাৎ খ্রীস্টধর্ম নিয়ে ফেলবেই!

২৪ "According to Dr. Clark, Secretary of the American Board of Foreign Missions, there is a 'decline of popular interest in Foreign missions at the present time.'.... Dr. Clark says, judging from the response to appeals for money, that 'the argument from the moral degradation and wretchedness of the great masses of non-Christian nations seems to have lost its power'.... One reason, the Secretary thinks, is that the Christian world has come to know the

মাদ্রাজের বিশপ ডাঃ হোয়াইটহেডের উক্তি ঃ ধর্মান্তর কার্যতঃ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটি শিক্ষিত হিন্দুকে খ্রীস্টান করাও যেন মিরাকলের ব্যাপার।২৫ নানা মিশনারি সংস্থার রিপোর্ট পড়ে মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিন লিখল অবস্থা খুবই নৈরাশ্যজনক (১৮৯৪ জুলাই)।২৬ 'প্রাইভেট সার্কুলেশনের' জন্য মুদ্রিত 'লেটারস্ ফ্রম মাইসোর সিটি' পুস্তিকায় নামকরা তিন মিশনারি হেনরি গিল্ডফোর্ড, ডবলিউ হোল্ডস্ওয়ার্থ, ই এস এডওয়ার্ডস্ স্বীকার করলেন—চার্চ-সমর্থকদের কেউ-কেউ দল ভেঙে চলে যাবার সময়ে বলছে—হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা যাবে না, তার প্রয়োজনও নেই, কারণ তারা স্বধর্মে তৃপ্ত। এঁরা তিক্তভাবে বললেন ঃ হাঁ তারা তৃপ্ত—তবে অজ্ঞানে। দেখ দিকি, শিক্ষিত হিন্দুদের মনের এমনই শোচনীয় অবস্থা যে, তারা কথার ভেলকিতেই মুগ্ধ—হাঁ করে গিলছে বিবেকানন্দ বেশান্ত যা বলছেন!২৭ মাদ্রাজের রেভাঃ টি. বি পাণ্ডিয়ন, আর্চবিশপ অব ক্যাণ্টারবেরীর কাছে

---

heathen better.... The *Nation* remarks : 'Travel and World's Fairs and Parliament of Religions and the going to and fro of the newspaper correspondents have revealed unexpected heathen virtues, some of which we might copy to advantage.' The *Nation* thinks,... 'Missionary Service is as well-established as the India Service, as a regular means of livelihood, and missionaries come and go in shoals, with motives doubtless as excellent as ever, but with an inevitable loss of the old-time distinction and influence. This dulling of the interest and imagination that used to attach to their office necessarily affects their cause also in the popular mind'." [*Light of the East,* Aug., 1895]

অমৃতবাজার ১৮৯৪, ২৫ সেপ্টেম্বর, হিন্দু-সাফল্যে আমেরিকায় মিশনারিদের মধ্যে আতঙ্কের সংবাদ দিয়েছিল, সেখানকার সংবাদপত্রের সাক্ষ্যে ঃ

"*The Press of New York* says, the number of converts, made by Hindu missionaries in this country, is creating consternation among the promoters of the Christian religion. Bishop Ninde of Detroit, thought the matter of enough importance to deliver an emphatic address on the subject to the Methodist Ministers at their weekly meeting.... He urged his hearers to devote some of their attention to it thoroughly, thus fortifying themselves against any argument that might be put to them." [*Amrita Bazar*; Sep. 25, 1894]

২৫ শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে কাজ করবার জন্য গঠিত কলকাতার অক্সফোর্ড মিশনের লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিশপ ডাঃ হোয়াইটহেড যা বলেন, তার রিপোর্টের অংশ ঃ

"Those, said Dr. Whitehead, who had worked for any time among the educated classes in Calcutta were aware of the extraordinary difficulty there was in converting a single individual Hindu to Christianity. Often, he said, when one saw that the obstacles were in the way of an educated native becoming a Christian, one could not but feel that it was almost a miracle that a single conversion was ever made." [*Madras Christian College Magazine*; Sep., 1899]

২৬ "We have before us several mission reports in which attention is directed to some important questions affecting the progress of mission work.... In connection with many of the stations mentioned in these reports we notice statements that at first sight seem very discouraging—statements to the effect that the church membership shows either a decrease as compared 'with the previous year or an increase much smaller than we might hope for."

[*Madras Christian College Magazine*; July, 1894]

২৭ "Indeed to us there is nothing more pathetic than the attitude of educated Hindus to-day.... Any juggler in words that comes along is sought unto at once, whether it be Vivekananda or Mrs. Besant, Miss Edgar or 'Paget, M. P.'."

রিপোর্ট পেশ করে বললেন—মিশনারিদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতে খ্রীস্টধর্মের প্রসার অল্পই হয়েছে এবং চার্চগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াবার অবস্থায় নেই, কারণ গরিবরাই খ্রীস্টান হয়। এখন প্রয়োজন, ভালো-ভালো শিক্ষিত লোক পাঠিয়ে অভিজাতদের ধর্মান্তরিত করা, যারা পুতুলপুজোয় এবং পুরোহিতদের পুষতে লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে। [বোম্বে গেজেট; ১৮৯৪, ২৮ এপ্রিল]। সিমলার রেভাঃ ডবলিউ এম ফেনউইক ওয়ালপোল নিউইয়র্ক ইনডিপেনডেন্ট-এ চিঠি লিখে জানালেন, অনেকেরই ধারণা, ভারতকে খ্রীস্টান করার চেষ্টা আর কলসী দিয়ে সাগর ছেঁচা একই ব্যাপার।২৮ এবং চার্চ গেজেট-এ রিচমন্ড নোবল নির্মমভাবে ভারতে মিশনারি-ব্যর্থতার চেহারা তুলে ধরলেন। তিনি অনেক কারণ দেখালেন, তার মধ্যে ছিল (১) সাধারণ মিশনারির তুলনায় ভারতীয়রা ধর্ম ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞ; মিশনারিরা এমন স্থূলভাবে ধর্মের কথা বলে যে, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয়রা তার ফাঁকি ধরে ফেলে; যেমন, মিশনারি এহেন প্রচারও করে, কেউ খ্রীস্টান হলে সে মৃত্যুর পরে সোজা স্বর্গে গিয়ে ভগবানের সঙ্গে বসে মদ খেতে পারবে; (২) মিশনারিরা অসহ্য জাতিগর্ব নিয়ে চলা-ফেরা করে; এবং জনসাধারণ দেখে—শাসক সরকারের সঙ্গে তাদের বেশ যোগসাজস, কারণ দেশীয় সাহায্য না মিললে সরকারী সাহায্যে মিশন চলে; (৩) নিম্নশ্রেণীর লোক খ্রীস্টান হয়, তারা অনেকেই চোর-ছ্যাঁচড়। বেঙ্গলী ১৯০০, ২৫ অগস্ট সংখ্যায় এই রচনাংশ ছেপেছিল, এবং ভদ্রতাবশে কঠিন কথাগুলির বিরুদ্ধে কিছু আপত্তিও করেছিল।

ধর্মান্তরের পথে নানা অসুবিধার কথা নানা পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়। উত্তরভারতে মিশনারি-কাজের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি ইংলন্ডের কোনো পত্রিকায় মিশনারি-ব্যর্থতার যেসব কারণ দেখান, তার মধ্যে ছিল: (১) প্রাচ্যে গোঁড়ামি ভয়ানক; (২) সেখানে জাতীয়তার জাগরণ হয়েছে; (৩) নিজেদের সংস্কৃতি এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্বন্ধে প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে বিশেষ সম্ভ্রমের মনোভাব, যেজন্য উভয়কে আঘাত করবে, এমন কিছু করতে তারা অনিচ্ছুক; (৪) খ্রীস্টধর্ম গ্রহণকারী পরিবার সম্বন্ধে তীব্র সামাজিক ঘৃণা, যা দেখে উৎসুকরা পেছিয়ে পড়ে; (৫) হিন্দুধর্মের আত্মসাৎ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা, যা অতীতে তাকে দীর্ঘজীবন দিয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং ভবিষ্যতেও তা বলবৎ থাকবে; (৬) প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি একান্ত আনুগত্যের মনোভাব; নারীর অবরোধ, জাতিপ্রথা, খাদ্যাখাদ্য-বিচার তার মধ্যে পড়ে; (৭) নিজেদের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে খ্রীস্টান-চিন্তাকে গ্রহণ করবার প্রবণতা। [হিন্দু; ১৮৯৫, ২০ নভেম্বর]

হিন্দুর সম্পাদক উপরের কথাগুলি উপস্থিত করবার পরে প্রশ্ন করেছিলেন, ওগুলি সত্য, কিন্তু মিশনারি-মহাশয় কি উত্তরভারতে এমন হিন্দুদের দেখেন নি, যাঁরা জাতিভেদ মানেন না, নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সন্তানদের ইংলন্ডে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, পৌরোহিত্যের গন্ডীকে কেটেছেন—তবু হিন্দুত্বের জন্য গর্বিত? সম্পাদক যোগ করে দিলেন—আসল কথা, খ্রীস্টানধর্মে এমন কিছু নেই যা জিজ্ঞাসু হিন্দুকে তৃপ্ত করতে পারে। অপর-

---

[·*Letters from Mysore City* ('for private circulation only'); Series II, No. XVIII; March 23, 1898]

২৮ "There are many who hold the opinion that any attempt to Christianise India is tantamount to trying to bale out the ocean with a bucket. For every native we bring to the knowledge of the truth there are twenty to take his place and continue the dogged persistance with which his last stronghold of heathendom has always faced missionary effort and enterprise." [Rev. W. M. Fenwick Walpole of Simla in *New York Independent*, quoted in *Bengalee*, June 27, 1896]

পক্ষে হিন্দুধর্মে রয়েছে বিচিত্র বৈপরীত্য, সুমহান থেকে সামান্য—সবই। এখন হিন্দুর কর্তব্য, পুরাতন মহান সত্যকে যুগোপযোগী করে তোলা।

ইণ্ডিয়ান চার্চ কোয়ার্টারলি রিভিউ-এ রেভাঃ সি এস রিভিংটন নামক 'সুপরিচিত মিশনারি' *The Present State of Missionary Work Amongst Hindoos* নামক রচনায় পূর্বোক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন, যার অকপটতা এবং প্রাঞ্জলতার প্রশংসা করে টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ১৮৯৮, ৩ অগস্ট। টাইমস অব ইণ্ডিয়ার কাছেও মিশনারি-প্রচেষ্টার ব্যাপকতা সত্ত্বেও ধর্মান্তরের সংখ্যাল্পতা বিস্ময়ের কারণ বলে মনে হয়েছিল।২৯ রেভাঃ রিভিংটন ধর্মান্তরের দুই ধরনের বাধার কথা বলেছিলেন, এক, যা আসছে খ্রীস্টানদের চরিত্র থেকে, দুই, অখ্রীস্টান-দের কাছ থেকে। ইউরোপীয় ও দেশীয় খ্রীস্টানদের বদ জীবনযাত্রা খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নষ্ট করে দিচ্ছে।৩০ তাদের বজ্জাতির কঠোর সমালোচনা ইনি করেন। অখ্রীস্টানদের কাছ থেকে বাধাগুলি এই : (১) যে-ধর্ম ইংরেজদের কাছ থেকে ইংরেজি পোষাক পরে আসছে, তার বিষয়ে দেশীয় বিতৃষ্ণা; (২) সেকুলার শিক্ষার ফলে ভারত থেকে ধর্মভাবের ক্রম-বিলয়; (৩) দেশে ঐতিহ্যের প্রবল প্রভাব, যা ভাঙবার নৈতিক সাহস ভারতবাসীর নেই ; (৪) (প্রধান বাধা) ভারতে এখন প্রচণ্ড খ্রীস্টবিরোধী শক্তি সক্রিয়। এই জিনিস ঘটিয়েছে নানা ধরনের ধর্মীয় আন্দোলন, যার স্রষ্টা রক্ষণশীল শিক্ষিত হিন্দুরা। তারা চায় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান, ধর্মভিত্তিক সমাজসংস্কার। সেজন্য প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা চলেছে, দক্ষিণভারতে দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের সস্তা অনুবাদ বেরুচ্ছে—এসব ব্যাপারে মহীশূরের রাজার খুব উৎসাহ ; মহীশূর থেকে বৈদিক ধর্ম সিরিজের প্রথম বই বেরিয়ে গেছে।

মিশনারি কনফারেন্সে পঠিত একটি প্রবন্ধ (*Missionary Expectancy and Success*) হার্ভেস্ট ফিল্ড ১৮৯৭, ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ছেপেছিল। প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদকের লেখা। লেখক বলেন, পুরনো হিন্দুধর্ম মরে গেছে। পুতুল আছে, মন্দিরও আছে, হাজার-হাজার লোকও সেখানে আসে, কিন্তু যান্ত্রিকভাবে। তাদের আধ্যাত্মিকতা নেই। তারা আসে তামাশার জন্য। কিন্তু তিনি সেইসঙ্গে বলেন—তাহলেও আর একটা বিপজ্জনক জিনিস আছে, যার মোকাবিলা আমাদের করতে হবে—নব্য হিন্দুধর্ম। এ-বস্তু ভবিষ্যতে কি ঝঞ্ঝাট বাধাবে বলা শক্ত, কারণ জাতীয়তার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। তাছাড়া জাতিপ্রথা একটা কঠিন জিনিস—খ্রীস্টধর্ম প্রচারের পথে প্রধান বাধা। হিন্দুরা প্রাণ গেলেও জাত ছাড়তে চায় না। আর আছে মারাত্মক হিন্দুদর্শন—আক্রমণোদ্যত নয়, কিন্তু বড় সূক্ষ্ম। সযত্নে তার প্রভাব এড়াতে হবে।৩১

---

২৯ "The writer [Rev. C. S. Rivington] a well known missionary of this diocese, has put together with great candour and lucidity the hindrances to Christianity which are the cause of the present paucity of baptisms, a paucity which is surprising considering the agencies now at work."

[*Times of India* ; Aug. 3, 1898]

৩০ পুনার দেশীয় খ্রীস্টান পত্রিকা জ্ঞানোদয় দেশীয় খ্রীস্টানদের মধ্যে পূর্বতন হিন্দুজীবন-যাত্রার প্রভাব বলবৎ দেখে আতঙ্ক প্রকাশ করেছিল। বলেছিল যে, খ্রীস্টানদের মধ্যেও আছে জাতি-প্রথা, তারা হিন্দুদের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করে, হিন্দু আচার-বিচারের অনুসরণ করে এবং খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ। মরাঠা পত্রিকা ১৮৯৫ ৪, অগস্ট জ্ঞানোদয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করে--সায় দিয়ে বলে, হাঁ ঠিকই, অনেকেই কেবল নামে খ্রীস্টান বস্তুতঃ হিন্দু। তারা যে ধর্মে খ্রীস্টান একথা তারা কেবল জানায় সুবিধে আদায় করবার সময়ে। জমি নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করে আদালতে গিয়ে ইউরোপীয় বিচারকের সহানুভূতি কাড়বার জন্য তারা বলে—আমি খ্রীস্টান।

৩১ "There is, however, [other than the old Hinduism], a neo-Hinduism with which we shall have to enter into conflict, This has not yet fully declared itself. There is manifest a tendency to go back to a pure form of Hinduism, to purge

১৯০২ অগস্ট মাসে হেনরি হেগ লণ্ডনে একটি বক্তৃতা করেন (*Some Leading Ideas of Hinduism*), সেটি পরে পুস্তিকাকারে বেরোয়, তার মধ্যে তিনি হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা অসম্ভব কঠিন, এই স্বীকারোক্তির পরে বলেন, পৃথিবীতে খ্রীস্টধর্ম এতবড় প্রতিরোধের সম্মুখীন কোথাও হয়নি, অতীতে বা বর্তমানে। এবং হিন্দুদের বেদান্তদর্শনের সঙ্গেই খ্রীস্টানদের সবচেয়ে বেশি করে লড়তে হবে, যে-বেদান্তের কয়েকটি মত (যথা পাপবাদ-বিরোধিতা) অত্যন্ত অসুন্দরভাবে বিবেকানন্দ উপস্থিত করেছেন।৩২

॥ ৪ ॥

নৈরাশ্যের যমজ ভ্রাতার নাম বিদ্বেষ। মিশনারিদের হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্বাবধি ঘৃণা ছিল না এমন কথা কেউ বলবে না, তাঁরা অবজ্ঞা উপেক্ষার উচ্চাসন থেকে ঘৃণা বর্ষণ করতেন, কিন্তু যখন দেখা গেল, দু'চারটে পাটকেল হিন্দুরা ফিরিয়ে দিতে পারে, এবং শিক্ষিত হিন্দুদের দলে-দলে খ্রীস্টান করা কঠিন, তখন আশাভঙ্গের জ্বালায় অস্থির হয়ে তাঁদের অনেকেই তিক্ততম ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে তাঁর সমাজসংস্কার-প্রীতির জন্য মিশনারিরা খুবই বন্ধুজ্ঞান করতেন।

it of what is gross and obscene, to read into it new ideas and aims and to make it serve the purpose of this present age.... This neo-Hinduism is aggressive, it is sometimes insulting, it is somewhat unscrupulous; but it is an improvement on the gross idolatry of puranic Hinduism.... It is not easy to forecast the trouble that this neo-Hinduism is to produce, because it has linked itself to a false patriotism.... [It] is likely to be a great hindrance to Christianity.... In the near future it is likely to be a cause of fierce conflict....

"Hindu philosophy will be a force that we shall long have to battle with. When practical paganism had lost its hold of the Roman Empire, it was the revival of pagan philosophy that brought such persecution and disaster to the Christian community. So will it be in India. The philosophy happily is not of the aggressive persecuting kind. It is of that subtle, mystical, vague type which will skillfully weave its webs to entrap the Church of the future. It will be the source of many a heresy in the Christian Church, and the Church must be trained from the first to distinguish its subtle influences."

['Missionary Expectancy and Success'; *Harvest Field;* Feb., t897]

৩২ "Missionary success in the West—in West Africa and West Indies—were swift and exciting but it is a far cry from there to India.... It must never be forgotten that Hinduism is a really great system. Not at Rome, nor yet at Ephesus, nor even in Athens, did the Apostle Paul ever encounter such a system as meets us in India. The system represented by these names were all born after Hinduism, and they have now been so long dead that any reference to them to-day is merely a reference to very ancient history. But Hinduism lives on. Age has not decayed it, rivals have not destroyed it....

"Of all teaching comprehended within the system of Hinduism the most important and the most difficult is the Vedanta philosophy.... It is by far the most pervasively influential.... It is in that philosophy that Christianity will find its latest, subtlest, most alert and most tenacious antagonist in India." [*Some Leading Ideas of Hinduism*; by Henry Haigh; Aug., 1902]

কিন্তু যখন দেখা গেল, তিনিও হিন্দুধর্মের সমর্থন এবং খ্রীস্টধর্মের সমালোচনা করছেন, তখন রেভাঃ স্লেটারের অনুশীলিত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল—তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত করে বললেন, আয়ার একজন ভন্ড, কারণ তাঁর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস না থাকলেও খ্রীস্টধর্মের সমালোচনা করছেন। ঐ সমালোচনায় আন্তরিকতা নেই, বদ মতলবের প্রকোপ রয়েছে; তাতে ধর্মভাবের বদলে জাতীয়তার প্রাবল্য। স্লেটার দুঃখে বললেন, ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্যভাব যতটা মনে করা হয় ততটা ঢোকেনি, অপরপক্ষে ঐ শিক্ষার জোরে তারা নিজেদের রীতিনীতি ও শাস্ত্রের সমর্থন করে যাচ্ছে। স্লেটার দাবি করলেন, খ্রীস্টানরা গোঁড়া হতে পারে কিন্তু প্রাণের কথা বলে, অপরপক্ষে 'হিন্দু'র লেখক (অর্থাৎ আয়ার) মন মুখ এক করে লেখেন না। [মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিন; মার্চ, ১৮৯৮]

একই বিতৃষ্ণার সঙ্গে হার্ভেস্ট ফিল্ড (ডিসেম্বর, ১৯০১) লক্ষ্য করল—মাদ্রাজের নূতন হিন্দু পত্রিকা 'আর্য' হিন্দুদের রক্ষণাত্মক মনোভাব ছেড়ে দিয়ে আক্রমণশীল হতে আহ্বান করেছে। এবং মারাত্মক—হায়ার ক্রিটিসিজমের সাহায্য নিয়ে গস্‌পেলের ছিদ্র দেখিয়ে দিতে বলেছে। এই পত্রিকা ছদ্ম আনন্দ প্রকাশ করে বলল, ভালই তো, হিন্দুরা খ্রীস্টান-শাস্ত্র পড়তে আগ্রহী হচ্ছে। কিন্তু পাছে হায়ার ক্রিটিসিজমের কথাবার্তাগুলো বেশি চাউর হয়ে পড়ে, তাই হিন্দুদের অনুরোধ করল, ইউরোপীয় পন্ডিতদের ঐসব গস্‌পেল-বিরোধী সমালোচনার সাহায্য না-নিয়ে তোমরা স্বাধীনভাবে বিচার করে কথা বলো। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট—সেক্ষেত্রে কথাগুলোকে টুস্‌কি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাবে, কেননা তা অদীক্ষিত, ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে পরিচয়হীন ব্যক্তিদের কথা!

স্বীকার করতে হবে, মিশনারি-পত্রিকাগুলি স্বাধীনভাবেই গালমন্দ করছিল। প্রগ্রেস্‌ ১৮৯৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সুদীর্ঘ এক রচনায় হিন্দু যোগশাস্ত্রের স্বাধীন কুৎসা করেছিল। তার আগে ১৮৯৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় যোগীদের মুক্ত নিন্দাও করেছে। হার্ভেস্ট ফিল্ড (১৮৯৬, ফেব্রুয়ারি) তিরুপতি মন্দিরের কোনো কেলেঙ্কারীকে হিন্দুধর্মের নীতিহীনতার অকাট্য প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়েছিল। অনুরূপভাবে একটি খ্রীস্টান পত্রিকা দক্ষিণ-ভারতে কোনো মন্দিরে সেবায়েতদের বাগড়াঝাটি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল, বিবেকানন্দের আস্ফালন সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম এমন অপদার্থ যে, নিজেদের ধর্মীয় ঝগড়া মেটাতে পারে না (হিন্দু, ১৮৯৪, ১৯ ফেব্রুয়ারি), এবং ত্রিচিনাপল্লীর এস-পি-জি মিশনের রেভাঃ জে এ শ্যারক, এম-এ, কলকাতার ইন্ডিয়ান চার্চ কোয়ার্টারলি রিভিউ-এ "ভারতীয় খ্রীস্টধর্মের উপরে হিন্দু-ধর্মের প্রভাব" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে জানালেন, ঐ প্রভাব খুব মন্দঃ "হিন্দুধর্ম যেহেতু নিছক আনুষ্ঠানিকতার ধর্ম, তাই পাপের বিষয়ে কোনো বাধা দেয় না, হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা বলে না। ফলে দেশীয় খ্রীস্টানদের উপরে তার প্রচন্ড কু-প্রভাব পড়ে। অবিবাহিত মেয়েকে ফুসলানো হিন্দুধর্মে কোনোই পাপ নয়। ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নের জবাব দিতে গিয়ে দেশীয় খ্রীস্টানরা প্রবঞ্চনার বদলে প্রবঞ্চনা, কপটতার বদলে কপটতা, জুয়াচুরির বদলে জুয়াচুরি করে—নেটিভ খ্রীস্টানদের মধ্য থেকে সেই মিথ্যাচার ও জোচ্চুরির দৃঢ়মূল পাপ দূর করা অসম্ভব। জাতি-হিসাবে হিন্দুরা বোধহয় এই দুষ্ট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুশ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, চতুর লোক—একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত। এসব কথার ব্যাখ্যানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এই লোকগুলি, তুচ্ছ রীতি-লঙ্ঘনকে যেখানে জঘন্যতম অপরাধ বলে মনে করে, সেখানে চূড়ান্ত লাম্পট্য বা বজ্জাতিতে কোনো দোষ দেখে না।" [বঙ্গবাসী; ১৮৯৯, ১১ মার্চ]

রেভাঃ শ্যারকের মন্তব্যে দক্ষিণভারতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল—ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ঘৃণাসৃষ্টি ভারতীয় দন্ডবিধির আওতায় এসে যায়, একথা রুষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল হিন্দু পত্রিকা, কিন্তু তাতে শ্যারক-কুলের থোড়াই কেয়ার। তাঁরা বলতে কুণ্ঠিত

হলেন না—বাঙালীরা জাতিগতভাবে মিথ্যাবাদী। রেভাঃ লালবিহারী দে'র একটি ইংরাজি জীবনীর ভূমিকায় ডাঃ টি স্মিথ নামক জনৈক স্কচ মিশনারি মেকলে-পন্থায় ঐ কথাগুলি বলেছিলেন। বেঙ্গলী (১৯০০, ১৭ সেপ্টেম্বর) উক্ত ভদ্রলোকের যে মাথায় গণ্ডগোল আছে, একথা জানাবার পরে মধুরভাবে বলেছিল, কাচের ঘরে বসে অপরকে ঢিল না ছোঁড়াই ভাল, কারণ ইংরেজ ও ফরাসিদের মিথ্যাবাদী বলেছে, এমন লোকের অভাব নেই, এবং ভারতীয়দের সত্যপ্রীতি সম্বন্ধে বিখ্যাত অভারতীয়দের সাক্ষ্যের উল্লেখ করাও সম্ভব। বেঙ্গলী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, মিশনারিগণ বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে এহেন ধারণা করতেই পারেন, যেহেতু সমাজের সবচেয়ে নিম্নচরিত্রের মানুষদের সঙ্গে তাঁদের কারবার। এবং যে-কোনো হিন্দুর অনাচারকে হিন্দুধর্মের অপরাধরূপে গণ্য করার চেষ্টার উত্তরে বেঙ্গলী জনৈক প্রাক্তন মিশনারি ইংলণ্ডে গিয়ে চুরি-চামারির অভিযোগে ধরা পড়েছে, এই সংবাদ ছেপেছিল (১৯০১, ৩০ অক্টোবর)। এই মিশনারি হাত-দেখার ব্যবসাও সেখানে শুরু করেছিল। বেঙ্গলী বলল, হায়, এই ব্যক্তি ভারতে থাকাকালে উক্ত দুষ্কার্যের জন্য হীদেনদের কত কেচ্ছাই না করেছিল!

মিশনারি ও ভারতীয়—দুই পক্ষের লেনদেনে কাগজপত্র এইসময়ে রীতিমত উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। একটা জায়গায় কিন্তু ভারত-পক্ষে পূর্ব-নির্ধারিত পরাজয়—ব্যক্তিগত কেচ্ছায় নামা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, এবং অন্য ধর্মের অসম্পূর্ণতার কথা বললেও তার সম্বন্ধে কুৎসিত গালাগালিতে সে সমর্থ ছিল না। বড় জোর সে খ্রীস্টান জাতিসমূহের ঔদ্ধত্য ও উৎপীড়নের এবং ব্যবসায়িক স্বার্থপরতার কথা বলেছে, কিংবা মিশনারিদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার কথা।

এর মধ্যে পুরুষোত্তম রাও তেলাং মিশনারি-পদ্ধতির প্রতি একটু বেশি আসক্তি দেখিয়েছিলেন, কারণ, তাঁর স্বীকারোক্তি-অনুযায়ী মিশনারিরাই তাঁকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। এই মরাঠি ব্রাহ্মণ চিকাগো-বিশ্বমেলার আগে ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকায় হাজির হন। সেখানে নখ দিয়ে ছবি এঁকে, তা বেচে গোড়ার দিকে গ্রাসাচ্ছাদন করেন। পরে তাঁর চমৎকার সরস কথাবার্তা বলার ক্ষমতা তাঁকে বক্তা ও লেখক করে তোলে। যখন আমেরিকা যান তখন ছিলেন উদাসীন হিন্দু, কিন্তু আমেরিকায় মিশনারিদের কাণ্ডকারখানা দেখে এবং ভারত-কুৎসার ব্যাপকতা দেখে তাঁর ভিতরে দেশপ্রেমিক মানুষটি জেগে ওঠে এবং হিন্দুধর্ম ও জীবনযাত্রাকে সমর্থনের প্রতিজ্ঞা তিনি করেন। তিনি দেখেছিলেন, মিশনারিদের প্রচার-কল্যাণে "ভারতবাসী বর্বর হীদেন, পাপে এবং দুঃখে নিমজ্জিত। তারা পত্নীদের পোড়ায়, কন্যাদের খুন করে, এবং শিশুদের ভোজন করে।" পরিস্থিতি এমনই ছিল, একবার একদল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী তেলাং-কে দেখতে এসে কাছে আর এগোয় না পাছে এই নরমাংসভোজী ব্যক্তিটি তাদের সদ্য ধরে কচ্‌কচ্‌ করে খেয়ে ফেলে। ধর্মমহাসভায় গিয়ে তেলাং শুনলেন, পেণ্ডারগাস্ট (পেণ্টিকস্ট) নামক জনৈক পাদ্রি বলছেন, ভারতের পুরোহিতানীরা সব বেশ্যা। এই অপমান সহ্য করবার পাত্র নন তেলাং। বিশেষতঃ তিনি যখন দেখলেন—ধর্ম-ব্যাপারটা আমেরিকায় প্রায় নেই। জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র খ্রীস্টান, যার মধ্যে অধিকাংশ আবার টলমল-পার্টি, ভণ্ড-পার্টি, এবং পত্নীভয়ে-ধার্মিক-পার্টি। দেখলেন, সেখানে ধর্ম বিশুদ্ধ ব্যবসা। ধর্মের বাইরে যে-অধিকাংশ লোক রয়েছে, তাদের অজ্ঞেয়বাদী ইঙ্গারসোল শোনাচ্ছে—বাইবেল চতুর জেলেদের রচা গল্প—দরিদ্র অজ্ঞ মানুষদের ঠকাবার জন্য। ব্যাপার-স্যাপার দেখে তেলাং মিশনারি-পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত করলেন, এইসব লোক বর্তমানে মানুষ, কিন্তু হিন্দু-পুরাণ-মতে বা ডারউইন-মতে পূর্বজন্মে ওরাং ওটাং। তেলাং-এর জিভে ছিল ধার এবং রস। চটপটে কথায় তিনি অদ্ভুত দক্ষ। আমেরিকার স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল : এখানে স্বামীরা স্ত্রী এবং স্ত্রীরা স্বামী; এখানে লর্ড বা ডিউক উপাধির

প্রয়োজন নেই কারণ সবাই লর্ড; খ্রীস্টধর্ম, হুইস্কি এবং আত্মা হাত-ধরাধরি করে চলে, খ্রীস্টধর্ম ব্রাহ্মণকে নাস্তিক করতে সমর্থ কিন্তু খ্রীস্টান করতে নয়; এবং মিশনারিরা এমনই বদান্য যে সবটুকু ধর্ম অপরকে দিয়ে ফেলেছে—নিজেদের জন্য ছিটেফোঁটাও রাখেনি!

বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ কাগজে ১৮৯৪, ৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত *A Brahmin on the Warpath* নামক সম্পাদকীয় এবং ১০ ডিসেম্বর তেলাং-লিখিত একটি সুদীর্ঘ পত্র বেরিয়েছিল—তার থেকে উপরের সংবাদগুলি সংগ্রহ করেছি। অমৃতবাজার ১৮৯৫, ২৯ জানুয়ারি 'পুরুষোত্তম রাও তেলাং' নামে একটি সম্পাদকীয়ও লিখেছিল। এই সমস্ত রচনার মধ্যে ভারত-পক্ষে প্রতিঘাত হানার চেষ্টা দেখা যায়। আমেরিকানদের তীক্ষ্ন রসবোধের সুযোগ নিয়ে [তারা রসিকতা অবিলম্বে বুঝে ফেলে, তাদের দ্বীপবন্ধ ইংরেজ তুতো-ভ্রাতাদের মতো মাসখানেক পরে হাসে না] তেলাং তাঁর চতুর তীক্ষ্ন উক্তির উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন কিন্তু অনেক বেশি ধীরস্থির জৈন-প্রতিনিধি বীরচাঁদ গান্ধী—স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন কথাই শুনিয়েছিলেন (তাঁর এই কাজের বিষয়ে স্বামীজীর প্রশংসার কথা আগেই জানিয়েছি) —কিন্তু ঐ শান্ত উক্তি কম ভয়ংকর ছিল না, যে-কারণে পুনার দেশীয় মিশনারি কাগজ জ্ঞানোদয় বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিল, গঙ্গায় শিশুনিক্ষেপ বা জগন্নাথের রথের তলায় আত্ম-বিসর্জনের পুরাতন দু'একটি কাহিনীকে এখনকার কালে প্রচলিত ঘটনা বলে উল্লেখ করা উচিত নয়। সেইসঙ্গে অবশ্য সে বর্তমান হিন্দুসমাজের আরো নানা দোষের উল্লেখ করতে ভুলল না। [বম্বে গার্ডিয়ান; ১৮৯৬, ১ অগস্ট]। শান্ত বীরচাঁদ গান্ধীও ক্ষেত্রবিশেষ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আদিযুগের খ্রীস্টান মিশনারিদের মদে এবং লাম্পট্যে হাবুডুবু খাওয়ার কথা বলেছিলেন, যা দেখে ঘৃণায় শিউরে উঠত তখনকার দেশীয় মানুষ। [হিন্দু পেট্রিয়ট; ১৮৯৪, ৩ মে]। একালে খ্রীস্টান-শাসনে একই পাপের ব্যবসায়িক বিস্তারের কথাও জানিয়ে-ছিলেন। নিউইয়র্কের নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি ক্লাবে বিশপ থবর্নের সঙ্গে তাঁর ধর্ম-বিতর্ক হয়, আম্পায়ার ছিলেন ডাঃ পল কারুস। খ্রীস্টান সরকার ও খ্রীস্টান মিশনারিদের কল্যাণে কিভাবে ভারতে মদ্যস্রোত বইছে, তার হিসাব তিনি দেন ঐ তর্কে।৩৩ [লাইট অব দি ইস্ট; ১৮৯৫, মার্চ]।

হিন্দু-উত্থানের প্রেরণায় হিন্দু-পত্রিকাগুলি প্রতিবাদমুখে অনেক কথাই লিখেছিল। মিশনারি-জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কলকাতার হোপ পত্রিকার ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা মরাঠা উদ্ধৃত করেছিল (১৮৯৫, ২৬ মে)। তার মধ্যে ছিল—সেরা পোষাকে সেজে, সুন্দর ঘোড়ার সুদৃশ্য গাড়িতে চড়ে, সেরা মদ্যাদি সেবন করে, তিনি দরিদ্র বুভুক্ষু হীনদেরে আত্মার উদ্ধারে যাত্রা করেন। তিনি থাকেন প্রাসাদোপম ভবনে, সেখানে অন্ততঃ কুড়িটি দাস-দাসী; কাপড়-

৩৩ "The following sentences from Mr. [Virchand] Gandhi's speech are worthy of reproduction: "Under the king of Oudh, there was not one liquor shop in all Lucknow; now under the rule of Christian Government, there are more than a hundred. In the year 1890-91 the English Government derived 4,947,780 rupees from the liquor-traffic— a revenue three or four times larger than that derived either from customs or assessed taxes or forests or registrations or post office, and seven times as large as telegraphs, eight times as large as from law and justice. The income is increasing every year by five hundred thousand dollars.... Drinking is, in fact, an inseparable feature of Christianity as understood by low-class people who are perverted to Christianity.... You will be startled when I tell you that even the missionaries have administered intoxicants to make conversion more easy and sure. Perversion always precedes conversion." [*Light of the East*; March, 1895]

কলে তাঁর শেয়ার আছে (বার্ষিক আয় ২০,০০০ টাকা), খনির অংশীদার, আমেরিকায় বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি; তিনি ধর্মপ্রচারের সময়ে তারস্বরে বলেন—দিন আনি দিন খাই, তবু পড়ে আছি তোমাদের কাছে প্রভুর ত্রাণবাণী শোনাবার জন্য। মরাঠা মিশনারিদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল (১৮৯৪, ৭ অক্টোবর)—তোমরা যে 'খ্রীস্টীয় বিচার', 'খ্রীস্টীয় নীতি,' 'খ্রীস্টীয় ন্যায়পরতা' ইত্যাদি বলো—তোমাদের বলাটাই দেখিয়ে দেয় তোমাদের ধর্মের আশে-পাশে কি ছিল বা আছে। বিচার, নীতি, ন্যায়পরতা—এগুলো সহজ মানবিক গুণ, ওর সঙ্গে হিন্দু বা খ্রীস্টীয় যোগ করার দরকার নেই। তবু তোমরা ও-কাজ করো এইজন্য যে, বর্বরদের মধ্যে তোমরা ধর্মপ্রচার করেছ, যারা ওসবের ধার ধারত না। এই কাগজ তীব্রভাবে বলেছিল (১৮৯৬, ১৯ জানুয়ারি)—বন্ধুগণ তোমরা স্বদেশে ফিরে গিয়ে সেখানকার পলায়নপর ধর্মকে আটকে রাখার চেষ্টা করো দিকি। বৌদ্ধ ধর্মপাল এইকালে মিশনারিদের সমঝে দিয়েছিলেন (মহাবোধি; ১৮৯৭, সেপ্টেম্বর)—আপনারা মনে রাখবেন, আপনারা ভারতে আছেন, হটেনটট বা রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে নেই। বেঙ্গলীও সেই কথাই লিখেছিল (১৯০০, ৮ ডিসেম্বর)—মনে রাখবেন, হিন্দুরা জুলু নয়। সমস্ত পৃথিবী যখন অন্ধকারে ছিল, হিন্দুরা জেবলেছিল ধর্মের আলো। অমৃতবাজার সরস ভাষায় বলেছিল (১৮৯৫, ৩ অক্টোবর), "আমাদের আশংকা হয় খ্রীস্টানরা স্বর্গে গিয়ে সুখী হবে না, যদি সেখানে গিয়ে দেখে অখ্রীস্টানেরাও হাজির। তারা কোনো সুখই পাবে না, যদি না স্বর্গ থেকে অপরের নরকভোগ দেখতে পারে।" অমৃতবাজার ১৮৯৭, ২০ ডিসেম্বর আনন্দের সঙ্গে স্টেটসম্যানে খ্রীস্টীয় আধ্যাত্মিকতার ক্ষয় সম্বন্ধে প্রকাশিত চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছিল, এবং পরদিন নিশ্চিতভাবে জানিয়েছিল—ধর্ম একেবারে ত্যাগ করেছে রক্তলোভী ইউরোপকে। ইন্ডিয়ান নেশনও কথার ছুরি তুলে নিয়েছিল। ১৮৯৪, ১৭ সেপ্টেম্বর লিখল, মিশনারিরা আশা করে, এমন দিন আসবে যখন প্রভু হিন্দুদের সামনেও আত্মপ্রকাশ করবেন, এবং তারা শিখবে যে, খ্রীস্ট ছাড়া ত্রাণকর্তা নেই।—হাঁ, আসবে কেন, সেদিন ইতিমধ্যেই এসে গেছে—যদি তা আসে দেশীয় ধর্ম সম্বন্ধে তামাশা, বিদ্রূপ বা কুৎসা করলে, উচ্চপদস্থ খ্রীস্টান মহোদয়দের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সযত্নচর্চিত নীরবতা রক্ষা করলে, যুদ্ধ করে পররাজ্য গ্রাস করলে। হিন্দুদের নব-চেতনা এবং সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার চেষ্টা দেখে বিরক্ত মিশনারি-পত্রিকা এপিফ্যানী বলেছিল—কী কাণ্ড! হিন্দুরা ভাবত, তাদের অভ্রান্ত অনড় শাস্ত্র। এখন সেই হিন্দুরাও নড়তে শুরু করেছে। ইন্ডিয়ান নেশন মিষ্টভাবে উত্তর দিয়েছিল (১৮৯৫, ২২ জুলাই)—হাঁ, চলবার অধিকার যখন এপিফ্যানীর দলের লোকেদের একচেটিয়া, তখন তাতে অন্যের প্রতিযোগী হওয়া উচিত নয়।

॥ ৫ ॥

· অবস্থা যখন অত্যন্ত সংকট তখন টিনিভেলির রেভাঃ টি ওয়াকার জ্বলন্ত ভাষায় আহ্বান করলেন—

"খ্রীস্টান বন্ধুগণ! সহকর্মিগণ! চেয়ে দেখ, আমাদের সামনে পড়ে আছে হীদেন-মতবাদ ও রাশি-রাশি কুসংস্কারে চাপা পড়ে অতিকায় প্রাণীর মতো ভারতবর্ষ! কত শতাব্দীর দীর্ঘ ঘন নিদ্রায় অচেতন সে! আমাদের কর্তব্যের বিরাট পরিমাণ দেখে আমরা আতঙ্কিত। সূক্ষ্ম দর্শনের বিষনেশায় এবং কলঙ্কজনক কুসংস্কারের মোহে এমনই সে আচ্ছন্ন যে, তাকে টেনে তোলা আমাদের সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু বৎসর হিন্দুস্থানে গস্‌পেল শোনানো হয়েছে, খাঁটি ও উত্তম মনুষ্যগণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই দৈত্যের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করেছেন।

খ্রীস্টের সৈন্যগণ দল বেঁধে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে গেছে।...খ্রীস্টান কলেজ, স্কুল ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের নিখুঁত জালে আমরা গোটা ভারতকে, অন্ততঃ তার বৃহৎ অংশকে ঘিরে ফেলেছি—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—সে কাজ অতীতে আমরা করতে পেরেছি। কিন্তু—"

এই 'কিন্তু'র লেজেই আছে কাঁটা—

"কিন্তু আমাদের বহু বৎসরের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও পৌত্তলিকতা সমুচ্চ সিংহাসনে এখনো আসীন—আমাদের ব্যর্থ চেষ্টার উপরে হাসছে শয়তান!"

এক নম্বর শয়তানের নাম—বিবেকানন্দ!

বিবেকানন্দ এই প্রথম শয়তান হলেন না। আমেরিকায় মিশনারিরা যে তাঁকে শয়তান বলে গণ্য করত তা হিরাম ম্যাক্সিমের রচনায় আগেই পেয়েছি। ব্যঙ্গ কবিতায় তিনি শয়তান-রূপে চিত্রিত, তাও দেখেছি। ভারতবর্ষে মিশনারিরা যে, তাঁকে শয়তান বলে ভাববে, তাতে আশ্চর্য কি!

লোকটিকে শেষ করতে হবে—সিদ্ধান্ত হল। কিভাবে? লোকটির মাতৃভূমিকে যেভাবে পৃথিবীর সামনে ছোট করে দিয়েছি, সেইভাবেই—আঘাত করে, আক্রমণ করে, কেচ্ছা করে। ধর্মযুদ্ধও যেহেতু যুদ্ধ, ন্যায়নীতির পরোয়া করা যাবে না এখানে—কুৎসা করো যত পারো।

তবে মিশনারিদের মধ্যে বুদ্ধি, ব্যবহার ও চরিত্রের তারতম্য ছিলই। স্লেটারের মার্জিত কৌশলের সঙ্গে মার্ডক-হিউমের স্থূল আচরণের তফাত থাকে।

বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে মিশনারি-প্রচার কয়েকটি ধারায় প্রবাহিত হল। প্রথমতঃ, মিশনারিরা প্রমাণ করতে চাইল, বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম যথার্থ হিন্দুধর্ম নয়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি কালাপানির পারে গেছেন এবং স্লেচ্ছ খাদ্যপানাদি করেছেন, সুতরাং আর হিন্দু নন। তৃতীয়তঃ, বিবেকানন্দ মন্দ চরিত্রের মানুষ। চতুর্থতঃ, বিবেকানন্দের সাফল্যসংবাদ মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত। পঞ্চমতঃ, বিবেকানন্দের যেটুকু সাফল্য ঘটেছে, তা তাঁর জমকালো পোষাকের জন্য। তত্ত্বের ব্যাপারে যেখানে তিনি দাগ কেটেছেন বুঝতে হবে—সেই অংশে তিনি কৌশলে খ্রীস্টতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। এইসঙ্গে তারা গোপনে সরকারের কাছে জানালো—বিবেকানন্দ লোকটার আসল উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার নয়, রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি। খ্রীস্টান-শাসনের বিরুদ্ধে স্বামীজীর কঠিন উক্তিগুলি এক্ষেত্রে পাদরিদের সাহায্য করল। শেষোক্ত বিষয়ে অনেক সংবাদ ইতিপূর্বে দিয়ে এসেছি।

একটি ব্যাপারে স্বামীজী পাদরিদের অত্যন্ত বিপাকে ফেলেছিলেন—প্রচলিত খ্রীস্টতত্ত্বের কয়েকটি অংশকে তিনি মূলে নাড়িয়ে দেন। তিনি খ্রীস্টধর্মতত্ত্বের সরাসরি সমালোচনা করে ও-কাজ করেন নি, হিন্দুধর্মের মর্মকথাই তুলে ধরেছিলেন—কিন্তু সেই কথাগুলি অনেক ক্ষেত্রে খ্রীস্টানদের ধারণার বিরোধী। তার মধ্যে প্রচণ্ডতম হল পাপবাদ-বিরোধিতা। তার বিরুদ্ধে পাদরিদের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার কথাও আগে বলেছি। সৃষ্টির অনাদিত্বের কথাও বলে-ছিলেন, যা বিচলিত করেছিল খ্রীস্টানদের 'ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্টি'—এই তত্ত্বকে। অদ্বৈতবাদকে দ্বৈতবাদী খ্রীস্টানেরা আতঙ্কের চোখে দেখেন। স্বামীজী সদর্পে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার করেছেন। মায়াবাদকে পাদরিরা ভারতের নীতিহীনতার হেতু মনে করেন। স্বামীজী (ডয়সনের মতোই) দেখাবার চেষ্টা করেছেন—মায়াবাদসহ অদ্বৈতবাদ শ্রেষ্ঠ নৈতিকতার আশ্রয়। যা-কিছু হচ্ছে ঈশ্বর-করুণায়, ঈশ্বরই কেবল পরিত্রাণে সমর্থ—এই খ্রীস্টীয় তত্ত্বের পক্ষে অসুবিধাজনক হল কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ—তাকেও স্বামীজী অনবদ্যভাবে তুলে ধরে-ছিলেন। এবং তিনি প্রতীক-উপাসনার গৌরব ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি, যাকে পুতুল পুজো নাম দিয়ে মিশনারিরা তার উপরে ডাণ্ডা ঘুরিয়েছে সর্বদা।

পাদরিরা আতঙ্কের চোখে দেখল—ঐ সমস্ত কথা বিবেকানন্দ বলছেন অসাধারণ শক্তি-শালী, সুন্দর অথচ প্রত্যক্ষ ভাষায়। তিনি দার্শনিক কচ্‌কচি পরিহার করেছেন। গোটা

ব্যাপারটাকে সাক্ষাৎ সত্যবৎ উপস্থিত করেছেন। ব্যাপারটা বুদ্ধির কারসাজি নয়—উপলব্ধির প্রকাশ—তাঁর কথা থেকে মনে হয়েছিল। কথাগুলো গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায় না—সরাসরি ঢুকে যায় মনের, প্রাণের মধ্যে—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, অস্থির করে, আলোকিত করে, উত্থিত করে ঊর্ধ্বতর চেতনায়। বিবেকানন্দ যদি কোনো দর্শনের অধ্যাপকের ভাষায় কথা বলতেন, তাহলে স্বচ্ছন্দে দর্শনের ভাষায় তার উত্তর দেওয়া যেত এবং তর্কের নিয়ম অনুযায়ী সবাই পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরত, লক্ষ্যে পৌঁছত না কেউ—অন্ততঃ কেউ যদি পৌঁছতে না চায় তাকে পৌঁছে দেয় কে? পাদরিরা তাই বিবেকানন্দকে বারে-বারে তর্কযুদ্ধে নামাতে চেয়েছে, কিন্তু বিবেকানন্দ ভ্রূক্ষেপ করেন নি। পাদরি দুয়ো দিয়ে বলেছে, লোকটি মোটেই দার্শনিক আলোচনায় সমর্থ নয়, বিবেকানন্দ তারও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তিনি নিজের কথা বলে গেছেন প্রত্যয়ের কণ্ঠে এবং সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন—আমার কথা—কথা নয়—বাণী। I have delivered my message, that is all. অনপনেয় আলোকের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল বিবেকানন্দের কথা—তা কথা নয় আপ্তবাক্য—ইংরেজি ভাষায় নতুন উপনিষদ।

॥ ৬ ॥

বিবেকানন্দ স্বয়ং তত্ত্ব-তর্কে না নামলেও মিশনারিরা নেমেছিলেন—এবং তাঁদের সঙ্গে উপযুক্তভাবে মুখোমুখি লড়াই করেছিল হিন্দু পত্রপত্রিকাগুলি। এ-ব্যাপারে এতদিন পর্যন্ত মিশনারিরা একাধিপত্য করে যাচ্ছিলেন, কারণ তাঁদের দলে আছেন প্রচুর বেতনভুক লেখক, হাতে আছে প্রভূত অর্থ, অভ্যস্ত কতকগুলি কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলবার মতো ট্রেনিং আছে, এবং সুবিধা আছে—তর্কের ভাষা ইংরেজি, যা তাঁদের মাতৃভাষা। হিন্দুপক্ষে অসুবিধা সবিশেষ—পয়সা নেই, লোক নেই, বৃথা ধর্মতর্ক রুচিতে বাধে এবং পরাধীনতার কারণে নৈরাশ্য ও উৎসাহহীনতায় মনপ্রাণ পূর্ণ। তদুপরি ভাষার অসুবিধা (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইংরেজি জানেন না), এবং মন হীনমন্যতায় আক্রান্ত। কিন্তু যখন সহসা জাতীয় জাগরণ শুরু হয়ে গেল, তখন সবাই যেন পরমোৎসাহে দল বেঁধে এগিয়ে এল প্রতিরোধে। অসুবিধা সত্ত্বেও এমন প্রতিঘাত তাঁরা দিতে পারলেন যে, রেভাঃ স্লেটার (এবং তাঁর মতো আরও অনেকে) বিষণ্ন মনে উপদেশ শোনালেন—ছি! ধর্ম কি কূটতর্কের জিনিস?

বেদান্ত তখন যেহেতু সবকিছুকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, তাই তার উপরেই মিশনারিদের প্রচণ্ডতম আক্রমণ। ইউরোপীয়-মহলে কিন্তু বেদান্তভক্ত মানুষও ছিলেন। তেমন একজন ইংরাজ বেদান্ত-শিক্ষার্থী মাদ্রাজ মেল-এ ১৮৯৭, ১৮ নভেম্বর এক পত্রে বললেন, কোনো জাতির বিচার করা উচিত তার শ্রেষ্ঠ রূপের দ্বারা। অংশের উপর নজর দিলে অনেক মন্দ চোখে পড়বে কিন্তু সমগ্রতঃ হয়ত তা মহান। ইনি বললেন—বেদান্তের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের একটি, তা বাস্তববোধ নষ্ট করে মানুষকে স্বাপ্নিক করে তোলে। সেকথা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়—কঠোপনিষদের নচিকেতাই তার দৃষ্টান্ত, যে-বালকটি কঠিনতম সত্যকে পাবার জন্য পদক্ষেপ করেছিল, স্বপ্নে ডুবে যায় নি। বৈদান্তিক বলেন, তবে দেখো, কর্ম করাই যেন শেষ জিনিস না হয়ে পড়ে, কর্মরহস্যও জানো। বেদান্তে নৈতিকতা নেই? বাজে কথা। অন্যেরা নৈতিকতার কথা বলেছে, বেদান্ত তার হেতু আবিষ্কার করেছে। অন্যেরা বলেছে, অপরকে ভালবাসো, বেদান্তও তাই বলেছে অধিকন্তু তার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে—অপরকে ভালবাসার কারণ হল, সেই 'অপর'—আমি ছাড়া কেউ নয়। বেদান্ত থেকে অভেদসূচক অনেক উক্তি উদ্ধৃত করে এই ইংরেজ বেদান্ত-ছাত্র তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, বেদান্তের নৈতিকতার ভিত্তি এই অভেদবোধ।

বেদান্তের পক্ষে ইংরাজের কলম চালানোর মতো গর্হিত কাজ বিনা প্রতিবাদে পার পেতে পারে না। ২০ নভেম্বর মাদ্রাজ মেলে খ্রীস্টান-পক্ষে প্রতিবাদ করলেন ত্রিচিনাপল্লীর মিশনারি জে এ শ্যারক, যাঁর মনের চেহারা আগেই দেখেছি। কুৎসায় আমোদী এই ব্যক্তি যুক্তি-তর্কের ধারে-কাছে না গিয়ে স্থির করলেন—ঠাট্টা-তামাশার ধুনো দিয়ে বেদান্ত-ভূতকে তাড়ানো যাবে। সুতরাং বেদান্তের উদারতা প্রসঙ্গে বললেন : "আমরা খ্রীস্টান—আমাদের অসহিষ্ণু বলা হয়। এখনকার সময়ে এর থেকে বড় নিন্দা আর কি হতে পারে! অপরপক্ষে আছেন উদার বেদান্তীরা—তাঁরা সকল ধর্মকে আলিঙ্গন করেন—সকল অজ্ঞেয়বাদকে—সকল পাপকে। সে বড়ই সহিষ্ণু, প্রশংসা করো তার। খ্রীস্টানরা বলে, যদিও নানা প্রবাহ একই পর্বত থেকে নেমে একই সমুদ্রে পড়ে, তবু ভগবানের অনুগামী আর শয়তানের অনুগামী শেষ পর্যন্ত একই স্বর্গে হাজির হবে—তার পক্ষে ঐ উপমাটা নিশ্চিত প্রমাণ নয়।" ঠাট্টা ছেড়ে রাগে অস্থির হয়ে পাদরি শুধোলেন—"কি করে জানলে যে, সেণ্ট অগস্টাইন এবং চৈতন্য একই থাকের সেণ্ট—তোমরা কি ভগবান নাকি যে, এ-ব্যাপারে বিচার করে ফেলছ?" না, সবাই এক নয়, সেকথা পাদরি-সাহেব এবার উপমার আশ্রয় নিয়েই বললেন : "গর্ডন হাইল্যাণ্ডার আর আফ্রিদীরা, সবাই মনুষ্যজাতীয়, কিন্তু [illegible]রা বিভিন্ন পতাকার তলায় থেকে লড়াই করে, যেমন সাধুরা আর পাপীরা লড়াই করে—এক পক্ষ ঈশ্বরের জন্য, অন্য পক্ষ শয়তানের জন্য।" মোদ্দা কথা শুনিয়ে দিলেন : "আবার বলছি, বেদান্ত কোনো অর্থেই ধর্ম নয়। ওটা নিছক একটা মিস্টিক ধরনের দর্শন—বহুদেববাদের ভিত্তিতে গঠিত। অধিকন্তু তা, যে-ব্যক্তি মৎস্য খেতে চায় তাকে দেয় সর্প।" রাগে-দুঃখে চেঁচিয়ে পাদরি বললেন : "ভারত যখন রুটি চাই, রুটি চাই বলে চেঁচাচ্ছে, তখন বেদান্তের ইংরাজ-ছাত্র কেন তাকে প্ররোচনা দিচ্ছে শুকনো পাথর চিবোবার জন্য?"

যোগী পার্থসারথি আয়েঙ্গার মাদ্রাজ টাইমসে এক পত্রে খ্রীস্টধর্মের উপরে হিন্দুপ্রভাব প্রমাণের জন্য যুক্তিবিস্তার করেছিলেন—তার উত্তর দিলেন জনৈক এস পি অ্যাণ্ডি (মাদ্রাজ টাইমস ১৮৯৪, ৩০ অগস্ট)। তিনি মহা পাণ্ডিত্য সহকারে জানালেন—উল্টোটাই সত্য—বিষ্ণুপুরাণে আছে ব্রাহ্মণেরা শ্বেতদ্বীপে গিয়ে খ্রীস্টমত শিখে এসেছিলেন; সুতরাং স্বয়ং কৃষ্ণ বিদেশী, ব্রাহ্মণ শব্দ হিব্রু থেকে এসেছে ইত্যাদি। ইনি খ্রীস্টকে মহম্মদ বা মোজেসের মতো সাধারণ শিক্ষক-পর্যায়ভুক্ত করার বিরুদ্ধে আপত্তি করেন। একই প্রকৃতির পাণ্ডিত্য সহকারে হিন্দুপক্ষে একজন উত্তর দিলেন (৪ অক্টোবর), যার মধ্যে 'হিন্দু', 'নমো নারায়ণায়', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি শব্দের উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ডাঃ লুন আমেরিকায় হিন্দুধর্মের নীতিহীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করছিলেন, ভারত থেকে শিবশঙ্কর পাণ্ড্য তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানালেন (মাদ্রাজ টাইমস; ১৮৯৪, ১২ নভেম্বর)।

যুক্তি তর্কে পশ্চাৎ অপসরণ করে পাদরিরা কিছু নূতন কৌশল গ্রহণ করলেন। তাঁদের কেউ-কেউ মেনে নিলেন, হাঁ, হিন্দুশাস্ত্রে অত্যুচ্চ নৈতিকতা আছে, কিন্তু যতক্ষণ না তারা দেহধারী ভগবানকে মেনে নিচ্ছে, এবং অদ্বৈতবাদের কু-দর্শন ছাড়ছে, ততক্ষণ ঐ নৈতিকতা তাদের জীবনে নামবে না। অদ্বৈতবাদের জন্য পাপবাদ হিন্দুরা গ্রহণ করতে পারছে না। মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত (১৯০১, জানুয়ারি) এই বক্তব্যযুক্ত রচনার প্রতিবাদ করে ইণ্ডিয়ান রিভিউ (১৯০১, ফেব্রুয়ারি)। প্রবন্ধ ভারত বৈদান্তিক নৈতিকতার ব্যাখ্যা করেছিল, তার উত্তরে মিশনারি-পত্রিকা 'প্রগ্রেস্' ১৮৯৮ অগস্ট সংখ্যায় যে-সব কথা লিখল, তাতে নূতনত্ব কিছু নেই—যদি আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হই, তাহলে আমার পাপ ঠেকাবে কে? বিবেকানন্দ পরিব্রাজক-জীবনে এর যে মোক্ষম উত্তর দিয়েছিলেন, তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। "বেদান্ত সকল নৈতিকতার মূলোচ্ছেদ করে," এই কথাটাকে কিন্তু টিকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। বোম্বাইয়ের বিশপ ভারতীয়দের তুলনায়

ইংরাজদের উচ্চতর নৈতিকতার দাবি করলে হিন্দু পত্রিকা তীক্ষ্নভাবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, নথি-পত্র ওল্টালে দেখা যাবে, হীদেন-অধ্যুষিত ভারতবর্ষের তুলনায় অতীব খ্রীস্টান স্কটলণ্ডে অপরাধের সংখ্যা বহুগুণে বেশি। (হার্ভেস্ট ফিল্ড; ১৯০২ মে)। এ ধরনের কথা আগেও অনেকে বলেছেন। ইণ্ডিয়ান নেশন প্রশ্ন করেছিল (১৮৯৪, ১৯ ফেব্রুয়ারি)—"যদি আমরা খ্রীস্টধর্মের বিচার বাইবেল দিয়ে না করে খ্রীস্টানদেশের আদালতের কাহিনী, খেলার মাঠ, থিয়েটার দোকান, কিংবা পথঘাটের ব্যাপার দিয়ে করি—কেমন দাঁড়ায়?" চাপে পড়ে এই সময়ে বুদ্ধিমান রেভাঃ স্লেটারকে স্বীকার করতে হল, ঠিকভাবে অনুসরণ করলে বেদান্তের মধ্যে উচ্চ কঠোর নৈতিকতা মিলবে,৩৪ তবে তা জীবনে প্রতিফলিত করা হয় না, এই যা।

বেদান্তের নৈতিক আদর্শের প্রসঙ্গটি এই কালে পত্রপত্রিকার বিশেষ মনোযোগের বিষয় হয়েছিল। "বেদান্তের সামাজিক আদর্শ" সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদিন যে-প্রবন্ধ লেখে, তাকে "অত্যন্ত শক্তিপূর্ণ," ও "সুলিখিত" বিবেচনা করে থিয়জফিক থিংকার ১৮৯৬, ২২ ফেব্রুয়ারি উদ্ধৃত করে। ফলাকাঙক্ষা না করে কাজ করে যাবার বৈদান্তিক আদর্শের চেয়ে আর কোন্ মহত্তর আদর্শ সম্ভব—থিয়জফিক থিংকার প্রশ্ন করেছিল।

মিশনারিরা হীদেনদের দেশে প্রচার করতে এসে একটি তত্ত্ব নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়েছিলেন। যত ভাল লোকই হও না বাপু, খ্রীস্টান না হলে অনন্ত নরক তোমার। এই কথা তাঁরা দিনের পর দিন শুনিয়েও এসেছেন। হীনমন্যতায় আচ্ছন্ন যখন হিন্দুরা, তখন তাদের উপরে চড়ে ওসব কথা বলা চলত, কিন্তু যখন তারা কিছুটা জেগে উঠে চড়া ভাষায় উত্তর দিতে লাগল, তখন গোটা তত্ত্বটিকে খুবই অসুবিধাজনক মনে হল। লাইট অব দি ইস্ট লিখেছিল (১৮৯৫, অগস্ট): "সর্বজ্ঞ মিশনারিদের মতে বুদ্ধ, কৃষ্ণ, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য—সকলেই খ্যাপা মিস্টিক—কেবল খ্রীস্ট হলেন ত্রাণকর্তা! খ্রীস্টজন্মের আগে হাজার-হাজার বছর ধরে গোটা হীদেন-জগতের পরিত্রাণের কোনো সম্ভাবনা নেই! কে একথা বিশ্বাস করবে? অর্ধ-শিক্ষিত, অর্ধাহারী লোকেরাই খ্রীস্টান হয়—হয় তারা হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নয় তাদের অসহ্য পেটের জ্বালা। বস্তুতঃপক্ষে গোটা বাইবেলের সত্যকে পাওয়া যাবে মহাভারতের একটিমাত্র পৃষ্ঠায় বা ধর্মপদের সিকি পৃষ্ঠায়।" লাহোর আর্যসমাজের মুখপত্র 'আর্যসমাজ' একই প্রসঙ্গে লিখেছিল, "খ্রীস্টানদের ঈশ্বর অংশ-ঈশ্বর কারণ তিনি কেবল তাদেরই স্যালভেশন দেন, যারা যীশু-খ্রীস্টকে পরিত্রাতা বলে স্বীকার করে। অপরদিকে যারা তা পারে না, তাদের ঠেলে দেন অনন্ত নরকে।" প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মসমাজের মুখপত্রে এই ধরনের লেখা অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল বম্বে ক্যাথলিক এগজামিনারের কাছে। সে আপত্তি জানিয়ে লিখেছিল (১৮৯৭, ২৪ ডিসেম্বর)—না, ও-কথা সত্য নয়। সেণ্ট অগস্টাইন বলেছেন, ভালো প্যাগানকেও ঈশ্বর রক্ষা করেন, যদি সে স্বাভাবিক ধর্ম মেনে চলে। এমন-কি দরকার হলে তার জন্য স্বর্গ থেকে এঞ্জেল পাঠিয়ে দিতে পারেন।

ক্যাথলিকদের কিছু স্বাভাবিক সংযম ছিল, যা একটুও ছিল না উৎসাহী প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়গুলির, যাদের প্রতিনিধিরা খ্রীস্টীয় ভগবানের মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে বলে ফেলে—

---

৩৪ "Mr. Slater admits that the *Vedanta* should, if consistently followed out, issue in a life of high and austere morality, but he points out that in most cases it is a spurious patriotism rendering the best minds incapable of a fair and impartial study of religious problems which causes a pretension of belief in the *Vedanta*." ['Work Among Educated Hindus, Bangalore'; *Harves Field;* May, 1902]

হিন্দুর ভগবানকে তো ভক্তরা নিয়মিত ঘুম পাড়ায়—কিন্তু খ্রীস্টানের ভগবান কত ভাল, সারাক্ষণ খাটেন, তবু কোনো ক্লান্তিই বোধ করেন না। (বম্বে গার্ডিয়ান; ১৮৯৯, ১৬ সেপ্টেম্বর)। এতখানি নির্বুদ্ধিতা অবশ্য মিশনারি-মহলেও অল্প দেখা যায়। আরো উচ্চতর দাবি নিয়ে অনেকে উপস্থিত হন। যেমন কলকাতার এপিফ্যানি পত্রিকার মতে, খ্রীস্টধর্ম সকল হিন্দু-সত্যকে গ্রাস করতে সমর্থ। ইণ্ডিয়ান নেশন লিখেছিল (১৮৯৫, ১০ জুন)—হাঁ, উত্তম, তবে আপনারা কি সেক্ষেত্রে কৃষ্ণকে অবতার বলে মেনে নেবেন? আমরা অবশ্য খ্রীস্টকে অবতার বলেই থাকি। খ্রীস্টীয় রেজারেকশন তত্ত্ব নিয়ে এপিফ্যানির সঙ্গে ইণ্ডিয়ান নেশনের তর্ক-বিতর্ক চলেছিল—হিন্দু হিসাবে শেষোক্ত পত্রিকা উক্ত ব্যাপারের সম্ভাব্যতায় কোনোই সন্দেহ করেনি, কেবল বলেছিল, ওটাকে যতখানি 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' করে দেখানো হচ্ছে, ব্যাপারটা ততখানি অসাধারণ নয়। একটি ক্ষেত্রে এই পত্রিকা স্পষ্টভাবে খ্রীস্টীয় মত মানতে অস্বীকার করেছিল—না, আমাদের পক্ষে মানবজাতির তথাকথিত পিতা আদমের পাপকে মেনে নিয়ে গোটা মানবজাতির উপর কালি বুলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

ইণ্ডিয়ান ইভানজেলিক্যাল রিভিউ, যার সম্পাদক কলকাতার সুপরিচিত মিশনারি রেভাঃ কে এস ম্যাকডোনাল্ড—ই টি স্টার্ডির নারদসূত্রের দীর্ঘ রিভিউ করেছিল ১৮৯৭, জানুয়ারি সংখ্যায়। সমালোচক লিখেছিলেন, তিনি স্টার্ডি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না কিন্তু তাঁর মহা অপরাধের কথাটা জানেন—স্টার্ডি বিবেকানন্দের অনুরাগী, স্টার্ডির বাড়িতে বিবেকানন্দ উঠেছিলেন, স্টার্ডি নারদসূত্রের অনুবাদের ব্যাপারে বিবেকানন্দের সাহায্য পেয়েছেন এবং বইটি বিবেকানন্দকেই উৎসর্গ করেছেন। পটভূমিকা যখন এমন কৃষ্ণবর্ণ, এবং অন্তরস্থ বস্তু যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—তখন মুখ কালো করেই সম্পাদককে আলোচনা করতে হয়েছিল। স্টার্ডি গ্রন্থমধ্যে বলেছিলেন—খ্রীস্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। কি বিকট কথা! নানা ঐতিহাসিক নজির তুলে স্টার্ডির (এবং অনেকের) এই অযৌক্তিক কথাটাকে খণ্ডন করতে হয়েছিল তাঁকে। তারপর সানন্দে নারদসূত্রের নারদকে নিয়ে পড়েছিলেন। বাঙালী বন্ধুদের কাছ থেকে সম্পাদক পরম মুখরোচক প্রবচনটি জেনে নিয়েছিলেন, 'নারদ! নারদ! খ্যাংরা-কাটি।' সেই ঝগড়ার মুনি বলছেন প্রেমতত্ত্ব!! বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ সম্বন্ধেও খোঁচা ছিল লেখাটিতে। বিবেকানন্দের দল মন্দ অংশকে ঢেকে কেবল ভাল দিককেই তুলে ধরে—নচেৎ গাঁজাখোর, মদখোর (?), শ্মশানে ঘুরে-বেড়ানো শিবকে অমন চুনকাম করে তারা?

সুতরাং নব্য হিন্দুদের ধাপ্পাবাজিতে ভুলো না। যদি হিন্দুশাস্ত্র পড়তেই হয়, ইউরোপীয়দের বই-মারফত তা পড়ো। যেমন ব্যালাণ্টাইনের অনুবাদ-করা বেদান্তসূত্র পড়তে পারো—হার্ভেস্ট ফিল্ড লিখেছিল ১৮৯৮, সেপ্টেম্বর সংখ্যায়।

॥ ৭ ॥

১৮৯৩-এর শেষভাগে বিবেকানন্দের আবির্ভাব থেকে ১৯০২-এর মধ্যভাগে তাঁর তিরোভাব পর্যন্ত আট-নয় বৎসর সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অজস্র-সংখ্যক মিশনারি-পত্রিকায় (সাধারণ পত্রিকাকেও মিশনারিরা আশ্রয় করেছিল) যে-পরিমাণে আক্রমণ করা হয়, তার পুরো হিসাব আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি—কিন্তু যা পেরেছি তার পরিমাণও বিপুল—তার সারাংশ দেওয়াও এই গ্রন্থমধ্যে সম্ভব নয়। কিছু বিক্ষিপ্ত সংবাদ এখন আমরা উপস্থিত করব—আগেও কিছু করেছি।

এমন হীনতা নেই, যা মিশনারিদের স্বীকার্য ছিল না, সেকথা সত্য, কিন্তু সভ্য-ভব্যভাবে সমালোচনা করবার মতো কিছু লোকও ছিল। লণ্ডনের স্পেকটেটর কাগজে স্বামীজীর

পেপার অন হিন্দুইজম্-এর উপরে সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। ১৮৯৫, ৯ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ টাইমস সেই আলোচনাকে কেন্দ্র করে সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখে। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ এই পত্রিকা, স্বামীজীর 'অধুনা খ্যাত' ঐ রচনাটি সম্বন্ধে স্পেকটেটরের প্রবন্ধে সমালোচনা থাকলেও ধীর বিচারের মনোভাব ছিল বলে খুশি হয়েছিল।৩৫

স্পেকটেটরের লেখক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত থেকেই সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যে আপত্তি জানিয়েছিলেন। মুক্তি-বিষয়ক হিন্দু ধারণাকেও তিনি পছন্দ করতে পারেন নি। পৌত্তলিকতা সম্বন্ধীয় হিন্দু মনোভাবও তাঁর কাছে নিন্দাযোগ্য মনে হয়েছিল। এক্ষেত্রে মাদ্রাজ টাইমসের সম্পাদক স্পেকটেটরের লেখকের মতকে গ্রহণ করতে পারেন নি, কারণ "স্বামীজীর কথায় আছে মহান প্রশস্ত মতবাদ, নেই কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামির চিহ্ন, যা যথার্থ খ্রীস্টীয় ব্যাপার"—তার বিরুদ্ধে স্পেকটেটরের সমালোচনা—"অতি-সমালোচনা।" মাদ্রাজ টাইমস স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, "সমালোচনার আগে বোঝা উচিত হিন্দুধর্ম ঠিক কী?" স্পেকটেটরের লেখক বলেছিলেন, "হিন্দুধর্মের অন্তরস্থ মতবাদ খ্রীস্টধর্মের অত্যন্ত বিরুদ্ধ।" তাতেও আপত্তি করেন মাদ্রাজ টাইমসের সম্পাদক। —"হতে পারে, অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম ভারতে খ্রীস্টধর্ম বিস্তারের পথে কঠিনতম বাধাস্বরূপ—তাই বলে তা কেন খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধ-শক্তি হবে?" সম্পাদক আরও আপত্তি করে বলেন, "স্পেকটেটর পত্রিকা সাধারণ হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে আচরিত ধর্মের সঙ্গে তুলনা করেছে আদর্শ খ্রীস্টধর্মের। এটা স্পষ্টতঃই অনুচিত আচরণ।" সম্পাদক শেষ করেন তির্যক মন্তব্য করে ঃ "আমরা কেবল এইটুকু যোগ করে দেব, যদি খ্রীস্টধর্ম প্রচার করে মিশনারিরা হিন্দুদের সাধারণ স্থূল ধর্ম থেকে সরিয়ে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের দিকে এগিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হবে, তাঁরা এদেশের জনগণের পক্ষে শুভকার্য করেছেন—যদিও কাজটা তাঁদের মিশনারি-ব্রতের অনুগত নয় হয়ত।"

'ইন্দো ইউরোপীয়ান করেসপনডেন্স' নামক পত্রিকা ১৮৯৪, ১৯ ডিসেম্বর, *A Word to the Swami* নামক রচনায় বিস্তৃতভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে স্বামীজীর মতের সমালোচনা করে। কোন্ একদিন শুভপ্রভাতে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন—এই খ্রীস্টীয় বক্তব্যকে স্বামীজী নস্যাৎ করেন—সে-ব্যাপারটা অসহ্য ছিল মিশনারিদের পক্ষে। স্বামীজী সৃষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের কথা তুলেছিলেন বলেই বিজ্ঞানপ্রিয় ইউরোপীয়দের মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। অনেক যুক্তিতর্কের পরে (যার তাত্ত্বিক আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই), এই 'লার্নেড পণ্ডিতের' 'শক্তিশালী বুদ্ধিশক্তির অহংকার' যে শূন্যগর্ভ, তা না জানিয়ে পত্রিকাটি পারেনি।

মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিন স্বামীজীর রাজযোগের আলোচনা-কালে লিখিত

৩৫ "An interesting article in the London *Spectator* reflects the view probably taken by the majority of informed Englishmen with respect to the Swami"s now famous pamphlet. On points of detail there will naturally be differences; but the general view taken by our London contemporary is that of cultured and not unsympathetic mind, and may fairly be regarded as representatives of the opinions of the best informed students of Hindu philosophy and religion. The writer may be open to conviction, but he needs to be convinced before he accepts any doctrine other than that of Christianity. He has probed this pamphlet honestly, no doubt, and he comes away unsatisfied. He opens with remarks that suggest a greater respect for Hinduism than is common among Christian writers in England or even Christian workers in India." [*Madras Times;* Feb. 9, 1895]

বস্তু অপেক্ষা লেখক-মানুষটিকে বেশি মনোযোগের বিষয় মনে করেছিল। ১৮৯৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত ঐ সমালোচনা শুরু হচ্ছে এইভাবে ঃ

"এই পুস্তকটি পড়বার পরে আমরা বুঝতে পারছি, লেখক কিভাবে আমেরিকায় যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। মিঃ বিবেকানন্দ স্পষ্টতঃই একজন উচ্চাঙ্গের না হলেও অনর্গল বক্তা। তাঁর এমনই সীমাহীন আত্মবিশ্বাস যে, তিনি প্রচণ্ড রকম অদ্ভুত কথাও বলতে পারেন যেন-কিছু-নয় ভঙ্গিতে। নতুন উত্তেজনা যারা খুঁজে বেড়ায় সেইসব মানুষের পক্ষে এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়াও তো চমৎকারজনক, যিনি এমন একটি পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন বলে দাবি করেন যার দ্বারা কেবল ব্যাধি ও মৃত্যুকে জয় করাই নয়, আমাদের শরীর ও মনের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করাই নয়, এমন-কি যে-কোনো জীবিত দেহের মধ্যে প্রবেশ করে কাজ করে যাওয়া যায়, মৃত শরীরে প্রবেশ করে তাকে বাঁচিয়ে তোলা যায়, এবং ইচ্ছামতো চন্দ্র-সূর্য-তারকার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা যায়। সহজে বিশ্বাস করা শক্ত যে, লেখক সিরিয়াস্‌লি কথাগুলো বলেছেন—একথা বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব যে, তিনি নিজে ঐ কথাগুলিকে সত্য বলে মনে করেন। সমস্যা আরও বেড়ে যায় যখন দেখি যে, লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সকল জ্ঞানের ভিত্তি বলে নির্দেশ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন—'রাজযোগের অনুশীলনের জন্য কোনো মত-পথে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই।' লক্ষ্য করার বিষয়, মিঃ বিবেকানন্দ কদাপি দাবি করেন নি—যে-সব অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার কথা তিনি বলেছেন, সে-সব বিষয়ে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, এবং ঐসব ব্যাপার যে ঘটেছে, তার পক্ষে কোনো সাক্ষ্য হাজির করার অভিপ্রায়ও দেখান নি।"

এর পরে যোগমার্গ যে, সাংখ্যদর্শনের উপর প্রধানাংশে নির্ভরশীল, একথা জানিয়ে সমালোচক বিশেষ বিরক্তির সঙ্গে বলেন, সবই ঈশ্বরের করুণায় ঘটছে, একথা না বলে নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করতে বলা গর্হিত ব্যাপার। বিশেষতঃ পাপতত্ত্ব গ্রহণ না করার চেয়ে অধর্ম আর কি হতে পারে?—

"যোগ-দর্শন, অনুরূপ অন্যান্য পদ্ধতির মতো পাপে গুরুত্ব দেয় না। মানুষের হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তির উপরে পাপের ভয়ানক আধিপত্যের ব্যাপারটিকে সে অগ্রাহ্য করে। যেহেতু সে তা করে, তাই মানবজীবনের দারুণ সমস্যার সমাধানের পথ সে দেখাতে সমর্থ নয়। বরং প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাসীদের কিছু আশা আছে—তা নেই এই দার্শনিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসীদের জন্য। প্রচলিত হিন্দুধর্মে সাকার ভগবানে ভক্তি থাকার জন্য ঈশ্বরের দয়ার কিছু ইঙ্গিত সেখানে মেলে।"

এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, কেবল উত্তেজনাবিলাসী আমেরিকানরাই নয়, ভারতের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকার বিচক্ষণ ইংরাজ লেখকেরাও স্বামীজীর যোগদর্শনে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন (যার নিদর্শন আগে দিয়েছি) এবং টলস্টয় থেকে শুরু করে বহু বিশ্ববিখ্যাত মনীষী অনুরূপ বা অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন এর সম্বন্ধে। কিন্তু মিশনারি-মন এক্ষেত্রে কতখানি তিক্ত ছিল, তার আরও নিদর্শন দেখব কিছু পরে মার্ক-প্রসঙ্গে।

কষ্টে ধৈর্যরক্ষা করে আরও কেউ-কেউ বিবেকানন্দের তত্ত্বদর্শনের আলোচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন (আরও উদাহরণ পরে দেব), কিন্তু অধৈর্য রোষই প্রবল ছিল। বিবেকানন্দ বেদান্ত পড়তে বলেছেন সকলকে—প্রগ্রেস্ পত্রিকা (১৮৯৭, অক্টোবর) ঝাঁঝালো গলায় প্রশ্ন করল—বেদান্ত পড়বার অধিকার কি শূদ্র বিবেকানন্দের নিজের আছে? মনু, বেদব্যাস, শংকরাচার্য—বিবেকানন্দ যাঁদের জয়ধ্বনি দেন—তাঁরা শূদ্রের বেদপাঠ নিষিদ্ধ করার যে-নির্দেশ দিয়েছেন, এবং সে-নিষেধ না মানলে কোন্ নরকে গতি হবে সে-সম্বন্ধে যে-বিধান দিয়েছেন, সেগুলি উদ্ধৃত করে এই পত্রিকা প্রশ্ন করেছিল ঃ "যদি ঐ কথাগুলি সত্য হয়, তাহলে বিবেকানন্দ, যিনি স্বয়ং শূদ্র—তিনি এবং তাঁর শ্রোতারা অবশ্যই পরলোকে তাঁদের

অন্তিম অবস্থার কথা ভেবে গভীরভাবে শঙ্কিত হবেন।" "বিবেকানন্দ যদি-না বেদান্ত-দর্শনের প্রবর্তক বেদব্যাস এবং 'অতুলনীয় স্মৃতিকার মনু-দেবতাকে' ছুঁড়ে ফেলে দিতে রাজি হন, তাহলে তাঁকে বেদান্তের পঠন ও পাঠন ত্যাগ করতে হবে, এবং বিশেষভাবে সন্ধান করতে হবে—ইতিমধ্যেই তিনি যে-মহাপাপ করে ফেলেছেন, তার থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার মতো কোন্ উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আছে।"

খ্রীস্টান পত্রিকাগুলিতে বিবেকানন্দের নানা মনোরম রেখাচিত্র আমরা পাই। পাঠকদের দু'একটি উপহার দেওয়া যায়। তার আগে কেবল স্মরণ করিয়ে দেব একটি কথা—কতকগুলি লোক বাইরে থেকে উড়ে এসে ভারতে জুড়ে বসেছে—তারা প্রকাশ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছে তাঁর, যাঁকে ঘিরে গোটা জাত মাতোয়ারা। দূর ব্যবধানে থেকে এইটেই মনে হয়—স্পর্ধার সীমা ছিল না মিশনারিগুলির! এদের অসভ্যতার সমস্ত জোরের পিছনে ছিল—খ্রীস্ট নন—ইংরাজশাসন।

ইন্দো-ইউরোপীয়ান করেসপনডেন্স ১৮৯৭, ২৪ ফেব্রুয়ারি 'সাকসেস্ টু বিবেকানন্দ' নামে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য করে ঃ

"আমাদের মেথডিস্ট সহযোগী ইন্ডিয়ান উইটনেসের কাছে আমরা *nothing succeeds like success*—এই প্রবাদের একটি অপূর্ব উদাহরণের জন্য ঋণী।

"'বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, এই শহরের জেনারেল অ্যাসেম্বিজ্ ইনস্টিটিউশনের সামান্য একজন আন্ডার-গ্রাজুয়েট (সেকেন্ড ডিভিশন) [হায় বি-এ পাশ নরেন্দ্র দত্ত!!]—স্বর্গতঃ বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে ধর্মীয় নাটকে অভিনয় করতেন—ইংলন্ডে গিয়েছিলেন।

"'ইংলন্ডে গিয়ে তিনি বিবেকানন্দ অর্থাৎ *the delight of discrimination*—এই গালভরা নাম নেন। সেখানে গিয়ে তিনি বক্তৃতা করেন এবং 'এথ্নগ্রাফিক্যাল ওয়ান্ডার'-রূপে তাঁকে গণ্য করে তাঁর বক্তৃতা শোনা হয়।

"'উক্ত বাবু এখন মহান স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে ভারতে ফিরেছেন—যিনি 'ইউরোপ ও আমেরিকার বিদগ্ধ শ্রোতাদের ধর্মান্তরিত করেছেন' ইত্যাদি।

"'স্বদেশবাসীর দ্বারা তিনি এইসব সম্বোধনে অভ্যর্থিত হয়েছেন ঃ শ্রীপরমহংসযতি-রাজ-দিগ্বিজয়কোলাহল-সর্বমতসম্প্রতিপন্ন-পরমযোগেশ্বর-শ্রীমৎভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস করকমলসঞ্জাত-রাজাধিরাজসেবিত-শ্রীবিবেকানন্দ স্বামী পূজ্যপাদেষু—'

"বেশ! বেশ! এ পৃথিবীতে আশ্চর্যের অবধি নেই, তা জানি আমরা। আর বাংলা তো বিস্ময়ের জগৎ। কিন্তু সহযোগী কাগজটি থেকে যে-সব সংবাদ উদ্ধৃত করেছি, সেগুলি যদি সত্য হয়, তাহলে বাবু নিশ্চয় আস্তিনে, উঁহু চাদরে, মুখ চাপা দিয়ে হেসে নিজেকে নিজেই ল্যাটিন প্রবাদটির অনুরূপ বাংলা প্রবাদ শোনাবেন—*Mundus vult decipe.*"

রেভাঃ কে এস ম্যাকডোনাল্ড দীর্ঘদিন কলকাতায় মিশনারি-বৃত্তিতে ছিলেন। একদা তাঁর মহাগৌরবের দিন ছিল। সেদিন লাথি মেরে কালা আদমীর শরীরের পিলে ফাটিয়েছে সাম্রাজ্য-শাসকেরা এবং ধর্মের পিলে ফাটিয়েছে ধর্ম-শাসকেরা। নিরুপদ্রবেই ও-সব কাজ করা গেছে। শরীরের পিলে ফাটানো ব্যবস্থাটা আরও কিছুকাল বলবৎ থাকবে কিন্তু ধর্মের উপর পদাঘাতটা কার্যতঃ অসম্ভব করে তুললেন বিবেকানন্দ ও আরও কেউ-কেউ। স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে এমন বাধা কার ভাল লাগে? রেভাঃ ম্যাকডোনাল্ডেরও ভাল লাগেনি। তাঁর সম্পাদিত ইন্ডিয়ান ইভ্যানজেলিক্যাল রিভিউ-এ (১৮৯৬, অক্টোবর) তাঁর অরুচিকর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ডাঃ এম এন ভট্টাচার্য তাঁর *Hindu Castes and Sects* নামক বইয়ে এই প্রোটেস্টান্ট রেভারেন্ডের পছন্দসই অনেক কথা লিখেছিলেন। যেমন উক্ত ডাঃ ভট্টাচার্যের মতে—"বুদ্ধ তাঁর সংঘে নারীকে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন প্রিয় শিষ্য আনন্দ বা মাতা গোতমীর অনুরোধরক্ষার জন্য নয়—সন্ন্যাস-জীবন সম্বন্ধে আকর্ষণ বাড়াবার

জন্য।" আধুনিক বাবুদের গেরুয়া চড়ানো সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ মন্তব্য করবার পরে ডাঃ ভট্টাচার্য বলেছেন—"বুদ্ধ একটা ছোট রাজ্যের রাজপদ ছেড়েছিলেন একথা সত্য, কিন্তু তিনি যা-কিছু বলেছেন, যা-কিছু করেছেন—সমস্তের মধ্য থেকে দেখা যায়, অনেক উ'চু পজিশন্ অধিকার করবার উচ্চাশার দ্বারা তিনি চালিত ছিলেন।" "তাঁর জীবন এবং শিক্ষার বিষয়ে সযত্নে অনুশীলন করলে এই সিদ্ধান্তে পে'ছিতে হয়—তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সন্ন্যাসীদের একটা বাহিনী তৈরী করে নিজেকে শক্তিধর পুরুষ করে তোলা।" ডাঃ ভট্টাচার্যের সমর্থনে রইস অ্যাণ্ড রায়ত পত্রিকার 'প্রতিভাবান সম্পাদক' যে-সব কথা বলেছিলেন, তাও রেভারেণ্ডের খুউব ভালো লেগেছিল ঃ "অনুরূপ অবস্থায় কেবল ব্রাহ্মণদের প্রধান বিরোধী ব্যক্তিটিই (অর্থাৎ বুদ্ধদেব) কি পৃথিবীতে গৃহত্যাগ করেছিলেন? পৃথিবীর সর্বস্থানেই কি তরুণদের মধ্যে ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী হবার ম্যানিয়া দেখা যায় না? ('না—ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে ও-বস্তু নেই—ভারতে খুবই আছে'—ম্যাকডোনাল্ড) প্রত্যেক যুগে কি তারা অ্যাডভেঞ্চার কিংবা অভি-নবজীবনের লোভে অনুরূপ কিংবা অধিক দুঃখময় জীবনযাত্রা গ্রহণ করেনি? ডাঃ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—আত্মহত্যার গৌরবের বেশি গৌরব নেই ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসজীবনে।"

ভারতবর্ষে সংগঠিত সন্ন্যাসী-সংঘের প্রবর্তক বুদ্ধদেবকে ধরাশায়ী করার পরে তাঁর অর্বাচীন অনুগামী বিবেকানন্দকে লোপাট করতে বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়নি ঃ

"বাংলায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা ওহেন বেশ-কিছু ছোকরা পেয়েছি—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট—সবকিছু ছেড়ে যারা ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের এখন অনেক অনুগামী, যেমন তাঁর অনেক পূর্বগামী ছিলেন।"

বিবেকানন্দের অনুগামীদের বিষয়ে কিছু সংবাদ ঃ

"কলকাতার রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে আছি—দেখলাম, এইসব গেরুয়াধারী, ন্যাড়া-মাথা, খালি-পা সন্ন্যাসীদের একজন স্ফূর্তিসে আমাদের দিকে আসছে। সে করতাল বাজাতে-বাজাতে বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষা করছিল। আমাদের কাছে এলে তার দিকে কড়া স্থির চোখে তাকালাম—সেও একইভাবে ফিরে তাকাল। তাকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম, খুব শ্রদ্ধাভরে অবশ্যই নয়—তুমি কে হে? সে ভালো ইংরেজিতে উত্তর দিল—ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড, 'আমাকে না জেনে আপনি নিজেকে অজ্ঞ প্রতিপন্ন করছেন।' নতুন জীবনরীতি-সম্মত না হলেও ইংরেজি-বিদ্যে জাহির করার এবং প্রশ্নকর্তার পরিচয় সম্বন্ধে ধারণা ঘোষণা করার প্রলোভন তার অত্যধিক। নচেৎ গেরুয়া চড়িয়ে সন্ন্যাসী হবার পরে তার পূর্ব বন্ধুদের জানা বা তাদের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া উচিত নয়। আমার প্রতি উক্ত শরক্ষেপ করে সে অন্য কথামাত্র না বলে চলে গেল। কাছেই দাঁড়িয়েছিল একজন নেটিভ পুলিশ। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—লোকটি কে? সে মুখ বাঁকিয়ে বলল, বোস্টব ভিখিরি—আবার কে? একটি ছোট ছেলে কাছেই ছিল। সে বলল, 'স্যার, উনি বি-এ পাস।' সন্ধান নিয়ে জানলাম—দু'জনের কথাই ঠিক।"

রেভারেণ্ড ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড অতঃপর কিছু হিন্দুধর্ম চর্চা করলেন। তাঁর বিশেষ প্রীতি দেখা গেল—তান্ত্রিক-পদ্ধতির বর্ণনা উদ্ধৃতিতে। নগ্ন নারীকে কিভাবে পূজাদি করা হয় তন্ত্রসাধনায়, তার সাগ্রহ সংকলন করার পরে সানন্দে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি পাঠককে উপহার ছিলেন ঃ

"বাংলার হিন্দু-জনসংখ্যার বড় অংশ, বিশেষতঃ নীচু জাতগুলি, তান্ত্রিক শাক্ত। স্বামী-ব্যক্তিটি নীচুজাতের মানুষ বলে খুবই সম্ভব শাক্ত।"

বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে রাগের কত কারণই যে ছিল। রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ডের পত্রিকায় ১৮৯৮, এপ্রিল সংখ্যায় জে ই বি মীকিন-এর লেখা একটি রচনার বিস্তারিত উদ্ধৃতি ছিল। মীকিন-সাহেব বীডন স্কোয়ারে এক বাঙালী যুবকের হিন্দুধর্ম প্রচারের জীবন্ত বর্ণনা

দিয়েছিলেন। বীডন স্কোয়ার বহু বৎসর ধরে খ্রীস্টান মিশনারিদের প্রচারের মুক্তাঙ্গন—সেখানে হিন্দুধর্মের পক্ষে প্রচার দেখে কৌতূহলী হয়ে মিঃ মীকিন প্রচারের বিষয়বস্তু শোনেন, এবং তার যে রিপোর্ট দেন, তাতে দেখে গেছে, মিশনারিদের মোকাবিলায় যুবকটি সমর্থ। রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড খোঁজ নিয়ে যুবকটির পরিচয় জেনেছেন—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য এবং বিবেকানন্দের গুরুভাই। এ'দের দলে আছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া অর্ধডজন বিশিষ্ট ছাত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট। এ'রা মিশনারিদের ধর্মান্তর-চেষ্টা রুখবার জন্য দলবদ্ধ হয়ে বাংলার যুবকদের কাছে উদ্দীপ্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে, এবং এ'দের প্রস্তাবিত একটি পত্রিকার প্রসপেকটাসে তীব্র ভাষায় লেখা হয়েছিল—খ্রীস্টান মিশনারিরা কিভাবে, কত চতুর কৌশলে, হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।৩৬

রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড ধরে নিয়েছিলেন—বিবেকানন্দ এই সবকিছুর পাণ্ডা। সুতরাং তাঁর পত্রিকার ১৮৯৭ এপ্রিল সংখ্যায় *The Swamis and Neo-Hinduism* নামক রচনাটি উপহার দিতে পেরেছিলেন। খ্রীস্টীয় সুরুচির পরিচয় দিয়ে লেখাটির সূচনায় লেখেন (অবশ্যই সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী)—সহবাস সম্মতি বিলের আলোচনাকালে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণানন্দ-স্বামী মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে জনচক্ষে একেবারে দেবতার আসনে উঠে গিয়েছিলেন—তারপর তিনি বালিকার উপর অত্যাচারের অভিযোগে তিন বছরের কারাবাস করেন। তারপর রেভারেণ্ড স্বামীজীর খাদ্যরীতি সম্বন্ধে দেশীয় কাগজের সঙ্গে খানিক লড়াই করেন 'শোনা কথা'র ভিত্তিতে। তারপর এই ভরসা প্রকাশ করেন—ভারতে বিবেকানন্দের বুদ্‌বুদ্‌ শীঘ্রই ফেটে উড়ে যাবে। তিনি জানালেনঃ "সাধারণের ধারণা—মাদ্রাজে যদি বিবেকানন্দ সপ্তাহখানেক বেশি থাকতেন, তাহলে সেখানকার উৎসাহ ফুরিয়ে যেত। কলকাতায় তাই যেন হতে আরম্ভ করেছে। আর তাঁর সন্ন্যাস বিষয়ে—ধর্মমহাসভা চলাকালে যে-ডাঃ বারোজের অতিথি তিনি ছিলেন, তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করাই ভাল। মহীশূরের হার্ভেস্ট ফিল্ডের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন—আমেরিকায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বলতে পারি,...আমার বিশ্বাস, জৈন-প্রতিনিধি নিরামিষাশী ছিলেন, বৌদ্ধ-প্রতিনিধি মাঝে-মাঝে মাছ খেতেন, বাকি প্রতিনিধিরা (বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে ছিলেন) আতিথ্যদানকারী আমেরিকানদের খাদ্যরীতি গ্রহণ করেছিলেন।"

এর পরে রেভারেণ্ড ডক্টর দীর্ঘস্থান নিয়ে চিকাগোর কসাইখানার বর্ণনা করেছেন। যে-লেখার নাম 'নব হিন্দুধর্ম ও তার স্বামীগণ'—তার পুরো অর্ধেক অংশে কসাইখানার বর্ণনা

৩৬ এস সি মজুমদার-পরিকল্পিত 'রীজন্' নামক পত্রিকার প্রস্পেকটাসে লেখা হয়ঃ

"The rapid spread of the mischievous teachings of the Bible in this country is a serious calamity. Many hundreds of Christian missionaries supported by the Government and rich private bodies are coming out here year after year and pursuing the work of proselytism with good successs. There are a few Societies also which offer inducements to our youths in the shape of handsome young European wives, lucrative posts under the Government etc. Many had been led astray at the delusive prospect of the temptations. Innocent school-boys snatched away from their parents are made to swallow the pills of Christian theology.... We have made up our minds to start a monthly English journal under the name of *Reason* in July next. Our main object it to demolish Christianity and to set up a rational religion in its stead."

[*Indian Evangelical Review*; April, 1898]

কি অপ্রাসঙ্গিক নয়? মোটে নয়। ঐ বীভৎস বর্ণনাসুদ্ধ তিনি বিবেকানন্দ ও তাঁর মতবাদের ঘাড়ে চেপে বসেছেন। যথা—

"আমরা এখন দেখলাম—চিকাগোর লোকজন কোন্ ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। হিন্দু-স্বামী তারা যা খায় তাই খেয়েছেন এবং তাদের উপার্জনের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি কি তাদের পাপী মনে করেন? কোথায়? তাদের সঙ্গে তিনি ভাই যেভাবে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে সেইভাবে কথা বলেছেন ঃ

" 'তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পুণ্য পূর্ণ-স্বরূপ। এই পৃথিবীতে তোমরা দেবতা। পাপী? মানুষকে পাপী বলাও পাপ। মানব-স্বভাবের সম্বন্ধে ঐ কথাটা স্থায়ী অমর্যাদার ঘোষণা।'

"হাজার-হাজার গরু মেরে সেগুলোকে খাওয়া পাপীর কাজ নয়? হিন্দু-জগৎ কোথায় যাচ্ছে?"

রেভারেণ্ড ডক্টর দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলেন—হিন্দু-জগৎ একেবারে গোল্লায় যায় নি, কারণ তাঁর স্বজাতির সঙ্গে সম্পর্ক-দোষের কারণে 'ম্লেচ্ছ' অভিধায় ভূষিত বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি (যে-প্রসঙ্গ পরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে) এবং বঙ্গবাসী কাগজ সেই নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল।৩৭

মিশনারি-মতে শয়তান—'মরিয়া না মরে।' বিবেকানন্দের পরে দেখা গেল—আর

৩৭ কেউ না মনে করেন রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড বিবেকানন্দকে কখনো মাথায় তোলেন নি। ১৮৯১ সালের সেনসাস রিপোর্টে হিন্দুসংখ্যা হ্রাস—এই সংবাদের উপরে পরমোল্লাসে *Decline of Hinduism* নামে এক বিরাট প্রবন্ধ লিখে বসেন নিজ পত্রিকায় (১৮৯৮, জানুয়ারি)—তার মধ্যে বিবেকানন্দকে অথরিটি হিসাবে উদ্ধৃত করেছিলেন। এই প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের বিরাট পতন-কাহিনীকে মজবুত করবার জন্য তিনি বিবেকানন্দের বামাচার-নিন্দা উপস্থিত করেন। এই কাজ করবার সময়ে তিনি অবশ্য ভুলে গিয়েছিলেন—কিছুদিন আগে তিনি 'বাংলার নীচু জাতের প্রিয় তান্ত্রিক শাক্ত-ধর্ম নীচু জাতের মানুষ বিবেকানন্দেরও ধর্ম বলে মনে হয়'—এমন কথা লিখেছিলেন। বিবেকানন্দ সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উপনিষদ ও গীতাকে নিতে বলেছেন—একথাও তিনি লেখেন।

রেভারেণ্ড ডক্টরের কথাবার্তায় আলোছায়ার অপূর্ব লুকোচুরি। হিন্দুধর্ম উচ্ছন্নে গেছে তার আচার-বিচার, পৌরাণিক কেচ্ছা, বামাচার—ইত্যাদি জন্য। এখন নব্য হিন্দুরা মন্দ জিনিস বাদ দিতে চাইছে। বা রে! ঐসব খারাপ জিনিস বাদ দিলে হিন্দুধর্ম টেকে বুঝি? অর্থাৎ রেভারেণ্ডের পছন্দ অনুযায়ী হিন্দুধর্মকে খারাপ-খারাপ জিনিস নিয়ে শুয়ে পড়ে থাকতে হবে—পাদরিরা এসে গাল পাড়তে-পাড়তে সেই খারাপ ব্যাপারটাকে পুড়িয়ে সেখানে খৃস্টধর্মের বীজ পুঁতবেন। সাবধান, তার মাঝখানে আত্মসংস্কারের নামে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

কে কল্পনা করতে পেরেছিল রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ডের পক্ষে বিবেকানন্দের নিম্নোক্তপ্রকার প্রশংসা করা সম্ভবপর?—

"Of Swami Vivekananda or Mr. N. N. Dutta, B.A., it must be allowed that he knows the Hindus from Hardwar to Cape Comorin. He has lived and travelled among all the Hindu sects and tribes and castes for many years and taken notes of them all. He knows also as very few natives of India do, Europeans and Americans alike in their homes in the West and here in the East." [*Indian Evangelical Review*; April, 1898]

হঠাৎ বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার এত প্রশংসা কেন?—কারণ ভারতবর্ষের সামাজিক আচার-আচরণের নিন্দা করতে হবে—বিবেকানন্দ-মারফত। অতঃপর স্বামীজীর *Lectures from Calombo to Almora* থেকে বিস্তৃতভাবে সেইসব অংশগুলি উদ্ধৃত করা হল, যেখানে তিনি ভারতের সামাজিক কুরীতি ও দুর্বলতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। যে-প্রশংসাগুলি করেছিলেন স্বামীজী, সেগুলি উদ্ধৃত করার কথা অবশ্য রেভাঃ ম্যাকডোনাল্ড ভাবতেই পারেন না। শেষে তিনি সদুঃখে বললেন—যদি আমরা বিবেকানন্দের ঐ কথাগুলি বলতাম, আমাদের কী নিন্দাই না করা হত।

একজন স্বামী আমেরিকায় হাজির হয়ে বক্তৃতাদি করছেন—তাঁর বিষয়েও ভালো-ভালো রিপোর্ট বেরুচ্ছে! লোকটি বিবেকানন্দের গুরুভাই। অত্যন্ত বিরক্তিকর সংবাদ। আরও যন্ত্রণাদায়ক এইজন্য যে, লোকটির দাদা আবার ম্যাকডোনাল্ডের ধর্মভাই, যদিচ নেটিভ—বিহারীলাল চন্দ্র। যেখানে দাদা আলোক ছড়াচ্ছে, সেখানে ভাই কালির (কালীর?) কারবার করবে? দাদার কাছ থেকে খবর নিয়ে ভাই সম্বন্ধে একটি মনোরম রচনা ফেঁদে বসলেন এই রেভারেণ্ড মিশনারি—রিভিউ অব দি ওয়ার্লড্ পত্রিকায়। সেটির অংশ এই :

"এই স্বামী-নামে কথিত ব্যক্তিটি খাঁটি স্বামী নন, ব্রাহ্মণও নন, এবং তিনি অল্পই সংস্কৃত জানেন। উক্ত 'স্বামী' অভেদানন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেবল এনট্রান্স পাস করেছেন, তার বেশি নয়। তাঁর ভাই আমাদের বলেছেন, অভেদানন্দ কেন ঐ [সন্ন্যাসীর] জীবন যাপন করছেন, সে-সম্বন্ধে অভিযোগ করা হলে তিনি উত্তর দেন—এটাই জীবিকা-নির্বাহের সহজতম এবং সবচেয়ে মনোরম উপায়। তিনি বেড়াতে এবং জগৎকে দেখতে ভাল-বাসেন। গেরুয়া চড়িয়ে, হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে, নাম বদলে, নতুন নামের আগে স্বামী বসিয়ে, তিনি সারা ভারত ঘুরতে পারেন এবং রাজার হালে চর্ব্যচুষ্যের উপরে থাকতে পারেন—না, তারও বেশি, ইংলণ্ডে আমেরিকায় যাবার পয়সা জোগাড় করতে পারেন—না, তারও বেশি, পৃথিবীর সমস্ত স্থানে ঘুরতে পারেন। অপরদিকে তাঁর বড় ভাই সরকারী অফিসে উদয়াস্ত ঘাড় গুঁজে দাসের মতো খেটেও এমন সামান্য রোজগার করেন, যা দিয়ে বৃহৎ পরিবারকে ভালভাবে প্রতিপালন করা যায় না। বড় ভাই রেজিস্টারের অফিসে বাঁধা পড়ে জীবন কাটাচ্ছেন, এর জন্য তাঁর প্রতি অভেদানন্দের বিশেষ অনুকম্পা। অপরপক্ষে এঁর মুক্ত জীবন—আকাশের পাখির মতো, অরণ্যের পশুর মতো। এই হল মানুষটি—যাঁর জন্য বিদগ্ধ আমেরিকার মেয়ে-পুরুষ যেন ক্ষেপে গেছে।"

রচনাটি রেভারেণ্ড ডক্টরের উপযুক্ত—যদিও অনেক সংবাদপত্র বলল, 'অনুপযুক্ত।' এর উপরে অমৃতবাজার দুদিন সম্পাদকীয় লিখেছিল—১৮৯৮, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৪ অক্টোবর। এইকালে অমৃতবাজার বৈষ্ণব-আন্দোলন সংগঠনে নেমে পড়েছে, অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ তার প্রিয় চরিত্র নন, তবু 'সত্যের খাতিরে' সে কয়েকটা কঠিন কথা মিশনারিদের স্মরণ করিয়ে দিল। হাঁ, মিশনারিদের মুখে অমন কথা অবশ্যই মানায়, যারা হীদেনদের দেশে ধর্মপ্রচারে আসার ব্যাপারটা ন্যায়সঙ্গত মনে করে—অপরপক্ষে খ্রীস্টানদের খরচে খ্রীস্টানদের দেশে গিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচার—পাতক পাতক মহাপাতক! 'সত্যের খাতিরে' বৈষ্ণব অমৃতবাজার ম্যাকডোনাল্ডের কথাও কিছুটা মেনে নিয়েছিল : "হয়ত অভেদানন্দ—'স্বামী' নন [?], ব্রাহ্মণ নন [ঠিক], পণ্ডিতও নন [নিশ্চয়, যেহেতু এনট্রান্স পাস। পরে বছর-দশেক অবশ্য ইংরেজি এবং সংস্কৃতচর্চা করেছেন, তবে সেটা তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে করেন নি!]--তা হলেও অভেদানন্দ বিদেশে কিছু ভাল কাজ করেছেন—এবং মিশনারিরা কুৎসিত নিন্দার দ্বারা নিজেদের কলঙ্কিত করেছে"—অমৃতবাজার বলেছিল।

. হিন্দু পেট্রিয়ট বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারে নিরত ছিল না—সুতরাং খোলা কলমে ম্যাকডোনাল্ডী নীচতাকে তিরস্কৃত করতে তার বাধেনি। দুঃখের বিষয়, হিন্দু পেট্রিয়টের মূল রচনাটি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি—মাদ্রাজ টাইমস পত্রিকায় তার উল্লেখ এবং অল্প উদ্ধৃতি মাত্র পেয়েছি। সাহেবী পত্রিকা মাদ্রাজ টাইমস ম্যাকডোনাল্ডকে আক্রমণ করেছিল বটে! ১৮৯৮, ৫ অক্টোবর *A Saint Denounced* নামে সম্পাদকীয় রচনায় পাই :

"স্বামী অভেদানন্দ—যিনি আমেরিকায় 'হিন্দু ঋষির এবং পণ্ডিতের ভঙ্গি নিয়েছেন'—আরও পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য [গুরুভাই]—তাঁর বিষয়ে কিছু চিঠিপত্র থেকে দেখেছি, তিনি তাঁর শিক্ষকের [বিবেকানন্দের] মতোই আমেরিকায় চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন

করেছেন, বিশেষতঃ মহিলাগণের মধ্যে। স্বামী অভেদানন্দ অবশ্য ধিক্কার পেয়েছেন। ধিক্কার-দাতা হলেন কলকাতার ফ্রি চার্চ মিশনের ডাঃ কে এস ম্যাকডোনাল্ড। [অতঃপর ম্যাকডোনাল্ডের রচনাংশ উদ্ধৃত, যা আমরা একটু আগে উপস্থিত করেছি।]

"আমাদের কথা তাহলে বলি। স্বামী অভেদানন্দকে নিয়ে আমাদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। কিন্তু অবশ্যই এই ইচ্ছা বোধ করি—কোনো মিশনারি যদি তাঁকে আক্রমণ করতে চান, অধিক নিপুণভাবে সে-কাজ যেন করেন, নচেৎ তাঁকে ছেড়ে রাখলেই ভাল হত। ডাঃ ম্যাকডোনাল্ডের দেখানো উচিত ছিল—তাঁর ঘৃণাস্পদ লোকটি কেন, কোথায় 'খাঁটি স্বামী' নন। 'ব্রাহ্মণ নন'—এটা কেন মহাপাপ—এটাও তাঁর জানানো উচিত। অবশ্যই তাঁর বলা উচিত, অভেদানন্দ কখনো 'অল্প সংস্কৃত' জানার বেশি দাবি করেছেন কি-না? আর ঐ যে অভিযোগ—'স্বামী-ব্যক্তিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পাস করেছেন, তার বেশি নয়'—ওর থেকে ডক্টরের এই স্বতঃস্পষ্ট ধারণার কথা বুঝতে পারি—কলকাতার এফ-এ সার্টিফিকেটের মোহর ছাড়া বিদ্যাবুদ্ধিতে কোনো বাঙালীর দাবি থাকতে পারে না। আমাদের কাছে অপরপক্ষে এটা খুবই আনন্দদায়ক সংবাদ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘানির মধ্য দিয়ে না গিয়েও কোনো বাঙালী বিশিষ্ট ব্যক্তি হতে পেরেছেন। বাকি বিষয়ে ডক্টরের অভিযোগ সম্বন্ধে বক্তব্য—হতে পারে, এই স্বামী তাঁর ভ্রাতার কাছে [সন্ন্যাসীর] 'পরের-দিনের-চিন্তা-ছাড়ো' মতাদর্শকে ধর্মীয়ভাবে গ্রাহ্য উপায়ে সমর্থন করেছিলেন। ব্যক্তিগত তুচ্ছ গালমন্দ করার চেয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করার আরো ভাল অস্ত্র খ্রীস্টধর্মের আছে, এবং ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড উক্ত স্বামীর দর্শনকে মূল বিষয়গুলিতে আক্রমণ করলেই ভাল করতেন।" [অ]

৬ অক্টোবর মাদ্রাজ টাইমস পুনশ্চ কঠোর আক্রমণ করল রেভারেণ্ড ডক্টরকে, হিন্দু-পেট্রিয়টের মন্তব্য উদ্ধৃত করে—এবার যেন ধিক্কার আরো বেশি ঃ

"মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপরের শিরোনামায় (*A Saint Denounced*) আমরা তরুণ বাঙালী স্বামী অভেদানন্দ সম্পর্কে—যিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনুসরণে আমেরিকায় প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন—কলকাতার ফ্রি চার্চ মিশনের রেভাঃ ডাঃ কে এস ম্যাকডোনাল্ডের দুঃখজনকভাবে দুর্বল এক আক্রমণ সম্বন্ধে সদুঃখে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। অত্যন্ত অক্ষম অ-খ্রীস্টান-ভাবে ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁর নস্যাৎ-করণের কর্মটি করেছেন, একেবারে ব্যক্তিগত কুৎসার তুচ্ছ উপায়ে, সুখের বিষয় যে-ধরনের মিশনারি-উদ্‌গার বিরল, [সত্যই? পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে কিছু ভিন্ন সংবাদ আছে], যা গভীরমনের দার্শনিক হিন্দুদের কাছে খ্রীস্টধর্মকে জাহান্নমে পাঠায়। আমরা দেখে বিস্মিত হইনি—ডক্টরের মন্তব্যের প্ররোচনায় হিন্দু পেট্রিয়ট একটি প্রধান সম্পাদকীয় লিখে ফেলেছে। ডক্টরের উদ্ভট কথা-গুলোকে স্বচ্ছন্দে নিকেশ করবার পরে, হিন্দু পেট্রিয়ট বলেছে, 'ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড নিশ্চিত থাকতে পারেন, তাঁর ভারতীয় কর্মজীবনের সমগ্র পরিধিতে তিনি যা-যা করেছেন, তার মধ্যে খুব কম কাজই তাঁকে শিক্ষিত হিন্দুদের কাছে এতখানি নামিয়েছে—যা করেছে এই প্রতিভা-বান বাঙালী যুবকটি সম্বন্ধে তাঁর অবাঞ্ছিত আক্রমণ।' ডক্টর ম্যাকডোনাল্ডের ঐ তেতো চিঠিটি খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে যে-বিরূপতার সৃষ্টি করেছে, তাকে তাঁর শ'খানেক সারমন্‌ও দূর করতে পারবে না। আর তাঁর সারমন্‌গুলি যদি তাঁর চিঠির তুলনায় অধিক ভালো না হয়, তাহলে তিনি যত কম সারমন্ দেন, ততই খ্রীস্টধর্মের পক্ষে মঙ্গল। ছোট মনের মিশনারিরা আছেই—যাদের বিষয়ে খ্রীস্টধর্ম আর্তনাদ করে বলতে পারে—'এইসব বন্ধুদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো!' উক্ত চিঠি থেকে ডক্টর ম্যাকডোনাল্ড সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করা যায়—তিনি সেইসব ব্যক্তিদের একজন যিনি খ্রীস্টধর্মের ক্ষতিসাধন করেন, এবং হিন্দু ও খ্রীস্টান উভয় সম্প্রদায়ের ঘৃণাপূর্ণ ক্রোধের উদ্রেক করেন।"

একজন বদস্বভাব মিশনারিকে ধাতানি দিয়ে মাদ্রাজ টাইমসের খ্রীস্টান-সম্পাদক সত্যই স্বধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন।৩৮

ডক্টর ম্যাকডোনাল্ডের সত্যই দুর্দিন চলছিল। জীবনের শেষভাগে ঘরে-পরে কত মারই তাঁকে খেতে হল! বিবেকানন্দ সংবাদপত্রে ধর্ম-বিতর্ক এড়িয়ে চলতে পারেন, কিন্তু সকলের তা করার কারণ নেই। ইতিমধ্যে হিন্দুদের মুখে কেবল বোল ফোটেনি, এমন তৈরী ভাষা এসে গেছে, যা প্রতিপক্ষকে নাজেহাল করে দিতে পারে—ইংরাজিতে ধর্ম-তর্কেও। বহু বৎসর হিন্দুরা ম্যাকডোনাল্ড-প্রমুখের গালাগাল খেয়েছে, অল্প-স্বল্প যে উত্তর দিয়েছে, তা ছিল আত্মরক্ষামূলক—এবার সে পরের ঘরে ঢুকে প্রতি-অক্রামণ শুরু করে দিল। ডঃ ম্যাকডোনাল্ড জানলেন—তাঁর ধর্মঘরে কিছু কাচের আসবাব আছে, যেগুলি পাটকেল খেয়ে ভেঙে চুর্ণ হয়ে যায়। ক্রীশ্চান ট্রাক্ট অ্যান্ড সোসাইটি থেকে তিনি পূর্ব স্বভাবমতো *Exposure of the Yajur Veda* বলে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন (লেখক তিনিই)—তার বিরুদ্ধে 'কাহান চন্দ্র বর্মা' নরম-গরম খোলা চিঠি লিখলেন (বেঙ্গলী, ১৯০১, ২৭ জুলাই)। ডন-সম্পাদকও ডাঃ ম্যাকডোনাল্ডের বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন। ডক্টর অবশ্য উত্তর দিতে ছাড়েন নি (১৯০১, ১০ অগস্ট)। কিন্তু ক্রমে বেঙ্গলীর পৃষ্ঠায় যে-বিতর্ক পাকিয়ে উঠল, তাতে দেখা গেল—ডক্টর ম্যাকডোনাল্ড বেশ বুঝেছেন, জমানা বদলে গেছে—এখন এক বললে দশ শুনতে হয়।

বিতর্ক প্রধানতঃ হয়েছিল রেভাঃ ডক্টর ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে ডন-সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। কিছু সময়ের জন্য রেভাঃ কালীচরণ ব্যানার্জি ম্যাকডোনাল্ডের সমর্থনে দাঁড়ান। এই দীর্ঘ তর্কযুদ্ধের ইতিহাসের পৃষ্ঠা আমি উল্টেছি। তাতে দেখেছি—ম্যাকডোনাল্ড-পক্ষে তত্ত্বকথার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল বিরক্তি ও মুরুব্বিয়ানা। ভাবটা—অ্যাঁ, 'বাবু' বলে কি! সেইসঙ্গে কুৎসার ফোড়ন অবশ্যই। সতীশ মুখোপাধ্যায় বাচালতার দিকে একেবারেই যাননি, কঠিন মনে উপযুক্ত জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন—অধিকন্তু চাপান দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করে-ছিলেন, হিন্দুধর্ম আপেক্ষিকভাবে কত শ্রেষ্ঠ। তর্কের তাত্ত্বিক বিচারকার্যে আমি নিযুক্ত নই, তার ইতিহাস-অংশটুকুই মাত্র নাড়াচাড়া করছি, কিন্তু যদি কেউ এ-সম্পর্কিত তত্ত্ব-সংঘাত নিয়ে আলোচনা করতে চান, তিনি এইকালের বেঙ্গলীর ফাইল দেখলে ভাল করবেন।৩৯

৩৮ মিশনারিরা যে-কোনো নীচতায় রাজি ছিল। লন্ডনে কোনো এক পরয়ানন্দ মারামারির মামলায় জড়িয়ে পড়ে। সেই ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, এই সংবাদে মিশনারি ও স্বার্থ-মহল ইংলন্ডের এবং ভারতের দেশীয় কাগজের পৃষ্ঠা ভরিয়ে ফেলে। অথচ উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে স্বামীজীর কোনই সম্পর্ক ছিল না। "দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের এই বিদ্বিষ্ট প্রচারের" বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ১৮৯৯ ২৭ সেপ্টেম্বর মিরারে চিঠি লিখে প্রতিবাদ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে স্বামীজীর কোনো সম্পর্ক আছে, প্রমাণ করতে তিনি চ্যালেঞ্জ জানান।

"The Christian missionaries....lately have so terribly suffered from their pecuniary support being stopped by many enlightened millionaires of the United States who have heard Swami Vivekananda, fire circulation to many unfounded stories against the Swamiji.... The false report comes from a quarter where the Swamiji's work has been the most successful one in India and where the missionaries have been most terribly opposed in furtherance of their work of evangelisation." [*Mirror*; Sep. 27, 1899]

৩৯ সম্ভাব্য আলোচকের সুবিধার্থে আমি তারিখগুলি দিয়ে দিচ্ছি। সতীশ মুখোপাধ্যায়ের এক সিরিজের পত্রের নাম ছিল :

OPEN LETTERS ON CHRISTIANITY ADDRESSED TO EDUCATED

॥ ৮ ॥

খ্রীস্টান-পক্ষে তত্ত্বালোচনায় এই সময়ে এমন একজন মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন, যাঁর নাম করলে অনেক শিক্ষিত বাঙালী বিস্ময় বোধ করবেন—তিনি পরবর্তী ইতিহাসের বিখ্যাত চরিত্র—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধব বহুদিন ক্যাথলিক খ্রীস্টান ছিলেন—এই সংবাদটুকু অবশ্য অনেকের জানা আছে কিন্তু তিনি যে উঠে-পড়ে হিন্দুধর্মকে গাল পেড়েছিলেন—এটা যথেষ্ট জানা নেই বলেই মনে হয়। সেই ইতিহাস উন্মোচন করার আগে আমি সেই অগ্নিজ্বলন্ত সন্ন্যাসীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদন করছি, যিনি তাঁর শেষ অস্থি-খণ্ডটুকুও ভারতবর্ষের জন্য দিয়ে গিয়েছেন—দিয়েছেন বলেই ভারতরক্ষার বজ্র নির্মিত হতে পেরেছে।

আরও একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেব। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব) যখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছিলেন, তখন গভীর ধর্মবিশ্বাস-বশে তা করেন—বেতনভুক প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারির ধর্ম-কর্ম হিসাবে নয়। তিনি ক্যাথলিক-মতের দরিদ্র সন্ন্যাসী ছিলেন।

জিজ্ঞাসায় আর্ত, সন্ধানে অস্থির, প্রেরণায় উদ্দীপ্ত এবং সৃষ্টিতে অক্লান্ত চরিত্র সম্বন্ধে যদি কারো আগ্রহ থাকে—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনী পড়লে তা যথেষ্টরও বেশিভাবে মিটবে। এ'র কয়েকটি ছোট বা মাঝারি জীবনী আছে—যোগেশচন্দ্র বাগলের লেখা জীবনীটি ছোটই ('সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্ভুক্ত) কিন্তু তথ্যবহুল এবং সুলিখিত—তার থেকে দু'একটি সংবাদ জানিয়ে দিতে চাই।

ব্রহ্মবান্ধবের (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) জন্ম ১৮৬১, ১১ ফেব্রুয়ারি, দেহত্যাগ ১৯০৭, ২৭ অক্টোবর। ছাত্রজীবনে পড়াশোনায় ভাল ছিলেন, যদিও এনট্রান্স পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয়নি—১৮৭৬-তে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। তারপর প্রথমে হুগলী কলেজ, পরে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের কলেজ-বিভাগে প্রবেশ করেন (স্বামী বিবেকানন্দকে এখানেই তিনি সহপাঠী হিসাবে পান) কিন্তু কলেজীয় শিক্ষা বেশিদূর এগোয় নি। তবে অনলস শাস্ত্রচর্চা এবং ভাষাচর্চার দ্বারা বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, সে-বিষয়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "[তিনি] সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, সিন্ধী, মারহাট্টী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; খ্রীস্টান থিয়লজি, বেদান্ত, সাংখ্য, সুফী প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।"

ব্রহ্মবান্ধব বাল্যে পিতামহীর কাছ থেকে খাঁটি বাংলা শেখেন, উপনয়নের পরে মাছ মাংস ছেড়ে ভট্টপল্লীতে সংস্কৃত পড়েন, ব্যায়াম ও কুস্তী করে শরীর তৈরী করেন, চুঁচুড়ার অসভ্য আর্মানী ও ফিরিঙ্গি ছেলেদের সঙ্গে মারামারিও করতে থাকেন, সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখের বক্তৃতা শুনে ক্ষাত্রশক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে গোয়ালিয়রে চলে যান দশটি টাকা সম্বল করে (দুবার গিয়েছিলেন), সে-যাত্রায় ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি, বাড়ি ফিরতে হয়েছিল কিন্তু ফেরার আগে 'সাধুসঙ্গ মানসে' ভারতের নানা স্থান

HINDUS: BY SATIS CHANDRA MUKHERJEE, M.A., B.L., EDITOR, THE DAWN.

মিশনারি-প্রচার প্রসঙ্গে সিরিজ-বহির্ভূত পত্রও লেখেন। রচনাগুলির তারিখ : ১৯০১—অগস্ট ৩, ৪, ১১, ১৫, ১৮, ২৫; সেপ্টেম্বর ১, ৮, ১৫; অক্টোবর ৮, ১৫, ২০; নভেম্বর ২, ৩। ১৯০২—জানুয়ারী ১১।

রেভাঃ ম্যাকডোনাল্ডের উত্তর : ১৯০১—অগস্ট ১৬, ২৯; সেপ্টেম্বর ১২, ১৮; অক্টোবর ৫, ১১; নভেম্বর ৫।

সতীশ মুখোপাধ্যায়ের চিঠিতে কেবল তত্ত্ববিচার ছিল না—ভারতে মিশনারি-প্রচারের ইতিহাস-কথাও যথেষ্ট ছিল—সেইসঙ্গে মিশনারিদের ও হিন্দুদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-মহলের মতামতের উদ্ধৃতি।

ঘুরে নিয়েছিলেন। তারপর কলকাতায় এসে কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে পড়েন, ১৮৮৭, ৬ জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নববিধান সম্প্রদায়ে যোগ দেন। খ্রীস্টভক্তিও তাঁর মধ্যে বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে কেবল কেশবচন্দ্র বা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রভাবই নয়, নিজের কাকা রেভারেন্ড কালীচরণ ব্যানার্জি'র প্রভাবও ছিল। তারপর ব্রহ্মবান্ধব নববিধান-ভক্ত হীরানন্দের আকর্ষণে সিন্ধুপ্রদেশের হায়দারাবাদে চলে যান, সেখানে হীরানন্দের 'ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি' স্কুলে পড়াতে থাকেন। ক্রমে খ্রীস্টতত্ত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেড়ে যায়, স্কুল ছেড়ে দিয়ে (১৮৯০), কয়েকজন বন্ধু-শিষ্য জুটিয়ে ঐ বিষয়ে আলোচনাই করতে থাকেন, এবং যদিচ এখনো কেশবচন্দ্রকে 'আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' বিবেচনা করতে থাকেন, তবু মনে করেন, কেশব-পন্থায় হিন্দুধর্ম ও খ্রীস্টধর্মের সমন্বয়চেষ্টা অপেক্ষা পুরো খ্রীস্টধর্ম নিলেই মঙ্গল—তদনুযায়ী ১৮৯১, ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রোটেস্টান্ট খ্রীস্টান হন, তাতেও না থেমে ১ সেপ্টেম্বর রোমান ক্যাথলিক ধর্ম নেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর কয়েকজন বন্ধুও খ্রীস্টান হন। ফলে সিন্ধুদেশে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মবান্ধব করাচীতে কার্যক্ষেত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মহোৎসাহে ক্যাথলিক-মত প্রচার করতে থাকেন (৮ বছর করাচীতে ছিলেন), স্থির করেন যে, ভারতীয় রীতিতে প্রচার না করলে ক্যাথলিক ধর্ম ভারতে প্রচারিত হবে না, সুতরাং ১৮৯৪ ডিসেম্বরে সন্ন্যাস নেন, প্রথমে নাম নেন 'ব্রহ্মবন্ধু,' পরে তা হয় ব্রহ্মবান্ধব, ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে মত-প্রচারও করেন, তারপর জব্বলপুরের নর্মদাতীরে ক্যাথলিক সন্ন্যাসী-মঠ স্থাপন করেন, কিন্তু এবার বিদেশীয় ক্যাথলিক-প্রধানেরা সন্দিগ্ধ হয়ে আপত্তি করায় মঠ ভেঙে দিতে হয়, তার মন দ্রুত হিন্দুধর্মের দিকে ঝুঁকতে থাকে, কলকাতায় চলে আসেন (১৯০০), কিছুদিনের মধ্যে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে তাকে সংগঠিত করেন, তারপর ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ২৭টি টাকা এবং 'কম্বলমাত্র সম্বলে' ইংলণ্ডে যান, সেখানে লণ্ডন, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে প্রাচ্য-চিন্তাধারা ও বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করে চমক লাগান, ফিরে এসে প্রথমে হিন্দুধর্ম ও সমাজতত্ত্বের পক্ষে জোরালো লেখনী চালনা করেন, ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, 'সন্ধ্যা'র আগুন জ্বলতে থাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দিবা-দ্বিপ্রহরে, ফলে গ্রেপ্তার হন, মামলা চলাকালে সহসা দেহত্যাগ করেন —দেহত্যাগের দু'মাস আগে কালীঘাটে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হয়েছিলেন।

এই রেখাচিত্র থেকে এইটেই দেখা যায়—ব্রহ্মবান্ধব থামবার জন্য জন্মান নি। তবে তিনি জীবনের বৃত্তটি সম্পূর্ণ করেছিলেন—ভবানীচরণ তাঁর ক্লান্ত শরীর ভবানীর চরণেই সঁপে দিয়ে বলেছিলেন—"মা, আমার এ দেহভার বহন করিতে আর সাধ নাই—বড়ই কলঙ্কিত আমার দেহ—আমায় আবার ব্রাহ্মণ-দেহ দিও, সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগৃহে আমাকে পাঠাইয়া দিও...তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের পক্ষে সহায়তা করিব। আমি তো মা চিরকালই তোমার দুরন্ত ছেলে—আমি তো কাহারও বন্ধনের মধ্যে কখনও যাই না—এই প্রার্থনা করি তোমার শ্রীচরণে যে, দেশের কাজ করিতে-করিতে...আমার এ-দেহ যেন পঞ্চভূতে মিশায়।"

ব্রহ্মবান্ধবকে আমরা আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে যখন দর্শন করতে যাচ্ছি, তখন তিনি কেবল 'মায়ের দুরন্ত ছেলে' নন, বিদ্রোহী ছেলেও বটেন, যে-মাতৃদ্রোহী জীবনের দিকে তাকিয়ে জীবন-প্রান্তে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন—'বড়ই কলঙ্কিত আমার জীবন।'

প্রথম যৌবন থেকেই ব্রহ্মবান্ধব প্রচারশীল—সর্বদাই পত্র-পত্রিকা আশ্রয় করে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্রহ্মবান্ধব ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকা তো একত্রবদ্ধ। কিন্তু তার আগে এবং পরেও অনেক ইংরেজি ও বাংলা পত্র-পত্রিকা চালিয়েছেন, যেমন 'ইয়ং-ম্যান,' 'কংকর্ড,' 'হার্মনি,' 'টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি,' 'স্বরাজ'—এবং 'সোফিয়া।' শেষোক্ত মাসিক পত্রিকাটি বোধহয় সবচেয়ে বেশিদিন চালিয়েছেন এবং তাঁর জীবনে গুরুত্বের দিক দিয়ে (সন্ধ্যার পরেই) দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। পত্রিকাটির আরম্ভ ১৮৯৪ জানুয়ারিতে, একটানা

চলে ১৮৯৯ মার্চ পর্যন্ত। বন্ধ হবার পরে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে কয়েক মাস চালাতে পেরেছিলেন কলকাতা থেকে—আগে বেরুত করাচী থেকে। ব্রহ্মবান্ধবের জীবনে সোফিয়া পত্রিকার বিশেষ গুরুত্ব এইখানে—এর মধ্যেই উগ্র ক্যাথলিক খ্রীস্টানরূপে ব্রহ্মবান্ধবের পুরো আত্মপ্রকাশ, এতেই তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা, আবার এরই মধ্যে তাঁর জীবনের দিক পরিবর্তনের সূচনার ইঙ্গিতও।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় যখন সোফিয়া কাগজ বেরুল তখন ভারতবর্ষে হিন্দু-উত্থানের সূচনাপর্ব এবং ব্রহ্মবান্ধবের খ্রীস্টীয় উন্মত্ততার সূচনাপর্বও বটে। তাঁর সেই প্রবল ধর্মান্ধতার কালে ব্রহ্মবান্ধব হিন্দু-উত্থানকে এবং তার নেতৃবৃন্দকে যতখানি শক্তিতে সম্ভব আঘাত করেছেন। স্বতঃই বিবেকানন্দ ও বেশান্ত তাঁর মূল আক্রমণ-লক্ষ্য হয়েছিলেন। সেই-সঙ্গে ধর্মের তত্ত্ববিচারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে তিনি ঐ দিক থেকে হিন্দুতত্ত্বকে আক্রমণ করেছিলেন।

আলোচ্য পর্বে ব্রহ্মবান্ধব নিজের মত-প্রচারে সবেগে কণ্ঠ এবং লেখনী চালনা করলেও ভারতের অধিকাংশ মিশনারি-পত্রিকাতে কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের বিষয়ে প্রায় সংবাদ নেই, তার কারণ, অধিকাংশ পত্রিকাই চালাতেন প্রোটেস্টাণ্টরা এবং রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ হিন্দুবিদ্বেষ অপেক্ষা কম ছিল না। খ্রীস্টান সন্ন্যাসীবেশে ব্রহ্মবান্ধবের আবির্ভাবকে তাঁরা পছন্দ করেন নি কারণ সন্ন্যাসমার্গে জীবনের অস্বীকৃতি আছে [যীশু-খ্রীস্ট?]। তাঁদের কনফারেন্সে এ-বিষয়ে নানা আলোচনা হয়। ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম ছড়াতে সন্ন্যাস-পদ্ধতিটির উপযোগিতা স্বীকার করেও তাকে তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারেননি—না করতে পারার ধর্মীয় কারণ যদিও তাঁরা দেখিয়েছিলেন—আসল ছিল অর্থনৈতিক কারণ।৪০

৪০ বোম্বে গার্ডিয়ানের ১৯০০, ২২ সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয় রচনায় খৃীস্টানদের সন্ন্যাসমার্গের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রোটেস্টাণ্ট-সম্মেলনে আলোচনার সংবাদ আছে। এই পত্রিকা বলেছে—আমরা সবাই খৃীস্টান কিন্তু সন্ন্যাসী নই—আমাদের পার্থিব জীবনের মধ্যেই থাকতে হবে, ইত্যাদি। সন্ন্যাস-মার্গের যৌক্তিকতা নিয়ে ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্টাণ্টদের লড়াই অনেক দিনের। তার প্রভাব ঐ রচনায় ছিল। তদুপরি—পাদরিদের সন্ন্যাসী হতে হলে কে আর দূর দেশ থেকে ভারতে আসতে চাইবে—যখন চাকরিটা লোভনীয় নয়?

'খৃীস্টীয় ভ্রাতৃত্ব' থেকে যে কেবল হীদেনরাই বঞ্চিত ছিল, তাই নয়, খৃীস্টান-নামধারী ব্যক্তিরাও বঞ্চিত হত, তা খৃীস্টান মিশনারিদের পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টালেই দেখা যায়। বোম্বে ক্যাথলিক এগজামিনার ১৮৯৫, ২২ নভেম্বর *A Gospel of Hate* নামে দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে কাতরভাবে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে প্রোটেস্টাণ্টদের কেচ্ছায় আপত্তি করে। ঐ কেচ্ছা এমন আকার ধারণ করেছিল যে, এই পত্রিকা বলে, "নৈতিক আদর্শ বজায় আছে, এমন কোনো খৃীস্টান-পরিবারে ঐ সব কেচ্ছার রচনা প্রবেশ করা উচিত নয়।" কেচ্ছা ছড়িয়ে খৃীস্টধর্মের বিস্তার কি করে যে করা সম্ভব, এই পত্রিকা বুঝতে পারেনি। বিশেষতঃ যখন সামনে রয়েছে ভারতের উর্বর ক্ষেত্র, যার সামান্য অংশেই খৃীস্টধর্মের বীজ পোঁতা হয়েছে, সেখানে কি ক্যাথলিক পাদরিদের দুশ্চরিত্রতার কথা ছড়ানো, বা "পোপকে খৃীস্ট-বিরোধী এবং ক্যাথলিক চার্চকে শয়তানের উৎপাদন" বলা উচিত? মিশনারিদের কর্তব্য কী হওয়া উচিত এবং কী দাঁড়িয়েছে, সে-বিষয়ে অনেক কথা পত্রিকাটি লিখেছিল, যথা :

"We take it that the agents of missionary Societies....are sent abroad primarily, if not solely, to labour amongst the heathen in order to win them to Christianity. But....a number of these evangelisers....devote their resources and their efforts to the vilification of the Catholic Church. In leaflets, in newspapers, in books, the Church is attacked not by argument....but by the publication of certain scandals.... The Christian cause can never be advanced amongst a pagan population....by the wide advertisement of scandals [against Catholics] by which some of its unworthy professors have dishonoured their creed." [*Bombay Catholic Examiner*; Nov. 22, 1895]

ব্রহ্মবান্ধবের এইকালীন পরিচয় তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধান পত্রিকা বোম্বে ক্যাথলিক এগজামিনারের ১৮৯৬, ১৭ এপ্রিল সংখ্যা থেকে উপস্থিত করা যাক ঃ

"সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেছে—ক্যাথলিক-মতে ধর্মান্তরিত জনৈক ব্রাহ্মণ বক্তৃতা করছেন খ্রীস্টান-সন্ন্যাসী হিসাবে।...হলদে রঙের ঢোলা পোষাক পরে তিনি গ্রীষ্মতাপের মধ্যেও খোলা মাথায় চলেন, শীতের মধ্যেও হাঁটেন খালি পায়ে। আহার —নিরামিষ, পান—বিশুদ্ধ জল। এদেশের লোকে সন্ন্যাস-জীবনকে উচ্চ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সেই কারণে বিখ্যাত জেসুইট মিশনারি ফাদার ডি নোবিলি এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী দু'শতাব্দী আগে এই বিশেষ ধরনের পোষাক ও জীবনযাত্রা অবলম্বন করেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব জন্মে বাঙালী, ব্রাহ্মণ, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশোদ্ভূত—হিন্দুধর্মের গন্ডী থেকে তিনি ক্রমে ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদের মধ্যে প্রবেশ করেন, তারপর প্রোটেস্টাণ্ট-মতে। কিন্তু ঐকান্তিক সত্যসন্ধানী বলে তিনি শীঘ্রই জানতে পারেন—প্রোটেস্টাণ্ট-মতে খ্রীস্টের পুরো গস্‌পেল বজায় নেই। সুতরাং সাহসের সঙ্গে, সে-জন্য ত্যাগস্বীকারও করতে হয়েছে তাঁকে—তিনি পাঁচ বছর আগে করাচীতে ক্যাথলিক-চার্চে যোগ দেন। তারপর থেকে তিনি বোম্বাইয়ের আর্চবিশপের অধীনস্থ হয়ে নিজেকে ধর্মের সেবায় সম্পূর্ণ নিয়োগ করেছেন।...ভারতে খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগের একটি—তা ধর্মান্তরিতদের জাতীয়তাশূন্য করে এবং বিদেশীয় আচার-ব্যবহার গ্রহণ করায়—এর সম্বন্ধে সচেতন থেকে তিনি তাঁর সম্প্রদায়-প্রধানদের সম্মতিতে, সন্ন্যাসীর বেশ এবং সন্ন্যাসজীবনের সকল কৃচ্ছ্রসাধন বরণ করার সিদ্ধান্ত করেছেন—যদিচ তার অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার সঙ্গে বিচ্ছেদ।

"উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়েছেন, ভালো সংস্কৃত জ্ঞানের সঙ্গে অনর্গল ইংরেজি বলা বা লেখার ক্ষমতা তাঁর আছে, সোফিয়া কাগজের তিনি সম্পাদক। সোফিয়া ইংরাজিতে ক্যাথলিক মাসিক পত্রিকা—অখ্রীস্টানদের প্রতি সরাসরি আবেদন জানায়।

ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের অবশ্য কোনোই আপত্তি ছিল না—প্যাগানদের কেচ্ছা করায়!!

প্রোটেস্টাণ্টরা কিন্তু ক্যাথলিকদের প্যাগান ছাড়া কিছু ভাবতে রাজি ছিল না। বোম্বে গার্ডিয়ান ১৮৯৯, ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর কলেজের টি আর এডওয়ার্ডস্-এর একটি চিঠির পুনর্মুদ্রণ করেছিল, যার মধ্যে হিন্দু ও রোমান ক্যাথলিকদের পাশাপাশি রেখে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল—দু'বস্তুই একেবারে এক। ঐ রচনা থেকে রোমান ক্যাথলিকদের সম্বন্ধে পাই ঃ তারা একেবারে পুরোহিতদের কব্জায় থাকে। পুরোহিতরা যা বলে তাই বিশ্বাস করে—খ্রীস্ট নন, পুরোহিতরাই তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করে। বাইবেল পড়া তাদের নিষিদ্ধ—ও-বস্তু পাদরিরাই তাদের হয়ে পড়ে দেয়। লাটিন তাদের পবিত্র ভাষা, যদিচ অধিকাংশ লোক ও-ভাষা বোঝে না। ব্যাপটিজমের কালে হোলি ওয়াটার তাদের নবজন্ম দেয়—চার্চে ঐ জলের প্রচুর ব্যবহার। মূর্তি ও ছবির সামনে প্রার্থনার সময়ে তারা নতজানু হয়। সেণ্টদের মূর্তিকে জমকালো পোষাকে ঢেকে রাখে। মূর্তি নিয়ে বিরাট-বিরাট শোভা-যাত্রা করে। খ্রীস্টের ভোজের উৎসবে বলি উৎসর্গ করে। পুরোহিতের বিশেষ-বিশেষ বাণীর মধ্যে খ্রীস্ট অবতীর্ণ হন—একথা বলে। রোম ও অন্যান্য স্থানে তীর্থযাত্রা করার মহিমা প্রচার করে। কোনো কোনো চার্চে বা বিশেষ স্থানে সেণ্টরা অলৌকিক নিরাময় ঘটিয়েছেন, প্রচার করে। দুর্ভাগ্যের প্রতিরোধের জন্য পোপের ছোঁয়া মেডেল ধারণ করে—কবচের মতো ক'রে। নির্ধারিত সময়ে উপবাস করে, মেরীর সামনে প্রার্থনার সময়ে গাঁট গণে, দিনের বেলায় উপাসনার সময়েও বাতি জ্বালায়, এবং ধূপ দেয়, পুরোহিতদের বিয়ে করতে দেয় না, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা ঊর্ধ্বতন কর্তাদের দ্বারা মৃতবৎ চালিত হয়। কারো মৃত্যু সন্নিকট হলে পুরোহিত পাঠিয়ে তার দেহকে তৈলচর্চিত করা হয়। আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে তার আত্মার নরকগমন ঠেকাবার জন্য এবং তাকে স্বর্গে পাঠাবার জন্য তারা পুরোহিতদের অনেক টাকাকড়ি দিয়ে অনুষ্ঠানাদি করায়।

প্রোটেস্টাণ্ট-প্রদত্ত এই ক্যাথলিক-চিত্র ক্যাথলিকদের কতখানি পীড়িত করবে জানি না, কিন্তু অবশ্যই পুলকিত করবে হিন্দুদের, যারা জেনে নিল—তারা, আষ্টেপৃষ্ঠে নরক-জড়ানো তারা, খ্রীস্টান-জগতের মস্ত এক অংশের সঙ্গে ধর্মাচারে নিতান্তই এক!!

...অনেকগুলি ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, শিক্ষিত ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্মালোচনায় অনেক সময় ব্যয় করেন—তাঁরা তাঁর পাণ্ডিত্যে এবং সৌজন্যে আকৃষ্ট। গত বৎসর আজমীরে আহূত ছোট-খাট ধর্মমহাসভায় তিনি ক্যাথলিক-মতের প্রতিনিধি হিসাবে আবির্ভূত হয়ে দুটি বক্তৃতা করেন, যা বিশেষ সমাদৃত হয়। একাধিকবার লাহোর ভ্রমণ করেছেন—এবং সেখানে বিখ্যাত দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের মতের বিরুদ্ধে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে যে-সব বক্তৃতা করেছেন, তা শুনতে এসেছিল প্রচুর লোক, প্রধানতঃ হিন্দুরা। সুক্কুর, করাচী এবং তাঁর হেডকোয়ার্টার হায়দারাবাদ-সিন্ধুতেও বক্তৃতাদি করেছেন—শেষোক্ত স্থানে আমিল-জাতীয় কয়েকজন যুবককে খ্রীস্টের খাঁটি গণ্ডীর মধ্যে আনতে পেরেছেন। বোম্বাইয়ের বক্তৃতামঞ্চে স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন, কারণ বর্তমান জেনারেশনের স্মরণকালের মধ্যে প্রাচ্য সন্ন্যাসীর পোষাক পরে কোনো ক্যাথলিক বক্তৃতা করেন নি, এবং যদিও পোষাকের উপর তিনি ক্রুশচিহ্ন ঝুলিয়ে রেখে-ছিলেন, যা সকল সন্দেহ নিরাকরণ করতে পারত, তবু অনেকেই উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—'কী, উনি খ্রীস্টান—অ্যাঁ—ক্যাথলিক!'" [অ]

বোম্বাইয়ে তাঁর সভাগুলিতে প্রচুর সংখ্যায় হিন্দু উপস্থিত ছিল, একটিতে সভাপতিত্ব করেন মিঃ চন্দ্রভারকর, অন্যটিতে বিচারপতি রানাডে (বোম্বে ক্যাথলিক এগজামিনার, ১৮৯৭ ১৭ এপ্রিল)। কয়েক মাস পরে আবার বোম্বাইয়ে বক্তৃতা করেন, রানাডের সভাপতিত্বে (ঐ —১৮৯৭, ১২ নভেম্বর)। তার আগে মাদ্রাজে বক্তৃতা করে নাড়া দিয়ে এসেছেন—যার উপরে জনৈক পত্রলেখক-প্রেরিত সমাদরপূর্ণ বিবরণ বেরিয়েছিল মাদ্রাজ মেলে, ১৮৯৬, ২৩ মার্চ। এর মধ্যে পাই : মাদ্রাজে ব্রহ্মবান্ধবের অদ্বৈতবাদ-বিরোধী বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে ছাপ রেখেছে এবং শ্রোতারা সংখ্যায় যথেষ্টই ছিলেন। উপাধ্যায় কিভাবে হিন্দুধর্ম থেকে ক্যাথলিক-মতে যান, সে কাহিনী এই পত্রলেখকও বর্ণনা করেন, সেইসঙ্গে বিদ্যালয়-জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী, এই উল্লেখ। ব্রহ্মবান্ধব যে "বহু বৎসর বিখ্যাত ব্রাহ্ম মিঃ মজুমদারের অনুগামী ভক্ত ছিলেন," তারপরে বোম্বাইয়ের জেসুইট ফাদারদের প্রেরণায় সন্ন্যাসী হন, সেই সংবাদও পাই। পত্রলেখক ব্রহ্মবান্ধবের প্রচারের ডায়ালেকটিক্যাল পদ্ধতির বিশেষ প্রশংসা করেন। ইনিও সপ্তদশ শতাব্দীর ইটালিয়ান জেসুইট ফাদার-ডি-নোবিলির কথা তোলেন, যিনি "সুদৃঢ় ব্রহ্মণ্যদুর্গের মধ্যে খ্রীস্টান-পতাকা তুলবার উচ্চাশায় অধীর হয়ে জেসুইট মিশনারির পোষাক ফেলে দিয়ে গেরুয়াবস্ত্র, চটি, এমন-কি ব্রাহ্মণগুরুর পৈতে পর্যন্ত ধারণ করেছিলেন।" তিনি সংস্কৃত শেখেন, দেশীয় ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেন এবং অনেক ব্রাহ্মণকে ধর্মান্তরিত করেন। মাদ্রাজ মেলের পত্রলেখক আধুনিক ফাদার-ডি-নোবিলির সাক্ষাৎ পেয়ে পরমোল্লাসে লেখেন—"ভারতীয় মিশনারি-সমাজে খাঁটি একজন ডি-নোবিলির এমন সাক্ষাৎ সহজে পাওয়া যায় না। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মতো ভারতের এক প্রতিভাবান সন্তান, যিনি ভারতীয় এবং অ্যারিস্টটলীয় ডায়ালেকটিকস্-কে নিজের মধ্যে সম্মিলিত করতে পেরেছেন—তিনি অবশ্যই ভারতের খ্রীস্টান-প্রচারকদের মধ্যে স্বাগত-সংযোজন রূপে গণ্য হবেন।"

এই 'স্বাগত-সংযোজনে'র ধাবিত আক্রমণ ক্যাথলিক এগজামিনার কতখানি পছন্দ করে-ছিল, তা দেখতে পাই তার ১৮৯৭, ৫ ফেব্রুয়ারির সংবাদে, যেখানে সিন্ধুদেশে অ্যানী বেশান্ত বক্তৃতা করতে এলে ব্রহ্মবান্ধব কিভাবে তাঁকে চালেঞ্জ করে নাজেহাল করেন, কিভাবে সারা করাচীর রাস্তা ঐ চ্যালেঞ্জের পোস্টারে মুড়ে দিয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে তৃপ্তিদায়ক সংবাদ ছিল। সেইসঙ্গে উপাধ্যায়ের সোফিয়া কাগজ সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিয়ে লেখা হয় : "পাঠকদের স্মরণ করাবার প্রয়োজন নেই, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব-সম্পাদিত আমাদের ক্যাথলিক মাসিকপত্র সোফিয়া তার প্রথম আবির্ভাবে যে-কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল, তা বিশ্বস্ততার

সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে—অর্থাৎ সামর্থ্যের সঙ্গে ক্যাথলিক-নীতির পক্ষসমর্থন করছে ও হিন্দুধর্মের ভ্রান্তি উদ্ঘাটন করছে।"

এবার সোফিয়া পত্রিকা থেকে ১৮৯৪-১৮৯৮ পর্যন্ত সময়ে (যে-পর্বের সোফিয়া আমি দেখেছি) বিবেকানন্দ ও তাঁর মত সম্বন্ধে যা বেরিয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যায়।

সোফিয়ার ১৮৯৪ জুন সংখ্যার 'হিন্দু রিভাইভ্যাল' প্রবন্ধের গোড়ার অংশ 'ভারতের নবজাগরণ' অধ্যায়ে উৎকলন করেছি। হিন্দু-উন্মাদনার সম্বন্ধে ক্রোধপূর্ণ স্বীকৃতি তাতে ছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে জাতীয়তার বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি করে বলা হয়, "যে-মানুষ সত্যের অপেক্ষা নিজের দেশকে ভালবাসে, সে সর্বোচ্চে আসীন ঈশ্বরের মহামহিমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।" [১২ বছর পরে এই কথাগুলি আয়রনির মতো ব্রহ্মবান্ধবকে আঘাত করবে।] তারপর যে-তত্ত্বালোচনা করেন, তার মূল বক্তব্য ঃ

বর্তমান হিন্দু-আন্দোলনের দুটি প্রধান তাত্ত্বিক মত—(১) সৃষ্টির অনাদি অনন্ত রূপ, (২) জন্মান্তরবাদ। আমাদের মতে—**এই মত দুটি মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু। আমরা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করছি**। এই দুই দুষ্ট মতের জন্য ভারত বহুযুগ ধরে ভুগেছে। জন্মান্তরবাদের জন্যই ভারতের দুর্নৈতিকতা। তারপর ঐ অদ্বৈতবাদ!—সকলই ঈশ্বর! ঈশ্বর সৃষ্টিধারার মধ্যেই আবির্ভূত!! তিনি স্রষ্টা নন—গঠনকর্তা মাত্র!!! মানুষ পাপ কাটিয়ে পূর্ণতা পাবার জন্য জন্মজন্মান্তরে ঘোরে—পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে না!!!! আমরা জানি, প্রতিবাদ করলে আমাদের জনপ্রিয়তা কমে যাবে। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা এবং মানবের মর্যাদা দাবি করছে—এইসব আত্মহননকারী মতবাদের বিরুদ্ধে আমরা ধর্মযুদ্ধে নেমে পড়ি। হাঁ, আমরা পিছপাও নই।

১৮৯৫, জানুয়ারিতে 'স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড প্যানথীজম্' রচনায় পাই ঃ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ব্রহ্ম থেকে কিভাবে সৃষ্টি হয়, সেকথা তিনি বলতে সমর্থ নন। তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছে লাইট অব দি ইস্ট পত্রিকা। কিন্তু বিবেকানন্দ জানেন যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়, তাই তিনি 'আমি জানিনা'র মধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছেন।

১৮৯৫ অগস্ট সংখ্যায় লাইট অব দি ইস্টের সঙ্গে অদ্বৈতবাদ নিয়ে দীর্ঘ তর্ক করার পরে সজোরে ব্রহ্মবান্ধব বলেন ঃ

"আমাদের অন্যতম মুখ্য জীবনোদ্দেশ্য—ভারত থেকে অদ্বৈতবাদের বিতাড়ন। যে-মত বলে—দুই বলে কিছু নেই, সৃষ্টির এই নানা রূপ হল অখণ্ড অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মের কাল্পনিক দর্শন, স্যালভেশন মানে অহংশূন্য অবস্থায় আত্মচৈতন্যে নিমজ্জন—সে-মত মানবের নিত্য স্বার্থের পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আমরা এই আত্মহননকারী মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করছি।"

১৮৯৫, নভেম্বর সংখ্যায় ব্রহ্মবাদিনের সঙ্গে অদ্বৈতবাদ নিয়ে তর্ক। ডিসেম্বর সংখ্যায় 'জনৈক ক্যাথলিক পুরোহিত'-লিখিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধ—*Liberalism in Belief or What Say Swami Vivekananda : Mrs Annie Besant and Their Disciples*. এই 'ক্যাথলিক পুরোহিতে'র নাম—রেভাঃ ফাদার লাকম্বি। এটি পুস্তিকা-আকারে পরে বেরিয়েছিল এবং খ্রীস্টান পত্রিকাগুলিতে যথোচিত সংবর্ধনাও পেয়েছিল।৪১

৪১ ইন্দো-ইউরোপীয় করেসপনডেন্স ১৮৯৬, ২২ জানুয়ারি এই পুস্তিকার প্রশংসাসূচক উল্লেখ করে। যে হিন্দুমতগুলি মরীচিকার মায়াঘোরে ঘুরছে, তাদের জন্য উপযুক্ত আলোক ও দিগ্দর্শন-পূর্ণ এই পুস্তিকা ও অনুরূপ কিছু পুস্তিকা—পত্রিকাটি বলেছিল।

বম্বে ক্যাথলিক এগজামিনার ফাদার লাকম্বি-লিখিত অনেকগুলি পুস্তিকার আলোচনা-প্রসঙ্গে

ধর্মক্ষেত্রে 'লিবারালিজম্' মানে সর্ব ধর্মের মধ্যেই সত্য আছে। প্রত্যেকে নিজ-নিজ ধর্মের মধ্যে থেকে ঈশ্বরারাধনা করলেই বাঞ্ছিত ফল পাবে। এই মতবাদ ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাসীদের পক্ষে মারাত্মক। একে মেনে নিলে মিশনারি-ছত্রটি গুটিয়ে ফেলতে হয়। মিশনারিরা আলোক দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁদের ঈশ্বর সেই আলোকের 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ' করে রেখেছেন বলে উক্ত ধর্ম-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত না-হলে সে আলোক কেউ পাবে না। তাই মিশনারিরা অস্থির হয়ে ধর্মক্ষেত্রে লিবারালিজম্-মতের প্রতিবাদ করেছেন—আলোচ্য রচনাতেও তাই দেখা যায়। উদারতার বান ডাকিয়ে ইনি বিবেকানন্দের এই সম্পর্কিত মত উদ্ধৃত করেছিলেন :

"পাঠকদের প্রথমে আমি...আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এমন একজন মানুষের উক্তির সম্বন্ধে মনোযোগী কর্ণদান করতে, যিনি ভারতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের অন্যতম বলে গৃহীত, পণ্ডিত-শাস্ত্রী হিসাবে খ্যাতিসম্পন্ন যে-ব্যক্তি 'চিকাগো ধর্মমহাসভায় কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও বুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত হয়েছেন।' মনে হয়, পাঠকগণ সকলেই বুঝতে পেরেছেন, আমি সুপরিচিত হিন্দুসন্ন্যাসী পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দের ইঙ্গিতই করেছি।

"যে-স্বামী, 'হিন্দু' পত্রিকার মতে, তাঁর খ্যাতির চেয়েও মহৎ, খুব বেশিদিনের কথা নয়, তিনি ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন। সেই বক্তৃতা থেকে আমি এই কথাগুলি উদ্ধৃত করছি : 'সত্য সর্বদাই সার্বভৌমিক। যদি আমার হাতে কেবল ছয়টি আঙুল থাকে এবং তোমার হাতে পাঁচটি, তাহলে তুমি নিশ্চয় ভাববে না আমার হাতই প্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি। উল্টোটাই ভাববে—তা অস্বাভাবিক বা রোগগ্রস্ত। ধর্ম সম্বন্ধেও সেই কথা। যদি কেউ দাবি করে, কোনো একটি মত সত্য, এবং অন্যগুলি মিথ্যা, তাহলে তোমার বলবার অধিকার আছে, যে-মত সে-কথা বলে তা রোগগ্রস্ত। যদি একটি ধর্ম সত্য হয়, অপর ধর্মগুলিও সত্য। হিন্দুধর্ম সেইজন্য যেমন আমাদের, তেমনি আপনাদেরও সম্পদ।'

"কিছু এগিয়ে তিনি এ-সম্পর্কে আরো বলেন : 'বস্তুতঃপক্ষে ঈশ্বর-বিষয়ক সকল মত, অর্থাৎ সকল ধর্ম, সত্য,, কারণ সেগুলি একটি মহাযাত্রার বিভিন্ন পর্যায়, যার চরম পরিণতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে বেদে। সেইজন্য আমরা (হিন্দুরা) কেবল প্রত্যেক ধর্মকে 'সহ্য' করিনা—তাদের 'গ্রহণ' করি। আমরা প্রার্থনা করি মুসলমানের মসজিদে, উপাসনা করি জরথুস্ত্রবাদীদের অগ্নির সামনে, নতজানু হই খ্রীস্টানদের ক্রুশচিহ্নের সামনে।...এই সকল পুষ্পকে সংগ্রহ করে আমরা প্রেমের সূত্রে গাঁথি এবং রচনা করি অপূর্ব পূজার পুষ্পস্তবক।'"

(১৮৯৬, ১৪ ফেব্রুয়ারি) ত্রিচিনাপল্লীর প্রাচীন বিখ্যাত 'সেণ্ট জোসেফ কলেজে'র বিশেষ প্রশংসা করেছিল, কারণ ফরাসি জেসুইট ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত এই কলেজটি অজ্ঞেয়বাদ, শূন্যতা এবং বিচারহীন হিন্দু-অন্ধতার ছেদনের জন্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তিকাগুলি প্রকাশের আয়োজন করেছে। পুস্তিকাগুলির ভাষায় ছিল, এই পত্রিকার মতে, পরিচ্ছন্নতা এবং প্রাঞ্জলতা, মূল বক্তব্য সজোরে তীক্ষ্ণভাবে হাজির করা হয়েছিল, এবং বাগ্‌বাহুল্য, অলংকারাসক্তি, অতিরঞ্জন একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছিল।' ছাপা ভাল, বাঁধাই ভাল, কিন্তু দাম মাত্র এক আনা।

বিবেকানন্দ-বিষয়ে সমালোচক লেখেন :

"*Liberalism in Belief,* deals exhaustively with the pernicious saying, that all religions are equally true, which formed the basis of the extraordinary assertions made by Swami Vivekananda.... By contrasting the chief dogmas of Hinduism and Christianity on the nature of God, on creation, the soul of man, on sin and salvation, the author shows the absurdities to which this saying leads, that it is the greatest insult a man can offer to God, whom it degrades even below the vilest of creatures."

রেভাঃ লার্কম্বি স্বামীজীর এই ধরনের আরও উক্তি উদ্ধৃত করেন। তারপর বলেন, স্বামীজীর মতে যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁদের বিষয়ে স্বামীজী কৃপার হাসি হাসবেন। স্বামীজী বলেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন অপর সমস্ত ধর্মের ধ্বংসের দ্বারা একটিই ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁরা করুণার পাত্র। রেভাঃ লার্কম্বি 'হিন্দু' পত্রিকার এক লেখকের কঠোর উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন ঃ যে খ্রীস্টান-মত বলে, উচ্চতর জীবনের পথ দেখাবার একমাত্র অধিকার ঐ মতেরই আছে, তা নিতান্ত সংকীর্ণ সংকুচিত মনের সৃষ্টি—তা তার সেমিটিক উৎসের বাতিল ধারণার গন্ডিতে এখনো আবদ্ধ।

রেভাঃ লার্কম্বি স্বভাবতঃই প্রচন্ড প্রতিবাদ করেছিলেন উপরের মতবাদের। বলেছিলেন, এহেন মতবাদ ভারতের পাপভারের অর্ধেকেরও বেশি অংশের জন্য দায়ী। "পর্বতপ্রমাণ ভ্রান্তিতে পূর্ণ" ঐ মতবাদের "যুক্তিহীনতা" প্রমাণের চেষ্টায় তিনি উপমা প্রয়োগ করে-ছিলেন ঃ "ধরা যাক কাক, যাকে কাঠকয়লার মতো কালো সবাই দেখে, যদি কেউ উঠে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত দাবি করে, না, আমি তুষারশুভ্র কাক দেখেছি, যদি কেউ বলে, মানুষ আছে এবং মানুষ নেই দুইই সত্য, যদি কেউ বলে, একমাত্র খাঁটি ভগবান যেমন আছেন তেমনি আছেন বহুসংখ্যক খাঁটি ভগবান, তাহলে যত শীঘ্র উক্ত বক্তাকে পাগলাগারদে পোরা যায়, তত শীঘ্র পৃথিবীর মঙ্গল।" ইনি আরও সিদ্ধান্তবাক্য দেন ঃ "মানুষ ঈশ্বরকে সম্ভবপর সর্বাধিক যে-অপমান উপহার দিতে পারে, তা হল—ধর্মমতের লিবারালিজম্, যে-মতের দ্বারা ঈশ্বর কুৎসিততম জন্তুতে পর্যবসিত হন।...কারণ ঐ মতের দ্বারা তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী হয়ে ওঠেন।...যথা ধরা যাক, ঈশ্বর হিন্দুদের দেখিয়েছেন, জন্মান্তর সত্য, একইসঙ্গে তিনি খ্রীস্টানদের আশ্বস্ত করেছেন, না জন্মান্তর মিথ্যা। এখন এই দুই মতের যেটিই সত্য হোক, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ঈশ্বর নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলেছিলেন যখন তিনি দুই পরস্পরবিরোধী প্রস্তাবকে সত্য বলে দেখিয়েছেন, যখন তিনি বেশ জানেন, তার একটি মিথ্যা।"

বলাবাহুল্য ঈশ্বর মিথ্যাবাদী নন। তিনি খাঁটি সত্য কেবল খ্রীস্টানদেরই দিয়েছেন। হিন্দুরা ঈশ্বরের মুখে মিথ্যা কথা বসিয়ে লোক ঠকাচ্ছে। রেভাঃ লার্কম্বি তা ধরে ফেলে এই প্রবন্ধযোগে তা পাঠকদের গোচর করেছেন।

সোফিয়ার ১৮৯৬ অগস্ট সংখ্যায় প্রবুদ্ধ ভারতের একটি সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় ঃ সম্পাদকীয়ের গোড়াতেই গন্ডগোল—সত্যভামা, রুক্মিণী, কৃষ্ণ, রাধা একত্র বিজড়িত। আমরা শুনেছি, রাধা ও গোপীরা কৃষ্ণের সঙ্গে যমুনার তীরে কামক্রীড়া করেছেন। কিন্তু সেখানে আবার সত্যভামা রুক্মিণীর আমদানী কেন? [এই ব্রহ্মবান্ধবই কয়েক বছর পরে কৃষ্ণচরিত্রের মিশনারি-কুৎসার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।]

রচনার শেষে বলা হয় ঃ "আধুনিক ভারত যে পুনরায় তার অতি পুরাতন বাসনা, ঈশ্বরকে পূর্ণভাবে জানার বাসনা বোধ করছে তা অভিনন্দনের বিষয় কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হল, একশ্রেণীর সংস্কারকের উদয় হয়েছে, যাঁরা ভারতকে তার তৃষ্ণা মেটাবার পানীয় দিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বেদান্তের মারাত্মক বদ্ধ জলাশয়ে। বৈদান্তিক ভ্রান্তির বিষ ভারতকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। তার বর্তমান আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দুর্গতির মূলে অদ্বৈতবাদ। যে-জাতির মূল ধর্মমত নিত্য পূর্ণসত্যকে অপূর্ণতার টেনে নামায়—তার উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ কি করে বর্ষিত হবে? চিকাগো-ধর্মমহাসভায় উপস্থাপিত বেদান্তের সার কথা হল—সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যে-কোনো ভাবে হোক, নিজেকে বস্তুতে আবদ্ধ করে ফেলে নিজেকে বস্তু বলে ভাবেন। ধিক!"

সোফিয়ার ১৮৯৬ অক্টোবরের সম্পাদকীয় রচনার নাম *Neo-Hinduism Run Wild*।

নব্য হিন্দুধর্মের খ্যাপামির পরিচয় দিতে ব্রহ্মবান্ধব ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদী নানা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তারপর তাঁর এই ব্যঙ্গাত্মক রচনা ঃ

"উপরের বিবেকানন্দের উদ্ধৃতির মোদ্দা কথা, নব্য হিন্দুধর্মের মতে, সকলই ঈশ্বর, ঈশ্বরই সকল কিছু। কিন্তু সেই পরম পুরুষ, জ্ঞানময় যিনি, তিনি কিভাবে নিজেকে দেবতা, দৈত্য বা মানব ভাবেন? ভো! অবধান করুন! নব্য হিন্দুধর্ম বলে ঃ সেই পরম পুরুষ মাঝে-মাঝে মায়াবশ হন। তিনি স্বপ্ন দেখেন তখন। সেই স্বপ্নে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দেবতা, দৈত্য, মানুষ, পশু, গ্রহতারা, পাথর, স্বর্গ, নরক—সব তৈরি করেন। যেমন রাজা স্বপ্নে দেখেন, তিনি চোর হয়েছেন আর তাঁর নিজের সেপাই তাঁকে গারদে ঢোকাচ্ছে,তেমনি আর কি। সর্বপূর্ণ, সর্বশুদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডপতি যেভাবে হোক ভেবে ফেলেন, তিনি অপূর্ণ মানুষ, পাপী, অপরাধী, তিনি বিচারের হাতে দণ্ডিত। এই হল সৃষ্টিরহস্য—পাপের উদ্ভব এইভাবেই। এখন উদ্ধারের উপায় কি? শোনো শোনো সুরলোকবাসী! নরলোকবাসী! সিদ্ধান্ত এই ঃ তোমরা কদাপি ভেবো না তোমরা ঈশ্বর-বই আর কিছু—তাহলেই সব পাপ ধুয়ে যাবে, সব মন্দ উড়ে যাবে, কারণ তোমরা বা অন্যেরা যেসব খুনজখম, ব্যভিচার, চুরিজোচ্চুরি করেছ বা করছ, সে সবই তোমাদের পরিবর্তিত চোখে মায়াগ্রস্ত ঈশ্বরের দায়িত্বহীন খেলা বলে প্রতিপন্ন হবে।...কেবল বিশ্বাস করো, তিনিই তুমি, তুমি সেই অনন্ত অস্তিত্ব, তাহলে এক মুহূর্তে তোমার সকল স্বার্থপরতা অদৃশ্য হয়ে যাবে, এবং প্রেম আমাদের এই ভূমণ্ডলকে প্লাবিত করবে। তাহলেই বিবাহবন্ধন পবিত্র হয়ে যাবে কারণ তখন পুং-ঈশ্বর স্ত্রী-ঈশ্বরকে বিয়ে করবে, তখন দুষ্টু-দুষ্টু খোকা-ঈশ্বর মিষ্টিভাবে রান্নাবাড়া বা কাপড়কাচায় নিযুক্ত নারী-ঈশ্বরকে দিব্য পেজোমি দিয়ে জ্বালাবে। তখন সব জায়গাতে বোঝাপড়া ও আপোষের আবহাওয়া বজায় থাকবে; এগারজন ভগবানের একটি দল অপর একটি এগার-ভগবানের দলের সঙ্গে ক্রিকেট খেলবে আম্পায়ার-ভগবানের সাহায্য ছাড়াই। তখন একদল রসস্থ ঈশ্বর আর একদল রসস্থ ঈশ্বরের স্বাস্থ্যপান করবে পুরো সৌহার্দ্য ও শান্তির সঙ্গে—পুলিশ-ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই।...তখন তুমি দেখবে, নিরামিষ-ঈশ্বর সবজী-ঈশ্বরকে খস্‌খস্‌ করে চিবোচ্ছে, মাংসাশী-ঈশ্বর কড়মড় করে চিবোচ্ছে হাড়-ঈশ্বরকে, বক্তা-ঈশ্বর প্ল্যাটফর্ম-ঈশ্বরের উপরে পা ঠুকছে, যুবক-ঈশ্বর বাহারে ছড়ি-ঈশ্বর নিয়ে বেড়াচ্ছে, বুড়ো-ঈশ্বর লাঠি-ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে হাঁটছে। তাহলে আর কোনো গণ্ডগোল বা অসঙ্গতি রইল না। উদ্ধার মানে কি—সবরকম অভিব্যক্তিকে বীজগণিতের ছোট্ট সমাধানে পরিণত করে ফেলা, তা ছাড়া আর কি!"

অদ্বৈতবাদের অনবদ্য ক্যারিকেচার—পরম উপভোগ্য। এ-বস্তু সর্বাধিক উপভোগ করবেন স্বামী বিবেকানন্দ যিনি একদা রামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদের সামনে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে বলে-ছিলেন—তাহলে ঘটিটাও ঈশ্বর! বাটিটাও ঈশ্বর! কিন্তু ঘটি-বাটিও যে, ঈশ্বর—অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তিনি জেনেছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের আনন্দের হাসির সঙ্গে বিষাদ-হাসিও মিশিয়ে ছিল, যা ব্রহ্মবান্ধবের ক্ষেত্রেও ঘটবে যদি পরবর্তীকালে তিনি নিজের এই লেখাগুলি উল্টে দেখে থাকেন।

যাইহোক, ব্রহ্মবান্ধব ক্যারিকেচারেই থেমে থাকতে পারেন নি। তাঁর ভিতরকার উগ্র-প্রচারক পূর্বোক্ত রচনার মধ্যে নির্ঘোষ তুলে প্রশ্ন করেছিল—"ভারতের বুদ্ধিবৃত্তি কি গোল্লায় গেছে যে, সে এহেন দর্শন মানবে?" ভারতের অনুসরণীয় আদর্শ কী, তাও তিনি জানিয়েছিলেন—তা হল, ক্যাথলিকদের ঈশ্বরতত্ত্ব। তারপর উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন ঃ

"নব্য হিন্দুধর্মের বক্তব্য খণ্ডন করে পুস্তক-পুস্তিকা ছড়িয়ে দাও ভারতের নগরে-শহরে, গ্রামে-প্রান্তরে, প্রাসাদে-কুটীরে—সর্বত্র। সেণ্ট টমাস ও অন্যান্য ক্যাথলিক দার্শনিকেরা যে-দুর্ভেদ্য যুক্তিতে অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করেছেন, সেইসব দার্শনিক রচনা পৌঁছে দাও

আমাদের শিক্ষিত লোকদের হাতে। আমাদের স্থির ধারণা, তাহলেই এই নব্য হিন্দুত্বের ভ্রান্তি-রাক্ষস শীঘ্রই অন্ধকার গর্তে-গুহায় পালিয়ে বাঁচবে।”

১৮৯৬ নভেম্বর সংখ্যায় *Neo-Hindu Guruism* রচনায় হিন্দু গুরুর সঙ্গে ক্যাথলিক আচার্যের তফাত দেখানো হয়। কোনো নব্য হিন্দু লিখেছিলেন—উপলব্ধিবান গুরু দরকার ধর্মজীবনে, যেমন ক্যাথলিকরা গুরু নেয়—সেই সূত্রেই উক্ত আপত্তি। ক্যাথলিক শিক্ষকের শ্রেষ্ঠত্ব সবিশেষ প্রতিপন্ন করেছিলেন সোফিয়া-সম্পাদক। বিশেষ বুঝিয়েছিলেন—তাঁরা জিজ্ঞাসুদের কতখানি স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। [স্বাধীনতা কতখানি হরণ করে থাকেন, তা বুঝতেও ব্রহ্মবান্ধবের দেরি হবে না।]

১৮৯৭, ফেব্রুয়ারির সম্পাদকীয়ের নাম—*The Impending Danger*। আসন্ন সর্বনাশ! সর্বনাশের কারণ—ভারতের শিক্ষিত লোক সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা ভগবানে বিশ্বাস না করে “একেবারে উদ্ভট, বিকট, বন্ধ্যা” নিরাকারে বিশ্বাস করতে অগ্রসর হচ্ছে। হিন্দু-উত্থানের দুই প্রধান পাণ্ডা বিবেকানন্দ ও বেশান্ত তাদের তাই করতে বলছেন।

ব্রহ্মবান্ধব আরও লেখেন ঃ ক্ষুদ্রাকার শিখ, ব্রাহ্ম ও আর্যসমাজের বাইরে অধিকাংশ হিন্দুর বিশ্বাস ঐ প্রকার—বিশেষতঃ ভারতের দুই অগ্রসর প্রদেশ বাংলা ও মাদ্রাজে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও তাই। পঞ্জাব ও পশ্চিমভারতে পতন সর্বাত্মক না হলেও বিবেকানন্দ ও বেশান্তের প্রচারের প্রতি ব্যাপক সহানুভূতি আছে। সুতরাং খুবই সম্ভাবনা—জনগণ ঐ “পৈশাচিক ভ্রান্তির” কবলে পড়বে। “ধর্মের কূপ অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে গেছে।” প্রশ্ন হচ্ছে —অবস্থার আরও অবনতি ঘটে কি অগণিত লোককে দুঃখের গহ্বরে নিক্ষেপ করবে? একথা সত্য, “আমাদের দেশে কখনই বিশুদ্ধ সত্যের আলোক ছিল না,” কিন্তু সাকার ভগবানে বিশ্বাসের শিখা তো জ্বলছিলই—সেটুকুও এখন নেভার মুখে। বিভিন্ন ধর্মসমাজ এই বিপদ বুঝছে না। “কে ভারতকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবে?” প্রোটেস্টাণ্টরা পারবে না কারণ ভারতের মতো “সূক্ষ্ম কিন্তু ভ্রান্তদর্শনের” দেশে প্রোটেস্টাণ্টদের সামান্য দর্শন চলবে না। “একমাত্র পারে ক্যাথলিকরা—যাদের বিশাল অপূর্ব সংগঠন, যুগ-যুগ ধরে সঞ্চিত প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার বিরাট ঐতিহ্য, হিপ্পোর সেণ্ট অগস্টাইন, অ্যাকুইনের সেণ্ট টমাসের বিস্তারিত দর্শন, সর্বোপরি স্বয়ং ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়ভার ন্যস্ত যাদের উপরে—তারাই কেবল এই বিপজ্জনক ভ্রান্তির তরঙ্গ রুখতে পারে, যদি সত্যই চেষ্টা করে।” তাই ক্যাথলিক সাধুরা ভারতের পুরাতন রীতি অনুযায়ী বেরিয়ে পড়ুন, ধর্মসভা ডেকে প্রতিপক্ষের পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করুন, এবং সেইসঙ্গে খ্রীস্টপ্রচার করে যান—তাহলেই বিপদ এড়ানো সম্ভব।

একই সংখ্যায় ভারতে আগত ডাঃ বারোজ-প্রসঙ্গে লেখা হয় ঃ বারোজ হিন্দুধর্মের প্রশংসা করে খ্রীস্টধর্মের মর্যাদানাশ করেছেন। কিন্তু তিনি কৃপার পাত্র। বেচারা সরলপ্রাণে ভেবেছিলেন, হিন্দুদের তোয়াজ করে তাদের সহিষ্ণু কর্ণে খ্রীস্টধর্মের অপূর্বতার বাণী ঢুকিয়ে দিতে পারবেন। তার ফল হল কী? হিন্দু-প্রতিনিধিদের বিষয়ে তাঁর সার্টিফিকেট হিন্দু-কাগজগুলি ফাঁপিয়ে ব্যবহার করল হিন্দুধর্মের শক্তি বাড়াতে—অথচ উল্টোদিকে বারোজ ভারতে কোন্ সংবর্ধনা পেলেন? হিন্দু-পত্রিকাগুলির মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, তারা খ্রীস্টধর্মকে অন্যান্য মনুষ্যসৃষ্ট ধর্মের চেয়ে বেশি-কিছু মনে করতে রাজি নয়, এমন-কি ক্ষেত্র-বিশেষে খ্রীস্টধর্ম তাদের ধর্মের চেয়ে নীচু!

সোফিয়ায় ১৮৯৭ মার্চে বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাগমন সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়। তাঁর প্রত্যাবর্তনে মহাকাণ্ড ঘটবে আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু হিন্দু-মহলে ব্যাপারটা ভাল দাঁড়ায় নি, কারণ বিবেকানন্দ থিয়জফি ও বেশান্তের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে থিয়জফিস্টদের (যাঁদের অনেকেই উৎসাহী নব্যহিন্দু) উৎসাহে জল ঢেলে দিয়েছেন।

একই সংখ্যায় ‘টি-কে’ স্বাক্ষরে জনৈক লেখক বিস্ময়করভাবে (এই পত্রিকার পক্ষে)

বিবেকানন্দের থিয়জফিস্ট-সমালোচনা এবং ব্রাহ্ম-সমালোচনা, এবং মজুমদারের ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্যের নিন্দা করেন। কিন্তু ব্যাপারটা বিস্ময়কর মনে হবে না, যদি আমরা মনে রাখি, যে-কোনো ভাবে হোক, বিবেকানন্দকে সমালোচনা করতে পারলে সাম্প্রদায়িক সুবিধা —তদনুযায়ী থিয়জফিস্টদের প্রতি এ'দের সাময়িক সহানুভূতি। আর ব্রহ্মবান্ধব ও তাঁর বন্ধুমহলে মজুমদারের প্রতি বিশেষ ভক্তি-ভালবাসা ছিল, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি।

১৮৯৭ এপ্রিলে *Neo-Hindu Dogmatism* রচনায় হিন্দুদের উদারতা-দাবিকে গোঁড়ামি আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করা হয়।

১৮৯৭ মে সংখ্যায় দক্ষিণভারতে ব্রহ্মবান্ধবের ভ্রমণ এবং তাঁর বক্তৃতার সমাদরের কথা বলা হয়। বিবেকানন্দের বন্ধুরা যে তাঁকে মাদ্রাজে ক্যাসল কার্নেনে রেখেছিলেন, তাও ঐ সংবাদে পাই।

১৮৯৭ জুন সংখ্যায় 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র অদ্বৈতবাদকে, এবং জুলাই ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ব্রহ্মবাদিনের অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ করা হয়।

সেপ্টেম্বর সংখ্যাতে জনৈক গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, এম-এ *Can Hinduism be a Universal Religion* নামক প্রবন্ধে বলেন, হিন্দুধর্ম সার্বভৌমিক ধর্ম নয়। আরও বলেন, ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হল—তাকে দেশীয় হতে হবে। পিতৃপুরুষের ধর্মত্যাগ ভালো নয়, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে বুদ্ধ, মহম্মদ, রামানুজ, বল্লভের প্রচার ভ্রান্ত হয়। আর 'ন্যাশন্যাল' ধর্ম যদি সুন্দর হয়, 'র‍্যাশন্যাল' ধর্ম মহান। বলাবাহুল্য খ্রীস্টধর্ম এই লেখকের পুনরুক্তিভরা রচনাটিতে 'র‍্যাশন্যাল' এবং 'ইউনিভার্সাল' ধর্ম বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল।৪২

১৮৯৭ অক্টোবর সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব *Who Was Ramakrishna* রচনায় রামকৃষ্ণকে অবতার করার চেষ্টার বিরুদ্ধে আপত্তি করেন। বিবেকানন্দ ও তাঁর সহযোগীরা প্রভূতসংখ্যক অবতারের আরও সংখ্যাবৃদ্ধি করতে চাইছেন—নিজেদের গুরুকে অবতার বানিয়ে। তাতে ব্রহ্মবান্ধব দুঃখিত, কারণ রামকৃষ্ণের মতো 'উত্তম ও মহাত্মা' ব্যক্তিকে নির্বোধের মতো দেবতা করে তুলতে গিয়ে তাঁর জীবনের কঠোর বাস্তব ঘটনাকে কুসংস্কারপূর্ণ ধাপ্পাবাজিতে ভরিয়ে তোলা হচ্ছে। ধাপ্পাবাজির সূচনা রামচন্দ্র দত্ত থেকে। তিনি রামকৃষ্ণের জন্ম থেকে শুরু করে সাধনার বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে নানা অলৌকিকতা প্রচার করেছেন। রামচন্দ্র দত্তের বিরোধী ছিলেন সুরেশ মিত্র—বিবেকানন্দ তার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু শেষে বিবেকানন্দও অন্ধকারের দিকে ঢলে পড়লেন। "রামকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ ব্যক্তিগত জানাশোনা ছিল। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম—একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না, তিনিও আমাদের ভালবাসতেন। তাঁর মধ্যে পাপবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রায়ই তাঁকে ঈশ্বরের

৪২ পণ্ডিত গোপাল শাস্ত্রী সম্বন্ধে কিছু চিত্তাকর্ষক সংবাদ আছে। রেভাঃ স্লেটার তাঁর ১৮৯৬-এর রিপোর্টে "পণ্ডিত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ"-এর "গভীর তাৎপর্যপূর্ণ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের" সংবাদ দেন। তাৎপর্যপূর্ণ এইজন্য যে, বিবেকানন্দের হৈ-চৈ-এর মধ্যে এ-জিনিস ঘটেছে। এই ব্যক্তি নাসিকের লোক, হিন্দুশাস্ত্রে বিরাট পণ্ডিত কিন্তু হিন্দুধর্মে শান্তি না পেয়ে খ্রীস্টধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন। শাস্ত্রীর "একটি অত্যন্ত আকর্ষক চিঠিও" তিনি ছেপেছিলেন, যার মধ্যে দেখি, জীবনের ছত্রিশটা বছর উনি হিন্দুশাস্ত্রের কুসংস্কারে মাথামুণ্ডু ডুবিয়ে বসেছিলেন, পুরুতরা তাঁর জ্ঞানচক্ষু কানা করে দিয়েছিল। তিনি মূল সংস্কৃতে পুরাণ, আরবীতে কোরান, প্রাকৃত ও পালিতে বৌদ্ধ-শাস্ত্র, এবং হিন্দীতে জৈনগ্রন্থ পড়েছেন, কিন্তু অন্ধই থেকে গিয়েছিলেন যতক্ষণ-না তেরটি বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল পড়তে পারলেন। "অন্ধ ছিলাম, এখন পেয়েছি দেখার নয়ন।" (হার্ভেস্ট ফিল্ড ১৮৯৭ এপ্রিল)।

একই কাগজে ১৮৯৭ নভেম্বরে বেরোয় : "গত বৎসর আমরা [পণ্ডিত গোপালচন্দ্র] শাস্ত্রীর ব্যাপটিজমের সংবাদ ছাপি।...... [ধর্মান্তরের পরে] শীঘ্রই দেখা যায়, শাস্ত্রী অদ্ভুত চরিত্রের লোক; কিন্তু খুব সম্প্রতি আমরা আবিষ্কার করেছি—সে একটি জোচ্চোর।"

কাছে একান্তভাবে ক্ষমা ও করুণাভিক্ষা করতে শুনেছি। আমরা স্বকর্ণে শুনেছি—অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তিনি তাঁর উপরে দেবভাব আরোপ করলে আপত্তি করেছেন। একদিন, কেদারনাথ নামক এক ব্যক্তি তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে 'ভগবান' বলে সম্বোধন করলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাবু কেদারনাথকে তা করতে নিষেধ করেন। আমাদের এই কথা মিথ্যা প্রমাণ করতে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি। এই রকম সস্তার দেবত্বারোপ দেখে আমাদের ইউরোপীয় পাঠকেরা চমকাবেন না, কারণ আগেই বলেছি, ব্যাপারটা খুবই সাধারণ ব্যাপার ভারতবর্ষে। ঘটনাটি দেখিয়ে দেয়, অদ্বৈতবাদ এবং পৌত্তলিকতা আমাদের দেশবাসীর বুদ্ধিবৃত্তিকে কিভাবে কালিমাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কি বিচিত্র! যখন কোনো মানুষ সুস্পষ্টভাবে, সজোরে ঈশ্বরত্ব-আরোপকে অগ্রাহ্য করলেন, অধিকন্তু নিজেকে পাপী বলে ঘোষণা করে ঈশ্বর-করুণা প্রার্থনা করলেন, তখনো এমন মন্দ-মনের মানুষ থাকবে—শিক্ষিত মানুষ—যারা তাঁকে সর্বেশ্বর বলে উপস্থিত করার চেষ্টা করবে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হে পরম-পুণ্য প্রভু! হে ঈশ্বর! তুমি তোমার গৌরব প্রকাশ করো এই হতভাগ্য মানুষগুলির কাছে!"

১৮৯৭ অক্টোবর সংখ্যায় ডাঃ বারোজ-কৃত বিবেকানন্দ-নিন্দা উদ্ধৃত হয় প্রতাপ মজুমদারের ইনটারপ্রেটার থেকে। সে-সব কথা বারোজ-সম্পর্কিত অধ্যায়ে উপস্থিত করব।

১৮৯৭ নভেম্বরে এস বারটোলি-লিখিত *Short Papers on Creation*-এর মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দাবি নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হয়।

তারপর অকস্মাৎ বেরুল ১৮৯৭ জুলাই সংখ্যায়—*Are We Hindus?* সবিস্ময়ে সবাই দেখল—ব্রাহ্মবান্ধব নামক কীর্তিনাশা নদী আবার বাঁক নিচ্ছে, আর তারই বেগে গ্রাস করে নিচ্ছে নিজেরই অনেক পুরাতন কীর্তি। লেখাটি মূলেই উদ্ধার করি ঃ

By birth we are Hindu and shall remain Hindu till death. But as *dvija* (twice born), by virtue of our sacramental re-birth, we are Catholic. . . .

"Our thought and thinking is emphatically Hindu. We are more speculative than practical, more given to synthesis than analysis, more contemplative than active. It is extremely difficult for us to learn how to think like the Greeks of old or the scholastics of the middle ages. Our brains are moulded in the philosophic cast of our ancient country.

"We are proud of the stability of the Hindu race. Many a mighty race did rise and fall. But we continue to exist. . .We believe in the future greatness of our race, and in this belief we shall live and die. . .

"Do we believe in Hinduism ?. . . .Hinduism has no definite creed. Kapila and Vyasa were opposed to each other and yet both of them are considered to be *rishis*. The Hindu Vedantist of the School of Ramanuja looked down upon the Hindu Vedantists of the School of Sankara as blasphemers [and so on]. .The test of being a Hindu cannot, therefore, lie in religious opinions. However, we are fully imbued with the spirit of Hinduism. *We hold with the Vedantists that there is one Eternal Essence from which proceed all beings.* We believe with the *Vaishnavas* in the necessity of incarnation, and in the doctrine that man cannot be saved without Grace. We agree in spirit with the Hindu law-givers in

regard to their teaching that sacramental rites (Sanskaras) are vehicles of sanctification. . .

"In short, we are Hindu so far as our physical and mental constitution is concerned, but in regard to our mortal souls we are Catholic. We are Hindu Catholic." [Italics mine]

ব্রহ্মবান্ধব তাঁর পুরনো বন্ধু বিবেকানন্দের হাত ধরেই এই লেখাটি লিখেছিলেন। বিবেকানন্দও 'ক্রীশ্চান হিন্দু'র কল্পনা করেছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব বদলালেন কেন? নিশ্চয় নিজ চরিত্রের বেগে। সর্ব তীর্থ ঘুরে 'সেই মা তোমার কাছে আসিনু আবার' বলাই তাঁর ভবিতব্য। তবু যদি কোনো শক্তি তাঁর পরিবর্তনের (বা পরিবর্তনের গতিবৃদ্ধির) জন্য দায়ী হয়—সে শক্তির নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। অন্ততঃ তাঁর রচনা থেকে তাই মনে হয়। রামকৃষ্ণকে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর সম্পূর্ণ খ্রীস্টীয় উন্মাদনার মধ্যেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তাঁকে অবতার বলে মানতে অস্বীকার করেছেন কিন্তু শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ বলতে দ্বিধা করেন নি। বিবেকানন্দ সম্পর্কে এই পর্বে সেই ভাবাবেগ নেই। না থাকার কারণ আমরা বুঝতে পারি। বিবেকানন্দের চেয়ে অল্প বয়োজ্যেষ্ঠ কিন্তু সহপাঠী এই মানুষটি পাশাপাশি থেকে নানা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় তরঙ্গের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন—কিন্তু কোথাও বিবেকানন্দকে সহমত পাননি। ব্রহ্মবান্ধবের মধ্যে ব্রহ্মণ্যসংস্কার প্রবল ছিল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আচার-বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন—বিবেকানন্দ প্রথম বয়স থেকে ঐসব জিনিস তীব্র আনন্দের সঙ্গে ভেঙে ছড়িয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধব যখন হিন্দু রক্ষণশীলতা থেকে নববিধানে প্রবেশ করছেন, কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের প্রভাবে এসে পড়েছেন, তখন বিবেকানন্দ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে নববিধানের বিরোধী মানুষ হিসাবে ঐ দুইজনের আন্তরিকতায় সন্দেহ করছেন (নিশ্চয় বন্ধুমহলে খোলাখুলি সেকথা বলেছেনও)। ব্রহ্মবান্ধব যখন একেশ্বরবাদের ভক্ত হচ্ছেন, বিবেকানন্দ তখন অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করে ফেলেছেন। তারপর ব্রহ্মবান্ধব যখন খ্রীস্টমতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে খ্রীস্টান ধর্ম নিয়ে তাকেই ভারতের পরিত্রাণের একমাত্র পথ বলে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—ঠিক সেই সময়ে সেই পথে সবচেয়ে বড় বাধার আকারে দেখা দিয়েছেন—বিবেকানন্দ। সুতরাং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর মন এতদিন পর্যন্ত একেবারে রুদ্ধ। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রভাব বিচিত্র ও বিস্ময়কর। তা নিঃশব্দে তলদেশকে ক্ষয় করে। যারা দ্বার বন্ধ করে রাখে, তারা জানেও না ইতিমধ্যে কোন্ অজ্ঞাত শক্তিতে অর্গল খুলে গেছে। স্বামীজী একবার নিবেদিতাকে বলেছিলেন—যারা আমার বিরুদ্ধে বলে, তারা আমারি—আমাকে তারা ছাড়তে পারে না। কথাটা যে সত্য, অন্ততঃ ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষে সত্য, তা তিনি নিজে স্বীকার করে গেছেন। এবং আমরা ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের শেষ পর্বের যেসব লেখার কথা জানি, তাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তুল্য ভক্তি আর কারো প্রতি প্রকাশ পায়নি।

রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব 'তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছি'—এই অনুতাপে লিখেছিলেন ঃ

"রামকৃষ্ণ কে? তিনি কি-জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন? এই নীচাশয়ের সহিত ঐ মহাপুরুষের বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয়ের কথা বলিতে গিয়া একজন কবির উক্তি মনে উদয় হইতেছে। পরিচয়ের গর্ব করিও না—যে কীট সে কীট—যদিও সে রাজমহিষীর কেশগুচ্ছে বাস করে। ভগবান রামকৃষ্ণও সাধনাসিদ্ধ মহাপুরুষ। এরূপ সাধক ও সিদ্ধি বহুকাল অবধি পুণ্যভূমি ভারতে দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে লাভ করিয়া ভারত ধন্য হইয়াছে—বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহার কামিনীকাঞ্চনে বিরাগের কথা স্মরণ করিলে প্রাণ-মন উদাস হইয়া যায়। তাঁহার অদ্বৈত-সমাধি ভাবিলে সকল ভেদ-বিরোধ বিস্মৃত হইতে হয়। তাঁহার ভক্তিময় হুঙ্কার-মুখরিত নর্তনদৃশ্য চিত্তপটে উদিত হইলে পাপতনুও

পুলক-রোমাঞ্চে কদম্বাকৃতি ধারণ করে। তাঁহার পুণ্য সংস্পর্শে আমি ধন্য হইয়াছি। তাঁহার শ্রীচরণযুগল আমার পাপ-অঙ্গে তিনি অর্পণ করিয়াছিলেন—আমার গণ্ডদেশে করকমল সঞ্চালন করিয়া এই হতভাগ্যকে আদর করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ও উপদেশ, বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, তিনি কোনো নূতন যুগধর্ম প্রচার করিতে আসেন নাই। যে ব্রাহ্মী-স্থিতির কথা গীতাতে বর্ণিত আছে—যে অহৈতুকী ভক্তিতত্ত্ব ভাগবতে গীত হইয়াছে, তাহাই তিনি জীবনে সিদ্ধ করিয়া পাপ পৃথিবীতে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। ['স্বরাজ' ১৯ চৈত্র, ১৩১৩। বাগল-রচিত জীবনীতে উদ্ধৃত]

স্বরাজ পত্রিকা আমি দেখিনি। তবে উপরের রচনায় ব্রহ্মবান্ধব আরও অনেক-কিছু লিখে-ছিলেন, তা দেখতে পাই ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের 'শ্রীরামকৃষ্ণঃ সমসাময়িক দৃষ্টিতে' গ্রন্থের মধ্যে। তার মধ্যে তিনি বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বনিতা জননী সারদাদেবীকে প্রণাম জানিয়েছিলেনঃ

"রামকৃষ্ণ কে? কে তাই জানি না। এই পর্যন্ত জানি যে, এই সোনার বাঙলায় এমন সোনার চাঁদ—গোরাচাঁদের পর—আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্ক-রেখাটুকুও নাই। আহা—তাঁহার ভাগবতী-তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্মল ছিল। বনিতা-বিলাস দোষে উহা কখনও কলুষিত হয় নাই।"

সারদাদেবীর প্রতি নমস্কারঃ

"তাঁহার যখন বিবাহ হয়—তখন তাঁহার পত্নীর বয়স আট বৎসর। বিবাহের আট বৎসর পরে ঐ সতীলক্ষ্মীর সঙ্গে আবার দেখা হয়। লক্ষ্মী তখন ষোড়শী যুবতী। রামকৃষ্ণদেব ঐ লক্ষ্মীকে বিধিমতে পূজা করেন ও নিজের জপের মালা তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গের পর রামকৃষ্ণ-চন্দ্রে ষোড়শ-কলা-চন্দ্রিকা ফুটিয়া ওঠে। ঐ শোভা ইতিহাসে অতি দুর্লভ। অনেক সাধু-মহাজন সহধর্মিণী ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু রামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয়—অঙ্গী-কারের পরাকাষ্ঠা। চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমনি মা লক্ষ্মী আমাদের —সেই ষোড়শী পূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে তো একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে গিয়া বসিও, আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশীসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণে কিভাবে সর্বকিছুর সমন্বয়, সেকথা তারপর বললেনঃ

"রামকৃষ্ণ কে? রামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞানী।...রামকৃষ্ণ কে? তিনি সাধক-চূড়ামণি। উচ্ছ্বাস-ময়ী, আবেগময়ী, ভাবময়ী সাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ-বিশেষ ভাব আহরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে—যোগীর সমাধি, গোপীজনের মাধুর্য, শাক্তের ভৈরবভাব অভেদ-সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। তিনি মহম্মদীয় সাধনাও করিয়াছিলেন এমন-কি—তিনি যীশুভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন।

"ভগবান রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে অচল-অটল ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সনাতন আর্যধর্মের পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল ভেদভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—অদ্বৈত-বিলাসিনী করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন।"

ব্রহ্মবান্ধব রামকৃষ্ণকে "লোকরক্ষার সেতু, ভাবসমন্বয়ের সাগর" মনে করেছিলেন। কিভাবে তাও ব্যাখ্যা করেছেন। "বিধাতার নির্দেশে পৃথিবীতে যত অংশাশি ভেদ-বিরোধ আছে তাহা সমস্তই এই পুণ্যভূমি ভারতে এক অপূর্ব সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত হইয়া অদ্বৈততত্ত্বে পূর্ণতা লাভ করিবে।" শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই উদার সমন্বয়ের আদর্শ দিয়েছেন। কালগতে বর্তমানে আবার সংঘাত ও আলোড়ন আরম্ভ হয়েছে। "এই আন্দোলনে—আলোড়নে ভারতের প্রতিষ্ঠা কে রক্ষা করিবে?" রামমোহন বা কেশবচন্দ্র নন। "রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়বাদী

ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাঁহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছেন।" ভারতবর্ষের ভিত্তিতে নিজ সাধনাশক্তিতে অপূর্ব সমন্বয়ের পথ একজন খুলে দিয়েছিলেন : "এই বিপ্লবে সমাজভঙ্গ রোধ করিতে ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। [তিনি] আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্মবিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোক-রক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন।"

এ রচনাও যথেষ্ট নয়। ব্রহ্মবান্ধব রামকৃষ্ণকে অবতার বা ততোধিক বলবেন। বলবেন—বিবেকানন্দের মতোই—রামকৃষ্ণ সমগ্র হিন্দুসাধনার সারভূত বিগ্রহ। মাসিক বসুমতীতে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবর্ষ সংখ্যায় (ফাল্গুন, ১৩৪২) ব্রহ্মবান্ধবের 'জন্মোৎসব' নামে একটি রচনা উদ্ধৃত হয়েছিল, তার কিছু অংশ এই :

"চল চল আজ দক্ষিণেশ্বরে যাই! আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়াছ, চল আজ রামকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবন-মনকে সার্থক করি। বড় ভাগ্য না হইলে মর্ত্যলোকে এমন অপূর্ব রূপ—এমন আবির্ভাব দেখা যায় না। চল চল বাঙালী, আজ তোমার জাতীয় জীবনের নবজাগরণের শুভ মুহূর্তক্ষণে ঐ নরদেবতাকে দেখিয়া ধন্য হইয়া আসি। জান কি রামকৃষ্ণ কে?

"পুরাতন যুগের অন্তিমকালে, নূতন যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিষ্ণু আবির্ভূত হন। এই সনাতন সত্যটি শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের অন্তে কলিযুগপ্রারম্ভে আমাদের শুনাইয়াছিলেন—'পরি-ত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' আজ যিনি রামকৃষ্ণরূপী, তিনিই সেই যুগসম্ভাবনা। যাহা আমরা আমাদের সাধনা ও শক্তিবলে পারি না, তাহাই তিনি কৃপা করিয়া সিদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন।......হিন্দুর জীবন্ত ও বহু ইতিহাস তাঁহার শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষাকে পুনরায় তিনি জীবনে পরিস্ফুট, বেগবন্ত করিতে আসিয়াছিলেন।...তাই আমেরিকায় তোমার বেদান্তের ধ্বজা উঠিয়াছে, ইংলণ্ডে তোমার শাস্ত্রের মর্যাদা বাড়িয়াছে, তোমার সমাজের ছায়া অনুসরণ করিবার জন্য সেই ফিরিঙ্গি নরনারীগুলির কি প্রাণপণ অকিঞ্চন, তাহা জানো কি? কাহার কৃপায় ইহা হইয়াছে? তোমার গোলামখানার বিদ্যায় নহে। ঐ ব্রাহ্মণের কৃপায়।...এসো, জন্মোৎসবের দিনে হিন্দুর সেই ঐতিহাসিক পারম্পর্যকে অঙ্গীকার করি।...এই জন্মোৎসব-দিনে রামকৃষ্ণকে সেই পারম্পর্যের সূত্র ধরিয়া পর্যবেক্ষণ করো—ধন্য হও।"

বিবেকানন্দ, যিনি ব্রহ্মবান্ধবের বহু আক্রমণের লক্ষ্য, বিশেষতঃ আমেরিকায় কথিত যাঁর ধর্ম-বক্তব্যকে নস্যাৎ করবার আপ্রাণ চেষ্টা তিনি করেছেন—সেই বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে একক কীর্তির এই স্তম্ভিত বন্দনা :

"স্বামীজী কামিনীকাঞ্চন-বিরক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ব্যথার ব্যথী ছিলেন। অহঙ্কার-বিমূঢ় ফিরিঙ্গি-জাতি ভারতের জ্ঞান-বিদ্যা ধর্ম-কর্ম সভ্যতা-সমাজকে পদদলিত করিতেছে, জগতের নিকটে উহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া প্রদর্শন করিতেছে, উহার মূল উৎপাটন করিয়া পাশ্চাত্য স্থূল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে—আর ভারত-সন্তানেরা কোথায় ইহার প্রতিকার করিবে, না, আত্মবিস্মৃত হইয়া কাচমূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় করিতেছে। এইসব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যথাই তাঁহাকে সাগরপারে সুদূর ফিরিঙ্গিস্থানে লইয়া গিয়াছিল। ঐ মায়াবীদের দেশে গিয়া তিনি একাকী আর্য-জ্ঞানের বিজয়ভেরী বাজাইয়াছিলেন। কে এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—ইঁহার স্পর্ধা তো কম নয়—স্থূল বিজ্ঞানদৃপ্ত ফিরিঙ্গির কোটের ভিতর গিয়া সিংহনিনাদে ঘোষণা করিলেন—হিন্দুজাতি জগতের গুরু—একমাত্র হিন্দুর নিবৃত্তিময়ী সভ্যতাই জগৎকে শান্তি ও একতার পথে লইয়া যাইতে পারে। ঐ বিজয়ভেরীর রব—ঐ সিংহনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ফিরিঙ্গি-

স্থানের নরনারীরা চকিত স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে, আর্যজ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই—সকল বিজ্ঞান, সকল কর্মকৌশল বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব দ্বারায় উৎকর্ষ ও চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।"

বন্ধু বিবেকানন্দকে তিনি সময়ে বোঝেন নি, ফিরিয়ে দিয়েছেন, সেই বিবেকানন্দই অদৃশ্যে থেকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেন তারই স্বীকারোক্তিঃ

"স্বামীজী! আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি —বনভোজন করিয়াছি—গল্পগাছা করিয়াছি। তখন জানিতাম না যে, তোমার প্রাণে সিংহবল আছে, তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয় পর্বতভরা ব্যথা আছে। আজ আমিও আমার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি।......**এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি—অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি—তোমার সিংহবলের কথা ভাবি—তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি—অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্যালোক দিব্যশক্তি আসিয়া প্রাণ-মনকে ভরপুর করিয়া ফেলে।"** [স্থূলাক্ষর লেখক-নির্দেশে]

ব্রহ্মবান্ধবের মতে, "স্বামী বিবেকানন্দ স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।" কোন্ গভীর বেদনাময় প্রাণকে তিনি দেশ ও জাতির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, একটি ঘটনার সূত্রে ব্রহ্মবান্ধব তা অপূর্বভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

"আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলিকাতায় হেদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই চুপ করিয়া বসিয়া আছো কেন? এসো—কলিকাতা শহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব, তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো। বিবেকানন্দ কাতরস্বরে বলিল—ভবানী ভাই, আমি আর বাঁচিব না (তাহার তিরো-ভাবের ঠিক ছয়মাস পূর্বের কথা)—যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি—তাহারি জন্য ব্যস্ত আছি—আমার অবসর নাই। সেইদিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময়—ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা—দেশের জন্য ব্যথা। আর্যজ্ঞান, আর্যসভ্যতা বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে যাহা ইতর, যাহা অনার্য, তাহাই সূক্ষ্মবস্তুকে, আর্যতত্ত্বকে পরাভূত করিতেছে—আর তোমার সাড়া নাই, ব্যথা নাই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল। সেই সাড়া এত গভীর যে, উহাতে মার্কিন ও য়ুরোপের চৈতন্য হইয়াছিল। ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে? দেশের জন্য ব্যথা কি কখনো শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।"

বিবেকানন্দের প্রেরণা একদা কোন্ 'অলৌকিক' প্রভাব বিস্তার করেছিল ব্রহ্মবান্ধবের জীবনে, তার শিহরণকারী কাহিনী ব্রহ্মবান্ধবের মুখেই শেষবারের মতো শোনা যাকঃ

"দিন-কয়েকের জন্য আমি বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইস্টিশানে পা দিলাম, কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন এক-খানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে? কেন—তাঁহার তো অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকু তুমি কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা করো। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ায় ইস্টিশানে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন

আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে? যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাতে গিয়া উক্ষপার (Oxford) বা কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম। বড়-বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বেদান্তবিজ্ঞান শিক্ষা করিবে বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঐ অধ্যাপকেরা যে-সকল চিঠি আমায় লিখিয়াছেন, তাহা আমি ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঝিতে পারা যাইবে, বিলাতে বেদান্তের প্রভাব কিরূপ গভীর হইয়াছিল। আমি সামান্য লোক। **আমার দ্বারা যে এত বড় একটা কাজ হইয়া গেল, তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মতো। এ সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি। তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে?"**

[স্থূলাক্ষর লেখক-নির্দেশে]

॥ ৯ ॥

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের রূপান্তর এবং তাতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্ভাব্য ভূমিকার অপূর্ব কাহিনী আমরা দেখলাম। ব্রহ্মবান্ধবকে আমরা কেউই খ্রীস্টান মিশনারি চেহারায় ভাবতে অভ্যস্ত নই এবং সত্যই ওটা ছিল তাঁর পরদেহ-প্রবেশের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার পর্যায়। আবার আমরা মিশনারি বলতে যাঁদের বুঝি তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে প্রবেশ করব। হার্ভেস্ট ফিল্ড ১৮৯৬ সেপ্টেম্বর 'অস্থির ভারতবর্ষ' নামক সুদীর্ঘ রচনায় সমকালীন ভারতবর্ষের চঞ্চল অবস্থার কথা বলতে গিয়ে যথারীতি হিন্দুজীবনের গ্লানির নানা তথ্য উপস্থিত করেছিল এবং পরিবর্তিত অবস্থায় ভারতবর্ষে চিহ্নিত-মিশনারি-রূপে না এসে কেবল খ্রীস্টীয় ভাব ছড়াবার জন্য উদারনৈতিক দলের আসবার যে-সব কথা শোনা যাচ্ছিল—তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। শেষোক্ত ব্যাপারে নববিধানী মুখপত্র ইউনিটি অ্যান্ড দি মিনিস্টারের সমর্থক মন্তব্য উদ্ধৃতও করেছিল।৪৩

'অস্থির ভারতবর্ষের' পরিচয় :

"আমাদের সামনে স্তূপাকার হয়ে আছে গত কয়েক সপ্তাহের পত্র-পত্রিকা এবং তাদের

৪৩ দলছুট ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে মিনিস্টারের মন্তব্য :

"Time has come for false teachers like ferocious lions to roam about and devour whom they may. We can easily conceive what mischief these men are doing to the followers of a dispensationless natural theism, who have to fall back upon their own understanding as the standard of their faith."

আক্রমণটা স্পষ্টতঃই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজীদের উদ্দেশে, মিনিস্টারের মতে, যারা 'ডিসপেনসেশন ফ্রম গড্' পায়নি বলে হিন্দুয়ানির দিকে ক্রমেই ঝুঁকেছে, আর ঈশ্বর-ভক্ত মেষগুলিকে হিংস্র হীদেন-ব্যাঘ্রের রূপে চিবিয়ে খাচ্ছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ ইউনিটারিয়ান খ্রীস্টান-মহলে উদার-নৈতিকতার বাহুল্যের জন্য খ্রীস্ট ছাড়াই খ্রীস্টভাব প্রচারের প্রস্তাব সম্বন্ধে একই পত্রিকার আতঙ্ক :

"The crying need of India was the personal influence of Jesus Christ, the Son of God.... Our Minister [Keshub] has, many a time, openly said that there can be no salvation to India without the Bible.... If it is a fact that there has been a tendency to belittle Christ and a proposal has been made 'to come to India without the name of Christ,' we say there is no need of such a mission to India. A missionary who would preach Christianity without Christ would do immense harm rather than any good to our people."

[Quoted in 'Restless India'; *Harvest Field*; Sep., 1896]

কর্তিত অংশ। সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে একটি সংবাদ—ভারতবর্ষ তার নৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে অস্থির, অসন্তুষ্ট, এবং অস্বস্তিতে পূর্ণ। কেউ-কেউ আছেন যাঁরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত—ঈশ্বরের সর্বোচ্চ প্রকাশ ভারতবর্ষে ঘটে গেছে, এখন অন্য জাতির ও ধর্মের লোকগুলি সত্য সন্ধানে বাগ্-বিতণ্ডা করে মরুক। কেউ-কেউ আবার লাফিয়ে উল্টো-প্রান্তে গিয়ে বলে—ভারতবর্ষে ভালো বলতে কিছু নেই, সবকিছুই নৈরাশ্যজনকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। একদল তথাকথিত সংস্কারক বর্তমান সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট; তবে তাঁরা বিশ্বাস করেন, ভারতবর্ষ তার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথার্থই সচেতন হয়ে উঠেছে এবং তাঁরা তাঁদের বাণী পৃথিবীতে ছড়াচ্ছেন—'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে।"

'অস্থির ভারতের' আরও পরিচয় ঃ

"বর্তমান হিন্দুসমাজে যার যা দেখতে পাবার ইচ্ছা সে তাই দেখতে পাবে। রক্ষণশীলেরা পুরাতন ঘৃণ্য গোঁড়ামিকে পাবে, যা সর্বপ্রকার নূতনকে অবজ্ঞা করে; সংস্কারকেরা নতুন ভাব ও আচারের ক্রমবিস্তার দেখে অদূরবর্তী মহান ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পূর্বঘোষণা করবে; সিনিকরা দেখবে, রাশিকৃত লোক নানাপ্রকার মত নিয়ে চেঁচামেচি করছে কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য নিজের জন্য কিছু গুছিয়ে নেওয়া; নৈরাশ্যবাদীরা দেখবে. যা-কিছু স্থায়ী তার ক্ষয়, যা-কিছু মহৎ তার পতন, সেইসঙ্গে ভাল-কিছু আসার সম্ভাবনা শূন্য; আর খ্রীস্টানরা দেখবে, বর্তমানের এই আপাত নৈরাশ্যজনক বিশৃঙ্খলা আসলে যে-সব শক্তিগুলি কাজ করছে তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া—এবং যীশুখ্রীস্ট ভারতে তাঁর ন্যায্য স্থান গ্রহণ করবেন—এ হল সেই সমুজ্জ্বল পরিষ্কৃত দিনকে আবাহন করার প্রস্তুতিপর্ব।"

ভারতবর্ষের বর্তমান অস্থিরতার জন্য দায়ী ব্যক্তিটির এবং তাঁর সমর্থকদের কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ ছিল এর পর। আমি অল্পমাত্র তুলছি ঃ

"বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দ জনচক্ষে কি স্ফীত আকার নিয়ে উপস্থিত, তা দেখতে চিত্তাকর্ষক। এই হিন্দুর কীর্তিকে বিকটভাবে ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে, যদিচ এঁকেই উল্টো-পক্ষে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ অঙ্কে গ্রহণ করবে না, যদি-না তিনি আমেরিকা ও ইউরোপ-গমনের পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা মুছে ফেলেন। তাঁর কীর্তি সম্বন্ধে একটি কাগজ লিখেছেঃ 'স্বামী বিবেকানন্দ প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে লণ্ডনে প্রচার করছেন। বিরাট-বিরাট বিশপ ও পাদরিরা, বিশেষতঃ লণ্ডনের অধিকাংশ প্রভাবশালী ধনী নাগরিক নিজেদের বিশ্বাস ত্যাগ করে তাঁর অনুগামী হয়ে পড়েছে। এখন খ্রীস্টানেরা তাঁদের এই ধর্মশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজ গৃহ রক্ষা করবার চেষ্টা করলেই ভাল করবেন।' আর একটি কাগজ ঘোষণা করেছে ঃ 'আমেরিকায় স্বামীজীর প্রচারের ফলে চার হাজার আমেরিকান হিন্দু হবার জন্য ব্যগ্র।' ব্যাপারটার জন্য হিন্দুরা অবশ্য অভিনন্দন না জানালেই ভাল করবেন। কারণ এইসব আমেরিকানদের নিয়ে কি করা হবে? তাদের কি ভাই বলে গ্রহণ করা হবে? না, সেখানে তো জাতিপ্রথার নিষেধ। পুনার একটি দেশীয় পত্রিকা পথ খুঁজে বার করেছে—ওদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বর্ণের সৃষ্টি করা হবে! রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম বিদেশীকে নিজের গণ্ডীতে নিতে পারে না। তারা হিন্দুধর্ম নিতে পারে কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সামাজিক ভ্রাতৃ-সম্পর্ক নয়।...

"মাদ্রাজে সদ্য-প্রকাশিত নূতন পত্রিকা প্রবুদ্ধ ভারতের প্রেরণাদাতা স্পষ্টতঃই স্বামী বিবেকানন্দ। এই সাময়িকপত্রটি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে—বর্তমানে ভারতবর্ষে বলবৎ অস্থিরতা, মানসিক অস্পষ্টতা ও শূন্যতা, দেশপ্রেম, অনুভূতি ও রচনারীতির আতিশয্যকে এবং—ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টির জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ভারতেই আছে—এই মনোভাবকে।"

প্রবুদ্ধ ভারত সম্বন্ধে যে-সব প্রশস্তি শোনা গেছে তার কিছু উদ্ধৃত করে পত্রিকার

প্রারম্ভিক রচনাটির দীর্ঘ সমালোচনা অতঃপর করা হয়। কিন্তু অপরপক্ষে রেভাঃ স্লেটার প্রবুদ্ধ ভারত ও ব্রহ্মবাদিনের শক্তি ও উচ্চ আদর্শবাদের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন (হার্ভেস্ট ফিল্ড; ১৮৯৭ এপ্রিল)। লন্ডন মিশনের রিপোর্টেও বলা হয়, ব্রহ্মবাদিন সবচেয়ে শক্তিশালী নব্যহিন্দু পত্রিকা (ঐ—১৮৯৭ মার্চ)।

প্রচারশীল কলমধারী মিশনারিদের মধ্যে রেভাঃ স্লেটারই সবচেয়ে মার্জিত, একথা আগেও বলেছি। তিনি যুক্তির উপর নির্ভর করতে চাইতেন—সে দাবিও করতেন। তার বিপত্তিও যে হত না তা নয়, যেমন হয়েছিল ১৮৯৪, সেপ্টেম্বরে, মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজে তিনি যখন 'কয়েকজন সাম্প্রতিক হিন্দুধর্ম-প্রবক্তা' অর্থাৎ বিবেকানন্দ ও বেশান্তের মতের উপর আলোচনাকালে যুক্তি প্রয়োগ করে উভয়কে, বিশেষতঃ বেশান্তকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন, এবং প্রাণোত্তপ্ত সভায় অনুরূপ তপ্ত বক্তৃতার জন্য মাদ্রাজ টাইমস কাগজে অনুকূল বিবরণলাভও করেছিলেন (১৮৯৪, ১৪ সেপ্টেম্বর)—(হিন্দুতেও ১৪ সেপ্টেম্বর রিপোর্ট ছিল) কিন্তু একই কাগজ তিন দিন পরে 'সি-কে' নামক পত্রলেখকের একটি চিঠি ছেপেছিল যাতে নিষ্ঠুরভাবে বলা হয়, স্লেটারের যত-কিছু যুক্তিবোধ সব নিঃশেষিত হয়ে যায় হিন্দুধর্মের দোষ-উদ্ঘাটনে কিন্তু খ্রীস্টধর্মের অলৌকিকতা-প্রসঙ্গে কেবল অবশিষ্ট থাকে ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস।

স্লেটার বুদ্ধিমান ছিলেন। সুতরাং একেবারে চোখ বুঝে না থেকে বাস্তব সত্যকে কিছুটা স্বীকৃতি দিয়ে তারই মধ্যে নিজের পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করতেন। তাই তাঁর রচনায় হিন্দু-জাগরণের আংশিক স্বীকৃতি দেখা যায়; উল্টোদিকে তেমনি ধর্মমহাসভার কারণে মিশনারি-প্রচারের ক্ষতি হওয়ায় যেমন অনেক মিশনারি সেই শয়তানী কান্ডকে প্রতিদিন নরকে না পাঠিয়ে রুটিগ্রহণ না করবার ব্রত নিয়েছিলেন, স্লেটার তা করেন নি, বরং এধার-ওধার করে বলবার চেষ্টা করেছেন—শেষপর্যন্ত ধর্মমহাসভা থেকে খ্রীস্টধর্মের ভালই হয়েছে—যে-কথা তিনি বলেন মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ পত্রিকায় (১৮৯৪, অক্টোবর) ডাঃ বারোজের *The World's First Parliament of Religions* নামক দুই খণ্ডের পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে। ডাঃ বারোজ স্লেটারকে "বুদ্ধিমান হিন্দুদের কাছে খ্রীস্টধর্মকে এবং বুদ্ধিমান খ্রীস্টানদের কাছে হিন্দুধর্মকে ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে যোগ্য ভারতবাসী মিশনারি" মনে করতেন—সেই স্লেটারের *The Higher Hinduism in Relation to Christianity: Certain Aspects of Hindu Thought from the Christian Standpoint* নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্মের যথেষ্ট সহানুভূতিপূর্ণ নিন্দা ছিল এবং হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী দর্শনের আধুনিক প্রবক্তা বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ-কথাও সবিশেষ বলা হয়েছিল, কারণ এই দুই ব্যক্তি বিরাটসংখ্যক প্রভাবশালী গ্রাজুয়েটকে বশীভূত করে হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্রকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে প্রণোদিত করেছেন।[৪৪]

৪৪ স্লেটারের গ্রন্থটির সমালোচনা করেন জে এ ভেনস্ হার্ভেস্ট ফিল্ডে, অগস্ট, ১৯০২ সংখ্যায়। তার মধ্যে পাই ঃ

"Most missionaries will support Mr. Slater in his statement that whenever a Hindu begins to think seriously on higher things he does so on the lines of the Vedanta philosophy.... Most of us at one time or another have wrestled with the views of the Vedanta and have felt peculiarly helpless in attempting to follow them in their airy labyrinth."

বেদান্ত-সম্বন্ধে অনেক বই আছে কিন্তু আধুনিক জীবন ও দর্শনের সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখাবার মতো বই বিশেষ নেই। এক্ষেত্রে ভেনস্ বলেছেন, স্লেটারের বইটি সহায়ক হবে, এবং স্বয়ং স্লেটার যে ক্ষুদ্র বইটির প্রশংসা করেছেন, সেই ই টমসন-লিখিত *The Teaching of Vivekananda* বইটিও মূল্যবান। তারপর বিবেকানন্দ ও তাঁর অনুগামীদের কার্যকলাপ ও প্রভাবের স্বীকৃতি ঃ

রেভাঃ স্লেটার রেভাঃ ই ডবলিউ টমসন এম-এ লিখিত *The Teaching of Swami Vivekananda* বইটির বিষয়ে খুবই শ্রদ্ধার সংগে উল্লেখ করেছেন। এতখানি শ্রদ্ধার কারণ বোধহয় এই—স্লেটার যে-সব গালাগাল প্রাণখুলে বিবেকানন্দকে করতে পারছিলেন না, অথচ যেগুলি করতে না পারার জন্য তাঁর অস্বস্তির সীমা ছিল না—সে-বস্তু অনর্গল আনন্দে প্রবাহিত হয়েছে রেভাঃ টমসনের সুশিক্ষিত কলম থেকে। মিশনারিদের বিশেষ অনুরাগী ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার (১৮৯৮, ২৪ এপ্রিল) বইটিকে 'সময়োচিত সংগীত' মনে করেছিল, এবং বিবেকানন্দের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে যে-সব সুসভ্য উক্তি করেছিলেন যাজক-মহাশয় সে সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয় ভেবেছিল (কেননা বিবেকানন্দের জ্ঞানগরিমা সম্বন্ধে সরাসরি ধারণা এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ছিল), কিন্তু একথা না বলে পারেনি, রেভারেণ্ডের দাবির বিপক্ষে ঃ "খ্রীস্টধর্ম কোনো মননগত জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করতে পারে না—সুতরাং তার পরীক্ষা-পদ্ধতি কেন প্রয়োগ করছ বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত সম্পর্কে, যারা বহুজনের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করে? প্রত্যেক বুদ্ধিশীল মানুষই খ্রীস্টের শিক্ষার মধ্যে যে-সব মহান নৈতিক সত্য আছে, তাদের বরণ ও বন্দনা করে, খ্রীস্ট সেগুলো শিখিয়েছিলেন বলেই তা করে না—তা করে যেহেতু সেগুলো নৈতিক সত্য।"

হার্ভেস্ট ফিল্ড (১৮৯৮, জুন) কিন্তু এই বইয়ের সমালোচনা করতে পেরে বিশেষ খুশি হয়েছিল। নব্য হিন্দুধর্ম অদ্বৈতবাদী, আর খ্রীস্টধর্ম দ্বৈতবাদী—সুতরাং দ্বৈতবাদের পক্ষে টমসন অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করে খুবই উপকার করেছেন (অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দকে খণ্ড-খণ্ডকরণ বাড়তি লাভ)। সেজন্য 'ক্রীশ্চান পেট্রিয়ট' পত্রিকা-প্রকাশিত এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটি "ভারতীয় খ্রীস্টানদের পড়া উচিত—যাতে তারা বর্তমানে চালু, সত্যের ছদ্মবেশধারী দর্শনটির মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে বুঝতে পারে। শিক্ষিত হিন্দুদের পড়া উচিত—যাতে তারা জানতে পারে, তাদের স্পর্ধিত মতবাদ কোন্ শিথিল ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। আর মিশনারিদের পড়া উচিত—কারণ বইটির সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বেদান্তমতের মূল নীতিগুলির আলোচনা রয়েছে।" এই রকম একটা "স্বাস্থ্যকর বলবর্ধক" গ্রন্থ প্রকাশের জন্য মাদ্রাজের 'ক্রীশ্চান পেট্রিয়ট'-কর্তৃপক্ষ অভিনন্দিত হয়েছিলেন, এবং অবশ্যই নিন্দিত হয়েছিলেন সেই বকম্বাজ লোকটি, যে দার্শনিক নয় অথচ দার্শনিক কথাবার্তার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়ে এতসব লেখালেখিতে মিশনারিদের বাধ্য করেছে ঃ

"We need not say, that Swami Vivekananda is not a philosopher; he is a charlatan. He, however, can use glibly the terminology of the Vedanta and make it appear reasonable to those who do not think."
[*Harvest Field*; June, 1898]

রেভাঃ টমসনের ধারণা আরও মন্দ।—ও লোকটা কিস্‌সু নয়—কেবল অহংকারের ডাঁই, নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না, একেবারে রাস্তার বক্তা, দর্শন-বিজ্ঞান কিছু জানে না,

---

"A very important movement is taking place amongst English-speaking Hindus to harmonise the older Hinduism with the progressive scientific spirit of the present century. The *Brahmavadin*, a monthly periodical published in English in Madras, with much ability represents the views of these, and the late Swami Vivekananda and his master Ramakrishna Paramahansa have simply led captive a vast number of influential graduates and persuaded them that the ancient writings may legitimately be interpreted in terms of modern science. ....So it is that Mr. Slater wisely considers the actual condition of those who are his hearers and does not overlook the arguments of Swami Vivekananda whom he calls 'the latest exponent of Vedantism'."

কেবল ভাসা-ভাসা জ্ঞান, বাজারে চলতি ধারণাগুলো বলে যায়, ভুল ভাষায়, কোনো যুক্তি-শৃংখলার পরোয়া না করে, আর মস্ত ভড়ং—আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সেতুবন্ধন করছি। বুদ্ধুরাই এমন লোককে সিরিয়াসলি নেয়। বিবেকানন্দের উপরে ধারাবাহিক প্রবন্ধ ও পরে বই লিখেও রেভাঃ টমসন অবশ্য বুদ্ধু হয়ে যাননি, কারণ তিনি জানিয়েছেন, বিবেকানন্দ-নামক অগভীর ব্যাপারটাকে ধরে তিনি খ্রীস্টীয় এবং হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে সুগভীর কিছু কথা বলতে চেয়েছেন।৪৫

স্বামীজীর বিরুদ্ধে মিশনারিরা মোট কতগুলি পুস্তক-পুস্তিকা এইকালে প্রকাশ করেছেন, তার পুরো হিসাব আমাদের হাতে নেই। মার্ডকের বইগুলি বাদ দিলে, উপরের বইগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি বইয়ের সংবাদ আমরা পেয়েছি :

SWAMI VIVEKANANDA'S YOGA PHILOSOPHY [Sold by Mr. A. T. Scott, Tract Depot Madras].

VIVEKANANDA : ISIS UNVEILED ; by Veritasananda—Madras.

SWAMI VIVEKANANDA AS A RELIGIOUS GUIDE.

শেষোক্ত পুস্তিকাটিতে লেখকের নাম নেই। এর কিছু অংশ প্রগ্রেস পত্রিকার ১৮৯৬ নভেম্বর সংখ্যায় বেরিয়েছিল *Swami Vivekananda : The Rishi of "Awakened India"* নামে।

ঐ প্রবন্ধে বা পুস্তিকার গোড়ায় কয়েকজন ভারতীয়ের কৃতিত্বের উল্লেখ করা হয়—ক্রিকেটে রণজিৎ সিং, আই-সি-এস-পরীক্ষায় অতুল চ্যাটার্জি, বিজ্ঞানে জগদীশ বসু। তারপর :

"কেউ হয়ত ভাবতে পারেন—ঐ তিনজন যোগ্য ব্যক্তির নামের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নাম যোগ করা উচিত। একথা সত্য, চিকাগোর ধর্মমহাসভায় তিনি খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন, এবং ভারতীয় পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতাদির প্রায়শঃ বিবরণ থেকে মনে করা হয়েছে—তাঁর মতবাদ ইউরোপ আমেরিকায় প্রশংসা আকর্ষণ করেছে। মাঠে

৪৫ রেভারেন্ডের মনোরম বক্তব্য তাঁর মুখে না শুনলে আমাদের পুরো সুখ হবে না, কারণ ভালো গালাগালি অনুবাদ করা যায় না :

"The most of what the Swami has said in public is undeserving of criticism. It would be foolish to take him too seriously. It is as futile to attempt to piece together a consistent whole out of his utterances as to construct a rational theory of human society from the popular harangues of a street orator. There is a total absence of those traits which we look for in a scholar and philosopher, humility and readiness to admit ignorance or error, moderation and accuracy in the use of language, regard for consistency—all that is meant by intellectual conscience—these qualities will be found wanting in him. Of Western Science and Philosophy, he has acquired the merest smattering, a knowledge limited to the ideas that are now afloat in the air. His lectures abound in scraps from the Science of Comparative Religion without catching the scientific spirit of that study. We ought to be prepared to receive and honour a religious teacher, who is ignorant of all these things. But, when a man presumes to pass judgement in any and every department of human enquiry, when he assumes the magnificent role of an arbitrator between Eastern and Western thought, these defects are intolerable. The absence of moral restraint and discipline make Swami Vivekananda unsafe even as an exponent of purely Hindu thought." [From Preface to *The Teaching of Swami Vivekananda,* by The Rev. E W. Thompson, M.A.]

যখন বহুসংখ্যক গরু চরে তখন কিন্তু শব্দ শোনা যায় ফড়িংয়ের ফর্‌ফর্‌। পাশ্চাত্যের লক্ষ-লক্ষ খ্রীস্টানের মধ্যে সর্বদাই কিছু চেঁচানো অবিশ্বাসী, নাস্তিক, গুপ্ত রহস্যবাদী, সর্বদেববাদী ইত্যাদি রয়েছে।...ফারার যেমন বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক-রকম ধর্মদ্রোহিতা ও উৎকট ভ্রান্তির প্রচারক মেলে। প্রত্যেক রকম নাস্তিকতাই, যত উদ্ধত আর উন্মার্গগামীই সেগুলো হোক—মঞ্চে বা সংবাদপত্রে তার সমর্থনকারী পাওয়া যাবে। অতি বিকট ও ধিক্কৃত কুসংস্কারের অন্ধ ভক্তের অভাব হয় না।'"

এই ভূমিকার পরে বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনচিত্র দেওয়া হয়েছিল মিশনারি-রীতিতে, যার অনুরূপ আগে দিয়েছি বলে এখানে না দিলেও চলবে। তারপরে আমেরিকায় বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তার যে-সব কারণ নির্দেশ করা হয়েছিল, সেগুলি এই লেখক ভ্রাতৃভাবে না-বলে গ্রহণ করেছিলেন রেভাঃ হাডসনের রচনা থেকে—হাডসন-প্রসঙ্গে তার চেহারা আমরা দেখব। ইণ্ডিয়ান নেশনের অস্ত্রে বিবেকানন্দকে বধ করার রীতিও ইনি শিখেছিলেন রেভাঃ মার্ডকের কাছে, তাও মার্ডক-প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। পাপবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়কেও ইনি খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অধিক উত্তম খণ্ডনচেষ্টা আমরা ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছি। তবে পরিসমাপ্তির আর্তনাদটুকু বুকফাটা মৌলিকতায় পূর্ণ বলে সত্যই উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

"'প্রবুদ্ধ ভারত' যেন সরোষ ঘৃণায় সেই ধর্ম-শিক্ষককে প্রত্যাখ্যান করে যিনি বাঁধনছেড়া অহংকার ও অজ্ঞানে বলেন, ঈশ্বর জন্মেছেন কিছু ব্যাঙের ছাতা থেকে; মানুষ যে পাপী একথা যিনি অগ্রাহ্য করেন; যিনি দাবি করেন—তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যে গরীব চাষা কাতর হয়ে কেঁদে প্রার্থনা করে—'আমি বড় পাপী, হে ভগবান করুণা করো'—সেও ঐ স্বামীর থেকে অনেক বেশি খাঁটি ধর্ম জানে।"

॥ ১০ ॥

বিবেকানন্দের প্রতিবাদীরূপে একেবারে গোড়ার দিকে যে-সব মিশনারির নাম পাই, তাঁদের মধ্যে রেভাঃ পেণ্টিকস্ট আছেন। ধর্মমহাসভায় উপস্থিত এই মিশনারির উল্লেখ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করেছি। ভারতের সংবাদপত্রেও এঁর বিবেকানন্দ-বিরোধিতার খবর বেরিয়েছিল। এই ব্যক্তির মাথা বোধহয় মিশনারিদের তুলনাতেও উত্তপ্ত নচেৎ মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনকে (১৮৯৩, ডিসেম্বর) লিখতে হত না ঃ "প্রাচ্য-বিষয়ে ডাঃ পেণ্টিকস্ট প্রায়শঃই নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক নন।" ইনি যে সাবলীল আবোল-তাবোলের জন্য তখনকার ভারতীয় পাঠকদের কাছে পরিচিত ছিলেন, তা হিন্দু পেট্রিয়টের ১৮৯৪, ১৯ নভেম্বরের সম্পাদকীয় (*The Achievement of Christianity in India*) পড়লে দেখা যায়। ডাঃ পেণ্টিকস্ট বাঙালীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'মনুমেণ্টাল লায়ারস্‌।' না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নয়, ওকথা তিনি বলেছেন তাঁর পরিচিত জনৈক বিখ্যাত ইংরাজির অধ্যাপকের অভিজ্ঞতা থেকে ঋণ নিয়ে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় "অস্বাভাবিক কৌতূহলে চালিত হয়ে" উক্ত বিশিষ্ট ইংরেজ অধ্যাপকের পরিচয় আবিষ্কার করেছিলেন। উক্ত ইংরাজ মহোদয় বিশিষ্ট বাঙালী-বিদ্বেষী; তিনি গর্ব করতেন—যদিও প্রতি বৎসর শত-শত বাঙালী ছাত্র তাঁর পাদমূলে ইংরেজি শেখার জন্য উপবেশন করে, তবু তিনি তাদের আধ ডজনের নামও মনে রাখেন নি, এবং তিনি সযত্নে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের সম্ভাবনা দূরে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি দিবারাত্র মৃতের জগতে অর্থাৎ 'অতীতের মহাশক্তিধর মনগুলির' জগতে বাস করতেন—এবং কদাপি কোনো বাঙালীকে চোখ চেয়ে দেখেন নি—

তিনিই ডাঃ পেণ্টিকস্টের সাক্ষী!! তারপর হিন্দু পেট্রিয়ট—ভারতের বহু-কিছুর মধ্যে খ্রীস্ট-ধর্মের প্রভাব আছে—ডাঃ পেণ্টিকস্টের এই দাবিকে নাড়া দিয়ে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য-জ্ঞান এবং খ্রীস্টধর্ম যে এক বস্তু নয়—একথা পেণ্টিকস্টরা শিখবেন কবে?—হিন্দু পেট্রিয়ট প্রশ্ন করেছিল। বলেছিল যে, যে-সব হিন্দু তরুণ স্পেনসার ডারউইনের মতে মন ডুবিয়েছে, তারা হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনী ছাড়লে 'সিরিয়ান মিথ্'-কে প্রাণের প্রভু করবে না। "বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষা এবং সভ্যতা...মিশনারি-প্রয়াসের প্রধান শত্রু, যেমন দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ প্রধান মিত্র।" হিন্দু পেট্রিয়টের মতে : "আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের সাম্প্রতিক সাফল্য এই মিশনারির মনের ভারসাম্য বিশেষভাবে বিচলিত করে ফেলেছে। ভারতে মিশনারি-চেষ্টা নৈরাশ্যজনকভাবে নিষ্ফল হয়েছে...সেটাই যথেষ্ট মন্দ। কিন্তু তদুপরি যদি দেখা যায়—বস্তুতঃই একজন হিন্দু ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আমেরিকায় ঢুকে গিয়ে তাঁর প্রচার-অভিযান চালাচ্ছেন অপূর্ব ভঙ্গিতে এবং বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে—তখন সে-দৃশ্যটা খ্রীস্টান মিশনারিদের পক্ষে নিতান্তই অসহ্য দাঁড়ায়।৪৬

ডাঃ পেণ্টিকস্টের মনের ভারসাম্য যে সত্যই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তা দেখা যায় বিবেকা-নন্দের প্রতিবাদে তাঁর কথাবার্তার মধ্যে। মিশনারিরা ভারতে খ্রীস্টান-শাসনের গুণগান করতেন, স্বামীজী সেজন্য ঐ শাসনের কিছু দোষ দেখিয়েছিলেন। তাতে চটে গিয়ে ডাঃ পেণ্টিকস্ট যে-সব উদ্ভট কথা বলেন, সেগুলির উপর 'হিন্দু' বিরূপ মন্তব্য করে ১৮৯৪, ৯ জানুয়ারি (*Dr. Pentecost on Christianity and Other Religions*)—সেটি পুরো উৎকলন করে মাদ্রাজ মেল ১০ জানুয়ারি। হিন্দু পেট্রিয়টও সম্পাদকীয় লেখে ঐ বিষয়ে ১৫ জানুয়ারি। বিবেকানন্দের সমর্থন করে সে বলে :

"এদেশ সম্বন্ধে উপর-উপর ধারণা আছে এমন যে-কোনো ইউরোপীয় স্বীকার করবেন—খ্রীস্টানদের আগমন অনেক মন্দ জিনিস ভারতে ঢুকিয়েছে। তাদের তালিকা দেবার প্রয়োজন নেই—আর সে তালিকা তো অফুরন্ত। কিন্তু ডাঃ পেণ্টিকস্ট এই সংযত বক্তব্য স্বীকারেও অনিচ্ছুক। তিনি লিখেছেন: 'হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ পিতামাতার সন্তান হয়ে জন্মালেই, এবং ঐসকল ধর্মের আনুষ্ঠানিক রীতিতে অভিষিক্ত হলেই, যে-কেউ হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ হয়—তার জীবন বা চরিত্র যাই হোক না কেন? খ্রীস্টানধর্মের ক্ষেত্রে তা হয় না। কেউ মাতাল, মিথ্যাবাদী, চোর বা খুনে হলে একইসঙ্গে খ্রীস্টান হতে পারে না। সুতরাং প্রাচ্য-দেশীয়দের সমালোচনা ধরাশায়ী হয়ে গেল।' সত্যি নাকি ডাঃ পেণ্টিকস্ট? আমাদের তাহলে বুঝতে হবে—খ্রীস্টানদের মধ্যে কোনো মাতাল ইত্যাদি নেই? এ-রকম উদ্ভট কথা আমরা কদাপি মেনে নিতে পারি না। তবে স্পষ্টই মনে হয়, ডক্টর মহাশয় বলতে চেয়েছেন—যখন কোনো খ্রীস্টান খুনে বা মিথ্যাবাদী হয়, সে আর খ্রীস্টান থাকে না। সেকথা সত্যি হতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে খ্রীস্টান-দেশে খ্রীস্টান বাছতে নতুন সেন্সাসের দরকার হবে। কিন্তু মহদাশয় ডক্টর কি-করে জানলেন, প্রাচ্য ধর্মসমূহের ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি বলবৎ—হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ জঘন্য পাপকাজ করেও স্বধর্মে থাকে? মহদাশয় ডক্টর কি জানেন, হিন্দু-ধর্ম অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ অপকর্ম করলে চণ্ডাল বা ব্রাত্য হয়ে যায় এবং শূদ্রও সৎকর্মের দ্বারা

৪৬ অমৃতবাজার একই কথা বলেছিল ১৮৯৪, ১ সেপ্টেম্বর :

"As for the missionaries, they cannot look with equanimity on the unprecedented success of Vivekananda's mission in the West, for it threatens to strike a blow at the very root of the deception so long served their private purpose, and that so well. They have begun with renewed vigour to abuse the Hindus with the view to be restored to the position they have enjoyed so long. But we fear the spell is broken." [*Amrita Bazar* ; Sep. 1, 1894]

স্বিজত্ব লাভ করতে পারে? সুতরাং এ-ব্যাপারে খ্রীস্টধর্মের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে কেবল ডক্টরের অনবহিত, অনুদার কল্পনায়।"

যেসব ভারতে বাস-কারী পাশ্চাত্ত্য-মিশনারি স্বামীজীর আবির্ভাবের পরেই হৈ-চৈ শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রেভাঃ জে হাডসনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি হার্ভেস্ট ফিল্ড পত্রিকায় ১৮৯৪ অক্টোবর সংখ্যায় 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম দিয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, যার ঈষৎ সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশিত হয় কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় ৯ নভেম্বর। প্রবন্ধটি হার্ভেস্ট ফিল্ডের মতো মিশনারি-পত্রিকার যোগ্য কিন্তু স্টেটসম্যানের মতো তথাকথিত উদারনৈতিক ইংরেজি পত্রিকায় ঐ ধরনের রচনা?—যার মধ্যে স্বামীজীর মতবাদের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক প্রতিবাদের চেষ্টা থাকলেও আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বামীজীকে জনচক্ষে খেলো করা—এবং সেই উদ্দেশ্য মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনে (১৮৯৪, নভেম্বর) স্বীকারও করা হয়! ৪৭ স্টেটসম্যানের এইকালের সংখ্যাগুলি ওল্টালে দেখা যাবে, প্রচুর খ্রীস্টীয় গোঁড়ামির চর্চা সে করেছে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ-সংরক্ষণী চেষ্টার সঙ্গে, এবং বছরখানেক আগে অ্যালবার্ট ডার্ডটির লেখা বিবেকানন্দ-প্রশংসা অজান্তে ছেপে যে পাপ করেছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছিল হাডসনের লেখা ছেপে।

"স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এ" চিকাগো-ধর্মমহাসভার সকল প্রতিনিধির মধ্যে আমেরিকানদের মনে সবচেয়ে দাগ কেটেছেন, একথা স্বীকার করার পরে সেই দাগ কাটার কারণ রেভারেন্ড হাডসন বিশ্লেষণ করেছিলেন ঃ

"আমরা সত্যই আশা করতে পারি না যে, হিন্দুরা বুঝতে পারবে—বিবেকানন্দ যে-আগ্রহের সৃষ্টি করেছেন তার মূলে রয়েছে কৌতূহল (*curiosity*)। ইংলণ্ডে কয়েকটি পল্লী ছাড়া হিন্দুদের কদাচিৎ দেখা যায়; আমেরিকায় তারা প্রায় অজ্ঞাত। আমাদের মহীশূরের বন্ধু মিঃ হোল্ডসওয়ার্থ হ্যারোগেট থেকে সম্প্রতি লিখেছেন, কিভাবে রাজকুমারী অ্যালিক্স ও মিসেস হোল্ডস্ওয়ার্থের ভারতীয় আয়া সেখানে প্রধান কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্য একটি চিঠিতে লিখেছেন, এক বৃহৎ জনসভায় জনৈক পশ্চিম আফ্রিকাবাসীর বক্তৃতার পরে বক্তৃতা করতে গিয়ে তাঁকে কি-রকম প্রচণ্ড অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। কৃষ্ণবর্ণ কোনো মানুষ, সে হিন্দুই হোক বা নিগ্রোই হোক—যে-কোনো প্রাদেশিক শহরে বিরাট দর্শক আকর্ষণ করবে, বিশেষতঃ সে যদি জাতীয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে আসে।

৪৭ আমেরিকান পত্র-পত্রিকা থেকে বিবেকানন্দের অত্যুচ্চ প্রশস্তি ছেপে যাচ্ছিল হিন্দু পত্রিকা-গুলি, যার কী ফল হয়েছিল আমরা যথেষ্ট দেখেছি। অথচ আমেরিকান পত্রিকায় ঐসব মন্তব্য মুদ্রিত আকারে বেরিয়েছে—অস্বীকার করার উপায় নেই। তাহলে উপায়—ঐসকল সমাদরের এমন কারণ দেখাও, যা গোটা ব্যাপারটাকে তামাশার রূপ দেবে। উদ্ধৃতিসহ হাডসনের প্রবন্ধ-বক্তব্য উপস্থিত করার কালে ভূমিকারূপে মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিন লিখেছিল ঃ

"The flattering reception which some of the Indian delegates received at the Parliament of Religions cannot but have led many of their countrymen to form exaggerated conceptions to the nature and extent of the influence which they exerted. That this had actually been the cause in regard to Swami Vivekananda the demonstrations that have been held in his honour at various places testify. It was meet, therefore, that some one should call attention to some of the circumstances which actually determined the applause with which the the speeches of many of the Indian delegates were recieved; and we would commend to the attention of our readers the paper on Swami Vivekananda contributed by the Rev. J. Hudson to the October number of *Harvest Field*."

[*Madras Christian College Magazine*; Nov., 1894]

তদ্‌পরি কলকাতার এই বক্তা জানেন, কিভাবে সবচেয়ে নাড়া দেবার মত পোজ্ করতে হয়। ঢিলে-ঢালা আলখাল্লা-পরা হিন্দু-ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ—কোট প্যাণ্ট-পরা মিঃ এন এন দত্ত বি-এ অপেক্ষা অনেক আকর্ষক ব্যক্তিত্ব। তদ্‌পরি তিনি তাঁর ভদ্র ব্যবহার ও অনর্গল ইংরাজির দ্বারাও অনেক আমেরিকানের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন।"

অতঃপর রেভারেণ্ড হাডসন স্বামীজীর পেপার অন হিন্দুইজম্-এর বক্তব্যের খণ্ডনের জন্য বিস্তারিত চেষ্টা করেন। তার মধ্যে প্রথমতঃ অভিযোগ করা হল, স্বামীজী হিন্দুধর্মের সেরা অংশকেই খুলে দেখিয়েছেন, আর তা দেখাবার সময়ে খ্রীস্টধর্মের সুন্দর-কিছু শব্দের আশ্রয় নিয়েছেন। একই নিঃশ্বাসে তিনি বললেন, স্বামীজী পৌত্তলিকতার সমর্থন করে জঘন্য কাজ করেছেন। পাদরি-পদ্ধতিতে কালী গণেশ প্রভৃতি হিন্দু-দেবদেবীর কিছু ধোলাই-কার্য করে, হিন্দুসমাজের অন্যান্য কেচ্ছার সঙ্গে তিরুপতি মন্দিরের তহবিল তছরুপের কেলেঙ্কারীর কথাও বললেন এবং সবিশেষ রাগ করলেন খ্রীস্টীয় পাপবাদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর কথাবার্তায়। ঐ পাপবাদকে খ্রীস্টানদের কাছ থেকে ব্রাহ্মরা নিয়েছে, এইটুকুই আশার সোনালি আলো, তাও জানালেন। সবশেষে একটি অসাধারণ গবেষণা পেলাম —স্বামীজীর (আসলে রামকৃষ্ণের) সর্বজনীন ধর্মধারণার বিষয়ে। স্বামীজী বলেছেন, প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ধর্মে থেকেই মুক্তি পাবে, যদি যথার্থই সে তাকে অনুসরণ করে। হিন্দুকে খ্রীস্টান হতে হবে না, খ্রীস্টানকে হিন্দু হতে হবে না, ইত্যাদি। রেভারেণ্ড হাডসন এই প্রসঙ্গে লিখলেন ঃ

"এই মনোভাব খ্রীস্টীয় উদারতা নয়। গর্বিত আত্মস্বাতন্ত্র্য থেকে এর উদ্ভব—এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কিছু করুণাপূর্ণ ঘৃণা। আমাদের মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দ রক্ষণশীল হিন্দুধর্মকে এইভাবে উপস্থিত করলে ঠিক করতেন ঃ 'আমি তোমাদের তারিফের জন্য একটি মহান ধর্মদর্শনকে উপস্থিত করলাম। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ভেবো না, তোমরা একে বরণ করো, তা আমি চাই। বলতে সংকোচ হয় তবু পরিষ্কার বলাই ভাল, তোমাদের কোনো ঠাঁই আমাদের মধ্যে হবে না। তোমরা ভারতে এলেও আমাদের জাতি-বর্ণের মধ্যে তোমাদের নিতে পারব না। যদি কৌতূহলবশে তোমরা আমাদের মন্দিরে ঢুকে পড়ো, তাহলে মন্দির অপবিত্র করার বিরাট মূল্য তোমাদের দিতে হবে। আমাদের বাড়িতে তোমাদের অভ্যর্থনা জানানো হবে না, অবশ্য বারান্দায় বসতে পারো। মরে গেলেও তোমাদের সঙ্গে একাসনে বসে খেতে পারব না। গলা শুকিয়ে ছটফট করলেও তোমাদের স্পর্শ-দুষ্ট জল পান করতে পারব না। আমাদের কুয়ো থেকে তোমাদের জল তুলতে দেবো না। তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করতে প্রায় চাইব না, কারণ তাতে আবার স্নানশৌচের হাঙ্গামায় পড়ে যাব। আমাদের ধর্মের অমৃতপথে যাত্রাকালে তোমাদের সহযাত্রী হতে দেব না। কিন্তু তোমরা নিরাশ হয়ো না। আমি তো বলেছিই—ধর্মগুলি হল বিভিন্ন যাত্রাপথ। তোমাদের জন্য পথ আছে, যেমন আছে ভারতের নিম্নশ্রেণীর জন্য। আমাদের জন্য নির্মিত রাস্তা সম্পূর্ণ আমাদেরই; সেখান দিয়ে স্পেশাল এক্সপ্রেসে চড়ে আমরা ছুটব। কিন্তু কুছ্-পরোয়া নেই—জঙ্গলের মধ্যে আঁকাবাঁকা একটা পথের রেখা তোমরা পেয়ে যাবে। তাই বলে সেটা তৈরি পথ নয়, কোনো ব্রিজ তাতে নেই, তোমাদের নড়বড়ে ধীরে-চলা গোরুর গাড়ির বরাতে দুঃখ আছে। শেষে অবশ্য অবস্থা ভালো হবে, তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পেঁছিবে—তবে আমাদের থেকে মাত্র কয়েক হাজার বছর পরে।"

প্রতিভা—বিশুদ্ধ প্রতিভার সৃষ্টি রচনাটি। এর প্রতি অমৃতবাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৮৯৪, ১২ নভেম্বর। ইণ্ডিয়ান নেশন ১০ ডিসেম্বর লেখে ঃ

"জনৈক মিঃ হাডসন—ভ্রাতৃবৎ সহৃদয়তায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ—তিনি কিন্তু মহা রেগে গেছেন এই দেখে যে, স্বামী বিবেকানন্দ-নামক প্যাগানটি খ্রীস্টানদের একচেটিয়া অধিকারে হস্তক্ষেপ

করে চিকাগো মহাসভায় সমবেত ব্যক্তিগণকে 'ভ্রাতা' বলে সম্বোধন করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। স্বামীজী রেভারেন্ড মিঃ হাডসনের মর্মস্পর্শী ভাষণের অপেক্ষাও খ্রীস্টীয় ভ্রাতৃত্বতত্ত্বের অধিক বাস্তব পরিচয় ইদানীং আমেরিকায় পাচ্ছেন, এবং মনে হয়, সে-সম্বন্ধে পুরো জ্ঞান লাভ করে ফেলেছেন। মঞ্চের খ্রীস্টধর্ম এবং জনগণের আচরিত খ্রীস্টধর্ম যে সর্বদা এক বস্তু নয়, স্বামীজী তার প্রতি-পর্বের অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছেন।"

রেভাঃ হাডসনকে বাংলাদেশের কাগজগুলি বেশি মনোযোগ না দিলেও দক্ষিণভারতের প্রধান দেশীয় কাগজ হিন্দু সে-বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে নি। ১৮৯৪, ৭ ডিসেম্বর এবং ১০ ডিসেম্বর—এই দুই দিন দুটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয় এই কাগজে, যার মধ্যে হাডসনকে যথোচিত উত্তর দেওয়া হয়েছিল। ১০ ডিসেম্বরের রচনাটি দীর্ঘতর, লেখক এন নারায়ণ-স্বামী আয়ার—খুঁটিয়ে তত্ত্ববিচার করে রেভাঃ হাডসনকে বুঝিয়ে দেন—যে-মতবাদ বলে, পাঁচ কি ছয় হাজার বছর আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হয়েছিল—তার সমর্থকেরা যেন বৈজ্ঞানিক মনোভাবের আড়ম্বর না করে। নারায়ণস্বামীর রচনাটি ছিল গুরুভার কিন্তু ৭ ডিসেম্বর টি-কে নামক লেখক তত্ত্ববিচারের সঙ্গে প্রাণঘাতী ধারালো অস্ত্রও চালিয়েছেন। বিবেকানন্দ বা হিন্দুধর্মের বিষয়ে যেসব নিন্দাদি করেছেন হাডসন, সে-সম্বন্ধে এই লেখকের কোনো বক্তব্য নেই, কারণ ওগুলো স্বাভাবিক মিশনারিকৃত্য, কিন্তু স্বামীজীর তত্ত্বদৃষ্টিকে আক্রমণ করার যে-চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে তাকে প্রতিহত তো করেছেনই বরং দু'পা এগিয়ে গিয়ে প্রতিঘাত করেছেন। তিনি যেভাবে তা করেছেন, তার পূর্ণরূপ উপস্থিত করার প্রয়োজন নেই কিন্তু অন্যান্য কথার সঙ্গে এই কথাগুলিও ছিল ঃ

"[অনন্ত শক্তি ও বুদ্ধি-সমন্বিত] সাকার ভগবানকে কোনো-কোনো ভারতীয় সম্প্রদায় স্বীকার করে থাকে। কিন্তু তারা কখনো ধারণা করতে পারে না—কোনো ভগবান দুইয়ের সঙ্গে দুই জুড়ে পাঁচ করতে পারেন—তিনি শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে পারেন—তিনি বিচারবুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে পাপে-ডোবা মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন, যদিচ ঐ মানুষগুলি কোনো দোষই করেনি—তারপর তাদের কাছে দাবি করতে পারেন, তারা যেন বুদ্ধিবৃত্তি জঞ্জালি দিয়ে যে-পাপ তারা করেনি সেই পাপ থেকে মুক্তিপ্রার্থনা করে।"

"মিঃ হাডসন কিভাবে তাঁর সাকার ভগবান-সরকারের অতীত কার্যের নৈতিকতার সঙ্গে আদমের পতন ব্যাপারটাকে মেলান?—আদম একটা ফল খেয়ে পাপে ডুবেছিল, তার ফলে কোটি-কোটি মানুষ কোনো পাপ না করেও জন্ম থেকে পাপী? দুটি মতের কোনটি যুক্তিশীল মানুষকে তৃপ্ত করবে—যার একটি বলে, মানুষের বর্তমান জন্ম এবং পরিবেশ পূর্বজন্ম ও কর্মের দ্বারা নির্ধারিত, আর দ্বিতীয়টি বলে, যেহেতু আদম নিষেধ সত্ত্বেও একটি ফল খেয়েছিল তাই তারপর ভগবান যত মানুষ বানাবেন সবাইকে আত্মাসুদ্ধ পাপ-গ্রস্ত করে রাখবেন।"

মিঃ হাডসন হিন্দুর বহু দেববাদকে আক্রমণ করেছেন। আমি মিঃ হাডসনের ভগবানের এঞ্জেল, আর্ক-এঞ্জেল এবং পতিত এঞ্জেলদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃই এক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে পারি। বাইবেলে তাঁদের সংখ্যার তো শেষ নেই। তাঁরা এখন কী করছেন? পৃথিবী বা স্বর্গের কোনো অংশের শাসনকার্যে তাঁরা নিযুক্ত আছেন, কিংবা নিছক আলস্যে কাল কাটাচ্ছেন? সম্ভবতঃ তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় বার্তা নিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বরের দূত। কিন্তু গত ১৮০০ বছর, কি তারও বেশি সময়, ঐ কার্যে তাঁদের নিয়োগ করার কোনো খবর তো আমরা পাইনি?"

"মিশনারিগণ বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন—অপর ধর্মমতকে আক্রমণ করার সময়ে। কিন্তু খ্রীস্টধর্ম আলোচনার কালে তাঁরা বিজ্ঞানকে পিছনে ফেলে রাখেন।"

"মিঃ হাডসন বলেন, খ্রীস্টানকে তার খ্রীস্টীয় বিবেক জানিয়ে দেয়—সে জন্মে পাপী। কেন? যেহেতু খ্রীস্টান তার বিচারশক্তি প্রয়োগে সমর্থ নয়?"

"শঙ্কর যদি মিঃ হাডসনকে সন্তুষ্ট করতে না পারেন, দোষটা শঙ্করের নয়, মিঃ হাডসনের বুদ্ধিবৃত্তির।"

"মিঃ হাডসন বলেছেন, স্বামীজীর আমেরিকান শ্রোতারা স্বামীজীর বলা গল্পের একটা শব্দেও বিশ্বাস করবে না। হাঁ, নির্উগিনির বন্যেরা তোমাদের ফলিত গণিতের একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। যে-ব্যক্তি স্বামীজীর ব্যাখ্যাকে গল্পকথা মনে করবে, এবং মনে করবে যে, তা গভীরভাবে বিবেচনাযোগ্য নয়, সে ব্যক্তি ধর্ম-ব্যাপারে স্বামীজীর থেকে সেই পরিমাণ নীচে অবস্থান করবে, যেমন করে বর্তমান বস্তুবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের নীচে নির্উগিনির অধিবাসীরা।"

"স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকানদের ভারতের মন্দির বা জাতির মধ্যে প্রবেশের জন্য আহ্বান করেন নি—যে-কারণে খ্রীস্ট বা পল, জেণ্টাইলদের বলেন নি—ফ্যারিসীদের জাতিতে বা ইহুদী-পূজাস্থানে প্রবেশ করতে। ইহুদী-জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইহুদী-ধর্ম বৃহত্তর পৃথিবীর কাছে উপস্থিত করা যায়—সেজন্য গ্রাহকদের উপর ইহুদী-জাতির গোষ্ঠীগত বা জাতিগত রীতিনীতি চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। তাহলে স্বামী বিবেকানন্দকে সেই স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে না কেন? তিনি হয়ত আর্যজাতির কাছে যাবা জেণ্টাইল তাদের ক্ষেত্রে আর্যধর্মপ্রবর্তক হয়ে দাঁড়াবেন! আর এই ব্যাপারটিই অনেক ভারতীয় মিশনারির মাথা গুলিয়ে দিয়েছে।"

হিন্দুপক্ষের এই প্রতি-আক্রমণের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর হয়েছিল খ্রীস্টানপক্ষের আক্রমণ হাডসনের বিরুদ্ধে। খ্রীস্টান মানেই মিশনারি নয়—যেমন মিশনারি মানেই মিশনারি নয়। মাদ্রাজ টাইমসের খ্রীস্টান সম্পাদক ১৮৯৪, ২৬ নভেম্বরের মুখ্য সম্পাদকীয়তে (*The Swami Reviewed*) রেভারেণ্ড হাডসনকে নিয়ে পড়েছিলেন। গোড়াতেই ঠাট্টা-তামাশার একশেষ। বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা তাঁর পোষাকের জন্য—সুতরাং পোষাক-দর্শনের পৃষ্ঠা-গুলি উল্টে তিনি রেভারেণ্ডকে বাহবা দিয়ে বললেন—ঠিক তো! পোষাকই তো আসল! 'ভেবে দ্যাখো, উলঙ্গ প্রধানমন্ত্রী উলঙ্গ লর্ডসভার সামনে বক্তৃতা করছেন'—তোবা! তোবা! লম্বা জিভ কেটে, কল্পনার চোখে রুমাল চাপা দিয়ে সম্পাদক বললেন, হাঁ, নির্ঘাত, পোষাকই সব—তবে সে পোষাক সম্ভ্রান্ত হলে যত না টানবে, উদ্ভট হলে অনেক টানবে—যেমন হাডসনী মতে, বিবেকানন্দের পোষাক বিবেকানন্দকে দর্শকদের চোখের পর্দায় টেনে এনেছে।

মাদ্রাজ টাইমসের ছুরি এবার ক্রমেই রেভাঃ হাডসনের অঙ্গস্পর্শ করতে থাকেঃ "আমাদের আলোচ্য খ্রীস্টান ভদ্রলোক হলেন রেভারেণ্ড জে হাডসন, যাঁর বস্তুতঃ ধারণা হয়েছে—বিবেকানন্দ লোকটি অনেকক্ষণ ব্যাট করছেন, এবার বোল্ড করে দেওয়া দরকার। মিঃ হাডসনের ধারণামতো স্বামীজী হলেন সেই হাতুড়ে চিকিৎসক যিনি হাঁ-করা পৃথিবীর সামনে ধর্মের টোটকা নাড়াচেছন আর জনতা তাকে অবাক বিস্ময়ে গিলছে। স্বামীজীকে আমরা একদিক দিয়ে দেখেছি—মিঃ হাডসন অন্যদিক থেকে তাঁর ছবি বা ব্যঙ্গছবি তুলেছেন। অধিকাংশ লোকের ছবিরই দুটো দিক থাকে।" সুতরাং হাডসন নির্ঘাত সত্য কথাই বলেছেন—হাঁ, অপরিচিত পোষাকের জন্য বিবেকানন্দের সমাদর। কিন্তু মিঃ হাডসন আর একটি কথা বললেন না কেন—বিবেকানন্দের মতবাদ পোষাকের মতোই অপরিচিত ও বিচিত্র বলেই তার প্রতি এত আকর্ষণ? ধর্ম-বাতিক যাদের তারা সব সময়েই নতুন খোঁজে, রোমান ক্যাথলিক মত থেকে নতুন বলেই প্রোটেস্টাণ্ট মতের আদর, অ্যাংলিকান মতের দলছুটদের বিষয়েও তেমনি ঔৎসুক্য লোকজনের। "ধর্মের লোকেরা ধর্ম-ব্যাপারে অভিনবের আলোচনা করে সুখ পায়, যেমন পৃথিবীর সাধারণ লোকে নতুন অভিনয় বা নতুন কেচ্ছায় সর্বদাই আকৃষ্ট।" "যেমন হিন্দুধর্ম—তাকে ঘৃণা করতে আমাদের শিখিয়েছে মিশনারিরা; ড্রুইডিজমের মতোই সেটা বাতিল ব্যাপার জেনেছি; জেনেছি যে, বুড়িদের গাল-গল্পের মতোই তার দর্শন—অকস্মাৎ একি বিস্ময়—যাকে মৃতদেহ মনে করেছি সে শিহরিত যথার্থ জীবনস্পন্দনে!

সেখানে আশ্চর্য আলোক যেখানে মমি-গুহার অন্ধকার কল্পনা করেছি! তাহলে এইটাই হল ছবির অপরদিক—চিকাগোয় বিবেকানন্দকে যে-রূপে দেখলাম! মিঃ হাডসন সত্যই উদার —এক্ষেত্রে স্বামীজীকে তিনি ধাপ্পাবাজ বলেন নি!"

ব্যঙ্গকৌতুকও আর বজায় রাখাতে পারলেন না সম্পাদক। এবার খোলাখুলি আক্রমণ ঃ

"স্পষ্টতঃই রেভাঃ জে হাডসন বি-এ—স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম-ড্রাগনের বিরুদ্ধে সেণ্ট জর্জের ভূমিকা নেবার যোগ্য মানুষ নন। স্বামীজী অন্ততঃ কিছুটা দর্শন জানেন, এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে খ্রীস্টীয় ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রয়োগ করবার সময়ে যখন বস্তুর নিত্যতার পক্ষে বলেছেন, তখন নিজের জানা দার্শনিক কারণই দেখিয়েছেন। এই দর্শন তাঁর স্বকৃত নয়। বস্তুতঃ যে-প্রসঙ্গের আলোচনায় বহু শতাব্দী ধরে ক্লাসিক এশিয়া এবং ক্লাসিক ইউ-রোপের জ্ঞানী ঋষিগণ তাঁদের দার্শনিক মনীষার সুবিশাল শক্তিকে ব্যবহার করেছেন—সেখানে নতুন যুক্তি আমদানীর স্থান বিশেষ নেই। কিন্তু একালের কোনো শিল্পী যেমন আমাদের সেই চির-চেনা সূর্যকে—হাজার-হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত পর্বতের পিছনে যা অস্ত গেছে—নতুন বর্ণরাগে উপস্থিত করেন, তেমনি পুরাতন দর্শনকেও পাঠকের কাছে নতুন আলোকবর্ণে উপস্থিত করা সম্ভবপর। প্রাচীন যে-জিনিসকেই স্বামীজী স্পর্শ করেন, তার মধ্যেই নবজীবন দেবার শক্তি তাঁর আছে, এবং যাঁরা কঠোর পরিশ্রমে প্রাচীন ভাষার জঠরের মধ্যে বস্তুর নিত্যতার পক্ষে হীদেনীয় যুক্তির সন্ধান করতে সচেষ্ট—তাঁরা সানন্দে দেখবেন, গোটা ব্যাপারটাকে স্বামীজী শক্তিশালী ভাষায় সংক্ষেপে ধরে দিয়েছেন। স্বামীজী বলেছেনঃ 'বিজ্ঞান আমাদের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে, কসমিক্ শক্তির মোট পরিমাণ সর্ব-সময়ে একই থাকে। তাহলে যদি কোনো সময়ে কিছুই ছিল না এমন হয়—তখন কোথায় ছিল এই ব্যক্ত শক্তি? কেউ বলেন, তা ছিল, ঈশ্বরের মধ্যে অব্যক্ত আকারে। তাহলে ঈশ্বর কখনো অব্যক্ত কখনো ব্যক্ত, যার দ্বারা তিনি পরিবর্তনশীল, এবং যা-কিছু পরিবর্তনশীল তাই মিশ্র, তাই এমন পরিবর্তনের অধীন যাকে বলতে পারি বিনাশ—ফলে ঈশ্বর বিনষ্ট হন। [তা যদি না হয়] তাহলে বলতে হবে—এমন কোনো সময় নেই যখন সৃষ্টি নেই।' যুক্তিটা ন্যায়ের ফাঁকির মতো কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক চেহারা—সুতরাং বৈজ্ঞানিক উত্তর দাবি করতে পারে। একজন খ্রীস্টান তাই অত্যন্ত বিরক্তি ও ক্রোধের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন—মিঃ হাডসন ঐ যুক্তিটাকে এই ন্যাড়া বিবৃতিতে নস্যাৎ করেছেন—'যাঁরা সাকার ভগবানের অনন্ত শক্তি ও বুদ্ধিতে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে ঐ যুক্তির কোনো দামই নেই।' খ্রীস্টীয় দর্শন পৃথিবীর বিরোধিতার সামনে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ, সেজন্য ন্যাচারাল থিয়লজি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে মিঃ হাডসন খ্রীস্টীয় দর্শনের পক্ষসমর্থনে দাঁড়িয়ে তাকে যেভাবে ডুবিয়েছেন—সেটা তাঁর উচিতকার্য হয়নি। খ্রীস্টান-দর্শকের পক্ষে কী বেদনাদায়ক দৃশ্য—সেণ্ট জর্জ তাঁর অস্ত্রাদির ব্যবহারে এমনই অপটু যে, যখন ড্রাগন কামড় বসাল, তখন বিজয়ী মহাবীর তাঁর বল্লম জন্তুটির গলায় ঠেসে ঢুকিয়ে না দিয়ে লেজ দেখিয়ে সরে পড়লেন! হিন্দুধর্মকে বিদ্রূপ করার পুরনো চতুরতায় মিঃ হাডসন সুমহান। 'নাক টিপে, দম বন্ধ করে' সমাধিতে যাবার জন্য উপনিষদসমূহে যে-বিচিত্র বিধান দেওয়া আছে—'ঈশ্বরকে দেখা ও জানার' সেই পার্থিব পদ্ধতি এই সমালোচককে হাস্যরস সরবরাহ করেছে। হিন্দু দেবগণের সন্দেহজনক আচরণ, রথের উপর অশ্লীল বস্তু, মন্দিরের পুরো-হিতানীদের চরিত্র, তিরুপতির মোহন্তের লোভ—এসব জিনিসের উপরে যথারীতি বল্লম ঢোকানো হয়েছে, অবশেষে ব্রাহ্মণদের উপরে কোপ বসিয়ে আমাদের চাম্পিয়ান মিঃ হাডসন বিশ্রাম নিয়েছেন। কিন্তু বলতেই হবে—মিঃ হাডসনের ঐসব রচনাদি আর বর্তমানে চলছে না। আজকের তরুণ হিন্দুকে আমাদের খোকামণি হেনরি-সোনার বেয়ারাকে যেমন করা যেত, সেইভাবে ধর্মান্তরিত করা যাচ্ছে না। তরুণ হিন্দুরা জানে, তাদের মূর্তিগুলি

মাটিতে তৈরি, এবং পোড়ামাটির সেই জিনিসগুলোকে ভেঙে ফেলা যায়—তা জেনেও তারা আশ্চর্য হয় না। সুতরাং প্রবলতর আক্রমণের পদ্ধতি প্রয়োজন, খ্রীস্টধর্ম নিশ্চয় তা দিতে পারে—দুঃখের বিষয় মিঃ হাডসন তা দিতে পারেন নি।"

হাডসনের রচনা স্বামীজীর ভক্ত ও অনুরক্তদের কাছে পীড়াদায়ক ঠেকেছিল। জি জি নরসিমাচার্য ২৯ নভেম্বরের এক চিঠিতে স্বামীজীকে এই বিষয়ে লিখে পাঠান:

"আলাসিঙ্গা আপনাকে গত ডাকে ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনে জনৈক হাডসনের লেখা একটি রচনার আলোচনা পাঠিয়েছে। একই খ্রীস্ট-প্রচারক কলকাতার স্টেট্‌সম্যানে আর একটি পত্র নিক্ষেপ করেছেন, যার বক্তব্য, আমেরিকায় বিবেকানন্দের সমাদরের মূলে রয়েছে তাঁর ঝলমলে আলাখাল্লা ও কমলারঙের পাগড়ি।"

কলকাতা থেকেও নিশ্চয় স্বামীজীকে হাডসনী-চেষ্টার বিষয়ে অবহিত করা হয়। এই ধরনের খেঁকি আক্রমণকে তুচ্ছ করতে স্বামীজীর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ১৮৯৫-এর এক পত্রে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন: "হাডসন নামক কে কি বকিয়াছে, তাহাকে আমার জবাব দিবার কোনো আবশ্যক নাই। প্রথমতঃ অনাবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ তাহা হইলে আমি হাডসন প্রভৃতি ফেরুপুঞ্জের সমদেশবর্তী হইব। তুমি উন্মাদ না কি? আমি এখান হইতে কে এক হাডসনের সহিত লড়াই করিব? প্রভুর কৃপায় হাডসন-বাডসনের গুরুর গুরুরা আমার কথা ভক্তিভাবে গ্রহণ করে।৪৮ তুমি কি পাগল না কি? খবরের কাগজ প্রভৃতি আর পাঠাইও না। ও-সকল দেশে চলুক, হানি নাই। ও-সকল কাগজে নামের প্রয়োজন ছিল, প্রভুর কার্যের জন্য। যখন তাহা সমাধিত হইয়াছে, তখন আর আবশ্যক নাই।"

রেভাঃ হাডসন যা পারেন নি, রেভাঃ হোয়াইটহেডও তা পাবলেন না। কলকাতার অক্স-ফোর্ড মিশনে তিনি *Swami Vivekananda and Neo-Hinduism* নামে বক্তৃতা করেন, এবং একই নামে তার দীর্ঘ রিপোর্ট বেরোয় স্টেটসম্যানে ১৮৯৭, ৭ মার্চ।

সে বক্তৃতায় যে-সব তত্ত্বালোচনা করেন, তার মধ্যে ইতিমধ্যে আলোচিত হয়নি এমন কোনো বক্তব্য ছিল না। তবে সভার মধ্যে এবং শেষে অল্পবিস্তর গোলমাল হয়েছিল, যখন রেভারেন্ডের বক্তৃতার প্রতিবাদে কোনো হিন্দু ভদ্রলোক প্রতিবাদ-মুখে কিছু বলেন। 'ডবলিউ এস জি' নামক এক ব্যক্তি উক্ত হিন্দু ভদ্রলোককে ধিক্কার দিয়ে স্টেটসম্যানে একটি পত্র লেখেন (৭ মার্চ), কিন্তু রেভাঃ হোয়াইটহেড প্রেম-করুণামাখা ভাষায় অন্য এক পত্রে বলেন (৯ মার্চ)—না না, গোলমাল বেশি কিছু হয়নি—যেটুকু হয়েছে ওটা কিছুই নয়—আমি তো কম কঠিন ভাষায় বিবেকানন্দের বক্তব্যকে আক্রমণ করিনি।

মিরারে ১৮৯৭, ১৩ এপ্রিল এম-সি-সি নামক লেখক দীর্ঘ পত্রপ্রবন্ধে রেভাঃ হোয়াইট-হেডের প্রত্যেকটি তাত্ত্বিক বক্তব্যকে অসার বলে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

৪৮ স্বগোষ্ঠীতে রেভাঃ হাডসন কিন্তু কম ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি মারা যাবার পরে তাঁর সম্বন্ধে হার্ভেস্ট ফিল্ড ১৮৯৬ মে সংখ্যায় অন্যান্য কথার সঙ্গে জানায়—তিনি ঐ পত্রিকার একজন প্রাক্তন সম্পাদক এবং পত্রিকাটি তাঁর লেখনীর ও পরামর্শের সম্পদে ধনী। তাঁর রচনাগুণের প্রশংসা করে বলা হয়—"তার মধ্যে লোকদেখানো আড়ম্বর কিছু ছিল না, চোখ টানবার চেষ্টা নয়, পরন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ের সতর্ক বিবেচনা এবং পূর্ণ নিরপেক্ষতা-সহ সর্বাঙ্গীণ আলোচনা, যাতে সত্য নির্গত হতে পারে।"

বিবেকানন্দ হাডসনী নিরপেক্ষতার স্বাদ অবশ্যই পেয়েছিলেন!

॥ ১১ ॥

স্বামীজীর জীবনী বা রচনাবলীর পাঠকদের কাছে রেভারেন্ড আর এ হিউমের নাম কিছুটা পরিচিত। হিউমের কাছে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠি পত্রাবলীতে আছে। পত্রাবলীর অন্য দু'এক জায়গাতেও তাঁর উল্লেখ পাই। এই হিউম ডাঃ বারোজের বিশেষ বন্ধু। ধর্মমহাসভায় ইনি স্বামীজীর মতের বিরোধিতা করেছেন। তারপরে স্বামীজী যখন আমেরিকার নানা স্থানে মিশনারিদের ভারত-কুৎসার চেহারা খুলে ধরছিলেন, তখন হিউম স্বামীজীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে তাঁকে চিঠি লেখেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বামীজীকে প্রকাশ্য বিতর্কে টেনে নামানো। স্বামীজী যদি সেই ফাঁদে পা দিতেন, হিউমরা জানতেন, তাহলে তাঁর যৎপরোনাস্তি দুর্গতি ঘটাতে পারবেন। প্রকাশ্য বিতর্কে কখনো সত্য নির্ধারিত হয় না। সত্যকে বিকৃত করে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার এসব ক্ষেত্রে করা হয়, এবং যার গলার বা কলমের জোর বেশী, যার পক্ষে অর্থ, সামর্থ্য ও সংঘবদ্ধ সমর্থকদল রয়েছে, সেই জিতে যায়। এসব ব্যাপারে মিশনারিদের কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত। স্বামীজী তা ভালই জানতেন। কিন্তু তাও নয় ; স্বামীজী কখনো ঐ শ্রেণীর মানুষকে নিজ সমকক্ষ মনে করেননি—সুতরাং তাদের সঙ্গে প্রকাশ্য কথাকাটাকাটিতে তাঁর অভিরুচি ছিল না। স্বামীজীর চরিত্রে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করি—তিনি প্রকাশ্যে আত্মসমর্থন করতে চাইতেন না—তা সন্ন্যাসীর রীতি নয়। তাছাড়া নিজের জন্য লড়াই করতে তাঁর মর্যাদায় বাধত।

"ভারতের একটি খ্রীস্টান মিশনের ডিরেক্টর" রেভারেন্ড হিউম স্বামীজীকে "ভারতাগত আমার স্বদেশবাসী" সম্বোধন করে ১৮৯৪, ২১ মার্চ ডেট্রইট থেকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে ছিলঃ "১২ মার্চ, ১৮৯৪-এর ডেট্রইট ফ্রি প্রেস সদ্য আমার কাছে পাঠানো হয়েছে, তাতে ১১ মার্চে ডেট্রইট অপেরা হাউসে প্রদত্ত আপনার বক্তৃতার দীর্ঘ রিপোর্ট রয়েছে। ভারতে জন্মেছে ও জীবনের বড় অংশ সেখানে কাটিয়েছে, ব্যাপক ভ্রমণ করেছে এবং সকল স্থানের ভারতীয় চিন্তানেতাদের সঙ্গে এবং শত-শত মিশনারির কাজের সঙ্গে পরিচিত—এমন একজন মানুষ আমি—আপনার কথা বলে মুদ্রিত বহু বক্তব্যে বিস্মিত হয়েছি। সুতরাং আমি আপনাকে এই চিঠি লিখে প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে পাঠাচ্ছি ; এর উত্তরে আমি আশা করি, সুস্পষ্টভাবে আপনি রিপোর্টে প্রকাশিত বক্তব্য সংশোধন করবেন। কিন্তু যেহেতু আপনার কথা মুদ্রিত হয়েছে, তাই আমার ইচ্ছা, ভবিষ্যতে এই চিঠি মুদ্রিত হবে, এবং আপনি যদি চান আপনার উত্তরও তাই করা হবে।" [ডিসকভারিজ]

হিউমের এই পত্রের যে-উত্তর স্বামীজী দিলেন (২৯ মার্চ), তাতে হিউমকে সম্বোধন করলেন 'প্রিয় ভ্রাতা' বলে; সেইসঙ্গে হিউমের কয়েকটি বক্তব্যের সংশোধন করে বললেন ঃ কোনো ধর্মপ্রবর্তক বা ধর্মের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলেন নি কারণ সব ধর্মই তাঁর কাছে পবিত্র। দ্বিতীয়তঃ মিশনারিরা দেশীয় ভাষা জানেন না, একথাও তিনি বলেন নি, তবে বলেছেন যে, তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউই সংস্কৃত ভাষা শিখতে মন দেননি। মিশনারিরা নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুদের খ্রীস্টান করে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে, একথাও তিনি অগ্রাহ্য করেন। আর, দক্ষিণভারতের এই শ্রেণীর খ্রীস্টান অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক, যারা নিজেদের মধ্যে জাতিপ্রথা খুবই বজায় রেখে চলে, এবং হিন্দুরা উদারতা দেখালেই সেই ধর্মে ফিরে যাবে। শেষে স্বামীজী লেখেন ঃ

"আমাকে 'স্বদেশবাসী' বলে সম্বোধন করার জন্য পরিশেষে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কোনো বিদেশী ইউরোপীয়, তিনি ভারতে জন্মান বা না-জন্মান, মিশনারি হোন বা না-হোন—এই প্রথম একজন ঘৃণ্য নেটিভকে [প্রকাশ্যে] স্বদেশবাসী বলে ডাকতে সাহস করলেন। ভারতে গিয়েও কি আপনি আমাকে একই সম্বোধন

করতে পারবেন? আপনাদের ভারতে জাত মিশনারিদের ঐ কাজ করতে বলুন, আর ভারতে জন্মান নি এমন মিশনারিদের বলুন—তাঁরা যেন ভারতবাসীকে নিজেদের মতোই মানুষ বলে গণ্য করেন। বাকি বিষয় সম্বন্ধে বলি, যদি আমি মেনে নিই, চরকি-ঘোরা ভূপর্যটক বা গল্পলেখকদের বর্ণনা থেকে আমাদের সমাজ ও ধর্মের বিচার করা সম্ভব, তাহলে আপনিই আমাকে আহাম্মক ঠাওরাবেন।

"ভ্রাতৃবর! ক্ষমা করবেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি যদিচ ভারতে জন্মেছেন, তথাপি আমাদের ধর্ম বা সমাজ সম্বন্ধে কতটুকু জানেন? সে সমাজ এমনই রুদ্ধদ্বার যে, তা জানা আপনার পক্ষে অসম্ভব। সর্বোপরি সবাই তার জাতি এবং ধর্মের পূর্বলব্ধ মাপকাটিতেই অপরকে বিচার করে—তাই নয় কি? যাইহোক, আপনি আমাকে আপনার স্বদেশবাসী বলেছেন—ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে প্রেম ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক এখনো সম্ভব।"

স্বামীজী আর কোনো চিঠি হিউমকে লেখেন নি—তাই বলে হিউম লিখতে ছাড়েন নি। হিউম নিজের বক্তব্য-সহ স্বামীজীর চিঠি সংবাদপত্রে ছাপান—সেই সূত্র ধরে দীর্ঘ বিতর্ক চলেছিল। স্বামীজীকে তর্কে টেনে নামাতে না পেরে হিউমের মতোই অখুশি হয়েছিল তাঁর সমর্থক 'আউটলুক' কাগজ, যার কাছে স্বামীজীর উত্তর "এড়িয়ে-যাওয়া-গোছের।" হিউমের প্রশংসায় ঐ কাগজটি লিখেছিলঃ "হিন্দুসন্ন্যাসী এবার একজন সমর্থ ও সৌজন্য-পরায়ণ প্রতিপক্ষ পেয়েছেন—খ্রীস্টান মিশনারি রবার্ট এ হিউমের মধ্যে। মিঃ হিউমের পত্রগুলির চেয়ে নিশ্চিত সমাধানমূলক বক্তব্য আমরা অল্পই পেয়েছি।"

হিউমেব বক্তব্য যে, "নিশ্চিত সমাধানমূলক" ছিল না, তা মিসেস বার্ক আলোচনা করে দেখিয়েছেন। আমরা তার সঙ্গে যোগ করতে পারি, সমকালের অনেক দায়িত্বশীল ভারত-বাসী ইংরেজ হিউমের বক্তব্য স্বীকার করতেন না। মিশনারিরা ভারতকে খুবই ভালো করে জানেন, হিন্দুধর্মকে জানেন—এই দাবির বিরুদ্ধে দক্ষিণভারতের প্রধান সাহেবী সংবাদপত্র মাদ্রাজ মেলের এইকালীন একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছিঃ

"The great reason that the force of the missionary impact upon Hinduism is so small, comparatively, is because so few missionaries understand Hinduism. There has, in fact, been but one Abbe Dubois during the whole course of missionary history. As a distinguished and experienced South Indian missionary observes in *Work and Workers* for April, 'it is astonishing how few missionaries have really an intelligent grasp of what is included in the term Hinduism. It has not made upon them the impression that so great a system ought to have made. They do not understand its attractions, nor have they solemnly and concientiously looked at all it has to say against Christianity, and for its own superiority.' " [*Madras Mail*; May 2, 1894]

ইউরোপীয়রা যে ভারতবাসীকে চেনবার সুযোগ পায় না, সে-বিষয়ে মাদ্রাজ টাইমসের মন্তব্য ঃ

"It is but few Englishman, of course, who have any real opportunity of becoming really acquainted with 'the people.' They make their acquaintance, for the most part, in the large cities where European influences predominate. In the districts almost every European is an official, and before him no Indian ever discovers himself in his true colours. Thus the

races seldom meet on a level footing, and an Englishman may live his lifetime in India and return to England with the most utter and erroneous impressions concerning the people amongest whom he has been." [*Madras times*; Feb.17, 1897]

মিশনারিদের বাংলা-জ্ঞান (বা দেশীয় ভাষা-জ্ঞান) চিরকালই দেশীয়দের কাছে আমোদের বিষয়। 'ঈশ্বর মানবকে প্রেম করিয়াছিলেন'—ঈশ্বরের এই কান্ড ভক্তিরস অপেক্ষা হাস্যরসই বেশি সৃষ্টি করেছে। দেশীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে সুদীর্ঘ পরিচয়ের অভিমানে পূর্ণ, বাংলা ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিতে সদা তৎপর রেভাঃ ম্যাকডোনাল্ড ১৮৯৬ অক্টোবরে (যখন গঙ্গায় জর্ডন নদীর অনেক জল ঢালা হয়ে গেছে) "সংস্কৃত-বিদ্যা-বিবর্ধনী-বিদগ্ধ-জননী-সভা"-এর ইংরাজি অনুবাদ করেছেন :

"Sanskrit-Learning-Promoting-Burnt-Mother-Society." [*Indian Evangelical Review* : Oct. 1896]

মিশনারিদের দেশীয় ভাষাজ্ঞানের পক্ষে হিউমের দাবির প্রতিবাদেই যেন হার্ভেস্ট ফিল্ডে ১৮৯৬ এপ্রিল সংখ্যায় *The Probation of Missionaries* নামে সম্পাদকীয় মন্তব্য বেরোয়, যার মধ্যে এই ব্যাপারে জনৈক মিশনারির করুণ আবেদনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। উক্ত মিশনারি দুঃখ করে বলেছিলেন, দেশীয় ভাষা শেখার জন্য মিশনারিদের মোটেই সময় দেওয়া হয় না। নানা কাজে তাঁদের এতই ব্যস্ত থাকতে হয় যে, সাধারণের সঙ্গে তাঁরা মিশতে পারেন না, ফলে ইডিয়ম-জ্ঞান একেবারে হয় না—কেবল বহু কষ্টে কতকগুলি শব্দ মুখস্থ করে কাজ চালাতে হয়। কোনো একজন হয়ত কিছু দেশীয় ভাষা জানেন, তিনি বিদায় নিলে গোটা মিশন-সোসাইটি একেবারে অথৈ জলে পড়ে। দেশীয় ভাষা শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য তাই যেন যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দেওয়া হয়—উক্ত মিশনারি সবিশেষ আবেদন জানান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হিউমের কথাগুলি "নিশ্চিত সমাধানমূলক" ছিল না। আর তাঁকে যদি "সৌজন্যপরায়ণ," ব্যক্তি বলতে হয়, তাহলে সৌজন্যের অপর নাম কপটতা। হিউমের মুখোসের অন্তরালে কোন্ মুখ ছিল, তা স্বামীজী ১৮৯৪ অগস্টের এক চিঠিতে ধর্মপালকে খুলে দেখিয়ে দেন :

"এখানকার জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মিশনারি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করে একখানি পত্র লেখেন, তারপর তাড়াতাড়ি আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরটি ছাপিয়ে একটা হুজুগ করবার চেষ্টা করেন। তবে তুমি অবশ্য জানো, এখানকার লোকে এরূপ ভদ্রলোকদের কিরূপ ভেবে থাকে। আবার এই মিশনারিটিই গোপনে আমার কতকগুলি বন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁরা যাতে আমায় কোনো সাহায্য না করেন, সেই চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি তাঁদের কাছে নিছক ঘৃণাই পেয়েছেন। লোকটির ব্যবহারে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি। একজন ধর্মপ্রচারকের এমন কপট ব্যবহার?"

আমেরিকা থেকে ফিরে হিউম-সাহেব অতঃপর তাঁর 'পুরাতন প্রিয় মাতৃভূমিতে' কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করলেন। চিকাগোর ধর্মমহাসভা মিশনারি-প্রচেষ্টার যে-সব ক্ষয়-ক্ষতি করেছিল, বারোজের বন্ধু-হিসাবে তার মেরামত করা তিনি কর্তব্য বিবেচনা করলেন। প্রধান ক্ষয়কারী শক্তি বিবেকানন্দের ধ্বংসসাধনই তাই তাঁর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। তিনি অতঃপর ভারতের মিশনারি পত্র-পত্রিকায় ধর্মমহাসভা যে, আসলে খ্রীস্টধর্মের কত ভালো করেছে—সে-বিষয়ে লিখতে লাগলেন, সেইসঙ্গে অত্যধিক খ্যাতিপ্রাপ্ত প্রাচ্য-প্রতিনিধি, তাঁর 'ভ্রাতা বিবেকানন্দের সুনামরহস্যের' পটভূমিকা ব্যাখ্যা করে চললেন। হার্ভেস্ট ফিল্ডে ১৮৯৫ মে সংখ্যায় ধর্ম মহাসভা সম্পর্কে প্রবন্ধে উদারভাবে জানালেন, একথা ঠিক, সেখানে ভারতই সর্বাধিক দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছে। তার কারণও অকাতরে জানালেন : (১) সংস্কৃতচর্চার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে তুলনামূলক ধর্মালোচনা আরম্ভ হয়েছে—সেই সংস্কৃত হল ভারতীয় ধর্মের ভাষা; (২) ভারতেই মিশনারিদের সবচেয়ে বেশি কাজ; সেইজন্য তাদের মারফত ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের অনেক কথা পাশ্চাত্ত্যে ছড়িয়েছে; (৩) কোনো-কোনো ভারতীয় প্রতিনিধির আকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং সামর্থ্য। শেষোক্ত বিষয়ে হিউম জানালেন : 'সেরা লোকদের উপরে সেরা ইম্‌প্রেশন' মজুমদারই রেখেছেন, কারণ (১) তাঁর ভাষার সৌন্দর্য, (২) 'সত্য' বিষয়ে আধ্যাত্মিক ধারণা, (৩) মিশনারিদের কাছে অকুণ্ঠ ঋণস্বীকার। হিউমকে তারপর বিবেকানন্দের কথা বলতে হয়েছিলই। বিবেকানন্দ যে তোফা মজায় আছেন, খাদ্য পানীয়ে বাছবিচার নেই—হিউম ভারতীয় পাঠকদের সুবিধার্থে জানিয়েছিলেন। কিন্তু আহারাদির জন্যই তো বিবেকানন্দ আমেরিকায় 'সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ' করেন নি। তাই হিউমকে রহস্যটা ফাঁস করতে হয়েছিল :

"ধর্মমহাসভায় এবং পরে আমেরিকার অন্যত্র ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ—যদিও যে-শ্রেণীর মানুষ মজুমদারকে খাতির করেছেন কিংবা মিশনারি-কার্যকলাপে যাঁরা বিশ্বাস করেন, এঁর খাতির তাঁদের কাছ থেকে নয়। বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর আসল নাম—কলকাতার লোক। তাঁর বিষয়ে দ্রুত জাগ্রত আগ্রহের কারণ—অংশতঃ তাঁর দীর্ঘ রক্তবর্ণের আলখাল্লা, আলগা-বাঁধা উজ্জ্বল হলুদরঙের পাগড়ি; অংশতঃ তাঁর পরিকল্পিত চতুরতা; অংশতঃ শ্রোতাদের মেজাজ অনুযায়ী কথা বলবার অসাধারণ ক্ষমতা—বিশেষতঃ ধর্মীয় ভাষাপ্রয়োগের ক্ষমতা, যা উচ্চ খ্রীস্টীয় অভিজ্ঞতার ভাষার সমতুল। তাঁর প্রভাব ও তাঁর চরিত্রের রূপ বোঝা যাবে যদি আমি তাঁর বক্তব্য কিছুটা উপস্থিত করি। বাহ্যতঃ তিনি বৈদান্তিক। তাঁর বক্তব্যের ভাষা কখনো-কখনো অদ্বৈত দর্শনের গা ঘেঁষে গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ দর্শনের সঙ্গে তার মিল নেই।"

হিউম স্বামীজীর ধর্মীয় বক্তব্য অতঃপর এমনভাবে উদ্ধৃত করেন, যার দ্বারা খ্রীস্টান পাঠকেরা স্বামীজী সম্পর্কে বিদ্বেষ বোধ করতে পারে। তারপর মিশনারিদের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেবার জন্য জানিয়েছিলেন—বিবেকানন্দের মতে, মিশনারিরা দেশীয় ভাষা জানে না, জনগণকে চেনে না, দেশের ট্রাডিশনের বিষয়ে অজ্ঞ; ইত্যাদি।—

"মোদ্দা কথা, ধর্মমহাসভায় এবং আমেরিকার অন্যত্র লোকজন ভারতীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতা দেখে কিছুটা বিস্মিত। তাদের ইংরেজি ভাষার উত্তম ব্যবহার, হিন্দুধর্মকে খ্রীস্টধর্মের সমতুল করে উপস্থিত করার চেষ্টা, মিশনারিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের উদারতা, যা মজুমদার-প্রমুখ লোকেরা করেছেন, মিশনারিদের বিরুদ্ধে উগ্র নিন্দা, যা স্বামী বিবেকানন্দ, মিঃ গান্ধীর মতো লোকে করেছেন—এই সবের ফলে যারা ভারতের সঙ্গে পরিচিত নয়, তারা ভারতীয় ধর্মের আসল চেহারা সম্বন্ধে বিভ্রান্তি বোধ করেছে। সেইজন্য অপরদিকে মিশনারিদের বন্ধুরা অনুভব করছেন যে, ভারতে প্রচারকার্য সজোরে চালাতে হবে, এবং কেবল সর্বদিকে পটু লোককেই সেখানে পাঠাতে হবে।"

হিউমের এই লেখায় যদি কেউ প্রাণনিধি ফিরে পেয়ে থাকে, সে নববিধানের মুখপত্র ইউনিটি অ্যান্ড দি মিনিস্টার। হিউম বলেছেন, প্রতাপ মজুমদার সেরা লোকের উপর সেরা ইম্‌প্রেশন রেখেছেন—কী আনন্দ! হিউম বলেছেন—বিবেকানন্দ লোকটা খাদ্যে পানীয়ে বড় সুখে আছে—শোনো, শোনো তোমরা! কিন্তু হিউম লোকটা কে? কি তার চরিত্র? কি তার স্বার্থ? ভারতীয় প্রতিনিধির নিন্দা করে কেন?—না, ওসব জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই, যখন জিজ্ঞাসা না করলেই কার্যসিদ্ধি! মিনিস্টার এইকালে মিশনারিদের একেবারে কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি!

'প্রিয় স্বদেশবাসী' স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি রেভারেন্ড হিউমের পরম ভ্রাতৃভাবের কথা নিশ্চয় স্বামীজীর কাছে পৌঁছেছিল। ১৮৯৫, ৯ সেপ্টেম্বর তিনি আলাসিঙ্গাকে

লিখে পাঠালেন ঃ "আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি তোমরা মিশনারিদের বাজে কথায় এত গুরুত্ব আরোপ করেছ। আমি সবই খাই। যদি কলকাতার লোকেরা চায় যে, আমি খাঁটি হিন্দু-খাদ্য খেয়ে কাটাই, তাহলে তাদের বলো, তাঁরা যেন দয়া করে আমার জন্য একটি রাঁধুনী ও তাকে পুষবার মতো যথেষ্ট টাকা পাঠিয়ে দেন। এক কানাকড়ি সাহায্য করার মুরোদ নেই আবার গায়ে পড়ে এন্তার উপদেশ ঝাড়া—দেখে হাসি পায়।

"অপরদিকে মিশনারিরা যদি বলে, ব্রহ্মচর্য ও দারিদ্র্য (*Chastity and Poverty*) —সন্ন্যাসীর এই দুই মহান ব্রতকে আমি কখনো ভেঙেছি, তাহলে তাদের জানিয়ে দিও, তারা **তাহা মিথ্যাবাদী**। মিশনারি হিউমকে লিখে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ অসদাচরণ করতে তিনি আমাকে দেখেছেন? কিংবা বলবে, তাঁকে সংবাদ সরবরাহ করেছে এমন লোকদের নাম তিনি যেন দেন। যে-সংবাদ তিনি পেয়েছেন, তা স্বয়ং দেখা বা জানা সংবাদ কি না? এমন করলেই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে এবং সমস্ত ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে পড়বে। ডাঃ জেনস মিথ্যাবাদীদের ঐভাবে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।"

মিশনারিদের আক্রমণে যতখানি না, সেই আক্রমণে ভারতীয়দের কাপুরুষ ক্রন্দন ও সন্দিগ্ধ ঈর্ষা দেখে স্বামীজীর ঘৃণা এসে গিয়েছিল। ঐ একই পত্রে তিনি লিখেছেন ঃ

"আমার সম্বন্ধে এটুকু জেনে রেখো, কারো নির্দেশে চলবার পাত্র আমি নই। আমার জীবনের ব্রত আমি জানি; সংকীর্ণ দেশপ্রেম আমার নয়। আমি যেমন ভারতের তেমনি সমগ্র জগতের। এসব ক্ষেত্রে আজে-বাজে কথা চলবে না। আমি যথাসাধ্য তোমাদের সাহায্য করেছি, এখন তোমরা নিজেদের দেখো। আমার উপর কোন্ দেশের বিশেষ দাবি? আমি কি কোনো জাতির ক্রীতদাস নাকি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, আর বেশী বাজে বকো না।...

"বৎস, আমি অসাধাবণ প্রকৃতির লোক। এমন-কি তোমবাও আমাকে সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারোনি। নিজের কাজ করে যাও। যদি না পারো ক্ষ্যামা দাও। কিন্তু কদাপি আজে-বাজে ব্যাপার নিয়ে এসে আমার উপরে মুরুব্বিয়ানা করতে চেয়ো না। আমাব পিছনে যে-শক্তি দেখছি তা মানুষ, দেবতা বা শয়তানের চেয়ে অনেক বড়।...

"বাঙালীরা...যার জন্য তারা কিছু করেনি, বরং যে তাদের জন্য সবকিছু করেছে, তার উপরে হুকুম চালাতে চায়! জগৎ এমনই অকৃতজ্ঞ বটে! তোমরা কি বলতে চাও, আমি ঐসব জাতিভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়াহীন, কপট, ভণ্ড, নাস্তিক কাপুরুষদের একজন হয়ে বাঁচবার ও মববার জন্য জন্মেছি? শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেই ঐসব প্রাণীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"

বিবেকানন্দের খ্রীস্টান-ভ্রাতা রেভারেণ্ড হিউমের প্রসঙ্গ এখনকার মত স্থগিত রাখছি, পরে ডাঃ বারোজের ভারতে আগমন উপলক্ষে আবার তাঁর সাক্ষাৎ পাব।

লাণ্ড নামক জনৈক আমেরিকান পাদরির বিরোধী রচনা নিয়ে ভারতের মিশনারিরা হৈ-চৈ করেছিল, তা বুঝতে পারি স্বামীজীর ১৮৯৫, ৬ মে'র চিঠি থেকে। আলাসিঙ্গাকে স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "তুমি মিঃ লাণ্ডের বক্তৃতার উল্লেখ করেছ। তিনি কে বা কোথায় থাকেন আমি জানি না। হয়ত তিনি গির্জায় বক্তৃতা করে থাকেন। যদি বড় সভায় বক্তৃতা করতেন তাহলে তাঁর বিষয়ে আমরা শুনতে পেতাম। ঐসব বক্তৃতা হয়ত তিনি কোনো সংবাদপত্রে বার করতে পেরেছেন, তারপর সেগুলি ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর তার সাহায্যে মিশনারিরা ব্যবসা জমাবার চেষ্টায় আছে। তোমার চিঠি থেকে এই পর্যন্ত অনুমান করতে পারছি। ব্যাপারটা জনসাধারণের মধ্যে নাড়া দেবার মত কিছু হয়ে ওঠেনি যাতে আত্মসমর্থনের প্রয়োজন দেখা গেছে। তাহলে তো আমাকে এখানে প্রতিদিন ওদের শত-শত লোকের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ভারতের এখন এখানে খুবই ডম্-ডমা। ডাঃ বারোজ

ও অন্যান্য গোঁড়ারা মিলে সে আগুন নেভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয়তঃ গোঁড়াদের ভারত-বিষয়ে প্রতিটি বক্তৃতায় আমার বিরুদ্ধে রাশি-রাশি গালিগালাজ থাকা চাই-ই। গোঁড়া মেয়ে-পুরুষ মিলে আমার সম্বন্ধে যেসব নোংরা গল্প বানাচ্ছে, তার যদি কিছু শোনো তো অবাক হয়ে যাবে। এইসব স্বার্থপর মানুষের কাপুরুষোচিত পশুবৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে কি সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে ক্রমাগত আত্মসমর্থন করে যেতে হবে? আমার কিছু প্রভাবশালী বন্ধু আছেন, তাঁরাই মাঝে-মাঝে জবাব দিয়ে এদের থামিয়ে দেন। তাছাড়া হিন্দুরা যদি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে থাকে তাহলে হিন্দুধর্মের সমর্থনে শক্তির অপব্যয় করে মরি কেন? ত্রিশ কোটি লোক তোমরা, ওখানে বসে করছ কী—বিশেষতঃ যারা বিদ্যেবুদ্ধির বড়াই করো? লড়াইটা তোমরা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে প্রচার ও শিক্ষাদানের জন্য আমাকে ছেড়ে দাও না কেন? এখানে আমি দিনরাত অচেনা বিদেশীদের মধ্যে থেকে প্রাণপণ সংগ্রাম করছি, প্রথমতঃ নিজের অন্নের জন্য, দ্বিতীয়তঃ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করে ভারতীয় বন্ধুদের সাহায্য করবার জন্য। আর ভারত কী সাহায্য পাঠাচ্ছে বলো? ভারতবাসীর মতো দেশপ্রেম-হীন জাতি পৃথিবীতে আছে কি?"

একই পত্রে পুনশ্চ ঃ "যদি তোমরা তিরিশ কোটি লোক মিশনারিদের কাছে ভয়ে গুটিয়ে যাও, একটি কথা বলবার সাহস না রাখো, তাহলে হে কাপুরুষগণ! বলো, সুদূর দেশে একজন মানুষ কতখানি করতে পারে? তা সত্ত্বেও যতটুকু করেছি তার যোগ্য তোমরা নও।

"আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় স্বজাতি ও স্বধর্মের সমর্থনে লিখে পাঠাও না কেন? কে তোমাদের বেঁধে রেখেছে? দৈহিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক—সব দিক দিয়ে কাপুরুষের জাত তোমরা—তোমরা যেমন পশুর মতো, ব্যবহারও তেমনি পাচ্ছ। কেবল দুটো জিনিস তো তোমাদের নজরে—কাম আর অর্থ। তোমরা একজন সন্ন্যাসীকে খুঁচিয়ে দিনরাত লড়িয়ে নিতে চাও, কিন্তু তোমরা নিজেরা 'সাহেব লোকদের' ভয়ে কেঁচো—এমনকি মিশনারিদের ভয়েও! আর তোমরা করবে 'বড়-বড় কাজ! ফুঃ!...এইটি মনে রেখো, এ-পর্যন্ত যে-সব নরাধম হিন্দু এই পাশ্চাত্ত্যদেশে এসেছে তারা টাকা ও সম্মানের জন্য প্রায়ই নিজের দেশ ও ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছে। কিন্তু আমি নাম-যশের জন্য আসিনি।"

॥ ১২ ॥

ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মিশনারিবা সম্পূর্ণ ভরসা পাননি যতক্ষণ না তাঁদের প্রধান সেনাপতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি হলেন রেভারেণ্ড ডাঃ জন মার্ডক। পঞ্চাশ বছবেব উপর তিনি ভাবতে কাজ করেছেন—রচনা কবেছেন শতাধিক পুস্তিকা, যার বড় অংশ ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের কুৎসা-কথনে নিয়োজিত ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় দ্বিতীয় কোনো মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না যিনি ধর্মপ্রচারক নাম গ্রহণ করে পরধর্মের গ্লানি-কথনে অর্ধশতাব্দীকাল নিয়োজিত ছিলেন। অন্যের পাপচিন্তায় যদি স্বর্গবাস সম্ভব হয় তাহলে রেভারেণ্ড মার্ডক চিরস্বর্গবাসী এবং যদি নরকবাস ঘটে, তাহলে দীর্ঘ নরক তাঁর ভবিতব্য।

রেভারেণ্ড মার্ডক মিশনারিদের 'বন্ধু, দার্শনিক ও দিগ্‌দর্শক,'৪৯—এদেশের সমাজ-

৪৯ ডাঃ জন মার্ডক (১৮১৯-১৯০৪) গ্লাসগোয় জন্মান; সিংহলে সরকারী শিক্ষাবিভাগে অফিসার হয়ে আসেন, তারপর উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে, সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে ঐ কাজে লেগে যান; সাউথ ইণ্ডিয়া স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপন করেন; তারপর ১৮৫৮-তে ক্রীশ্চান

সংস্কারকদেরও তাই ৫০—তিনি অব্যাহত সুখে হিন্দুধর্মের উপরে নরকাগ্নির স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে গেছেন বহু বৎসর ধরে—এমন সময়ে, তাঁর জীবনের সমাসন্ন হীরক জয়ন্তীকালে, সহসা হিন্দু-উত্থান, অ্যানী বেশান্ত, স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার ও প্রভাব—ডাঃ মার্ডক স্থির করলেন, যাবার আগে শেষ অস্ত্র তিনি ছুঁড়ে যাবেন। শেষ পর্বের তিন খানি সেরা বাণ তিনি বিবেকানন্দকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়েছিলেন—তিনখানি পুস্তিকা—প্রথমটির নাম : *Swami Vivekananda on Hinduism* (1895) ; দ্বিতীয়টি : *Yoga Sastra: The Yoga Sastra of Patanjali Examined : With a Notice of Swami Vivekananda's Yoga Philosophy* (1897); তৃতীয়টি : *Swami Vivekananda and His Guru* (1898)। ডাঃ মার্ডক সব সময়েই পরিকল্পনার অধীন—এই তিনটি পুস্তিকাতেও সেই সুপরিকল্পিত সংহারবাসনা দেখা যায়। প্রথমটি রচিত হয় যখন স্বামীজী বাইরে আছেন। তখন তাঁর বিষয়ে নানা প্রশংসা এসে হাজির হচ্ছে ভারতে, তাঁর হিন্দুধর্ম বিষয়ে রচনার প্রশংসায় চারদিক ভরপুর, যার মধ্যে খ্রীস্টতত্ত্বকে মূলে নাড়া দেওয়া কিছু কথা আছে; তাই প্রথম বইটিতে আছে স্বামীজীর বৈদেশিক সমাদরের কারণ-বিশ্লেষণ, তাঁর 'হিন্দুধর্ম'-রচনার খণ্ডন এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের বস্ত্রহরণের বেইজ্জতি। তারপর ডাঃ মার্ডক দেখলেন—যতই হিন্দুধর্মের কুৎসা করুন—এদেশের যোগধর্ম নানাভাবে পাশ্চাত্ত্য-

লিটারেচর সোসাইটি স্থাপিত হলে তার সঙ্গে যুক্ত হন—পরবর্তী অর্ধশতাব্দী ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েই কাজ করে যান। মার্ডকের মৃত্যুর পরে রেভাঃ এইচ গিলফোর্ড তাঁর সম্বন্ধে ১৯০৪ সেপ্টেম্বরের হার্ভেস্ট ফিল্ডে লেখেন :

"The name of Dr. Murdoch is well known all over India and Ceylon. Perhaps no name is so familiar among missionaries, young Indians who read English, Social Reformers, and politicians ; but to most of these he was unknown save by his writings.... He spoke with no uncertain sound, and his words have done much towards the awakening of India. The movements—intellectual, social, religious—in India during the second half of the 19th century owes not a little to the readiness with which Dr. Murdoch had a pamphlet or a tract prepared for each passing phase of public opinion.... When one looks over the hundreds of books and pamphlets he published, one marvels at the range of subjects he dealt with.... He wrote not for scholars or specialists, but for the ordinary Indian who knows English." ['John Murdoch', by Rev. H. Gulliford ; *Harvest Field* ; Sep., 1904]

৫০ প্রার্থনা-সমাজের মুখপত্র সুবোধ পত্রিকা (১৯০৪, ২১ অগস্ট) ডাঃ মার্ডকের মৃত্যুতে একেবারে আত্মহারা হয়ে যা লিখেছিল, তা দেখিয়ে দেয়—সত্যই মার্ডক প্রার্থনা-সমাজীদের ভাব-পিতা। আমি কয়েক লাইন তুলছি :

"The East, especially India, is never worse for the work of the Christian missionary in it.... Sincerity is the soul of service ... When monuments of such soul-service....are taken away from our midst we are great sufferers and loosers indeed! The passing away of Dr. Murdoch in his good old age has left India the poorer.... Dr. Murdoch was no prophet or sooth sayer. He was no Dowie playing the clown before multitudes out of righteous vanity. To his credit be it said that he never sought fame by means of noisy nonsense. He was one of those silent workers for the good of humanity, whom the noisy world hears least.... Dr. Murdoch's rest—deep rest—has come to him after a long, whole and true-hearted service for the cause of India's progress. Long will it be before he ceases to live in our memory—one of a few 'Gems of purest ray serene' that the soil of India bears." [*Subodh Patrika* ; Aug. 21, 1904]

বাসীদের কাছে সমাদৃত হচ্ছে। সুতরাং তিনি উক্ত যোগশাস্ত্রকে খুলে ধরলেন দ্বিতীয় পুস্তিকায়। তারপর স্বামীজী যখন ভারতে এসেছেন, বিপুল সমাদর পাচ্ছেন, পাশ্চাত্যে তাঁর কর্মসাফল্যের নানা কথা লোকমুখে রোমাণ্টিক কাহিনীর মতো ছড়াচ্ছে, সেইসঙ্গে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণও শিষ্যপ্রভাবে এবং ম্যাক্সমুলারের রচনাকল্যাণে অবতার পর্যায়ে উঠে পড়ছেন—তখন তৃতীয় পুস্তিকায় রেভারেন্ড মার্ডক প্রমাণ করে দিলেন, পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ কোনো সাফল্যই পান নি,৫১ এবং তাঁর গুরু শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু জানেন না—বিবেকানন্দ গুরুর উপরে মিথ্যা গুণারোপ করছেন।

ডাঃ মার্ডকের গ্রন্থরচনার একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। তিনি সংবাদপত্রে ও অন্যত্র প্রকাশিত সংবাদ সংগ্রহ করে রাখতেন এবং যখনই প্রয়োজন হত ঐসব সংবাদকে ইচ্ছামত প্রসঙ্গ-বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করে একটি পুস্তিকা তৈরী করে ফেলতেন।৫২ এ-কাজ তিনি হিন্দুধর্মের গ্লানিপ্রচারেই বেশি করেছেন।

বিবেকানন্দ-নিধনে ডাঃ মার্ডককে অবতীর্ণ দেখে মিশনারিরা কতখানি আশ্বস্ত হয়েছিলেন, তা পুস্তিকাগুলি সম্বন্ধে মিশনারি-পত্রিকাগুলির উল্লসিত প্রশংসা থেকে বোঝা যায়। মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিন ১৮৯৮ জানুয়ারি "স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড হিজ্ গুরু" গ্রন্থের আলোচনায় লেখে : "যাঁরা ইউরোপ ও আমেরিকায় স্বামীজীর অবস্থান ও

৫১ মিশনারিদের মিথ্যার আবরণ মাঝে-মাঝে খসে পড়ত এবং কৌতুকের কথা, অজান্তে সেই আবরণ মোচনে হাত লাগাতেন দলভুক্ত লোকেরাই। মিশনারিরা সযত্নে শিখিয়েছেন, আমেরিকায় যে বেদান্তের প্রভাবের কথা শোনা যায়, ওটা অতিরঞ্জিত, ওর ঠাঁই একমাত্র কৌতূহলবিলাসীদের মনে। এমন সময়ে দেখা গেল, পরম উৎসাহী নারী-মিশনারি রমাবাঈ আমেরিকা ঘুরে এসে তেজে আগুন হয়ে জানালেন—ভারতের উদ্ধারের জন্য তিনি লাখখানেক নারী-মিশনারি কিছুদিনের মধ্যেই বানিয়ে ফেলবেন। হার্ভেস্ট ফিল্ড উক্ত পরিসংখ্যান নিয়ে মাতামাতি না করেও রমাবাঈয়ের অভিপ্রায়ের সাধুতায় বাহবা না দিয়ে পারল না, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধায় পড়ল—রমাবাঈ আমেরিকায় ক্ষতিকর ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের প্রভাবের কথা বলেছিলেন—সেটা কিভাবে মানা যায়? হোক-গে রমাবাঈ বেশ কিছুদিনের খ্রীস্টান, তাঁর সাহায্যের জন্য আমেরিকার শহরে-শহরে ভারতের কেচ্ছাকারী রমাবাঈ-সার্কল থাকুক-গে, তিনি সদ্য আমেরিকা ঘুরে, মিশনারিদের মধ্যে থেকে, সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেই বা কি—তিনি কিস্সু বোঝেন নি—হার্ভেস্ট ফিল্ড ১৮৯৭ অক্টোবর সংখ্যায় তাই জানাতে চেয়েছিল :

"She [Ramabai] has been disturbed by finding the philosophy, that in her view was cause of India's stagnation and women's degradation in particular, claiming adherents on the other side of the Atlantic. But no reasonable person who is familiar with the condition of Western life need be dismayed at such a fact. The study of the Vedanta in America, of which so much is spoken, is on an infinitesimal scale, and, those who read it, many are students of Comparative Religion, Christian pastors.... For the rest, it is few of the hysterical and the fickle-minded, the lovers of the strange and romantic, who make themselves ridiculous by the *Swami cult* of which Ramabai speaks.... It is inevitable that a new country like America with its strange assemblage of diverse nations should be a congenial soil for the *crank*, whether religious or otherwise."

[*Harvest Field*; Oct., 1897]

৫২ মার্ডকের গ্রন্থরচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার ১৯০১, ৩ ফেব্রুয়ারি লিখেছিল :

"Dr. Murdoch has a big kaledoscope of quotations. Turn it once and you have one pamphlet; turn it again and a second pamphlet is the result; turn it third time and yet another booklet it issued.... The indefatigable gentleman makes no secret of the principle on which he works, namely, to keep repeating."

সেখানে বেদান্তধর্মের অগ্রগতি সম্বন্ধে উজ্জ্বল বিবরণীতে বিশ্বাস করতে উৎসুক, তাঁরা ভারতের ক্রীশ্চান লিটারেচর সোসাইটি প্রকাশিত **স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরু** পুস্তিকাটি পড়লে ভাল করবেন।...হিন্দুধর্ম-প্রবক্তা হবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের উচ্চাভিলাষকে এই পুস্তিকাটি ফাঁস করে দিয়েছে, এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় নিজ সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর দাবিকে চূর্ণ করেছে।" আরও উৎসাহে এই পত্রিকা লিখেছিল : "তারপর এতে স্বামীর সন্ন্যাসী সাজবার মতলব নিয়ে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে—ঐ উপাধিতে তাঁর দাবি উদ্ভট। তাঁর বেদান্ত শিক্ষা দেবার অধিকার-প্রশ্নটিও পরীক্ষা করা হয়েছে—দেখা গেছে, তাঁর নিতান্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর সামর্থ্য।"

হার্ভেস্ট ফিল্ড (১৮৯৭ এপ্রিল) যোগশাস্ত্র বিষয়ে মার্ডকের পূর্বোক্ত গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলে—এই "ব্যাপক-প্রচলিত পদ্ধতির" "নিষ্ঠাবান প্রচারক বিবেকানন্দ।" "যোগের প্রবঞ্চনা ও ফাঁদ থেকে পরিত্রাণের পথ মার্ডক দেখিয়েছেন"—সেজন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র।

একই কাগজে **স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরু**-র আলোচনায় (১৮৯৮ ফেব্রুয়ারি) বিবেকানন্দকে ধিক্কার দিয়ে বলা হয় : "এমন কতকগুলি কথা আছে যা এমনই নিদারুণ মিথ্যা যে, সেগুলি খণ্ডন করাও কঠিন। ধরা যাক, যদি কোনো মানুষ বলে, সবুজ পনীর দিয়ে চাঁদ তৈরি হয়েছে, তাহলে ঐ উদ্ভট কথাকে অপ্রমাণ করতে গেলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের অনেকগুলি শব্দাড়ম্বরপূর্ণ উক্তি সম্বন্ধেও একই কথা সত্য। সেগুলিকে যদি শীতলভাবে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে আর একটিমাত্র উপায়ে তাদের ব্যবস্থা করতে হয়—একটি-একটি করে ধরে-ধরে সেগুলির উদ্ভটতা দেখিয়ে দেওয়া—আর তাই করা হয়েছে এই বইয়ে।"

হার্ভেস্ট ফিল্ড (১৮৯৫ জুলাই) **স্বামী বিবেকানন্দ অন হিন্দুইজম্** বইটির আলোচনার শুরুতে লিখেছিল : "সময়োচিত একটি প্রকাশ! যেন দ্রুত ব্যাপক প্রচার হয় এর!!"

আর হার্ভেস্ট ফিল্ড (১৮৯৭, এপ্রিল) ধন্যবাদ দিয়েছিল ভারতের ক্রীশ্চান লিটারেচর ট্রাকট্ সোসাইটিকে, যার প্রাণপুরুষ ডাঃ মার্ডক :

"ক্রীশ্চান লিটারেচর সোসাইটি ক্রমাগত ভারতের সমগ্র মিশনারি-সমাজকে ঋণী করে তুলছে।"

প্রশংসায় ভেঙে পড়েছিল বোম্বে গার্ডিয়ান—**স্বামী বিবেকানন্দ অন হিন্দুইজম্** পড়ে। ১৮৯৫, ১৮ মে পত্রিকাটি লেখে :

"আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে, সেইসঙ্গে ভারতবর্ষেও একটি বইয়ের ব্যাপক প্রচার হওয়া উচিত, যেটি মাদ্রাজের ক্রীশ্চান লিটারেচর সোসাইটি প্রকাশ করেছে—নাম, 'স্বামী বিবেকানন্দ অন হিন্দুইজম।' অগণ্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, সুনির্বাচিত উদ্ধৃতিসহ ডাঃ মার্ডক তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন—চিকাগো-ধর্মমহাসভায় বাঙালী স্বামীর বক্তৃতা কত অগভীর চরিত্রের। বিবেকানন্দের যুক্তিগুলি হিন্দুশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে। আর যে-ধর্মের লক্ষণ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছেন—'তা পূর্ণ হবার জন্য, দিব্য হবার জন্য, ঈশ্বরের কাছে উপনীত হবার জন্য, স্বয়ং ঈশ্বর হবার জন্য, নিরন্তর সংগ্রামরত'—সেই ধর্মের নামে কী পরিমাণ নিষ্ঠুরতা চলে, তাও তিনি সতর্ক প্রযত্নে দেখিয়ে দিয়েছেন। সে ধর্ম অবশ্য এখন খ্রীস্টধর্ম-দ্বারা ভেসে যাবার মুখে।"

বোম্বে গার্ডিয়ানের এই সুপারিশ মার্ডকের গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের অগ্রিম ধারণা করার সুযোগ করে দেয়। বদ্‌বুদ্ধির জন্য এই পত্রিকা সমকালে তথ্যাভিজ্ঞ-মহলে পরিচিত ছিল। হিন্দুধর্মের নিন্দায় এর উৎসাহের মাত্রাধিক্য আদালতের শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠত। ধর্ম-

মহাসভা-সূত্রে প্রকাশিত একটি রচনা—যেটি বাঙ্গালোরের 'লোন্ স্টার' পত্রিকা থেকে এতে উদ্ধৃত হয়—আদালতের বিচারে শাস্তি পেতে পারে বলে অনেকে মনে করেছিলেন।৫৩ লেখাটির নাম *What the Hindu Gentlemen at Chicago Did Not Say*। খুবই অল্প অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

"That infanticide, Thuggism, Sutee, child sacrifice, prostitution and other rites too horrible to mention either were or are still essential part of Hinduism.

"That in India holiness has nothing to do with character, that the holiest man is often the filthiest, vilest and most ignorant man in the district.

"That moral character form no part of Hindu orthodoxy.

"That the most immoral, profilgate Hindu is as good as his god or his Veda.

"That carnivals of vice are held under the auspices of Hinduism.

"That ecclesiastical prostitution is part of the system."

এহেন বোম্বে গার্ডিয়ান দ্বারা প্রশংসিত মার্ডকের গ্রন্থচরিত্র অনুমান করা কঠিন নয়। তবে এখানে একটি কথা বলে নেওয়া উচিত, হিন্দুধর্মের ডাক্তারী পরীক্ষা ডাক্তার মার্ডকই প্রথম করেন নি—ঐ লোকসেবার কাজ মিশনারিরা বহুদিন ধরে করে আসছেন।৫৪ ডাঃ মার্ডকের গৌরব—তিনি অগণ্য নর্দমার কথা-উপকথাকে সম্মিলিত করে কর্দমের মহাভারত রচনা করতে পেরেছেন বহু সর্গে।

৫৩ হিন্দু পেট্রিয়ট ১৮৯৪, ২৭ এপ্রিল বোম্বে গার্ডিয়ানেব চরিত্র সম্বন্ধে লেখে :

"বোম্বে গার্ডিয়ান খ্রীস্টান কাগজ—তার জীবনোদ্দেশ্য ভারতকে খ্রীস্টান করা। আমাদের সহযোগী স্পষ্টতঃই মনে করেন, ক্রিমিন্যাল কোর্টের কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরে ঐ লক্ষ্যে পেঁছানো যাবে। সেদিন জনৈক রেভারেণ্ড ভদ্রমহোদয়কে বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ২০১ টাকা ফাইন করেছেন বোম্বে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত তাঁর রচিত একটি মানহানিকর প্রবন্ধের জন্য—সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা এখনো ঝুলে আছে।" [অ]

হিন্দু পেট্রিয়ট এই লেখাতেই উপরে উল্লিখিত বোম্বে গার্ডিয়ানের রচনাটি কিছু অংশে উদ্ধৃত করে প্রশ্ন করেছিল :

"এই ধরনের রচনা হিন্দুধর্মকে খুন করবে কি খ্রীস্টধর্মের উপরে ধিক্কার টেনে আনবে, সে প্রশ্নের আলোচনা করতে ইচ্ছুক নই। তবে লেখককে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—অপর লোকের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করাকে তিনি যত নিরাপদ মনে করেছেন, সেটা তত নিরাপদ নয়।"

পেনাল কোডের কোন্ ধারায় এই ধরনের কুৎসা দণ্ডনীয় অপরাধ, তা জানাবার পরে হিন্দু পেট্রিয়ট লেখে, যার মধ্যে বৃটিশ ন্যায়বিচার সম্বন্ধে সুন্দর ইঙ্গিত ছিল :

"যদি কোনো হিন্দু-লেখক খ্রীস্টান লেখকটির মতো করে খ্রীস্টানধর্মের কেচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, অবিলম্বে তাঁকে অভিযুক্ত করে, দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে, গারদে পোরা হত।"

৫৪ অধ্যাপক স্বপন বসু আমার অনুরোধে পূর্ববর্তী মিশনারি কেচ্ছাসাহিত্য কিছু সংগ্রহ করে দিয়েছেন, তার অতি সামান্য অংশ পাঠকদের উপহার দিচ্ছি :

"I have found no traces of God's immaculate purity, or inflexible justice, in any part of the Hindoo writings, nor amongst the great number of intelligent Hindoos with whom I have conversed." [William Ward; 1811]

"If the vices of lying, deceit, dishonesty and impurity, can degrade a people, the Hindoos have sunk to the lowest depths of human depravity.... Lying is universally practised: The author has never known a Hindoo, who has not resorted to lying without hesitation, whenever he thought he could draw the

মার্ডকের *Swami Vivekananda on Hinduism* গ্রন্থের তিন ভাগ। প্রথম ভাগে বিবেকানন্দের পূর্বাপর পরিচয় ; দ্বিতীয় ভাগে তাঁর 'হিন্দুধর্ম' রচনার সম্পূর্ণ উৎকলন, তৃতীয়ভাগে তার সমালোচনা। স্বামীজীর পরিচয় এবং 'হিন্দুধর্ম' রচনার উদ্ধৃতি মিলিয়ে গ্রন্থের প্রায় এক-চতুর্থ অংশ গেছে। বাকি তিন-চতুর্থ অংশে 'হিন্দুধর্ম' রচনার আলোচনা ও সেইসূত্রে হিন্দুধর্মের ও তার দেবদেবীর অঢেল কুৎসা। সে কুৎসা পড়তে ভদ্র মানুষের সংকোচ হবে, কিন্তু মিশনারি-প্রচারের চেহারা দেখাতে তাকে কিছু অংশে হাজির করতে হবে, তবে লেখকের ভাষাতেই তাকে রাখব, কারণ ইংরেজি ভাষার আবরণটা এক্ষেত্রে থাকা ভাল, তাছাড়া মার্ডকের মতো সভ্য মানুষকে তাঁর নিজের ভাষায় কথা বলবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

হিন্দুধর্ম কি, তা নির্ণয় করবার জন্য পাদরি মার্ডক তুলনামূলক পদ্ধতি নিয়েছেন। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন—সত্যধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের পার্থক্য মানুষ ও বাঁদরের পার্থক্যের তুল্য ঃ

"In comparing two objects, their distinguishing feature is of most

least advantage from it." [*Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos*: William Ward, 1811]

"The Hindoos have no moral books. What branch of their mythology has not more of falsehood and vice in it, than of truth and virtue? They have no moral gods. They lift up their hands before an idol which is surrounded by the emblems of impurity and vice." [*Memoir of the Expediency of an Ecclesiastical Establishment for British India*: (2nd Ed. 1812): By Rev. Clauds Buchanan, D.D.]

"[Amongst the Hindus] Seduction and concubinage prevail to a most shocking degree, and unnatural crimes are too common.... As these people have no moral sense, it is not strange that the word conscience should not be found in their language." [*A Letter to the Right Honourable J. C. Villiers, On the Education and Improvement of the Natives of India*; (*Friend of India*; June, 1920) by William Ward]

"The deities which they worship are very personifications of vice, and that the dances, songs and other exhibitions at the public festivals are so impure, that like the overflowing of the Ganges, the whole country is inundated thereby, and at length becomes a vast mass of putridity and pestilence." [*Ibid.*]

"The Hindoo female, having no education, nor any sufficient employment in her youth, lives in a state of idleness with other girls, and becomes an early prey to vice... Unlawful intercourse of the sexes is so great, that I once heard a missionary, who have been nearly thirty years in India, declare, that he verily believed a chaste female was almost unknown among the Hindoos."

[*Ibid.*]

"Of all the systems of false religion ever fabricated by the perverse ingenuity of fallen man, Hinduism is surely the most stupendous." [*India and India Missions*; (1839) By Rev. Alexander Duff]

হিন্দুদের ভগবান কৃষ্ণের কেচ্ছায় খ্রীস্টান মিশনারিরা কত পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন, তা খ্রীস্টানদের ভগবানই বলতে পারবেন। আমি ১৮৩৮ অক্টোবর 'ধর্ম অবতার' থেকে কয়েক লাইন তুলছি ঃ

"হে প্রিয় পাঠকেরা, বিবেচনা করিয়া দেখ, যিনি এই প্রকার পরদার, বধ, চৌর্য্য, মত্ততা ও মিথ্যা বাক্যাদি অশেষ কুকর্ম করেন, তিনি কিরূপে ঈশ্বর হইতে পারেন? ও তাঁহার আরাধনা করিলে মানুষদিগের পরিত্রাণ বা কি প্রকারে হয়?.. শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিলে মানুষদিগের অন্তঃকরণ কখন পবিত্র হইবে না। কেননা যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরদার, বধ, চৌর্যাদি করিয়াছেন, তাহারাও তেমনি কেন না করিবে।"

importance. A man and monkey have both two eyes, two ears, a mouth etc ; but the characteristic of the former is that he possesses reason, enabling him to know about God and distinguish right from wrong. It may be asked what is the distinguishing feature of religion ? Dictionaries define it to be, 'The performance of our duties of love and obedience towards God.' Is Hinduism a religion *in this sense* ?...

"If religion means our *duty to God*, Hinduism is *not a religion*. It is a social organisation, whose essence is the observance of caste rules. ...Hinduism is only a *word*, including all the false religions of the world—a word which foreigners, in their ignorance, have used of India and its religions."

হিন্দুধর্মের জন্যই যে, হিন্দুরা অর্ধসভ্য ও মনুষ্যত্বহীন, লেখক সেকথা জানাচ্ছেন ঃ

"Religious intolerance is attented by many evils. Among the Hindus it has been a great obstacle to progress, and perpetuated a stationary condition of semi-civilisation. The people are like a flock of sheep all moving together.

"It has induced religious hypocrisy among the educated who have some glimmering of the truth, but who are unwilling to act up to their convictions of what is right. This is destructive of all nobleness of character."

হিন্দুর বৈদিক ঋষিরা শ্লোক বানিয়েছেন, যেমন কাঠুরে গাড়ি তৈরি করে ঃ

"Very numerous quotations are also given showing that the Rishis claim to have written the hymns themselves, just as a carpenter makes a car."

হিন্দুর প্রধান দেবতা কৃষ্ণ নিষ্ঠুর খুনে, কামুক ইত্যাদি ঃ

"The supposed Avatara of Krishna is fully described in Bhagavata and Vishnu Puranas. Love was certainly not a feature of his character. He murdered Kansa's washerman because he complained of the injury done to his master's clothes ; a great past of his life was spent in fighting ; he burnt up the city of Beneras and destroyed its inhabitants ; and one of the last acts of his life was to kill the survivors of his reputed 180,000 sons.

"In the Bhagabad Gita, Arjuna, his eyes full of tears, expresses his unwillingness to kill his own relations and teachers in battle, his preceptors and friends. Krishna's reply was, 'Cast off this base weakness of heart, and arise, O terror of foes.'

"With 8 queens and 16,100 wives, Krishna was rather an incarnation of lust than of God"

হিন্দুর অন্যান্য দেবতার বিষয়ে ঃ

"Take some of the most popular images of India and consider how they help a man to 'realise his divine nature.' "

"The most celebrated idol in India is that of Jaggarnath, 'The lord of the world,' at Puri...It is fully described as exceedingly ugly, the most hideous caricature of the human face divine."

কালী এবং গণেশের রূপচর্চা কোনো মিশনারি কদাপি বাদ দিতে পারেন না এবং মার্ডকের ব্যতিক্রম সাজবার ইচ্ছা ছিল না। স্বামীজী হিন্দুর বহু দেববাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেনঃ "সেই একই আলোক নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে আসছে। মানুষ যাতে নিজ মনোভাবমতো আরাধ্য বরণ করতে পারে, তাই এইসব পার্থক্য। কিন্তু কেন্দ্রে বিরাজিত সেই একই সত্য। ঈশ্বর তাঁর কৃষ্ণাবতারে বলেছেন, মণিগণের মধ্যে অনুস্যূত সূত্রের মতো সকল ধর্মের মধ্যেই আমি বর্তমান।" স্বামীজীর এই কথার উত্তরে মার্ডক লিখলেন, বিবেকানন্দ আলো ও অন্ধকারের তফাত জানেন না, সত্যের পবিত্র মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা নেই, নচেৎ কৃষ্ণ ও খ্রীস্টকে এক করেন?—

"It is asserted that the 'same God is the inspirer of all religions.' Then theism, polytheism, pantheism, and the most degrading fetish worship are all inspired by the same God! The contradictions between them are 'only *apparent*!' As well might it be said, that the contradictions between light and darkness, virtue and vice are 'only *apparent*.' The Swami has evidently no idea of the sanctity of truth. However, he expresses the general feeling of his countrymen, who complacently tell the missionary that Christianity and Hinduism, Christ and Krishna, are all the same. The same feeling is found in China. The word 'Joss' is used for God or religion. A Chinese will say to a European, 'your joss and my joss, both are good joss.'"

দীর্ঘ স্থান নিয়ে মার্ডক হিন্দুধর্মকে বিবস্ত্র করেছেন। সেইকালে হিন্দুধর্মের যেসব অশুভলক্ষণ দেখেছেন, সেগুলিকে নানা শিরোনামায় ভাগ করে উপস্থিত করেছেন। শিরোনামাগুলি এইঃ

Impurity; Cruelty; Injustice; Paltering with Truth; Religion and Morality are Divorced; The Eternal Distinction Between Virtue and Vice are Denied; Dishonouring Representations of God; The False Promises.

উপরিউক্ত লক্ষণগুলির দৃষ্টান্তরূপে মন্দিরগাত্রের মিথুন-ভাস্কর্য, চড়কে আত্মপীড়ন, সতীদাহ, সেবাদাসী, গঙ্গায় শিশুনিক্ষেপ, জগন্নাথের রথের তলায় আত্মবিসর্জন প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। শত-শত গ্রন্থে মিশনারিরা একই কাজ করেছেন।

এই সবকিছু করার পরে মার্ডকের সিদ্ধান্ত—হিন্দুধর্ম যতই আত্মশোধনের চেষ্টা করুক, তার সংস্কার সম্ভব নয়, কারণ একেশ্বরবাদ গ্রহণ না করলে ও-বস্তু ঘটতে পারে না। আর যদি একেশ্বরবাদ নেওয়া হয়, তাহলে? মিশনারি-সাহেবের উল্লসিত উত্তরঃ

1. The worship of Siva, Vishnu, Krishna, Rama, Ganesa, Durga etc. would cease.

2. The Vedas, Upanishads, Puranas etc. would no longer be regarded as sacred.

3. Caste would be rejected and the Brotherhood of man acknowledged.

Hinduism thus deprived of its characteristic features would no longer exist ; it would be an entirely different religion like the Brahmo Samaj.

এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করেন, একেশ্বরবাদ না দিলে রিফর্মেশন হয় না কেন, তার সোজা উত্তর—সেটা মার্ডক-সাহেব দিন বা না-দিন—নচেৎ খ্রীস্টধর্ম যে টেকে না, বা তার বিস্তার হয় না!

সুতরাং হিন্দুধর্মে হিন্দুর পরিত্রাণ নেই। তার ক্ষেত্রে সমাজসংস্কার বা ধর্মসংস্কার চলবে না—তার একেবারে ধর্মান্তর চাই। হিন্দুধর্মের রঙ, তার দেবদেবী কৃষ্ণ বা কালীর মতোই কয়লা-কালো, শতবার ধুলেও সে পাকা রঙ যাবে না। এখন, কোন্ ধর্ম সে নেবে? বলাবাহুল্য খ্রীস্টধর্ম, যার মিশনারি মার্ডক। কৃষ্ণ ও খ্রীস্টের চরিত্রের তুলনা করার পরে—যে তুলনায় খ্রীস্টের কাছে কৃষ্ণ স্বতঃই নাজেহাল হলেন—মার্ডক জানালেনঃ

"Let the great God who made the world and all things therein, in whom we live and move and have our being, alone be worshipped, instead of idols and imaginary deities stained with vice."

হিন্দুকে ধর্মান্তরিত হতে হবে, আগে হোক পরে হোক, অন্য পথ নেই—একথা খ্রীস্টধর্মের ইতিহাস ঘেঁটে মার্ডক জানালেন। অমন দুর্ধর্ষ রোমান সাম্রাজ্য খ্রীস্টধর্মের চাপে ভেঙে পড়ল, আর তুচ্ছ পরাধীন হিন্দুরা তা হবে না? "নিশ্চয় বিষ্ণু ও শিবের মন্দিরগুলি পরিত্যক্ত হবে, যেমন হয়েছে ইউরোপে জুপিটার ও মিনার্ভার মন্দির।" ডাঃ মার্ডক আশ্বাস দিয়েছিলেন, খ্রীস্টধর্ম নাও, দেখবে একমাত্র সেখানেই আছেন পরিত্রাতা। তোমরা চিন্তাশীল, তোমরা জানো সারাক্ষণ পাপের বোঝা বইছ। এই বোঝা বইতে-বইতে তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ো, তোমাদের সাহায্য দরকার। খ্রীস্টধর্মে সে সাহায্য মিলবে। তারপর যখন ভবের খেলা ফুরোবে, তখন হিন্দুধর্মে যেমন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে-কাঁপতে অনন্তের দিকে এগোতে হয়, এখানে তেমন নয়—পরিত্রাতা তোমাদের পাশেই থাকবেন অমরতার পরম প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মার্ডকের ঐ মনোভাব। ধর্মের নামে এত ঘৃণা ও গরল ওগ্‌রানো সম্ভব? সম্ভব বলেই বোধহয় হিন্দুরা পূর্বাহ্নে নীলকণ্ঠ শিবের ধারণা করে রেখেছে। এখন, পৃথিবীর একটি সুপ্রাচীন ধর্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে যাঁর ওহেন ধারণা, যিনি ভিন্ন-ধর্মীদের সমাজদেহের কতকগুলি গ্লানির উপরে চোখ তুলতে পারেন না—তিনি ভিন্ন ধর্মের এক নবীন আচার্য সম্বন্ধে কী মনোভাব পোষণ করবেন সহজেই অনুমেয়, বিশেষতঃ সেই মানুষটি যখন মার্ডক-সম্প্রদায়ের প্রিয়-পোষিত আকাঙ্ক্ষার পথে হিমালয়প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করেছিলেন! সেজন্য তিনি মিশনারিদের কাছে স্বতঃই শয়তানের এজেন্ট—হিরাম ম্যাক্সিমের সে-কথা আগেই জানিয়েছি। আর আমরা তো দেখেই এলাম—মার্ডকগণের কাছে হিন্দু দেবতারা শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার স্মরণ করাচ্ছি—মার্ডকদের কাছে স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রমাণের উপায় পরধর্ম ও পরধর্মীদের কেচ্ছা করা।

সুতরাং রেভারেন্ড ডাক্তার জন মার্ডক সহজেই সিদ্ধান্ত করতে পারেন—কিউরিয়সিটিই আমেরিকায় বিবেকানন্দের সংবর্ধনার মূলে। মার্ডকের মতো পণ্ডিত-ব্যক্তি কথাটা লঘু-ভাবে বলতে পারেন না। তাই কিউরিয়সিটির উপরে তাঁকে থীসিস রচনা করতে হয়েছে। তার মধ্যে দেখিয়েছেন—কৌতূহল মনুষ্যজাতির সাধারণ গুণ—তা বিশেষ গুণ আমেরিকান মনুষ্যের—তা সবিশেষ গুণ আমেরিকান নারী-মনুষ্যের। আমেরিকান কৌতূহলের সঙ্গে বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তার পরিণয়কর্ম মার্ডক-সাহেব এইভাবে করেছেন ঃ

"আমেরিকায় স্বামীর জনপ্রিয়তার অনেকগুলি কারণ স্বীকৃতঃ তাঁর সুখকর বক্তৃতা, তাঁর বাগ্মিতায় বাঙালী-অনর্গলতা, ইংরেজি ভাষায় অধিকার, কতকগুলি বিষয়ে বুদ্ধি-

মানের মতো তাঁর নীরবতা, কতকগুলি খ্রীস্টীয় মতকে হিন্দুমত বলে তাঁর দাবি করা ইত্যাদি। আসল কারণ অবশ্য কৌতূহল, যা আমেরিকানদের মধ্যে অফুরন্ত পরিমাণে রয়েছে, একথা বলা হয়।

"যে-কোনো মস্ত নতুন অদ্ভুত ব্যাপার মনোযোগ আকর্ষণ করে। সর্বাঙ্গে ছাপ-ছোপ-লাগা আদিম অধিবাসী, হাতে পাথরের টাঙ্গি নিয়ে যুদ্ধের নাচ শুরু করলে অমনি বিরাট ভিড় জমে যায়। এখন এই স্বামীই প্রথম ভারতীয় সন্ন্যাসীর পোষাক পরে আমেরিকায় হাজির হলেন। তাঁর আগমন সম্বন্ধে একটি আমেরিকান পত্রিকা লিখেছেঃ 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জমকালো কমলারঙের পাগড়ির ঐশ্বর্যসহ বস্টনে আসছেন।' আর একটি পত্রিকা লিখেছেঃ 'তাঁর সুসমন্বিত সুন্দর মস্তক, হয় কমলা না হয় লালরঙের পাগড়িতে সজ্জিত থাকে, এবং কোমরবন্ধনীতে বাঁধা তার আলখাল্লা হাঁটুর নীচে ঝুলে থাকে, যার রঙ পর্যায়-ক্রমে কখনো উজ্জ্বল কমলা, কখনো গাঢ় লাল।'

"স্বামী বেশ বিবেচনাবুদ্ধির সঙ্গে পোষাকের হেরফের করেন। ব্রুকলিনে তাঁর বক্তৃতার একটি রিপোর্টের মধ্যে পাইঃ 'বক্তৃতা করতে তিনি যখন উঠে দাঁড়ান, তখন তাঁকে চিত্রবৎ সুন্দর দেখায়। প্রাচ্য-পোষাকে তিনি সজ্জিত, কোমল রক্তবর্ণ কাপড়ের পোষাক, হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ঝুলে থাকে, আর লাল কোমরবন্ধনীতে বাঁধা তা। মাথায় শাদা সিল্কের পাগড়ি, যা তাঁর শ্যামবর্ণ পরিষ্কার ক্ষৌরিত মুখকে সুন্দর বৈচিত্র্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলে'।"

চিত্রবিচিত্র-করা নিউজিল্যান্ডের আদিম অধিবাসীর সঙ্গে পাগড়ি ও আলখাল্লা-পরা বিবেকানন্দের সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত করার পরে রেভারেন্ড মার্ডক কৌতূহল-বিলাসিনী আমেরি-কান মহিলাগণকে নিয়ে পড়লেনঃ

"তাঁর সর্বাধিক সমজদার হলেন মহিলারা। চিকাগো ডেইলি ইণ্টিরিয়র ওসান লিখেছেঃ 'বিরাট জনতা—অধিকাংশই মহিলা—অপরাহ্ণের অধিবেশন আরম্ভ হবার এক ঘণ্টা আগে থেকেই কলম্বাস-হলের সকল প্রবেশপথে ঠাসাঠাসি-ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে—কারণ ঘোষণা করা হয়েছে যে, জনপ্রিয় হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁকে ম্যাক্‌কলোর ওথেলোর মতো প্রায় দেখতে—বক্তৃতা করবেন। মহিলা—সর্বত্রই মহিলা—বিরাট সভাগৃহকে পূর্ণ করে আছে।' "

এই মহিলাদের অজ্ঞতায় ধর্মযাজক মার্ডক কৃপাবোধ না করে পারেন নি—ওরা নীলবর্ণ শৃগালকে বনের রাজা মনে করেছে!—

"এই মহিলার পাল হিন্দুধর্মের প্রায় কিছুই জানে না। তাদের মুখ্য আকর্ষণ পোষাকে—যা তাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি সুপরিচিত ভারতীয় গল্পও আছে। একবার একটা শেয়াল নীল-ভেজানো গামলায় পড়ে যায়। তারপর যখন সে বেরিয়ে আসে তখন তার অপূর্ব নীলদেহ। সে নিজেকে বনের রাজা বলে দাবি করল। সিংহ ও অন্যান্য জন্তুরা সে-দাবি মেনে নিল, যতক্ষণ-না তার আসল জাত ধরা পড়েছিল।"

মিশনারি-সভ্যতার অকাট্য নিদর্শন এই রচনা (বললেই চলবে না, এটা কেবল মার্ডকেরই কথা—মিশনারি-পত্রপত্রিকায় বইটির বিষয়ে সমাদরের বান ডেকেছিল)—ইণ্ডিয়ান মিরার ১৮৯৫, ২৮ জুন এর সম্বন্ধে মন্তব্য করেঃ

"...মিশনারি-মহোদয়ের পরবর্তী বিদ্রুপবাণের লক্ষ্য স্বামীজীর প্রাচ্য-পোষাক। এই পোষাকই, লেখকের মতে, আমেরিকায় এই মহান প্রচারকের সকল জনপ্রিয়তার মূলে, বিশেষতঃ মহিলাদের মধ্যে। স্বভাবসিদ্ধ শীলনতা ও সুরুচির পরিচয় দিয়ে লেখক ঐভাবে সজ্জিত স্বামীজীর সঙ্গে ভারতীয় কথাকাহিনীর শৃগালের তুলনা করেছেন, যে-শৃগাল নীল রঙ-ভর্তি গামলা থেকে বেরিয়ে তার ঝলমলে রঙের জন্য বনের পশুদের (আমেরিকার মহিলাগণ!) কাছ থেকে সম্মান দাবি করেছিল। ভারতের সাধারণ খ্রীস্টান-মিশনারির উচ্চ-

তর সংস্কৃতি ও মার্জিত আচারের এবং খ্রীস্টীয় বদান্যতার শ্রেষ্ঠতর আর কোন্ পরিচয় সম্ভব, যা ঐ মনোরম তুলনাটি থেকে আমরা পেয়েছি? ভরসা করি, আমেরিকার মহিলাগণ তাঁদের রুচি ও বুদ্ধির বিষয়ে প্রযুক্ত ঐ উচ্চ অভিনন্দনের খুবই তারিফ করবেন।"

যতই যা হোক, স্বামীজী যে আমেরিকায় সকল ভারতীয়ের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, তা ডাঃ মার্ডক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ইউনিটি অ্যান্ড দি মিনিস্টার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সর্বাধিক সাফল্য সম্বন্ধে যেসব উক্তি করে এসেছে, তা তাঁদের ধর্মবন্ধু মার্ডকের উক্তিতে খণ্ডিত হয়ে গেছেঃ

"দুজন বাঙালী ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন [না, থিয়জফিস্ট চক্রবর্তীও বাঙালী] —ঐ স্বামী এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। প্রথম ব্যক্তি জনতা টেনেছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেশবচন্দ্র সেনের বন্ধু ও জীবনীকার—অনেক সমর্থ ব্যক্তি তিনি, লেখক ও বক্তা হিসাবে সমাদৃত—**অপেক্ষাকৃত অলক্ষিত থেকে যান।**" [স্থূললিপি লেখক-নির্দেশে]

মজুমদারের 'অপেক্ষাকৃত অলক্ষিত' থাকার কারণ অবশ্যই তাঁর প্রচলিত ইউরোপীয় পোষাক আর স্বামীজীর লক্ষিত হওয়ার কারণ তাঁর বিচিত্র সন্ন্যাসীবেশ, কোনোই সন্দেহ নেই, কারণ সেকথা মার্ডক বলেছেন, যদিও তার দ্বারা আমেরিকানদের দৃষ্টিশক্তির যত সুখ্যাতি ঘটুক না কেন, বুদ্ধিশক্তির খ্যাতি ঘটে না—কিন্তু মিশনারি মার্ডক সত্যবাদী। সুতরাং আমেরিকানরা যদিও মিশনারিগিরির বেশি টাকা জুগিয়ে থাকে, তবু তাদের মুখের উপরে এই সত্য কথা শুনিয়ে দিতে মার্ডক ছাড়েন না—বিবেকানন্দ 'নয়া হিন্দুধর্ম' তৈরী করে ভারতে তাকে বেশ খানিক ছড়িয়েছেন ; সে-বস্তুর উদ্ভব ও বিকাশক্ষেত্র আমেরিকাই হবে, যেহেতু তা 'নয়া দুনিয়া।' বলাবাহুল্য 'নয়া দুনিয়া' খুব শ্রদ্ধাসূচক শব্দ নয়।

মার্ডক শুধু সত্যবাদী নন, ভারত-হিতৈষী বটেন। অতএব তাঁকে আমেরিকায় স্বামীজীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সংবাদ জানাতে হলই। সেকাজ সমাধা করে তিনি দুটি ডাক ছাড়লেন। সাধারণ ডাক বিবেকানন্দ-ভক্ত ভারতবাসীর উদ্দেশ্যেঃ হে ভারতবাসিগণ! একবার তোমরা দেখো, তোমাদের ভক্তিভাজন সন্ন্যাসীপ্রবর আমেরিকায় কি-রকম মজায় রয়েছেন! আর মার্ডকের বিশেষ ডাকটি ছিল মাদ্রাজের দুই ধনী জমিদারের (অর্থাৎ মহীশূর ও রামনাদের মহারাজার) উদ্দেশ্যে, যাঁরা বিবেকানন্দের আমেরিকাগমনের জন্য বড় আকারে চাঁদা দিয়েছিলেন এবং যাঁদের কাছে ইণ্ডিয়ান মিরার আরও সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে—যাতে স্বামীজীর পক্ষে অধিকদিন বিদেশে ধর্মপ্রচার করা সম্ভব হয়। ধনী জমিদার-দুজনকে মার্ডক বন্ধুভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে তাঁরা বিলাসী সন্ন্যাসীর জন্য অনুচিত অর্থব্যয় না করেন।

নিউইয়র্ক ইনডিপেনডেণ্ট কাগজে প্রকাশিত পূর্বালোচিত বাল্টিমোর-ঘটনার বিবরণ অতীব সুখের সঙ্গে মার্ডক উদ্ধৃত করেছেন। আসল ঘটনা কি আমরা আগে তা দেখিয়েছি। মার্ডক যখন সবই জানেন, তখন ধরে নিতে হবে আসল ব্যাপারটা জানতেন। কিন্তু ঘটনার সত্যরূপ সম্বন্ধে মার্ডক-সাহেব ধারণায় মৌলিক। হিন্দুধর্মের পাহাড়প্রমাণ মিথ্যা দূর করতে হলে অল্প-স্বল্প মিথ্যাচারে দোষ নেই। মার্ডক মন্তব্য করেছেন ঃ

"সুতরাং উপরের ঘটনা থেকে বোঝা যায়, স্বামীর ফার্স্টক্লাস হোটেলে যাতায়াত ছিল। দেখা যাচ্ছে, বাল্টিমোরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে ঢোকার চেষ্টা না করে ফার্স্টক্লাস হোটেলগুলিতেই তিনি ঢোকার চেষ্টা করেছেন। ভ্রমণকারীরা জানেন, আমেরিকার ফার্স্টক্লাস হোটেলগুলি প্রাসাদের মতো, তাতে সর্বপ্রকার বিলাসের আয়োজন আছে; সেইমতো সেগুলি ব্যয়বহুল।

"স্বামী ফার্স্টক্লাস হোটেলে আস্তানা গেড়েছিলেন। তিনি কি সেখানকার সুখাদ্য পরিহার করে নিরামিষাশী ছিলেন? চিকাগো শূকর-মাংসের জন্য বিখ্যাত। তিনি কি

একবারও তার স্বাদ না-নিয়ে শহর ছেড়েছিলেন? তিনি কি সুস্বাদু ঝলসানো গোমাংসের দ্বারা প্রলুব্ধ হন নি? তিনি মদ্য স্পর্শ করেন নি? হাভানা সিগারেটের গুণ সম্বন্ধে স্বামী কি বলেন?...

"ফার্স্টক্লাস হোটেলে স্বামীর খরচের বহর সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা যায়? সবই কি তাঁর ভারতীয় অনুরাগীরা বহন করেছেন? স্বামী কি বদান্যতার জন্য খ্যাত আমেরিকানদের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করেছেন? যদি করে থাকেন—কি উদ্দেশ্যে সে টাকা দেওয়া হয়েছে?

"মাদ্রাজের ধনী জমিদারেরা অবশ্য কালে ভগ্নমোহ হবেন এবং তাঁরা সন্দেহ বোধ করবেন —ফার্স্টক্লাস হোটেলে থেকে সন্ন্যাসী তাঁদের জন্য কি পরিমাণ ধর্ম জমা করছেন!"

এই ধরনের সুশালীন রচনা মার্ডকদের পক্ষেই লেখা সম্ভবপর। কিন্তু পরাধীন দেশের কাতর মনের কাছে এই রকম লেখার প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট হয়। মার্ডকের এই বইয়ের দৃঢ় যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করে ইণ্ডিয়ান মিরার ১৮৯৫-এর ২৮ জুন ও ১২ জুলাই, দুটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখে। তারও আগে ৩১ মে'র সম্পাদকীয় টীকায় মিরার কিছু মন্তব্য করেছিল। লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকাসহ অন্যান্য ভারতীয় পত্রিকাও প্রতিবাদ জানায়।

মিরারের প্রতিবাদ-রচনাগুলির বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। ৩১ মে'র সম্পাদকীয়তে অন্যান্য কথার সঙ্গে মিরার বলেছিল, মার্ডকের চেয়ে অনেক বড় পণ্ডিত মাদ্রাজের ডাঃ উইলিয়ম মিলার স্বামী বিবেকানন্দের মতোই বলেছেন, পৃথিবীতে হিন্দুধর্মের একটি মিশন আছে এবং তা পৃথিবীর খ্রীস্টান জাতিগুলিকে বিরাট শিক্ষাদান করতে পারে। ২৮ জুনের সম্পাদকীয়তে মার্ডকের বক্তব্য নানাভাবে খণ্ডিত করার পরে তীক্ষ্ন কঠিন ভাষায় বিদ্রূপের সুরে মিরার-সম্পাদক একটি কথা মার্ডককে স্মরণ করিয়ে না-দিয়ে পারেননি— ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দকে গাল দেবার জন্য মার্ডকদের পোষবার টাকা জোগাতে হচ্ছে দরিদ্র, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভারতবাসীকেই।—

"মিশনারিরা পারলে স্বামীজীকে অনাহারে রেখে শেষ করে ফেলেন—কেননা তিনি ধর্মমহাসভায় এবং অন্যত্র আমেরিকানদের বিশেষ অনুরোধে নিজ ধর্মের পক্ষে বলার মতো অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন। আমেরিকানরা অপাত্রে দাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন বলে যে-সব তামাশা করা হয়েছে, তা কি ভারতে বিচিত্র কথা বলে মনে হবে না, যেখানে নিরন্ন প্রজার রক্ত শুষে আদায় করা টাকা দিয়ে নির্মিত ধর্মসংস্থার গোটা আধ্যাত্মিক ফলটা কেবল খ্রীস্টানরাই পেয়ে যায়। যে-হিন্দুরা স্বধর্মে যথেষ্টই আধ্যাত্মিক শান্তিতে আছে, তারা কেন বিশপ ও চাপলিনদের মোটা বেতনের জন্য ট্যাক্স দেবে, যখন বিনিময়ে তারা কিছুই পাবে না?...রেভারেণ্ড ডক্টরের পক্ষে এসব জিনিস ভুলে যাওয়াই সুবিধাজনক কারণ সাধুতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য তিনি মোটে ব্যস্ত নন যখন স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ আসে, এবং তিনি তাঁকে যেন-তেন-প্রকারে কুৎসার পাঁকে টেনে নামাতে চান।"

মার্ডকের গ্রন্থের দ্বারা বোধহয় সর্বাধিক বিব্রত হয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান নেশনের সম্পাদক। স্বামীজীর 'পেপার অন হিন্দুইজম্' প্রাপ্তিমাত্রে পাণ্ডিত্যে অধীর হয়ে কিভাবে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে তার সমালোচনা করেছিলেন, এবং তার দ্বারা কিভাবে কেবল স্বামীজীর ঐ বিখ্যাত রচনাটিকেই নয়, সমগ্র হিন্দুধর্মের দার্শনিক ভিত্তিকে অস্বীকার করেছিলেন, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি। এই কাজের জন্য সম্পাদক মহাশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছিলেন, প্রকাশ্য সভায় পরোক্ষভাবে ত্রুটিস্বীকারও করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটার শেষ তাতেই হয়নি। মার্ডকের মতো সন্ধানী মিশনারি ঐ সমালোচনার সুযোগ নেবেন না, তা হতেই পারে না। এবং ঐ সমালোচনা যদি কোনোভাবে তাঁর চোখ এড়িয়ে যেত—তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ইণ্ডিয়ান মেসেনজার তো প্রস্তুত ছিলই। মার্ডকের বইয়ে হিন্দুধর্মের দার্শনিক ভিত্তিকে নস্যাৎ করতে যে-সকল যুক্তি উপস্থিত করা

হয়েছিল, তার প্রধান অংশ ইণ্ডিয়ান নেশনের প্রবন্ধগুলি থেকেই নেওয়া হয়। মার্ডক জানতেন, কিভাবে ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা করাতে হয়।

মার্ডকের গ্রন্থ যখন নানাস্থানে আলোচিত হতে লাগল তখন বিব্রত ইণ্ডিয়ান নেশনের সম্পাদক ১৫ জুলাই লিখলেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে ডাঃ মার্ডকের রচনার খণ্ডনে ইণ্ডিয়ান মিরার বারবার মনোযোগ দিয়ে ঐ ভদ্রলোককে অযথা সম্মানিত করছে। মাদ্রাজ ক্রীশ্চান ট্রাকট্ সোসাইটি ডাঃ মার্ডকের রচনাদির জন্যই কেবল আমাদের নিকট পরিচিত। এই সোসাইটি নিশ্চয়ই অধ্যবসায়ী কিন্তু পাণ্ডিত্য বা মৌলিক চিন্তার জন্য বিশেষ চিহ্নিত, এমন মনে করা যায় না। কিছু ভাল স্কুল-বই সেখান থেকে বেরিয়েছে, একটি ভূগোল বইয়ের এবং ব্যাকরণের উল্লেখ এক্ষেত্রে করতেই হয়। এবং এদের বিচার-বিতর্কমূলক যে-সব পুস্তিকা দেখেছি, সেগুলিতে খাটা-খাটুনির পরিচয় আছে, সেইসঙ্গে আরও কিছু। এই সোসাইটি যে-পরিশ্রম ও ধৈর্যের সঙ্গে নিজ সংগ্রহশালায় সংবাদপত্রের কাটা অংশ রেখে দেয় এবং সময় বুঝে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার জন্য সেগুলিকে একসঙ্গে জুড়ে হাজির করে —তার প্রশংসা অবশ্যই করতে হবে। সোসাইটির পুস্তিকাগুলির পৃষ্ঠাতে অনেক সময়ে আমাদের রচনার অংশ উজ্জ্বলাক্ষরে মুদ্রিত দেখে আমরা বিস্মিত ও মোহিত হয়েছি, যদিও ঐসব লেখার কথা আমরা একেবারে ভুলেই গেছি হয়ত। সুতরাং আমাদের রচনা সম্বন্ধে ওহেন মনোযোগের সম্মানের যোগ্য আমরা নই।...আমরা দেখে দুঃখিত যে, আমাদের পত্রিকার স্তম্ভে ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত স্বামীজীর একটি ভাষণের যে-সমালোচনা করা হয়েছিল, তাকে এমন এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে যা কখনই আমাদের অভিপ্রেত ছিল না। ডাঃ মার্ডকের বইয়ের সর্বত্র আমাদের প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যা দেখে অসতর্ক পাঠক মনে করতে পারেন—হয় আমরা, না-হয় বিবেকানন্দ হিন্দু-বিরোধী।"

মার্ডকের বই স্বামীজীর মাদ্রাজী-ভক্তদের বিশেষ বিচলিত করেছিল। খাদ্যাখাদ্যবিচারে মাদ্রাজ সদাব্যস্ত, এক্ষেত্রে দক্ষিণীদের গোঁড়ামির শেষ নেই, তদুপরি মাদ্রাজই মার্ডকের কর্মক্ষেত্র এবং তিনি রীতিমত বুদ্ধিমান। এবং তিনি সক্রিয় মিশনারি। সর্বস্থানে সর্ববিষয়ে মাথা গলানো তাঁর অভ্যাস। মাদ্রাজের সোস্যাল রিফর্মারদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সৌহার্দ্য। ঐসব ছোকরা সংস্কারকেরা নিজেদের নিরপেক্ষতা অটুট রাখতে এতই সন্ত্রস্ত থাকতেন যে, মিশনারি-দের বিরুদ্ধে কিছু বলতে তাঁদের কুণ্ঠার সীমা থাকত না। বরং বলা যায়, হিন্দুসমাজের দোষ-দর্শনে তাঁরা মিশনারিদের সহযোগী ছিলেন। সুতরাং মার্ডকের গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে (স্বামীজী ছাড়াও হিন্দুধর্ম, শাস্ত্র এবং তার প্রাচীন আচার্যেরা মার্ডকের কয়েকটি পুস্তিকার লক্ষ্য ছিলেন) ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মারে ১ জুন তারিখে যে-মন্তব্য করা হয়, তাতে মার্ডকের সমর্থন করা না হলেও বিরুদ্ধেও বলা হয়নি। মার্ডকের বিবেকানন্দ-বিষয়ক দ্বিতীয় বই—*The Yoga-Sastra : The Yoga Sutra of Patanjali Examined, With a Notice of Swami Vivekananda's Yoga Philosophy*—যা স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে রচিত হয়েছিল—সেই বইয়ের বক্তব্যেরও কোনো প্রতিবাদ না করে সোস্যাল রিফর্মার মার্ডক-লিখিত শ্লেষাত্মক ভূমিকার অংশ উদ্ধৃত করেছিল। এবং মার্ডকের এই বিষয়ে তৃতীয় গ্রন্থ *Swami Vivekananda and His Guru*-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বরং মার্ডককেই সমর্থন করা হয়েছিল ২৭ জানুয়ারি, ১৮৯৭, তারিখে লিখিত এক সম্পাদকীয় টীকায়।

মাদ্রাজে মার্ডক-পুস্তিকাগুলি কিছু প্রচার লাভ করেছিল। স্বামীজীর ভক্ত ও শিষ্যেরা ব্যস্ত হয়ে উক্ত পুস্তিকাসহ স্বামীজীকে অবিরত পত্রাঘাত করতে লাগলেন। মার্ডকের বই যখন প্রকাশিত হয়, স্বামীজী তখন আমেরিকায় বিরোধী-আক্রমণের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছেন। মাদ্রাজ ও কলকাতার ধন্যবাদ-সভার পরে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে তাঁর ভূমিকা

যখন স্বীকৃত হয়েছে, তখন ঐসব মিশনারি-দংশনকে আর তিনি গ্রাহ্য করছিলেন না—এই পরিস্থিতিতে মিশনারি-কুৎসা সম্বন্ধে তাঁর ভারতীয় শিষ্যদের অতিরিক্ত উদ্বেগ তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছিল। তাছাড়া ভীরুতাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না; এবং মিশনারি-দংশনে ভারতবাসীর নিরুপায় ক্রন্দন তাঁর কাছে জঘন্য কাপুরুষতা বলে মনে হয়েছিল। মার্ক-সম্বন্ধে তিনি ১৮৯৫, ১ জুলাই আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখেন; "তোমাদের প্রেরিত মিশনারিদের বইখানা...পেলাম।...রমাবাঈয়ের দলের সঙ্গে ডাঃ জেনসের বাদপ্রতিবাদ থেকে বেশ বোধ হয়, মিশনারিদের পুস্তিকাখানা এখানে বহুদিন পূর্বে এসে পৌঁছেচে।" স্বামীজী বাল্টিমোরের বড় হোটেলে থাকা প্রসঙ্গে জানালেন, তিনি বড় হোটেলে পূর্বে থাকেননি ইত্যাদি—যে-কথাগুলি পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। তারপরে স্বামীজী কঠোরভাবে ভারতীয় কাঁদুনির সমালোচনা করলেন ঃ "আলাসিঙ্গা, তোমায় বলছি শোনো, তোমাদের নিজেদেরই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। কচি খোকার মতো আচরণ করছ কেন? কেউ যদি তোমাদের ধর্মকে আক্রমণ করে তার জবাব দাও না কেন? আমার সম্বন্ধে বলতে পারি, তোমাদের ভয় পেতে হবে না; এখানে আমার শত্রুর চেয়ে মিত্রের সংখ্যা বেশী। এদেশে অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র খ্রীস্টান, আর শিক্ষিতদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক লোকই মিশনারিদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে। মিশনারিরা কোনো কিছুর বিরুদ্ধে লাগলে শিক্ষিতরা আবার সে-বিষয়টি পছন্দ করে। এখন এখানে মিশনারিদের শক্তি অনেক কমে গেছে, দিন-দিন তা কমছে। তাদের আক্রমণ তোমাদের কষ্ট দিলে অভিমানী ছেলের মত ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদুনি গাইতে আসো কেন? তোমরা কি লিখতে পারো না, তাদের দোষ দেখিয়ে দিতে পারো না? কাপুরুষতা কোনো গুণ নয়।...যতক্ষণ তোমরা মিশনারিদের আক্রমণে ককিয়ে কাঁদবে, ধড়পড় করে লাফাবে, তখন তা দেখে আমি হাসব। খাটো পুতুলের দল সব—তা ছাড়া আর কি? আ—হাঃ! 'স্বামীজী, মিশনারিরা আমাদের কামড়াচ্ছে—উঃ জ্বলে পুড়ে মলুম! উঃ—উঃ!' স্বামীজী আর বুড়ো খোকাদের জন্য কি করতে পারে!

"বৎস, আমি বুঝেছি, আমাকে ফিরে গিয়ে তোমাদের মানুষ করতে হবে। আমি জানি যে, ভারতে কেবল নারী আর ক্লীবের বাস। সুতরাং বাজে বিরক্ত করো না। ভারতে কাজের পথ আমাকেই বের করতে হবে। কতকগুলি জড়বুদ্ধি ক্লীবের হাতে গিয়ে আর পড়ছি না। তোমাদের বিব্রত হবার দরকার নেই, অল্প-স্বল্প যা পারো করে যাও। আমাকে একলা আপাদমস্তক তৈরী করতে হবে। কলকাতার লোকদের কী সংকীর্ণভাব! আর তোমরা মাদ্রাজীরা কুকুরের ডাকে মূর্চ্ছা যাও! নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। আমার জন্য ভয় পাবার দরকার নেই, প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন। তোমরা কেবল আত্মরক্ষা করে যাও, আমাকে দেখাও যে, তোমরা ঐটুকু করতে পারো, তা হলেই আমি সন্তুষ্ট। অপরে আমার সম্বন্ধে কি বলছে তা নিয়ে আমাকে বিরক্ত করো না। কোন্ আহাম্মক আমার বিচার করবে, তা শোনবার সময় আমার নেই।"

এর পরে ছিল সেই অপূর্ব বিবেকানন্দীয় বা প্রফেটীয় আত্মবিশ্বাস ঃ

"হে অবিশ্বাসিগণ! চিরকালের জন্য জেনে রাখো, প্রভু আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। যতক্ষণ আমি পবিত্র থাকব, তাঁর দাস হয়ে থাকব, ততক্ষণ কেউ আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।"

একাধিকবার স্বামীজী তাঁর চিঠিতে জানিয়েছিলেন, তিনি আচারে রক্ষণশীল হিন্দু নন, খাদ্যাখাদ্য বিচার করেন না, যা পান তাই খান। আরও জানালেন—আগেই তা দেখেছি আমরা—সন্ন্যাসের শুদ্ধতা নির্ভর করে কাম কাঞ্চনের আসক্তি ত্যাগের উপরে। ১৮৯৫, অগস্ট মাসে আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠিতে মিশনারিদের চেঁচামেচির কারণ ব্যাখ্যা করলেন ঃ "মিশনারিদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। তারা চেঁচাবে, তাই স্বাভাবিক। অন্ন মারা গেলে কে না চেঁচায়। গত

দু'বছরে মিশনারি-তহবিলে বড় ঘাটতি পড়েছে, তা বাড়তির মুখে।" মিশনারিদের পক্ষে কেন তাঁকে সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়, স্বামীজী তাও জানালেন। ১৮৯৪, ৫ সেপ্টেম্বর মন্মথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : "আমি একটি বিচিত্র ধরনের জীব, যার কোনো রোমাণ্টিক অনুভূতি নেই।...আমি তাদের (আমেরিকান নারীদের) আমাকে 'পিতা' বা 'ভ্রাতা' বলতে বাধ্য করি, অন্য কোনো মন নিয়ে কাছে ঘেঁষতে দিই না।" এই "বিচিত্র ধরনের জীব"কে সত্যই মিশনারিদের পক্ষে চেনা সম্ভব ছিল না। ১৮৯৬, ১৭ ফেব্রুয়ারি, আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন : "মিশনারি ও অন্যান্যরা আমাকে বুঝতে পারে না সেজন্য তাদের দোষ দিই না—কাম-কাঞ্চনকে গ্রাহ্য করে না এমন লোক তারা কখনো দেখেছে কি না সন্দেহ। দেখে তারা গোড়ায় বিশ্বাসই করতে পারেনি তা সম্ভবপর। পারবেই বা কিভাবে? কদাপি মনে করো না, ব্রহ্মচর্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ধারণা ভারতেরই অনুরূপ। তাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ শব্দ নৈতিক শক্তি ও সাহস (*Virtue and Courage*)। তাদের সাধুত্বের আদর্শ ঐ পর্যন্ত। তাদের মতে, বিবাহাদি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম—এর অভাবে মানুষ অসাধু। আর যে-ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সম্মান না করে, সে তো অসৎ।...এখন লোকেরা দলে-দলে আমার কাছে আসছে। এখন শত-শত লোক বুঝেছে যে, এমন লোক আছে, যারা নিজের কামপ্রবৃত্তিকে সত্যই সংযত করতে পারে।"

মিশনারিরা কিন্তু বিবেকানন্দের 'বুঝতে' না পেরে মোটেই দুঃখিত ছিল না, কারণ তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য বিবেকানন্দের মহিমা না বোঝাই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তারা বিবেকানন্দ-বিরোধী জেহাদ চালিয়ে গিয়েছিল, তাতে যোগ দিয়েছিল খ্রীস্টধর্মান্তরিত ভারতীয় মহিলা রমাবাঈয়ের গোষ্ঠীর লোকেরা। স্বামীজী তাঁর নিজের বিরুদ্ধে কুৎসায় যতখানি-না আহত হয়েছিলেন, তাঁকে অনেক বেশী পীড়িত করেছিল ভারতের বিরুদ্ধে রাশি-রাশি গ্লানিময় প্রচার, যার সামান্য নমুনা মার্ডকের গ্রন্থ থেকে পেয়েছি। ভারতে ফেরার পরে স্বামীজী এক বক্তৃতায় মিশনারি ও চার্চ-উওম্যানদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কিছু বলেন। মিশনারিরা সেই কথাগুলিকে বিকৃতভাবে আমেরিকায় ছড়াতে আরম্ভ করে, বলতে থাকে, বিবেকানন্দ দেশে ফিরে গিয়ে আমেরিকার নারীদের নিন্দা করে বেড়াচ্ছেন। আমেরিকায় স্বামীজীর বন্ধুদের কাছে ব্যাপারটা প্রীতিকর ঠেকেনি। মেরী হেলকে এই প্রসঙ্গে স্বামীজী ১৮৯৭, ৯ জুলাই লিখেছিলেন :

"বিভিন্ন আমেরিকান কাগজের অনেকগুলি কাটিং আমি পেয়েছি; তাতে দেখলাম, আমেরিকার নারীদের সম্বন্ধে আমার উক্তির ভয়ানক সমালোচনা করা হয়েছে।...এক বক্তৃতায় আমি মিশনারিদের সম্বন্ধে—এবং ইংলিশ চার্চের ভদ্র মিশনারিদের বাদ দিয়ে সাধারণ মিশনারিদের সমাজের কোন্ স্তর থেকে সংগ্রহ করা হয়—সে-সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। সেইসূত্রে চার্চ-গোঁড়া আমেরিকান নারীদের কিছু কথা, তাদের কুৎসা-উদ্ভাবনের ক্ষমতার কথাও বলেছি। এখন মিশনারিরা আমেরিকায় আমার কাজ নষ্ট করার জন্য চার্চ-গোঁড়া নারীদের সম্বন্ধে আমার বক্তব্যকে গোটা আমেরিকার নারীদের উপরে চাপিয়ে বিরুদ্ধপ্রচার চালাচ্ছে, কারণ তারা ভালই জানে, শুধু তাদের উপরে কোনো আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ খুশিই হবে। কিন্তু প্রিয় মেরী, ধরো, ইয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে আমি সর্বরকম ভয়ানক কথা বলেছি—তাহলেও তার দ্বারা কি আমাদের মা-বোনদের বিরুদ্ধে তারা যেসব কথা বলেছে, তার কোটি ভাগের এক ভাগও শোধ হবে? আমরা ভারতের হীদেন—আমাদের নারী পুরুষের প্রতি খ্রীস্টান-ইয়াঙ্কিদের যে-ঘৃণা, তা ধুয়ে ফেলতে বরুণদেবতার সব জলেও কুলোবে না। অথচ আমরা তাদের কি অনিষ্ট যে করেছি, জানি না!"

॥ ১৩ ॥

মিশনারিরা যখন তাঁদের অজস্র পত্রপত্রিকার অগণিত পৃষ্ঠাকে গাঢ়তর কালিতে রঞ্জিত করছেন—ঠিক সেইসময়ে বিবেকানন্দ বাইরে আঘাত করে যেমন, তেমনি তাদের ভিতরেও ক্ষয় এনে দিয়েছেন। যে-ধরনের খ্রীস্টীয় প্রচারসাহিত্য তৈরি হচ্ছিল তাতে যে চলছে না, মিশনারি-মহল বুঝতে শুরু করেছিল। হার্ভেস্ট ফিল্ডের ১৮৯৯ মে সংখ্যায় 'ক্রীশ্চান লিটারেচর' নামক সম্পাদকীয়তে এই প্রচার-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বলা হয়েছিল : এই কাজে বহু লেখক দরকার এবং দরকার এমন একটি খ্রীস্টান পত্রিকা যা 'প্রশস্ত উদার-নীতি' অনুসরণ করবে, হিন্দু-চিন্তার বিষয়ে লেখার সময়ে 'সহানুভূতি ও বুদ্ধিমত্তার' সঙ্গে অগ্রসর হবে। এপিফ্যানি বা মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিন যথেষ্ট ভালো কাজ করলেও ঐ মাপকাঠিতে এ'দের কাছে সুযোগ্য বিবেচিত হয় নি।

মার্ডক যে আর চলছে না—তা খোলাখুলি স্বীকারও করেছিলেন কেউ-কেউ। মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ পত্রিকায় (১৯০০, জানুয়ারি) "পঞ্জাবের সুপরিচিত মিশনারি রেভাঃ ডাঃ ই এম হোয়েরি"র একটি "উল্লেখযোগ্য" রচনা বেরোয়। মিশনারি-প্রচারে খ্রীস্টীয় সাহিত্যের গুরুমূল্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডাঃ হোয়েরি বলেন, খ্রীস্টীয় সাহিত্য আরও সক্রিয়-ভাবে প্রচারকার্যে সাহায্য করতে পারত, যদি পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজের চেহারা সে বদলাত। ভারতেব পটভূমিকায় খ্রীস্টীয় সাহিত্যের এই অনড়তা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। যখন "নতুন ভারত জন্মেছে, নব পৌরুষের শক্তিতে স্পন্দিত হচ্ছে," তখন অধিকাংশ খ্রীস্টীয় সাহিত্য, যা ডাঃ মার্ডকের তত্ত্বাবধানে রচিত, পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী নয়।[৫৫] তিনি এইসঙ্গে বলেন, পুরনো ধরনের বিতর্কমূলক রচনা আর চলবে না। আগেকার বইগুলি ছিল তাত্ত্বিক, বুদ্ধির কাছে আবেদন করত—এখন এমন সাহিত্য দরকার যা হৃদয়ের কাছে আবেদন করবে। তাছাড়া আগেকার মতো বিদেশী সাহিত্যের হুবহু অনুবাদও চলবে না—দেশীয় ভাষায় দেশীয় ভাবে লেখা দরকার।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডে স্বামীজীর প্রচারসাফল্য নিয়ে বহু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন মিশনারিরা। ধর্মান্তর বলতে যে স্থূল ব্যাপারটা মিশনাবিরা বুঝতেন—সে-রকম নিশ্চয়ই ঘটেনি। এবং স্বামীজীর তা কোনো দিন অভিপ্রায়ও ছিল না। সর্বধর্মের সত্যকে যিনি প্রথমেই স্বীকার করে রেখেছেন, তিনি মিশনারি-মতে ধর্মান্তরের পক্ষপাতী হতেই পারেন না। স্বামীজীর উদ্দেশ্য ভাবপ্রচার; পাশ্চাত্যের কাছে তিনি বেদান্তভাব দিয়েছেন, এবং মনে করেছেন—ঐ ভাব এখনই নিয়েছেন বহু শিক্ষিত পাশ্চাত্ত্যবাসী, এবং আরো বেশি সংখ্যায় তাঁরা তাকে নেবেন ভবিষ্যতে। স্বামীজী যখন বলেছিলেন, দশ বছরের মধ্যে ইংলণ্ডের অর্ধেক লোক বৈদান্তিক হয়ে যাবে (যা নিয়ে মিশনারি-পত্রিকাগুলির অসুখী আমোদের অন্ত ছিল না)—তখন তিনি মনে করেছিলেন—দশ বছরের মধ্যে অর্ধেকসংখ্যক শিক্ষিত ইংরেজ সর্ব মানবের ও বস্তুর অন্তর্নিহিত দেবত্বকে স্বীকার করে নেবে। স্বামীজী

৫৫ "A new India has been born and has grown into the vigour of young manhood. In this renaissance a most important part has been played by missionary education and Christian literature. Many of the results of this awakening are, however, not what missionaries had hoped for.... Most of the literature of the past is not suited to influence the minds and hearts of those who constitute the people of New India. Much has been done....by the Christian Literature Society under the guidance of Dr. Murdoch, but much yet remains to be done." [Dr. Wherry in *Madras Christian College Magazine*; January,1900]

সম্ভবতঃ ভুল করেছিলেন, কারণ তিনি সভ্যতার অগ্রগতিতে বিশ্বাস করার মতো ভ্রান্তি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি একক ছিলেন না, কারণ স্বয়ং ইংরেজ এবং যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম হারবার্ট স্পেনসারের শেষের দিকের উক্তির মধ্যে বেদান্ততত্ত্বের স্বীকৃতির আভাস দেখে চমকিত ও উল্লসিত হয়েছিলেন বেঙ্গলী পত্রিকার সুপণ্ডিত সম্পাদক, এবং সেই আনন্দে বাদ সাধতে চেয়েছিলেন মিশনারি জে এন ফার্কুহার, যদিও তিনি মিশনারি-অসুলভ রীতিতে বেদান্তের কিছু ভাবমহিমা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।৫৬

হিন্দুধর্ম, ধর্মান্তরে বিশ্বাস করে না বলে তার বিস্তারের সম্ভাবনা নেই—সেজন্য মিশনারিদের কাছে বহু কৃপাবচন পেয়েছে—কিন্তু ভাবের ক্ষেত্র এই ধর্ম কিভাবে সম্প্রসারণশীল ছিল এবং আছে, তা ব্রহ্মবাদিনে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে (১৮৯৬, ৯ মে) দেখতে পাই। ***Hinduism and Religious Conversion*** নামক ঐ প্রবন্ধটিতে (লেখকের নাম ছিল না, অনুমান করি ওটি অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের লেখা) পৃথিবীর ধর্মসমূহের ইতিহাস আলোচনা করে দেখানো হয়েছিল—আর্যধর্ম সর্বদাই আর্যেতরদের প্রভাবিত করেছে, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম অপরকে স্বধর্মভুক্ত করেছে, কিন্তু যে-অর্থে আধুনিক খ্রীস্টান মিশনারিরা

৫৬ বেঙ্গলী-সম্পাদক ১৯০২, ১৮ জুলাই *The Latest Utterances of Herbert Spencer* নামক সম্পাদকীয় রচনায় বলেন, অজ্ঞেয়বাদ হিন্দুর বেদান্তধর্মের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে—এবং স্বয়ং স্পেনসারের রচনায় তার সূচনার রূপ দেখা যায় :

"And this agnosticism [of Herbert Spencer] is the precursor to the spread of that Vedantism which, we believe, is likely to be the future religion of the intellectual classes of our earth. It is the Hindu, time and again, has given to the world its religions. It is the Hindu who has given the world its philosophies and the elements of all the sciences. And it is the Hindu who stands predestined once again to replace by a perfect faith the unbelief and the gross materialism.... And by a mysterious law, the great apostles of Agnosticism are the Baptists who have prepared the way for the reception of the world of the ancient Hindu faith with its logical conception of an Impersonal Deity, with its principle of reincarnation, with its theory of evolutionary progress which even the materialistic sciences of the West help to demonstrate. And the utterances of Herbert Spencer himself tend to show that the loftiest intellects of the West are slowly, it may be unconsciously, converging towards the cardinal principles on which is based the great Vedantic doctrine."

[*Bengalee* ; July 18, 1902]

২৩ জুলাই-এর প্রতিবাদপত্রে ফার্কুহার বলেন, না, ঐ ভবিষ্যৎবাণী সফল হবার সম্ভাবনা নেই। একথা ঠিক, বেদান্ত ইউরোপ আমেরিকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে পঠিত হয়, এবং এই পদ্ধতির আকর্ষণ যথেষ্ট—কিন্তু প্লেটো-দর্শন যেমন ভারতে পঠিত হয়েও জীবননীতি হিসাবে গৃহীত হবার সম্ভাবনা নেই, তেমনি বেদান্তদর্শনও ইউরোপে। কিন্তু মিশনারিরা যে-সব কারণে বেদান্তের চরম বিরোধী, দেখা যাবে, এই মিশনারি তার অনেকগুলির শক্তিমহিমা স্বীকার করেছেন, যার দ্বারা বিবেকানন্দের কথার সত্যতাই আংশিক প্রমাণিত হয় :

"The [Vedanta] system has many attractions for the philosophic mind. The simplicity and definiteness of pantheism has always fascinated the speculative intellect. The Vedanta attracts attention besides by the satisfaction of offers to our spiritual inspirations in the promise of identity with the Supreme Spirit here and now ; by the magnificent sweep and compass of several of the ethical ideas contained in its doctrine of Karma ; and by its exaltation of philosophic intution to the very work of soul-redemption itself."

[J. N. Farquhar in *Bengalee* ; July 23, 1902]

ধর্মান্তর বোঝেন সেই অর্থে নয়, কখনই স্বমতে গৃহীত মানুষটিকে উৎপাটিত করার চেষ্টা করা হয়নি তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে, যা করবার চেষ্টা করেছে বণিক সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবপুষ্ট আধুনিক খ্রীস্টান মিশনারিরা। এই লেখক এমন-কি খ্রীস্টানধর্মের প্রাচীন ইতিহাস থেকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—আদিপর্বে খ্রীস্টানেরাও একই জাতীয় ভাববিস্তারের চেষ্টা করেছেন, যখন একই পরিবারের মধ্যে স্বচ্ছন্দে খ্রীস্টান ও প্যাগান ভ্রাতারা বাস করেছে। বিবেকানন্দ যে-ধরনের সহিষ্ণুতার এবং স্বীকৃতির কথা পাশ্চাত্ত্যে বলেছেন—তার সুর দেখা গেছে ফ্লিনডার্স পেত্রীর মতো নৃবিজ্ঞানীর সাম্প্রতিক রচনায়, তাও লেখক দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনের অন্যান্য রচনাতেও দেখতে পাই, বিভিন্ন খ্রীস্টান লেখকের রচনা থেকে অংশ উদ্ধৃত করে একই দাবি করা হয়েছে ঃ

"Such articles as the two from which I have briefly quoted explain the assertion of the Swami Vivekananda, that in a short space of time Vedanta will conquer the world, not as a sect, but in its broadest sense as embodying the eternal principles of religion, and particularly as representing the belief in the Divinity of Man." [*Brahmavadin* ; Aug.14, 1897]

স্বামীজীর বেদান্ত উদারনৈতিক খ্রীস্টান-মহলে সত্যই প্রভাববিস্তার করেছিল, তার প্রমাণঃ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় একইসঙ্গে মিশনারিদের দুই সম্মেলন বসেছিল, যার একটিতে শোনা গিয়েছিল সংকীর্ণতার কঠিন ঘোষণা, অন্যটিতে উদারতার প্রসন্ন আহ্বান। প্রবুদ্ধ ভারতে *Missionaries in Conference* রচনায় (১৯০০ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর) আমেরিকান পত্রিকা থেকে সংকলন করে ঐ দুই ধরনের সম্মেলনের বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছিল। গোঁড়ারা তাঁদের সম্মেলনে কী বলেছিলেন, তা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি—এখন দেখতে পারি—কী বিপরীত কথা বলেছিলেন উদারনৈতিক যাজকেরা 'বস্টন কংগ্রেস অব রিলিজিয়নস্'-এ। এপিসকোপাল চার্চের রেভাঃ ডাঃ হেবার নিউটন সম্মেলনের প্রাণসত্য এই বলে প্রকাশ করেনঃ "মূলগত খ্রীস্টধর্ম যা, তাই মূলগত ইহুদী ধর্ম, তাই মূলগত হিন্দুধর্ম।" রেভাঃ নিউটন প্রশ্ন করেছিলেনঃ "যেসব মতপার্থক্য আমাদের বিচ্ছিন্ন করে, গণ্ডীবদ্ধ করে, কলহে নামায—তাদের চর্চা করে কেন আমরা আমাদের নৈতিক শক্তির ক্ষয় করব, কেন আধ্যাত্মিক জীবনকে করে তুলব নিষ্প্রাণ?" "মুক্ত আত্মার মানুষরা" ঐ সংকীর্ণ পথে চলতে রাজি হননি। রেভাঃ স্যামুয়েল ক্রথার সুতরাং বলেছিলেন, (একেবারে বিবেকানন্দের ভাষায়) "ধর্মের মহা যুগগুলিতে মানুষ কেবল ধর্মের অস্তিত্বই স্বীকার করেনি—ধর্মে জীবিত ছিল।" ডাঃ লুইস জি জেনস মানুষের মনকে হীরকের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, কোনো দুটি হীরে একরকম ভাবে কাটা হয় না, কিন্তু সকলেই নানা আকারে আলোক বিচ্ছুরণ করে; তেমনি মানুষের মনের গড়ন পৃথক হলেও ঈশ্বরের নিত্যসত্যের জ্যোতি সে বিকীর্ণ করেই। যদি পরিষ্কৃত থাকে তাহলে সব হৃদয়েই ঈশ্বরজ্যোতির প্রতিফলন। রেভাঃ চার্লস সি এভারেট খ্রীস্টধর্মের ব্যাখ্যায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে, তার অসীম গুরুত্বের উল্লেখ করে বলেন, "এখন আমরা নিজস্ব-ভাবে নিউ টেস্টামেন্টের ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারছি। এমন কি যীশুর মুখে যে-সব উক্তি বসানো হয়েছে, তার সবগুলিকে খাঁটি বলে স্বীকার করতেও বাধ্য নই।" সম্মেলনে যে-প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, তাতে যেন বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষাকেই স্বীকৃতির মুদ্রণ দিয়ে উদারনৈতিক মিশনারিরা উপস্থিত করেছিলেন ঃ

"The Congress of Religion, assembled at Boston. . recognises the

underlying unity that must characterise all sincere and earnest workers of God and welcomes the free expression of positive convictions, believing that a sympathetic understanding between men of differing views will lead to finer catholicity of mind and more efficient service of men."

দুই বিপরীত সম্মেলনের বিবরণদানের পর নিউইয়র্কের 'সান' পত্রিকা বলে—দেখা যাচ্ছে, একটা সম্মেলনে ধর্মান্তরের জেহাদ তোলা হচ্ছে, অন্য সম্মেলনে বলা হল, ধর্মান্তর-চেষ্টার প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতের হিন্দুরাও খ্রীস্টানদের সঙ্গে "মানবের একই আধ্যাত্মিক ধর্মের" অন্তর্ভুক্ত। সান এমন-কি বলল, নিউইয়র্কের গোঁড়াদের সম্মেলনেও ইঙ্গিতে বাইবেলের চূড়ান্ত অথরিটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং ভারতের এক মেথডিস্ট বিশপ, সেইসঙ্গে রক্ষণশীল চার্চের অন্য একজন যাজক, যীশুখ্রীস্টের উক্তিকে ঈশ্বরবাণীরূপে চাপিয়ে না দিয়ে মানুষের যুক্তিবোধের কাছে তার আবেদনকে উপস্থিত করেছিলেন।

পরিস্থিতির কত বদল হয়েছিল—তা দেখা যায় স্যার লেপেল গ্রিফিনের মতো সুপরিচিত ভারত বিরোধীর৫৭ পরিবর্তিত মনোভাব থেকে। স্বামীজীও স্যার লেপেলের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। ১৮৯৪, ২৬ এপ্রিল ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে স্বামীজী লেখেনঃ "গত মাসের রিভিউ অব রিভিউজ্ যদি জোগাড় করতে পারো, তাহলে সেটি মায়ের (মিসেস হেল) কাছে পড়ে শোনাবে, যাতে ভারতে আফিম-প্রশ্নে হিন্দুদের সম্বন্ধে ভারতের সর্বোচ্চ এক ইংরাজ রাজকর্মচারীর সাক্ষ্য রয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দুদের তুলনা করে তিনি হিন্দুদের একেবারে আকাশে তুলে দিয়েছেন। স্যার লেপেল গ্রিফিন—আমাদের জাতির দারুণতম শত্রুদের একজন—হঠাৎ তাঁর এই দিক-পরিবর্তনের কারণ কি?"

স্যার লেপেল কিন্তু তাঁর এই পরিবর্তিত ভূমিকা পরেও ত্যাগ করেন নি। ভারতের ধর্মশিক্ষা প্রশ্নে তিনি ইংলণ্ডে একটি ভাষণ দেন (১৯০১), তাতে বিশপ ওয়েলডনকে তাঁর ভারতে মিশনারি-অভিলাষ সম্পর্কে কঠোরভাবে সমঝে দিয়েছিলেন। কলকাতার বিশপ ওয়েলডন, বোম্বাইয়ের বিশপ, এবং বিশপ হোয়াইটহেড প্রভৃতিরা বিশপগিরির সরকারী চাকরি যখন করছেন, তখন তার সীমা লঙ্ঘন করে ধর্মান্তরকরণের বাড়তি চেষ্টা করার অধিকার তাঁদের নেই—স্যার লেপেল স্মরণ করিয়ে দেন। এই সূত্রে তিনি খ্রীস্টান-ইংরাজদের তুলনায় হিন্দুদের চরিত্রের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে, ভারতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনকে একেবারে উড়িয়ে দেন। স্যার লেপেলের পূর্বেকার ধারাবাহিক ভারতবিরোধী উক্তির সম্বন্ধে সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা অবহিত, তাই নিম্নের কথাগুলি তাঁদের কাছে বিস্ময়কর মনে হবেঃ

"The Hindu creed. .is a creed of very high ethical value. .When I remember those honourable industrious, orderly, law-abiding, sober, manly men, I look over England and wonder whether there is anything in Christianity which can give higher ethical creed than that which is now professed by the large majority of the people of India. I do not see it in London society, I do not see it in the slums of East

৫৭ ভারত-নিন্দুক, ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী স্যার লেপেল গ্রিফিনের সঙ্গে ভারতীয় সংবাদপত্রের নিত্য বিবাদ। অমৃতবাজারের একটি ইতস্ততঃ মন্তব্য তোলা যাক ঃ

"Some years ago when Sir Lepel Griffin was, in a paper, caricaturing the religion of the Hindus, which, he said, consisted in besmearing a piece of stone with red powder, it was no other than the Pioneer, his staunch supporter in politics, which entered into a protest." [*Amrita Bazar*; Feb. 27, 1897]

End, and I do not see it in on the London Stock Exchange. I think that the morality of India will compare very favourably with the morality of any country in West Europe." [*Bengalee*; Dec. 26, 1901]

॥ ১৪ ॥

এইকালে হিন্দু-উত্থানের বৃহত্তম 'শিকার' অন্য কেউ নন—স্বয়ং ডাঃ জন হেনরি মিলার। মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজের দীর্ঘদিনের শিক্ষক ও অধ্যক্ষ, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন ভাইস চ্যান্সেলার, মাদ্রাজের প্রধান শিক্ষাব্রতীরূপে স্বীকৃত ডাঃ মিলার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এইকালে এমন কিছু কথা বলেন, যা স্বামীজীর বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। স্বামীজী নিজে এ-সম্পর্কে ১৮৯৫, ২৬ জুন মেরী হেলকে লেখেনঃ

"সেদিন মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজের প্রেসিডেন্ট মিঃ মিলার আমার চিন্তাগুলি বহুলাংশে সন্নিবিষ্ট করে বলেছেন যে, পাশ্চাত্ত্যের কাছে ঈশ্বর এবং মানব সম্বন্ধে হিন্দু-ভাবগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেগুলির প্রচারের জন্য পাশ্চাত্ত্যে যেতে তরুণদের তিনি আহ্বান করেছেন। এতে অবশ্য মিশনারি-মহলে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।"

চিঠিতে নিছক একটা সংবাদ জ্ঞাপনের ভঙ্গিতে স্বামীজী যে-কথা লিখেছেন, তার থেকে ব্যাপারটার প্রচণ্ড চাঞ্চল্যকর রূপ বোঝা সম্ভব নয়। মাদ্রাজের পক্ষে ডাঃ হেনরি মিলার কী ছিলেন সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

ডাঃ মিলার ভারতে আসেন ১৮৬২ সালে—ভারত ত্যাগ করেন ১৯০৭ সালে। গোড়ায় অল্প কিছুদিন উৎসাহী মিশনারির ভূমিকা নেন, তারপরে মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ সংগঠন করেন। প্রধানতঃ ডাঃ মিলারের পরিশ্রম, সামর্থ্য, বুদ্ধি এবং ত্যাগের জন্য এই কলেজটি দক্ষিণভারতের প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল এবং এর সঙ্গে তিনি এমনই অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন যে, এটি ডাঃ মিলারের কলেজ নামে পরিচিত ছিল। মাদ্রাজের শিক্ষাজগতে তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব বহু বৎসরের ঃ মাদ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে তাঁরই সর্বাধিক জীবন্ত উপস্থিতি, "সিন্ডিকেটের তিনি মেরুদণ্ড," বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, তার প্রথম বেসরকারী ভাইস চ্যান্সেলার, দু'বার কনভোকেশন বক্তৃতাদানে আমন্ত্রিত (বিরল ব্যাপার), লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে শিক্ষক-প্রতিনিধি, ১৮৮২-তে লর্ড রিপনের এডুকেশন কমিশনের সদস্য। হিন্দু খ্রীস্টান নির্বিশেষে অগণিত ছাত্রের শিক্ষাগুরু তিনি—এমনই তাঁর জনপ্রিয়তা যে, ল্যাণ্টার্ন বক্তৃতাকালে তাঁর ছবি দেখা গেলে করতালিতে সমাবেশ ফেটে পড়ত, এবং ১৮৯১-তে জনসাধারণ তাঁর প্রস্তরমূর্তি তৈরী করার জন্য প্রকাশ্যে প্রস্তাব নিয়ে চাঁদা তুলতে থাকে (১৯০১-এ মূর্তি স্থাপিত হয়)। হাউস অব লর্ডসে লর্ড নেপিয়ার শিক্ষাজগতে তাঁর দানের স্বীকৃতিতে বলেছিলেন, ["Dr. Miller's] Services in the cause of higher education are probably unsurpassed in India."৫৮

ডাঃ মিলার তাঁর ভারতীয় কর্মজীবনে মতের ক্ষেত্রে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন নি। কর্মজীবনের প্রথম পর্বে তিনি খ্রীস্টান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খ্রীস্টীয় নৈতিকতা শিক্ষা দেবার

৫৮ সংবাদগুলি প্রধানতঃ সংগৃহীত হয়েছে ইণ্ডিয়ান রিভিউ, ১৯১৪ মে সংখ্যায় মিঃ এস সত্যমূর্তি-লিখিত *A Great Educationist* প্রবন্ধ থেকে। মাদ্রাজের নটেশন কোম্পানী 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' সিরিজে ডাঃ মিলারের জীবনী বার করেছিল।

ঘোরতর পক্ষপাতী ছিলেন, সেজন্য ডাঃ ডানকানের সংগে তাঁর প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধ হয়েছিল, আর শেষ পর্বে তিনি স্বয়ং ঐ সংকীর্ণ শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছিলেন।

রেভাঃ ডাঃ মিলার সম্পর্কে মিশনারিদের ধিক্কারের সূচনা ১৮৯৫ সালের গোড়ার দিকে—যখন ডাঃ মিলার মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকদের সামনে *The Place of Hinduism in the Story of the World* বক্তৃতাটি করলেন। ভারতে তখন হিন্দু-উত্থানের তরংগ প্রবলতম, ঘাঁটি রক্ষা করতে মিশনারিদের প্রাণান্ত হচ্ছে—ঠিক এই সময়ে দেশের সর্বাধিক সম্মানিত মিশনারি-শিক্ষাচার্যের হিন্দুধর্মের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা-সূচক বক্তব্য একেবারে ভিতর থেকে ছুরিকাঘাত মনে হয়েছিল।

যে ডাঃ মিলার তাঁর ভারতবাসের প্রথম পর্বে গোঁড়া মিশনারি—খ্রীস্টান স্কুল-কলেজে শিক্ষাদানের সংগে খ্রীস্টধর্ম বিস্তারের প্রয়াসকে যুক্ত করতে উৎসাহী—সেই মিলারের পাশে বর্তমান মিলারকে রেখে দেখবার চেষ্টা করেছিল মাদ্রাজ টাইমস (১৮৯৫, ১২ এপ্রিল):

"ভ্রাম্যমান নয় এমন সাধারণ ইংরেজের কাছে অখ্রীস্টানেরা কৃপার জীব। তাদের চোখে মুসলমানেরা গোঁড়ামিতে অন্ধ এবং হিন্দুরা অজ্ঞানে অন্ধ। ভক্তগণের কাছে মিশনারিদের চাঁদার বাক্স ঘুরে-ঘুরে টাকা জোগাড় করে, যার সাহায্যে শিক্ষাদাতা পাঠিয়ে মুসলিম ধর্মান্ধতাকে খ্রীস্টীয় বিশ্বাসে পরিবর্তিত করা যাবে এবং হিন্দু অজ্ঞানতাকে ধুযে দেওয়া যাবে গস্‌পেলের জ্যোতিতে। তরুণ মিশনারিরা এই বিশ্বাস নিয়ে কাজে বেরোয়—হীদেনদের কাছে খ্রীস্টধর্মের সত্য হাজির করেছ কি অমনি তারা তাদের ভ্রান্ত আচার্য এবং ভ্রান্ত দেবতাদের ছেড়ে দিয়ে ছুটে আসবে, যেমন দলে-দলে ধেয়ে এসেছিল সেণ্ট পল-কথিত এথেন্সের লোকেরা 'ভগবানের মার থেকে বাঁচবার জন্য।' রেভাঃ জোসিয়া জনসন একদিন এসেছিলেন একই উদ্দেশ্যে—কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন জনতার কাছে মন্দ তামিলে ধর্মপ্রচার করবার মতো ভাষাশিক্ষা করার আগেই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন—হিন্দু কি মুসলমান কেউই পুরো আহাম্মক নয়। কপালে উজ্জ্বল তিলক, ইংরেজি বলতে পাবে, সুন্দর চেহারার যে-নেটিভটিকে রেভাঃ জোসিয়া মাদ্রাজের সমুদ্রতটে ব্যস্ত হয়ে পাকড়ালেন কব্জা করবার জন্য—দেখা গেল, সে-ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, সংস্কৃতিসম্পন্ন, দর্শন ও ইতিহাসে পরিপক্ক এবং ধর্মান্তর-চেষ্টার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সমর্থ। রেভারেণ্ডের জ্ঞানোদয় হল। ক্রমান্বয়ে এমন অনেকগুলি জ্ঞানোদয়ের পরে যখন তিনি ছুটিতে বাড়িতে ফিরলেন এবং গ্রামের মিশনারি-সোসাইটিতে কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হলেন তখন তিনি খুবই অস্বস্তিতে পড়লেন। স্থানীয় পাদরি-মহোদয়, যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন, তিনি হতভাগ্য হিন্দুদের অজ্ঞানের অন্ধকার সম্বন্ধে এমনই অত্যুৎসাহী ছিলেন যে, রেভারেণ্ড জোসিয়া মিশনারিদের চাঁদা-আদায়ের ঐ সভায় সমবেত শ্রোতাদের সামনে নিজেকে জোচ্চোর বলে মনে করতে লাগলেন—কারণ তিনি শ্রোতাদের ধারণানুযায়ী হিন্দুধর্মকে যথেষ্ট আহাম্মকি বলতে পারছিলেন না। রেভাঃ জোসিয়ার ভারতীয় কর্মজীবন শেষ হবার আগেই দেখা গেল—তাঁর মিশনারি-উৎসাহ স্তিমিত। নবাগত, নবোৎসাহে জ্বলন্ত কোনো তরুণ মিশনারি যখন নানা উদ্দীপনাপূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ করত—তখন তিনি বেদনাদায়ক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার করুণা নিয়েই সে-সব কথা শুনতেন।

"এখন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় এই নগরবাসী রেভারেণ্ড ডাঃ মিলারের মনোভাবে একই প্রকার পরিবর্তন ঘটেছে কি-না, তা বলা কঠিন, কিন্তু একথা নিশ্চয় বলা যাবে—১৮৬২, ৯ ডিসেম্বর ২৪ বৎসর বয়সে মাদ্রাজে এসে যে মিঃ উইলিয়ম মিলার পথপ্রচারে নেমে পড়েছিলেন, তিনি তখনি যদি ১৮৯৫ সালে প্রদত্ত রেভাঃ ডাঃ মিলারের বক্তৃতা পড়তে পেতেন, নিশ্চয় একেবারে চমকে শিউরে উঠতেন। ডাঃ মিলার অবশ্য তাঁর আশপাশে চমক ও শিহরণ জাগবে, তা ধরেই নিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র নিষ্ঠুর কথা বলা হবে 'হিন্দু-

পক্ষ থেকে, খ্রীস্টান-পক্ষ থেকে, আবার যে-কোনো ধর্মের বিরোধীদের পক্ষ থেকে—অর্থাৎ সকল পক্ষ থেকে।' "

ডাঃ মিলার তাঁর পূর্বকথিত বক্তৃতায় (যার বিষয়বস্তু বেরিয়েছিল কলেজ-পত্রিকায়) ইহুদী ধর্ম, গ্রীক ও রোমের প্যাগান ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি আছে স্বীকার করেছিলেন—হিন্দুধর্মের সেই বৈশিষ্ট্যের বরণীয় প্রকৃতিকে সহানুভূতির সঙ্গে তিনি বর্ণনাও করেন, যদিও একইসঙ্গে বলেন, খ্রীস্টীয় আদর্শ—ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্মান্তরচেষ্টায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিরোধের কোনো অভিপ্রায় নেই, একথা জানাবার পরে ডাঃ মিলার কিন্তু নিজে ঐ চেষ্টার বিষয়ে ব্যক্তিগত উৎসাহপ্রকাশ করেন নি।

ডাঃ মিলার জানতেন, হিন্দু ও খ্রীস্টান উভয় মহল থেকে তাঁর উপরে কটুকাটব্য করা হয়। হিন্দু-মহলে নিন্দা ছিলনা তা নয়, কিন্তু আনন্দের পরিমাণই ছিল বেশি, কারণ এই বিখ্যাত খ্রীস্টান মিশনারির আংশিক উদারতাও বিস্ময়কর সুতরাং প্রশংসনীয় মনে হয়েছিল, ফলে 'এই মহান ডক্টর' 'পরিবর্তিত মিশনারি' রূপে হিন্দুদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন, 'যিনি অভিশাপ দিতে এসে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন।' (মাদ্রাজ টাইমস, ১৮৯৫, ১১ মে)।৫৯ অপরদিকে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ভারতের এবং বহির্ভারতের মিশনারি পত্রিকাগুলি। তাদের আতঙ্কের সীমা ছিল না যখন দেখল—ভারতের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় এবং বিখ্যাত মিশনারি যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে বলছেন ঃ "যীশু তাঁর বাণী প্রচার করেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন—কাউকে উল্টে দিতে বা কোনো সম্প্রদায় স্থাপন করতে চাননি।" অধিকন্তু দেখা গেল, ডাঃ মিলার চান না তাঁর ছাত্ররা "চার্চ বা মিশনারি নিয়ে ব্যস্ত হয়," কারণ সেখানেও "অনেক মন্দ ও পাপ।" মিশনারিদের পথপ্রদর্শক হবার অধিকার নেই"—একথা যিনি বলেন তাঁকে মিশনারিরা ছেড়ে দিতে পারেন না। মিলার কি ভিতরে-ভিতরে থিয়জফিস্ট হয়ে পড়েছেন, কিংবা ব্রাহ্ম কিংবা বৈদান্তিক?—এই কটু সন্দেহে অস্থির হয়ে তাঁরা বললেন—লোকটি নেকড়ের চামড়া-ঢাকা ভেড়ুয়া, নিজের নীতি ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতক

৫৯ ইণ্ডিয়ান নেশন ডাঃ মিলারের বক্তৃতার উপরে সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখে। হিন্দু-ধর্মকে কিছু প্রশংসা করে ডাঃ মিলার কিভাবে আসলে খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন —সেকথা তীক্ষ্ন বিশ্লেষণের সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদক দেখান। তাঁর মোট মনোভাব এই ঃ

"Our surprise, on reading it [Dr. Miller's lecture] is that Hindus should have congratulated themselves so much on it, and that Christians should have thought fit so warmly to denounce it. It has some appreciative remarks about Hinduism, but it places that religion high, only to make Christianity higher."

[*Indian Nation*; May 27, 1895]

হিন্দু-মহলের আনন্দ সম্বন্ধে মাদ্রাজ টাইমস লিখেছিল ঃ

"Dr. William Miller's lecture....is looked upon in some native quarters as pointing to an instance of the converted missionary, which is expected to become more common as Hinduism is more understood. The great Doctor is spoken of as a modern prophet blessing where he came to curse!"

[*Madras Times*; May 11, 1895]

'হিন্দু' পত্রিকার উল্লাসপূর্ণ রচনার কয়েক লাইন ঃ

"The Reverend gentleman has the courage to avow that Hinduism has a mission and an ideal to go forth with to the world.... We heartily congratulate Dr. Miller....and we can assure him that no true Hindu will fail to recognise the service he has done to the peace and good will of mankind by his lecture." [From *Hindu*; quoted in the *Bombay Guardian*, April 6, 1895]

ইত্যাদি। মিশনারিদের রুষ্ট চাঞ্চল্যের ছবি এঁকেছিল মাদ্রাজ টাইমস (১৮৯৫, ১৯ অগস্ট) ঃ ছুটিতে বাড়ি ফিরে তালেবর স্কুলের ছোকরা পকেট থেকে সিগারেট বার করে গুরুজনদের সামনে ফস্ করে দেশলাই জ্বালিয়ে তা ধরালে যেমন বাড়ির শান্তি নষ্ট হয়, আমেরিকান তরুণী তার সম্ভ্রান্ত প্রেমিকের আইবুড়ি পিসির সামনে ক্লান্ত পদযুগল হঠাৎ টেবিলের সামনে তুলে দিলে যেমন তিনি আঁতকে ওঠেন, মসজিদে শুয়োরের মাথা বা মন্দিরে গোরুর লেজ পড়ে থাকলে যেমন দারুণ হৈ-চৈ পড়ে যায়—ডাঃ মিলারের বক্তৃতা মিশনারি-মহলে তাই ঘটিয়েছে। ডাঃ মিলার জানালেন, "তাঁর চড়া সমালোচকেরা কেউ-কেউ তাঁর বিষয়ে এমন ভাষা প্রয়োগ করেছেন, যা কোনো আত্মমর্যাদাযুক্ত সংবাদপত্র কি করে ছাপতে পারল, সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।" অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ডাঃ মিলার বললেন, কর্তৃপক্ষ চাইলেই তিনি পদত্যাগ করবেন।

বোম্বে গার্ডিয়ান ডাঃ মিলারের বক্তৃতার সমালোচনা কেবল নিজে করেনি, বৃটিশ-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেও প্রকাশ করেছিল। এই পত্রিকা লিখেছিল (১৮৯৫, ৬ এপ্রিল) ঃ ডাঃ মিলার তাঁর একটি বক্তৃতার দ্বারা তিরিশ বছরের মিশন-নীতির বিরোধিতা করে জানিয়ে দিয়েছেন—ধর্মান্তর করা মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য নয়। বোম্বে গার্ডিয়ান 'হিন্দু'র আনন্দপূর্ণ সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করে বলেছিল—ঐ উল্লাসই ডাঃ মিলারের বক্তৃতার ক্ষতিকরতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এইসঙ্গে সে টিনিভেলি সি-এম-এস কলেজের রেভাঃ হেনরি স্ক্যাফটারের মন্তব্য ছেপেছিল, যিনি বলেছিলেন—আবার পরিষ্কার দেখা গেল, ডাঃ মিলারের নেতৃত্বে মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজের উদ্দেশ্য নয় ধর্মান্তর-সাধন সুতরাং কলেজের সমর্থকরা যত শীঘ্র সেটা বুঝে ব্যবস্থা করেন ততই মঙ্গল। লণ্ডনের 'বৃটিশ উইকলি'তে রেভাঃ জেমস ডেনীর মন্তব্য এই পত্রিকা ছাপল (১৮৯৫, ৬ জুলাই), যাতে দেখা গেল, রেভাঃ ডেনী বলেন ঃ মিশনারিরা বিশ্বাস করে, "হীদেনদের উদ্ধার দরকার এবং তাঁরা যে গসপেল সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, তার মধ্যেই একমাত্র আছে ঈশ্বরের ত্রাণশক্তি।" "মিশনারিকে তাঁর শ্রোতাদের শোনাতেই হবে—যে-মেসেজ হাজির করেছি, তা না নিলে তোমরা জাহান্নমে যাচ্ছ।" এই যখন সত্য, তখন অপর ধর্মমত থেকেও কিছু পাওয়ার আছে, এমন কথা ওঠে কি করে? "একথা ঠিক, আলেকজাণ্ডার বা সিজার যদি অপরের উপরে আধিপত্য করতে যান, সেটা হবে স্বার্থপরতা, কিন্তু খ্রীস্টের ক্ষেত্রে তা সত্য নয়.. কারণ তিনি হলেন সকলেরই প্রভু—প্রথমে ও শেষে।"

'বৃটিশ উইকলি' থেকেই বোম্বে গার্ডিয়ান (১৩ জুলাই) ভারতের এক পুরনো পোক্ত মিশনারি ডাঃ রবসনের রচনাংশ উদ্ধার করল, যিনি রেভাঃ ডেনীর বাদ দেওয়া বিষয়গুলি পাকড়ে ধরেছিলেন। ইনি বললেন ঃ "পরিস্থিতি মারাত্মক।...তাহলে কি ডাঃ মিলারের বক্তব্য-অনুযায়ী ভারতের চার্চগুলিকে পাততাড়ি গোটাতে হবে?" হিন্দুধর্মের মারাত্মক জারক ক্ষমতা সম্বন্ধে ডাঃ রবসন বললেন ঃ "অপর ধর্মবিশ্বাসকে গ্রাস করার বা তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করার এমন সূক্ষ্ম ক্ষমতা আর কোনো ধর্মমতের নেই। মুসলমান-ধর্মের আক্রমণশীল রূপকে সে শক্তিহীন করে ফেলেছে। বৌদ্ধধর্মকে সে ভারত থেকে তাড়িয়েছে। খ্রীস্টধর্মের পূর্ববর্তী জয়চেষ্টাকে সে ব্যর্থ করেছে। হিন্দুধর্মের পাশে সিরিয়ান ও রোমান ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়গুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিষ্ক্রিয় জড়। প্রোটেস্টাণ্ট-প্রচেষ্টার দশাও কি তাই হবে? যদি একবার ডাঃ মিলারের মনোভাব প্রোটেস্টাণ্ট মিশনগুলি নিয়ে ফেলে, তাহলে অনিবার্য পরিণতি তাই ঘটবে। যদি একবার তারা খ্রীস্টের আদর্শ হিন্দুধর্মের মধ্যে জায়গা পেয়ে গেছে ভেবে নিয়ে তুষ্টিবোধ করে, তাহলে তারা হিন্দুধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলবে, এবং খ্রীস্টের জন্য ভারতজয়ের আশা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। না—খ্রীস্টের আদর্শ নয়—ভারতকে একেবারে পুরো খ্রীস্ট ধরিয়ে দিতে হবে।"

ডাঃ মিলারের বক্তৃতা নিয়ে সবচেয়ে ফ্যাসাদে পড়েছিল হার্ভেস্ট ফিল্ড। বোম্বে গার্ডিয়ানের মতো করে মিলারকে যদি গালাগালির তোড়ে ভাসিয়ে দেওয়া যেত, প্রাণে শান্তি হত, কিন্তু পত্রিকাটি যে আবার 'বিজ্ঞ বিবেচক;' সেজন্য ১৮৯৫, জুনের সম্পাদকীয়তে ডাঃ মিলারের অভিমত যথাসম্ভব নরম আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা সে করল কিন্তু অস্বস্তি ও বিতৃষ্ণা সম্পূর্ণ গোপন করতে পারল না। অনেকটা শান্তি পেল যখন ডাঃ মিলার ক্রীশ্চান কলেজ পত্রিকায় তাঁর পূর্ব বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু আপসের সুরে ব্যাখ্যাত্মক চিঠি লিখলেন। ডাঃ মিলার জানিয়েছিলেন, তিনি চান, পুরোপুরি হৃদয়ের পরিবর্তন—যে খ্রীস্টান হতে চায়, সে খোলাখুলি ঘোষণা করুক সে-বিষয়ে। মিলার দাবি করলেন—মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ যে-কোনো প্রোটেস্টাণ্ট কলেজ অপেক্ষা বেশি খ্রীস্টান বানিয়েছে। তাঁর এইসব কথার পরে হার্ভেস্ট ফিল্ড (সেপ্টেম্বর) না বলে পারল না, খুবই দুঃখের বিষয়, ডাঃ মিলারের সঙ্গে "খ্রীস্টসেবকেরা অত্যন্ত অযোগ্য ব্যবহার করেছেন।" কিন্তু এই স্বস্তির সময় দীর্ঘায়ত হয়নি। কিছুদিনের মধ্যে ডাঃ মিলার পুনশ্চ হিন্দুধর্মকে সার্টিফিকেট দিলেন এবং বললেন, ধর্মান্তর ক্রীশ্চান কলেজের মূল শিক্ষানীতি নয়, যা বিশেষ ক্ষুণ্ণ করল পত্রিকাটিকে (১৮৯৬, জুন)।

হার্ভেস্ট ফিল্ডের আসল মনোভাব খুলে বলেছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ও প্রধান লেখকদের একজন, আমাদের পূর্বপরিচিত রেভাঃ জে হাডসন—১৮৯৫ জুনের এক মস্ত প্রবন্ধে। হাডসন জানালেন—মিলারের বক্তব্য অস্পষ্ট, তাতে অবাঞ্ছিত অনেক কথা আছে, বক্তৃতাটা লোকে ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করতে পারে। সুবিধামতো অর্থ করতে চায় এমন হিন্দুরা বলবে—ডাঃ মিলার যীশুখ্রীস্টকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আচার্য মেনে নিয়েও বলতে চান, খ্রীস্টধর্মের মধ্যে সমগ্র সত্য নেই। এমন-কি কোনো-কোনো সত্য অন্য ধর্মে আরও ভালোভাবে শেখানো হয়েছে। সেজন্য শ্রেষ্ঠ আচার্য খ্রীস্টকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা তাঁর শিষ্য হতে পারি—খ্রীস্টান চার্চে যোগদান না করেও। ডা হাডসন দৃঢ়ভাবে বললেন : "আমরা খ্রীস্ট ও খ্রীস্টানীকে তফাতে করতে চাই না।" খ্রীস্টধর্ম বুঝতে অবশ্যই খ্রীস্টান-চার্চের ইতিহাসের মধ্যে না গিয়ে গস্‌পেল পাঠ করব, কিন্তু খ্রীস্ট যে জগতে কতখানি 'পাওয়ার' তা না বুঝলে চলবে কি করে—আর তা বোঝার উপায় তো চার্চের 'পাওয়ার' বোঝার উপরেই নির্ভরশীল। হাডসন বললেন, ডাঃ মিলার দেখাতে চেয়েছেন, ভারতের একটি আদর্শ আছে যাতে জগতের প্রয়োজন। তার মানে কি—"খ্রীস্টের আদর্শ অসম্পূর্ণ এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হিন্দুধর্মের প্রয়োজন?...না, আমরা বিশ্বাস করি না যে, হিন্দুধর্মে এমন কোনো শিক্ষণীয় আদর্শ আছে যা খ্রীস্টধর্ম শিক্ষা দেয় না।"

ডাঃ মিলার হিন্দুধর্মের যে-সব সদ্‌গুণের কথা বলেছিলেন, রেভাঃ হাডসন তাকে পয়েন্ট ধরে-ধরে নস্যাৎ করেছেন।—

(১) ডাঃ মিলার বলেছেন : হিন্দুধর্ম বলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও একটা অনিবার্য শক্তি বিরাজিত আছে, যাকে মানুষ পরিবর্তিত করতে পারে না—তার কাছে আত্মসমর্পণ করাই প্রজ্ঞার লক্ষণ।

হাডসনের উত্তর : এটা থেকে হিন্দুর নিয়তিবাদ আসছে। এ বস্তু চলবে না। চাই ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সর্বময় কর্তৃত্ব।

(২) হিন্দুধর্ম বলে : ঈশ্বর কেবল উপরে বসে নেই, সকলের ভিতরেও আছেন—সমগ্র পৃথিবী এবং যারা তাতে বসবাস করে, সবই ঈশ্বরত্বের বিকাশ।

উত্তর : এর থেকে যে-কোনো বস্তুতে ঈশ্বর দেখার সর্বনেশে অদ্বৈতবাদ এসে যায়।

(৩) হিন্দুধর্ম বলে : সকল মানুষ, কিংবা হিন্দুধর্মভুক্ত সকল মানুষ, অবিচ্ছেদে

যুক্ত, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য দায়ী, এবং কোনো ক্ষেত্রেই কেউ অপরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এরই নাম *Unitedness or solidarity of men.*

উত্তর : ও-কথা মানতে খুবই আপত্তি, কারণ হিন্দুদের ও-সব বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই।

হাডসন অবশ্য স্বীকার করলেন, যুগে-যুগে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ছে। তার দ্বারা গস্‌পেলের উপরে নতুন আলোকসম্পাতও সম্ভব। হিন্দুরাও তা করতে পারে। যেমন প্রতাপ মজুমদার 'ওরিয়েন্টাল ক্রাইস্ট' লিখেছেন। এমন-কি হিন্দুধর্মেরও কিছু সত্য থাকতে পারে। কিন্তু সে সত্য এমন অতিরঞ্জিত ও বিকৃত যে, তা মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজীয় শিক্ষায় ধর্মপ্রচারের যে বিরোধিতা ডাঃ মিলার করেছেন, তাতেও সবিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে হাডসন বললেন—যদি কেউ অন্তরে খ্রীস্টকে নিয়ে ফেলে অথচ বাইরে হিন্দু থেকে যায়, সে কি দ্বৈতজীবন যাপন করছে না, সেটা কি নৈতিকভাবে দুষ্ট ব্যাপার নয়?

মিশনারি-আক্রমণ-পর্যায় বর্তমানের মতো শেষ করে আনছি। দীর্ঘ সময় নিয়েছি এক্ষেত্রে। বিবেকানন্দের উপরে মিশনারি-আক্রমণ দেখানোই কেবল আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না—ভারতীয় মিশনারিদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের প্রচারের প্রকৃতির একটা খসড়া-ইতিহাস উপস্থিত করতেও চেয়েছি। বর্তমান স্বাধীন ভারতবর্ষের পাঠকদের কাছে ভারতের নব-জাগরণের নায়ক সম্বন্ধে বিদেশাগত কতকগুলি লোকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আঘাত ও আক্রমণ এবং অবিশ্রান্ত কুৎসা যত অসম্ভব-কাণ্ড মনে হোক না কেন—সেই পরাধীন দেশে তা ছিল না, বিশেষতঃ যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সঙ্গে মিশনারিরা গাঁটছড়া-বাঁধা ছিলেন। তাছাড়া ডাঃ মিলারের মতো সর্বজনমান্য খ্রীস্টান প্রচারকের বক্তৃতায় কিছু উদারতার পরিচয় পাওয়া মাত্র যে-রকম ক্ষিপ্ত আক্রমণ করা হয়েছে, তাতে বুঝতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়, হীদেনকুলে মিশনারিদের প্রধান শত্রু বিবেকানন্দ কোন্ বস্তু উপহার পাবেন। কেবল এখানে নয়, যেখানেই সংকীর্ণতা থেকে উদারতার দিকে গেছেন বিখ্যাত কোনো খ্রীস্টান যাজক, সেখানেই তিনি গোঁড়া মিশনারিদের কাছে একই ব্যবহার পেয়েছেন। আমেরিকার বহুমান্য ধর্মযাজক লীম্যান আবট, ধর্মমহাসভার আগে এবং মধ্যে যিনি যাজক-কুলের অলঙ্কার বলে স্বীকৃত, তিনি যখন বিবেকানন্দের প্রভাবে বদলে গিয়ে প্রচলিত খ্রীস্টান-ধারণার কোনো-কোনোটিকে মানতে অস্বীকার করলেন, যেমন দণ্ডধারী ঊর্ধ্বাসীন ঈশ্বরের ধারণাকে, তখন, আমেরিকায় মিশনারি-মহলে নিন্দার বান ডেকে গিয়েছিল, তাঁকে রূঢ়স্বরে বলা হয়েছিল "অবিশ্বাসী," "ধর্মদ্রোহী," "ভ্রান্ত দর্শনের সমর্থক"—কিন্তু ওখানে আসলে জয়ী হয়েছিলেন বিবেকানন্দ, যিনি এই মহান প্রচারকের কণ্ঠে তুলে দিয়েছিলেন হিন্দুদর্শনের মূল সত্যগুলিকে। ৬০

৬০ ডাঃ লীম্যান অ্যাবট বলেছিলেন :

"That notion of an absentee God—an Imperial Caesar sitting in the centre of the universe ruling things....is gone or going. There are some of us who still cling to it, and to whom the removal of that image seems like atheism.... though their grasp is loosening.... Science, literature and history tells us that there is one eternal energy, that the Bible no longer can be accepted as ultimate, that many of its laws are copied from other religions, that the Ten Commandments did not spring spontaneously from Moses, but were, like all laws, a gradual growth, and that man is a creature of evolution, not a creation. No thinking man will say there are many energies.... There is only one energy. That energy has always been working.... It was working before Christ's time,

আবার এমনও হয়েছে—বিবেকানন্দ কোনো এক নিষ্ঠাবান মিশনারির ধর্মধারণা বদলে দিতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর কাছে স্বরূপ-সত্যে প্রকাশিত হয়েছেন। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে—নিজ মতে অবিচল থেকেও কিভাবে দুই ভিন্ন ধর্মের মানুষ পরস্পরের হাত ধরতে পারেন।

তরুণ আমেরিকান মিশনারি রিভস্ কলকিনস্ ভারতে আসার জন্য নেপলস্ থেকে 'রুবাটিনো' নামক জাহাজে উঠেছিলেন। সুয়েজে পৌঁছবার পরে কিছু যাত্রী নেমে যাওয়ায় তাঁদের খাওয়ার টেবিলে এলেন একজন 'ভারতীয় আচরণসম্পন্ন' অদ্ভুত ভদ্রলোক। প্রথমবার আহারের সময়ে তিনি নীরব ছিলেন, সামান্য কিছু খেয়েছিলেন, কিন্তু মানুষটিকে দেখলেই বোঝা যায় সামান্য নন। সুতরাং তাঁর পরিচয় জানার আগ্রহ জাগল অনেকের মনে এবং সেটা মেটাবার জন্য সুরুচি লঙ্ঘন করে জনৈক চোয়াড়ে সহযাত্রী চীফ স্টুয়ার্ডকে ডেকে, ভদ্রলোকের সামনে অর্ডারের জন্য ওয়াইন-কার্ড রাখতে বললেন। তিনি সামান্য সোডা-ওয়াটারের জন্য চিরকুট লিখে দিলে সেটি যখন অন্যান্যদেব সামনে এল তারা দেখল, স্বাক্ষর—বিবেকানন্দ। তখনই এই তরুণ আমেরিকানের মনে ঝলসে উঠল পুরনো ছবিটা। হাঁ, ইনিই তো তিনি—যাঁকে দেখেছিলুম চিকাগো ধর্মমহাসভায় এবং অত্যন্ত অপছন্দ করেছিলুম। অপছন্দের কারণ রীভ কলকিনস্ জানিয়েছেন। তখন তিনি সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্গত তরুণ প্রচারক—গেছেন ধর্মমহাসভায়—দেখলেন, "কী অসামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিবেকানন্দ খ্রীস্টান-ইতিহাসকে যেন অবহেলায় সরিয়ে দিয়ে প্রাচ্যের এক নতুন তারকার আবির্ভাব-কথা ঘোষণা করলেন। মনে হয়, তাঁর রাজকীয় ভঙ্গিই আমার আমেরিকান গণতান্ত্রিক চেতনাকে বিচলিত করেছিল। তিনি বলেন নি তিনি উচ্চতর ব্যক্তি—তিনি সেটাকে উন্মোচন করে-ছিলেন।" অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে এই তরুণ প্রচারক ঐ সময়ে লক্ষ্য করেছিলেন, আমেরিকার অনেক শহরে, বিশেষতঃ বস্টনে, বিবেকানন্দ-ক্লাব গড়ে উঠেছে। "তাঁর আদর্শ নয়, তাঁর চোখই লঘুচরিত্র আমেরিকান মেয়েগুলোকে ক্রীতদাসী করে ফেলেছে"—ইনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

ছয় বছর পরে বিবেকানন্দকে দেখে যখন চিনতে পারলেন—কলকিন্সের মনের বিরূপতা গেল না। অবিলম্বে তাঁদের পরিচয় হল না। তারপর একদিন বিবেকানন্দ তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি আমেরিকান?" —"হাঁ।" "মিশনারি?'—"হাঁ। "আমাদের দেশে ধর্ম শেখাতে আসো কেন?"—"আমাদের দেশে ধর্ম শেখাতে যান কেন?" বিবেকানন্দ একটু চোখ মটকালেন—আর তাতেই দুজনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন এবং তাঁরা বন্ধু হলেন।

বিবেকানন্দকে সহযাত্রীরা কিভাবে আলোচনায় টেনে এনে প্রশ্নে নাজেহাল করতে চেয়েছিল, কিভাবে চমকপ্রদ উত্তরে বিবেকানন্দ তাদের উপযুক্তভাবে নিরস্ত করেছেন, কিভাবে তাঁর উজ্জ্বল বাক্যের হীরক ঝলসে উঠত, সেকথা কলকিনস্ বলেছেন। আবার সেই ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে ড্রেক ব্রকম্যান নামক জনৈক সিভিলিয়ানের শীতল যুক্তি উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত, তাও ঐ বিবরণে পেয়েছি। একরাত্রে বিবেকানন্দের অসাধারণ বাগ্মিতার কথা তিনি বলেছেন, যেদিন গঙ্গার মহাবন্যার মতো তাঁর কণ্ঠস্বর অনিবার্য বেগে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। আবার অন্তরালে সমালোচনাও করা হয়েছিল—ওগুলো ওঁর মুখস্থ কথা। কলকিনস্ বলেছেন, তৈরী-করা কথা হোক না হোক—"অপূর্ব বিস্ময়কর ও আকর্ষক সে-জিনিস।" কলকিনস্ তাঁর মিশনারি-ধারণামতো বলতে চেয়েছেন

even as it is now.... Man's progress is a progress upward. Each day is better than the first.... To oppose this irresistible tendency of modern thought is to fight against the very spirit of progress, and those who do so are the real enemies of religion." [From a sermon of Dr. Lyman Abbott at the Harvard University; quoted in the *Prabuddha Bharata*; April, 1905]

—বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচারের মূলে ধর্মপ্রেরণা অপেক্ষা দেশাত্মবোধ প্রবলতর। এই পথেই তিনি ভারতীয় পৌরুষের জাগরণ নিশ্চিত ঘটাতে পারবেন মনে করেছিলেন এবং এই দেশ-প্রেমবশেই তিনি মনে করতেন—খ্রীস্টান মিশনারিরা ভারতের স্বার্থহানি করে থাকেন। "এই প্রসঙ্গে কথা বলতে-বলতে বিবেকানন্দের মধুর কণ্ঠস্বর কঠিন ও তিক্ত হয়ে উঠেছিল ঃ ভারতকে আর কাউকে ধর্ম শেখাতে হবে না—এখানে আমরা পৃথিবীর শিক্ষক।"

"সেইদিন রাত্রে আমরা দুজনে ডেকে পায়চারি করেছিলাম এবং গভীরতর বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম—যেখানে ইংরেজ বা আমেরিকান নেই, ভারতীয়ও নেই—আছে কেবল আমাদের ক্ষুধিত মানবভ্রাতারা এবং এক মানবপুত্র, যাঁর আত্মোৎসর্গের রক্ত এখনো রয়েছে এশিয়ার সঞ্চরমান বালুকারাশির মধ্যে কোনো এক স্থানে।"

যে-বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারকে দেশপ্রেরণার ফল বলে এই মিশনারি স্থির করেছিলেন—সেই বিবেকানন্দের পরম রহস্যময় অধ্যাত্মচেতনার রূপও কিন্তু ইনিই বর্ণনা করেছেন। "বিবেকানন্দের মিস্টিসিজম অপূর্ব মোহকর এবং পরম বিস্ময়কর। তাতে কোনো ভঙ্গি ছিল না। আমাদের কথাবার্তা যখন আত্মার গহন বিষয়কে স্পর্শ করত, আর তা না করে পারত না, তখন তাঁর ভারী চোখের পাতা ধীরে নেমে আসত এবং তিনি আমারি সামনে প্রস্থান করতেন এমন এক জগতে, যেখানে কিন্তু আমার আমন্ত্রণ ছিল না। এমনই এক ঘটনার কালে যখন আমি বলেছিলাম—সেই পরম পুরুষের সান্নিধ্যে খ্রীস্টানের অবস্থিতি অবশ্যই সচেতন, জাগ্রত এবং সতর্ক (সকল ব্যক্তিগত সম্পর্ক যা হয়ে থাকে)—সেজন্য হিন্দুর সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মে নিমজ্জনের সঙ্গে তার কার্যতঃ ও মূলগত পার্থক্য আছে—তখন তিনি আমার দিকে চকিত চোখে তাকিয়ে যাচাই করে নিয়েছিলেন কিন্তু কোনো কথা বলেন নি।"

শেষ রাত্রির কথা। জাহাজ বোম্বাইয়ে পেঁছিবার ঠিক আগের রাত্রি। তাঁরা দুজনে সামনের ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিবেকানন্দ একটি ব্রায়ার-পাইপে ধূমপান করছিলেন ("আমার একমাত্র ইংরেজি দোষ, যার প্রতি আমি আসক্ত।") সামনে ছিল তাড়িত সমুদ্র আর ভাবী অজানিত জীবনের রূপ সম্বন্ধে নানা ভাবনার ভার। মিশনারি তাই স্তব্ধ। স্বামীজীও নীরব। বহুক্ষণের মৌন। "তারপর স্বামীজী যেন স্থির করলেন—আমি ভারতের কোনো ক্ষতি করব না—তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন।

"'ওরা ওদের বুদ্ধের, কৃষ্ণের, খ্রীস্টের কথা বলে বলুক, কিন্তু আমরা বুঝেছি, আপনি আর আমি—আমরা সেই এক ও অদ্বিতীয়ের অংশ।'

"তাঁর হাত আমার কাঁধের উপরে রইল। এমনই বন্ধুর হাত তা, রূঢ়ভাবে তাকে সরিয়ে দিতে পারলাম না। তারপর তিনিই হাত নামালেন আর আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম।

"আমি বললাম, স্বামীজী! আপনি আপনারই কথা বলুন, আমার হয়ে বলবেন না। যে এক ও অদ্বিতীয়ের কথা আপনি বলেছেন, তা নৈর্ব্যক্তিক, সুতরাং অবশ্যই অজ্ঞেয় থেকে যাবে—যদি তার মধ্যে আমি নিমজ্জিত হই তবুও—যেমন এই জাহাজটি ভারত-মহাসাগরে নিমজ্জিত হলে হবে। আমি যাঁকে জানি, আমি যাঁকে ভালবাসি, তিনি ব্যক্তিরূপ, অত্যন্তই বাস্তব সত্য—স্বামীজী, তাঁর মধ্যেই সমস্ত পূর্ণতার আশ্রয়।

"চকিতে স্বামীজী মুখ থেকে ব্রায়ার-পাইপটি নামালেন—রেলিং-এ যখন হেলে দাঁড়ালেন, তখনই দেখা গেল—তাঁর চোখের পাতা নামতে শুরু করছে—আর তিনি প্রস্থান করেছেন দূরে, বহুদূরে।

"সে-রাত্রে বিবেকানন্দ কোথায় গেলেন? সে কি এক এবং অদ্বিতীয়ের মধ্যে—না কি সমস্তের মধ্যে বিরাজিত সেই পরম একের মধ্যে—কে জানে!"

॥ ১৫ ॥

এই দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করবার আগে চিরন্তন বিবেকানন্দের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে—সকল ধূলি-ঝঞ্ঝার উপরে নিশ্চিত আলোকের মতো যিনি বর্তমান ছিলেন। 'কিছু অসুখী ব্যক্তি' অধ্যায়টি শুরু করেছিলাম যেকথা বলে, তার প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারি। আমরা বলেছিলাম, তিনি নামযশ ঘৃণা করতেন অথচ তাঁকেও একবার সংবাদপত্রের সমর্থন চাইতে হয়েছিল। ভাগ্যের পরিহাসে তাঁকে বারে-বারে চেয়ে পাঠাতে হয়েছে ভারতীয় সংবাদপত্রের টুকরো অংশ, যার মধ্যে তাঁর ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত আছে! বিবেকানন্দ সম্মান-ভিখারী নন, কিন্তু যে-কাজের পত্তন করেছেন তাকে নষ্ট হতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মেরী হেলকে ১৮৯৭, ৯ জুলাই লিখেছিলেন : "কেবল একটা ভাব আমার মাথায় ফুটছিল—ভারতের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র চালু করা"—যন্ত্রটা চালু করার জন্যই তিনি নিজের যন্ত্রী-ভূমিকার স্বীকৃতি চেয়েছিলেন, নচেৎ "লোকেরা কি বলে না-বলে, তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা সব খোকার দল, বেশি কি বুঝবে? কী! আমি আত্মাকে জেনেছি, পার্থিব অসার বস্তুর শূন্যতা বুঝেছি—আমি খোকাদের কথায় নিজের পথ থেকে সরে যাব—আমাকে দেখে তাই মনে হয়?"

স্বামীজী এও জানতেন, যে-যন্ত্রটা তিনি তৈরি করতে চান, তা কেবল ভারতবাসীর নয়, শেষ পর্যন্ত মানবজাতিরই কল্যাণে লাগবে, সুতরাং সেজন্য, ঈশ্বরের নির্দেশেই কি না কে জানে, তাঁকে স্বীকৃতি ভিক্ষা করে দাঁড়াতে হয়েছে দেশবাসীর সামনে। মাদ্রাজ ও কলকাতার ধন্যবাদ-সভার অনুষ্ঠান ও তার বিবরণ আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে যখন তাঁর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আর কোনো প্রশ্নই রইল না, তখন থেকে তিনি আর সংবাদপত্রের প্রচার চাইলেন না—কিছুদিন পরে ও-বস্তুকে রীতিমত ভয় করতে আরম্ভ করলেন। ঐ প্রচারের যদি কিছু মূল্য থাকে তা ভারতেরই জন্য—ভারতবাসী তাঁর মধ্য দিয়ে নিজ দেশ ও ধর্মকে মর্যাদা দিতে শিখবে। কিন্তু তা যদি আত্মতৃপ্তির জন্য হয়—ঈশ্বর রক্ষা করুন! চিঠির পর চিঠিতে স্বামীজী ভারতের কাগজের কাটিং পাঠাতে নিষেধ করেছেন। কলকাতার ধন্যবাদসভার খবর পাবার পরেই ১৮৯৪, ২১ সেপ্টেম্বর আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন : "আমার মনে হচ্ছে—খবরের কাগজের জয়ঢাকবাদ্য এবং পাবলিক ওয়ার্কের ভুয়ো হৈ-চৈ তো যথেষ্ট হল—আর কেন? আমার ও-সবের একদম ইচ্ছে নেই।" কয়েকদিন পরে, ২৭ সেপ্টেম্বর একই ব্যক্তিকে লিখেছেন : "আমার বন্ধুদের বলবে, আমার নিন্দুকদের জন্য আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। তাদের ঢিল খেয়ে যদি পাটকেল মারতে চাই, তাহলে তো তাদের পর্যায়ে নেমে এলুম। বন্ধুদের বলবে, সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই করবে—আমার জন্য কাউকে অন্যের সঙ্গে লড়তে হবে না।" ঐ বছর ২২ অক্টোবর রামকৃষ্ণানন্দের কাছে পাঠানো চিঠিতে লিখেছিলেন : "অধিক নিউজ পেপার কাটিং পাঠাইবার আবশ্যক নাই, অনেক হইয়াছে।" অক্টোবর মাসেই মেরী হেলের কাছে চিঠিতে ভারত থেকে আসা রাশি-রাশি চিঠিপত্র সম্বন্ধে বিরক্তিপ্রকাশ করেছেন : "ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। কেবল ভারত থেকে বোঝা-বোঝা সংবাদপত্র আসায় বিরক্ত হয়েছিলাম। 'মাদার চার্চ' এবং মিসেস গার্নসিকে সেগুলি গাড়ি-বোঝাই করে পাঠিয়ে দিয়ে ভারতে ওদের নিষেধ করেছিলাম, আর যেন সংবাদপত্র না পাঠায়। ভারতে খুব হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে। আলাসিঙ্গা লিখেছে, দেশ জুড়ে, গ্রামে-গ্রামে আমার নাম রটেছে। ফলে পূর্বেকার সে শান্তি আর রইল না। এরপর আর কোথাও বিশ্রাম বা অবসর পাওয়া কঠিন হবে। ভারতের এই সংবাদপত্রগুলি আমাকে শেষ না করে ছাড়বে না দেখছি। কবে কি খেয়েছি, কখন হেঁচেছি—সব ছাপবে। অবশ্য বোকামি আমারই। এখানে এসেছিলাম নিঃশব্দে কিছু অর্থসংগ্রহের জন্য। কিন্তু

ফাঁদে পড়ে গেছি। চুপচাপ থাকা শেষ হয়ে গেল।" ২৭ তারিখে আলাসিঙ্গাকেঃ "ভারত থেকে যথেষ্ট কাগজপত্র এসেছে, আর আবশ্যক নেই। তুমি এবং মাদ্রাজের অন্যান্য বন্ধুগণ আমার জন্য নিঃস্বার্থভাবে যে কঠোর পরিশ্রম করেছ তার জন্য কত কৃতজ্ঞ বলে উঠতে পারব না। তবে একথা জেনে রেখো, তোমরা যা করেছ তার উদ্দেশ্য আমার নাম বাজানো নয়—তোমাদের শক্তি সম্বন্ধে তোমাদের সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। সংগঠনকার্যে আমি পটু নই—ধ্যানধারণা, অধ্যয়নের দিকেই আমার প্রবণতা।" ৩০ নভেম্বর পুনশ্চ আলাসিঙ্গাকে ঃ "সংবাদপত্রের কাটিং আর পাঠাবার দরকার নেই—তার বন্যায় ভেসে গেছি—যথেষ্ট হয়েছে।"

চিঠির পর চিঠিতে স্বামীজী একই কথা লিখে গেছেন। আর দু'একটির মাত্র উল্লেখ করব। ১৮৯৪-এর এক চিঠিতে শিবানন্দকে লিখেছেন ঃ "এই যে খবরের কাগজগুলো আমাকে বাড়িয়ে তুলছে, তাতে আমার খ্যাতি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ভালো ফল এস্থান থেকে ভারতে অধিক। এখানে বরং রাতদিন খবরের কাগজে নাম বাজতে থাকলে উচ্চশ্রেণীর লোকদের মনে বিরক্তি জন্মায়। অতএব যথেষ্ট হয়েছে।" ঐ বৎসরে আলাসিঙ্গাকে লেখা এক চিঠিতে নিজের সাময়িক দুর্বলতা অকুণ্ঠে স্বীকার করে বলেছেন ঃ "আমি যে খবরের কাগজের অংশগুলো তোমায় পাঠিয়েছিলাম, সেগুলি প্রকাশ করতে বলা ঠিক হয়নি। ওটা অত্যন্ত ভুল কাজ হয়ে গেছে। তা মুহূর্তের দুর্বলতারই প্রকাশ।" এবং বিবেকানন্দই ঐ রকম লিখতে পারেন! স্বামীজী ধর্মমহাসভা হয়ে যাবার পরে আলাসিঙ্গাদের কাছে কৃতজ্ঞতাবশে কিছু সংবাদপত্রের বিবরণী পাঠিয়েছিলেন—সেগুলি 'হিসাব' দেবার জন্য—প্রকাশের জন্য নয়। তারপরে একবার তিনি প্রকাশের জন্য কিছু সংবাদপত্রের অংশ পাঠান—সেই "নাম যশের প্রতি লোভ" সন্ন্যাসীকে অনুতাপে আত্মগ্লানিতে ভরিয়ে তুলেছে। এক্ষেত্রে আমরা যদি কেবল পুরনো ইতিহাসের দিকে একবার চোখ ফেরাই—১৮৯৪-এর মাঝামাঝি সময়ে স্বামীজীর জীবনের মন্দতম মুহূর্তগুলি, তাঁকে প্রতারক, অসাধু প্রমাণ করবার জন্য জোটবদ্ধ বিরোধীপক্ষ, সর্বদিকে আক্রান্ত তিনি, সাহায্যের হস্ত কোথাও উত্তোলিত দেখছেন না, সমস্ত জীবনের সাধনা ব্যর্থ হওয়ার মুখে, ব্যক্তিগত চরিত্র পর্যন্ত সন্দেহের অধীন—সেই দুর্লগ্নে যদি তিনি প্রশংসামূলক কিছু সংবাদ প্রকাশের জন্য ভারতে পাঠিয়ে থাকেন—হাঁ, সে-কাজ করে লজ্জিত হতে পারেন বিবেকানন্দই।

সুতরাং বিবেকানন্দ পুনশ্চ লিখলেন ১৮৯৫-এর ১১ জানুয়ারীতে ঃ "খবরের কাগজের বিবরণ সম্বন্ধে আর আমার আগ্রহ নেই। সেগুলো তোমাদের পাঠাব, তা আর আশা করো না। কাজ আরম্ভের জন্য একটু হুজুগ দরকার হয়ে পড়েছিল। এখন তা যথেষ্ট হয়েছে।... তোমরাও আমাকে খবরের কাগজ আর পাঠিও না। ও দেখলেই আঁতকে উঠি। নীরবে, ধীর-ভাবে কাজ করে যেতে চাই, প্রভু সর্বদা সঙ্গে আছেন।" একই কথা স্বামীজী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৫-এর এক চিঠিতে লিখলেন ঃ "এক্ষণে বহুত খবরের কাগজ ইত্যাদি এককাট্টা হইয়া গেল। আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। হুজুক এক্ষণে ভারতের মধ্যেই চলুক।"

যে-বিবেকানন্দকে এখন আমরা দেখছি, তাঁর কাছে সাফল্যের চেয়ে আতঙ্কের বস্তু আর কি থাকতে পারে? ১৮৯৪ ১২ মার্চ হেল-ভগিনীদের লিখেছেন ঃ "সত্য কথা বলতে কি, আমি যতই জনপ্রিয় হচ্ছি, এবং আমার বাগ্মিতার উৎকর্ষ ঘটছে, ততই আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছি।...এসব বাজে জিনিস থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।" তাঁর অন্তরের চিরসন্ন্যাসী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন ঃ

"বক্তৃতা ও অধ্যাপনায় বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।...একটি নোটবই আমার কাছে আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরেছে। দেখছি, সাত বছর আগে এতে এই কথাগুলি লেখা হয়েছে ঃ 'এবার একটি একান্ত ঠাঁই খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে।' কিন্তু

হলে কি হয়, এইসব কর্মভোগ বাকি ছিল। মনে হয় এবার কর্মক্ষয় হয়েছে, ঈশ্বর আমাকে এই প্রচারকার্য তথা শুভকর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন।...

"অনন্ত অবিঘ্নিত শান্তি ও বিশ্রামের জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। 'একাকী বিচরণ করো! একাকী বিচরণ করো! যিনি একাকী অবস্থান করেন, কাহারও সহিত কদাচ তাঁহার বিরোধ হইতে পারে না। তিনি অপরের উদ্বেগের হেতু হন না, অপরেও তাঁহার উদ্বেগের হেতু হন না।' সেই ছিন্ন বস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন ভোজন—হায়! সেগুলি কী তীব্রভাবে আমি চাই—চাই!" (ওলি বুলকে লেখা, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৯৫)।

এই অধ্যায় শেষ করার আগে নির্ভয় নির্মম সন্ন্যাসীর মুখোমুখি দাঁড়াব আমরা, যিনি পদ্যে নয় গদ্যেও 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচনা করেছেন। একবার জনৈক প্রেসবিটেরিয়ান ধর্ম-যাজকের সঙ্গে স্বামীজীর তুমুল তর্কবিতর্ক হয়। বিতর্ককালে স্বামীজীর কঠোর সত্য-ভাষণ আমেরিকায় তাঁর কাজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে—এই সতর্কবাণীর উত্তরে স্বামীজী মেরী হেলকে ১৮৯৫, ১ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন ঃ

"সেদিন মিস থার্সবির বাড়িতে এক প্রেসবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। যথারীতি তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে গালমন্দ করতে লাগলেন। সেজন্য মিসেস বুল আমাকে খুবই ভৎর্সনা করেছেন কারণ এগুলি আমার কাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তোমার মতও তাই মনে হচ্ছে।

"তুমি যে ঠিক এখনি এ-সম্বন্ধে লিখেছ, তাতে আমি খুশি কারণ বিষয়টি নিয়ে আমি যথেষ্ট ভাবছি। প্রথমতঃ জানাই, এইসব ব্যাপারের জন্য আমি আদৌ দুঃখিত নই। হয়ত তুমি এতে বিরক্ত হবে—হতেই পারো। সাংসারিক উন্নতির জন্য মধুরভাষী হওয়া কত ভালো, আমি তা বিলক্ষণ জানি। আমি যথাসাধ্য তা হতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে যখন অন্তরস্থ সত্যের সঙ্গে উৎকট রকমের আপস করবাব অবস্থা আসে, আমি থেমে যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নই—আমি সমদর্শিত্বে আস্থাবান।

"সাধারণ মানুষের কর্তব্য—তার সমাজ-নামক 'ঈশ্বরের' আদেশ পালন করা। কিন্তু জ্যোতির তনয়গণ কখনো সেরূপ করেন না। এই একটি চিরন্তন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সঙ্গে মানিয়ে নেয় এবং সর্বসুখদাতা সমাজের কাছ থেকে সকল সুখসম্পদ লাভ করে; অপরজন একাকী খাড়া থেকে সমাজকে তার দিকে আকর্ষণ করে। আপসকারীর পথ কুসুমাস্তীর্ণ, আর তাতে অনিচ্ছুকের পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমেষেই বিনাশ পান, আর চিরজীবী হন সত্যের তনয়গণ।...

"ভগিনি! আমি যে প্রতিটি বিকট মিথ্যার সঙ্গে মিষ্টবাক্যে আপস করতে পারি না, সেজন্য দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু কি করব, পারি না। সারাজীবন সেজন্য ভুগেছি, তবু পারি নি। অবিরাম চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হতে দেবেন না। এখন হৃদয়ের সত্য আবির্ভূত হোক। আমি এমন কোনো পথ আবিষ্কার করতে পারি নি, যা সকলকে খুশি করবে। আমি স্বরূপতঃ যা, তা না হয়ে আমার উপায় নেই। নিজের অন্তরাত্মার নিকট আমাকে খাঁটি থাকতেই হবে। 'যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, ধন ও জীবন নশ্বর, নাম ও যশ নশ্বর, বন্ধুত্ব ও প্রেম শূন্যে হারিয়ে যায়, এমন-কি পর্বতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হয়—কেবল সত্যই চিরস্থায়ী।' হে সত্যরূপী ঈশ্বর! তুমিই আমার একমাত্র পথপ্রদর্শক হও! আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এখন আর মিষ্ট-মধু হওয়া চলে না। আমি যা, তাই আমাকে তোমরা থাকতে দাও। 'হে সন্ন্যাসি! তুমি নির্ভয়ে দোকানদারি ত্যাগ করে, শত্রু-মিত্র কাউকে গ্রাহ্য না করে, সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকো। এই মুহূর্ত থেকে ইহলোক এবং পরলোকের সকল প্রাপ্তিকে ও প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে ত্যাগ করো—ত্যাগ অসার সম্ভোগকে। হে সত্য! একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও।'

আমার ধনের, মানের, ভোগের কামনা নেই। ভগিনি! এ সকলই ধূলিবৎ তুচ্ছ। আমি আমার ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। অর্থোপার্জনের কৌশল আমার জানা নেই—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অন্তরস্থিত সত্যের বাণী না শুনে কেন আমি বাইরের পৃথিবীর খেয়াল-খুশিতে চলব? ভগিনি! আমার মন এখনো দুর্বল, তাই বাহ্যজগতের সাহায্য এলে সময়-সময় অভ্যাসবশে তাকে আঁকড়ে ধরি। কিন্তু ভয় আমার নেই। ভয়ই সবচেয়ে গুরুতর পাপ। আমার ধর্মের শিক্ষা তাই।...

"হৃদয় শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। জীবন কিছুই নয়, মৃত্যু ভ্রমমাত্র। এই যা-কিছু—এসব কিছুই নয়। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। হে আমার হৃদয়, নির্ভয় হও, নিঃসঙ্গ হও! ভগিনি! পথ দীর্ঘ, সময় অল্প, সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে—আমাকে শীঘ্র ঘরে ফিরতে হবে।...

"মিসেস বুলের মতো তুমিও যদি ভেবে থাকো, এ-পৃথিবীতে আমার বিশেষ কাজ আছে, তাহলে ভুল করেছ। এ-জগতে বা অন্য কোনো জগতে আমার কোনো কাজ নেই। আমার কেবল কিছু বাণী আছে। তাকে আমি নিজের ভাবেই উপস্থিত করব—হিন্দু-ভাবে নয়, খ্রীস্টান-ভাবে নয়—একেবারে আ-মা-র ভাবে, এইমাত্র! মুক্তিই আমার একমাত্র ধর্ম—আর যা-কিছু তার প্রতিবন্ধক, আমি তাকে পরিহার করব—হয় সংগ্রাম করে, না হয় সরে গিয়ে—যে-ভাবে হোক। কী! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করব!! ছোঃ!!! ভগিনি! আমার কথা ভুল বুঝে ক্ষুণ্ণ হয়ো না। তোমরা শিশুমাত্র, আর শিশুদের পরের অধীনে থেকে শিক্ষালাভ করা কর্তব্য। তোমরা এখনো সেই উৎসের সন্ধান পাও নি, যা 'যুক্তিকে অযুক্তিতে পরিণত করে, মর্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শূন্যে পর্যবসিত করে এবং মানুষকে ঈশ্বর করে তোলে।' শক্তি থাকে তো লোকে যাকে 'জগৎ'-নামে অভিহিত করে, সেই ভ্রান্তির জাল কেটে বেরিয়ে এসো। তখনই আমি তোমায় প্রকৃত সাহসী ও মুক্ত বলব। আর যদি তা না পারো, তাহলে অন্ততঃ যারা 'সমাজ'-নামক মিথ্যা ঈশ্বরকে ধূলিবৎ চূর্ণ ক'রে তার অবিমিশ্র কপটতাকে পদদলিত করতে সাহস করে—তাদের উৎসাহিত করো। যদি তাও না করতে পারো, তবে দয়া করে চুপ করে থাকো; কিন্তু দোহাই, আপস বা মনস্তুষ্টি করার মিথ্যা মূর্খতায় প্রণোদিত করে তাদের পাঁকে টেনে নামাবার চেষ্টা করো না।

"আমি এই জগৎকে ঘৃণা করি—এই স্বপ্নকে, উৎকট দুঃস্বপ্নকে, তার গির্জা-মন্দির-মসজিদের প্রবঞ্চনাকে, তার শাস্ত্র ও বদমাইশিকে, তার সুন্দর মুখ ও কপট হৃদয়কে, তার বিবেকের বাহ্য আস্ফালন ও ভিতরের শূন্যতাকে, সর্বোপরি, ধর্মের নামে তার দোকানদারিকে। কী! সংসারের ক্রীতদাসেরা কি বলছে, তার দ্বারা আমার সত্তার বিচার করবে? ছোঃ! ভগিনি! তুমি সন্ন্যাসীকে চেনো না। বেদ বলেন, সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ, কারণ তিনি গির্জা-মন্দির-মসজিদ, সম্প্রদায়, ধর্মমত, শাস্ত্র বা প্রবক্তার ধার ধারেন না। মিশনারি বা অন্য যে-কেউ যত পারে চিৎকার করে আমাকে আক্রমণ করুক, আমি গ্রাহ্য করি না।"

বিবেকানন্দ নিন্দুকদের গ্রাহ্য না করতে পারেন, কিন্তু তাতে নিন্দুকরা নিবৃত্ত হবে, এমন মনে করার হেতু নেই, কারণ—একই ঈশ্বরের কাছ থেকে নিন্দার অধিকারও তারা পেয়েছে! আমেরিকান কবি এলা হুইলার উইলকক্স এক্ষেত্রে শেষ কথা বলেছেন :

> "আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মধ্যে কোনো বিরাট আত্মার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে—হয়ত বুদ্ধের, হয়ত খ্রীস্টের।...এমন মহাপ্রাণকেও মানুষ ভুল বোঝে, কলঙ্ককথায় লাঞ্ছিত করে—এ জিনিসটি আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকত যদি-না জানতাম—বুদ্ধ ও খ্রীস্ট কিভাবে নিম্নস্তরের ক্ষুদ্র মানুষদের মিথ্যার দ্বারা আহত হয়েছেন, উৎপীড়িত হয়েছেন তাদের হাতে।"

———

নির্ঘণ্ট

[পত্র-পত্রিকার নাম নির্ঘণ্টের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা দেবী, ব্রাহ্মসমাজ, খৃস্টান-মিশনারিও অনুল্লিখিত।]

বিবেকানন্দ সম্পর্কে যখন রোমাঁ রোলাঁ, নিবেদিতা, তিলক শ্রীঅরবিন্দ, অ্যানী বেশান্ত, ঈশারউড, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রাধাকৃষ্ণণ লুই বার্ক, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র অধ্যাপক বাসমের মতো লেখকেরা কলম ধরেছেন তখন উচ্চাঙ্গের রচনার নিশ্চয় অভাব নেই।

অভাব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। সমকালীন ভারত-ইতিহাসের উপরে স্থাপন করে স্বামীজীকে এখনো দেখা হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন তিনি যেন এদেশের ইতিহাসকে দুহাতে ধরে বদলে দিয়েছেন তার তথ্যভিত্তিক বিবরণ রচনার জন্য চাই সমকালীন সাক্ষ্যের সংকলন। ভারতের নানা স্থানে বহু বৎসর ভ্রমণ করে শতাধিক পত্র পত্রিকা ও অন্য সূত্র থেকে বিপুল সংবাদ আবিষ্কার করে লেখক সেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন করেছেন। রচিত হয়েছে আশ্চর্য কাহিনী অভিঘাত সংঘাতে রক্তাক্ত কিন্তু আলোকোজ্জ্বল এক মহাজীবন কথা।

এই গ্রন্থ একইসঙ্গে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের দলিল। ব্রাহ্ম মিশনারি হিন্দু রক্ষণশীল বৈষ্ণব বৌদ্ধ থিয়সফি এইসব আন্দোলনের সঙ্গে এতে আছে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ [illegible] ইত্যাদি। তিলকের গ্রেপ্তার নিষ্ঠুর সরকারী দমননীতির কথা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্র জাতীয়তা আঞ্চলিকতা সম্প্রদায়িকতার সঙ্গে বিজ্ঞান যন্ত্রশিল্প কলাশিল্প সাহিত্য সংগীত সাময়িকপত্র সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা। সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে ম্যাক্সমূলার ও [illegible] রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে নানা মহলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সূচনা ও বিকাশ, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা আন্দোলন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক (রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ পরিচয়ের অজ্ঞাত সংবাদ-সহ)। এ গ্রন্থে অগণিত মানুষের ভিড় তাঁদের অনেকেই ভারত ও পৃথিবীতে বিখ্যাত চরিত্র আবার অনেকে বিবেকানন্দের স্পর্শে বা প্রেরণায় আত্মোৎসর্গের অগ্নিবজ্র। এই সূত্রে জাতীয় আন্দোলনে বিশেষতঃ বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর বিপুল প্রভাবের মূল্যবান সংবাদ। আর রয়েছে—বিবেকানন্দ কেন এ যুগের বিশ্বের প্রফেট—তারই অভ্রান্ত নির্দেশ।

নিঃসন্দেহে বলা যায়—এই হল স্বামীজীর-সম্পর্কে ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গবেষণা।

[illegible] সমুখ।